সাতটি উপন্যাস

বুদ্ধদেব গুহ

সাতটি উপন্যাস

বুদ্ধদেব গুহ

বুদ্ধদেব গুহ-র

সাতটি উপন্যাস

বুদ্ধদেব গুহ-র

সাতটি উপন্যাস

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

SATTI UPANYAS
A Collection of Bengali Novels by BUDDHADEB GUHA
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241 2330/2219 7920, Fax : (033) 2219 2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
Rs. 300.00

ISBN : 81-295-0738-2

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৭২

PUBLIC LIBRARY
14199

প্রচ্ছদ : সুব্রত চৌধুরী

দাম : ৩০০ টাকা

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণগ্রন্থন : অনুপম ঘোষ, পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ঈশানী হাজরা

কল্যাণীয়াসু

লেখকের অন্যান্য বই

ঋভু (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ)
ঋভু (অখণ্ড সংস্করণ)
বনী
দশম প্রবাস
স্বপনে, নিভৃত স্বপনে
(স্বপ্নিল, পরিক্রমা, দ্রিমি)
সাঁঝবেলাতে
পর্ণমোচী
চরৈবেতি
যুগল উপন্যাস
তেরোটি উপন্যাস (একত্র সংকলন)
সমুদ্রমেখলা
সারেং মিঞা
শালডুংরি
জঙ্গল সম্ভার
অদল বদল
ভাল লাগে না
অজগরের দেশে
আলোকঝারি
পরদেশিয়া
কাঙ্গপোকপি
চানঘরে গান
অভিলাষ
সাজঘরে, একা
প্রেমের গল্প
ধুলোবালি
রিয়া
পঞ্চপ্রদীপ
কোজাগর
ইলমোরাণদের দেশে
পলাশতলীর পড়শী
নাজাই
যাওয়া আসা
লালা মিঞার শায়েরী
মহুড়া
পারিধী
সোপর্দ
বনবাসর
প্রথম প্রবাস
পঞ্চম প্রবাস
চবুতরা
প্রথমাদের জন্য
স্বগতোক্তি
লবঙ্গীর জঙ্গলে
জলছবি
অনুমতির জন্যে
আয়নার সামনে
জঙ্গল মহল
ঝাঁকিদর্শন
সুখের কাছে
জঙ্গলের জার্নাল
বাজা তোরা, রাজা যায়
দূরের দুপুর
চাপরাশ
সারস্বত
শ্রেষ্ঠ গল্প

প্রকাশকের নিবেদন

প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের বাংলা উপন্যাসের সেরা সম্ভার দুইমলাটে বন্দি করে পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আগ্রহে গত কয়েকবছর ধরে 'তেরোটি উপন্যাস' সিরিজ প্রকাশ করে আসছে দে'জ পাবলিশিং। এই সংগ্রহগুলি পাঠক-প্রিয় হয়েছে।

এই পর্যায়ে প্রথম সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল 'বুদ্ধদেব গুহ-র তেরোটি উপন্যাস'। আনন্দের কথা বইটি পাঠকদের প্রীতি-আনুকূল্য লাভ করেছিল। এজন্য আমরা পাঠকদের কাছে কৃতজ্ঞ।

আমাদের বর্তমান প্রকাশ বুদ্ধদেব গুহ-র আরও তেরোটি উপন্যাসের সংগ্রহ। তবে বইয়ের আয়তন এবং মূল্যের কথা মাথায় রেখে পাঠকদের সুবিধার জন্য দুটি পরিপূরক খণ্ডে যথাক্রমে ছয়টি ও সাতটি উপন্যাস বিন্যস্ত হল।

যে কোনও লেখকেরই সেরা রচনা বাছাই করা অতিশয় দুরূহ কর্ম। বিশেষ করে তিনি যদি বুদ্ধদেব গুহ-র মতো লেখক হন। এ-দায়িত্ব লেখক নিজে নেওয়ায় আমার ভার অনেকটাই লাঘব হয়েছে। এই সংকলনে সংগৃহীত উপন্যাসগুলি লেখকের বিভিন্ন সময়ের রচনা। এই সংকলন প্রকাশ করতে পেরে একজন প্রকাশক হিসেবে আমি গর্বিত। আর ভুল-ত্রুটি যা-কিছু তার দায়িত্ব আমারই।

সুধাংশুশেখর দে

সূচি

সাঁঝবেলাতে
৯
পাখিরা জানে
১০১
সুখের কাছে
১৩৭
বিন্দাআস
২১১
সারেং মিঞা
২৪১
সমুদ্রমেখলা
৩৫৯
পর্ণমোচী
৪৩৯

সাঁঝবেলাতে

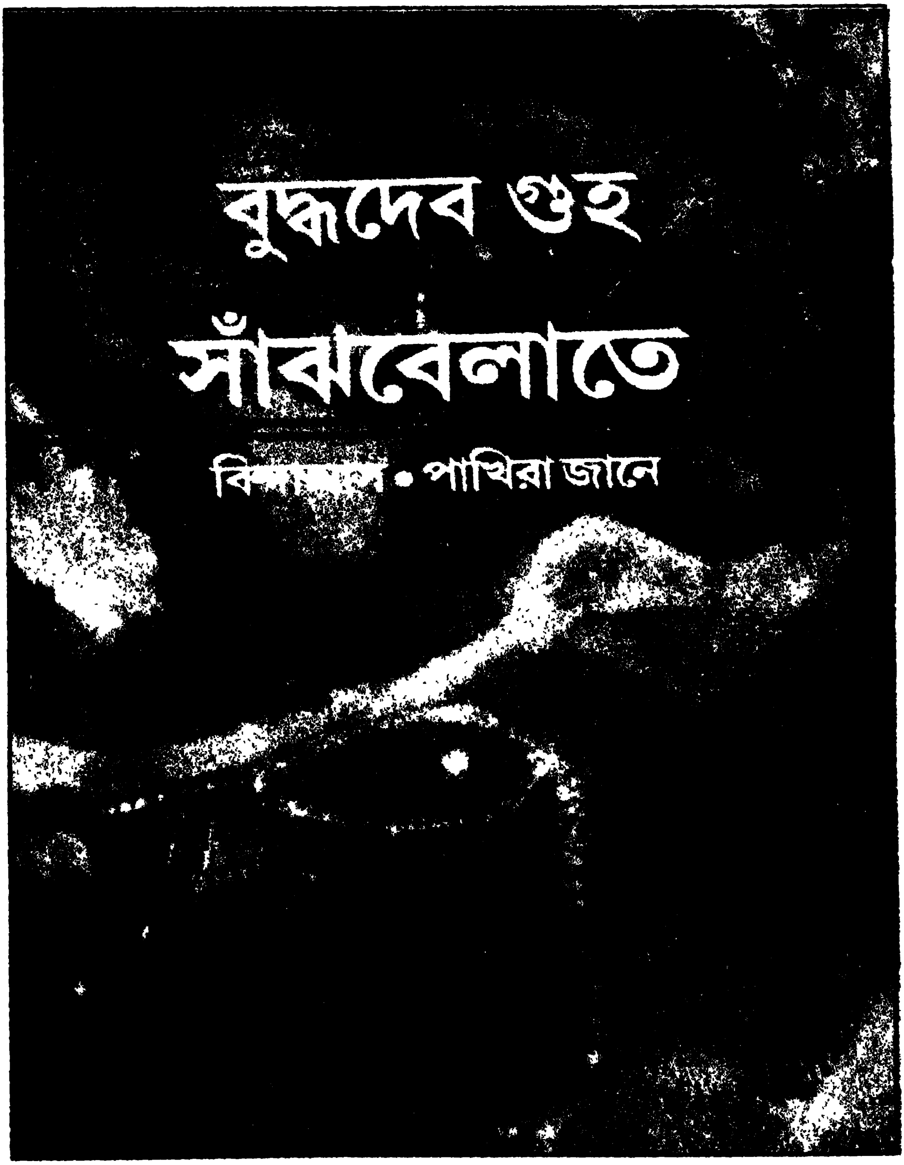

উৎসর্গ

সুভাষ এবং শুক্লা ভৌমিক-কে

প্রচ্ছদ

বুদ্ধদেব গুহ

ফোনটা যে ওঘরে বেজে যাচ্ছে। গিয়ে ধর না জগু। কর্ডলেসটা আমার কাছে দিসনি কেন? অপারেটর আজ আসেনি?

আজ তো রবিবার বাবু।

ওটা চার্জে রাখা আছে।

হ্যাঁ বাবু।

ধরলি?

ধরছি স্যার।

কার ফোন?

আপনারই বাবু। আর কার হবে? এ বাড়িতে আপনি ছাড়া...

তুই বড়ো বেশি কথা বলছিস আজকাল। কে? করলেন কে?

শ্রীদেবী।

তিনি কে?

জানি না বাবু। সিনেমা স্টার কি?

বিরক্তির সঙ্গে, দে! বলে কর্ডলেস ফোনের রিসিভারটা কানে লাগালেন হরপ্রসাদ চ্যাটার্জি। বললেন, ইয়েস।

স্যার, আমি দেবী বলছি। আপনার স্টাডির ফোনটা কি খারাপ?

হ্যাঁ।

তাই অন্য নম্বরটাতে করলাম।

বেশ করেছ। কেমন আছ?

আপনার গাছের চারা জোগাড় করেছি স্যার। আজ অগাস্টের এগারো তারিখ। এ সপ্তাহের মধ্যেই লাগিয়ে দিন। মাটি ধরে নেবে। তরতরিয়ে বাড়বে। তা ছাড়া রাজপুরের মাটি খুব ভালো।

সত্যিই কি বসন্তী নামের কোনও ফুলের গাছ আছে? আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লীতে প্রীতি আর আলো রায়ের বাড়ি 'আস্তানা'র কম্পাউন্ডে গাছটি না দেখলে তো ও গাছের কথা জানতামই না। গত বছর গেছিলাম বসন্তোৎসবে, পঁয়ত্রিশ বছর পরে।

এই তো আপনার দোষ স্যার। বিশ্বাস করতে সব কিছুই কি নিজের চোখেই দেখতে হবে? না-দেখে কি কিছুই বিশ্বাস করতে তো বটেই স্বীকার করতেও পারেন না? আমাকেও তো আপনি দেখেননি বললেই চলে। তার মানে কি আমিও নেই?

তুমি অবশ্যই আছ। তুমি নেই এ কথা কে বলে! তা ছাড়া, তোমাকে দেখিনি তা তো নয়। একঝলক দেখেছিলাম। একটি কালো ব্লাউজ আর হলুদ শাড়ি পরে এসেছিলে তুমি সেমিনারে। সেমিনারের শেষে আমার কাছে এসে আলাপ করলে। বললে, নারী প্রগতি সম্বন্ধে আমার বলা ইনফর্মাল বলেই তোমার খুব ভালো লেগেছে।

তা বলিনি। আপনার বক্তব্য ছিল থার্ড ক্লাস কিন্তু বলার রকমটা ছিল দারুণ।

বলো নি? তা হবে। দু-তিন মিনিট কথা বললে। তারপর তো আর দেখা হয়নি। ফোনেই কথা হয়েছে বার কয়েক মাত্র। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, সেই ক্ষণ থেকেই তুমি আমার কাছে হলুদ রঙের প্রতিভূ হয়ে গেছ। বাসন্তী। আর তাই তো তোমাকেই বসন্তী গাছের কথা বললাম। তোমার সঙ্গে

অন্য দশটা মেয়ের তফাত আছে। তুমি একেবারে তোমারই মতো। বয়স কম হলে কি হয়, তুমি খুব ম্যাচিয়োর্ডও।

তারপর বললেন, রবিবাবুর ওই গানটি কি শুনেছ তুমি?

কোন গান? আপনারা বুঝি রবীন্দ্রনাথকে রবিবাবু বলেন?

মানে, মা-বাবারা বলতেন ছেলেবেলায়। তাঁদের মুখে শুনে শুনে...

গানটা কি বলুন।

'একলা বসে হেরো তোমার ছবি, এঁকেছি আজ বসন্তী রঙ দিয়া।'

খোঁপার ফুলে একটি মধুলোভী, মৌমাছি ওই গুঞ্জরে বন্দিয়া।'

শুনেছি।

আর কেউই কেন অমন লিখতে বা সুর দিতে পারলেন না বলো তো?

জানি না।

আপনাদের জেনারেশনের রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বেশ বাড়াবাড়ি আছে।

রবীন্দ্রনাথকে পড়লে, তাঁর গান শুনলে বাড়াবাড়ি না করে যে কোনও উপায় নেই। তোমরা যে যাচাই না করেই বাতিল করতে চাও কি না। অবুঝ যৌবনের অন্ধ ধর্মই যে এই।

তারপর তোমাকে যখন হলুদ ফুলের কথা বললাম, বললাম বসন্তী গাছের কথা, তুমি বললে চারা এনে দেবে। বুঝলে দেবী, বসন্তী ফুল হয়তো দেখে থাকব কিন্তু গাছ তো আগে চিনিনি।

ও গাছের আরও একটি নাম আছে। ভারি সুন্দর।

কী সেটা?

ফাগুন-বউ।

তাই?

হ্যাঁ। কিন্তু দেব কোথায়? চারা তো এনেইছি। এখন দেব কি করে! শুনেছি আপনার বাড়িতে তো আপনি কারও সঙ্গেই দেখা করেন না।

ঠিকই শুনেছ।

কেন করেন না?

সে অনেক কথা। আপাতত এটুকু জেনে রাখো যে আমার বাড়ি বলতে কিছুই নেই। জগন্নাথ বলে একটা Rogue আছে। সেই বাড়ির মালিক। যে বাড়িতে কোনও নারী থাকেন না তাও কি বাড়ি না কি?

আপনার স্ত্রী থাকেন না আপনার সঙ্গে?

আমি তো বিয়েই করিনি।

সে কি? কেন?

করবার সময় পেলাম কই? আর করবার জন্যেই বিয়ে করে লাভই বা কি? স্ত্রীকে সময় না দিতে পারলে বিয়ে না করাই ভালো। তা ছাড়া বিয়ে করার মতো কোনও নারীর সঙ্গে দেখাই হল না এ পর্যন্ত।

ভেরি স্যাড।

একটি ঘর বরাদ্দ আছে আমার। সেই স্টাডিতেই, রাতে শোবার সময় ছাড়া, দিন ও রাত কাটাই, অফিসে না গেলে, নিজের নিজস্ব কাজকর্ম করি, গান শুনি, ছবি আঁকি, গান করি-ও।

গান করেন আপনি?

ওই চান ঘরে গানের মতো গান আর কি। নিজেই গাই, নিজেই শুনি।

তারপর বললেন, এসব কথাকে কারও বিরুদ্ধে, এমনকী নিজের বিরুদ্ধেও কোনও অনুযোগ অভিযোগ বলে ভেব না, নেহাতই আমরা আক্‌নের ভাষায় যাকে বলি, 'স্টেটমেন্ট অফ ফ্যাক্ট'।

কারও বাড়িতে আসতে যে বলতে পারি না তা নয়, কিন্তু হয়তো না বলাই ভালো। আমার বাড়িতে তো বাড়ির পরিবেশ নেই। তাই কারোকে আসতে বললে যে প্রকার টেনশন হয় তার চেয়ে আসতে না বলাই ভালো বলে মেনে নিয়েছি। এই বন্দোবস্তেই দিন কাটছে, কেটেছে। কেউ ব্যাখ্যা চাইলে বিব্রত বোধ করি। তা ছাড়া বাড়ি তো স্ত্রীদেরই। তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখেন তো তাঁরাই। তাই আমার স্ত্রী-ই যখন নেই...

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, দেখা করতে হলে তোমাকে আমার অফিসেই আসতে হবে। আসল চেম্বার অবশ্য বাড়িতেই। অফিসটাও অবশ্য আমার একার নয়। সেখানেও আমার জন্যে একটা ছোটো ঘর বরাদ্দ আছে বাবার আমল থেকেই। নড়াচড়া করা যায় না তাতে। আর তাতেই কাটিয়ে দিলাম যৌবনের, প্রৌঢ়ত্বের এমনকী বার্ধক্যের বছরগুলিও। আমার কপালটাই এরকম। আছে সবই কিন্তু সবই ছোটো। সবই আছে কিন্তু কিছুই নেই।

এমন হল কেন? বিয়ে তো আপনি এখনও করতে পারেন। বলেন তো পাত্রীর লাইন লাগিয়ে দিই।

এইচ. পি. চুপ করে রইলেন।

তারপর দেবী বলল, আপনার বড়ো বোকা অভিমান। নিজের অধিকার কেড়ে নিতে শেখেননি কেন? এমন দয়া-নির্ভর কেন আপনি?

জানি না। হয়তো আমারই দোষে। কিন্তু থাক সে সব কথা। এখন বলো বসন্তী গাছের চারাটি আনলে কোথা থেকে? গাছটা তো বেশ বড়োই হয় দেখলাম। তবে ঝুপড়ি হয় না। বসন্তেই ফোটে তো। ফুল?

বসন্তে বসন্তী ফুটবে না তো কি শিউলি ফুটবে! আশ্চর্য কথা বলেন আপনি! এনেছি এটা ঝাড়গ্রাম থেকে। সেখানে আমার বড়োমামা থাকেন। সুবিমল চন্দ্র দে-র হর্টিকালচারাল এরেনা থেকে কিনেছি। উনি হর্টিকালচার শুধু ব্যবসার জন্যেই করেন না, পণ্ডিত মানুষ, অনেক বইও আছে তাঁর। এই তো এইবারের বইমেলাতেই বেরিয়েছে ফুলের বড়ো গাছের ওপরে একটি বই, দে'জ পাবলিশিং থেকে।

তাই?

তারপর বলল, আপনি এ বছরে বইমেলাতে যাননি?

নাঃ। প্রথম প্রথম গেছি কয়েক বার। ওই ভিড় আর ধুলো আর আঁতেলদের ভিড় ভালো লাগে না আমার। তা ছাড়া, বইমেলা তো লেখক আর পাঠকদের। আমি না লেখক, না পাঠক। কোন দাবিতে যাব সেখানে?

পশ্চিমবঙ্গে আঁতেল আছেন না কি কেউ? অধিকাংশই তো সিউডো। তা ছাড়া আপনি তো পাঠক হিসেবেই যেতে পারেন। কত মোটা মোটা বই আছে আপনার অফিস ঘরে, বাড়িতেও আছে। আমি শুনেছি।

তুমি কি আমার পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছ না কি?

হয়তো লাগিয়েছি।

উদ্দেশ্যটা কি? কিডন্যাপ করবে? আমার অত টাকা নেই। কিডন্যাপ করলে মেরে ফেলতে হবে।

তারপর বললেন, মোটা মানুষের কাছে কিছু মোটা বই তো থাকবেই।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, কিন্তু ওসবই তো ওকালতির বই। মক্কেলেদের ভড়কি দেওয়ার জন্যে। যাতে তারা ঘাবড়ে গিয়ে বেশি ফিস দেন। উকিলের চেম্বারে যত বই থাকে তার অধিকাংশই দেখাবারই জন্যে। এমনই হয়ে আসছে চিরদিন। বেশির ভাগ বই-ই নানা আইনের হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের রিপোর্টস। মামলার সময়ে কাজে লাগে রেফারেন্সের জন্যে। তবে বইয়ের

দিন তো শেষ হয়ে এল। এখন কমপ্যাক্ট ডিস্ক-এ আসছে সব ডিসিশনস। সিডি-রম। কম্পিউটার। ইন্টারনেট। জায়গার বড়ো সংকুলান হবে এবারে। বড়ো আরামে হাত-পা ছড়াবে মানুষ এবারে।

আর বইগুলো? এতদিনের সুখ-দুঃখের সঙ্গী আপনাদের লাল নীল পেনসিলে দাগ দেওয়া, সেগুলোর কী হবে। ফেলে দেবেন?

পুরোনো কাগজওয়ালা কিনে নেবে। উনুন ধরাবে ফুটপাথের তেলেভাজাওয়ালা।

তাই? এমন ভাবতে আপনার খারাপ লাগে না?

লাগে খারাপ। তবে আমরা তো সব Obsolete হয়ে গেছি। মানুষই বাতিল হয়ে যাচ্ছে এসব বইপত্র তো হবেই। খারাপ লাগলে কি হবে। মেনে নিতে হবে। ওয়ান মাস্ট রাইড উইথ দ্যা টাইড।

যাই হোক, আপনি যে বললেন আমাকে লাঞ্চ খাওয়াবেন একদিন, তার কী হল!

খাওয়াব তো। যেদিন বলবে। তবে সেদিন কোর্ট না থাকলেই হল।

কবে কোর্ট থাকবে না তা আমি জানব কি করে?

তুমি এক শনিবারে এসো। কোর্ট তো সব শনিবারই বন্ধ থাকে। আমার চেম্বারের কাছেই 'মেইনল্যান্ড চায়না'। দারুণ চাইনিজ খাবার। বার লাইসেন্সও আছে। দু'টি করে ব্লাডি মেরি খেয়ে তোমাকে হাঁসের মাংস খাওয়াব নয়তো ক্র্যাবমিট।

চাইনিজ আমার ভালো লাগে না।

সে কি?

যা সকলের ভালো লাগে আমার তা লাগে না। তবে আপনার বেলাতেই একসেপশন করেছি। না করে পারিনি বলে।

আমাকে সকলের ভালো লাগে বলছ?

লাগে বইকী। পুরুষদের কথা বলছি। হাইকোর্টে তো আপনি খুবই জনপ্রিয়।

রাখো ওসব বাজে কথা। এখন বলো দেখি কোথায় খাবে?

আপনি যেখানে খাওয়াবেন। কোনও ধাবা-টাবাতেও খেতে পারি। খাওয়াটা তো বড়ো কথা নয়। আপনার সঙ্গে, আপনার মুখোমুখি বসে কথা বলতে পারব কিছুক্ষণ। এ আমার বহু দিনের স্বপ্ন।

হরপ্রসাদ হেসে ফেললেন। বললেন, ধাবাতে কেন? তোমাকে তাজ বা গ্রান্ডের কফি শপ-এ খাওয়াব। পার্ক হোটেলের কফি শপটাও খারাপ নয়। তোমার যেখানে খুশি। কোনো ক্লাবেও খেতে পারো। টলি, সুইমিং ক্লাব, বেঙ্গল ক্লাব। তবে ক্লাবগুলো আর আগের মতো নেই। কুচো চিংড়ি আর চামচিকেয় ভরে গেছে।

ক্লাবের দোষ কি? আসলে মানুষের কোয়ালিটিই নষ্ট হয়ে গেছে। কতখানি নষ্ট হয়েছে তা আমার চেয়ে আপনি অনেক ভালো জানবেন।

কিন্তু আমি তো সেলিব্রেটেড লেখক নই, গায়ক নই, চিত্রী নই, আমার মধ্যে তুমি কি দেখলে তা তুমিই জানো! বড়োই বিপদে ফেললে দেখছি তুমি আমাকে। এখনও সময় আছে। নিজেকে গুটিয়ে নাও।

তা হয় না। আপনার মধ্যে একজন মানুষ দেখেছি। সেটাই যথেষ্ট।

তারপর বলল, মির সাহেবের একটা শায়েরি আছে জানেন?

না। আমি কোনো শায়েরিই জানি না। হরপ্রসাদ বললেন। শায়েরি কি জিনিস?

দেবী বলল,

'হিঁয়া সুরত-এ আদম বহুত হ্যায়, আদম নেহি হ্যায়।'

মানে কি হল? এসব বিজাতীয় ভাষা আমি বুঝি না।

সে কি? আপনি হিন্দি ছবি দেখেন না টেলিভিশনে?

টিভি আমি দেখিই না।

মানে হল, এখানে মানুষের চেহারার জীব অনেক আছে, মানুষ নেই।

ভালো। তুমিই সত্যদ্রষ্টা। জীবনের সাঁঝবেলাতে তুমি এসে পড়ে আমার জীবনে মহা ঝামেলা বাধাবে বলে মনে হচ্ছে। জানি না, কপালে কি আছে!

জীবনের সাঁঝবেলাতে পৌঁছে গিয়েও বাঁচতে শিখলেন না। হোয়াট আ পিটি! আপনাকে আমি বাঁচতে শেখাব।

কোনো কিছুই শেখার মতো মানসিকতা আর ধৈর্য আমি হারিয়ে ফেলেছি দেবী। বৃথা চেষ্টা কোরো না। তোমার জীবনে এখন সুগন্ধি সকাল। নিজেকে উপভোগ করো। বুড়োকে গাছের চারা দিয়েছ বেশ করেছ, নিজের মহামূল্য সময় দিয়ে নিজের ক্ষতি কোরো না। যৌবনের মতো দামি আর কিছু নেই। আমার যৌবন চলে গেছে বলেই আমি একথা জানি। এ কথার তাৎপর্য তুমি আজকে বুঝবে না। তুমি নিজেও একটি চারা। তোমার যোগ্য বাগানে হেঁটে গিয়ে থিতু হও।

আপনি মুণ্ডু জানেন। যৌবন কোনো শারীরিক অবস্থা আদৌ নয়, পুরোপুরিই মানসিক অবস্থা, অ্যাটিট্যুড টুওয়ার্ডস লাইফ। আপনার মতো যুবক তো আমি সেদিন আর একজনও দেখলাম না।

এই টাক-পড়া হতশ্রী বুড়োকে এসব কথা বলে উত্তেজিত বা আহ্লাদিত করতে পারব না। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, চোখ খারাপ তো হয়েইছে।

আমি ঠিকই আছি। ইন পারফেক্ট ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল কন্ডিশন।

দেবী বলল।

আচ্ছা দেবী, তুমি কি চাও বলো তো আমার কাছে? চাকরি চাও? টাকা চাও? ডোনেশন চাও? কোথাও কি ইন্টারভিউ পেয়েছ? ইন্টারভিউয়িং বোর্ডে কারোকে কারোকে বলে দিতে হবে তোমার সম্বন্ধে? খুলেই বলো না।

দেনাপাওনা, স্বার্থ, এসব ছাড়া কি কিছুই বোঝেন না আপনি? আপনার মনটাই দূষিত হয়ে গেছে। একেবারে পল্যুটেড। আপনার মনের পরিবেশ ঠিক করতে সময় লাগবে। কত সময়, কে জানে!

সময় যে আমার বেশি বাকি নেই দেবী। তুমি রবিবাবুর ওই গানটা জানো?

কোন গান?

"অবেলায় যদি এসেছ আমার বনে, দিনের বিদায় ক্ষণে/গেয়ো না, গেয়ো না চঞ্চল গান ক্লান্ত এ সমীরণে। ঘন বকুলের ম্লান বীথিকায়/শীর্ণ যে ফুল ঝরে ঝরে যায়/তাই দিয়ে হার কেন গাঁথ হায়, লাজ বাসি তাই মনে/চেয়ো না, চেয়ো না মোর দীনতায় হেলায় নয়ন কোণে।"

গেয়ে শোনান না?

আমি গায়ক নই। তা ছাড়া তোমাকে শোনাবার মতো ভালো গাই না।

হাঃ। আমি কি খুব বড়ো বোদ্ধা?

যাই হোক, গানটি শুনিনি। আমরা সত্যিই অভাগা। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে বা তার সাহিত্য ও গানের ছায়ায় আমরা বড়ো হয়ে উঠিনি। আমার মা সব সময়েই বলেন একথা।

তাই? তোমার বাবা কি করেন?

বাবা ডাক্তার ছিলেন। জি. পি.।

ছিলেন মানে?

মানে, এখন নেই। চলে গেছেন।

সে কি! তোমার বাবার আর কত বয়স হতে পারে। ষাটও তো হবে না।

থাকলে বাষট্টি হত। উনি পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেই চলে গেছেন মোটর অ্যাকসিডেন্টে।

আর মা? তোমার সঙ্গে থাকেন? মায়ের বয়স এখন কত?

মেয়েদের বয়স জিজ্ঞেস করতে হয় না। তা এখন পঞ্চান্ন হবে। মা একাই থাকেন। আমার সঙ্গে থাকেন না।

মা কি কিছু করেন?

মা স্কুলের টিচার।

কী বিষয় পড়ান?

বাংলা।

তা হলে তুমিও একাই থাকো?

হাসল দেবী। বলল, একা কেন থাকব? সঙ্গীর সঙ্গে থাকি।

সঙ্গী মানে? বিয়ে করোনি তুমি?

না স্যার। বিয়ে ব্যাপারটা আজকালকার দিনে সকলের পক্ষে করা সম্ভব হচ্ছে না আর। খুব বড়োলোকের মেয়ে যদি হতাম তবে হয়তো বেশ সালংকারা সুসজ্জিতা হয়েই সানাই বাজিয়ে বিয়ে করতাম। বাবা জামাইকে গাড়ি কিনে দিতেন, টলি ক্লাবের মেম্বার করে দিতেন, বিলেতে বা স্টেটস-এ ম্যানেজমেন্ট পড়াতে পাঠাতেন আর আমি স্বামীর ওপর ছড়ি ঘোরাতাম। অমন চক্ষুলজ্জাহীন আরামদায়ক ব্যবস্থা না হলে বিয়ে করা সম্ভব হচ্ছে না এখন। করাটা উচিতও নয় হয়তো। মানে, ওরকম বিয়ে করাটা। তেমন স্বামীকে তো শ্রদ্ধা করা যায় না। তারা তো ঘর জামাই-এর চেয়েও অধম। আজকালকার খুব কম শিক্ষিত আত্মসম্মান জ্ঞানসম্পন্ন ছেলেই অবশ্য অমন বিয়ে করতে রাজি হবে।

বলো কি? আমার তো ধারণা আত্মসম্মান জ্ঞান ব্যাপারটা আজকালকার খুব কম ছেলের মধ্যেই আছে।

আপনি হয়তো সকলকে দেখেননি স্যার।

তোমার সঙ্গী কি করেন?

তবে আমার সঙ্গী তো এক জন নয়, দুজন। মিনি-দ্রৌপদী বলতে পারেন আমাকে। আমরা তিন জনে এক সঙ্গে লিভ টুগেদার করি। একজন স্বামীতে আজকাল সত্যিই কুলোয় না। তিন জনেই কাজ করি যে আমরা।

কেন? তিন জনেই কাজ করো কেন?

নইলে কুলোয় না। কারও রোজগারই তো বেশি নয়।

তারপরই বলল, আপনাকে একদিন নিয়ে আসব আমাদের বাড়ি। আসবেন? আপনি এত বড়োলোক, নামী মানুষ।

আমি যে মোটা মানুষ এটুকুই জানি। আর কিছু বিশেষণ আমার সম্বন্ধে প্রযোজ্য বলে জানি না।

তারপর বললেন, কোথায় থাকো তুমি?

কোনও পশ পাড়াতে নয়। বুঝতেই পারছেন, আমি অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত। দমদমের নাগেরবাজারে থাকি আমি। খাদিমের কর্তা পার্থ রায়বর্মনকে যেখানে কিডন্যাপাররা ছেড়ে দিল আমাদের একতলার বাড়িটা সেই গলিতেই। রিকশাওয়ালটাকেও আমরা চিনি। কতদিন দমদম স্টেশন থেকে ওকে নিয়ে আমি এসেছি।

নিজের ফ্ল্যাট তোমার? ওনারশিপের...

দেবী হাসল।

বলল, আপনি কি পাগল? নিজের ফ্ল্যাট থাকলে কি আর সংসার চালাতে দুজন সঙ্গী লাগত? একটা ডাইনিং-সিটিং আর দুটো বেডরুম। তাও এক তলাতে। প্রাইভেসি প্রায় নেই-ই। এই

গুমোটে সারাক্ষণ পর্দা টেনে থাকলে হয়। আওয়াজ। ধুলো। গাড়ির হর্ন। সাইকেল রিকশার প্যাঁকপ্যাঁকানি।

দুটো বেডরুম কেন?

আমার যে দুজন সঙ্গী। এক সঙ্গে দুজেনর সঙ্গে শোব কী করে! তিন দিন তিন দিন করে শুই। বদলে বদলে। রবিবার অফ ডে। আমি একলা শুই হাত-পা ছড়িয়ে আর ওরা দু-বন্ধু এক সঙ্গে শোয়। রাম-টাম খায়। টিভি দেখে, বসার ঘরে বসে। মেয়েদেরই মতো ছেলেদেরও অনেক নিজস্ব গল্প থাকে, যা মেয়েদের সামনে করতে বাধে। তবে ভবিষ্যতে আরও একটা ঘরের হয়তো দরকার হবে।

কেন? আরও একজন সঙ্গী জোটাবে না কি?

হেসে ফেলল, দেবী।

বলল, না। আগামী বসন্তে যখন শান্তিনিকেতনে নরম হলুদ বসন্তী ফুল আসবে, মনে ইচ্ছে আছে, তখন কনসিভ করব আমি।

তারপরই বলল, ও গাছের আরও একটি নাম আছে। ভারি সুন্দর।

কী সেটা?

ফাগুন বউ।

ফাগুন বউ বা বসন্তী গাছে যখন ফুল আসবে তখনই আমিও ফুলফলন্ত হব। আমার শরীরে বীজ বপন করব। ইচ্ছে আছে। আগন্তুক এলে তো তার জন্যে একটা এক্সট্রা ঘর লাগবেই।

কনসিভ যে করবে তা তোমার সন্তানের বাবা কে হবে?

আপাতত ঠিক আছে বর্তমান সঙ্গীরাই।

দু'জনে?

হ্যাঁ দুজনেই। তবে আমি সিংগল-প্যারেন্ট হিসেবে মানুষ করব সন্তানকে যদিও সন্তানের দুই বাবাই আমাকে মরাল ও ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট দেবে। আশা করি। নিনা গুপ্তা আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন। শি ইজ দ্যা পাথ-ফাইন্ডার। বাঘও তো শুনেছি তার বাচ্চাদের সঙ্গে থাকে না। বাবাদের যে বাচ্চার সঙ্গে থাকতেই হবে তার কি মানে আছে?

হ্যাঁ। অনেক বাবা শুনেছি বাঘেরই মতো স্বভাবের হয়। নিজের বাচ্চাকেও খেয়ে ফেলে।

শুনছেন! শুনছেন! দরজার বেল বাজাচ্ছে তো না যেন যুদ্ধ করছে। নিশ্চয়ই কিংশুক ফিরেছে। ওর আবার আজকে বাজার করে নিয়ে আসার কথা। দরজা খুলতে দেরি হলে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করবে। আজকে ছাড়ি স্যার। পরে আবার করব একদিন শিগগিরই। পরশুই করব। আপনার সঙ্গে কথা বলতে খুব ভালো লাগে। আপনিও করবেন, যদি সময় পান। আর যদি ইচ্ছে করে। আমার নম্বরটা লেখা আছে তো?

আছে আছে। লেখা আছে।

তারপরে, টাটা! বলেই রিসিভারটা ক্র্যাডল-এ নামিয়ে রাখল দেবী।

কর্ডলেস ফোনটার সুইচ অফ করে দিতেই কেমন যেন শূন্যতা বোধ করলেন এইচ. পি. চ্যাটার্জি সাহেব। কলকাতার উঁচু মহলে সকলেই তাঁকে এইচ. পি. বলেই জানে। ঠিক এই ধরনের শূন্যতা এর আগে কোনওদিনই বোধ করেননি। ওই অল্পবয়সি মেয়েটি তাকে কী যেন এক পূর্ণতার আভাস দেয়, হাতছানি দেয়, অতি শালীন ও সুরুচিসম্পন্ন হাতছানি, অন্য এক জগতে, যে-জগৎ সম্বন্ধে এইচ.পি-র কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই।

ফোনটা বাজল।

তোমার অন্য নাম্বার দুটোই কি খারাপ? এইচ. পি?

মাথার মধ্যে যে এক ঘোরের সৃষ্টি হয়েছিল তা চুরমার হয়ে গেল। এইচ. পি বললেন, হ্যাঁ তিন দিন হয়ে গেল।

কমপ্লেইন করোনি?

করেছে তো মদন।

জে. কে. রায় সাহেবকে বলে দাও না একবার।

থাক না। যবে ঠিক হয়, হবে। ফোন একটা যন্ত্রণা। একা থাকার, একটু একা ভাবার কি জো আছে? তবু যদি বুঝতাম আমার উপকার করতে কেউ ফোন করে। সকলেরই তো কিছু না কিছু চাই। এটা করে দাও, ওকে বলে দাও, সেটা ধরে দাও এই আর কি! বিরক্ত লাগে। তিতিবিরক্ত।

বুঝলাম। তা কার সঙ্গে প্রেম করছিলে এইচ. পি?

হরপ্রসাদ অনেকক্ষণ চুপ করে থাকাতে ব্যারিস্টার মৃগেন মিত্তিরের বউ বাসবী খেঁকিয়ে উঠে বললেন, কি? কথা বলছ না যে।

তাঁর কী যে অধিকার এইচ. পি. চ্যাটার্জির ওপরে তা তিনিই জানেন। বিরল কেশ, কলপ করা, পেডিকিয়ুর ও ফেশাল করা ষাট ছুঁই ছুঁই বাসবী মিত্তির হরিপদকে একটু বিশেষ চোখে দেখেন। কিন্তু এইচ. পি সাহেব রিয়্যালি ডেসপাইজেস হার। নেহাত মৃগেন মিত্তির তার চেয়ে সিনিয়র এবং প্রথম দিকে প্রফেশনে খুবই সাহায্য করেছিলেন। তা ছাড়াও বাসবীর দাদা হারাধন বাঁড়ুজ্জ্যে একজন নামী সলিসিটর। মেসার্স ওয়ালটন অ্যান্ড হুইটনি সলিসিটর ফার্মটা ওঁরই, বহুদিন হল। ওয়ালটন এবং হুইটনি ওই দুই সাহেবই স্বাধীনতার কয়েক বছর পরেই ইংল্যান্ডে চলে গেছেন। ওই ফার্ম অনেকই ব্রিফ দিয়েছে চ্যাটার্জি সাহেবকে, পেশার প্রথম দিকে, যখন সাহায্যের দরকার ছিল। আজকে তিনি ব্রিফ যত ফেরত দেন সেই তুলনাতে খুব কমই নেন। বাসবীকে তাই সহ্য করেন ফর ওল্ড টাইমস সেক।

অনেক মহিলারই বয়স যত বাড়ে তাঁরা তত গ্রেসফুল হন কিন্তু বাসবী অন্য মেরুর জীব। রাক্ষসী, রুক্ষ, অভব্য বলে মনে হয় তাঁকে চ্যাটার্জিসাহেবের। স্বাভাবিকতা যে নারীর নেই, যিনি গ্রেসফুলি বুড়ি হতে জানেন না, বয়স তাঁকে ভিখিরি করে দেয়। একথাটা কম নারীই বোঝেন।

মৃগেনটাও একটা ম্যাদামারা। মিথ্যে বলবেন না, হরপ্রসাদের যৌবনে বাসবীর সঙ্গে একটু মাখোমাখো হয়েছিলেন তিনি। অবশ্য বাসবীরই প্রবল আগ্রহে। এইচ. পি-র দিক দিয়ে সেই সম্পর্কটা ছিল কনভিনিয়েন্সেরই। মহিলা নিমফোম্যানিয়াক ছিলেন যৌবনে। তাই কয়েক বার শারীরিক সান্নিধ্যে আসতে হয়েছিল। বিবেকের কাছে তিনি পরিষ্কার। কিন্তু সেই সম্পর্কে কোনো মাধুর্য ছিল না বরং পুরো নারী জাতির ওপরেই এক গাঢ় বিদ্বেষ জন্মে গেছিল চ্যাটার্জিসাহেবের। উনি এমনিতে খুবই সূক্ষ্মরুচির মানুষ। বাসবীর শরীরী প্রেম তাঁর সেই রুচিকে আহত করেছিল। এসব জিনিস বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে বলার নয়, নীরব অনুভূতির। যাঁরা বোঝার, তাঁরা বুঝবেন।

সময়ে বিয়েটা যে কেন করা হল না, এখন ভেবেও তার কোনও ব্যাখ্যা পান না।

মনে আছে, দিল্লি থেকে সান্যালসাহেব একবার এসেছেন ফুল-বেঞ্চে অ্যাপিয়ার করতে। কলকাতা হাইকোর্টের লিফট-এর সামনে দেখা। তখন চ্যাটার্জিসাহেবের বয়স হয়েছে চল্লিশ-বেয়াল্লিশ। সান্যালসাহেব বললেন, আরে হরপ্রসাদ, তোমার সব খবরই পাই। খুবই তো ভালো করছ হে! ভেরি গুড। কনগ্র্যাচুলেশনস। তা এবার একটা বিয়ে-টিয়ে করো।

চ্যাটার্জিসাহেব বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলেন, পায়ে একটু ভালো করে দাঁড়িয়ে নিই স্যার।

সান্যালসাহেব বলেছিলেন, এখনও দাঁড়াওনি। তা ভায়া, তুমি যখন দাঁড়াবে তখন তো তোমার ওটি আর দাঁড়াবে না।

লজ্জায় অধোবদন হয়ে গিয়েছিলেন চ্যাটার্জিসাহেব। অন্য সিনিয়ররা হেসে উঠেছিলেন কাঁচা রসিকতার জন্যে বিখ্যাত সান্যালসাহেবের কথাতে।

কি হল? জবাব দিচ্ছ না কেন এইচ. পি?

খেঁকিয়ে উঠে বললেন মিসেস মিত্তির।

কি বলবে বলো না বাসবী? কি করতে পারি তোমার জন্যে?

কিছুই করতে হবে না, সাড়ে সাতটার সময় কাল রাতে ক্লাবে চলে আসবে। হাউজি আছে।

কোন ক্লাবে?

স্লিক ক্লাবে?

আমি যেতে পারব না। স্লিক ক্লাবে তো আজকাল একদল সিউডো আঁতেলকে জুটিয়েছ তোমরা। যাওয়াই যায় না তাদের ভিড়ে। তা ছাড়া বুড়ো বয়সে 'টু ফ্যাট লেডিস এইট্টি এইট' ওইসব বালখিল্য ক্রিয়াকাণ্ড করে সময় নষ্ট করতে আমি আদৌ রাজি নই। রিডিকিউলাস। আমার সময়ের দাম আছে।

শোনো, তারপর আমরা তাজ বেঙ্গলে যাব। 'সোনার বাংলা'-তে খাব।

ভালো কথা। আমি রাজীব গুজরালকে বলে দেব, তুমি যাকে খুশি সঙ্গে নিয়ে যেয়ো। বিল সই করে দিয়ো। আমার নাম। আমি কোথাওই যাব না।

সই করার কী আছে। মণ্ড সেন কি দেউলে হয়ে গেছে নাকি? না, সে রাজীব গুজরালকে চেনে না। তুমি আসবে না?

খুব রেগে বললেন বাসবী।

না সরি। এনাফ ইজ এনাফ। তুমি খুকি হতে পারো কিন্তু আমার বয়স হয়েছে।

কি করবে? বাড়ি থেকে বেরোবে না তো, শনিবারের সন্ধেবেলায় কি কবরে একা বসে?

মৃগেনদা কি করবে? তাকেই নিয়ে যাও না।

সে কি এখানে আছে না কি? বম্বেতে আছে সাত দিন হল। এসো, এসো, খাওয়ার পরে আমরা বাড়িতে আসব, নয়তো তোমার বাড়ি।

কি করতে? নোপ। সরি।

তারপর বলল, 'তোমার নাতনির সঙ্গে হয়তো দেখা হয়ে যাবে তার বন্ধুদের নিয়ে তাজ বেঙ্গলের "ইনকগনিটোতে" নেচে-টেচে সে-ও খেতে আসবে যখন।

তাকে কি? নাতনিদের জীবন তাদের, আমাদের জীবন আমাদের। আমাদের কি লাইফ এনজয় করার রাইট নেই?

এনজয়মেন্ট নানা রকম হয় বাসবী। তুমি আমাকে বুঝবে না।

তুমি করবেটা কি বলো না?

ভীমসেন যোশীর একটা টেপ পাঠিয়েছে বম্বে থেকে বকুল, জয়ন্ত চ্যাটার্জির কাছে। ভীমসেন যোশীর নাম শুনেছ কি? মাইকেল জ্যাকসন-এর শুনেছ, পিট সিগারের শুনেছ, কিন্তু ভীমসেন যোশীর নাম সম্ভবত শোনোনি। আগামীকাল জয়ন্ত সেটা আমাকে পাঠাবে। কোর্ট থেকে ফিরে রাতের চেম্বার শেষ করে চানটান করে হুইস্কির বোতলটি নিয়ে ইজিচেয়ারে আধো শুয়ে সেটি শুনব। প্রায় পৌনে তিন ঘণ্টার টেপ। ইমন, হোরি বাহার তারপর পিলুতে ঠুংরি, সব শেষে ভজন। 'যো ভজে হরিকো সদা।' সত্যি! হাজার বার শুনেছি, তবু পুরোনো হয় না।

খুব হুইস্কি খাচ্ছ বুঝি তুমি আজকাল?

খুব না হলেও খাই। উকিল-ব্যারিস্টারেরা মাথার কাজ করেন, তাঁরা অনেকেই খান। তোমার বাবা খেতেন, দাদা খায়, মৃগেন তো খায়ই। তবে আমি মৃগেনের চেয়ে কম খাই। তুমি জ্ঞান দিয়ো না তো।

তুমি জাহান্নমে যাও। কার সঙ্গে কথা বলছিলে তা বললে না তো। পৌনে এক ঘণ্টা ধরে লাইন এনগেজড!

সে আছে। আছে। এক হলুদ পরী।

বৃদ্ধ ভাম। শখ কত্ত।

বলেই, বাসবী মিত্তির জ্বলে উঠলেন।

এইচ. পি. বললেন, তুমি যা ভালোবাসো, যেমন মানুষ ভালোবাসো, সমমানসিকতার, তাদের নিয়েই এনজয় করো। তুমি তোমার আনন্দে থাকো, আমাকে আমার মতো থাকতে দাও।

ওসব জ্ঞানের কথা থাক। এখন তুমি কাল আসবে কি না ফাইনালি বলো।

বললামই তো, আসব না।

ঠিক আছে।

মনে হল বাসবী থ্রেট করলেন? কিন্তু হরপ্রসাদের বাসবীর কাছ থেকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কোনোদিনই ছিল না। জীবনের এক সময়ে যদি কোনো মহিলার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক হয়ে থাকে, এমন মহিলারা সেই সম্পর্কে রদ করলে তিনি বাঘিনির মতো হিংস্র হয়ে ওঠেন বোধহয়।

কর্ডলেস-এর সুইচটা টিপে দিয়ে হরপ্রসাদ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেন।

বাইরে বড়োই কোলাহল। ভবিষ্যতে কলকাতায় না কি মানুষ আর যানবাহন আরও বেড়ে যাবে। কাগজে পড়েছিলেন। সব সময়েই এত আওয়াজ, এত গাড়ির হর্ন, এত বিভিন্ন যানবাহনের এঞ্জিনের আওয়াজ একটুও ভালো লাগে না আর। হেঁটে কোথাও যাওয়া তো যায়ই না, গাড়ি করেও কোথাওই যাওয়া যায় না। হাইকোর্টে যেতেই হয় সপ্তাহে পাঁচদিন। সেখানে থেকে ফিরে কোথাওই আর যেতে ইচ্ছে করে না। ইচ্ছে করে, প্রতি উইকএন্ডেই রাজপুরের বাগানবাড়িতে চলে যান, কিন্তু হয় না। কনফারেন্স থাকে, প্লেইন্ট সেটল করার থাকে, পরের সপ্তাহের মামলা দেখে রাখতে হয়। এত কাছে করলেন বাগানবাড়ি তাও যাওয়া হয় না। তিন জন মালি, বাবুর্চি, বেয়ারা, ইলেকট্রিসিটি, ফোন, ফ্যাক্স খরচা যা হওয়ার হয়ই কিন্তু যাওয়াই হয় না। সত্যি কথা বলতে কি আজকাল কোর্টেও আর যেতে ইচ্ছে করে না। সব জায়গার পরিবেশই পালটে গেছে, মানুষজন সব অন্যরকম হয়ে গেছে। না কি, তিনি সত্যিই বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন? প্রায়ই মনে হয়, আর বেশি দিন খাপ খাওয়াতে পারবেন না।

শুধু টাকার জন্যেই যে কাজ করেন তা নয়। যতটুকু সঞ্চয় আছে তাতে তাঁর কাজ ছেড়ে দিলেও বাকি জীবন এইভাবেই কেটে যাবে। টাকার জন্যে নয়, কিন্তু কাজ না করলে করবেনটাই বা কি? সময় কাটবে কি করে। অকুপেশন ছাড়া মানুষে বাঁচে? রিটায়ার্ড মানুষদের মতো সকালে লাঠি বা ছাতা হাতে করে বেশি দিন বাঁচবার জন্যে হেঁটে বেড়ানো, পার্কের বা বেঙ্গল রোয়িং ক্লাবের লনে বসে চা খেতে খেতে রাজা-উজির মারা বা মুখরোচক পরনিন্দা পরচর্চা করে বেড়াতে তাঁর মানসিকতাতে বাধে।

তবে আগে 'হেলথ কনশাস' বুড়োদের যতখানি অনুকম্পার চোখে দেখতেন এখন আর তা পারেন না। শরীর নানারকম বেগড়বাই শুরু করেছে।

অনেকের কাছেই শোনেন, সন্তানদের মধ্যে মেয়েরা না কি ছেলেদের চেয়ে অনেকই বেশি দেখে বাবা-মাকে, বুড়ো বয়সে। তাঁর ছেলেমেয়েই নেই, তার বাছবিচার। কত দিন বাঁচতে হবে তা তো জানা নেই। বার্ধক্যে কার শরণাপন্ন হবেন? জীবনে অনেক যুদ্ধই জিতে এসেছেন, সত্যি কথা বলতে কি, কোনও যুদ্ধেই হারেননি। হারতে ভালোবাসেননি। কিন্তু ভয় হয় বার্ধক্যের কাছে বোধহয় হেরে যাবেন। আর সেই হার হবে বড়ো মর্মন্তুদ।

অনন্তরূপ, তাঁর [illegible] মামাতো ভাই, একটা আমেরিকান অ্যাড কোম্পানিতে বড়ো চাকরি করতেন। অনেক টাকা নিয়ে রিটায়ার করেছেন। এক ছেলে। সে স্টেটসে থাকে, জাপানি মেয়ে বিয়ে করেছে। অনন্তর পারকিনসন্স ডিজিজ হয়েছে। হাত কাঁপে, জামাকাপড় পরতে পারে না,

17270

কথা জড়িয়ে যায়, কি বলে, তা বোঝা যায় না। অনন্তর ছোড়দা বলে, খুব কম অন্যায় তো করেনি অন্ত মানুষের ওপরে। সব শুধে যেতে হবে। এখানেই শুধতে হবে। তাই গুনাগার দিচ্ছে অন্ত।

ল' কলেজের বন্ধু বিমলেন্দুর স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছিলেন অন্য একজনের সঙ্গে। অনেকদিনই হল। তারপরে সেই সুন্দরী মহিলা মারাও গেছেন আজ বছর কুড়ি। ওর দু মেয়ে। কিন্তু বিয়ে হয়েছে। তারা নিজের নিজের সংসার ও চাকরি নিয়ে থাকে। বিমলেন্দু প্রায় অন্ধই হয়ে গেছে। চেন্নাইয়ে নেত্রালয়ে নিয়ে গেছিল মেয়েরাই। হরপ্রসাদ মক্কেলদের বলে তাদের চেন্নাইয়ে থাকার এবং গাড়ির বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুই হয়নি। বিমলেন্দু অন্ধই আছে। দেখতে পায় না। দু মেয়ের একজন প্রায় রোজই এসে ওকে দেখে যায় রিলিজিয়াসলি। কিন্তু বিমলেন্দু বলছিল ফোনে সেদিন, বুঝলি হরু, ওরাও আমাকে নিয়ে হয়রান। দুস, এই জীবন রাখতে ইচ্ছে করে না রে। মনে হয়, আত্মহত্যা করে মরে যাই।

বিমলেন্দুকে কখনও কখনও গাড়ি পাঠিয়ে রাজপুরে নিয়ে আসেন। তবু ওর পক্ষে আসা মুশকিল। সঙ্গে সব সময় একজনকে লাগে। রিফ্লেক্সও ঢিলে হয়ে গেছে।

মনে হওয়া আর করা এক নয়। অমন তো হরপ্রসাদের মনে হয় মাঝেমাঝেই। আত্মহত্যা করা কাপুরুষদের কাজ আদৌ নয়। অত্যন্তই সাহস লাগে আত্মহত্যা করতে। এখন মনে হয় হরপ্রসাদের।

কে জানে! সত্যিই কি পাপপুণ্যের হিসেবনিকেশ এখানেই করে যেতে হবে? পরজন্ম-টরজন্ম সব বোগাস? পুণ্যের প্রাপ্তি, পাপের গুণগার সব এখানেই?

অনেকে বলে ঈশ্বরচিন্তা করতে। কোনও গুরুটুরুর কাছে যেতে। কলেজের বন্ধু যতীন, সাঁইবাবার ভক্ত হয়েছে। সেদিন এসেছিল। সাঁইবাবার একটি ছবি আর কিছুটা ভস্ম দিয়ে গেছে। বলেছে, কাছে রাখিস, কোনও বিপদই তোকে ছুঁতে পারবে না।

অনিমেষ, অনুকূল ঠাকুরের শিষ্য হয়েছে। প্রায়ই দেওঘরে যায়। বলে, মহানন্দে আছি রে হরে। যাবি নাকি তুই? 'জয় ঠাকুর!' কথায় কথায় 'জয় ঠাকুর' বলে।

হরপ্রসাদ হেসেছেন। বলেছেন মন এখনও করেনি, করলে, তোকে অবশ্যই বলব।

বিজিতেন লোকনাথবাবার শিষ্য হয়েছে। চাকলাধাম না কোথায় যেন যায় স্ত্রী-শাশুড়ি ছেলেমেয়ে সকলকে নিয়ে গাড়ি বোঝাই করে সপ্তাহান্তে। বলে জানিস, বড়ো শান্তি পাই রে।

শান্তির নানা রকম আছে। প্রতিটি মানুষের শিক্ষা, মানসিকতা ছেলেবেলা থেকে তাকে একজন আলাদা মানুষ করে গড়ে তোলে। প্রত্যেকেরই আদল আলাদা আলাদা হয়। এক খাপে অন্যে আঁটে না। হয়তো সেই কারণেই তারা মানুষ, জানোয়ার নয়।

কারোকেই ছোটো বলে ভাবেন না হরপ্রসাদ, তবে ছাপ্পান্ন বছর বয়সে পৌঁছে একথাটা বোঝেন যে, তিনি অন্যদের থেকে আলাদা। বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি তাঁর হবে না। অথচ কিসে যে হবে তা তিনি নিজেও জানেন না। 'মুক্তি' বলতে ঠিক কী যে বোঝায় তা নিয়েও বিশেষ চিন্তাভাবনা করেন নি।

মাঝরাতে 'বলো হরি হরি বোল' ধ্বনি দিতে দিতে পথ দিয়ে কোনো মৃতদেহ নিয়ে গেলে হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে বসে ভাবতে বসেন হরপ্রসাদ, কোথায় যাচ্ছে মানুষটা? আধুনিক বিজ্ঞান বলে, কোথাওই যাচ্ছে না। এখানেই সব শেষ। সেই শেষ কবে আসবে তাঁর? মানুষ অনেকই দেখেছে, জেনেছে, কিন্তু কার শেষ কখন যে আসবে সেই জ্ঞানটা তো কারও ভাঁড়ারেই নেই।

একথা ঠিক যে, এইসব ভাবনা হয়তো উনি ব্যাচেলর বলেই, একা বলেই, প্রায়ই আসে মনে। ভয় ভয় লাগে। আর লাগে বলেই, ওই মেয়েটি, দেবী, তার সঙ্গে হঠাৎ আলাপিত হওয়ার পরে তারুণ্যের উষ্ণতা ও দীপ্তির চমক দিয়ে অন্য এক জগতের আভাস দেয়, সে এবং তার লিভ

টুগেদারের দুই সঙ্গীর কাছেই, ওই থ্রিমাস্কেটিয়ার্স-এর কাছেই বোধহয় হরপ্রসাদের পুনর্যৌবনের মুক্তির মন্ত্র আছে। দিন বদলে গেছে, পৃথিবী পালটে গেছে। কতখানি যে পালটে গেছে তা সামান্য দূরে, দমদমের নাগের বাজারের, একটি মড পরিবারকে জেনেই তিনি বুঝতে পারছেন।

অবাক লাগছে হরপ্রসাদের। যে আধুনিক জগৎ সম্বন্ধে তাঁর কোনও ধারণা নেই সেই জগৎ সম্বন্ধে তীব্র এক আকর্ষণ বোধ করতে থাকলেন উনি ফোনটা আজ ছাড়বার পব থেকেই।

২

বাঃ। কোচটা তো একেবারে নতুন।

এইচ. পি. বললেন।

তা তো হবেই স্যার।

দেবী বলল।

কেন? তা হবেই কেন?

এখন রাঁচি তো একটি রাজ্যের রাজধানী। ঝাড়খণ্ডের রাজধানী নয়? তাই রাঁচির ট্রেনকে উপেক্ষা করলে আর চলবে না। আগে আগে সাউথ ইস্টার্ন রেলের যত ওঁচা কোচ সব ঠেলে দিত রাঁচি এক্সপ্রেস আর পুরী প্যাসেঞ্জারে।

এ সি কোচও?

সব সব। ফার্স্ট ক্লাস, এ সি সব কোচই। রেলের অনেক উন্নতি হচ্ছে। হয়তো আরও হবে। আপনি শিয়ালদহ থেকে যে রাজধানী ছাড়ে তাতে কখনও চড়েছেন স্যার। ভাবা যায় না। উনিফর্মড বেয়ারারা হাতে গ্লাভস পরে দারুণ খাবার সার্ভ করছে, পলিথিনের ব্যাগে করে বেডশিট তোয়ালে পিলোকেস দিচ্ছে, মিনারাল ওয়াটারের বোতল।

কোন ক্লাসে? এ সি ফার্স্ট-এ?

না, না এ সি থ্রি টায়ারেই। আমি জীবনে এ.সি. ফার্স্ট ক্লাস-এ চড়েছি না কি? এই তো প্রথম চড়লাম আপনার দৌলতে। তবে মানে হয় না কোনো এত পয়সা নষ্ট করবার।

আমি তো মোটা মানুষ। তাছাড়া, পয়সা তো খরচ করারই জন্যে। পয়সা জমিয়ে রাখলে তা কাগজই হয়ে থাকে। জমানো পয়সা হয়তো কোনো কোনো অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত আত্মবিশ্বাসহীন মানুষের শ্লাঘা বাড়ায় কিন্তু পয়সাকে কে কোন কাজে ব্যয় করে তার ওপরেই পয়সার সার্থক হওয়া না হওয়া নির্ভর করে। তাছাড়া, সারাটা জীবন অনেকই পরিশ্রম করেছি। জীবনে তোমরা যাকে 'সফল হওয়া' বলো, তা হতে অনেকই মূল্য দিয়েছি। জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সব দিনে নিজেকে অনেকই সুখ, অনেকই আনন্দ থেকে বঞ্চিত করেছি তাই আমার মনে হয়, এই সাঁঝবেলাতে পৌঁছে এইরকম কিছু কিছু আরামের যোগ্যতা আমি হয়তো অর্জন করেছি।

অবশ্যই! আমি আমার নিজের কথাই বলছিলাম। কিন্তু মনে করবেন না স্যার।

না, না মনে করব কেন?

তাহলে চড়বেন একবার শিয়ালদহ থেকে ছাড়া রাজধানীতে।

ট্রেনে চড়ি কোথায়? আজকে তোমার পাল্লায় পড়ে ট্রেনে চড়ছি, তাও সম্ভবত বছর পনেরো পরে। নইলে সব জায়গায়ই তো প্লেনেই যাতায়াত করতে হয়। সময় কোথায় সময় নষ্ট করবার।

ক-টা বাজল স্যার?

সাড়ে নটা। কেন? তোমার ঘড়ি নেই?

থাকবে না কেন? আছে। ব্যাটারিটা বদলাতে দিলাম কিংশুককে। তা ভুলেই গেল।

তোমাকে একটা ভালো ঘড়ি দেব।

দেবেন কেন? একটা তো আছেই। অপচয় করবেন না। তাছাড়া আমি যত ভালো আমার ঘড়ি তার চেয়ে বেশি ভালো হলে দৃষ্টিকটু দেখাবে না!

আরেকটা কাটলেট খাও। আমার বাবুর্চি ইদ্রিস আলি রান্নাটা ভালোই করে। ইংরেজি, মোগলাই, চাইনিজ যা বলবে রেঁধে দেবে। তবে বাঙালি রান্না এখনও শিখল না।

কেন?

শেখাবে কে?

তাই? তা আপনি বাঙালি রান্না কি কি খেতে ভালোবাসেন?

সেসব কথা থাক। তুমি খাও তো এখন। পুডিংটা খেয়ো। সুইট-ডিশও খুব ভালো করে ইদ্রিশ।

আপনি তো কিছুই খেলেন না।

খাদ্য আমি রাতে কমই খাই। দুটি হুইস্কি খাই। দেখছ তো খাচ্ছি।

হ্যাঁ। তা তো দেখছিই। কি হুইস্কি খান আপনি?

তুমি কি নাম জানো নাকি?

না, ওরা মাঝেমধ্যে খায় তো।

ওরা কি খায়?

রয়্যাল স্ট্যাগ। শিঙাল হরিণের ছবি দেওয়া বোতলে।

হেসে ফেললেন এইচ. পি.।

বললেন, তাই?

তারপর বললেন, ওটা দেশি। তবে শুনেছি ভালোই।

আপনি দেশি খান না?

উনি হেসে বললেন, এমনিতে আমি খুবই দেশপ্রেমী কিন্তু হুইস্কির বেলাতে নই। হুইস্কি বলতে স্কটল্যান্ডের হুইস্কিই বুঝি। আমার নিজের কিনতেও হয় না। প্রতি সপ্তাহেই কোনো না কোনো মক্কেল বিদেশে যান, নিয়ে আসেন আমার জন্যে। নিজে আর কতটুকু খাই। কখনও পার্টিটার্টি দিলে অন্য কথা।

পেছনে বালিশ নিয়ে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে বসেছিলেন এইচ. পি।

এককালে হ্যান্ডসাম ছিলেন। মানুষে বলত। এখন বয়স এসে অনেক কিছুই একে একে ছিনিয়ে নিয়েছে। পারেনি শুধু মনটাকে। মনের মধ্যে এখনও একটি কুড়ি-একুশ বছরের তরুণ বাস করে। তবে সে বড়ো লাজুক। মুখ লুকিয়েই থাকে। কখনো-সখনো চারদিকে যে কেউ নেই তা দেখে নিয়ে চুপিসাড়ে মুখ বের করে। তবু সে যে আছে, থাকে তাঁর হৃদয়ে, নীরবে এবং গোপনে এই কথাটা জেনেই খুবই আনন্দ হয় এইচ. পি. চ্যাটার্জির। সে বুকের মধ্যে না থাকলে, সত্যিই একেবারেই বুড়ো হয়ে যেতেন।

তুমি যে আমার সঙ্গে ট্রেনের কুপেতে ট্রাভেল করছ, তোমার ভয় করছে না? আমি বুড়ো হলেও তো এমন বুড়ো নই! মেয়েদের ক্ষতি করার ক্ষমতা তো এখনও যায়নি আমার।

খুব জোরে হেসে উঠল দেবী, খাওয়া থামিয়ে। বলল, আপনি যেটাকে আমার ক্ষতি ভাবছেন সেটা তো আমার লাভও হতে পারে। কিন্তু আমি অথবা আপনি তো জন্তুজানোয়ার নই যে সুযোগ পেলেই শারীরিক সম্পর্ক ঘটে যাবে আমাদের মধ্যে। আমরা মানুষ। দুজন মানুষের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক হওয়ার আগে কত সময়ের, বিবেচনার দরকার। আমরা যে দারুণই কমপ্লিকেটেড জীব। মনের মিল হতে হবে, তারপরে সহমর্মিতা, তারও পরে রুচির মিল, তারপরেও সোহাগ, শৃঙ্গার,

আদর। এ সবকিছুর পরেই তো বড়ো আদর। কত মাস বছর কেটে যায় এই সব প্রসেসে। সত্যি! বিধাতা মানুষকে বড়োই গোলমেলে করে গড়েছেন।

বলেই বলল, আপনার হঠাৎ এ কথা মনে হল কেন স্যার?

আমার মনে ঠিক হয়নি। তোমার মনে কিছু হল কী না তারই খোঁজ করছিলাম। তুমি এ ব্যাপারে আশ্বস্ত না হলে রাতেও নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারবে না যে!

ক্যারামেল কাস্টার্ড পুডিংটা খেতে খেতে হাঃ করে হাসল, দেবী।

বলল, আমি তো ধোওয়া-তুলসী পাতা নই। অনাঘ্রাতাও নই। আপনি তো জানেনই যে আমি মিনি-দ্রৌপদী। তবে আমি ধোওয়া-তুলসী পাতা নই বলেই যখনই ইচ্ছে যে কেউ বাজার থেকে কিনে নিয়ে গিয়ে পুজোয় লাগাবে তাও হবার নয়। আসলে, আপনি আমার আই কিউ-এর লেভেল বড়ো নিচু বলে মনে করেছিলেন স্যার ভুল করে। আপনাকে সারাঙ্গাতে নিয়ে যাব বলে ঠিক করার অনেক আগেই আপনাকে আমি বুঝে গেছিলাম। আপনার দ্বারা কোনো কুকর্ম হবে বা না হবে, সে সম্বন্ধে আমার স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে আপনাকে সারাঙ্গাতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলতামই না। এ তো রেলগাড়িরই বদ্ধ কামরা, হোক না সুন্দর বিছানা-পাতা, গদি-আঁটা, হোক না এয়ার কন্ডিশনড। প্রকৃতির মধ্যে যখন থাকব আমি আর আপনি একই ঘরে, সেই সাংঘাতিক অভিঘাতও যখন আপনার সয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস, তখন এই ট্রেনের কুপেতে কোনও অঘটন ঘটবে না। আসলে আপনাকে যে কারণেই হোক আমি এমন এক জায়গাতে বসিয়েছি আমার মনের, এমন এক উঁচু কুলুঙ্গিতে যে, সেখান থেকে মাটিতে নেমে অন্য দশজন সাধারণ পুরুষের মতো পুরুষ আপনি কখনওই হতে পারবেন না।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, দেবীর বয়স কম হলে কি হয়, এ পর্যন্ত যে অনেকেই পুরুষের পুজো পেয়েছে, গ্রহণ করেছে কি করেনি, সেটা অবান্তর। তাই এই সব সামান্য ও তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আপনি মোটেই মাথা ঘামাবেন না। কিংশুক আর অন্তর সঙ্গে তো আমি লিভ টুগেদার করিই। আপনি আমার স্বপ্নের মানুষ। আমি চাই আপনি স্বপ্ন হয়েই থাকুন। আপনার আদর যদি কখনওই খাই তো স্বপ্নেই খাব। আপনি আমার চেয়ে বয়সে অনেকই বড়ো। আপনিও নিশ্চয়ই নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে হেঁটে এসেছেন এতগুলো বছর। আপনারও কি মনে হয় না যে স্বপ্ন, বাস্তবের চেয়ে সব সময়েই বেশি সুন্দর?

মনে হয়। কিন্তু মনে মাঝে মাঝে এ সংশয়ও জাগে যে, শুধু স্বপ্ন নিয়েই কি জীবন কাটানো যায়? বিশেষ করে, জীবন যখন শেষই হয়ে এসেছে।

অবশ্যই যায় স্যার। আমি পারিনি ফিনান্সিয়াল কারণে।

এইচ. পি হুইস্কির গ্লাসটা শেষ করে বললেন তুমি তো ভারি সুন্দর কথা বলো। তুমি লেখালেখি করো না কেন?

কথা বলতে পারলেই কি লেখা যায়? শুধু কথায় ভার থাকে না। শুধু কথা গেঁথে গেঁথে লিখে যুক্তিহীন অর্থহীন টিভি সিরিয়ালের স্ক্রিপ্ট লেখা যেতে পারে, সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। কিংশুকের আসার কথা আছে—কথা আছে আগামী পরশু পাটনা থেকে, সারাঙ্গাতে। সে তো কবি। সে লিখতে পারে। শুনবেন তার কবিতা।

কবিতা লেখাই ওর প্রফেশন নাকি?

ঠিক তা নয়। কবিতা ওর প্রেম। প্রথম প্রেম। আমি ওর দ্বিতীয় প্রেম। মনে হয়। জানি না ঠিক। ও সম্ভবত বিজ্ঞাপনের কপি-টপি লেখে। ফ্রি-লান্সার। ঠিক কী যে করে তা বলতে পারব না।

কিংশুকের পদবী কি?

বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিংশুক বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিজের মনে বললেন এইচ. পি। নামটা তো চেনা মনে হচ্ছে না।

কি করে হবে। ওতা লেখে লিটল ম্যাগ-এই। তাছাড়া কবি তো এখন বাংলা ভাষায় আছে কয়েক হাজার। মানে, যাঁরা নিজেদের কবি বলে ভাবেন। স্বঘোষিত কবি আর কি! দেশে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ হয়েছে অবশ্যই কিন্তু কবিদের জনসংখ্যাতে যে বিস্ফোরণ ঘটেছে গত ত্রিশ বছরে, মানে আমার জন্মের সময় থেকেই, তার কোনও নজির নেই। শুনেছি, স্বয়ং শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও একবার লিখেছিলেন, বড়ো বেশি কবি হয়ে গেছে এখানে।

এইচ. পি বললেন, তাই বুঝি?

তাই তো শুনেছি।

নীল নাইট-লাইটটা কি জ্বালিয়েই শোবে? না কি সব আলো নিভিয়ে দেবে?

আপনার কিসে সুবিধা?

সব আলো না নিভিয়ে আমি শুতে পারি না, তবে তোমার অসুবিধে হলে নাইট-লাইটটা জ্বালিয়েই রেখো।

আমি তো ওপরের বার্থে শোব। যদি রাতে বাথরুমে যেতে হয়, নামতে গিয়ে আপনার ঘাড়ে পড়লেই চিত্তির। যদিও সুন্দর সিঁড়ি লাগানো আছে।

তবে, জ্বেলেই রেখো।

আপনি শুয়ে পড়বেন এখন?

কেন? তুমি কি জেগে থাকতে চাও?

বেশিক্ষণ নয়। একটা রিপোর্ট জমা দিতে হবে দে সাহেবকে। সেটাতে একবার চোখ বুলিয়ে নিতাম। মাথার কাছের ল্যাম্প জ্বালিয়ে পড়ে নেব। আপনার অসুবিধে হবে না।

দে সাহেব কে?

প্রফেসর ইন্দ্রজিৎ দে। তিনি আর তাঁর স্ত্রী সুমিতাদিই তো সোসাইটি ফর রুরাল ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন চালান। রাঁচির বারিয়াতুতে ওঁদের ক্রিয়াকাণ্ড দেখলে আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে। এন জি ও। ওঁদের সঙ্গে আমাদের টাই আপ আছে। সুমিতাদির ইউনিটটির নাম অবশ্য অন্য।

কি তা?

"ভূমিকন্যা"।

বলেই বলল, আমি একবার বাথরুম থেকে ঘুরে আসি। পা-টা ভালো করে না ধুলে আমার ঘুম আসে না।

খুবই ভালো অভ্যেস। শুধু পা-ই কেন, গোড়ালি, হাঁটু, হাঁটুর উল্টোদিক, কনুই, কবজি, ঘাড়, কানের পেছন এসব জায়গাতে জল লাগিয়ে শুলে খুব ভালো ঘুম হয়। তবে চান করতে পারলে সবচেয়ে ভালো। আমি তো সারা বছরই রাতে গরম জলে চান করি।

তাই? তো সারাঙ্গাতে কি হবে? ওখানে তো গিজার-টিজার নেই।

তারপরে বলল, ঠিক আছে। ক্যানেস্তারা করে জল গরম করে দিতে বলব। আর সব কিছুর অভাব অবশ্যই আছে কিন্তু লোকবলের তো অভাব নেই আমাদের। বলেই বলল, তাহলে আমি যাই?

যাও। তুমি এলে আমি একবার যাব।

বাথরুমে যেতে যেতে দেবী বলল, নীল আলোটা নিভিয়েই দেব। আপনার যখন অসুবিধে হয়। রাতে আমি উঠিই না বলতে গেলে। যদির কথা ভেবেই বলেছিলাম। উঠলে, তখন বাতিটা জ্বালিয়ে নেব।

দেবী চলে গেলে এইচ. পি. লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। পা দুটো ভিতরে করে নিলেন যাতে দেবী ফিরে এসে ইচ্ছে করলে বসতে পারে? পায়ের কাছে ভাঁজ করা সাদা চাদর আর নতুন কম্বল। যখন ঠান্ডা লাগবে তখনই গায়ে দেবেন। আজকাল একাধারে স্পন্ডিলাইটিস, অন্যধারে সাইনাসাইটিস-এ ভারি কষ্ট পাচ্ছেন। কাজের জন্যে চেম্বারে এ সি তো চালাতে হয়ই কিন্তু এসবের ভয়ে শোবার ঘরে সারা রাত চালাতে পারেন না। ঘরটা ঠান্ডা হয়ে গেলেই বন্ধ করে দেন। কিন্তু বন্ধ ঘরে অক্সিজেনের অভাবে বুকে কষ্ট হয়। ডাক্তার বলেছেন স্লিপ অ্যাপনিয়ার জন্যে কাত হয়ে শুতে। চিৎ হয়ে না-শুতে। ওজনটা বেড়ে যাওয়াতেই নানারকম অসুবিধেতে পড়েছেন। ওজন কমবার কোনো সম্ভাবনাও তো দেখছেন না। মা বাবা দুজনেই মোটা ছিলেন। গোপেন গাঙ্গুলি রোগা হওয়ার ওষুধ অ্যামেরিকান 'গোলা' খেয়ে অনেক কেজি কমেছে, প্যান্ট ঢিলে হয়ে গেছে। কিন্তু এইচ. পি. অনেক অনুরোধেও খাননি। ভগবান যাকে যেমন গড়ন দিয়েছেন। রোগা-মোটা, বেঁটে- লম্বা, ফরসা-কালো করে গড়েছেন তিনি মানুষকে। খামোখা খোদার ওপর খোদকারি করার দরকার কি?

দেবী বাথরুমে চলে যাবার পরে কূপের মধ্যে তার শরীরের হালকা পারফিউমের গন্ধ পেলেন এইচ. পি. এয়ার কন্ডিশনারের ঝিরঝিরে হাওয়ায়। রাতে ঠান্ডাটা কমাবার ব্যবস্থা করতে হবে। এখুনি কোচ অ্যাটেনডেন্টকে বলে রাখতে হবে। তিনি নিজে ডাবল-কম্বল গায়ে মাথা ঢেকে ঘুম লাগালেই চিত্তির।

এই সুগন্ধে বেশ একটা ঘোর ঘোর লাগছে এইচ. পি-র। পারফিউমের গন্ধ ছাড়াও দেবীর শরীরেরও কি আলাদা কোনও গন্ধ আছে? কোনো যুবতীর এত কাছে তো বহুদিন থাকেননি। মৃগেনের বউকে তিনি রমণ করেছিলেন বার কয়েক অবশ্যই, তার বছর পঁচিশেক আগে কিন্তু তাকে রমণীজ্ঞানে কখনও দেখতে পাননি, দেখেছিলেন এক কামুক ডাইনি হিসেবে।

যদি উনি বিয়ে করতেন যৌবনে, যখন সকলেই করে, তাহলে ফুলশয্যার রাতে কি এমনই গন্ধ-মেদুর অনুভূতি হত? সুগন্ধি অন্ধকার ঘরে একটি যুবতীর সঙ্গে এমন ভাবে রাত কাটাননি কখনও। রীতিমতো উত্তেজনা বোধ করছেন উনি। যদিও দেবী তাঁর সঙ্গে শোবে না, শোবে ওপরেই, তবু এই সান্নিধ্যও তো অভূতপূর্ব। দেবীর চুড়ির রিনঝিন, পায়ের পাঁয়জোর-এর শব্দ নিঝুম রাতে কানে আসবে। ঘুম কি আসবে তাঁর? রবীন্দ্রনাথের লেখাতে পড়েছিলেন, কোন কবিতাতে তা মনে নেই,

'রাতের রেলগাড়ি, দিল পাড়ি,
গাড়ি ভরা ঘুম, কামরা নিঝুম।'

ঘুম কি আজ আসবে এইচ. পি-র?

দেবী ফিরে এলে উনি চটিটা গলিয়ে বাথরুমে গেলেন। ফিরে এসে দেখেন দেবী তাঁর পায়ের কাছে চাদর পেতে তার ওপরে কম্বল বিছিয়ে সুন্দর করে ভাঁজ করে দিয়েছে, ফাইভ-স্টার হোটেলে যেমন ভাবে করে "হাউস-কিপিং"-এর লোকেরা।

দেবী বলল, জল রইল মাথার কাছে। হাত বাড়ালেই পাবেন।

তোমার জলের বোতলটা ওপরে তুলে নিয়েছ তো?

হুঁ।

তারপরে স্বগতোক্তির মতো বললেন, সোহনলালবাবুর গাড়িটা পাঠালে হয় স্টেশনে। রাঁচি স্টেশন থেকে কতক্ষণ লাগবে তোমার সারাঙ্গা পৌঁছোতে?

ভালো ড্রাইভার হলে ঘণ্টা আড়াই।

বলেই প্রশ্ন করল, সোহনলালবাবু কে?

সোহনলাল ব্যাহেল। আচ্ছুরাম কালকাফ, লাক্ষা কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ও। ওঁদের নাম তো শুনেছি। রাঁচি থেকে চক্রধরপুরের যাওয়ার রাস্তায় খুঁটি পেরিয়ে মুরহুতে তো ওঁদের মস্ত কারখানা আছে না লাক্ষা? ওই জায়গাটার নাম হচ্ছে তো অচ্ছুরামপুরী।

তুমি জানলে কি করে?

আমাদেরই একটি ইউনিট তো ওখানে আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করছে, তাই জানি। যদিও আমি যাইনি সেখানে কখনওই। কিন্তু আমার বন্ধু সুদীপ এখন খুঁটিতেই আছে। আপনি কি গেছেন স্যার? ওদের তো গেস্টহাউসও আছে শুনেছি ভালো।

এইচ. পি. মাথা নাড়লেন। বললেন, নাঃ যাইনি। অচ্ছুরাম, সোহনলালবাবুর বাবার নাম। জার্মান কলাবরেশনে কোম্পানিটি ফর্ম করেছিলেন উনি। উনি অনেকবারই বলেছেন যদিও। সেখানে ইংলিশ জার্সি গোরু আছে। তার দুধ-ঘি-দই খাওয়াবেন বলেছিলেন। নিরামিষ, কিন্তু খুব ভালো খাওয়া।

গেলেন না কেন? যদি কখনওই যান তবে ওই অঞ্চলের মুণ্ডাদের নিয়ে লেখা 'সাসানডিরি' নামের একটা উপন্যাস অবশ্যই পড়ে নেবেন। এ অঞ্চলের বিপজ্জনক ডি-ফরেস্টেশন এবং মুণ্ডারী সংস্কৃতির বিনাশের কথা তাতে আছে।

তারপরে বলল, গেলেই তো পারেন একবার।

বুঝলে দেবী। ওপরওয়ালার মতো জবরদস্ত অ্যাকাউন্ট্যান্ট দুটি দেখলাম না। এক হাতে তিনি দেন আর অন্য হাতে নিয়ে নেন। একটা ডেবিট হলে সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্রেডিটও হয়। ওঁরই অঙ্গুলি হেলনে। ভারতবর্ষে এমন কম জায়গাই আছে যেখানে ব্যারিস্টার এইচ. পি. চ্যাটার্জি যেতে চাইলে স্টেশনে বা এয়ারপোর্টে এয়ারকন্ডিশনড গাড়ি থাকবে না, থাকা-খাওয়া-ঘোরার দুর্দান্ত বন্দোবস্ত থাকবে না, কিন্তু সময় কোথায়? সময়ই যে জীবনে সবচেয়ে দামি সে কথা এই পরিণত বয়সে এসে যতটা বুঝি অল্প বয়সে ততটা বুঝিনি।

তারপর বললেন, তুমি যেতে চাও তো বলো আমাকে। তোমরা তিন জনেই যেয়ো না! এই পুজোতে যাবে? সব বন্দোবস্ত করে দেব। স্টেশন থেকেই ওদের কেউ এসে তোমাদের নিয়ে যাবে। ভি আই পি ট্রিটমেন্ট দেবে।

দেবী খুশি হয়ে বলল, বলব। আসলে ওই অঞ্চলই তো বিরিসামুণ্ডার উলগুলান-এর জায়গা। অনেক কিছু দেখার আছে ওদিকে। লুথেরান মিশন আছে। জার্মান মিশন। ফাদার হফম্যানের জায়গা। কত পড়েছি ফাদার হফম্যান সম্বন্ধে।

বাবাঃ। তুমি কত কি জানো। ছোটো মেয়ে হলে কি হয়! তোমাদের জ্ঞানগম্যিই আলাদা। একবার যাও। তোমাদের তিন জনকে এই Treat-টা দিতে পারলে আমার খুব ভালো লাগবে।

আমাদের খুব ভালো লাগত এক সঙ্গে যেতে পারলে কিন্তু তিন জনের এক সঙ্গে হওয়াটাই যে প্রচণ্ড অসুবিধের। আমাদের তিন জনেরই কাজের রকম এমনই যে, কী বলব! অথচ কাজ তো না করলেই নয়। তবে শুধু যে টাকার জন্যেই কাজ করি এমনও নয়। নেশাও বলতে পারেন। সত্যি! বাবা বা মামা যদি বেশ কয়েক লাখ ব্যাংকে রেখে যেতেন তবে এই ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে এমন হন্যে হয়ে ঘুরতে হত না।

শুধুই কি পেটের অন্নের জন্যেই খাটো? মনে তো হয় না। তুমি, যেই তোমার স্বামী হোক না কেন, তার রোজগারেই অবহেলায় তার বাড়িতেই থাকতে পারতে। হাউস-ওয়াইফ হয়েই না হয় থাকতে। থাকো না যে তার কারণ অন্য। আমার মনে হয়, এত হাজার বছরের পরে তোমরা যে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছ, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, চিন্তা-ভাবনা, সঙ্গী নির্বাচন, ব্যক্তিগত সেক্স-লাইফের স্বাধীনতা তা তোমরা পুরোপুরি উপভোগ করতে চাও। সে জন্যে তোমরা অনেক কিছুই

ছাড়তে রাজি আছ এবং ছাড়ছোও। তোমাদের এইসব কষ্ট স্বীকার যে আনন্দরই এক অন্য রূপ, অন্য অভিব্যক্তি, তা এই মুহূর্তে তোমরা হয়তো বুঝতে পারছ না কিন্তু তোমাদের উচ্ছ্বাস, এই স্বাধীনতার ঢেউয়ে চূর্ণিত জীবনের ফেনা যখন থিতিয়ে আসবে তখন অবশ্যই বুঝতে পারবে। আমি তো এইসব নিয়েই বলেছিলাম তোমাদের সেদিনের সেমিনারে।

সত্যি! যদিও আপনি সোশিঅলজির পণ্ডিত নন, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানও না, আমাদের, মানে, অল্পবয়সি মেয়েদের স্বাধীনতার স্বরূপের ব্যাখ্যা সেদিন আপনি যেমন প্রাঞ্জল করে আপনার বক্তৃতাতে দিলেন তাতে আমরা তো বটেই আমি যে কলেজে পড়তাম এবং অন্যান্য নানা কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারাও মুগ্ধ। দূর থেকে দেখে এমন অ্যানালিসিস যে করা আদৌ যায় তা ভেবেই ওঁরা চমৎকৃত। তাও যদি আপনি সাহিত্যিক-টাহিত্যিকও হতেন। জীবনের নানা দিককে যাঁরা দেখেছেন, ভেবেছেন, ছিঁড়েছেন, লিখেছেন তাহলেও না হয় বোঝা যেত।

আমরা যাঁরা মনোযোগ দিয়ে ওকালতি করি তাঁরা কিন্তু সাহিত্যিকদের চেয়ে কিছু কম জানি না মানুষের জীবনকে। আইন ব্যাপারটাই দাঁড়িয়ে থাকে ফ্যাক্টের ওপরে। ফ্যাক্ট যদি ডিসটিংগুইশ করতে পারে তাহলে আইনের প্রয়োগ ভিন্ন রকম হবে। আর সে কারণেই প্রত্যেক কেসেরই এই ফ্যাক্টকে আলাদা করে জানতে গিয়েই অনেক গভীরে যেতে হয়, অনেকই বিভিন্ন জগতে ঢুকতে হয় আমাদের। আর এই করে করেই মানুষকেও জানতে পারা যায়। আমরা কলম ধরলে অনেক সাহিত্যিকের চেয়েই হয়তো ভালো লিখতে পারতাম।

এই সব Facts কি সব কেসেই আলাদা আলাদা হয়?

নিশ্চয়ই। তবে Facts ভুল ইংরেজি অথচ অনেক উকিল ও জজসাহেব পর্যন্ত এই শব্দটি ব্যবহার করেন।

সে কি! Facts ভুল শব্দ?

ভুলই তো। Fact হচ্ছে Plural, Singular হচ্ছে Factum। যেমন Datum আর Data।

সত্যি? এটা জানতাম না তো। সকলেই ব্যবহার করেন, আমার চেয়ে অনেক জ্ঞানী-গুণীরাও তাই আমিও ব্যবহার করি।

বাজল কটা?

সাড়ে দশটা?

এবার শোবে তো?

ওই। শুয়েই পড়ব। দাঁড়িয়ে তো গল্পও হবে না, পড়াও হবে না।

তার আগে ওই কলিংবেল-এর সুইচটা একবার টেপ তো লক্ষ্মীটি।

দেবী বেল-এর সুইচ টিপলে একটু পরই অ্যাটেনড্যান্ট এলেন। বললেন, ইয়েস স্যার। কি লাগবে?

লাগবে মানে, ঠান্ডাটা বেশ বেশি আছে। একটু পরেই কম করে দিতে হবে।

কোনও চিন্তা নেই স্যার। একটু পরেই অটোম্যাটিক থার্মোস্ট্যাটে দিয়ে দেব। প্রথমে সকলেরই গরম বেশি লাগে তো। তার ওপর প্রতি কম্পার্টমেন্টে যে সব ব্রিফকেস আছে তার মধ্যে বাণ্ডিল বাণ্ডিল হাজার আর পাঁচশ'র নোট। তাদের গরমটার কথাও তো ভাবতে হবে স্যার।

আমাদের ব্রিফ কেস নেই।

নেই যে তা দেখেছি বলেই তো সাহস করে বললাম কথাটা। আচ্ছা স্যার। গুড নাইট। আপনাকে একটা এক্সট্রা পিলো কি দেব? পাশ বালিশ করার জন্যে?

দিলে তো ভালোই হয়।

এখুনি দিচ্ছি।

আপনি বুঝি পাশ বালিশ ব্যবহার করেন? দেবী বলল।

করি। আমার তো বউ নেই যে তার কোমরে পা তুলে দেব। তাছাড়া পাশ পালিশ কেন, আমি Neck-Pillowও ব্যবহার করি।

সেটা কি জিনিস?

সাহেবরা বলছে এখন Neck-Pillow কিন্তু আমাদের দেশে এর ব্যবহার বহুদিনের। লখনউয়ের নবাবেরা একে বলতেন 'গল-তাকিয়া'। মানে, গালের বালিশ। তুমি যখন পাশ ফিরে শোও তখন গালের নিচে হাল্কা ও ছোটো বালিশ দিলে আরাম হয়। Neck-Pillow-টা ঠিক গাল-তাকিয়া নয় যদিও। মনে হয়, যাদের স্পন্ডিলোসিস আছে তাঁরা পুরো বালিশ ব্যবহার না করে এই ঘাড়ের নীচের ছোটো কোলবালিশের মতো গোল বালিস ব্যবহার করলে আরাম পান। আজকাল ক্যামাক স্ট্রিটের West Side-এ কিনতে পাওয়া যাচ্ছে।

দেবী বলল বাবাঃ। কত কি শিখছি আপনার কাছে স্যার।

আমিও শিখছি তোমার কাছে।

দেবী বলল, আমি তাহলে স্বর্গারোহণ করছি। কিন্তু তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন?

কি বলো?

এতো নাম থাকতে আপনার নাম হরপ্রসাদ কে দিলেন?

হেসে ফেললেন এইচ. পি। বললেন, আমার এক বালবিধবা পিসি ছিলেন আমাদের বাড়ির সর্বময় কর্ত্রী। খুবই অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন বলেই বাবা-কাকারা ওঁর অনেক অপ্রাপ্তির শূন্যতা তাঁকে ভাঁড়ারে চাবি আর এই কর্তৃত্ব দিয়ে পূর্ণ করে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর ওপরে কথা বলেন এমন সাধ্য মা-কাকিমাদের কারোই ছিল না। তিনিই আমাদের সকলের নাম দিয়েছিলেন। তিন ভাইয়ের তিন ছেলের নাম হরপ্রসাদ, রুদ্রপ্রসাদ এবং কালীপ্রসাদ। আর মেয়েদের নাম মানদাসুন্দরী, জ্ঞানদাসুন্দরী, মৃণালিনী, কাদম্বরী ইত্যাদি।

এই বিচ্ছিরি নাম নিয়ে আপনার কোনো অভিযোগ ছিল না?

ছিল বইকি। কিন্তু নিজের নাম তো কেউই নিজে রাখে না। তা, একদিন আমার বাবা আমাকে একটি গল্প বলেছিলেন। তারপর থেকে আর কোনও অনুযোগ অভিযোগ ছিল না। তখন আমি ক্লাস থ্রি-তে পড়ি।

কি গল্প? বলে ওপরে ওঠার সিঁড়িতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল দেবী।

বাবা বললেন, একজন মানুষের নাম ছিল ঠনাঠন দাস।

সে আবার কী নাম!

বিহারী নাম। আমার ঠাকুরদা অভ্রখনিতে কাজ করতেন বিহারের কোডারমাতে। সাহেবদের কোম্পানি ছিল, ক্রিশ্চান মাইকো কোম্পানি, তাতে। তাই গল্পটির অনুষঙ্গ বিহারী। বাবার ছেলেবেলা ওই অঞ্চলেই কেটেছিল বলে।

গল্পটা বলুন।

হ্যাঁ। তা ঠনাঠন দাসের মনে বড়োই দুঃখ। এমন নাম নিয়ে কেউ বাঁচে? সকলেই তাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করে, নামেরই জন্যে। তা একদিন এই দুঃখর নিরসন করবে বলে সে নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করবে মনস্থ করে নদীর দিকে চলল।

তারপর?

কিছুদূর যাওয়ার পরেই দেখল পথের পাশে এক বাড়ির সামনে জটলা। কি ব্যাপার? না একজন মরে গেছেন। তাঁর চাদরে ঢাকা মৃতদেহ শোয়ানো আছে চৌপায়ার ওপরে। ঠনাঠন দাস জিজ্ঞেস করল, মৃতের নাম কি ছিল? পরিজনেরা বললেন, অমরনাথ।

তারপর?

ভারি অবাক হল ঠনাঠন দাস। যার নাম অমরনাথ সেই না কি মরে গেল যৌবনাবস্থাতেই।

তারপর?

তারপর ঠনাঠন দাস জঙ্গলে ঢুকে নদীর পথ ধরল। আরও কিছু দূর গিয়ে দেখে একটা ছোটো হাট মতো। এক জন বুড়ি শতছিন্ন শাড়ি পরে পাহাড়ি ঝোরা থেকে ধরা মাছ তিন ভাগ করে নিয়ে বসে আছে। ঠনাঠন জিজ্ঞেস করল তোমার নাম কি বুড়ি মা?

বুড়ি বলল, লছমী।

তারপর?

ঠনাঠন তো আরও ফাঁপরে পড়ল। যার নাম লক্ষ্মী তারই কিনা এই দশা।

তারপর?

ভাবতে ভাবতে ঠনাঠন দাস আরও এগিয়ে যেতে দেখে এক বুড়ো খালি গায়ে একটা ছেঁড়া খেটো ধুতি পরে জঙ্গলের মধ্যে কাস্তে দিয়ে ঘাস কাটছে। সেই ঘাস হয়তো বাড়িতে বয়ে নিয়ে যাবে গোরু বা ছাগলকে খাওয়ানোর জন্যে অথবা বিক্রি করে দেবে অন্যকে।

তারপর?

ঠনাঠন দাস জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কী বুড়ো বাবা?

বুড়ো বলল, ধনপত। শুনে তো ঠনাঠনের অজ্ঞান হওয়ার জোগাড়। যে সাক্ষাৎ ধনপত অর্থাৎ ধনপতি কুবের, তারই না কি এই দশা।

তারপর কি হল? হাসতে হাসতে বলল দেবী।

তারপর ঠনাঠন দাস অ্যাবাউট টার্ন করে বাড়ির দিকে ফিরে যেতে যেতে বলল,

'অমরনাথ যো সো মর গ্যয়ে হ্যায়,
ঔর ধনপত কাটতি হ্যায় ঘাস,
লছমি যো, সো মছলি বিকতি হ্যায়
ভালাই ঠনাঠন দাস।"

দেবী হাসতে হাসতে ওপরে উঠে গেল। উঠে বলল, আমারই জিজ্ঞেস করা অন্যায় হয়েছে। শেকসপিয়রই তো সেই কবে বলে গেছেন What's in a name?

দেবী কালোর ওপরে সাদা পলকা ডট-এর একটি সালোয়ার কামিজ পরেছিল সিল্কের। সে ওপরে উঠে যাওয়ার আগে তার সুন্দর পায়ের পাতা, দু-পায়ের মধ্যমার রুপোর চুটকি, সুডৌল সুগৌর গোড়ালিতে পাতলা পাঁয়জোর সুদ্ধু পায়ের ছবিটি এইচ. পি-র চোখে আঁকা হয়ে গেল। আলোগুলি নিভিয়ে দিল দেবী।

অন্ধকার কুপেতে চোখ খুলে শুয়ে উনি ভাবছিলেন, ওঁর মধ্যে যে এতখানি রোমান্টিকতা ছিলই শুধু নয়, আজও বেঁচে আছে সে সম্বন্ধে তাঁর নিজেরই কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। নিজেকে পুরোপুরি জানেন, ভাবতেন উনি। এখন জানছেন যে, আদৌ জানতেন না নিজেকে। সময়ে বিয়ে করলে তাঁর দেবীর বয়সি কন্যা থাকতে পারত। তাঁর কন্যার প্রতি তাঁর যে মনোভাব, যে অপত্য, তার রকমটা কেমন হতো তা জানার উপায় তাঁর আর নেই কিন্তু দেবীর প্রতি তাঁর যে মনোভাব তার মধ্যেও অপত্য মিশে আছে অনেকখানি এবং সেই অপত্যর সঙ্গে আরও অনেক কিছু মিশে আছে। কিন্তু সেই সব বোধের নাম তিনি নিজেও জানেন না। আশ্চর্য! সারা জীবনেও একজন মানুষ তার সব বুদ্ধি বিদ্যা ও অনুভূতি দিয়েও নিজের কতটুকুকেই বা ধরতে পারে, জানতে পারে। অথচ সে সর্বজ্ঞ মনে করে নিজেকে। রবীন্দ্রনাথের গান মনে পড়ে গেল আবার এইচ. পি-র। "আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না, ফুরাবে না/সেই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।"

৩

টাটিসিলোয়াই।

টাটিসিলোয়াই স্টেশনে ট্রেনটা দাঁড়িয়েছিল। কোচ অ্যাটেন্ড্যান্ট দরজাতে টক টক করে বলে গেলেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই রাঁচি পৌঁছোবে ট্রেন। উঠে বসলেন এইচ. পি। চেঞ্জ করার কিছু নেই। যে পায়জামা পাঞ্জাবি পরে ট্রেনে উঠেছিলেন তা পরেই নামবেন। শুধু বাথরুম স্লিপারটা ব্যাগে ঢুকিয়ে কাবলিটা পরে নিতে হবে। কুপের মধ্যেই ওয়াশ বেসিন ছিল। লিকুইড সোপ, তোয়ালে, সব। মুখ চোখ ধুয়ে নিলেন।

দেবী উপর থেকেই বলল গুড মর্নিং স্যার।

ভেরি গুড মর্নিং ইনডিড। রাতে ভালো ঘুম হয়েছিল?

ঘুমই হয়নি।

কেন?

ট্রেনে কি ঘুম হয় না কি কারও? তাছাড়া সারারাত স্বপ্ন দেখলাম।

সত্যি? কাকে দেখলে স্বপ্নে?

কতজনকে। তার মধ্যে আপনিও ছিলেন।

তাই? বাঃ। শুনেও ভালো লাগছে। বাস্তবে না থাকলেও তোমার মতো সুন্দরী কৃতবিদ্য যুবতীর স্বপ্নে যে আছি এইটাই বা কম কি?

আর আপনার ঘুম হয়েছিল?

আমি তো একটা অ্যালজোলাম খেয়েছিলাম। রোজ রাতেই খাই।

কত মিলিগ্রাম?

ওয়ান।

ঘুম হয়েছিল তবে?

হ্যাঁ।

আর স্বপ্ন দেখেননি?

আমি আমার জীবনের এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি দেবী যেখানে সব স্বপ্ন শেষ হয়ে গেছে। স্বপ্ন যদি কখনও দেখি-ও তাও শুধু অতীতই দেখি। আমার অতীতই সব। ভবিষ্যৎ তো নেই-ই, বর্তমানও ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তাছাড়া ঘুমের ওষুধ নিয়মিত খেলে স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।

বানিয়ে বানিয়ে কথা বলেন আপনি। আপনিও স্বপ্ন দেখেছিলেন, আমি জানি।

ওপর থেকে নামতে নামতে দেবী বলল।

আমি বাথরুম থেকে আসছি। তুমি মুখ এখানেই ধুয়ে নাও, দাঁতও মাজতে চাও তো তাও মাজতে পারো, তোমার তোয়ালে বাঁদিকে আছে। আমি আসছি।

রাতের দেবীর মুখকে এক রকম দেখিয়েছিল। আজ জানালা দুটোর পর্দা সরিয়ে দেওয়ায় সকালের আলোতে তাকে অন্য রকম দেখাল। চুল এলোমেলো, মুখটা সামান্য ফোলা, এ সি-র ঠান্ডাতে বোধহয়।

বাথরুম থেকে ফিরে এসে দেখলেন চুল আঁচড়ে, হালকা করে লিপস্টিক দিয়ে ফিটফাট হয়ে গেছে দেবী।

নিজের থেকেই বলল, লিপস্টিক দেওয়া আমি পছন্দ করি না কিন্তু এত ঠোঁট ফাটে যে বলার নয়।

বেশ করো। দেখতেও তো ভালোই লাগে। তুমি কোন কোন শেডের লিপস্টিক ব্যবহার করো তা আমাকে লিখে দিয়ো। আমার মক্কেলদের বলে দেব অনেক এনে দেবে তোমাকে। এক বছরের স্টক।

আপনি স্যার ভীষণই বোরিং।

কেন?

আপনার কোনো অভাবই নেই। অভাববোধ কিন্তু থাকাটা জরুরি।

তাই?

হ্যাঁ আমার মনে হয়। অভাব না থাকলেও অভাববোধ থাকাটা দরকার।

চাদর ও কম্বলটা ফটাফট পাট করে ফেলে বালিশটার সঙ্গে এক কোনায় করে এক পাশে বসে পড়ল দেবী। এইচ. পি. অবাক হয়ে দেখছিলেন। ভাবছিলেন, মেয়েরা কিছু কিছু কাজ এমন নিপুণভাবে অথচ অবহেলায় করে যে ছেলেরা হয়তো শত চেষ্টাতেও করতে পারবে না। রাতের বেলা তাঁর বিছানার ওপরে চাদর ও কম্বল বিছানোর কথাও মনে পড়ে গেল। এই প্রজন্মের পুরুষেরা কি বলবে তা জানেন না এইচ. পি. কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন যে মেয়েরা পুরুষের জীবনের কত শূন্যতাই কি আশ্চর্যভাবে পূরণ করে। একথা ভাবলেও আশ্চর্য হন। অথচ তিনি এত বড়ো ইডিয়ট যে সারা জীবন এক জেদের বশে পেশাতে এক নম্বর হওয়ার জন্যে, পুরুষের জগতে পূর্ণতা আনার সাধনাতে, তাঁর অন্য অনেক জগৎই শূন্যই রেখে দিলেন। আজ আর পূর্ণ করার সময় এবং উপায়ও নেই।

ট্রেনটা ছেড়ে দিল। এ সি ফার্স্ট ক্লাসের কামরা থেকে বাইরের স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের বা প্ল্যাফর্মের বাইরেরও কোনো আওয়াজই শোনা যায় না। বাইরেটাতে নড়াচড়া দেখেই বুঝতে হয় ট্রেন ছাড়ল। হাওড়া-হাটিয়া এক্সপ্রেস টাটিসিলোয়াইতে থামে না, সিগন্যাল না পেয়ে থেমেছিল। কে জানে!

এইচ. পি. একটা বড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ওঁর ভিতরটাও ওই এ সি কামরারই মতো হয়ে গেছে। বাইরের কোনো তাপ বা শীত কোনো গান বা কথা বা নিমন্ত্রণের প্রবেশাধিকার নেই আর ওঁর মনে। নিজের ওপরে হঠাৎই বড়ো রাগ হল ওঁর। কি করতে এই প্রায় অচেনা ছুঁড়ির সঙ্গে তিনি তার কথাতে মজে সারাঙ্গা না ফারাঙ্গা দেখতে এলেন? দেবীর মতলব যদি এই হয় যে, ওদের অর্গানাইজেশনে কিছু ডোনেশন পাওয়া ওঁর কাছ থেকে, তবে ব্যাংক চেক লিখে দিচ্ছেন এখুনি উনি। সোহনলালবাবুর সঙ্গে ওঁর ওখানে একটা দিন কাটিয়ে আগামীকালই প্লেনে বা ট্রেনে ফিরে যাবেন।

রাঁচি স্টেশনে নেমেই মোবাইল ফোনে ধরলেন কার্তিককে। কার্তিক রায় তাঁর ক্লার্ক-কাম-সেক্রেটারি-কাম ম্যানেজার সব। মহিলাহীন সংসারে সেই ম্যানেজার। কি বাজার হবে থেকে কোন গাড়ির ড্রাইভারের কি ডিউটি প্রত্যেক দিন, কোন কাজের লোক কবে ছুটি নেবে বা দেশে যাবে সেসব কার্তিকই ঠিক করে, দেখাশোনা করে। তার নীচে ক্যাশিয়ার আছে একজন। সেই রাতে, চেম্বারে মক্কেলদের কাছ থেক চেক ও ক্যাশ নেয়, হিসেব রাখে, খরচও করে। আরও অনেকে আছেন তবে কার্তিকই ইনচার্জ। অত সকালে কার্তিক তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। তার স্ত্রী ধরলেন ফোন। বললেন, অনেক রাত করে ফিরেছে স্যার। আপনি তো নেই।

এইচ. পি. বললেন, ও বড়ো বেশি ড্রিংক করছে আজকাল। ওকে বলবে যে, অমন করলে চাকরিটা যাবে। পরিমিতিজ্ঞান যার নেই আমার কাছে তার জায়গা নেই। আর শোনো মলিনা, ও উঠলে বোলো যে আমি নেই বলে যেন চেম্বার সে কামাই না করে। আমি হয়তো কালই ফিরে যেতে পারি। রাতে ফোন করে জানাব ওর মোবাইলে। ঠিক আছে?

ঠিক আছে স্যার। আমি শুনেছিলাম সাত দিনের জন্যে গেছেন। যা পরিশ্রম করেন স্যার, একটু ছুটি নেওয়া তো ভালোই।

কার্তিকের স্ত্রী মলিনা বললেন।

একথার উত্তর না দিয়ে এইচ. পি. বললেন, ছাড়ছি।

কার্তিককে, ক্যাশিয়ারকে এমনকী তাঁর খাস ড্রাইভার রামদীন সিংকেও একটা করে মোবাইল ফোন দিতে হয়েছে। রামদীনের দরকার ক্যালকাটা ক্লাব বা টলি ক্লাবের পার্কিং লট থেকে গাড়ি নিয়ে আসার জন্যে বলতে। আজকাল তো কোথাওই সোফার-ড্রিভন গাড়ি রাখতে দেয় না। ক্লাব থেকে বেরোবার পাঁচ মিনিট আগে মোবাইলে বলে দিলে গাড়ি নিয়ে গেটে এলে সুবিধা হয়।

দেবী এইচ. পি.-র মোবাইলের কথোপকথনটা শুনতে পেয়েছিল। ফোনটা সুইচ অফ করে দেওয়ার পর দেবী এইচ. পি-র মুখে তাকাল। এইচ. পি. ও তার মুখে তাকালেন। দেবীর মুখটা কালো হয়ে গেছিল। মুখ নীচু করে বলল, আপনি ফিরে যাবেন? আমার কি অপরাধ হয়েছে কোনো?

দেবীর কালো হয়ে যাওয়া মুখে চেয়ে তাঁর বুকে হঠাৎ করে কি যেন বিঁধল। হার্ট অ্যাটাক হলে কি অমন ছুরির মতো বেঁধে বুকে? কিন্তু উত্তর দেবার সময় পেলেন না, সোহনলালবাবুর বড়ো ছেলে কুলদীপ ব্যাহেল, যার ডাকনাম কুকু, এসে তাঁকে প্রণাম করল।

এইচ. পি. হেসে তাকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, হাউ আর উ্য?

ফাইন আংকল।

পিতাজি ক্যা ঘরমে?

উনোনে তো দেল্লি গ্যয়া কালহি এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিল মে কুছ জরুরি কাম পড় গ্যয়া। আপকি মোবাইল নাম্বার মুঝে দিজিয়ে উনসে বাত করা দেগা।

গাড়ি তো লায়া?

জি আংকল। মগর হামলোগোঁ কো তো মার্সিডিজ নেহি না হ্যায়। ওপেল অ্যাস্ট্রা লেকর আয়া। তকলিফ হোগা আপকি।

মজাক মত ওড়াও বেটা।

বলেই বললেন, কাহে? পিলা রঙকি এক মার্সিডিজ তো থি। বাব্বিকে শাদিমে ওহি গাড়িমে ম্যায় বরাতভি গ্যয়েথে।

হাঁ হাঁ থি। মগর পেট্রল কা থি। সফেদ হাতি বন গ্যায়ে থে। পিতাজি হ্যাজ গিফটেড দ্যাট কার টু দ্যা রাজা অফ গুণ্ডু, হিজ ফ্রেন্ড। গুণ্ডু সে কাফি স্টিকল্যাকভি আতা হ্যায় ফাক্টরিমে।

এইচ. পি. দেবীর দিকে ফিরে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনোনে হ্যায় দেবীজি, দেবী ভটচারিয়া...। সোশ্যাল ওয়ার্কার হ্যায়। বহুতই তেজ আপনি কামমে।

বলেই বললেন, সারাঙ্গা কাঁহা হ্যায়? জানতে হ্যায় তুম কুকু?

নেহি তো আংকল। কিতনা সারি জাগে হ্যায় হিঁয়া ঝাড়খণ্ডমে সবহি ম্যায় জানতা থোড়ি। রাঁচি ঔর মুরহু এহি তো হ্যায় হামারা বিট। কভি কভি কলকাত্তা ভি চলে যাতেঁ হেঁ। ব্যস।

চলো, কাঁহা হ্যায় তুমহারা গাড়ি।

বলে, দেবীকে বললেন, এসো দেবী।

আপলোগোঁ কি সামান?

এই কুলি।

বলে ডাকলেন এইচ. পি.। বললেন, একহি কুলি লেগা দোনোকো সামান। দোনোকা লাগেজ। গাড়ির কাছে পৌঁছে এইচ. পি. বললেন, তুম লওটে গা কৈসে? দুসরা গাড়ি লায়া?

কুকুবাবু বললেন, আপনাকে ছাড়ছি থোড়ি। বাড়িতে চলুন। রেশমি আর মা আপনাদের জন্যে নাস্তা বানিয়ে অপেক্ষা করছেন। মুখ-হাত ধুয়ে নাস্তা করে তারপর যাওয়া। ওই ওপেল গাড়ি আর সানেকা মুণ্ডা ড্রাইভার আপনারই হেফাজতে থাকবে আপনি যতদিন থাকবেন। সাত দিন থাকবেন তো?

কথা তো সে রকমই ছিল। তবে আগেও ফিরে যেতে পারি। কতগুলো ঝামেলার মামলা আছে, অনেকগুলো প্লেইন্ট সেটল করতে হবে। জুনিয়রেরা কান্নাকাটি করবে।

আসাটা আপনার হাতে ফেরাটা আমাদের হাতে। কি বলেন দেবী জি? কুকু বললেন।

জরুর।

দেবী বলল।

তারপর বলল, স্যার আমরা কিন্তু সোজা বেরিয়ে গেলেই ভালো করতাম। পথে কুরুতে ব্রেকফাস্ট করে নিতাম, তাহলে সারাঙ্গাতে পৌঁছোনো যেত সময় মতো। আপনার মতো বড়ো মানুষকে নিয়ে তো যাইনি কখনও আগে। আপনার যাতে অসুবিধে না হয় তার সব বন্দোবস্ত করতে হবে তো। তারপরে দুপুরে দেসাহেব আর সুমিতা বউদি আসবেন। আমাদের সঙ্গে এক সঙ্গে খাবেন বলেছেন। আমাকে আপনার ভালো লাগছে না যে তা বুঝতে পেরেছি কিন্তু ওঁদের অবশ্যই ভালো লাগবে।

এইচ. পি. বললেন, কুকু যদি তোমাদের বাড়ি না যাই তবে ভাবীজি আর রেশমি কি খুবই রাগ করবেন?

গেলে যদি আপনার অসুবিধে হয়, তাহলে আর রাগ করবেন কি করে।

তাহলে আমাকে ছেড়েই দাও। ফেরার সময়ে, কথা দিচ্ছি, ট্রেনে ওঠার আগে তোমাদের বাড়িতে খেয়ে তারপরেই ট্রেনে উঠব।

প্রমিস আংকল?

প্রমিস। চলো তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাই।

আমি অন্য গাড়ি এনেছি পাছে আপনি না মানেন। তাছাড়া আপনারা কুরুর দিকে যখন যাবেন তখন আমাদের বাড়ি একেবারেই উলটো দিকে হবে।

ঠিক আছে। ওঠো দেবী। তুমি ডান দিকে বসো আমি বাঁ দিকে বসব।

দেবী বলল, আমি ড্রাইভার সাহেবের পাশেও বসতে পারি। পেছনে আমি বসলে অসুবিধে হবে না আপনার?

এইচ. পি. এবার দৃঢ় গলাতে বললেন, না, হবে না। তুমি পেছনেই বসো।

দেবী উঠে বসলে এইচ. পি. কুকুবাবুকে বললেন, কুকু প্লিজ নোট ডাউন মাই মোবাইল নাম্বার।

জি আংকল, বলেই পকেট থেকে ছোটো নোটবই বের করে নাম্বারটা নোট করে নিলেন কুকুবাবু আর নিজের একটা কার্ড দিয়ে বললেন, এতে আমার মোবাইল নাম্বার আছে। সকাল পাঁচটা থেকে ছটা চার্জে রাখি, শুধু সেই সময়টুকু ছাড়া যে কোনও সময়েই করতে পারেন।

তারপর এইচ. পি-কে বসিয়ে, গাড়ির দরজা বন্ধ করার আগে বললেন, আংকল, শুনেছি, আপনি জঙ্গলে যাবেন। সেখানে এই গাড়িতে যদি সুবিধে না হয় তবে জিপ পাঠিয়ে দেব একটা। মাহিন্দ্রর 'বোলেরো' নিয়েছি দুটো। এসি-ও আছে। দারুণ গাড়ি। ওপেলটাও রাখবেন। ফোন করলেই পাঠিয়ে দেব। আরও কিছুর দরকার হলেও বলবেন, দ্বিধা করবেন না। আপনার কোনওরকম অসুবিধা হয়েছে জানলে বাবা আমার চাকরিটাই খেয়ে নেবেন।

এইচ. পি. বললেন, থ্যাংক উ্য।

দরজাতে হাত দিয়েই কুকু এবার দেবীকে জিজ্ঞেস করলেন, সারাঙ্গা জায়গাটা ঠিক কোথায়?

দেবী বলল, চান্দোয়া-টোরী থেকে লাতেহারের দিকের রাস্তাতে মাইল পনেরো গিয়ে বাঁদিকে একটা কাঁচা পথ ঢুকে গেছে। ওই পথেই সাত আট কিমি গেলে সারাঙ্গা। অতি ছোটো বস্তি। আসলে ওখানে একটা পাহাড়ি নালাও আছে, যার নাম সারাঙ্গা।

নদীর নামে গ্রামের নাম? আশ্চর্য তো।

এইচ. পি. বললেন।

নদীর নামেই গ্রামের নাম। গ্রামীণ ভারতবর্ষের প্রায় সব জায়গাতেই নদীর নামেই গ্রামের নাম হয়। পাহাড়ের নামে ও গাছের নামেও নাম হয় দেশের কোথাও কোথাও।

দেবী বলল।

তারপর বলল, বস্তির নাম অবশ্য কম মানুষই জানেন। এ-ই ছোটো বস্তি। জঙ্গলে জঙ্গলে চাহাল-চুঙরু থেকে একটা কাঁচা জিপেবল রোড এসেছে সারাঙ্গাতে। বহু বছর আগে একটা কোলিয়ারি ছিল না কি। অ্যাবানডনড হয়ে গেছে। তাও আজ চল্লিশ বছর আগে, শুনেছি। আমার জন্মেরও আগে। ছিপাদোহর থেকেও একটি পথ এসেছে তবে পায়ে চলা, জিপও যায় না সে পথে।

তাহলে এবারে আমরা এগোই কুকু?

এইচ. পি. বললেন।

জি আংকল। হ্যাপি জার্নি।

থ্যাংক উ্য।

ড্রাইভার সানেকা মুণ্ডা গাড়ি স্টার্ট করল।

এইচ. পি. বললেন, ট্রেন মে বহতই সর্দি থা। এয়ার কন্ডিশনার ইকদম কমতি করকে রাখ না গাড়িকো।

জি স্যার।

বলল, সানেকা।

এখনও রাঁচি শহরের মধ্যেই আছে ওরা। শহর এখনও পুরো জাগেনি।

এইচ. পি. বললেন, আমি একবার নেতারহাটে এসেছিলাম বছর চল্লিশেক আগে। তারপরে আর আসিনি এদিকে। তখন মানুষজন অনেক কম ছিল। হাটিয়ার হেভি-এঞ্জিনিয়ারিং-এর কারখানা তখনও হয়নি সম্ভবত। ভারি ভালো লেগেছিল। এখন তো শুনি রাঁচি একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল শহর হয়ে গেছে।

দেবী চুপ করে রইল।

তুমি কিন্তু আমাকে গাইডের মতো সব দেখাতে দেখাতে নিয়ে যাবে দেবী। আবার কবে আসব এদিকে কে জানে। এ জীবনে কি আর আসা হবে!

দেবী তবুও চুপ করেই রইল।

কি হল? চুপ মেরে গেলে যে! কথা বলছ না যে!

কি কথা বলব বলুন স্যার। যখন কিছু দ্রষ্টব্য জায়গা আসবে তখন বলব আপনাকে।

তারপরে দুজনেই নিজের নিজের ভাবনাতে বুঁদ হয়ে জানালার বাইরে চেয়ে রইলেন। গাড়ি চলতে লাগল।

খুবই ভালো ড্রাইভার।

বলল, দেবী।

হ্যাঁ। গাড়ির ড্যাশবোর্ডে জলের গ্লাস রাখলেও জল একটুও চলকে পড়বে না। এমনই সুন্দর চালাচ্ছে গাড়ি। শুধু গিয়ারেই গাড়ি চালাচ্ছে ব্রেক প্রায় ব্যবহারই করছে না, লক্ষ্য করেছ?

তারপর বলল, জাপানে যে বুলেট ট্রেন আছে তার কথা মনে পড়ে গেল। দেড়শ মাইল গতিতে ট্রেন যায় অথচ ডাইনিং রুমে তোমার চায়ের কাপ থেকে চা একটুও চলকাবে না।

আমি কি কখনও গাড়ি চালিয়েছি না রোজ গাড়ি চড়ি। আমি এসবের কি বুঝি? জাপানেও তো যাইনি কখনও।

যেতে চাও? তুমি বললেই বন্দোবস্ত করে দেব। মারুতির কিছু কাজ আমি করি। জাপান অবশ্যই দেখা উচিত। দেখার মতো দেশ। গেলে সেপ্টেম্বরের শেষে যেয়ো। তখন ওদের 'সাকুরা' ফেস্টিভ্যাল হয়। সাকুরা মানে চেরি ট্রি। চেরি গাছে ফুল আসে তখন। আর সেপ্টেম্বরেই হাওয়াইতে 'আলোহা' উইক হয়। আলোহা মানে, ওয়েলকাম। একটা প্যারেড হয় ওয়াইকিকিতে দেখবার মতো। জাপান থেকে সেখানে চলে যাবে।

জাপান থেকে হাওয়াইয়ান আইল্যান্ডস কত দূরে।

কি আর দূর। প্যাসিফিক ওসানে তো। জাপান হয়ে স্টেটস-এ আসতে পথে হনলুলু। মনে নেই? জাপানিরা তো জাপান থেকেই হনলুলুরই খুব কাছে পার্ল হারবার-এ প্রথমে অতর্কিতে বোমা ফেলে আমেরিকান ন্যাভাল বেস ধ্বংস করেছিল। তারপরেই না যুদ্ধে নামল আমেরিকা।

সত্যি। পৃথিবীর এদেশ থেকে ওদেশের কথা এমন করে বলছেন যেন বালিগঞ্জ থেকে টালিগঞ্জ যাওয়া। কত্ত জানেন আপনি দেবী বলল।

এইচ. পি. বললেন। তুমি যা জানো তা তো আমি জানি না। এখন থেকে আমি শ্রোতা আর তুমি বক্তা। আমাকে সব দেখাতে দেখাতে নিয়ে চলো। আমি কিছুই মিস করতে চাই না কিন্তু। আসলে নিজের দেশই দেখিনি। লজ্জার কথা।

ঠিক আছে।

বলল, দেবী, অন্যমনস্ক গলাতে।

এইচ. পি. বুঝলেন যে মেয়েটি খুবই সেনসিটিভ। নইলে কাল ট্রেনের কুপেতে সে এক রকম ছিল আর প্ল্যাটফর্মে নেমেই অন্য রকম হয়ে গেল মোবাইল ফোনে তাঁর কথোপকথন শোনার পর থেকেই। নিজেকেই বকলেন মনে মনে। যাচ্ছ তো ঠিকই, থাকবেও সাত দিন, তবে শুধু মুডটা নষ্ট করতে গেলে কেন মেয়েটার। কত ভালোবেসে আগ্রহ করে সে নিয়ে এসেছে এইচ. পি-কে। ভারি আত্মসম্মানজ্ঞানী মেয়ে, মনে হয়। সে সইবে কেন অবহেলা? ওতো কিছু চাইতে আসেনি এইচ. পি-র কাছ থেকে। সারা জীবন ঘাঘু মক্কেলদের চরিয়ে খেয়েছেন, কার কি ধান্দা তো ঠিকই বোঝেন। এ মেয়ে কোনও ধান্দা নিয়ে তাঁর কাছে আসেনি। আর আসেনি যে, তা জেনেই আরও ফাঁপরে পড়েছেন উনি। ধান্দাহীনতাই একটা ধান্দা কি না সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারছেন না কিছুতেই। আসলে ধান্দাবাজ মানুষ দেখে দেখে নিজের মনটাই বোধহয় বক্র হয়ে গেছে। সহজ কথা, ভাবতে পর্যন্ত পারেন না। এ একটা ট্র্যাজেডি। সারা পৃথিবীই তাঁর চোখে বাঁকা হয়ে গেছে।

গাড়িটা এখন ফাঁকাতে এসে পড়েছে। ডান দিকে কালো পাথরের স্তূপ, সবুজ গাছগাছালি বুকে করে দাঁড়িয়ে আছে বৃষ্টিস্নাত লাল মাটির পটভূমিতে। ডান দিকে মস্ত বড়ো একটা আমবাগান।

দেবী বলল, দেখেছেন স্যার? আম্রকুঞ্জ? শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জের চেয়েও অনেক গুণ বড়ো।

আর ওই আম্রকুঞ্জের পেছনে লাল পাথরের যে দুর্গ মতো দেখা যাচ্ছে ওটা কার দুর্গ?

এইচ. পি. জিজ্ঞেস করলেন।

ওটা দুর্গ নয়, রাজবাড়ি। ওই জায়গাটার নাম রাতু। রাতুর রাজার বাড়ি ওটা। আর দেখুন বাঁদিকে জলাটা। বিরাট নয়? শীতকালে এখানে অনেক রকম পরিযায়ী হাঁস আসে।

পরিযায়ী মানে?

মানে, মাইগ্রেটরি।

মাইগ্রেট করে আসে পাখি? কোত্থেকে?

কত দেশ থেকে আসে, ইউরোপের নানা দেশ থেকে আসে, রাশিয়া, সাইবেরিয়া। তবে এই জলাতে সামান্যই আসে।

আবার চলে যায় ফিরে?

যায়ই তো। গরম পড়লেই ফিরে যায়। তবে যেতে যেতেও এপ্রিলের মাঝামাঝি অবধি কোনো কোনো প্রজাতিকে দেখা যায়।

প্রজাতি মানে?

মানে স্পিসিস।

তুমি এই সব পাখিদের নাম জানো?

সবের নাম কি জানি? তবে কিছু কিছুর জানি। সারাঙ্গাতে আমরা নদীতে একটা বাঁধ বেঁধেছি পঞ্চায়েতের সহযোগিতাতে। তাতে একটি জলাধার হয়েছে বেশ বড়ো। গত শীতে ওখানেও এসেছিল কিছু পাখি। শিকার করা তো একদম মানা। পাহারাও দিই আমরা। তাই মনে হয়, এ বছর আরও পাখি আসবে। মাছও ছেড়েছি গত বছরে। এ বছর শীতে দেখা যাবে মাছ কত বড়ো হল।

কি মাছ ছেড়েছ?

মেইনলি রুই, কাতলা, মৃগেল। তবে দেসাহেব কিছু তেলাপিয়াও ছেড়েছেন গেরস্থ-পোষা হিসেবে।

বাঃ।

কয়েকটি পরিযায়ী পাখির নাম বলো তো শুনি, চিনি কি না একটাকেও।

ম্যালার্ড, পোচার্ড, গার্গনি, পিন-টেইল, পোচার্ড, পিংক-হেডেড পোচার্ড, শোভেলার, স্পুন-বিলড, নাকটা, বাহমিনি ডাকস, মানে চখাচখি, নানা রকম টিলস, হুইসলিং টিল, গিজ নানারকম। এরা সবাই হাঁস। আরও কত আছে। যেমন কুট, মুরহেন ইত্যাদি।

আচ্ছা, কাম পাখি বলে কি কোনও পাখি আছে, জগু বলে তার দেশের বিলে আছে। দারুণ সুন্দর নাকি দেখতে, লাল ঠোঁট আর ময়ূরের মতো গায়ের রং, বড়ো বড়ো পা। সত্যি?

এইচ. পি. বললেন।

তাঁর দেশ কোথায়?

বহরমপুরে।

হ্যাঁ বহরমপুরে তো অনেকই বড়ো বড়ো বিল আছে। থাকতে তো পারেই। কাম পাখির ইংরেজি নামই তো মুরহেন।

আর গিজ মানে রাজহাঁস? আসে?

হ্যাঁ। তবে সারাঙ্গাতে আসে না।

সরস্বতী ঠাকুরের রাজহাঁসের মতো?

এইচ. পি. রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। উনিও জানেন কম নয়, ইন্ডিয়ান ল রিপোর্টস, ইনকাম ট্যাক্স রিপোর্টস, সুপ্রিম কোর্ট রিপোর্টস, সেলস ট্যাক্স রিপোর্টস। আইনে আর রায়ে তাঁর মগজ খচখচ করে। কিন্তু এ যে জীবনের খবর, অন্য জগতের খবর। আশ্চর্য! বড়োই অশিক্ষিত তিনি। ওই অতটুকু মেয়েটার কাছেও যে তাঁর এত কিছু শেখার থাকতে পারে তা ঘুণাক্ষরেও ভাবেন নি উনি।

হ্যাঁ। সে রকমও আসে। ওইরকম বড়ো রাজহাঁস আসে অস্ট্রেলিয়া আর সাইবেরিয়া থেকে। তবে ওসব হাঁস বড়ো হ্রদ বা নদী ছাড়া নামে না। অস্ট্রেলিয়া থেকে অমন বড়ো কালোরঙা রাজহাঁসও আসে। চিড়িয়াখানায় দেখেননি?

চিড়িয়াখানা! চিড়িয়াখানাতে বড়োরা যায় না কি? শেষ গেছি বড়োমামার সঙ্গে, যখন স্কুলে পড়ি। তা, বছর পঞ্চাশেক আগে হবে।

আপনি চিলিকা লেক-এ গেছেন?

দেবী বলল।

নাঃ। গোপালপুর অন সি-তে ওবেরয়ের পাম বিচ হোটেলে তিন দিনের জন্যে গেছিলাম একটা আইনের সেমিনারে একবার। অনেকেই উইক-এন্ডে গেছিলেন চিলিকাতে বটে। আমি যাই নি। বারান্দায় বসে বিয়ার খেয়েছিলাম আর হ্যারল্ড রবিনস পড়েছিলাম।

ও।

তুমি হ্যারল্ড রবিনস পড়েছ?

না। আমাদের নিজস্ব বিষয়ে এত পড়াশুনো করতে হয় যে অন্য কিছু পড়ার অবকাশই হয় না। আর পড়লেও ক্লাসিকস পড়ি বাংলা এবং ইংরেজি।

তারপরে বলল দেবী, কিছুক্ষণ পরেই আমরা মান্দার বলে একটা জায়গা পেরোব। সেখানে হাট বসে আজকে। গির্জা আছে, মিশনারিদের হাসপাতাল আছে।

এই মিশনারিরাও কি জার্মান?

না, জার্মান যে নন সেটা জানি তবে ইংলিশও নন। সম্ভবত বেলজিয়ামের কোনও মিশন। ঠিক জানি না।

মান্দারের পরে আমরা পৌছোব বিজুপাড়াতে। রাঁচি থেকে ঠিক কুড়ি মাইল। সেখানে থেকে ডান দিকে রাস্তা বেরিয়ে গেছে খিলারির সিমেন্ট ফ্যাক্টরির। আর বিজুপাড়া থেকে কিছু দূর গিয়ে চামা নামের একটি বস্তি হয়ে বাঁদিকে গেলেই ম্যাকলাস্কিগঞ্জ। বিজুপাড়া থেকে পনেরো মাইল। নাম শোনেন নি?

না তো। ম্যাকলাস্কি কে ছিলেন?

তা জানি না, তবে জানি যে, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের খুব সুন্দর কলোনি ছিল মস্ত এলাকা জুড়ে সেখানে, পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে। স্কটসম্যান ম্যাকলাস্কি একটা সোসাইটি গড়ে সেই কলোনির পত্তন করেছিলেন তাই তাঁর নামে নাম। খুবই স্বাস্থ্যকর জায়গা শুনেছি আর ভারি সুন্দর নিসর্গ দৃশ্য। ক্লাব ছিল, চার্চ ছিল। তবে এখন আর সাদা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা নেই-ই বলতে গেলে, সব অস্ট্রেলিয়াতে চলে গেছে।

এত কাছ দিয়ে যাও আসো আর যাওনি একবারও। এইচ. পি. বললেন।

হয়নি যাওয়া। কাছে গেলেই কি যাওয়া হয় সবসময়ে? কি পথে, কি জীবনে।

কথাটার গভীরতায় চমকে উঠলেন এইচ. পি।

দেবী বলল, সারঙ্গাতে কাজে আসি। রাঁচিতে নেমে রাঁচি শহরের রাতু রোড বাসস্ট্যান্ড থেকে ডালটনগঞ্জের বাসে চড়ে এসে সারাঙ্গার মোড়ে নেমে যাই। কেউ না কেউ থাকে মোড়ে, আমার অপেক্ষায়। তার সঙ্গে হেঁটে চলে যাই। অনেক সময় সাইকেলেও যাই। অনেক সময় কেউই আসতে পারে না কাজ বেশি থাকলে, তখন একাই হেঁটে যাই।

জঙ্গলে অতখানি পথ একা হেঁটে যেতে ভয় করে না?

জঙ্গলে একা হাঁটার মতো সুখ আর কিছু নেই। আসলে একা তো আর থাকি না—কত পাখি, প্রজাপতি, ওরাও তো সঙ্গে থাকেই। তাছাড়া ভয়, শহরে যতখানি জঙ্গলে তার ছিটেফোঁটাও নেই। আমরা জঙ্গলকে চিনি না, ভালোবাসি না, তাই মনের মধ্যে নানা মিথ্যে ভয় পুষে রেখেছি।

তুমি সাইকেল চালাতে জানো?

অবাক হয়ে বললেন, এইচ. পি।

হেসে ফেলল, দেবী। বলল, সাইকেল চালানো আর কঠিন কাজ কি? আপনি জানেন না?

নাঃ। তবে গত দশ বছর আগে অবধিও জিম-এর সাইকেল চালিয়েছি। সে সাইকেল তো আর এগোয় না, তা চড়তে ব্যালান্সেরও দরকার হয় না।

তা ঠিক।

মান্দার পেরিয়ে যাওয়ার পরে কিছু দূর গিয়েই পথটা একটা খুব খারাপ বাঁক নিয়েছে ডান দিকে।

অত্যন্ত বাজে বেন্ড তো!

এইচ. পি. স্বগতোক্তি করলেন।

হ্যাঁ। এখানে বহু অ্যাকসিডেন্টও হয়েছে। কলকাতার এক সময়ের খুবই নামি বাঙালি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি ফার্ম পি কে মিত্র অ্যান্ড কোম্পানির নাম শুনেছেন? জি বাসু, রায় অ্যান্ড রায়ের সমসাময়িক?

হ্যাঁ। শুনেছি বইকি। তখন তো মাড়োয়ারি গুজরাটি প্রফেশনালস কলকাতায় ছিলই না বলতে গেলে। প্রফেশনাল মানেই ছিল বাঙালি।

সেই ফার্মের পার্টনার সি পি মুখার্জির ছেলে এই বাঁকে মারাত্মক অ্যাকসিডেন্ট করেছিলেন। তবে প্রাণে বেঁচে যান।

কবে?

সেও বহুদিন আগে। আমি দেসাহেবের কাছে শুনেছি।

এই দেসাহেব মানুষটি সম্বন্ধে আরও কিছু জানা দরকার।

জানবেন। যেমন সুন্দর চেহারা তেমন প্লিজিং পার্সোনালিটি। আমেরিকাতেও প্রফেসারি করে এসেছেন। ভার্সেটাইল মানুষ। ওর স্ত্রী সুমিতাদি শান্তিনিকেতনের মেয়ে। তিনিও চমৎকার। সুন্দরী, ভালো গানও গান। আলাপ হলেই দেখবেন। ওদের সঙ্গে আলাপ হলে আমাকে ভুলে যাবেন।

আমি যাতে তোমাকে ভুলে যাই-ই সে জন্যে তুমি এত উদগ্রীব কেন? তুমি কি চাও যে, আমি ভুলে যাই তোমাকে, ভালো করে চিনতে না চিনতেই।

আমার কোনো চাওয়া নেই।

খারাপ কথা। এই বয়সেই এমন হলে তোমাতে আর সন্ন্যাসিনীতে তফাত কি রইল?

সন্ন্যাসিনী হতেই বা দোষ কোথায়?

না, দোষ নেই। তবে কোন অভিমানে এই বয়সেই বিবাগি হবে? আমিই কি তোমাকে বিবাগি করলাম? আমি মানুষ হিসেবে কি এতই রিপালসিভ?

হেসে ফেলল, দেবী। বলল, তাই কি বললাম?

কিংশুক কীভাবে আসবে পাটনা থেকে?

এইচ. পি. প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বললেন।

পাটনা থেকে বাসে বা ট্রেনে আসবে রাঁচি। রাঁচি থেকে বাসে আসবে। পাটনা থেকে ডালটনগঞ্জের বাসও থাকতে পারে সরাসরি। সেটা গয়া হয়ে এলে জৌরি চাতরা হয়ে চান্দোয়া-টোরী হয়ে ডালটনগঞ্জের দিকে আসতে পারে। জানি না, আমি ঠিক। কি করবে না করবে তা ও এবং ওরাই জানে। একবার শুনছিলাম দুজনেই আসবে। আবার কেউই আসতে নাও পারে। ওদের মতির স্থির নেই।

তোমার ব্যাপারে তো দিব্যি একমত হয়েছে।

হয়েছিল। কতদিন সম্পর্ক টেকে দেখি। লিভ টুগেদারের যা সুবিধে তাই অসুবিধে। চলে যাবার জন্যে দরজা খোলা থাকে বলেই সবসময় পা সুড়সুড় করে চলে যাওয়ার জন্য।

তারপরই বলল, ওই যে সামনে বিজুপাড়া। আপনার খিদে পেয়ে থাকলে এখানেও খেতে পারেন। নইলে কুরুতে গিয়েও খাওয়া যেতে পারে। বাসে এলে, সেখানেই খাই। যেমন আপনার ইচ্ছা।

এখন টু-আর্লি হয়ে যাবে। তবে সকাল থেকে বেড-টিও খাওয়া হয়নি, এক কাপ করে চা খাওয়া যেতে পারে। ড্রাইভারেরও খাওয়া দরকার। তার ঘুম পেয়ে গেলে মুশকিল।

বলেই, বললেন, সানেকা আগে জারা রোকনা। ঔর উতারকে আচ্ছা সে চায়ে বানোয়ানা। একমে বেগর চিনি। তুম ভি পি লেনা, কুছ। খানা হ্যায় তো খা ভি লেনা।

নেহি স্যার। ব্রিফ চায়ই পিয়েগা। ম্যায় লা রহা হুঁ আপলোঁগেকি চায়।

একটু পরই সানেকাকে ভাঁড়-এ করে দু-ভাঁড় চা নিয়ে আসতে দেখা গেল।

এইচ. পি. বাঁদিকের দরজাটা খুলে দিয়েছিলেন।

দেবী বলল, এই এসি গাড়িগুলো শহরে ভালো। আওয়াজ ও পল্যুশন এবং হিউমিডিটির হাত থেকে বাঁচা যায় কিন্তু বাইরে এলে প্রকৃতির সঙ্গে কোনও সম্পর্কই থাকে না। তাই না?

ঠিক তাই। তাই তো খুলে দিলাম। তবে কাচ নামানো থাকলে আবার চুলগুলো হুটোপাটি করে চোখে-মুখে হাওয়ার ঝাপটা লাগে, ধুলোবালিও ঢোকে। গরম তো আছেই। ঠান্ডার দিনেও ঠান্ডা তো থাকে। চা খেয়ে কাচ নামিয়েই যেতে বলব। তারপর বেলা বাড়লে গরম লাগলে তখন চালানো যাবে আবার। কি বলো?

আমি তো বাসে করেই আসি। আমার কিসে অসুবিধা।

একি! ভাঁড়ের চা। আহ! সেই ছেলেবেলাতে খেয়েছিলাম। রেলস্টেশনে স্টেশনে "চায় গরম", "চায় গরম" করে চা নিয়ে ফেরি করত চা-ওয়ালা। আহা বড়ো নস্টালজিক করে দিলে আমাকে দেবী। ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে এসেছিলাম।

চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, চিনি দিয়েই খাই? কি বলো? ডাক্তারেরা তো কত বারণই করেন। সানেকা, ইক চামচ শক্কর লাও তো। চাম্মচভি লেতে আনা।

সানেকা চিনি নিয়ে এলে চিনি গুলিয়ে চা-টা খুব রেলিশ করে খেলেন এইচ. পি।

দেবী অবাক চোখে তাঁর দিকে চেয়েছিল। ভাবছিল মানুষটা বড়ো হলেও একেবারে শিশু আছেন কোনো কোনো ব্যাপারে। সত্যি একজন মানুষের মধ্যে যে কতজন মানুষ থাকেন!

চা খাওয়া হলে, এইচ. পি. সানেকাকে পার্স খুলে একটি পাঁচশো টাকার নোট দিয়ে বললেন, তোমার কাছে রাখো। পেট্রলও তো কিনতে হবে। যখন যা লাগে। তোমার বিড়ি সিগারেট।

সানেকা লম্বা কুর্নিশ করে বলল, নেহি হুজুর। পয়সা তো কুকুবাবু দেহি দিয়া। আপকি কোইভি ফিক্কর নেহি কর না চাহিয়ে। হামারা নোকরি চলা যায়েগা।

এ-তো মহা ফ্যাসাদ। স্বগতোক্তি করলেন এইচ. পি। তারপর ওটি ফেরত নিয়ে একটি একশো টাকার নোট দিলেন। বললেন, লো, রাখখো।

গাড়ি আবার চলল। মিষ্টি হাওয়া আসছে। আকাশ মেঘলা থাকলেও গুমোট নেই। এইচ. পি. বললেন, এর পরে কী কী জায়গা পাব আমরা পথে?

এরপরে পাব সঁস। সঁস-এ এ অঞ্চলের মস্ত বড়ো হাট বসে চান্দোয়া থেকে লাতেহার থেকে, ডালটনগঞ্জ থেকে নানারকম সবজি, মোরগা-আন্ডা, পাঁঠা সব আসে এই হাটে। আজ মান্দারের হাট। সঁস-এ আজ হাট নেই। আমাদের কোন পিকনিক টিকনিক হলে সঁস থেকে পাঁঠা কিনে নিয়ে যাওয়া হয়। অবশ্য যদি ট্রান্সপোর্ট অ্যারেঞ্জড হয়।

তারপর?

তারপর পৌঁছোব কুরু। কুরুতে নাস্তা করে আমরা ডান দিকে ঘুরব।

আর সোজা গেলে?

সোজা গেলে লোহারডাগা। আর লোহারডাগা থেকে নেতারহাট ঠিক পঞ্চাশ মাইল, আপনি যেখানে গেছিলেন।

লোহারডাগা কত মাইল রাঁচি থেকে?

ঠিক পঞ্চাশ মাইল। সারাঙ্গা থেকে জঙ্গলে জঙ্গলে একটা পথ গেছে বেতলা ন্যাশনাল পার্ক-এর মধ্যে দিয়ে—সেটা সোজা গিয়ে উঠেছে লোহারডাগা—নেতারহাটের পথের বানারিতে।

বাবাঃ তুমি দেখছি এসব জায়গা হাতের রেখার মতো জানো।

গত চার বছর মাসে তিন-চারবার করে আসছি যে।

তারপর কুরু থেকে?

কুরু থেকে চান্দোয়া-টোড়ি এগারো মাইল। কিমিতে একটু বেশি হবে।

চান্দোয়া-টৌড়ি নাম কেন?

চান্দোয়ার ঘাটে উঠব আমরা একটু পরে। সুন্দর জঙ্গলে পাহাড়ি ঘাট রাস্তা। ঘুরে ঘুরে পথ উঠেছে। এই পথেই ঘাট শেষ হওয়ার আগে ডান দিকে একটি বাংলা আছে নাম, আমঝারিয়া। অনেকটা নেতার হাটের পালামৌ ডিভিশনের বাংলোর মতো।

বলেই বলল, আপনি মধ্যপ্রদেশের মাণ্ডুতে গেছেন কখনও?

মাণ্ডু? সেটা আবার কোথায়?

মধ্যপ্রদেশের ধার জেলাতে। মাণ্ডু একটি দুর্গ। দেখার মতো। সত্যি! আমাদের দেশে গর্ব করার মতো কত কী যে ছিল। দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

কাদের তৈরি?

তৈরি তো করেছিলেন রাজা ভোজ দশম শতকে। তারপর একাদশ শতকে পারমার রাজারা দখল নেয়। ঘোরি এবং খিলজি বংশর মালিকানাতে যায় চতুর্দশ শতকে। সেই সময়েই রাজধানী মাণ্ডুর রবরবা হয়। জাহাঙ্গির এর নাম দেন শাদিয়াবাদ বা আনন্দনগরী। মারাঠারা মুঘলদের হঠিয়ে দেয় অষ্টাদশ শতকে। তখনই মাণ্ডু তার গরিমা হারায়। কারণ, রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যায় তারা সমতলে। ধার-এ। এখন ধার মধ্যপ্রদেশের একটি জেলা।

তারপর বলল, আপনি এ এল ব্যাশামের "দ্যা ওয়ান্ডার দ্যাট ওজ ইন্ডিয়া" বইটা পড়েছেন?

না তো।

এইচ. পি. বললেন।

কী আর পড়েছি বলো? শুধু তো অকাজই করেছি। কাজের কাজ আর কি করলাম। এতগুলো বসন্ত পার করে দিলাম। অথচ। নিজের ওপরে ঘেন্না হয়। তারপর বললেন, হঠাৎ মাণ্ডুর কথা উঠল কেন?

না, মাণ্ডুর এক প্রান্তে রূপমতী মেহাল আছে। নবাব বাজবাহাদুর আর গায়িকা রূপমতীর প্রেমের উপাখ্যান কিংবদন্তি হয়ে আছে। সেই মেহালটি দুর্গের শেষ প্রান্তে এবং সেখান থেকে পাহাড় খাড়া নীচে নেমে গেছে প্রায় দুহাজার ফিট নিচে, নিমারের উপত্যকায়, যেখানে দিয়ে নর্মদা বয়ে গেছে। আমঝারিয়া বাংলোর সামনেটাও মাণ্ডুর মতো অতখানি না হলেও প্রায় হাজার ফিট খাড়া নেমে গেছে নীচে পাহাড় জঙ্গলাবৃত উপত্যকায়। সেই বনভূমি ধরে সোজা হেঁটে গেলে চাতরা আর সোজা গিয়ে ডান দিকে গেলে হাজারিবাগ। অপূর্ব দৃশ্য। তবে এখন গাছ কেটে তো প্রায় শেষ করে দিয়েছে। দেসাহেবের কাছে শুনেছি আগে ওই উপত্যকার দৃশ্য দেখার মতো ছিল, বিশেষ করে বসন্তে ও বসন্ত শেষে।

দেখাবে না আমাকে?

নিশ্চয়ই দেখাব। তবে বর্ষার রূপ দেখতে পাবেন। বসন্ত তো কবেই চলে গেছে।

একটু চুপ করে থেকে এইচ. পি. বললেন, তা ঠিক। বসন্ত অনেক দিন হল চলে গেছে। 'কখন বসন্ত গেল, এবার হল না গান'। হয়তো আর কখনওই হবে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তারপর কোথায় যাব আমরা?

তারপর চান্দোয়ার ঘাট থেকে নেমে টোড়ি বস্তিতে গিয়ে বাঁ দিকের পথে ঘুর যাব আমরা লাতেহার ডালটনগঞ্জের দিকে। সাতান্ন মাইল পথ। বেতলার পথ চলে গেছে ডালটনগঞ্জে পৌঁছোনোর সাত কিমি আগে, বাঁদিকে। তবে আমরা ওই পথে টোড়ি থেকে মাইল পনেরো গিয়ে বাঁদিকে কাঁচা পথে ঢুকে যাব।

ক-টা নাগাদ পৌঁছোব?

নাস্তা করতে মিনিট পনেরো কুড়ি লাগবে। তার ধরে, ধরুন এই দশটা সাড়ে দশটাতে, খুব বেশি হলে এগারোটাতে। দেখতে দেখতে, থামতে থামতে যাচ্ছি তো, তাই এত সময় লাগবে।

বাঃ।

সানেকা বলল, মেমসাহেবকো তো সবেহি মালুম। মুঝে ভি ইতনি সারে মালুম নেহি হ্যায়।

হাসল, দেবী।

এইচ. পি.-ও হাসলেন, অ্যাডমিরেশনের হাসি। তারপর পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে নাম্বার ডায়াল করলেন। কে? কার্তিক? শোনো, তোমার স্ত্রীকে বলেছিলুম যে কালই ফিরে যেতে পারি। কিন্তু যাচ্ছি না। ছুটি খাও। তবে সন্ধেবেলা চেম্বারটা অ্যাটেন্ড কোরো। ফোন এবং ফ্যাক্স-এর মেসেজগুলো নোট করে রাখতে বলো ডালিয়াকে। ঠিক আছে? ছাড়ছি। তারপর আবার ডায়াল করলেন। মে আই স্পিক টু কুকু? ও কুকু। কুকু প্লিজ গেট মি টু রিটার্ন টিকেটস বাই হাটিয়া হাওড়া অন নেক্সট স্যাটারডে। ইয়েস, আই সাপোজ উ্য নো মাই নেম অ্যান্ড এজ। দ্যা আদার শুড বি ইন দেবী, ডি ই বি আই ভটচার্জিস নেম। এজ? ইটস নট নাইস টু আস্ক আ লেডি হার এজ। বাট পুট থার্টি। শি শুড অফ রেশমিজ এজ। গেট আ কুপে প্লিজ। থ্যাংকস।

আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে ফিরতে নাও পারি! তাছাড়া দুজন যদি কাল আসে এখানে।

তারা অর্ডিনারি থ্রি-টায়ারে যাবে আর আমি আপনার সঙ্গে ফার্স্ট ক্লাস এসিতে যাব এটা কি ভালো হবে?

সব কিছুই যে ভালো হতে হবে তার কি মানে আছে? তোমার ইচ্ছে হলে যাবে নইলে টিকিট নষ্ট হবে। নইলে বলো, ওদের জন্যেও ফার্স্ট ক্লাস এসির টিকিট কাটতে বলি—ফোর বার্থ কম্পার্টমেন্ট—গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। বলেই, পকেট থেকে ফোনটা আবার বের করলেন।

দেবী বলল, না না ওরা অত দামি ক্লাসে যাবে না।

যাবে না?

তারপর বললেন, ওরা যাক আর নাই-ই যাক। তুমি আমার সঙ্গে যাবে।

দেবী এইচ. পি-র দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। এইচ. পি-ও ওর দিকে তাকালেন।

দু'জনেই কি বুঝলেন ও বুঝল তা অন্যে বুঝল বা বুঝল না। কিন্তু দুজনের মনেই নানা ভাবনার ঝড় উঠল। দেবী ভাবল, মনের ব্যাপারে মানুষটি অশক্ত নন। শরীরে তো নিশ্চয়ই নন। আফটার অল পুরোনো দিনের পুরুষ তো, আস্তে আস্তে জোর খাটানো শুরু করেছেন। আসলে সব পুরুষই সমান। বসতে দিলে শুতে চায়।

এইচ. পি. ভাবলেন, দুজনের সঙ্গে সহবাস করো বলেই তো আর খোঁটায় বাঁধা গোরুর মতো জরু নও তুমি। জীবনের সাঁঝবেলাতে এসে আমিও যে সাহসী হতে পারি তা প্রমাণ করব। এক জন পুরুষের মধ্যে মেয়েরা কি চায় তা ঠিক জানেন না এইচ. পি। এবারে জানবেন। আগল যখন খুলেইছেন, নিশি যখন ডেকেইছে, তখন কোন দিকে সে তাঁকে নিয়ে যায় দেখাই যাক না। তাঁর শরীর মনের মধ্যে অনেক শুকিয়ে যাওয়া চাওয়ার উৎসমুখগুলি যেন একে একে খুলে যাচ্ছে।

জীবনের এই সাঁঝবেলাতে পৌঁছে এ কি বিপদে পড়লেন তিনি।

৪

সকালবেলা ঘুম ভাঙল হাজারো পাখির ডাকে। পায়ের কাছের ও গায়ের কাছের জানালা দিয়ে ঝকঝকে রোদ এসে পড়েছে। কে বলবে অগাস্টের শেষ। রোদের রং, আকাশের রং এবং মিষ্টি ঠান্ডাতে মনে হচ্ছে যেন শরতেরই সকাল।

চোখ মেলে প্রথমে কয়েক সেকেন্ড বুঝতে পারেননি এইচ. পি. তিনি কোথায় আছেন। কলকাতাতে মাঝ রাতে উঠে এয়ার-কন্ডিশনারটা বন্ধ করে দেন। ঘরের পর্দা সব টানাই থাকে। ভোরে উঠে একবার বাথরুমে গিয়ে মুখে ঘাড়ে জল দিয়ে আসেন তারপর আবার শুয়ে পড়েন। একটু আলসেমি করেন। দ্বিতীয় বার শোওয়ার আগে ঘরের দরজার লকটাকে আনলক করেন। পাঁচ-দশ মিনিট শুয়ে থেকে বালিশের পাশে রাখা রিমোট কন্ট্রোল বেলের সুইচটা টেপেন। তাঁর খাসবেয়ারা জগু নিঃশব্দ পায়ে এসে ঢোকে পাঁচখানি খবরের কাগজ নিয়ে। মশারি খোলে এবং তোলে, এয়ারকন্ডিশনড ঘরে শুলেও তিনি মশারি টাঙিয়েই শোন। চিরদিনের অভ্যেস। জানালাগুলির পর্দা সরিয়ে জানলাও খুলে দেয় সে, তারপর পশ্চিমের জানালার সামনে রাখা রকিং-চেয়ারের পাশের উঁচু তেপায়াতে কাগজগুলি রেখে চা আনতে যায়। খবরের কাগজ তিনি পড়েন না। প্রথম পাতার হেডলাইনগুলি দেখেন শুধু টাইমস অফ ইন্ডিয়ার। পরে ওগুলো চেম্বারে চলে যায়, মক্কেল এবং জুনিয়রেরা পড়েন।

দু-মুঠো মুড়ি খান একটা বড়ো এককোয়া রসুন দিয়ে, তারপর বিস্ক ফার্মের দুটি মিষ্টি এবং দুটি নোনতা বিস্কিট দিয়ে দু-কাপ চা। তারপরে শরীরের রক্ত চলাচল শুরু হয়।

দে'জ মেডিকেলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দে মশায় খুব স্নেহ করতেন এইচ. পি-কে শুধু উকিল হিসেবেই নয়, এক বিশেষ চোখে দেখতেন তিনি হরপ্রসাদকে। উনি বলতেন ঘুম মানে অর্ধ-মৃত্যু। ঘুম ভেঙে চা খেলে তবেই জীবন ফিরতে থাকে তোমার মধ্যে। আরেকটা কথা বলতেন যা খুবই মানেন এইচ. পি। বলতেন দ্যাখো, আমরা ওষুধ তৈরি করার সময়ে যেমন লিখে দিই প্যাকের ওপরে ডেট অফ ম্যানুফ্যাকচারিং আর ডেট অফ এক্সপায়ারি,আমাদের যিনি বানিয়েছেন তিনিও তেমনই লিখে রেখেছেন আমাদের কপালে অদৃশ্য কালিতে ডেট অফ এক্সপায়ারি। যেদিন যেতে হবে সেদিন হবেই। সেদিন যে কোন দিন বা কোথায় তা আগে থেকে জানাও যাবে না আর তা নিয়ে ট্যা-ফোঁ করাও চলবে না।

মনে পড়ে গেল এইচ. পি-র যে ভূপেনবাবু যেদিন মারা যান বম্বেতে সেদিন এইচ.পি-ও বম্বেতেই ছিলেন। বম্বে হাইকোর্টে দুটো ম্যাটার ছিল। তাজমহল হোটেলে ওল্ড উয়িং-এ উনি উঠেছিলেন, যেমন চিরদিন ওঠেন, কিন্তু এইচ.পি জানতেন না যে ভূপেনবাবুও সেদিন সেখানেই আছেন। অনেক সময় লবিতে তাঁর সঙ্গে বা তাঁর পুত্র গৌতমের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে কিন্তু সেবারে হয়নি। রাতে নাকি পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হয় তারপর ডেট অফ এক্সপায়ারিতে তিনি এক্সপায়ার করে যান। তাঁর মৃত্যু-সংবাদ পরদিন বিকেলের ফ্লাইটে কলকাতাতে পৌঁছে তারপরই পান এইচ.পি। ভূপেনবাবুও জানতেন না যে উনিও ওইদিন ওখানেই আছেন।

সাতসকালে মৃত্যুর কথা কেন মনে এল জানেন না। প্রৌঢ়ত্বের শেষে এবং বার্ধক্যের চৌকাঠে তিনি অবশ্যই পৌঁছেছেন এসে কিন্তু মরার সময় তো তাঁর আদৌ হয়নি। তবু এই এক অবকাশ রোদের মধ্যে এই মৃত্যু-চিন্তা কেন?

দু-কাপ চা না খেলে তিনি "নট-নড়নচড়ন-নট কিচ্ছু" হয়ে থাকেন। ল্যাজে গোবরে। কিন্তু কে এনে দেবে তাঁকে এখন চা? কাল রাতেই বুঝতে পেরেছিলেন যে অ্যাডভেঞ্চার করতে এসে ভালো করেননি। কষ্ট করার ক্ষমতা তাঁর আর নেই। আরামের মধ্যে তিনি নির্বাসিত হয়ে গেছেন চিরজীবনের মতো। তাঁর আর মুক্তির উপায় নেই।

কাল রাতের ডিনার ছিল মোটা আটার রুটি আর আলু ভাজা। কাল দুপুরে খেয়েছিলেন মোটা চালের ভাত, অড়হরের ডাল আর বেগুন ভাজা। খেতে কিন্তু খারাপ লাগেনি। কিন্তু সবচেয়ে যেটা খারাপ লেগেছিল সেটা হচ্ছে বিকেলের চা। মোটা, আধফাটা কাচের গ্লাসে খুব দুধ আর চিনি দেওয়া গুঁড়ো চা। কাঠের আগুনের গন্ধ তাতে। গেলা যায় না। আবার সেই চা খেতে হবে ভাবতেই ভয় করছিল এইচ. পি-র।

ছেলেটির নাম যেন কি? ভিগু? হ্যাঁ ভিগুই তো। ভিগু বলে ডাকলেই সে এসে দাঁড়াবে, বলেছিল দেবী। বলেছিল এইচ. পি. যতদিন আছেন ভিগুকে অন্য সব দায়িত্ব দিয়ে ছুটি দেওয়া হয়েছে, শুধুই এইচ. পি-র ডিউটি করবে সে। খাটের ওপরে উঠে বসে ভাবলেন, ভিগু বলে ডাকেন। ঠিক সেই সময়ে বাইরে থেকে দেবীর গলা ভেসে এল ঔর জারা গরম পানি বইঠাও। ম্যায় ঔর এক গ্লাস পিয়েগা ঔর সাবকি লিয়েভি বানানা তো পড়ে গা।

জি দিদি।

ভিগু বলল।

মাটির বাড়ি একটা। খাপরার চাল। মনে হয় না বেশিদিন বানানো হয়েছে। বাড়ির চারদিকে চারটি বারোমেসে জবার বড়ো গাছ। তাতে নীল, লাল, সাদা আর কালচেটে জবা ফুটেছে। এই জবা গাছ তাঁর রাজপুরের বাগানবাড়িতে আছে বলে তিনি চেনেন। চারগাছের নীচে। গাছটার নাম গতকাল বিকেলেই ইন্দ্রজিৎবাবু বলেছিলেন এইচ.পি-কে। বিরাট গাছ। ফলও ফলে। মানুষে খায়ও সে ফল।

দুটি ঘর পাশাপাশি। সামনে ছফিট গভীর বারান্দা—লম্বাতে আঠারো ফিট হবে। তাতে কয়েকটি বেতের ও বাঁশের মোড়া রাখা আছে। একটি ঘরে পাশাপাশি ঠাসাঠাসি করে চৌপাইতে শুয়েছিল রামধানিয়া, নাগেশ্বর আর ভিগু। যে রান্না করে সেই ভরত শোয় রান্নাঘরেই। তিন দিন আগেই নাকি এক ভাল্লুক এসেছিল রাতে তার সঙ্গে ভাব করতে। রামধানিয়ারা ঠাট্টা করছিল ওকে, বলেছিল ভাল্লুকি নিশ্চয়ই, নইলে অবিবাহিত ভরতের খোঁজ করতে বর্ষা রাতে কেন আসবে?

হঠাৎ নীচু গলাতে গান ধরল দেবী। কি গান? মনে হয় ব্রহ্মসঙ্গীত। শোনেননি আগে।

"তাঁরে দূর জানি ভ্রম, সংসার সংকটে
আছে বিভু তোমা হতে তোমারো নিকটে
তুমি কেন নিরন্তর থাকো তা হতে অন্তর
ভাব সেই পরাৎপর নিত্য অকপটে
ভ্রম, সংসার সংকটে।"

চমৎকার গলা দেবীর। আর আশ্চর্য সুন্দর ভাবও আছে গলাতে। আছে ঈশ্বর-প্রেম, সমর্পণ-তন্ময়তা। ওইটুকু বয়সের মেয়ের মধ্যে এমনটি আশা করারই নয়।

এইচ. পি. বাইরে এলেন।

দেবী ওই ডেরায় পাশেই গাছতলাতে বড়ো কোনও গাছের একটা গুঁড়ি ফেলা ছিল তার ওপরে বসেছিল। সেটাই চেয়ারের মতো ব্যবহার করে সবাই, কালই দেখেছিলেন। গুঁড়িটা এতখানি লম্বা যে জনা পনেরো কুড়ি মানুষ তার ওপরে বসতে পারেন পাশাপাশি।

এইচ.পি-কে দেখে দেবী উঠে দাঁড়াল। রাতে সালোয়ার কামিজ পরেই শুয়েছিল। এখন একটা কালো জিনস আর হলুদ গেঞ্জি পরেছে। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। আসলে চোখ যাকে একবার সুন্দর দেখে, তাকে সব বেশেই, সব অবস্থাতেই সুন্দর দেখে বোধহয়। সেই চোখটা যখন মরে যায় বা নড়ে যায় তখন আর একটুও সৌন্দর্য খুঁজে পাওয়া যায় না যাকে দেখা যায় তাঁর মধ্যে। দেবী ঠিক কতখানি সুন্দর বা আদৌ সুন্দর কি না, ঠিক জানেন না এইচ.পি। প্রস্ফুটিত পূর্ণ যৌবনের দীপ্তি যখন লাগে, কি নারী কি পুরুষের মুখে, তখন সেই মুখ এক আলগা এবং আলাদা সৌন্দর্য পায়।

কুকুরিও যৌবনে সুন্দরী। যৌবন যখন চলে যায় তখন নিষ্ঠুরের মতো সেই দীপ্তিকে মুখ থেকে মুখোশের মতো ছিঁড়ে নিয়ে যায়। দুঃখের বিষয় এই যে, যাদের যৌবন আছে ভরপুর, তারা এই দীপ্তি সম্বন্ধে আদৌ সচেতন নয়।

মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়েছিলেন এইচ.পি. দেবীর মুখে।

দেবী দাঁড়িয়ে উঠে বলল, রাতে ঘুম হল ভালো?

কাল থেকে হবে। নতুন জায়গাতে প্রথম রাতে ঘুম হয় না।

তা ঠিক।

তুমি ঘুমোলে?

আমি তো পড়ি আর মরি।

ঘরের মধ্যে ধাড়ি শুয়োর নিয়ে কেউ ঘুমোতে পারে?

মানে?

মানে আমি নাকি নাক ডাকি শুয়োরের ঘোঁতঘোঁতের মতো।

কে বলেছে?

আমার বন্ধু ব্রতীন বলত। গোপালপুরে ঘর কম থাকাতে সে আমার ঘরে ছিল ওবেরয় পামবিচ-এ। তিন রাত। ভুক্তভোগী বলেই বলত।

জানি না। আমি তো বুঝতে পারিনি।

বলেই বলল, চা আনতে বলি? চা আর লেড়ো বিস্কিট।

তারপর বলল, আমার ভীষণই খারাপ লাগছে। আপনাকে যে কোন আক্কেলে এখানে নিয়ে এলাম। এত খারাপ থাকা-খাওয়া, বাথরুম পর্যন্ত নেই, অ্যাটাচড-বাথরুম তো দূরস্থান, সবই জঙ্গলে—এর মধ্যে আপনার মতো মানুষ কি থাকতে পারেন? তার ওপরে মশার কামড়। যদি ম্যালেরিয়া-ট্যালেরিয়া হয়ে যা তাহলেই তো চিত্তির। কি করে মুখ দেখাব?

কার কাছে মুখ দেখাবে? আমার তো আত্মীয়-পরিজন কেউই নেই। জবাবদিহি করতে হবে না তোমার কারো কাছেই। এই মস্ত সুবিধা। আমার অসুখে বিচলিত হওয়ার মতো কাছের মানুষ নেই-ই বলতে গেলে।

আপনার কোনও আত্মীয় নেই?

আপন ভাইবোন নেই। কাজিনস আছেন। তবে আত্মীয় শব্দটার মানে তো যে বা যাঁরা আত্মার কাছে থাকেন। সেই অর্থে আত্মীয় কেউই নেই। আর হবে যে কেউ, তারও বেলা নেই আর।

বলেই বললেন, তোমার কাছে আমি কতখানি যে কৃতজ্ঞ কি বলব। সারা জীবনে তো দেশে-বিদেশে অনেক জায়গাতেই বেড়ালাম। মুসৌরি, নৈনিতাল, কোদাই, গোয়া, কাশ্মীর, আন্দামান, কোভালম। অস্ট্রিয়া, সুইটজারল্যান্ড, ওয়াইকিকি, কোবে, সেশ্যেলস। সব জায়গার সবচেয়ে ভালো হোটেলে থাকলাম কিন্তু সে সব জায়গাতে না তোমার মতো কেউই হাত ধরে নিয়ে গেছে, না আমাদের এই জঙ্গলে ভারতবর্ষ ছিল আমার অনুষঙ্গ হয়ে। এই আমার প্রথম স্বদেশ ভ্রমণ। সত্যিই বলছি।

বাবাঃ! দারুণ বাংলা বলেন তো আপনি। কবিতা টবিতা লিখতেন না কি?

যৌবনে কবিতা লেখেনি এমন বাঙালি কি একজনও আছেন? আর যাঁরা কাগজে লেখেন কি কলম দিয়ে, তাঁরা মনে মনে অবশ্যই লিখেছেন, বসন্তের বাতাসে, ঝরা পাতাতে, শ্রাবণের মেঘে লিখেছেন, তারপরে উড়িয়ে দিয়েছেন, হারিয়ে ফেলেছেন। কবিতার যারা প্রেরণা তারাই যখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে হারিয়ে যায় তখন কবিতা হারিয়ে যাওয়া নিয়ে দুঃখ করে কি লাভ?

তারপরে বললেন পঞ্চাশের দশকের শেষাশেষি 'দেশ'-এ একটি কবিতা পাঠিয়েছিলাম এবং সেটি ছাপাও হয়েছিল।

সত্যি?

হ্যাঁ।

তারপর আর লিখলেন না?

লিখেছি অনেক কিন্তু পাঠাইনি কোথাওই। আমাদের সময়ে কবি গায়ক চিত্রীদের মধ্যে এমন রাতারাতি বিখ্যাত হওয়ার মানসিকতাটা ছিল না। অনেক গুণই মানুষে নিজস্ব করে রাখতে ভালোবাসত—বাজারে পাঠাতে চাইত না পণ্য হিসেবে। এখন যার গলাতে একটা পর্দাও সুরে বলে না সেও ক্যাসেট করে, সি টি ভি এন চ্যানেলে না কি সেই সব ছেলেমেয়েদেরই গাছ জড়িয়ে বা সিঁড়িতে বসে গান শুনতে ও দেখতে হয় শুনি।

শোনেন মানে? আপনি টিভি দেখেন না?

নাই বলতে পারো। দেখলে বিবিসি, বা ডিসকভারি বা ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক চ্যানেল দেখি।

তারপর বললেন, এমন অত্যাচার আমাদের সময়ে কেউ করতও না, করলে কেউ সহ্যও করত না। প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে একটা শালীনতাবোধ ও লজ্জাবোধ ছিল। যথেষ্ট ভালোভাবে কোনও কিছুই না করতে পারলে, না শিখলে, জনসমক্ষে আসতে মানুষে স্বভাবতই কুণ্ঠিত হত। গুরুরাও ছাত্রছাত্রী যথেষ্ট তৈরি না হলে তাদের পাবলিক পারফরমেন্স করতেই দিতেন না। আর আজকাল শয়-শয় ক্যাসেট-করা, সিডি বের করা শিল্পীর গলাও বেসুরে বলে অথচ নির্লজ্জতার চরম করে তাঁরা মঞ্চ ও টিভির পর্দা দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন।

একটু চুপ করে থেকে এইচ. পি বললেন আসলে আমার কি মনে হয় জানো দেবী? ইকনমিক্স-এর Gresham সাহেবের সেই ম্যাক্সিম এখন বাঙালি জীবনের সব ক্ষেত্রে, সাহিত্য, সঙ্গীত, রাজনীতি সব ক্ষেত্রেই প্রচণ্ডভাবে প্রযোজ্য।

সেই ম্যাক্সিমটা কি?

"ব্যাড মানি ড্রাইভস অ্যাওয়ে গুড মানি"। থার্ড ক্লাস মানুষেরা এসে জীবনের সব ক্ষেত্র থেকেই প্রকৃত গুণী মানুষদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করছে। প্রকৃতই যাঁরা গুণী, তীব্র আত্মসম্মান এবং তীব্রতর অভিমান নিয়ে নিজের নিজের বাড়িতে বসে আছেন। এই বাজারি প্রতিযোগিতাতে নামতে তাঁরা ঘেন্না বোধ করেন।

তারপরই বললেন, তুমি যেমন গাও, তুমি তো সহজেই ক্যাসেট করতে পারতে দেবী। রেডিও এবং টিভিতেও গাইতে পারতে। গাও না কেন? ভারি ভালো লাগল তোমার গান।

ওই যে। বললেন না আপনি। কিছু জিনিস তো আমার নিজস্ব থাকবে। আমার অবকাশের নিশ্চিন্ত পরিসরে বসে আমি আমার গানই হোক কি ছবি কি কবিতা আমি আমাকেই শোনাব বা দেখাব। দশজনের বাহবা যে পেতেই হবে তার কি মানে। নিজের অন্তরের গভীরে যদি আনন্দ পাই তবে সেই তো পরম প্রাপ্তি।

আর তোমার যারা প্রিয়জন তাদেরও কি এই গান শোনাও না, শোনাবে না?

যদি তারা ভালোবেসে শোনে তবে তো শোনাব।

মুখ নীচু করে গলা নামিয়ে বলল দেবী।

ওই গানটি, মানে যেটি গাইছিলে একটু আগে, সেটি ব্রহ্মসঙ্গীত, না? কার কাছে শেখো তুমি? আমি চুপ করে শুনছিলাম বলেই আওয়াজ দিইনি এতক্ষণ। ঘুম তো ভেঙেছে অনেকক্ষণই।

কারো কাছেই শিখিনি তেমন করে। আমার মা খুব ভালো গান করেন। মায়ের গান শুনে শুনে, শুধু মা কেন, আমার মামা-মামিরাও প্রত্যেকে ভালো গান করেন। শিশুকাল থেকে গানের আবহের মধ্যেই বড়ো হয়ে উঠেছি তাই গাইলে বেসুরো গাই না এটুকুই বলতে পারি। আসলে, আমার মা বলেন, সুর সকলের গলাতে থাকে না। যার গলাতে নেই সে যত চেষ্টাই করুক তার গলা হারমোনিয়াম ভেঙে ফেললেও সুরে বলবে না। আর যার সুরের কান না তৈরি হয় তার পক্ষে

সুর-বেসুরের তফাতটুকুও বোঝা সম্ভব নয়। নয় বলেই, সে মহা জাঁকজমকের সঙ্গে পনেরোটি বাজনা নিয়ে মঞ্চ কাঁপিয়ে গান গাইলেও সে নিজেই বুঝতে পারে না যে তার গান গাওয়াটা গান হচ্ছে না, তার গান গাওয়া আদৌ উচিত নয়।

ঠিকই বলেছ। তোমার মামাবাড়ি কি ব্রাহ্ম? এমন ব্রহ্মসঙ্গীত!

ব্রাহ্ম নন। ব্রাহ্মদের সব কিছুই যে ভালো এমন তো নয়। অবশ্য কারোই সব কিছু ভালো নয়। না। তবে মামাবাড়ি ব্রাহ্মভাবাপন্ন একথা বলতে পারি। হয়তো মা-মাসিরা সবাই শান্তিনিকেতনে লেখাপড়া করেছেন বলেই কিছুটা প্রভাবিত হয়েছেন। আজকের শান্তিনিকেতনের অবশ্য তেমন কোনও প্রভাব ছাত্রছাত্রীদের ওপরে নেই। প্রতিষ্ঠানেরই নিজস্বতা যদি না থাকে তবে তা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চুঁইয়ে আসবে কি করে। সারা পৃথিবীরই সব দুধেই এখন জল। কি আর করা যাবে।

ভিগু একটা প্লাস্টিকের থালাতে বসিয়ে গ্লাসে করে চা আর লেড়ো বিস্কিট নিয়ে এল। ওর গ্লাসটি তুলে নিতে নিতে দেবী বলল, আরেক গ্লাস খাবেন তো?

খেতে পারি। এই চা খেয়ে আমাদের এক বেলজিয়ান বন্ধুর কথা মনে পড়ে গেল।

কী সে কথা।

এইচ. পি. বললেন, রসিকতাটা রসিকতা হিসেবেই নিয়ো—নো ইল-ফিলিং প্লিজ।

বলুনই না।

উনি বলেছিলেন, "সামথিং ওজ বিইং সোল্ড অ্যাট মিন্সিং লেন, হুইচ লুকড লাইক কোকো, টেস্টেড লাইক কফি, অ্যান্ড ওজ টোল্ড টু বি টি।"

মিন্সিং লেনটা কোথায়?

ও, মিন্সিং লেন হচ্ছে লানডান-এর চা অকশনের জায়গা—পৃথিবীখ্যাত।

ও।

দেবী হেসে বলল, আমাদের সারাঙ্গার চা তাহলে এক অভিজ্ঞতা। কী বলুন। পাই-পয়সাও বাঁচাতে চাই আমরা। অনেকের চাঁদার টাকাতেই তো চলে সব। নিজের টাকা হলে এসব বিলাসিতা নিয়ে ভাবা যেত।

তারপর বলল, ভিগু, সাবকে লিয়ে ঔর এক গ্লাস চায় লাও। উসকে বাদ সাবকো লেকর জঙ্গলমে যানা। লোটামে পানি লে যা না।

জঙ্গলে বাথরুম জীবনে করেননি। কি করে যে কি হবে এবং হবার পর যে কি হবে এই চিন্তাতেই চ্যাটার্জিসাহেবের মগজ কাল রাত থেকেই খুবই উত্তেজিত আছে। কঠিনতম মামলার আগেও এমন উত্তেজনা বোধ করেননি কখনও। যাক, যা হওয়ার তা হবে। তবে কালই তো ইনিশিয়েশন হয়ে গেছে। আজকে অতটা কঠিন কাজ বলে মনে হবে না।

চা খেতে খেতে এইচ. পি. বললেন, কিংশুক কখন আসবে?

এসে পড়বে। অন্তুও আসবে হয়তো। দেসাহেব, মানে ইন্দ্রজিৎদা বলেছিলেন। এক জনের সখ আধুনিক কবিতা অন্য জন বাংলা ব্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত।

কি? মহীনের ঘোড়াগুলি?

দেবী হেসে বলল, না, সে তো অনেক দিন আগের ব্যাপার। মহৎ ব্যাপারও। অন্তুদের ব্যান্ডের নাম 'ঝঞ্ঝাটিয়া পাখিরা'।

কি? কি?

'ঝঞ্ঝাটিয়া পাখিরা'। ওদের লিড ভয়েস দেয় যে ছেলেটি তার নাম ঝঞ্ঝাট সেন। সে আবার Gay।

তারপরই বলল, আপনাকে একটু সাবধান করে দেওয়া দরকার।

কিসের থেকে সাবধান?

না, ওদের থেকে।

কেন?

ওরা দু জনেই বয়োজ্যেষ্ঠদের একেবারেই সম্মান দিয়ে কথা বলে না। সম্মান তো দেয়ই না, উলটে অপমানজনক কথাবার্তাও বলে, মুখের ওপরেই। ওদের ধারণা আমাদের প্রজন্মের যা কিছু দুঃখ-কষ্ট তার সবের জন্যেই দায়ী আপনাদের প্রজন্ম।

সম্মানের যোগ্য যদি কেউ না হন তবে তাকে সম্মান দেবেই বা কেন? তা ছাড়া ওদের অভিযোগ তো পুরোপুরি মিথ্যাও নয়। আমি দোষ দিতে পারি না ওদের।

তা বলে জেনারালাইজ করা কি ভালো? ওরা যে যোগ্য-অযোগ্যের বিচার করে না। আমি নিশ্চিত যে, আপনি সমাজের যে তলাতে বাস করেন, যাদের সঙ্গে ওঠা-বসা করেন, সেই সমাজকে ওরা জানেই না, আমিও অবশ্য জানি না। সেই সমাজের সঙ্গে কিংশুক আর অন্তর কোনোই মিল নেই। আপনাদের ওরা জানে না, একেবারেই জানে না। জানতে না পারে কিন্তু জানার ইচ্ছেটাও কেন থাকবে না? ওরা সবকিছুকেই উড়িয়ে দিয়ে বলে, বিন্দাআস।

এইচ. পি. বললেন, বিন্দাআস। এই শব্দটার মানে কি? বিন্দাআস? সেদিন সৌরভের খেলা দেখার জন্যে টিভি খুলে ওপেল গাড়ির বিজ্ঞাপনে দেখি ব্যবহৃত হচ্ছে ওই শব্দটি। মানে বুঝিনি।

বম্বেতে চালু আছে এই বিন্দাআস শব্দটি। দেখছেন না। কিডন্যাপাররা যেমন আসছে বম্বে থেকে, নানা নতুন শব্দও আসছে। কলকাতা এখন পুরোপুরিই রিসিভিং এন্ড-এ।

তা বিন্দাআস শব্দটির মানেটা কি?

ঠিক মানে কি তা আমিও বলতে পারব না। ধরুন ইংরেজিতে could not care less বলতে আমরা যা বুঝি, তাই আর কি!

সবকিছুকেই উড়িয়ে দেওয়া, মানে ওড়ানোর জন্যেই উড়িয়ে দেওয়াটা তো স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। ওড়াবার জিনিসকে ওড়ানো খারাপ নয় কিন্তু ওড়াবার মতো প্রি-ডিটারমিন্ড মেন্টাল ফ্রেম কি ভালো?

এইচ. পি. বললেন।

ভালো তো নয়ই। কিন্তু এসব ওদের পার্সোনাল ব্যাপার। পার্সোনাল ভিউ অফ লাইফ। আমার সঙ্গে দু জনের সম্পর্ক জীবনের একটা বিশেষ দিকের। তবে আমিও ওদের উড়িয়েই দিই। আমরা তিন জনে সহাবস্থান করি বটে কিন্তু তা সীমিত আছে জীবনের কিছু বিশেষ ক্ষেত্রেই—যেখানে আমাদের মধ্যে ঝগড়া বা মতবিরোধ এখনও নেই। অন্য সব ব্যাপারে আমরা তিন জনেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দাম দিই। কিন্তু ওদের বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি এই যে আটার ডিসরেসপেক্ট, এটা আমার ভারি খারাপ লাগে। অসভ্যতা বলেই মনে হয়। অথচ ওরা ভাবে, এটাই সপ্রতিভতা।

এই ব্যাপারটা আমিও অনেক তরুণদের মধ্যে লক্ষ্য করেছি। Arrogance-কেই ওদের মধ্যে অনেকে Smartness-এর সমার্থক বলে মনে করে। এই ধারণাটা ভুল অবশ্যই। আমরাও একদিন তরুণ ছিলাম, আমাদের তারুণ্যের দিনে এমনকী আমরা কখনওই ভাবিনি।

এইচ. পি. বললেন।

জানি স্যার। তাই-ই আপনাকে সাবধান করে দিলাম।

দ্যাখো দেবী, অনেক দুঁদে উকিল-ব্যারিস্টারের সঙ্গে টক্কর দিয়ে আমার দিন কাটে, এতগুলো বছর কাটল। ওদের আমি ঠিকই ট্যাকল করতে পারব। তোমার চিন্তা নেই কোনও।

না, মানে আমি যা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে, প্রয়োজনে আপনি ওদের "ফিক্স" করে দেবেন। ওদের অসভ্যতা, মানে যদি কিছু করে, তা হলে আপনি ছেড়ে দেবেন না। ওরা আমার এমন কিছু আপনজন নয়। বলেইছি তো! আমরা তিন জনে এক সঙ্গে থাকি ওনলি ফর কনভিনিয়েন্স। এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।

সে কি! স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকছ আর বলছ সম্পর্কটা বিশেষ নয়। ওরা তোমার আপনজন নয়।

সত্যিই তাই। মনে করুন, আমরা ট্রেনের এক কম্পার্টমেন্টের যাত্রী। যে কোনো স্টেশনে যে কেউই নেমে যেতে পারি। আজকের পৃথিবীতে "চিরকালীন" বলে কোনও সম্পর্ক আর নেই স্যার। সব কিছু সম্বন্ধেই এখন বলা চলে, "বিন্দাআস"! এক জন নারী আর পুরুষের মধ্যে শারীরিক সম্পর্কটাই আগেকার দিনে সম্পর্কের একেবারে শেষ কথা বলে ধরা হত। আজকাল সেই কনসেপ্ট আর নেই। সব ভেঙেচুরে গেছে। গেছে যে, তা তো আমাদের দেখেই বুঝতে পারছেন স্যার।

এইচ. পি. চায়ের গ্লাসটা শেষ করে বললেন, কি জানি! দেখি তোমাদের বুঝতে পারি কি না। এত বড়ো কুইজের মধ্যে এনে ফেলবে জানলে সত্যিই আসবার আগে ভাবতাম।

আহা। আমি তো আপনার দলেই। অন্যায় কিছু যদি করে ওরা তবে আমিই বা মেনে নেব কেন? আফটার অল আপনি তো আমারই অতিথি হয়ে এখানে এসেছেন স্যার।

আর ওরা? ওরা কার অতিথি?

ওদের কেউ নেমন্তন্ন করেনি। দেসাহেবকে মানে ইন্দ্রজিৎদাকে চেনে, একবার আমারই সঙ্গে এসে বারিয়াতুতে ছিল দু-দিন। আমাদের প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটরকে চেনে। তাই আমি আসছি এবং কয়েক দিন ছুটি পড়েছে বলে ওরাও আসছে। হয়তো ছুটি নিয়েওছে ক-দিন। ছুটি নেওয়ার মতো বাঁধা-ধরা কাজ ওরা কেউ করে বলে জানি না অবশ্য। সম্ভবত না। তবে আদৌ আসবে কি না এবং কবে আসবে তা ওরাই জানে। ওদের চলাফেরার, কথাবার্তার কোনোই ঠিক নেই।

হুঁ।

এইচ. পি. বললেন, একটু চিন্তিত হয়েই।

৫

এইচ. পি. যখন ভিগুর সঙ্গে প্রাতঃকৃত্য সারতে জঙ্গলে যাচ্ছিলেন তখনই কলকল করতে করতে আদিবাসী মেয়েরা, যারা কাল সন্ধের আগে ফিরে গেছিল কাছাকাছিই নিজেদের গ্রামে এবং সারাঙ্গাতেও, তারা ফিরে এসে দেবীকে ঘিরে ধরল। গতকালই লক্ষ্য করেছেন এইচ. পি. যে, দেবী মেয়েটির মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার এক স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। কিছু হেসে, কিছু গম্ভীর হয়ে কিছু বকে ঝকে ওদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেওয়ার এক বিরল গুণ আছে। ও পাকাপাকিভাবে থাকত তবে তারা খুবই সুখী হত, দেবীকে কম পায় বলেই যখন পায় তখন বোধহয় এমনি করেই পুরোপুরি নিংড়ে নিতে চায়। সকলেই ওকে দেবীজি। দেবীজি। বলে ডাকছিল।

দেবী জঙ্গলের দিকে ভিগুর দিকে এগিয়ে যাওয়া এইচ. পি-কে বলল, স্যার, আমি কিন্তু চলে যাচ্ছি। আপনি ফিরে কখন নাস্তা করবেন ভিগুকে বলে দেবেন।

তুমি নাস্তা করবে না?

নাঃ। আমার সময় নেই। অনেক কাজ। দুপুরে খেতে আসব।

ক-টাতে?

বারোটা থেকে একটার মধ্যে। তবে আমার দেরি হলে আপনি খেয়ে নেবেন।

দেসাহেবরা কি আজও আসবেন?

সম্ভবত না। আজ ওঁদের বারিয়াতুতে একটা সেমিনার আছে। তবে বলেছেন, চেষ্টা করবেন।

ঠিক আছে।

ওঁদের কেমন লাগল স্যার আপনার?

ফ্যানটাসটিক। আমি গ্রেট ফ্যান হয়ে গেছি ওঁদের। এমন মেড ফর ইচ আদার কাপল আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

বলেছিলাম না আপনাকে। ওঁরা আমার আদর্শ। আপনিও কিছুটা।

আমি?

অবাক হয়ে বললেন, এইচ. পি.।

নাস্তার পরে ভিগুকে নিয়ে চারদিক এবং আমাদের নানা প্রজেক্ট দেখতে পারেন।

আমি এখন তোমার সঙ্গে যেতে পারি না?

আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু চার কিমি পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যের পাকদণ্ডি দিয়ে হাঁটতে হবে। আপনি পারবেন না। খুব উঁচু একটা চড়াই আছে। ব্রিজটাও ভেঙে গেছে শুনেছি। নদীতে এখন কত জল কে জানে। নদী পেরিয়ে যেতে হবে।

এইচ. পি. হার স্বীকার করে বললেন, না। হাঁফ ধরে যায়। চড়াই উঠতে পারব না।

পারবেন। কয়েকবার এসে থাকুন, দেখবেন শরীর মন সব বদলে গেছে। বয়স কুড়ি বছর কমে গেছে। তবে এখন পারবেন না বলেই আপনাকে রেখে যাচ্ছি। আমি এগোলাম স্যার। টা- টা।

হাত তুলে দেবীর এই টা-টা বলার ভঙ্গিটা ভারি ভালো লাগল এইচ. পি-র। যেন কত জন্মের কাছের কেউ ও।

জঙ্গলের দিকে এগোতে এগোতে এইচ. পি. ভাবছিলেন শরীরের চর্চা বহু বছরই ছেড়ে দিয়েছেন। ওঁর ছেলেবেলার বন্ধু মুনা দাস, ফুটবলার, এখনও রোজ সকালে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে তার নাতিকে নিয়ে জগিং-স্যুট পরে দৌড়োয়। এখনও দারুণ ফিট আছে। সারা পৃথিবীতেই ফিজিকাল ফিটনেস একটা ক্রেইজ হয়ে গেছে এখন। সকলেরই ফিগার ভালো থাকা চাই-ই। মানুষ যেন পুরোপুরিই শরীর-সর্বস্ব জীব হয়ে গেছে। যতই ফিট থাকুক মুনা দাস, সে তো একটা চিতাবাঘের মতো ফিট হতে কোনদিনও পারবে না। মানুষ তো চিরদিনই তার মনের সুবাদেই উৎকৃষ্টতম জীব। চারদিকের এই শারীরিক ক্রিয়াকাণ্ড দেখে মনে হয় মানুষের মনের চর্চার আর দরকার নেই। মনের চর্চা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু করতে বা বলতে কাউকেই দেখেন না। বিধাতা তো বৈচিত্র্যের জন্যে মোটা-মানুষ রোগা-মানুষ বেঁটে-মানুষ লম্বা-মানুষ কালো সাদা হলুদ বাদামি নানা রঙা মানুষই সৃষ্টি করেছিলেন। সকলেরই যে আদা নুন খেয়ে রোগা হতে হবেই কেন সে কথা ভেবে পান না এইচ. পি.। কিন্তু নিজের মনের কথা বলে যে হালকা হবেন বা নিজের মতের পক্ষে অন্য কারোকে পাবেন তেমন মানুষ একজনও পান না। তাই এ প্রসঙ্গের অবতারণাই আর করেননি কারও কাছেই—পাছে লোকে পাগল বলে।

ভিগু তাঁকে একটা প্রস্তরময় জায়গাতে নিয়ে গেল। কাল বিকেলে অন্যদিকে গেছিলেন। বড়ো বড়ো নানা আকৃতির পাথর আছে সেখানে। পাশ দিয়ে একটি সরু ঝোরা মতো বয়ে গেছে। তাতে জল চলছে তিরতির করে। ভিগু বলল আপনার পছন্দসই একটা পাথরে বসে পড়ুন, যার পেছন দিকে ফাঁকা। এইচ. পি. বুঝলেন ভিগু কি বলছে। ভিগু এবারে জল ভর্তি ঘটিটা ওঁর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, আমি ওই মহুয়া গাছটার নীচে থাকব। আপনার হয়ে গেলে আমাকে ডাকবেন। আরও জলের দরকার হলে ওই নালাতে নেমে যাবেন—দু-কদম তো। বহতা জল আছে।

মহুয়া গাছ কোনটা?

বিপদে পড়ে বললেন এইচ. পি.। গাছ-টাছ তিনি চিনবেন কোত্থেকে!

ভিগু আঙুল দিয়ে মস্ত গাছটাকে দেখালো। বড়ো বড়ো পাতাতে ভরে আছে। অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন এইচ. পি,। এই মহুয়া গাছ! "মহুয়া" নামের একটি বইও তো আছে রবীন্দ্রনাথের। মহুয়া নামের একটি মেয়েও পড়ত তাঁদের সঙ্গে স্কটিশ চার্চ কলেজে। মহুয়ার মদ-এর কথাও শুনেছেন। কিন্তু মহুয়া গাছ! জীবনে এই প্রথম দেখলেন। কে জানে। আগে হয়তো কখনও দেখেছেন কিন্তু চিনতেন তো না।

ব্যাপারটা যেমন অসাধ্য বলে ভেবেছিলেন কাজে তেমন মনে হল না। হল না যে তা জেনে পুলকিত হলেন এইচ. পি.। তিনি এখনও পুরোপুরি বর্জ্য পদার্থে হননি তা হলে, শহর আর

আরামের ঘেরাটোপের বাইরে আসতে ও চলতে ফিরতে তিনি তা হলে পারতেও পারেন, যদিও কষ্ট খুবই হবে প্রথম প্রথম।

ভিগু বলল, সব ঠিকঠাক না হ্যায় সাব?

সব ঠিক ঠাক। নাল্লামেভি উতর গ্যায়াথা। উঁহা মিট্টিভি মিল গয়া। সাফ পানি থা।

তারপর বললেন, জঙ্গলেই যানা হোতা তো আওরত লোগ কওন টাইম মে যাতি?

উনোনে সব সুরজ উঠনেকে পহিলে পহিলেই যাতি হ্যায়। দিদিভি গ্যায়িথি। ই দেহাত জঙ্গল কি এহি রেওয়াজ। ফির সাম মে সুরজ ঢলনেকো পহিলে পহিলে এক দফে যাতি হ্যায়। জাগে সব অলগ অলগ হ্যায় না। যাঁহা মরদলোগ যাতা আওরতলোগ হঁয়া না যাতি।

একটা ছোটো পাখি ফিচিক ফিচিক করে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল সবুজ শালের চারায় কাঁপন তুলে। ওই চারার ওপরেই বসেছিল সে।

কি পাখি ওটা?

এইচ. পি. শুধোলেন।

ফিচফিচিয়া।

এমন সময়ে ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ কর্কশ শব্দ করে কচি-কলাপাতা-সবুজ একঝাঁক টিয়া উড়ে চলে গেল মাথার ওপর দিয়ে।

ভিগু বলল, হারামজাদা।

এইচ. পি. বললেন, এমন সুন্দর পাখিগুলো কি দোষ করল?

দোষ? ব্যাটারা তো ফসল খেয়ে শেষ করে দেয়। আর একমাস পরেই মকাই পাকবে। পেকে গেলে তার ওপরে এক ঝাঁক সুগা এসে পড়লে সব মেহনত আর আশা সাফ হয়ে যাবে পনেরো মিনিটের মধ্যে। ওরা আমাদের দুশমন।

বলে কি ছেলেটি! টিয়া পাখি, চন্দনা পাখি তো শহরে মানুষদের কাছে বড়ো আদরের ধন আর জঙ্গলের মানুষদের ওরা এমন শত্রু তা তো জানা ছিল না।

দূর থেকে একটা পাখির ডাক টিউ টিউ টিউ করে ভেসে আসছিল।

এইচ. পি. শুধোলেন, ওটা কি পাখি?

কালি তিত্তর। তিত্তরভি হ্যায়। তিত্তর বহুত তেজ বোলতা হ্যায়। বহত হ্যায় হিঁয়া।

ছবি দেখেছেন বটে পাখির বইয়ে, ব্ল্যাক প্যাট্রিজ। মনে পড়ল এইচ. পি-র।

এমন সময়ে কেঁয়া-আ-আ করে তীক্ষ্ণ স্বরে খুব জোরে কি একটা ডেকে উঠল সারা বনে অনুরণন তুলে।

চমকে উঠে এইচ. পি. বললেন, ই কওন জানোয়ার হ্যায় হো?

ভিগু কলকাতার ডাকসাইটে উকিল সাহেবের অজ্ঞতাতে হেসে ফেলল। বলল, ইতো মোর বা। শওন কি মাহিনামে মোর নেহি বোলেগা তো কব বোলেগা?

এই কেকাধ্বনি! অবাক হয়ে শুনলেন এইচ. পি.।

আর একটু এগিয়ে গিয়ে বাঁদিকে চেয়ে দেখলেন অনেকখানি জায়গা জুড়ে নানা গাছ—যেসব গাছের মধ্যে দু-একটি তাঁর চেনা, যেমন কেসিয়া, নড্যুলাস, গুলমোহর। জঙ্গলের গাছ তো উনি চেনেন না কিছুই।

এগুলো তো জঙ্গলের গাছ নয়।

নাই তো। দিদি অনেকগুলো লাগিয়েছেন আর দে সাহেব লাগিয়েছেন দিদিরও পাঁচ বচর আগে থেকে। এগুলো সব ফুলের গাছ। এইসব গাছের চারা ও বীজ কিনতে আসতে শুরু করেছে ডালটনগঞ্জ, রাঁচি এবং হাজারিবাগের মানুষেরা।

গাছগুলো তুমি চেনো?

না, না, আমি চিনি না। দিদি চেনে।

দিদি এখন কোথায় গেল ওই মেয়েদের নিয়ে?

স্কুলে। স্কুল আছে যে।

কোন ক্লাস অবধি পড়ানো হয় এখানে। এই সব মেয়েরাই পড়াশোনা জানে? লিখতে পড়তে জানে?

লিখা-পড়ার স্কুল নেহি সাব। ওখানে নানা হাতের কাজ শেখানো হয়। সেলাই, চামড়ার কাজ, বাঁশের ঝুড়ি বানানো, পোড়া মাটির নানা জিনিস বানানো। এই সব বানিয়ে লাতেহারের কো-অপে সাপ্লাই দেয় সব। সেখানে বিক্রি হয়। অন্যান্য নানা জায়গাতেও হয়। সেই স্কুলে চাষবাসের কাজ, মাছ চাষের কাজ এসবও শেখানো হয়। গোবর-গ্যাসের মেশিনও আছে। সোলার হিটার, সোলার লাইট।

তুমি কি ইংরেজি জানো ভিগু?

দিদি শিখিয়েছেন একটু একটু। এবারে তো আপনি এসেছেন তাই কাল সন্ধেবেলা গল্পটল্প হল। নইলে অন্য সময়ে সন্ধের পরে দিদি আমাকে আর সুরাতিরা দিদিকে ইংরেজি আর হিন্দি পড়ান। ভরতদাদা শিখতে চায় না। বলে, উমর বিত গ্যয়া।

এইচ. পি. একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। উমর বিত গ্যয়া।

আমাদের খাতা-বইও আছে। দিদি এলে খুব মজা হয় আমাদের।

দিদি কি রাঁচি হয়েই আসেন?

ঠিক নেই। অনেক সময়ে টোড়ি হয়েও আসেন, অনেক সময়ে ডালটনগঞ্জ হয়েও আসেন। এখন নাকি শক্তিপুঞ্জ বলে গাড়ি হয়েছে। কলকাতা থেকে বিকেলে রওনা হলে একেবারে ভোরে ডালটনগঞ্জে এসে পৌঁছোয়। আর ডালটনগঞ্জ থেকে বাসে সারাঙ্গার মোড়ে নামলেও রাঁচি হয়ে আসার মতোই সময় লাগে বাসে।

ডেরাতে পৌঁছোলে নাস্তা নিয়ে এল সুরাতিয়া। সুরাতিয়া এমনিতে এখানে থাকে না। দেবী এলে দেবীর জন্যেই আসে। হাতেগড়া আটার রুটি আর আলুর চোখা এবং আবার সেই চা। সকলে উঠেই জঙ্গলে হেঁটে যাওয়া-আসাতে খিদে খিদে পেয়েছিল এইচ. পি-র। খিদে যে কাকে বলে তা ভুলেই গেছেন। রাতে দু-তিনটি হুইস্কি খেলে একটু খিদে খিদে মনে হয়, ওই আর কি। খিদের মুখে এই খাবারই অমৃত বলে মনে হল। ভিগুকে জিজ্ঞেস করলেন, দুপুরে কি খাওয়া হবে?

চাউল, মুঁগ কি ডাল, বাইগন ভাজি আর চালোয়া মাছ ভাজা। মাছ যদি পায় চানোয়া। এখন নদীতে অনেক জল। মাছ পাওয়া মুশকিল। নইলে আন্ডা হতে পারে। ঠিক জানি না। দেসাহেব এলে রাঁচি থেকে রুই মাছ নিয়ে আসবেন বলেছিলেন কাল।

তোমরা কি এই চালই খাও বাড়িতে? মানে, তোমাদের গ্রামে?

আমরা? চাল? চাল তো হুজৌর শাদি-টাদির খানা থাকলেই খাই। নইলে আমরা ভাত রোজ থোড়ি খেতে পারি। রোজ ভাত তো আপনাদের মতো বড়োলোকেরাই খেতে পারে। তবে এখানে কাজ করি বলে আমি, আমরা খাই। বস্তির লোকেরা ভাত পাবে কোত্থেকে।

তা হলে তোমরা রোজ কি খাও?

বাজরার রুটি খাই, সুখা মহুয়া সিদ্ধ করে খাই, কখনও কান্দা-গেঠিও খাই। সরগুজার তেল দিয়ে ভেজেও নিই অনেক সময়।

কান্দা-গেঠিটা কি জিনিস ভিগু?

জঙ্গলের মূল বাবু। আমরাও খুঁড়ে আনি, শুয়োরেরাও খুঁড়ে খায়। ওলের মতো, তবে তেতো হয় খেতে। সারারাত ঝরনার জলে ধুয়ে নিলে তেতো একটু কমে। ধান হয় চিনামিনা, সাঁওয়া এই সব। ছোটো ছোটো চাল হয় তাতে। ওই সব ধান আমরা এই জঙ্গল পাহাড়ের মানুষেরাই চাষ করি ছোটো ছোটো জমিতে, আমরাই খাই।

নাস্তার পরে পরেই একটা জিপের শব্দ শোনা গেল। দেখা গেল, ইন্দ্রজিৎ দে সাহেব আর ওঁর স্ত্রী সুমিতা দেবী আসছেন। এখন মনে হচ্ছে এইচ. পি-র যে, ওপেল গাড়িটা রাঁচিতে ফেরত না পাঠালেই ভালো হত। বাজার দোকান করানো যেত ইচ্ছে করলে। কিন্তু পরের গাড়ি মিছিমিছি আটকে রাখতে বিবেকে বাধল। যেদিন ফিরবেন সেদিন দুপুরে আবার চলে আসবে এমনই বলে দিয়েছেন সানেকা মুণ্ডাকে। এখানে ইলেকট্রিসিটি নেই বলে মোবাইল ফোনটা রিচার্জ করা যাচ্ছে না। ব্যাটারিটা বসে গেলেই খামোখা খরচ হবে।

দেসাহেব জিপ থেকে নেমেই বললেন, আমাকে ফোনটা দিয়ে দিন, পুরো চার্জ করিয়ে পরশু নিয়ে আসব। আমারটা বরং আপনি রাখুন। পুরো চার্জ দেওয়া আছে।

থ্যাংক উ্য। তবে আপনারটা রাখার দরকার নেই। দু-দিন ফোন না থাকলে আর কি হবে। ফোন একটা যন্ত্রণা। মোবাইল ফোন আরও যন্ত্রণা।

মিসেস দে বললেন, এখানে কষ্ট হচ্ছে তো?

মিথ্যে বলব না। তা একটু হচ্ছে। তবে আনন্দও কম হচ্ছে না। আনন্দটা কষ্টের চেয়ে অনেকই বেশি।

তা হলেই ভালো। দেবী কোথায় গেল?

বলল, স্কুলে যাচ্ছি।

সেখানে তো জিপ যাবে না। একটু ছোটো নালার ওপরে ব্রিজ আছে পথে, সেটা ভেসে গেছে বানের তোড়ে গত রবিবারে। হেঁটে যাওয়া যেতে পারে কিন্তু খুব উঁচু চড়াই আছে পথে—আপনার পক্ষে অসুবিধে হবে।

হ্যাঁ। আমি পারব না।

আপনি জিপে করেই চলুন। আপনাকে ঘুরিয়ে আনি।

দেসাহেব বললেন।

কোথায়?

আরে চলুনই না। আমাদের এখানে যেদিকে পা বাড়াবেন সেদিকেই আনন্দ, সেদিকেই ছুটি, বিশেষ করে আপনার মতো মানুষের কাছে, যাঁরা ইট-চাপা ঘাসের মতো প্রকৃতি-বিবর্জিত জীবন কাটান। প্রকৃতি আর জীবন যে সমার্থক একথা কয়েকবার এলেই বুঝতে পারবেন।

সুমিতা বললেন, ওঃ। আপনার জন্যে একটু মাছ ও পাঁঠার মাংস এনেছেন উনি আর আমি এনেছি ফুল। ভুলেই গেছিলাম।

ফুল? কী ফুল?

আমার বাড়ির ফুল। স্বর্ণচাঁপা।

বাঃ।

বিছানাতে রেখে দেবেন শোবার সময়ে।

ফুলশয্যা হবে বলছেন?

ভাবলে, তাই।

থ্যাংক উ্য।

তারপর ভিণ্ডকে ডেকে বললেন, আমরা তাহলে যাচ্ছি ভিণ্ড। তুমি এগুলো সব নিয়ে গিয়ে সুরাতিয়াকে আর ভরতকে দাও, যা করার করবে। মাছটা দুপুরে রাঁধতে বলো আর মাংসটা রাতে। সাঁতলে রাখতে বলো।

জিপ স্টার্ট করার পরই সুমিতা বললেন, আমাকে বরং ঝরিয়া নালার ভাঙাব্রিজের কাছে নামিয়ে দাও। আমি স্কুলেই যাই। দেবী একা হিমশিম খাবে। আজই তো খুলছে স্কুল। অনেকদিন পরে।

ঠিক আছে যেমন বলবে।

দেসাহেব বললেন।

মাহিন্দ্রর কম্যান্ডার জিপ। দেসাহেব স্টিয়ারিং-এ, মধ্যে মিসেস দে আর বাইরের দিকে এইচ. পি.। জঙ্গলের পথে কিছুটা গিয়েই সকালে যে ফুলের গাছে ভরা বনটি দেখেছিলেন এইচ. পি. তারই পাশে এসে জিপ দাঁড় করালেন দেসাহেব। বললেন, দেখুন আমি আর দেবী মিলে যেমন ফ্লাওয়ারিং ট্রি-র বন করেছি। এই সব গাছের চারা আর বীজ বিক্রি করে আমাদের প্রজেক্টের অনেক রোজগার হবে ভবিষ্যতে। রোজগার এখনই আরম্ভ হয়ে গেছে। আসুন, নামুন, গাছগুলো চেনাই। ফুল তো এখন অধিকাংশ গাছেই নেই। আমাদের এই বনের আসল রূপ যদি দেখতে চান তো হোলির সময়ে আসুন একবার। রং-এর দাঙ্গা কাকে বলে দেখতে পাবেন।

জিপ থেকে নেমে সামনেই যে গাছটা ছিল সেটাকে দেখিয়ে বললেন, এই দেখুন সারাঙ্গা। এই গাছের নামেই আমি এই প্রজেক্টের নাম রেখেছিলাম সারাঙ্গা।

সারাঙ্গা কি হিন্দি নাম?

না, তা কেন? বাংলা নাম। ইন ফ্যাক্ট এই গাছের হিন্দি নাম আদৌ আছে কি না জানি না। থাকলেও আমার জানা নেই। এর ইংরেজি নাম আছে অবশ্য অনেকগুলো যেমন নিকারাগুয়ান শেড ট্রি, মাদার অফ কোকো, ইত্যাদি। এদের আমি নিবাস আমেরিকার ক্রান্তীয় অঞ্চলে। পর্ণমোচী গাছ এটি।

মানে?

মানে, ডিসিডুয়াস। যাদের পাতা ঝরে যায় এবং আবার গজায়। ছেলেবেলায় পড়েননি? "এসেছে শরত হিমের পরশ লেগেছে হাওয়ার পরে"... আমলকী গাছের পাতা খসানোর সময় এসেছে, এইসব? তিন থেকে আট মিটার অবধি উঁচু হয় গাছগুলো। ফেব্রুয়ারি-মার্চে ফুল আসে। তবে তিন সপ্তাহের বেশি থাকে না।

কেমন দেখতে এই সারাঙ্গার ফুল?

হালকা গোলাপি থেকে হালকা বেগুনি। নিষ্পত্র গাছে যখন ঠাসা থোকায় ফুল আসে তখন গাছতলা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। এই অঞ্চল ছাড়া আমাদের প্রজেক্টের প্রায় পুরো এলাকাতেই এই গাছ লাগিয়েছি। আর চার বছর পরে সব গাছে যখন ফুল আসতে আরম্ভ করবে তখন যা দেখাবে তা ভাবলেও রোমাঞ্চ হয়। হর্টিকালচার গার্ডেন হয়ে যাবে।

আমি শুধু এই দুটি গাছকেই চিনি, কেসিয়া নোডোসা আর গুলমোহর মানে কৃষ্ণচূড়া। আমার বাগানে আছে।

কেসিয়া নোডোসা, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া এখন ক্লিশে হয়ে গেছে। সবাই ওই গাছই চেনে এবং লাগায় অথচ আরও কত ফুলের গাছ যে আছে কী বলব। সেশ্যেলস দ্বীপপুঞ্জে এক রকমের গাছ হয় তাদের নাম ফ্ল্যামবয়ান্ট। কী আশ্চর্য লাল ফুল যে ফোটে সে গাছে। আমার এক বন্ধু নিয়ে এসে দিয়েছিল, এখানে এবং বারিয়াতুতেও লাগিয়েছিলাম। কিন্তু বাঁচাতে পারি না। সেশ্যেলস-এর Endemic গাছ। এখানের কৃষ্ণচূড়ার সঙ্গে ফ্ল্যামবয়ান্টের মিল আছে যদিও।

Endemic মানে? এইচ. পি. শুধোলেন।

মানে নেটিভ আর কি।

সুমিতা বললেন। ওই দেখুন! ওই যে ম্যাজেনটা রঙা ফুল ফুটে আছে গাছে, ওই গাছটার নামই ম্যাজেন্টা। এদেশে এসেছে এ গাছ বেশিদিন নয়। তবে এসেই খুব জনপ্রিয় হয়েছে। প্রায় সব ঋতুতেই ফুল হয়।

ওটা কি গাছ?

ওটির নাম বসন্তী। বসন্তী ফোটে। হলুদ ফুল...পাতা ঝরে যাওয়া গাছে যখন রাশি রাশি হলুদ ফুল ফোটে তখন ভারি সুন্দর দেখায়।

এইচ. পি. বললেন, এরই একটি চারা এনে দিয়েছে দেবী আমাকে ঝাড়গ্রাম-এর "হর্টিকালচারাল এরেনা" থেকে।

এখান থেকে বীজ নিয়ে গেলেই পারত। পাগলি একটা। বীজ থেকেও এই গাছ হয়। দু-তিন বছরেই ফুল দেয়। এটা ট্যাবেবুইয়া ভ্যারাইটির ফুল, হলুদ যেমন হয়, তেমন সাদা, বেগনি এবং গোলাপিও হয়। এরা বিগনোনিয়েসি গোত্রের গাছ সব।

এখানে অন্যান্য রঙের লাগালেন না ট্যাবিবুইয়া?

ভুল হয়ে গেছে। আগামী সপ্তাহেই লাগাব। এখনও বৃষ্টি হবে মাসখানেক। ধরে যাবে গাছ।

বলেই বললেন, ওই দেখুন ওই গাছটি। ওর নাম সিলভার ওক। বাংলা নামটি ভারি সুন্দর। কি নাম? রূপসী। আদি নিবাস কুইন্সল্যান্ড ও নিউ সাউথ ওয়েলস আন্দামান দ্বীপপুঞ্জেও দেখা যায় এদের। প্রজাতিগত নাম রোবাস্টা। Robust থেকে। খুব উঁচু হয় গাছগুলো প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিটার মতো। এদের ফুল আসে এপ্রিল থেকে জুনে।

এবারে সুমিতা বললেন আপনার জন্যে যে ফুল নিয়ে এলাম সেই ফুলের গাছ দেখুন, কনকচাঁপা। সেই আমাদের ছেলেবেলার ভুঁড়োশেয়ালির কনকচাঁপা। এর সংস্কৃত নাম কর্ণিকার। বাংলাতে এর আর একটি নাম আছে। মুচকুন্দ। সে নামটা আনরোম্যান্টিক। এই গাছের ফুল কিন্তু হয় বসন্তে ও গ্রীষ্মে। অনেকদিন আগে ফুল শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমাদের বারিয়াতুর প্রজেক্ট এরিয়ার মধ্যে একটি গাছ কেন যেন এখনও ফুল দিচ্ছে। হয়তো আপনি আসবেন বলেই।

দেসাহেব বললেন, ওই যে উঁচু গাছটা দেখছেন ওটি হল স্বর্ণচাঁপা। ভারতীয় বন বিভাগের সমীক্ষা অনুযায়ী এই গাছই ভারতের বনের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু গাছ। প্রায় তিরিশ মিটার অবধি উঁচু হয়। চন্দনদস্যু বীরাপ্পনের কোল্লাগালের জঙ্গলে, মানে নীলগিরি হিলসে, এরা যত বড়ো হয় তত বড়ো আর কোথাওই হয় না।

ফুল কখন হয়?

শরতে আর বসন্তে। পুজোর সময়ে আসবেন। ফুল দেখাব। গন্ধে ম-ম করবে বন তখন।

সুমিতা বললেন, সত্যি! এই তোমার দোষ। তোমাকে একবার গাছে পেলে তুমি একেবারে গেছোভূত হয়ে যাও। গাছ থেকে মোটে নামতেই চাও না। চলো এবার। আমার তো ওখান থেকে হেঁটে যেতেও প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগবে। কখন পৌছোব, কখন ফিরব, কখন তোমরা খাবে।

তোমরা না ফিরলে খাব না আমরা।

চলো।

চলো, বলে জিপে উঠলেন সকলে।

দেসাহেব বললেন, আপনাকে ফেরার সময় আবার চেনাব গাছ। আকাশমণি বা আফ্রিকার টিউলিপ আছে, শ্বেতচাঁপা, আকাশনিম, নাগলিঙ্গম সব দেখাব।

ওঁকে শিরীষ, কুর্চি আর গুলঞ্চ গাছও দেখিয়ে দিয়ো।

সুমিতা বললেন।

এইচ. পি. বললেন, আপনাদের একবার আমার রাজপুরের বাগানে নিয়ে যাব। কিন্তু বনের মধ্যে গাছপালার যা শোভা, তা কি শহরে খোলে! রাজপুরও আর আগের রাজপুর নেই। শহর হয়ে গেছে।

তার চেয়ে আপনিই বরং এখানে চলে আসুন। ঝাড়খণ্ড হওয়ার পরে তো রাঁচিই ক্যাপিটাল হয়ে গেছে। এখন আপনাদের মতো সিনিয়র কাউন্সেলের এখানে চাহিদা হবে। আপনার কথা বলছিলেন বীরু রায় এবং তাঁর জুনিয়র রবি সরকার। আপনাকে তো ওঁরা চেনেন। হয়তো এসেও পড়বেন দু একদিনের মধ্যে সারাঙ্গাতে আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

বীরু রায়? ও হ্যাঁ! হ্যাঁ! চিনি বইকী। ভালো উকিল তো। রবি সরকারকে তো ঠিক চিনলাম না।

খুব লম্বা ছ'ফিট দুই-টুই হবে, কালো, ছিপছিপে, কার্মাটোলিতে বাড়ি।

ওও হ্যাঁ চিনেছি। সে তো কলকাতাতেও আসে প্রায়ই। হাইকোর্টে নয়, অন্যান্য কোর্টে অ্যাপিয়ার করে। আমার জুনিয়র শ্যামল সেন বলছিল, সেদিন রাঁচির কথা ওঠাতে। বীরু কি সেই সার্কুলার রোডেই থাকে? কি একটা হোটেলের পেছনে যেন।

অপ্সরা।

হ্যাঁ হ্যাঁ।

লালপুরে বাড়ি না?

তার দাদা তো জজ ছিলেন রাঁচি হাইকোর্টের। বীরুর বাড়িতে জব্বর নেমন্তন্ন খাইয়েছিল একবার এবং ভালো হুইস্কি। নিজে নিয়ে এসেছিল চার লিটারের বোতল, জনি ওয়াকার ব্লু-লেবেল-এর, স্টেটস থেকে আসবার সময়। সে সব অনেক দিনের কথা।

তবে তো আপনি জানেন-চেনেনই। এখানে একটা গ্রাম অ্যাডপ্ট করে সেই গ্রামেই থেকে যান। মাসে দু তিনটে মামলা করবেন। আপনার যা ফিস তাতে একটা পুরো গ্রামের খোরপোশ চলে যাবে।

গ্রামও অ্যাডপ্ট করা যায় নাকি? আজকাল তো ছেলেমেয়ে অ্যাডপ্ট করার হিড়িক পড়েছে।

তা পড়েছে। কিন্তু পুরো গ্রাম অ্যাডপ্ট করলে তো সব ছেলেমেয়ে এবং তাদের মা-বাবারাও আপনারই পুষ্যি হবে। কত বড়ো স্যাটিসফ্যাকশন বলুন তো।

এমন হয় না কি?

হয় না? দেবী কিছু বলেনি আপনাকে?

কই না তো।

তা হলে বলবে পরে।

অ্যাডপ্ট করতে কত টাকা লাগে?

এক লাখ মতো। আপনার তো হাতের ময়লা। চলে আসুন। বি ওয়ান অফ আস। প্রকৃতির মধ্যে থাকবেন, কী ডিজেল আর পেট্রলের ধোঁয়ার মধ্যে খাবি খান কলকাতাতে চ্যাটার্জিসাহেব। কলকাতাতে কোনো মানুষে থাকে? তার অন্য কোনো উপায় থাকলে?

তা ঠিক। অন্যমনস্কের মতো বললেন, এইচ. পি। তারপর বললেন, সম্ভবত অভ্যেস থাকে। কলকাতা অজগর সাপের মতো আমাদের গিলে ফেলেছে। এখন সে নিজে যদি দয়া করে উগরে দেয় তা হলেই মুক্তি, নচেত নয়।

ততক্ষণে জিপটি সেই ভাঙা ব্রিজের নদীর কাছে এসে পৌঁছে গেছে। নদীতে প্রায় হাঁটু জল। বেশ স্রোতও আছে। মধ্যিখানে আরও বেশি হতে পারে। চ্যাটার্জিসাহেব বললেন, সুমিতাকে ওপারে যাবেন কি করে!

কেন? শাড়িটা একটু তুলে নেব। পায়ে তো গলফ শু। ভিজে গেলেও শুকিয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে।

এইচ. পি. বললেন, দেবীও কি এই ভাবেই নদী পেরিয়ে গেছে?

অবশ্যই। আর কি ভাবে যাবে! ও কি আজ জিনস পরেছিল?

হ্যাঁ।

তবে ভিজবে ওটা। মেয়েটা শাড়ি যে কেন পরে না কে জানে। এত সুন্দর দেখি আমি ওকে শাড়ি পরলে।

চ্যাটার্জিসাহেব চুপ করে রইলেন। শাড়িপরা দেবীকে দেখেননি উনি কখনওই। তবে অন্য পোশাকেও উনি যথেষ্ট সুন্দরীই দেখেন।

তারপর মিসেস দে বললেন, শাড়ি পরার এই সুবিধা।

লুঙিরও।

দেসাহেব বললেন।

ভদ্রলোক লুঙি পরে না।

টা-টা। দুপুরে দেখা হবে।

বলে, সুমিতা জিপ থেকে নেমে নদীতে নামলেন। দেসাহেব জিপটা ঘুরিয়ে নিলেন।

যেতে যেতে মাঝ-নদীতে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বললেন, আমরা মেয়েদের সঙ্গে ওখানেই কিছু খেয়েও নিতে পারি। কাজ যদি শেষ না হয় তবে তাই করব। তোমরা দুটো অবধি দেখে খেয়ে নিয়ো.কিন্তু। চ্যাটার্জিসাহেবকে উপোসি রেখো না।

এই গভীর জঙ্গলের মধ্যে একা একা অতখানি পথ যাবেন উনি? যাওয়াটা কি সেফ হবে?

চ্যাটার্জিসাহেব বললেন।

বুনো জন্তুর ভয় দিনে নেই বললেই চলে। তবে বনের জানোয়ারদের ভয় আমরা করি না। মানুষদেরই করি—তাও বনের মানুষদের নয়। শহরের জানোয়ারেরা এমন পথে সুমিতা বা দেবীকে একা পেলে জিপে উঠিয়ে নিয়ে যাবে হয়তো। শহরের মানুষমাত্রই সেক্স-স্টার্ভড। কেন এমন হয় জানি না। হয়তো প্রকৃতি-বিবর্জিত জীবন বলেই হয় এমন। এ নিয়ে গবেষণা হওয়া দরকার। এখানে শহুরে মানুষেরা নেই তাই বাঁচোয়া কিন্তু শহরের প্রভাব খুব দ্রুত এসব জায়গাতেও দূষণ ছড়াচ্ছে।

হঠাৎ? কি করে?

টিভির মাধ্যমে। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতই জানে। তবে কলকাতাতে তো হেঁটে গেলে যখন তখন বাস-মিনিবাস-গাড়ি চাপা পড়েও মরতে পারে মানুষ। এখানে বিপদ-আপদ সেই তুলনাতে নেই-ই বলতে গেলে। তাছাড়া এই পুরো অঞ্চলে সুমিতা এবং দেবীকে সকলেই চেনে, ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। আমরা তো ওদের শোষণ করতে আসিনি। সম্পূর্ণ স্বার্থহীনভাবে ওদের ভালো করতেই এসেছি। এবং ভালো করছিও। মিশনারিদের পর্যন্ত কখনও কখনও কোনও ভেস্টেড ইন্টারেস্ট থাকলেও থাকতে পারে, সে তারা যে ধর্মাবলম্বীই হন না কেন, যেমন ধর্মান্তকরণের, কিন্তু আমাদের তো কিছুমাত্রই স্বার্থ নেই। সে কথা পঞ্চাশ বর্গমাইল এলাকার মানুষে জানে। ওদের বিপদ কেউ ঘটালে তার সাংঘাতিক বিপদ ঘটাবে জঙ্গলের বাসিন্দারাই।

৬

বেলা দেড়টা নাগাদ দেসাহেব হাতঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, জিপটা নিয়ে আমি ওই ব্রিজটার কাছে গিয়ে বরং দাঁড়াই একটু। অন্তত আধ মাইল তো কম হাঁটতে হবে ওদের। যদি ফিরে আসে।

তা ঠিক।

বলেই, ভিগুকে ডেকে বললেন, দো বাজে খানা লগা দেনা। ম্যায় লওট আয়েঙ্গে। খ্যয়ের, ম্যায় নেহি ভি আয়া তো সাহাবকো বৈঠাকে মত রাখনা, সমঝা? সাহাবকো খিলা দেনা।

জি হুজৌর।

দে সাহেব চলে গেলে এইচ. পি. ভাবছিলেন, স্বামী-স্ত্রীর সমস্ত বিষয়ে সমান আগ্রহ থাকলে দাম্পত্য সম্ভবত এমনই মধুর হয়। তাছাড়া ইন্দ্রজিৎ এবং সুমিতার দম্পতিটিকে প্রকৃতিও এক অন্য মাত্রা দিয়েছে। অবিবাহিত এইচ. পি, দাম্পত্য সম্বন্ধে কিছু বোঝেন না কিন্তু এই দম্পতিটাকে দেখে বিয়ে যে কেন করেননি সময়ে তা ভেবে ভারি আক্ষেপ হচ্ছে। তবে সকলেই বলে, বিয়ে তো

দিল্লিকা লাড্ডু, যো খায়া উও পস্তায়া, যো নেহি খায়া উওভি। আবার দেবী দাম্পত্যের রকম সম্বন্ধে যা শুনেছেন তাতে গভীর ঔৎসুক্য জন্মেছে সেই দাম্পত্য সম্বন্ধেও।

তবে ওই সম্পর্ককে কি দাম্পত্য আদৌ বলা চলে?

তারপর ভাবলেন, তবে কি লাম্পট্য বলবেন? না, তাও তো নয়। ওরা তিন জনে লুকিয়ে-চুরিয়ে তো কিছুই করছে না। যা করছে তা তো বুক ফুলিয়েই করছে এবং তিন জনের একে অন্যের মধ্যে সম্ভবত এক আশ্চর্য সমঝোতাও আছে। এমন সম্পর্কের কথা আগে কোনো বইতেও পড়েননি, এইচ. পি, দেখেন তো নিই। মনে হয়, দেবী অত্যন্ত সৎ ও সাহসী মেয়ে নইলে এইচ. পি-র কাছে তাদের ওই অদ্ভুত ত্রিভুজ সম্পর্কর কথা সে একটুও লুকোছাপা না করে বলত না। তাছাড়া দেবীর সঙ্গে তাঁর আলাপই বা কত দিনের? তাও তো বলতে গেলে ফোনে ফোনেই। দেবী তো দূরভাষিণীই।

চাঁপাগাছ তলাতেই বসেছিলেন এইচ. পি। আকাশে একটু করে মেঘ জমছে। হয়তো দুপুর বা বিকেলের দিকে বৃষ্টি হবে। ঝিরঝির করে হাওয়া দিচ্ছে একটা নানা বনজ গন্ধ বয়ে। নানা রকম পাখি ডাকছে চারদিক থেকে। নাম জানেন না তাদের। আসলে তিনি কত কিছুই যে জানেন না তা এখানে না এলে বুঝতেনই না। তিনি যতটুকু জানেন তা শুধু টাকা রোজগার করতেই দরকার হয়। সে সব না জানলেও মানুষ হিসেবে তাঁর কোনও ক্ষতিই হত না। বৃষ্টির আগে দেবীরা না ফিরলে তো ভিজে ঝোড়ো কাক হয়ে যাবে। হাতে তো দু জনের কারওই কোন ছাতা-টাতাও ছিল না। এঁদের যতই দেখছেন ততই অবাক হচ্ছেন এইচ. পি। এঁরা প্রকৃতিরই কন্যা যেন।

এমন সময়ে দুটি ছেলে বছর তিরিশেক বয়স হবে, একজন দেহাতি মানুষের মাথায় দুটি ব্যাগ এবং কাঁধে একটি গিটার ঝুলিয়ে শাল বনের মধ্যে লালমাটির পথটি যেখানে বাঁক নিয়েছে সেই বাঁকটি ঘুরে ডেরার দিকে এগিয়ে এল। এক জনের পরনে জিনস আর লাল গেঞ্জি। অন্য জনের পায়জামা-পাঞ্জাবি—খদ্দরের। দু জনের চেহারাই বেশ ভালো এবং মনে হয়, ভালো পরিবারেরই ছেলে। গিটারটা দেখেই এইচ. পি. বুঝতে পারলেন এরাই দেবীর দুই সঙ্গী। গিটারের মালিকই নিশ্চয়ই বাংলা ব্যান্ড 'ঝঞ্ঝাটিয়া পাখিরা'র একজন। তবে গিটারটার মালিকানা জিনস-পরিহিতর না পায়জামা-পাঞ্জাবি পরিহিতর তা বোঝা গেল না।

ওই বাঁকের মুখে এসেই তারা দু জনে একসঙ্গে হাঁক দিয়েছিল কোই হ্যায়? আরে হ্যায় কোই? দেবীশ্রী কাঁহা হ্যায়?

এইচ. পি. বুঝলেন, দেবীর পুরো নাম তাহলে দেবীশ্রী। ছোটো করে দেবী বলে। ছোটোই তো নাম তার আবার ছাঁট-কাট-এর প্রয়োজন কি?

যে লোকটি ব্যাগ দুটি আর গিটারটি বয়ে নিয়ে আসছিল সেই গলা তুলে ডাকল আর-এ। হ্যায় কোই?

তার গলার আওয়াজে ওরা তিন জনেই একই সঙ্গে রান্নাঘর থেকে বাইরে এল। এতক্ষণ রান্নাঘর থেকে তাদের পুটুর পুটুর কথা শোনা যাচ্ছিল।

আগন্তুকদের মধ্যে একজন বলল, দেবীজি কাঁহা? দেবীশ্রী?

দিদি তো জঙ্গলমে গ্যয়ী।

বয়স্ক ভরত বলল।

জঙ্গল মে মঙ্গল।

অন্য জন বলল।

খানাপিনা কুছ মিলেগা না? উনোনে হাম লোগোঁকো বারেমে কুছ বোলকে তো গ্যয়ী।

জি হাঁ। বোলিনথী যো আপলোগ কাল ইয়া পরশু আওবে কিজিয়েগা।

এক রোজ পহলেই আ পৌছা। পহিলে পৌছ গিয়া ইসলিয়ে ক্যা ভুখা রহনা পড়ে গা?

নেহি নেহি বাবু। ই কোই বাত হুয়া? সব ইন্তেজাম হো যায়গা।

তুমহারি দিদি কব লওটেঙ্গি?

কোই ঠিক নেহি হ্যায় বাবু।

তব হামলোগ কাঁহা আরাম করেগা, কওন কামরামে ঠাহরেগা ইসব বাতায়গা কওন?

ভিগু সেই দেহাতি লোকটিকে বলল, আরে , লগন ভাইয়া, সামান সব বাঁয়াওয়ালা কামরামে রাখখো।

তারপর আগন্তুকদের দিকে ফিরে বলল, পানি—উনি পিজিয়েগা বাবু? চায়ে উয়ে লিজিয়েগা?

হাঁ। থোড়া পানি পিয়েগা আর থোড়া মাথামে ঢালেগা।

এক জন বলল, রসিকতা করে। কিন্তু ভিগু সে রসিকতা বুঝল না।

অন্য জন বলল, জঙ্গলে এলাম রাফিং করতে, দেবীর মোডাস-অপারাণ্ডি, ওয়ার্কিং প্লেস, লিভিং কমফর্টস দেখতে। আর সেই হাপিস।

তারপর ভিগুকে বলল, এই সময়ে কেউ চা খায়। দোঠো গ্লাস ঔর পানি লানে সকতা?

এবারে ওদের দেখে এইচ. পি-র মনে হল ওরা কিঞ্চিৎ ড্রাংক হয়েই এসেছে। সম্ভবত পথেই খেয়েছে। বাসে খেলে অন্য যাত্রীরা আপত্তি করতেন নিশ্চয়ই। এখন বাজে প্রায় দেড়টা। লাঞ্চ-এর আগে Boozing-এর সময় তো হয়েইছে।

ভিগু দুটি গ্লাস এবং জলের ঘটি নিয়ে এল। এক জন বলল, লোটামে পানি। ইরে বাবা। হামারা গা ঘিনঘিনি কর রহা হ্যায়। যো লেকে টাট্টিমে যাতা ওই লোটামেই পানি পিতা। অাঁ? তুম-লোগ সাচমুচ জংলি হ্যায়।

ভিগু বলল, ছাইসে বহত আচ্ছাসে মলকে উসকো বাদ আচ্ছাসে ধোকর তবহি না পিনেকে পানি লেকে আয়া।

অন্যজন বলল, ছাড় তো। সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়। বোতলটা বের কর তোর ব্যাগ থেকে। নিপ দুটো তো শেষ করে দিলাম পথেই।

'নিপ্ট ইন দ্যা বাড' কথাটা কি এই নিপ থেকেই এসেছে না কি রে?

আমি কি করে বলব। আমি কি তোর মতো বিদ্বান, কপি-রাইটার।

সেই কথাতে এইচ. পি বুঝলেন যে, পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা ছেলেটিই কিংশুক এবং অন্য জন অন্তু। অন্তুর পুরো নাম বলেনি দেবী তাঁকে।

অন্তু ব্যাগ থেকে একটা ব্লু রিব্যান্ড জিন-এর বড়ো বোতল বের করল এবং একটি ঠোঙাতে চুরমুর। তারপর কিংশুককে বলল ওরভি হ্যায়। ঘাবড়াও মত।

কিংশুক বলল, নিম্বু হ্যায়? নিম্বু?

ভিগু বলল। নেহি বাবু।

এমন সময়ে সুরাতিয়া বাইরে এল, সম্ভবত আগন্তুকদের ভালো করে দেখতে।

ভিগু বলল, আণ্ডা খাইয়ে গা আপলোঁগ?

কিসকি আণ্ডা?

অন্তু বলল।

তারপরে কিংশুক সুরাতিয়ার দিকে চেয়ে বলল, তুমহারি আণ্ডা?

এইচ. পি. ওখানে বসেছিলেন। এবার কিছু একটা বলা বা করা দরকার। তারা দেবীর লিভ-টুগেদারের পার্টনারই হোক আর যেই হোক, এনাফ ইজ এনাফ।

এইচ. পি. বললেন, আপনাদের পরিচয়?

পরিচয়?

ওরে! পরিচয়। কি পরিচয়? কার পরিচয়? আপনার কি পরিচয়? আপকি তারিফ?

আমার নাম এইচ. পি. চ্যাটার্জি।

ব্যারিস্টার?

এখন সবাই উকিল।

এইচ. পি. বললেন।

মাই! মাই! সরি স্যার। চিনতে পারি নি। অবশ্য আমরা দেখিনি তো আগে। আপনি যে এমন ধুমসো মোটা এক বুড়ো তা ভাবতেও পারিনি। দেবী এত কথা বলেছে আমাদের আপনার সম্বন্ধে।

ও হয়তো আমার পেশার কথা, নেশার কথা বলেছে, চেহারার কথা বলেনি। বলতে পারত।

তা হবে? দেবীকে আপনিই নিয়ে এলেন ফার্স্ট এসির কুপেতে করে? আপনিই সেই ফ্যাবুলাসলি রিচ ব্যারিস্টার।

ফিলদি-রিচ বল।

ইয়া। ফিলদি-রিচ। ফর আ চেঞ্জ, তুই ঠিক বলেছিস কমরেড।

তা, দেবীকে কোথায় গুম করে দিলেন চ্যাটার্জি সাব?

কাজে গেছে। হয়তো খাওয়ার আগেই চলে আসবে। কিন্তু আপনাদের পরিচয় তো পেলাম না, যদিও আন্দাজ করতে পারছি।

কেন সারা রাত ধরে দেবীর সঙ্গে এলেন, দেবী আমাদের পুরো পরিচয় দেয় নি কি? সারা রাতেও টাইম হল না?

দিয়েছে, মানে, সম্পর্কর কথাটা বলেছে কিন্তু...

বলেছে? তা জানার পরেও মিস্টার ফ্যাটসো কোন সাহসে আপনি কুপেতে দেবীর সঙ্গে রমদা-রমদি করতে করতে এলেন। সাহস তো কম নয়। আপনি শিগগিরি কিডন্যাপড হবেন। আপনাদের মতো খসসরদেরই কিডন্যাপ করা উচিত। তা না করল ব্যাটারা ভদ্রলোক পার্থ রায়বর্মনকে।

কিংশুক বলল, জিন চলবে নাকি একটু?

আমি দুপুরে খাই না বহু বছর। রাতে দুটো হুইস্কি খাই।

দুটো। যারা গুনে গুনে হুইস্কি খায় তারা মানুষ খুন করতে পারে, সুদের কারবার করতে পারে। তোমাকে, থুড়ি কি বলে ডাকা যায় বলুন তো আপনাকে। সতিনের পুংলিঙ্গ কি?

তুই না শালা কপি-রাইটার। বাংলাতে না কি তোর দারুণ ফান্ডা, কবিতা লিখিস লিটল ম্যাগ-এ, লিরিক লিখিস, আর সতিনের পুংলিঙ্গ জানিস না?

বলেই, বোতলটা দেখিয়ে বলল, ঢাল না, ঢাল।

এইচ. পি. রীতিমতো আতঙ্কিত বোধ করলেন। এই দুটি চরিত্রের সঙ্গে দেবী থাকে! দেবী সম্বন্ধেও ধারণা সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। 'স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম দেবা নঃ জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ' মনে পড়ে গেল। তারাশংকরের দুই পুরুষ নাটকের ডায়ালগ। সংস্কৃত-টংস্কৃত এইচ. পি. বিশেষ জানেন না।

অন্তু বলল, লিরিক দে লিরিক। তবে না সুর কম্পোজ করব। নে একটা বড়ো ঢোক দে, মাথা খুলে যাবে।

দাঁড়া, দাঁড়া, ভাবতে দে। এ কি শালা তোর সকালবেলার পার্জিং? কমোডে বসলাম আর হয়ে গেল। পার্জিং অবশ্যই, তবে ক্রিয়েটিভিটির পার্জিং। বাচ্চা প্রসব করার মতোই কষ্ট হয় একটা কবিতা লিখতে। বুয়েছিস। তাও সিজারিয়ান নারে শালা। নর্ম্যাল ডেলিভারি।

গিটারটা বেঁধে নিয়ে পিড়িং পিড়িং করতে লাগল অন্তু। করতে করতে বলল, দে দে। বডি এখন লিরিক চাইছে। লিরিক দে।

হঠাৎ কিংশুক বলল, এসেছে। নে ধর। গরম গরম। দাঁড়ে-বসা মুরগির ডিম যখন মুরগির পেট থেকে পড়ে তখন ক্যাচ করেছিস কি কখনও? করে থাকলে? তেমন করেই ক্যাচ কর।

যত বাতেল্লা পার্টির। দে দে লিরিক দে। বডি এখন গান চাইছে।

আজকে এই বাদল দিনে
সারাঙ্গাতে এসে
বড্ড ভালোবেসে
দেখতে পেলাম ঘ্যাম ফ্যাটসো
কাঁটাল যেন ভুঁড়ি, থুড়ি থুড়ি থুড়ি।

এরপর অন্তরা। বল বল। বডি গান চাইছে।

সে যে মোদের সতিন,
তার বাপের নাম যতীন
আর তার সাঁটুলির নাম দেবী-ই-ই-ই...
আঃ। আঃ। আঃ। মাই দেবী-ই-ই...
ঝিংকু চিকুর! ঝিংকু চিকুর! ঝিংকু চিকুর!
কিরে!
এরপর আরেঞ্জার মিউজিক দেবে।

সুর লাগা, কম্পোজিশনটা জমে গেলে 'ঝঞ্ঝাটিয়া পাখিরা'র পরের প্রোগ্রামে এটা গেয়ে দিস।

দাঁড়া না! পঞ্চম আর ধৈবত এমন করে লাগাব না! শাল্লা! ঐরাবত বের হবে। তোর মুরগির ডিম নয়। বল, বল, লিরিকটা রিপিট করে যা, সুর কম্পোজ করা কি সোজা কথা রে। এই ক্রিয়েশনের কথা যারা জানে, তারাই জানে।

তারপরই বলল, কিন্তু নোটেশন করবে কে? পরে যে ভুলে যাব। আমার কি মোটা দীনু আছে?

আমি টেপ করে নিচ্ছি, কলকাতা গিয়ে ভালুদাকে দিয়ে করিয়ে নিস।

বলেই, এইচ. পি.-র দিকে ফিরে বলল, স্যার। আপনি কি নোটেশান করতে পারেন? মানে, স্বরলিপি? দেবীজি তো আপনাকে স্যার বলেই ডাকে। আপনি আমাদেরও স্যার।

স্যার? না ষাঁড়?

আঃ হচ্ছেটা কি?

না, না, আমি বেরসিক নির্গুণ। অত বিদ্যা আমার নেই।

এইচ. পি. বললেন।

অন্তু বলল, ন্যাকা! বিনয় হচ্ছে!

কিংশুক বলল, আরগুণ না থাকলেও ছারগুণ আছে।

অন্তু বলল, আমাদের ক্ষমা করে দেবেন স্যার। খালি পেটে মাল পড়েছে, আমরা ড্রাংক হয়ে গেছি। আসলে আমরা...

কিংশুক বলল, ছাড় তো! অত এক্সপ্লানেশন কিসের? মাল তো খায় মানুষে ড্রাংক হবার জন্যেই। অত এক্সপ্লানেশান কিসের? কারও বাপের পয়সাতে খাচ্ছি কি? নিজেদের কষ্টার্জিত পয়সাতেই খাচ্ছি।

এইচ. পি. ভাবলেন বলেন, সকলের পয়সাই কষ্টার্জিত। যাদের রোজগার কম শুধুমাত্র তারাই কষ্ট করে না রোজগার করতে। তবে হ্যাঁ, কষ্টের রকমটা আলাদা আলাদা হয় অবশ্যই। কিন্তু এদের

এসব বলার মানে কি? এদের ওয়েভ-লেন্থ আর ওঁর ওয়েভ-লেন্থ একেবারেই আলাদা। এরাই যদি বাংলার যুব-সমাজের প্রতিভূ হয় তবে বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ে অবশ্যই চিন্তিত হওয়ার সময় হয়েছে।

এমন সময়ে জিপটা ফিরে এল। দেসাহেব একা। ওঁরা আসেননি।

জিপ থেকে নেমেই বললেন, ও, তোমরা এসে গেছ। এসেই বসে গেছ।

ওরা বলল, কি করব দাদা, দেবী নেই, চেনা মুখের কেউ নেই, শুধু উনি।

এসেই বসিনি, দাদা। পথেও মহুয়া আর হুইস্কির নিপ খেয়েছি।

মহুয়া পেলে কোথা থেকে?

বাস থেকে নামবার পরে ওই যে মক্কেল মাল বয়ে আনল, তাকে বলতেই সে জোগাড় করে দিল। হ্যোয়ার দেয়ার ইজ আ উইল, দেয়্যার ইজ আ ওয়ে।

তোমাদের চেনা করে নিতে আর কতক্ষণ লাগে? আলাপ আছে কি? চ্যাটার্জিসাহেবের সঙ্গে?

ছিল না। হল।

বলেই অন্তু বলল, একটা গান কম্পোজ করেছি এই মাত্র। শুনুন ইন্দ্রজিৎদা। লিরিক কিংশুক বন্দ্যোপাধ্যায়, কম্পোজিশান অন্তু দাসের।

বলেই, গানটি ধরে দিল।

গান শুনে ইন্দ্রজিৎ দে বললেন, গান-টান আমি বিশেষ বুঝি না। সুমিতা শান্তিনিকেতনে পড়েছিল, রবীন্দ্রসঙ্গীত গায় ও। তাই শুনে শুনে রবীন্দ্রসঙ্গীতই ভালো লাগে। মানুষের মনের এমন কোনও ভাব নেই যা রবীন্দ্রসঙ্গীতে নেই।

হাঃ রবিন্দরসঙ্গীত আর কে গাইবে? পীযূষদাই মরে গেলেন।

তিনি কে?

পীযূষকান্তি সরকার। তাঁর গান না হয় না শুনলেন, নামও শোনেন নি?

না।

আপনি টিভি দেখেন না?

না।

নিউজ পেপার পড়ে না?

না। সুমিতা আনন্দবাজার পড়ে। অভ্যেস, ছোটোবেলার সময় পেলে আমিও চোখ বোলাই। সেখানে কি খবর বেরিয়েছিল?

নিশ্চয়ই।

তা হলে তেমন ইম্পর্ট্যান্স দিয়ে বেরোয়নি।

আই পিটি উ্য। আর কি বলব।

কিংশুক বলল।

অন্তু বলল, পীযূষদাই মরে গেলেন। রবিন্দরসঙ্গীতও শেষ হয়ে গেল।

দেসাহেব ভিগুকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাত আর চাপিয়েছে কি না?

ভিগু বলল, ভাত তো চাপিয়েইছে বেশি করে তার ওপর মাছের ঝোলেও জল ঢেলে ঝোল বাড়িয়েছে। আলুও ভেজে দেবে সুরাতিয়াদিদি।

বেশ।

অন্তু বলল, আরেক লোটা জল আনো তো বাবা। শুধু জল দিয়ে খেতে মুখ মেরে যাচ্ছে, লেবু তো নেই-ই, জেরা মিরচা হবে?

লেবুও হবে। আমি নিয়ে এসেছি পথ থেকে। আজকে সঁাসের হাট ছিল। সুমিতা এত কিছু কিনল যে সে জন্যেই দেরি হয়ে গেল।

তারপর ভিগুকে ডেকে বললেন, দেখো ভিগু, জিপকা পিছুমে নিম্বু ঔর হরা মিরচা হ্যায়। ধো কর লাও পিরিচমে, বাবুলোগোঁকো লিয়ে।

জি হুজৌর।

এরা কি আপনাদের ক্রীতদাস নাকি? কথায় কথায় হুজৌর বলে কেন? কি বা মাইনে দেন এদের। দেওয়ার মধ্যে দু-বেলা খেতে দেন মাত্র।

সেটা ওদের চরিত্রদোষ, মানে সম্বোধনটা। পুরোনো অভ্যেসে বলে। আসলে ওরা জানে যে, আমরা ওদের সহকর্মী। লাভের জন্যে তো এই এন জি ও চালাই না আমরা। তা ওরা ভালো করেই জানে।

এখানে তো এই সারাঙ্গা না বারাঙ্গাতে তো থাকা-খাওয়ার বিস্তরই অসুবিধা। আপনার বারিয়াতুতেই গিয়ে উঠলে পারতাম আমরা। সেখানে সব কিছুই ওয়েল অর্গানাইজড। ইলেকট্রিসিটি আছে, জেনারেটর আছে। খাওয়ার ঘর, টেবল-চেয়ার, রান্নার লোক, খিদমতগার। কমোডওয়ালা অ্যাটাচড বাথ...

এই সারাঙ্গাতেও সব হবে একদিন। বারিয়াতুতে যখন প্রথম প্রজেক্ট করি তখন উদোম টাঁড় ছিল। আরম্ভ দেখেই মুষড়ে পড়লে কি হয়? আরম্ভটা তো বীজ। এই বীজ থেকেই মহীরুহ হয়।

এই আপনার দোষ দাদা, শুধু আপনারই নয়, আপনাদের সকলেরই, আপনাদের জেনারেশনের দোষই জ্ঞান দেওয়া। একটা সিম্পল কোয়েশ্চেন-এর সিম্পল আন্সার আপনারা কখনও দেবেন না। জ্ঞান ঢোকাবেন, ফিলসফাইজিং করবেন। আপনারা সবাই এক রকম।

দেসাহেব সে কথার জবাব না দিয়ে বললেন, তোমাদের খেতে তো দেরি আছে। আমরা খেয়ে নিয়ে একটু বেরবো। ঠিক আছে তো?

আপনিই তো মালিক। আপনি যা বলবেন তাই ঠিক আছে। আবার এসব ভণ্ডামির দরকার কি?

কিংশুক বলল, তা যাবেন কোন দিকে?

এই জঙ্গলেই। মিস্টার চ্যাটার্জি প্রথমবার এলেন, একটু ঘুরিয়ে সব দেখাই। কত রকম প্রজেক্ট করছি আমরা। পনেরোটি গ্রামের মানুষ এতে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে। পঞ্চায়েতও অবশ্য পুরোপুরি ইনভলভড হয়েছে। ঝাড়খণ্ড হওয়াতে আমাদের কাজের অনেক সুবিধা হয়েছে।

এম সি সি-র ঝামেলা নেই?

প্রথম প্রথম ছিল, ছিল না যে তা নয়। গাছতলাতে বসে গ্রামের মানুষের সঙ্গে মিটিং করছি হঠাৎ অটোম্যাটিক রাইফেল হাতে এম সি সির আট-দশ জন অ্যাক্টিভিস্ট যেন আকাশ থেকে পড়ল। কালোজাম খাচ্ছিলাম আমরা গাছ থেকে পেড়ে। কালোজাম দিয়েই দুপুরের খাওয়া সারছিলাম। ওদেরও দিয়ে পাশে বসতে বললাম। আমাদের প্রজেক্টের কথা বুঝিয়ে বলার পরে তারা বুঝল। গ্রামের সব লোকজনের সঙ্গেও কথা বলল। জঙ্গল পাহাড়ের মানুষের ভালোর জন্যেই যে যা করার তা করছি, নিজেদের মুনাফার জন্যে নয়, সে বিষয়ে ওরা নিশ্চিত হওয়ার পরে বলে গেল, আপনাদের কাজে যদি কেউ বাধা দিতে আসে আমাদের জানাবেন, আমরা তাদের ধড়কে দেব।

বাঃ। হিতোপদেশের গল্পর মতো শোনাচ্ছে মাইরি। না রে কিংশুক।

অন্তু বলল।

ইশপস ফেবল।

কিংশুক বলল।

তাই তো শোনাবে। আমরা যে অন্যের হিতই করছি।

দেসাহেব বললেন।

তারপর গলা তুলে বললেন, আমাদের দু জনের খাবার দাও ভিগু, বেরোব আমরা।

অন্তু বলল, রিয়্যালি, বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়। দেবী যখন আপনার আর বউদির কথা বলে উত্তেজিত হয়ে, তখন ওর মুখ-চোখের ভাব বদলে যায়। নিজের লাভ ছাড়া এই পৃথিবীতে কেউ যে কিছু করতে পারে এ কথা ভাবাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব। যারা তা করে বা করতে চায়, তারা পাগল ছাড়া আর কিছুই নয়, নয়তো ভণ্ড। তারা হয়তো কোনও Big bluff-এর অংশ। গুরুদের মতো, অমুক বাবা তমুক মায়ের মতো আপাত বুদ্ধিমান-বিদ্বান মানুষদের মেসমেরাইজ করে তারা যা বাগাবার বাগিয়ে নেয়। এইসব "কাল্ট"-এর বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করছি। একদিন হয়তো আপনাদের এই ভড়কিবাজিরও শেষ দেখব আমরা। যাঁরা আপনাদের ডোনেশন দেন তাঁদের কাছে আপনাদের এক্সপোজ করে দেব। আপনারা শেয়ানা পাগল, পাগল নন।

জেনুইন পাগলও তো হতে পারি। আফটার অল, থাকি তো রাঁচিতেই। কাঁকের মেন্টাল হসপিটাল তো কাছেই।

দেসাহেব বললেন।

সে আমরা দেখব। দেবীকে কী গুণ করেছেন আপনি এবং আপনারা জানি না আমরা কিন্তু ওকে এই চক্কর থেকে মুক্ত করবই। সে জন্যেই আসা এবারে। আপনাদের চক্কর আর এই ফ্যাটসোর খপ্পর থেকে। কলকাতার জীবন ছেড়ে, এত রকম এন্টারটেইনমেন্ট ছেড়ে এই জঙ্গলে কিসের খোঁজে বার বার আসে ও, এবার তা ভালো করে বুঝে যেতে চাই।

আশ্চর্য। দেসাহেব একটুও রাগ করলেন না। হাসলেন। বললেন, এবারে তো চার-পাঁচদিন ছুটি নিয়ে এসেছ, ভালো করে বুঝে যাও। দেখো, তারপরে দেবীর সঙ্গে তোমরাও যেন কলকাতার সব মোহ ছেড়ে এই জঙ্গলের নেশাতে মজে এই গরিবিতে শামিল না হও। সাবধানে থেকো। এই প্রকৃতি অক্টোপাসের মতো। যাকে সে ধরে, তাকে আর সে ছাড়ে না।

ওঁদের খাওয়ার নিয়ে এল ভিগু প্লাস্টিকের থালাতে করে। বাটিটাটি নেই, থালারই মধ্যে ভাতের ওপরে ডাল, আল ভাজা এবং মাছও। ভাত লাগলে আর দেবে।

থালার একপাশে কাঁচা লংকা কাঁচা পেঁয়াজ। দেসাহেব বললেন, চলুন, আমরা ও দিকে গিয়ে বসি। ওদের হয়তো অসুবিধে হবে।

আমাদের সবেতেই সুবিধে। দূরে যেতে চান, যান, অত এক্সপ্লানেশান কিসের মিস্টার দে?

এগুলো? ওগুলো দেখিয়ে চ্যাটার্জিসাহেব বললেন আতঙ্কিত গলায়।

সাহেবের পাত থেকে পেঁয়াজ কাঁচা লংকো তুলে নিয়ে যাও ভিগু। বললেন দেসাহেব।

তারপর বললেন, আরে কাঁচা পেঁয়াজের মতো এনার্জি-গিভার আর কিছুই নেই। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের শেষ দিকে বার্মার জঙ্গলে, এখন মায়ানমার, জেনারেল উইংগেট ছিলেন ব্রিটিশ আর্মির। জাপানিদের বিরুদ্ধে উইংগেটের কীর্তিকলাপ কিংবদন্তি হয়ে আছে। উইংগেট নাকি শুধু কাঁচা পেঁয়াজ খেয়েই থাকতেন। 'উইংগেটস সার্কাস' বলে খ্যাত ছিল তাঁর রেজিমেন্ট।

গন্ধ লাগে না?

আমার তো লাগে না। আর আমাকে চুমুটা খাচ্ছে কে? যে কখনো-সখনো খায়, আমার বিয়ে-করা বউ তাকেও পেঁয়াজ কাঁচা লংকা ধরিয়ে দিয়েছি। গন্ধ কাটাকুটি হয়ে যায়।

চ্যাটার্জিসাহেবদের খাওয়া হয়ে গেলে দেসাহেব দেবীর দুই সঙ্গীকে বললেন, তোমরা খুব দেরি কোরো না। কারণ, তোমাদের খাইয়ে ওরা নিজেরা খেয়ে দেয়ে বাসনপত্র মেজে আবার রাতের রান্নার বন্দোবস্ত করবে।

তারপর বললেন, রাতে কি খেতে চাও তোমরা? তোমরা হলে দেবীর গেস্ট, মহামান্য, আমার কাছে।

রাতে রাম খাব আমরা। রাম-এর সঙ্গে খিচুড়ি জমবে ভালো।

মাংসও করতে বলব। কষা মাংস। চলবে?

বাঃ। তা'লে তো জমে যাবে। আপনি গ্রেট। রিয়্যালি।

দুপুরের খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম তো করবে?

একটু মানে? লম্বা ঘুম লাগাব। ট্রেন জার্নি করে এসেছি, ঘুম তো হয়নি। আসারও ঠিক ছিল না। আনরিজার্ভড কামরাতে সেকেন্ড ক্লাসে সারা রাত প্রায় বসে বসেই এসেছি। দেবীর এই ইনফ্যাচুয়েশনটা ইনভেস্টিগেট করতে আমাদের আসাটা খুবই জরুরি ছিল। এই সারাঙ্গা এবং ফ্যাটসো এই দুটি মিথকেই আমরা এক্সপ্লোড করে যেতে চাই।

খুব ভালো। থরোলি ইনভেস্টিগেট করো। বিকেলে বা সন্ধেতে ঘুম ভেঙে উঠে চা চেয়ো, চা দেবে। ওর নাম ভিগু। সুরাতিয়া রান্নাঘর থেকে বেরোয় না। ওকে উত্যক্ত করো না ড্রিংক-ট্রিংক করে। মাথায় টাঙ্গির কোপ পড়বে।

কে মারবে?

আমাদেরও ক্লোজডসার্কিট টিভি আছে। আগন্তুকদের সব ক্রিয়াকলাপ মনিটর করা হয়। গার্ডও আছে। দেবী নিজে টাঙ্গি চালালেও আশ্চর্য হয়ো না। আমাদের এখানে আমরা সকলেই, তোমরা যাকে পাগল বলে, তাই। পাগলে কি করে আর কি করে না, তা কি বলা যায়?

ওকে। থ্যাংক উ্য ফর দ্যা ওয়ার্নিং।

কিংশুক বলল।

অন্তু বলল, এইচ. পি. চ্যাটার্জির ওপরে একটা গান কম্পোজ করলি, এবার ইন্দ্রজিৎ দে-র ওপরে আরেকটা কম্পোজ কর। ফিরলে, গিটার বাজিয়ে গেয়ে শোনাব। দেবীকেও শোনাতে হবে দুটি গানই।

বলে, দু জনেই হি হি করে মাতালের হাসি হাসতে লাগল।

৭

জিপে এক কিমি মতো গিয়ে একটা চড়াইয়ে উঠে খুব ঘন জঙ্গলের মধ্যে মালভূমির মতো একটা সমান জায়গাতে পৌঁছে ইন্দ্রজিৎবাবু বললেন, নামুন এবারে।

তারপর বললেন, আধ কিমি মতো হাঁটতে পারবেন তো? চেষ্টা করলেই পারবেন। রোজই একটু একটু করে যদি হাঁটা বাড়ান তা হলেই দেখবেন ঠিকই হাঁটতে পারছেন। কোনোই অসুবিধা হচ্ছে না। তা ছাড়া, এখানে পিয়োর অক্সিজেন। যাঁদের হার্টের অসুখ তাঁরাও এখানে এসে নওজোওয়ান হয়ে যান। আসলে শরীর তো মন বিবর্জিত নয়। মন আনন্দে থাকলেই শরীরও আনন্দে থাকে।

দুজনে কথা বলতে বলতে আধ কিমি মতো হেঁটে গিয়ে সেই মালভূমির একেবারে শেষে গিয়ে দাঁড়াল। নীচে গভীর খাদ। অত্যন্ত গভীর জঙ্গল সেখানে। বহু রকম গাছ। দুপুরের রোদে সেই জঙ্গলের বৃষ্টি ভেজা ক্লোরোফিল-উজ্জ্বল গাঢ় সবুজ পাতারা একেবারে ঝকঝক করছে।

একটা ঝরঝরানি আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন চ্যাটার্জিসাহেব?

পাচ্ছি।

এটাই হল ঝিঙ্গুরঝারি নালা। ওই নালাতেই বাঁধ দিয়েছি আমরা। ওই বাঁধের জন্যে যে জলাধার হয়েছে সেই জলাধার থেকে ক্যানাল কেটেছি দু-দিকে। এ বছর যা ফসল ফলবে তা বলার নয়।

তারপর বললেন, আমি যখন পূব-আফ্রিকার তানজানিয়ার লেক-মানিয়ারা ন্যাশনাল পার্ক-এ যাই তখন সেখানের ফরেস্ট লজে প্রথম বার সুইট-কর্ন সুপ খেয়ে ভালো লাগায় অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম। গেছিলাম জুলাই মাসে। তখন আফ্রিকাতে শীতকাল। অত বড়ো বড়ো ভুট্টার দানা ভারতের কোথাওই দেখি নি। আসার সময় শুকনো দানা নিয়ে এসেছিলাম। বারিয়াতুতে আমাদের প্রজেক্ট এরিয়ার মধ্যে একটি আলাদা বেড করে তাতে ওই ভুট্টার দানা ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। তা

থেকে যে ভুট্টা হয়েছিল তার পুরোটাই বীজ হিসেবে রেখে নানা জায়গাতে লাগিয়েছিলাম। হাজারিবাগ—গয়া রোডে মারহান ফার্মেও বীজ দিয়েছিলাম। সেই ভুট্টাই আমরা সারাজাতে লাগিয়েছি। এবারে আসুন শীতে, আপনাকে মক্কিকি রোটি আর শর্ষৌকি সাগ খাওয়াব। সুইট-কর্ন সুপ খাওয়াব। দেখবেন, কত বড়ো বড়ো দানা ভুট্টার। আর কী মিষ্টি!

তারপর বললেন, জানেন তো, এই ভুট্টাই জিম করবেট পুব-আফ্রিকার কিনিয়া থেকে এনে উত্তরপ্রদেশের হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে তাঁর কালাধুঙ্গির খামারবাড়িতেও লাগিয়েছিলেন।

তাই? আমি কি করে জানব বলুন চ্যাটার্জিসাহেব। বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি! তা আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারেরা কেন পূর্ব-আফ্রিকা থেকে ওই ভুট্টা আনান না?

বলতে পারব না। হয়তো আনান। পঞ্জাব গভর্নমেন্ট নিশ্চয়ই আনান। কি করে ফেলেছে ওরা! কৃষিকাজ করেও যে অমন বড়োলোক হওয়া যায় তা পঞ্জাব আমাদের চোখের সামনে করে দেখিয়েছে।

তারপর একটু চুপ করে, একটোক জল খেয়ে, চ্যাটার্জিসাহেব বললেন, তবে পঞ্জাবিদের অনেকই গুণ। কঠোর পরিশ্রমী তাঁরা। জেদি। ইজরায়েলিদের সঙ্গে নানা ব্যাপারে মিল আছে ওঁদের।

পঞ্জাবিদের বড়োলোক হবার আরেকটা কারণ অ্যাগ্রিকালচারাল ইনকাম-এর ওপরে ট্যাক্স নেই যে!

কেন? ট্যাক্স বসানো হয় না কেন?

কোনো কেন্দ্রীয় সরকারেরই উপায় নেই কৃষি-আয়ের ওপরে কর বসায়—। রাজ্য সরকার যে ট্যাক্স বসান তা খুদকুঁড়োর সমান। আয়কর আমরা যে-হারে দিই তার ধারে কাছেও আসে না তা। এদিকে কৃষিকাজ করেই এয়ারকন্ডিশানড খামার বাড়িতে থাকছে, এয়ারকন্ডিশনড গাড়ি চড়ছে তারা গত ত্রিশ বছর ধরে।

কেন? উপায় নেই কেন?

উপায় নেই, কারণ ভোট চলে যাবে। ভোট পেলে তবেই না গদিতে থাকা যাবে। আর গদিই যদি চলে যায় তবে দেশের ভালো দিয়ে কি হবে! সেই নেহরু সাহেবের আমল থেকেই এই ট্র্যাডিশন সমানে চলে আসছে। মুখে "গরিবি হাটাও" আর বদলে ভোট বাগাও। দেশের ভালো সত্যিই করতে চাইলে জনসংখ্যা এমন প্রলয়ংকর রূপ ধারণ করে! আমাদের দেশের সব সমস্যার গোড়াতে তো এই জনসংখ্যাই। স্বাধীনতার এত বছর পরে উৎপাদন কি বাড়েনি? সবকিছুই বেড়েছে। কিন্তু উৎপাদন যদি অ্যারিথম্যাটিক্যাল প্রগ্রেশনে বেড়ে থাকে তাহলে জনসংখ্যা বেড়েছে জিয়োমেট্রিক্যাল প্রগ্রেশানে। সমস্যার সমাধান হবে কি করে।

আপনারা ফ্যামিলি-প্ল্যানিং সম্বন্ধে কিছু কি করছেন? আপনাদের প্রজেক্টে।

করছি বইকী। একটা মিজারের কথা বলতে পারি। জঙ্গলের পাহাড়ে আমোদ বলতে মুখ্যত ছিল সঙ্গম। সন্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে দুয়ার দিয়ে জঙ্গলের মানুষ আর কি করবে? ওই একমাত্র আনন্দ ছিল।

কি করেছেন আপনারা তার বিকল্প হিসেবে?

আমরা ওদের যা "রোজ" দিই তার দশ পার্সেন্ট কেটে রেখে তার সঙ্গে আমরাও দশ পার্সেন্ট যোগ করে টাকা জমলেই ওদের ব্যাটারির ট্রানজিস্টার কিনে দিচ্ছি। তাতে নানা রকম প্রোগ্রাম শুনছে ওরা। সন্ধের পর সময় কাটছে ভালো। তা ছাড়া সেক্স-এডুকেশান ক্যাম্প আছে, নানা এন.জি.ও-কে ইনভলভ করে বার্থকন্ট্রোল পিলস, কন্ট্রাসেপটিভস ইত্যাদি বিনা পয়সাতে আমাদের সব প্রজেক্টেই বিলি করছি। চাইল্ড কেয়ার সেন্টার, ক্রেশ, এসবেরও বন্দোবস্ত করেছি। ছোটো পরিবারই যে সুখী পরিবার একথা ওরা প্রত্যেকেই এখন জেনে গেছে।

রেডিয়ো কিনে দিচ্ছেন, তো টিভি কি দোষ করল? সোলার ব্যাটারি দিয়ে ইলেকট্রিসিটি আনা যায় না?

যায়। কিন্তু এই টিভি আর টিভির বিজ্ঞাপন আর লাগামহীন সিরিয়াল আর ছবিই তো যা কিছু ভারতীয়ত্ব তার সর্বনাশ করে দিল। পেপসি আর কোক আর নেসলে কি কলগেট বা হুন্ডাই বা সোনি এরা একটিও কি ভারতীয়? এদের এই রমরমার মানে কী? দেশের টাকা বিদেশে বুক ফুলিয়ে পাচার। এদের এমপ্লয়মেন্ট পোটেনশিয়ালই বা কী? ক-জন মানুষকে চাকরি দিচ্ছে এরা।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, আসলে এত কিছুই করার আছে আমাদের এই সব প্রজেক্টসে চ্যাটার্জিসাহেব, আর আমাদের জনবল, অর্থবল এতই কম যে, তেমন কিছুই করে উঠতে পারিনি এ পর্যন্ত।

আমি কি আপনাদের কোনো সাহায্য করতে পারি। ইন্দ্রজিৎবাবু?

না। আর্থিক সাহায্য এখুনি নেব না। এখনও তার সময় হয়নি। আপনাকে বার বার আসতে হবে, আমাদের সঙ্গে হাত লাগাতে হবে। আর্থিক সাহায্যের কথা অনেক পরে। আমরা ইনভলভমেন্ট চাই, টাকা চাই না। এই সারাঙ্গা প্রজেক্টটা দেবীই বলতে গেলে একা হাতে গড়েছে, আমি আর সুমিতা সাহায্য করেছি মাত্র। বাইরের টাকার চেয়েও স্থানীয় মানুষদের উৎসাহ-উদ্দীপনা এখানের সবচেয়ে বড় স্ট্রেংথ।

দেবী বলছিল যে, এক লাখ টাকা দিলে না কি একটা গ্রাম অ্যাডপ্ট করা যায়।

বলছিল বুঝি?

দেসাহেব বললেন।

তারপর বললেন, তা অবশ্যই যায়। কিন্তু তার আগে সেই গ্রামের মানুষদের আপনাকে তো বাবা বলে মানার মতো মানসিকতাও আনতে হবে। এ তো আর মাদার টেরিজার আশ্রয় থেকে শিশুকে নিয়ে আসা নয়, আবালবৃদ্ধবনিতা সমেত একটা পুরো গ্রামের বাবা হওয়া। সেই সময়টুকু আগে দিতে হবে। যাকে বলে জেস্টেশান পিরিয়ড। আন্তরিকতাও প্রমাণ করতে হবে। তাদের পছন্দ না হলে তারা বাবা বলে মানবেই বা কেন আপনাকে?

ভেবেই উত্তেজিত বোধ করছি। সত্যিই কল্পনাতীত। একজন অকৃতদার মানুষের এত বড়ো পরিবার!! সত্যি। দেবীর কাছে আমি ভারি কৃতজ্ঞ। ও যদি না নিয়ে আসত তবে তো আসতেই পারতাম না এখানে। নিজের চোখে এসব দেখতেই পারতাম না। জানতেই পারতাম না।

তা ঠিক।

ইন্দ্রজিৎবাবু বললেন।

তারপর বললেন, দেবীর মতো অল্পবয়সি একটি মেয়ের এই প্রজেক্টে যা ইনভলভমেন্টে তার প্রকৃত মূল্যায়ন করা আমাদের পক্ষে সম্ভবই নয়। চিন্তাই করা যায় না। ও হয়তো অল্পদিনের মধ্যেই কলকাতা ছেড়ে এখানেই এসে থাকবে পাকাপাকিভাবে। তা ছাড়া, কলকাতাতে ওর অ্যাট্রাকশনটা কি? যাদের সঙ্গে ঘর করে তাদের তো দেখলেন। ওরাই হচ্ছে আপনাদের কলকাতার নব্য-বুদ্ধিজীবীর নমুনা। কোনো পালের "গোদা" বা "দাদা" ধরে দল পাকিয়ে পারস্পরিক পিঠ চুলকোনি করেই জীবন পার করে দেবে এরা। শুধু 'মুখেন মারিতং জগৎ অ্যাটিট্যুড নিয়েই তো আর চলে না। যদিও আমি প্রবাসী, তবু বাঙালি তো! এদের মতো বাঙালির স্যাম্পল দেখে লজ্জা করে আমার নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিতে। আপনারা তো কলকাতাতেই থাকেন। করতে পারেন না কিছু?

আমার বয়স হয়ে গেছে। তা ছাড়া আমি অন্য জগতের মানুষ। খেটে খেতে হয় আমাকে। আমার কথা এই সব নানা ধান্দাবাজেরা কি শুনবে? তা ছাড়া ব্যাপারটা কি জানেন? হাভাতেদের দেশে বড়োলোক হবার মতো পাপ আর নেই। বড়োলোক মাত্রই নির্গুণ। এই আটারলি নেগেটিভ

অ্যাটিটুডই সব কিছু শেষ করে দিল। অথচ প্রত্যেক হাভাতের, সে বুদ্ধিজীবীই হোক অথবা শ্রমজীবী—মনের গভীরে কিন্তু একটাই স্বপ্ন।

কি সেই স্বপ্ন?

বড়োলোক হবারই স্বপ্ন।

বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের। বামপন্থা পশ্চিমবঙ্গে নান্যপন্থা নয়। সেটা একটা ভেক। যত দুর্বুদ্ধিজীবী তারাই নানা দল পাকিয়ে লাল পতাকার তলায় গিয়ে জুটেছে। ভণ্ডামির চূড়ান্ত। ভালো মানুষ ও প্রকৃত বুদ্ধিজীবী যে নেই তা নয়, কিন্তু তাঁরা নগণ্য। এখন দুনম্বরিদেরই দিন।

দেসাহেব একটুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে থেকে হঠাৎই বললেন, ওদের মেরে আমি ঘাড় ধরে বের করে দিতাম জঙ্গলে। রাঁচির বাসে চড়িয়ে দিতাম। কিন্তু পারলাম না শুধু দেবীর কথা ভেবে।

তারপর বললেন, কেন এবং কিসের জন্যে দেবী ওই দুটো লোফারের সঙ্গে থাকে বলতে পারেন?

এইচ. পি. বললেন, না। সত্যিই পারি না। তবে দেবীকে আপনি আর সুমিতা দেবী অনেক বেশি চেনেন। আমি আর কতটুকু জানি ওকে। তবে একথা ঠিক যে ওই নৈকট্য আমার সব বুদ্ধির বাইরে। কোথায় দেবী, কোথায় ওরা! তবে একথাও ঠিক যে ওদের প্রজন্মকে আমরা হয়তো ঠিক বুঝতে পারি না। দোষটা হয়তো আমাদেরই।

তারপর বললেন, মেয়েদের বোঝা সহজ নয় জানতাম কিন্তু তা যে এতখানি কঠিন তা সত্যিই জানতাম না।

থাক ওসব আলোচনা, দেবীর সঙ্গীদের আলোচনা, দেশের বা আপনাদের কলকাতার আলোচনা, এবার একটু ডান দিকে চলুন। দেখেছেন ওই পাহাড়টা। চারদিকের সবুজের সমারোহের মধ্যে কেমন ন্যাড়া, গাছহীন।

সত্যি তো? কি করে এমন হল?

অনেকদিন আগে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ওখানে হরজাই বা পাঁচমিশেলি জঙ্গলের ক্লিয়ার-ফেলিং করেছিল কোনো এক রকম গাছের প্ল্যানটেশান করবে বলে। প্ল্যানটেশান না করলেও পাহাড় কি জমি জঙ্গল এমনি ফেলে রাখলেও তাতে হরজাই জঙ্গল গজিয়েই যায় অচিরে। প্রকৃতির মতো বড়ো জমিদার, বড়ো লেঠেল আর দ্বিতীয় নেই। অচিরে প্রকৃতি দখল নেয় ন্যাড়া জমি বা পাহাড়ের। কিন্তু এই পাহাড়ের ওদিকের ঢালে একটি গুহা আছে। সেই গুহাতে "হো"দের এক দেবতা আছেন। ক্লিয়ার-ফেলিং-এর সময়ে বন বিভাগের কাঠুরেরা ওই গুহাতে ঢুকে দেবস্থান নাকি অপবিত্র করে। সেই রাগে সেই দেও ওই পাহাড়ে বন বিভাগকে কিছুই করতে দেয়নি। তাঁর অভিশাপে ওই পাহাড়ে বন বিভাগ কোনো একটি গাছকেও বাঁচাতে পারেনি।

ওই দেবতা কেমন দেখতে?

আমাদের দেশের দেবতারা সবাই তো সাকার নন। বনে-জঙ্গলে টোটেম পুজোরই বেশি প্রচলন। নিরাকারও আছেন। এই দেও একটি গোল পাথর কিন্তু উজ্জ্বল সিঁদুরে লাল রং তার।

কী করে?

তা বলতে পারব না। ম্যাঙ্গানিজ আকরের তাল কি না জানি না, জিওলজিস্টরাই বলতে পারবেন। কোনো কোনো বছর ওই গুহার মুখে যে একটা মাত্র বড়ো শাল গাছ আছে, তাকে গাছ না বলে মহীরুহ বলাই ভালো, সেই গাছে এক জোড়া লাল-রঙা পাখি এসে বসে চৈত্রর শেষে। যে বছর আসে। সে বছর তারা থাকে দিন দশেক।

কি পাখি?

তা আমি জানি না। জঙ্গলের মানুষেরা বলে পাখি দুটি ওই লাল দেবতার পূজারি। পাখির ছদ্মবেশে আসে। যে বছর আসে সেই বছর মস্ত মেলা বসে ওই পাহাড়ের ওদিকে, গুহামুখে।

সকালে লালদেওকে পূজা চড়ায়। সারাদিন রাত ভিড় লেগে থাকে, নাচগান হয়। তারপর পাখিরা উড়ে গেলে মেলাও শেষ। স্থানীয় মানুষদের আশা এক দিন লালদেওর দয়াতে ওই পাহাড় আবার সবুজ হবে।

আপনি এসব বিশ্বাস করেন দেসাহেব?

বিশ্বাস বলতে আমরা যা বুঝি তা হয়তো করি না, আবার অবিশ্বাসও করি না। কারণ, ঘটনা তো সত্যি। যতক্ষণ না বিজ্ঞান তার কোনো প্রণিধানযোগ্য ব্যাখ্যা দিয়ে এই ঘটনাকে অপ্রমাণ না করতে পারছে ততদিন বিশ্বাস না করার কারণ নেই। যদিও আমার কোনো কুসংস্কার নেই, আমিও তো এই সারাঙ্গার মানুষদেরই মতো একজন জঙ্গলের মানুষই। আমরা তিন পুরুষ রাঁচিতেই। আমার বাবা ডাক্তার ছিলেন। তাঁর খুব শিকারের শখ ছিল আর সে জন্যেই বন পাহাড়ের যত অগম্য জায়গা, পাহাড়-চূড়া, নদী, গুহা সব জায়গাতে তাঁর যাতায়াত ছিল। বছর দশ-বারো বয়স থেকে বাবা আমাকেও সঙ্গে নিতেন। সেই কারণে আমি প্রকৃতির মধ্যেই বড়ো হয়ে উঠেছি বলতে পারেন। প্রকৃতিকে যেমন ভালোবাসতে শিখেছি ছোটোবেলা থেকে, তেমনি এক জন সরল সাধারণ আদিবাসীরই মতো তাকে ভয় করতে, মান্য করতেও শিখেছি। মনের মধ্যে এক ধরনের ধারণা তৈরি হয়ে গেছে যে ঈশ্বরবোধের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো বিরোধ নেই। ব্যাপারটা আমি ব্যাখ্যা করে বলতে পারব না। এটা অনুভূতির ব্যাপার। আপনি যদি বার বার বছরের পর বছর আসেন এখানে আপনি তখনই বুঝতে পারবেন কি আমি বলতে চাইছি।

এইচ. পি. চুপ করে ছিলেন। ভাবছিলেন, কলকাতা থেকে এ কোন রাজ্যে এসে পৌছোলেন!

চ্যাটার্জিসাহেব বললেন, এই বনের গভীরে একটা প্রাগৈতিহাসিক কদম গাছ আছে।

কদমগাছ?

হ্যাঁ। যে কদমগাছের নীচে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ কানহাইয়া বাঁশি বাজিয়ে রাধাকে ডাকতেন। দেখেননি কখনও?

না তো!

লজ্জার সঙ্গে বললেন এইচ. পি।

ওই দেখুন।

বলে, ডান দিকে আঙুল দিয়ে একটা বড়ো গাছকে দেখালেন ইন্দ্রজিৎবাবু। হলুদ গোল গোল ফল হয়ে আছে। ছেলেবেলাতে ওইরকম হলুদ পশমের বল দিয়ে তাঁরা ব্যাডমিন্টন খেলতেন তাঁদের যৌথ পরিবারের বাড়ির ছাদে। অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন এইচ. পি। কত কিই যে জানার আছে অথচ ভেবেছিলেন তিন-চারটি আইনকে নখদর্পণে এনেছেন বলেই তিনি সবই জানেন।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, সেই গাছটির কথা বলুন।

হ্যাঁ। এক গাঁওবুড়ো আমাকে নিয়ে গেছিল সেই গাছের নীচে। গাছের নীচে মস্ত চ্যাটালো পাথরের কালো একটি শিলাসন। তার ওপরে আমাকে নিয়ে বুড়ো বসল।

কতদিন আগে?

তা আজ থেকে পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে। তখন বড়ো বাঘের দাপটে এ জঙ্গলে ঢোকাই বিপদ ছিল। ঢুকলেও বেলা চারটের আগেই বন ছেড়ে চলে আসতেন মানুষ। তবে আমি তো শিকারি। আমি তো বাঘকে ভয় পাই না, বাঘের সঙ্গে মোলাকাত করার জন্যই আসতাম।

তারপর বুড়ো বলল, বুড়ো, আমার বাবাকেও জানত। বাবা সেই গাঁওবুড়োর বউকে দুরারোগ্য চীচক রোগ থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন বলে বাবাকে ডাগদারসাব হিসেবে খুবই খাতির করত গাঁওবুড়ো এবং পুরো গ্রামের লোকেরা। ওদের গ্রামের নাম ছিল চুগুর।

বুড়ো কি বলল, বলুন তারপরে।

হ্যাঁ। বুড়ো বলল তোর মনে খুব অশান্তি?

তখন আমার বয়স কুড়ি। অশান্তি বলতে, ওই বয়সেই একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছিলাম। বাবা-মা বুঝতে পেরে আমাকে কিছু দিনের জন্যে পাটনাতে সরিয়ে দিলেন। তার ওপর পড়াশুনোর চাপ তো ছিলই। বিদেশ যাওয়ার কথা। সব মিলিয়ে আমার জঙ্গলের স্বর্গ থেকে নির্বাসিত হয়ে পাটনার হই-রই-এর পরিবেশে আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করত।

বুড়োকে মাথা নাড়িয়ে জানালাম যে, হ্যাঁ। অশান্তি আছে।

জানি না, বাবা, বুড়োকে কিছু বলে রেখেছিলেন কি না।

শীতকাল। চুঙর বস্তির ফসল খেতে বুনো শুয়োর আসত, ওদের খুবই ক্ষতি করছিল বলেই আমরা শুয়োর মারতে গেছিলাম সেই গ্রামে। তখন বাবা জিপ গাড়ি কিনেছেন, গেছিলাম বাবার জিপেই।

বুড়ো বলল, তোর যাকে যা বলার আছে, যার ওপরে যত রাগ আছে, যা-ই তুই চেয়েছিস অথচ পাসনি সব কিছু এক সঙ্গে একটা দলা পাকিয়ে নে।

দলা পাকিয়ে?

আশ্চর্য হয়ে বললেন, এইচ. পি.।

হ্যাঁ। বলল, দলা পাকিয়ে।

তারপর?

তারপর সেই দলা মনে মনে ছুঁড়ে মার ওই গাছের গুঁড়িতে। তারপর একটা নুড়ি তুলে নিয়ে জোরে মার ওই গাছের কাণ্ডে। তারপর আমি চলে যাব। তুই মনটাকে স্থির করে, ওই গাছতলাতে এক ঘণ্টা বসে থাক। গাছ তোকে আশীর্বাদ দেবে। তোর সব অশান্তি দূর হয়ে যাবে।

বলে বুড়ো আমাকে সেই পাথরের ওপরে রেখে চলে গেল। বলল, এক ঘণ্টা হয়ে গেলে তোর ঘড়ি দেখে আমাকে ডাকবি, আমি আসব। কাছেই থাকব আমি তবে তোর সঙ্গে নয়।

তারপর?

তারপর কি যে হল কি বলব!

আপনি কি জোড়াসনে বসেছিলেন, মানে, কোনো মুদ্রাতে?

আরে না না চ্যাটার্জিসাহেব। চেয়ারে বসার মতো করে পাথরটার ওপরে বসেছিলাম। শীতের বিকেল। সূর্যের কমলা আলো এসে গাছপালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে সেই পাথরটা এবং আমার গায়েও এসে পড়ছিল। নানা পাখি ডাকছিল। একটা কোটরা হরিণ ব্বাক ব্বাক করে ডাকছিল নীচের নালা থেকে। বাঘ দেখে থাকবে হয়তো। টিয়ার ঝাঁক দিন শেষের খবর আবিরের মতো ছড়াতে ছড়াতে তীর বেগে উড়ে যাচ্ছিল মাথার ওপর দিয়ে। আমি মনটাকে যত সম্ভব শান্ত করে বসেছিলাম।

তারপর?

এক ঘণ্টা কখন হল আমি ঠিক জানি না তবে আমার সত্যিই ভারমুক্ত মনে হতে লাগল। মনের মধ্যে কোনো ব্যাপারেই আর কোন চিন্তা, দ্বিধা বা সংশয় রইল না। রাগ রইল না কারো ওপরে। মনটা যেন পাখির মতো হয়ে গেল, মনে হল, ওড়াউড়ি করতে পারবে যেন ইচ্ছা করলেই।

গাঁওবুড়ো হঠাৎ ডাকল, ইন্দা।

আমি চমকে উঠে ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলাম, দেড় ঘণ্টা হয়ে গেছে। মন আমার অভাবনীয়ভাবে চিন্তাশূন্য হয়ে গেছিল। সত্যি।

পরে আবার কখনও এসেছেন?

হ্যাঁ। সেই গাঁওবুড়ো কবে মরে গেছে। এখন তার ছেলে গাঁওবুড়ো। কিন্তু আমি বছরে কম করে তিন-চার বার আসিই। এ এক আশ্চর্য থেরাপি।

কোন সময় আসেন?

তার ঠিক নেই কোনোই। যখনই মনে ভার জমে, টেনশান, স্ট্রেস, রাগ, অভিমান তখনই চলে আসি এবং সম্পূর্ণ ভারমুক্ত হয়ে ফিরে যাই। সুমিতাকেও নিয়ে এসেছি অনেকবার। দেবীও যাবে বলেছে একবার। তবে ওখানে বসতে হয় একাই। অন্য কেউ সঙ্গে থাকলে হয় না। দূরে চলে যেতে হয় সঙ্গীকে।

কবে?

কী কবে?

মানে, দেবী কবে বলেছে যে যাবে ওখানে?

গতবারে এখান থেকে যাবার সময়ে বলে গেছিল যে এবারে এসে যাবে। ও পথ চেনে তো।

শেষবার এখানে কবে এসেছিল দেবী?

দিন পঁচিশেক আগে।

ও।

এইচ. পি. মনে মনে হিসেব করলেন কবে দেবী তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছিল সেই সেমিনারে নিজে এগিয়ে এসে—তা প্রায় ছ মাস তো হল।

এইচ. পি. বললেন, জিপটা নিয়ে একবার সেই ভাঙা ব্রিজটার কাছে যাবেন না? ওঁরা যদি না এসে থাকেন তবে আধ কিমি ওদের কম হাঁটতে হবে। বেলাও তো পড়ে আসছে।

হাতঘড়িতে এক ঝলক দেখে নিয়ে ইন্দ্রজিৎ দে সাহেব বললেন, হ্যাঁ! চলুন। তবে ডেরা হয়ে যেতে হবে। যদি ওঁরা ইতিমধ্যেই ফিরে এসে থাকেন। তবে সে সম্ভাবনা কম। খেতে যখন আসেননি তখন কাজ পুরো করে সন্ধের মুখে মুখেই ফিরবেন।

জিপ নিয়ে ডেরাতে যখন পৌঁছোলেন এইচ. পি-রা তখন বেলা পড়ে এসেছে। ভিগু আর ভরত বলল মেমসাহেবরা ফেরেননি।

বাবুরা কখন খেলেন?

দেসাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

এই তো একটু আগেই।

এত দেরিতে?

জি সাব। পুরো বোতলটা সাফ করে তারপরই না খেলেন।

তোমরা খেয়েছ?

হ্যাঁ, খেয়েছি একটু আগে।

তোমরা আগে খেয়ে নিলে না কেন?

মেহমানরা না গেলে কি করে খাই সাহাব। খাওয়ার কোনও জিনিস যদি কম পড়ে যেত। কেমন খান তা জানা নেই না আমাদের!

কোথায়? বাবুরা?

ঘুমুচ্ছেন। বলেছেন, ওঁরা উঠে চা চাইলে চা দিতে। নইলে ওঁদের যেন না ডাকা হয়।

ভালো করে খেয়েছেন তো? তোমরা দেখাশোনা করেছ তো ঠিক মতো।

জি সাব।

যা চেয়েছেন তাই দিয়েছ?

জি সাব। তবে একটা জিনিস ছাড়া।

সেটা কি?

সুরাতিয়ার ডিম।

ওই বাজনদার বাবুটা ভারি ঝামেলা করছিলেন, সুরাতিয়ার ডিম খাবেন বলে।

তাই?

জি সাব।

দে সাহেবের চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে এলো।

ওঁরা যখন সেই ভাঙা-ব্রিজের নদীটার কাছে পৌছোলেন তখন সূর্য পশ্চিমের জঙ্গলে হারিয়ে গেছে। গাছের পাতায় ভাদ্র শেষের গলানো রোদ মাখামাখি হয়ে আছে। একটা ময়ূর ডেকে উঠল সামনে থেকে। ওঁরা দুজনে জিপ থেকে নেমে ভেঙে যাওয়া ব্রিজের একটা পিলারের ওপর বসলেন।

দেসাহেব চ্যাটার্জিসাহেবকে বললেন, এখুনি এসে পড়বে ওরা।

তারপর কি রকম চুপ করে থেকে কি ভেবে বললেন, আমরা সবাই বুনো। দেবীও গত চার বছরে বুনো হয়ে উঠেছে। আমার মন বলছে, শহরের বাঁধন ও এবারে ছিঁড়বে। কিন্তু আমি না হয় বিবাহিত। মেয়েটা বিদেশে চলে যাওয়ার পর থেকে সুমিতাও ওর পুরো সময় দেয় মেয়েদের নানা প্রজেক্টে। কিন্তু দেবীর সামনে লম্বা জীবন পড়ে আছে। ও তো আর মিশনারি নান নয়। ওর জীবনেও তো অন্য চাহিদা আছে, ঘরের মতো ঘর বাঁধার ইচ্ছে আছে। কী করবে, তা ওই জানে। তবে ভাল্লুক বা শুয়োর বা বাঁদরের সঙ্গে ঘর করার চেয়ে ঘর না করাই ভালো। আপনি কি বলেন চ্যাটার্জিসাহেব?

আমি কি বলব? আমি কীইবা জানি। বিশেষ করে এসব ব্যাপারে, বলুন? তারপর বললেন, দেবী যে সঙ্গীদের সঙ্গে লিভ-টুগেদার করছে তাদের নিয়ে কি ও সুখী নয়?

আদৌ নয়।

আপনাকে বলেছে কখনও?

সরাসরি বলেনি। তবে আভাসে ইঙ্গিতে বলেছে। আসলে, ও আপনাকে বলেছে কি না জানি না, ওর মা-র দুটি কিডনিই খারাপ হয়ে গেছে। ওঁকে সপ্তাহে একবার ডায়ালিসিস করাতে হয় টাকার ওর খুব প্রয়োজন। বাবার মৃত্যুর পরে বাবারই এক ব্যাচেলর বন্ধুর সঙ্গে থাকেন মা। তাঁর একটা ছোটো দোকান আছে যাদবপুরে। তাঁর রোজগার সামান্যই। তবে তিনিও যতটুকু রোজগার তার সব টুকুই দেবীর মায়ের জন্যেই খরচ করেন। ওঁদের সম্পর্কটা অন্যায়ের নয়, নোংরাও নয়। শুনেছি অন্য সূত্র থেকে যে, দেবীর বাবাও জানতেন এই সম্পর্কের কথা। দুই বন্ধুই ভালোবাসতেন একই নারীকে। ছেলেবেলা থেকে এটা দেখে ও জেনেই হয়তো দেবীর কাজে দু জন পুরুষের সঙ্গ লিভ-টুগেদার করাটা অস্বাভাবিক মনে হয়নি। আমাদের এই প্রজেক্ট থেকে যা ও পায় তার সবই মাকে দিয়ে দিতে হয় ওর। তাই ওর থাকা খাওয়ার কারণেই হয়তো ওদের কাছে থাকে। তা ছাড়া যখন থাকবে বলে মনস্থির করে, তখন হয়তো ভালোবাসাও ছিল ওদের সঙ্গে। কোন মানুষ জীবনের কোন পর্যায়ে এসে কি করে, কেন করে তা শুধু সেই জানে। অন্যের পক্ষে অনুমান করা হয়তো সম্ভব, জানাটা প্রায় অসম্ভব। তা ছাড়া এই সব ব্যাপার এতই ব্যক্তিগত যে, নিজে থেকে না বললে কারোকে তো জিজ্ঞেসও করা যায় না!

তাতো ঠিকই।

এইচ. পি. বললেন।

তারপর বললেন, দেবীর মায়ের ডায়ালিসিস কোথায় হয়?

ওদের পাড়ারই একটা নার্সিংহোমে হয়। ওদের মেশিন আছে।

কোন নেফ্রোলজিস্টের আন্ডারে আছেন?

ড. বাণী ব্যানার্জি।

নার্সিংহোম-এর নাম কি জানেন?

রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে, ইউনিক নার্সিংহোম, লেক মার্কেটের কাছে শুনেছি।

ও। বললেন, এইচ. পি.। তারপর বললেন, আপনারা তো চলে যাবেন একটু পরে রাঁচিতে, তাই না?

হ্যাঁ। দে সাহেব বললেন।

গত রাতে তো আমি ছিলাম। আজ তো দেবীর সঙ্গীরা সবাই এসে গেছে। কিন্তু ওরা যদি না আসত তবে দেবী একা থাকত রাতে এই জঙ্গলে? ভয় করে না ওর?

ভয়ডর আর নেই দেবীর। ও আমাদেরই মতো হয়ে গেছে। তা ছাড়া মুসলিম এসে যাবে। মুসলিমই থাকে এখানে। এতক্ষণে হয়তো এসেও গেছে। আজ লাতেহার হয়ে আসবে। হয়তো সন্ধে নামার পরেই আসবে। তা না হলে ওর আসার আওয়াজ পাওয়া যেত।

তারপর বললেন, দেবী যখন আসে তখন দেবীর দেখাশোনা ও করে। সুরাতিয়া, ভিগু আর ভারত তো থাকেই।

এই মুসলিম কে?

সে এক ক্যারেক্টার। ছ-ফিট দু-ইঞ্চি লম্বা। কুচকুচে কালো। অলিভগ্রিন পোশাক পরে। দেখলে মনে হবে কম্যান্ডো। ও ছিল ডালটনগঞ্জের মোহন বিশ্বাসের ছিপাদোহরের জঙ্গল-ম্যানেজার। আই সি সি-র পেপার মিলে লাখ টাকার বাঁশ যেত, তার জন্যে শয়ে শয়ে কুলি লাগত আর সেই সব কুলির "মেট" ছিল ওই মুসলিম। টাইগার প্রজেক্ট হয়ে যাওয়াতে তো সব ফরেস্ট অপারেশনই বন্ধ হয়ে গেল, মোহন বিশ্বাসও মারা গেছেন—তাই ওকে আমাদের প্রজেক্টের কাজে লাগিয়েছি। সপ্তাহে একদিন করে যায় ছিপাদোহরে। সেখানেই তার পরিবার থাকে। ছেলেরাও বড়ো বড়ো হয়ে গেছে। তারা নানা জায়গাতে কাজ ও ব্যবসা করে। কিন্তু মুসলিম জঙ্গলেই সারা জীবন কাটিয়েছে তাই বাকি জীবনও কাটাতে চায়। একটা বহু পুরোনো লজঝড়ে বি এস এ মোটর সাইকেল আছে ওর। তাই চালিয়ে জঙ্গলের মধ্যের পায়ে-চলা পথ দিয়ে চলে আসে ছিপাদোহর থেকে।

বাঃ।

বাঃ না। ওদিকের জঙ্গলে তো হাতি আছে অনেক। হাতিরা মাঝে মাঝেই গণ্ডগোল করে।

কেন?

ওরা মোটর সাইকেলের শব্দ একেবারেই পছন্দ করে না। ভট ভট ভট শব্দ শুনতে পেলেই তাড়া করে আসে।

তাই?

বলেই, এইচ. পি. বললেন, একি! সন্ধে তো হয়ে এল! এবার আমারই ভয় করছে। আপনার স্ত্রী আর দেবী কি রাত নামলে ফিরবেন? ধন্যি মহিলা ওঁরা সত্যি। আপনিও ধন্যি।

টেনশন করবেন না। বনে এসে কোনো রকম মিছে চিন্তা করবেন না। বি কুল। ওঁরা এসে যাবেন। তা ছাড়া দেখুন ওদিকে চেয়ে।

এইচ. পি. বর্ষাস্নাত স্নিগ্ধ নির্মেঘ আকাশের দিকে চাইলেন।

দেখতে পাচ্ছেন?

চ্যাটার্জিসাহেব বললেন।

কি?

দেখুন পশ্চিমে সূর্য ডুবছে লাল থালার মতো আর পুবে চাঁদ উঠছে হলুদ থালার মতো। আর ওই দেখুন, পশ্চিমাকাশে সন্ধ্যাতারা। দেখছেন?

মন্ত্রমুগ্ধের মতো এইচ. পি. বললেন, হ্যাঁ।

তারপর বললেন, অনেক জঙ্গলেই বেড়াতে গেছি, বাংলোতে বসে হুইস্কি খেয়েছি, তাস খেলেছি, কলকাতার গল্প, পরনিন্দা পরচর্চা করেছি কিন্তু জঙ্গল দেখার চোখ তো ছিল না। আপনি আমাকে ইনিশিয়েট করলেন। এখন আর মুক্তি নেই মনে হচ্ছে।

এখনই তো আসল মুক্তি। মুক্তির পথই তো আপনাকে আমি চেনালাম। বন্ধনের মধ্যেই ছিলেন তো এতগুলো বছর।

একথা ঠিক। আমার যেন এমানসিপেশন হল চ্যাটার্জিসাহেব আপনার দয়াতে।

আমার দয়া নয়। দেবীই তো আপনাকে নিয়ে এল হাত ধরে। আপনার কৃতজ্ঞতা দেবীরই প্রতি থাকুক। আমরা রাঁচিতে ক-টা নাগাদ পৌঁছোবেন?

আটটা নাগাদ।

বিজুপাড়া না কি একটা জায়গা আছে না? ওখানে পৌঁছে মোবাইলে বলে দেব কুকুকে গাড়িটা পাঠাতে। কোথায় পাঠাতে বলব?

সেকি! আপনি থাকবেন না রাতে?

না।

কেন?

বলেই বললেন, বুঝতে পারছি—থাকবেন না ফর আন্ডারস্ট্যান্ডেবল রিজন্‌স। কিন্তু দেবী যে দুঃখ পাবে।

মনে হয়, দেবী বুঝবে। আমি আজ রাতে এখানে থাকলে দেবীব সামনে আমি অপমানিত হলে দেবীর সম্পর্কটা ওদের সঙ্গে হয়তো চিড় খাবে। দেবীর কোনো রকম ক্ষতি হয় তা আমি চাই না।

আপনি ম্যাগনানিমাস। তবে আমিও আপনার জাযগাতে থাকলে বোধহয় চলেই যেতাম।

তারপরই বললেন, ছেলেদুটো কি আমাব সঙ্গে ঠাট্টা করল? নইলে বিনা প্ররোচনাতে কেন এমন ব্যবহার করবে? দেবী আমার সঙ্গে এসেছে বলে তো ওদেব উত্তেজিত হবার কাবণ ছিল না।

ওরা তো অত্যাধুনিক। তা ছাড়া ওরা তো ম্যাবেডও নয়। তেমন কোনো জোবও তো নেই দেবীর ওপরে ওদের।

কী জানি! কিছু কিছু জোর থাকে যা দুর্বলতাব মোড়কে মোড়া থাকে। সেই মোড়ক খুলে দেখতে পাবলেই সেই জোরেব স্বরূপ বোঝা যায়।

দেসাহেব বললেন।

হবে হয়তো।

এইচ. পি. বললেন।

এক জোড়া প্যাঁচা উড়ে উড়ে ঝগড়া কবতে কবতে চক্রাকাবে ঘুবতে ঘুবতে চাঁদের মধ্যে ঢুকে গেল। লালচে-হলুদ অন্ধকার নেমে-আসা রাতে তাদেব অপার্থিব গলার স্বার এইচ. পি-র গাযে কাঁটা দিল। এমন সময়ে দেবী আব সমিতার গলায় স্বর শোন গেল। মনে হল, ওরা নদীব ওপাবে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

দেসাহেব বললেন, পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে এসে যাবে।

পাঁচ-সাত মিনিট লাগবে?

হ্যাঁ। এই নিস্তব্ধ জঙ্গলে আওয়াজের দূবত্ব অনুমান কবতে পাববেন আপনিও পবে। আমি ততক্ষণে জিপটা ঘুবিযে নিই।

বলেই উঠলেন দেসাহেব।

৮

চিঠিটা নিয়ে এসেছিল সোহনলাল বাবুদের ড্রাইভার সানেকা মুণ্ডা একটা ছোটো মারুতি গাড়ি নিয়ে।

পরশু বিকেলে স্যার ইন্দ্রজিৎদাদের সঙ্গে চলে গেছিলেন সন্ধের পরেই। কিংশুকরা তখনও ঘুমোচ্ছিল মিশ্র মদের নেশাতে। ওবা বলে "Sleeping it of"। ঘুম থেকে উঠেছিল প্রায় রাত দশটার সময়ে। গত কাল সারা দিন ও রাত ওরা ছিল। তবে দেবী তো কাল ভোরে উঠেই চলে গেছিল সারাঙ্গাতে। ওরা কেউই সেখানে যাওয়ার ঔৎসুক্য দেখায়নি।

গতকাল সন্ধের সময়ে ফিরে শুনেছিল দেবী যে ভিগুকে দিয়ে সুগালিয়া বস্তি থেকে মহুয়া আনিয়ে সারাদিন মহুয়া খেয়েছে এবং গিটার বাজিয়ে গান গেয়েছে ওরা দু জন। ওরা ওদের মতো করে "Enjoy" করেছে ওদের ছুটি, কিন্তু দেবীর মনে খুবই দুঃখ হয়েছিল যে ওদের মধ্যে কেউই দেবীর কাজ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখায়নি। জিজ্ঞেস পর্যন্ত করেনি দেবী সারাদিন কি করে।

প্রথম রাতে ইন্দ্রজিৎদাদের জিপ চলে গেলে ঘুম থেকে উঠে ইন্দ্রজিৎদা এবং স্যারের নিন্দাতে মুখর হয়েছিল। একজন জীবনমুখী গায়ক যেমন পরম ঔদ্ধত্যের সঙ্গে তাবৎ বয়স্কদের সম্বন্ধেই কথা বলেন, যেমন মনে করেন যে, Arrogance is synonymous to smartness। যেমন মনে করেন যে তরুণরা বুঝি চিরদিন তরুণই থাকবেন এবং প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধদের হেলিকপ্টার থেকে ওই অবস্থাতেই ধরাধামে বিধাতা নিক্ষেপ করেছিলেন কিংশুকরা তেমনই মনে করে। ওরা ভাবে, ওদের সবকিছুই ভালো, ওরা সর্বজ্ঞ, সমস্ত ট্রাডিশনই খারাপ। পূর্বসূরিদের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি পুরোনো মূল্যবোধ সবই একেবারেই অর্থহীন। ওরা বলে, বাবা-মায়ের যৌন-সুখের কারণে ওরা পৃথিবীতে এসেছে তাঁদের প্রতি বিন্দুমাত্র দায়দায়িত্ব বা কর্তব্য ওদের নেই। এইসব নানা কারণেই সাম্প্রতিক অতীত থেকে দেবীর দম বন্ধ হয়ে আসছিল। ওদের সঙ্গে থাকবে অথচ বিকল্প নিয়ে যে ভাববে। তার সময়ও ছিল না।

বালিগঞ্জ পাড়ার এক বড়োলোকের বউয়ের শাড়ির দোকান পুরোপুরি দেখাশোনা করার ভার তারই উপরে। টাকার জন্যেই করে। অথচ পার্টনার করে নিলেও বুঝত। মাইনে যদিও খারাপ দেন না কিন্তু দিনে কত লাভ হয়, বিশেষ করে পয়লা বৈশাখ ও পুজোর আগে তা দেবী ভালোই জানে। তাই যা পায়, তা ওর পরিশ্রম ও যোগ্যতা হিসেবে কিছুই নয়। কিন্তু কী করে! উপায়ও নেই। সাবাঙ্গাতে আসে যতখানি আনন্দের জন্যে, ততখানি টাকার জন্যে নয়। নো-প্রফিট অর্গানাইজেশন বেশি টাকা দেবেনই বা কী করে। তবে সারাঙ্গাতে মাঝে মাঝেই আসতে পারে বলেই সে এখনও বেঁচে আছে।

ওরা দুজনেই যে দেবীর সহবাসের সঙ্গী সে কথা এই ভিগু, ভরতদা বা সুরাতিয়াদিদি বা মুসলিমদাদারা জানে না। ভাগ্যিস জানে না! ওরা শুধুমাত্র জানে যে, দু জনের একজন দেবীর স্বামী। আর অন্যজন তার বন্ধু। কিন্তু চোখের সামনে ইন্দ্রজিৎদাদের দুজনকে দেখে তারা "ভদ্রলোকদের" সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে এসেছে এত দিন এদের দুজনকে দেখে তা নিশ্চয়ই ভেঙে গেছে। বড়ো অপমানিত বোধ করেছে দেবী। সুরাতিয়া দিদির প্রতি অশোভন আচরণ করেছে ওরা। একথা ভরতদাদা ও ভিগুর কাছে শুনেছিল দেবী। লজ্জাতে মরে গেছিল। সুরাতিয়া দিদি নিজে অবশ্য কিছুই বলেনি। শুনে, দেবীর আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়েছিল। দেবী শুনেছিল অনেকের কাছে যে, রাঁচির এক নামি বাঙালি ভদ্রলোক নাকি তার নিমফোম্যানিয়াক স্ত্রীর নির্লজ্জ বেলেল্লাপনার কারণে, চাকর ড্রাইভার প্লাম্বার মিস্ত্রি সকলের সঙ্গেই সেই মহিলার বিছানাতে যাবার প্রবণতার লজ্জা সহ্য করতে না পেরে, ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন অনেকবছর আগে।

এই কি শিক্ষার নমুনা! মদ তো এইচ. পি. চ্যাটার্জিও রোজই খান। সেদিন খেলেনও রাতে ট্রেনে। কখনও কখনও ইন্দ্রজিৎদাও খান। দেবী তো একাই ছিল কুপেতে।

কই? কোনো রকম অশালীনতা তো করেননি।

গত দু-রাত সে ঘুমোতে পারেনি। এই দুই নব জীবনের দূতের সঙ্গে দেবী কি করে কাটাল গত দেড়টা বছর! তা ভেবেই ওর বড়ো গ্লানি হচ্ছে. অথচ মায়ের কাছে থাকাটাও সম্ভব ছিল না। ওর দুঃখের কথা ওই জানে।

তার ভোলেভালা বাবার সঙ্গে, বাবার শেষ দিনকটিতে মা খুবই খারাপ ব্যবহার করেছিলেন। তার প্রেমিকেরই জন্যে। সে কথা দেবী ভুলতে পারেনি। পারবেও না কোনোদিন। আজকে সেই

পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হয়তো করছেন মা। যাই হোক, জন্মদাত্রী মা, যে ক-দিন আছেন তাঁর প্রতি সব কর্তব্যই করে যাবে দেবী। পাপ-পুণ্যের বিচার করবেন ওপরওয়ালা, যদি তিনি থেকে থাকেন।

এই ওপরওয়ালা ব্যাপারটা সম্বন্ধে তার কোনো ভয়-ভক্তি ছিল না। গত চার বছর ধরে ইন্দ্রজিৎ এবং বিশেষ করে সুমিতার সঙ্গে বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে, ঘুরে দিনরাত জঙ্গলে পাহাড়ে কাটিয়ে ওর মধ্যে একধরনের প্রকৃতি-সঞ্জাত ঈশ্বরবোধ গড়ে উঠেছে। গড়ে যে উঠেছে, সে বিষয়ে ও নিঃসন্দেহ।

ছেলেবেলাতে মায়ের হাত ধরে পুজোমণ্ডপে অঞ্জলি দিয়েছে ঠিকই। কিন্তু না বুঝে। যাঁরা অঞ্জলি দেন তাঁরা নানা rituals পালন করেন, তাঁদের বিশ্বাসে দেবী আঘাত দিতে চান না। কারণ, সেসব ভালো না খারাপ সে কথা জানার মতো বিদ্যাবুদ্ধি বা মানসিকতা ওর এখন গড়ে ওঠেনি। কিন্তু ওর মধ্যে যে প্রকৃতি-সঞ্জাত ঈশ্বরবোধ জন্মেছে তা একেবারেই অন্য জিনিস। সেটাও যে ঠিক কী তা ও ব্যাখ্যা করে বলতে পারবে না। তবে সেই বোধকে সে অন্তরের গভীরে সযত্নে ও সসম্ভ্রমে লালন করে।

৯

এইচ. পি. চ্যাটার্জির চিঠিটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ বসে ছিল দেবী। আজই দুপুরে চলে গেছে কিংশুক আর অন্তু। রাঁচির বাস ধরে। রাঁচি গিয়ে রাতে কলকাতার গাড়ি ধরবে হোটেলে খেয়ে।

আজ দেবী সারাঙ্গার বাঁধে যায়নি। বৃষ্টি যদি আরও হয় তবে বাঁধের এক জায়গাতে ফাটল দেখা দিতে পারে। চুলের মতো ফাটল দেখা দিয়েছে। আজকে ওদের বলে এসেছে যে, মুসলিম দাদার তত্ত্বাবধানে বাঁধকে মজবুত করে যেন ওরা। পাথরও অজস্রই আছে, বালিরও কোনো অভাব নেই। ট্রাকে করে সিমেন্টের বস্তা টোড়ি থেকে এনে ট্রাক যতদূর আসে, ততদূর পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে তারপর বাঁশের দোলায় বয়ে এনেছে ওরা। কাজটা আজই সারা দরকার। সিমেন্টের বস্তাগুলো একটা চাঁর গাছের তলাতে প্লাস্টিকের চাঁদোয়া খাটিয়ে তার নীচে রাখা হয়েছে। কাল রাত থেকেই আকাশে মেঘ জমছে। বৃষ্টি যে কোনো সময়েই আসতে পারে। এলে সব পণ্ড হবে কিন্তু ঝুঁকি নিয়ে মেরামত না করেও উপায় নেই কোনো। ওরা সকলেই এ কাজে ব্যস্ত থাকবে আজকে। পাতার সারের জন্য যে বড়ো বড়ো গর্তগুলো করা হয়েছে সেগুলো আরও বড়ো করা দরকার। সেগুলোর ওপরেও বাখারির আস্তরণ দিতে হবে।

সানেকা মুণ্ডাকে চা খাইয়েছিল দেবী। সে বলল, সাহেব মুরহুতে আচ্ছুরাম কালকাফ-এর গেস্ট-হাউসে আছেন। সকালে নাস্তা করেই বেরিয়ে পড়েন সোহনবাবুর সঙ্গে। আজকে বীরসা মুণ্ডা যে পাহাড়ে থাকতেন তা দেখতে যাবেন খুঁটি থেকে তামারে, গভীর বনের মধ্যে দিয়ে যে রাস্তা চলে গেছে সেই রাস্তাতে। কাল যাবেন টেবো ও চক্রধরপুর। পরশু যাবেন বলরামপুর।

সাহেব ভালো আছেন তো?

দেবী জিজ্ঞেস করেছিল।

বহুবছর হয়ে গেল অনাত্মীয় কারোর জন্যই এমন উদ্বেগ বোধ করেনি সে। নিজেকে দেখে নিজেই অবাক হল দেবী। সেদিন হাওড়া স্টেশনে এসে হাওড়া-হাটিয়া এক্সপ্রেস-এ চড়ার পর থেকে তার মধ্যে নানা রকম পরিবর্তন লক্ষ্য করছে যার কোনো ব্যাখ্যা সে জানে না।

মানেকা বলল, জি মেমসাব। সাহাব বহুত মজেমে হ্যায়।

মানেকা একটা প্যাকেট নিয়ে এসেছিল হাতে করে। তাতে নেসকাফের টিন, নর-এর চিকেন এবং টোম্যাটো সুপের গোটা বারো প্যাকেট, এক প্যাকেট লপচু চা এবং বিস্কফার্ম আর ব্রিটানিয়া কোম্পানির বিস্কিট।

মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল দেবীর। মনে মনে বলল, এসব বাহ্য ব্যাপারে প্রয়োজন বহু দিন হল ফুরিয়ে গেছে ওর। এসবের কোনো দরকার ছিল না। এইচ. পি. তাকে অন্তরের যে উষ্ণতাটুকু দিয়েছেন সেটাই যথেষ্ট। তাতেই সে স্ফুরিত হয়েছে। আসলে এইচ. পি-র সঙ্গে আলাপ না হলে ও জানতেও পেত না যে তার ভিতরে এত ফাঁকফোকর ছিল, এত ফাঁকি ছিল।

মানেকা চলে গেলে গাছতলার বেদিতে বসে সে চিঠিটা খুলল। একটু পরেই সন্ধে হয়ে যাবে। কিংশুকরা এতক্ষণে হয়তো বিজু পাড়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। ওদের সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা হয়নি আজকেও। আজকেও ওরা সকাল থেকে মহুয়া আনিয়ে জঙ্গলের মধ্যে একটি পাথরে বসে ছিল। অনেকগুলো গান; ওদের ভাষায় 'লিরিক' কম্পোজ করেছে নাকি—কিংশুক অন্তুর জন্যে। পরের মাসে নজরুল মঞ্চে 'ঝঞ্ঝাটিয়া পাখিরা' একটি অনুষ্ঠান করবে তাই অনেক গানের দরকার অন্তুর।

দেবীকে সবচেয়ে যেটা বেশি আহত করেছে তা হল ওদের দুজনের কারো মধ্যেই একটুও অনুশোচনা না দেখে। রাতে খোয়াঁরি ভাঙলে উঠে বাইরে এসে ফুটফুটে জ্যোৎস্না দেখে ওরা খুব খুশি হয়েছিল। কিংশুক বলেছিল, দেবী তোমার সেই নেকু নেকু রবীন্দ্রসঙ্গীত গাও তো একটা।

দাঁড়াও! রাম-এর বোতলটা নিয়ে আসি। রাম খেতে খেতে শুনব।

অন্তু বলেছিল, ভূত পেতনি তাড়াতে তো রাম নামই করতে হয়।

তারপরে বলেছিল, রাতে খিচুড়ি হচ্ছে তো?

সেরকমই তো শুনলাম। ইন্দ্রজিৎদাও তাই বলে দিয়েছেন। খিচুড়ি করতে আর অসুবিধা কি? সঙ্গে আর কি কি খাবে? আলুভাজা আর ডিমভাজা হচ্ছে।

সুরাতিয়ার ডিম?

দেবী প্রচণ্ড চটে উঠে ইংরেজিতে বলেছিল, এনাফ ইজ এনাফ। বিহেভ ইওরসেলভস। সকালে যা করেছ তা করেছ। আর নয়। তোমাদের ব্যবহারে আমার অতিথি অসম্মানিত হয়ে চলে গেলেন এখন আমার এখানকার সহকর্মীদেরও আমি অপমান করতে দেব না। যদি একটুও অসভ্যতা আর করো তাহলে তোমাদের এই রাতেই বড়ো রাস্তাতে পাঠিয়ে দেব। তারপরে বাঘেই খাক কি ডাকাতেই ধরুক তোমরা বুঝবে।

বাবাঃ। এত পিরিত।

অন্তু বলেছিল।

কাদের ভয় দেখাচ্ছ তুমি দেবী? আমাদের? মেয়েছেলের কি অভাব আছে আমাদের? কলকাতাতে ফিরে অ্যাড্রেস বদল করো। আমরাও আমাদের স্বাধীনতায় এহেন মেয়েছেলের এমন হস্তক্ষেপ সহ্য করব না।

সত্যি বলছি, কিন্তু মনে কোরো না। তোমাদের প্যারেন্টেজ নিয়ে আমার মনে নানা প্রশ্ন জাগছে কিছুদিন হল। সব স্বাধীনতার মধ্যেই স্বেচ্ছারোপিত কিছু পরাধীনতা সুপ্ত থাকেই। তোমরা এমনই বালখিল্য যে, সেটুকু বোঝার মতো ক্ষমতাও তোমাদের হল না। অথচ তোমরাই নিজেদের সর্বজ্ঞ ভাবো।

এসব জ্ঞান পরে দিয়ো। এখন গানটা গাও।

ইয়েস। অন্তু বলল, গানটা। সেই গানটা জোসনা রাতে সোবাই।

অন্তু বলল, গ্যাসসে বোনে।

অর্ডার দিয়ে গান হয় না।

কে বলেছে হয় না?

বলল অন্তু।

আমরা কেউ বাজারের পাখিকে অর্ডার দিলে সে গায় না গান?

সব পাখি সমান নয়।

ওকে। ওকে। কাল সকালেই আমরা ফুটে যাব।

এক্ষুনি যাও না। দ্যা সুনার উ গো দ্যা বেটার ফের এভরিওয়ান।

ইয়ার্কি পেয়েছ? কত খরচ করে এতদূর এলাম। তোমার ইচ্ছেতে ফিরে যাব? নিজেদের ইচ্ছেতে এসেছি, নিজেদের ইচ্ছেতেই যাব। আমরা স্বাধীন বাঙালি।

অন্তু বলল।

না রে! এখানে থাকব না।

কিংশুক বলল।

এখন চেপে যা। বর্ষাকাল। বড়ো বড়ো সাপ আছে। শেষে সাপের কামড় খেয়ে মরবি? তোদের শো-এর কি হবে?

গ্লাস আনতে বল না। এই ভিস্তু।

ও নাম ভিগু।

দেবী বলল।

ওই হল। আমি যে নামে ডাকব তাই ওর নাম হবে। তোমার নামও তাই হবে। তোমার নাম দেবী নয় বিদে।

ভিগু প্লাস্টিকের থালায় বসিয়ে দুটো গ্লাস এবং জলের ঘটি নিয়ে এল। তারপর দেবীকে ও জিজ্ঞেস করল, খিচুড়ির সঙ্গে কি পেঁয়াজি করবে? ভরতদাদা জিজ্ঞেস করছে।

করতে বলো। করতে বলো।

অন্তু বলে উঠল।

পেঁয়াজি ভাজো, কিন্তু পেঁয়াজি মেরো না।

এমন সময়ে মুসলিম এসে দাঁড়াল। আলোছায়ার বুটি-কাটা জমিতে আধো আলো আধো ছায়ায় তার কুচকুকে কালো ছ-ফুট দুইঞ্চি মূর্তি দেখে ওর দুজনেই বেশ ভড়কে গেল।

এ আবার কোন কাঁড়িয়া পিরেত বা?

কিংশুক বলল।

কাঁড়িয়া পিরেত তো ধুতি পিন্দতে থে। তুমি কে বাওয়া লুঙি পরা ভূত?

ওঁর নাম মুসলিম ভাই। আমাদের এখানে ম্যানেজার। শুধু হাতে একটা চিতাবাঘকে মেরে ফেলেছিল। গায়ে এত জোর।

হাঃ আমরা পশ্চিমবঙ্গের ক্যালকাটার রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।

আই। "কলকাতা" বল। সুনীলদা শুনতে পেলে খুব রাগ করবে।

দেবী ভাবল, এরা ছেলেবেলাতে সেই লাইনগুলিও কি পড়েনি? 'নিজে যারে বড়ো বলে বড়ো সেই নয়, লোকে যারে বড়ো বলে বড়ো সেই হয়!' পশ্চিমবঙ্গকে এই দোষেই খেল। কী মন্ত্রী, কী আমলা, কী কেরানি, কী ফোর্থ ক্লাস কর্মচারী সকলেই গুমোরে মরল। নিজের রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যে কেউই যায় না, গেলেও সম্ভবত চোখ বন্ধ করেই যায়। নিজেদের গর্তে নিজেদের গুমোর নিয়েই পচে মরল সকলে। না করলে কোনো কাজ, না পালন করল কোনো কর্তব্য, নিজ মুখেই, চেঁচিয়ে গেল আজীবন। আমাদের মতো ভালো আর কেউই নয়। দ্যাখো। দ্যাখো। উফঃ!!! রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার! আমাদের মতো আত্মমগ্ন, দুপুরবেলার মাঠে চরেবেড়ানো ছাগলের মতো আত্মতুষ্ট, অপরিণামদর্শী, অনিয়মানুবর্তী, আত্মসম্মান-জ্ঞানহীন জাত আর ভারতে আছে কি না সন্দেহ। দুর্বুদ্ধিজীবী আর ভণ্ডদের ডিপো এই রাজ্য। স্বার্থান্বেষীদের স্বর্গ। বাঙালির যা কিছু ভালো তা আছে প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে। হয়তো বাংলাদেশিদের মধ্যেও।

ঝিরঝির করে হাওয়া দিচ্ছিল একটা পাতায় পাতায় সড়সড় শব্দ তুলে। আকাশের দিকে চেয়ে প্রার্থনা করল দেবী, আজ আর কাল যেন বৃষ্টি না হয়। দুটো দিন পেলে বাঁধটা মেরামত হয়ে যাবে। মানে মেরামতের জায়গাগুলো শুকিয়ে যাবে। দু-দিন পুরো রোদ পেলেই হবে। পরক্ষণেই ভাবল দেবী, ওর মনের ফাটা-বাঁধ কি মেরামত আদৌ হবে?

চিঠিটা এবারে খুলল দেবী। আলো থাকতে থাকতেই চিঠিটা পড়ে ফেলবে। যদিও চিঠিতে কি থাকতে পারে তা অনুমান করেছে মোটামুটি, তবু কি লিখেছেন এইচ. পি তা জানতে ইচ্ছে তো করছেই খুব। বড়ো লজ্জা দেবীর, বড়ো লজ্জা।

দেবী,

কল্যাণীয়াসু,

আমি জানি যে চলে এলাম বলে তুমি খুব দুঃখ পেয়েছ কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে তোমাকে এমবারাসমেন্টের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যেই আমি চলে এলাম।

নিজ গুণে আমাকে ক্ষমা কোরো।

দোষটা কিংশুক অথবা অন্তর নয় (তার ভালো নাম তুমি আমাকে জানাওনি এবং আমারও জানার সুযোগ হয়নি) দোষটা পুরোপুরি আমারই। কিংশুকরা ওদের 'ঝঞ্ঝাটিয়া পাখিরা'র জন্যে আমার নামে যে গান কম্পোজ করেছে সেটা কি শুনেছ? না শুনে থাকলে শুনে নিয়ো।

গলার স্বর এবং সুর গান জ্ঞান দুইই ভালো এবং ওদের ভাষায় 'লিরিক'ও ভালো।

দোষটা আমার এই জন্যেই বলছি যে, প্রশংসা শুনে শুনে এবং আমার চারপাশে কিছু আজ্ঞাবহ স্বার্থান্বেষী চাটুকারও জমে যাওয়াতে আমি এই হরপ্রসাদ চ্যাটার্জি মানুষটার যে কোনো নেগেটিভ দিকও থাকতে পারে তা ভুলেই গেছিলাম। আমি এক কাচের স্বর্গের বাসিন্দা ছিলাম এতদিন। সে স্বর্গে শুধুমাত্র আমার বশংবদ মক্কেল আর আজ্ঞাবহ জুনিয়র এবং কর্মচারীদেরই বাস। অন্যভাবে বললে বলতে হয়, কোনো কোনো সফল ব্যবসাদার ও ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট সব সম্পর্ককেই মনিব ও চাকরের সম্পর্ক বলেই মনে করেন এবং কোনো সম্পর্কই যাঁদের কাছে সমতার নয়, এবং মমতারও নয়, তাঁদের অন্য কেউ হঠাৎই তাঁদের বয়স, বৈভব, তাঁদের নিজস্ব ছোট্ট জগতের খ্যাতি ও ক্ষমতার দুর্ভেদ্য বর্ম ভেদ করে যদি তাঁদের নিছক অন্য একজন সাধারণ মানুষ হিসেবেই দেখতে চায় ও দেখে, তখন সেই প্রথমোক্তদের মোহভঙ্গ হয়। গুমোরে ধাক্কা লাগে। মোহভঙ্গ হওয়া আর অপমানিত হওয়া তো এক কথা নয়।

তোমার বন্ধুরা, যাদের সঙ্গে তুমি থাকো, যাদের কাছে তুমি দ্রৌপদী, আমাকে অন্যায় কিছুই বলেনি। আমার যে বয়স হয়ে গেছে, ওপারের ডাকের জন্যেই যে আমার বসে থাকা, আমি যে কুদর্শন, পৃথুল এবং "ধুমসো" "ফ্যাটসো" সে কথাও তো একশো বার সত্যি। আমি যে ওদের তুলনাতে সচ্ছল এটাও সত্যি।

আমাদের এই গরিব দেশে আমার মতো অতি সাধারণ সফল মানুষকেও দূরবিনের উলটোদিক দিয়ে দেখে মস্ত বড়োলোক বলে মনে হতে পারে। তা হতে পারে এইজন্যেই যে, বড়োলোক কাকে বলে তা আমাদের মধ্যে কম মানুষই জানি। পশ্চিমি দুনিয়াতে যারা প্রকৃতই বড়োলোক তাদের নিজের পাহাড় থাকে, দ্বীপ থাকে, নিজস্ব সমুদ্র ও সৈকত থাকে, আকাশ এবং জলে যাতায়াতের জন্য এয়ারোপ্লেন, হেলিকপ্টার এবং সি-প্লেন থাকে। বহু গন্ডা গাড়ি থাকে, যার একটার দামই এদেশের সবচেয়ে দামি যে গাড়ি তার কুড়িটার দামের সমান। তাই আমাকেও বড়োলোক ঠাউরে ওরা ভুল যদিও করেছে, অন্যায় করেনি কোনো। কারণ, আমাদের দেশে এখনও মানুষ অভুক্ত থাকে। আমাদের দেশে বড়োলোক হওয়াটাই যথেষ্ট দোষের, তার অন্য কোনো দোষ থাক আর নাই থাক।

ওদের সবচেয়ে বেশি রাগ হয়েছে আমি তোমাকে নিয়ে ফার্স্ট এসির কুপেতে এসেছি বলে।

যেটা তুমি বোঝো, ওরা হয়তো বোঝে না। এক জন মানুষের কাছে মনটার দাম যে শরীরের দামের চেয়ে অনেকই বেশি। এ কথা ওরা সম্ভবত ওদের রগরগে যৌবন এবং শরীর-সর্বস্বতার দিনে বোঝে না। বোঝে না বলে আমি ওদের কোনো দোষও দিই না। আমার যদি ওদের মতো বয়স হতো এবং আমার ভালোবাসার সঙ্গিনীর কাছাকাছি যদি কোনো কুদৃশ্য বয়স্ক মানুষ আসার চেষ্টা করত তবে আমারও রাগ হতে পারত ওদেরই মতো। ওদের রাগটা আদৌ দূষণীয় নয়।

এত কথা বললাম এই জন্যে যে আমি চলে আসায় তুমি দুঃখ যাতে না পাও তাই সুনিশ্চিত করতে। এই "ফিলদি রিচ ফ্যাটসোর" সঙ্গে সম্পর্ক তুমি নাই বা রাখলে। না রাখলেও আমার জীবন যেমন চলছিল তেমনই চলবে। যার জীবনে প্রাপ্তি বলতে প্রকৃতই কিছু নেই তার হারানোর ভয়টাও কম। যার অনেক আছে, হারানোর দুঃখ তাকেই বাজে। যার কিছুই নেই সে কোনো উপরি পাওনা থেকে বিচ্যুত হল তার দুঃখ হবার কোনো কারণ ঘটবার কথা নয়। আমার জন্যে তুমি ভেবো না।

তুমি যে আমাকে তোমাদের সারাঙ্গাতে হাত ধরে নিয়ে এসেছিলে সে জন্যে আমি তোমার কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ। ঠিক কতখানি যে কৃতজ্ঞ তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। তোমাকে আমি প্রকৃতির মধ্যে আবিষ্কার করলাম—। যে রূপ তোমার আসল রূপ, সেই রূপকে প্রত্যক্ষ করলাম। কলকাতার জাদুঘরের আশুতোষ সেন্টিনারি হলের সেই সেমিনারের শেষে হলুদ শাড়ি আর কালো ব্লাউজ পরে একটা হলুদ বসন্ত পাখির মতো এসে তুমি আমার সঙ্গে আলাপ করেছিলে, আমার প্রশংসা করেছিলে, তারপর শুধু টেলিফোনের মাধ্যমেই তোমার সঙ্গে একটা আশ্চর্য মিষ্টি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এক দিন আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবার কথা ছিল, তাও হয়নি আমার বিচ্ছিরি কাজের জন্যে। আমরাই কাছাকাছি এলাম শুধু হাওড়া-হাটিয়া এক্সপ্রেসের ট্রেনের কামরাতে। এক সঙ্গে লাঞ্চ খেলে যেমন টেবিলের উলটো দিকে বসে গল্প করতে করতে খেতে তেমনই ট্রেনেও রাতের খাবার খেয়েছিলে তারপর ওপরের বাংকে উঠে শুয়েছিলে। সেই টুকুই আমার সঙ্গে তোমার 'সান্নিধ্য' যদি তাকে সান্নিধ্য আদৌ বলা যায়। তবে সেইটুকুই আমার কাছে অনেক। সত্যিই অনেক। সেই সুখস্মৃতিটুকু ভাঙিয়েই অনেক দিন কেটে যাবে আমার।

সেদিন তোমাকে মিথ্যে বলেছিলাম, যখন ট্রেনটা টাটিসিলোয়াই স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল। আসলে আমি সারারাত তোমারই স্বপ্নে বুঁদ হয়েছিলাম। এই প্রৌঢ়র জীবনে তোমার মতো যুবতীর সঙ্গে এক কামরায় রাত কাটানো এক অভিজ্ঞতা। এই কথাকটি তোমাকে আমার বলা দরকার, নিজেকে ছোটো করেও। দরকার এই জন্যে যে, পরে হয়তো আর সময় পাব না। আমার হাতে তোমার মতো অঢেল সময় নেই দেবীশ্রী। তোমার এখন তো সবে শুরু হল জীবন, আর আমি শেষের কাছে পৌঁছেছি, জীবন-নদীর মোহানাতে দাঁড়িয়ে আছি।

এই চিঠি তোমাকে ধন্যবাদ দেওয়ারও জন্যে। তুমি এখানে না নিয়ে এলে ইন্দ্রজিৎ ও সুমিতা দের সঙ্গে আলাপ হত না। মানুষের জীবনে প্রকৃতির ভূমিকা কি এবং কতখানি, নিজের বিত্ত, নিজের আরামের চেয়েও যে আমাদের এই গরিব দেশের মানুষদের সাচ্ছল্য, তাদের সুখবিধানের জন্যে কিছু করাটা অনেক বেশি আনন্দের, তা এখানে না এলে নিজে চোখে তোমাকে এবং ইন্দ্রজিৎবাবুদের না দেখলে জানতেও পেতাম না। এই দেবীকে দেবীর ভূমিকাতে জানতাম না। অনেক এন. জি. ও-কে জানি, কিন্তু দেসাহেবের ও তাঁর স্ত্রীর এই প্রজেক্টের মতো প্রজেক্টও যে হয় সে কথা জানতাম না। মানুষের জীবনের ওপরে, সব বয়সী মানুষেরই জীবনের ওপরে প্রকৃতির যে কি অভিঘাত, তার যে কি সুদূরপ্রসারী প্রভাব তাও জানতাম না। সত্যি বলছি, অনেক কিছুই জানতাম না।

তুমি হাত ধরে নিয়ে না এলেও আমি এখানে আবার আসব। হয়তো তোমার সারাঙ্গাতে আসব না। আশাকরি, একথা জেনে কিংশুক ও অন্তু খুশি ও আশ্বস্ত হবে।

আমি একটি গ্রাম অ্যাডপ্ট করব ভাবছি। জাস্ট ভাবছি। এখনও মনস্থির করিনি। Still toying with the idea। যদি শেষ পর্যন্ত করিই তবে সেই গ্রামকে আমি সত্যিই দেখার মতো গ্রাম করে গড়ে তুলব। খরচের কোনো কার্পণ্য করব না কিন্তু সেই খরচের মধ্যে অশিক্ষিত বড়োলোকের আত্মপ্রচারের রেশও থাকবে না। আর আমার সেই প্রজেক্টের নাম দেব দেবীশ্রী। পাছে, তোমার দুই সঙ্গী তোমার ওপরে চটে যায় তাই তোমাকে দূরে রেখে তোমার নামটা নিয়েই থাকব বাকি জীবন। তাতেও নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না তোমার। তবে আমার প্রজেক্টের যতই সব কিছুই সাধারণ হোক না কেন যে বন-বাংলোতে আমি আর আমার অতিথিরা থাকবেন সেটিতে অ্যাটাচড বাথরুম থাকবে। কমোডও থাকবে। সেপটিক ট্যাংক করে বাথরুম করব। এবং পুরোনো সব বন-বাংলোতে যেমন থাকত, বাংলোর তিনদিকে ঘোরানো বারো ফিট চওড়া বারান্দা থাকবে। সব কটা বেড়রুমেরই একটি করে দরজা থাকবে সেই ঘোরানো বারান্দার দিকে মুখ করা। সেই বারান্দাতে বড়ো বড়ো ডেক চেয়ার থাকবে—যাতে সারা দিনের পাহাড় জঙ্গল উপত্যকা পরিক্রমার পর সকাল থেকে সন্ধে পরিশ্রমের পর ইজিচেয়ারে হাতলে দুই পা তুলে দিয়ে ক্লান্তি অপনোদন করা যাবে। সারাঙ্গাতে তোমাদের দেখেই বুঝেছি যে, আরাম করা তাদেরই সাজে যারা শুধু মাথার কাজ নয়, অনেক শারীরিক পরিশ্রমও করে।

গত সন্ধেতে তোমরা যখন সারাঙ্গা থেকে ফিরে আসছিলে, আর আমি আর দেসাহেব তোমাদের অপেক্ষতে ভাঙা ব্রিজের পিলারের ওপরে বসেছিলাম তখন একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখালেন দেসাহেব। সূর্য ডুবছে আর চাঁদ উঠছে। কাল বুঝি পূর্ণিমা ছিল? পূর্ণিমা অমাবস্যা তো শহরে বোঝাই যায় না। ঠাকুমার যেদিন বাতের ব্যথা বাড়ত তখন আমাকে বলতেন, পঞ্জিকাটা দ্যাখ তো হপু, আজ নিশ্চয়ই পূর্ণিমা কি অমাবস্যা। নিদেনপক্ষে একাদশী। ঠাকুমার বাতই ছিল পূর্ণিমা অমাবস্যা জানবার নিশ্চিত উপায়। আজকের কলকাতাতে পূর্ণিমা অমাবস্যা তো অনেক বড়ো ব্যাপার, সকাল ও সন্ধে কখন আসে যায় তার খবরই বা কে রাখে। ক্ষুন্নিবৃত্তি আর আরও চাই আরও চাই এর দৌড়ে সকলেই ঘানি ঘোরানো চোখ বাঁধা বলদের মতো জীবন কাটাই। যার যা রোজগারই থাক সেই রোজগার সুষ্ঠুভাবে খরচ করার শিক্ষা আমাদের কারোওই নেই।

রিডার্স ডাইজেস্টএ একটা লেখা পড়েছিলাম, How evening comes। সন্ধে কীভাবে আসে, রাত কীভাবে শেষ হয় এইসব নির্জন মনোযোগ দিয়ে দেখার মধ্যে দিয়ে সম্ভবত মানুষ নিজের মনুষ্যত্বকে উপলব্ধি করতে পারে। লেখাটা পড়েছিলাম বহু বছর আগে কিন্তু মানে বুঝিনি। লেখাটার তাৎপর্য যেন হঠাৎ করে বুঝলাম সারাঙ্গাতে এসে।

দেসাহেব বলছিলেন, গুহার মধ্যে লাল দেবতা ও লাল পাখিদের কথা। বলছিলেন সেই মস্ত প্রায় প্রাগৈতিহাসিক কদমগাছ তলার বড়ো কালো চ্যাটালো পাথরটার কথা—সেখানে একা এক ঘণ্টা বসে থাকলে মন থেকে সব টেনশন, দ্বেষ, মালিন্য, ঈর্ষা, ক্ষোভ ধুয়ে মুছে যায়। কদমগাছ থেরাপি। সত্যি! একটা দিনেই যে কত কিছু জানলাম। শুধু জানাই নয়, কত কিছু উপলব্ধি করলাম। উপলব্ধি করলাম তোমাকেও। তোমাকে একজন প্রখর বুদ্ধিমতী, সপ্রতিভ এবং গভীর যুবতী বলেই জেনেছিলাম কলকাতাতে, তুমি যে এমন একজন ব্যক্তিত্বময়ী, কর্মী, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহীয়সী নারী সে সম্বন্ধে সামান্যতম ধারণাও ছিল না। জওহরলাল নেহরুর 'দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া' পড়েছিলাম, যখন স্কুলে পড়ি। পড়েছিলাম এ এল ব্যাশাম-এর 'দ্য ওয়ান্ডার দ্যাট ওয়াজ ইন্ডিয়া'। কিন্তু কালকে তোমার সঙ্গে এসে এবং দেসাহেবদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমার দেশ, ভারতবর্ষকে নতুন করে আবিষ্কার করলাম। আমরা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে অনেকেই পশ্চিমবঙ্গকেই ভারতবর্ষ বলে ভুল করি। পশ্চিমবঙ্গ যে ভারতবর্ষের একটা রাজ্য মাত্র এবং ভারতবর্ষ যে অনেকই বড়ো, অনেক পুরোনো, অনেকই যে আঁটে তার মধ্যে, অনেক বাধা, অনেক ব্যবধান, অনেক পরিধান, অনেক মতামত, এই সত্য উপলব্ধি করতে হলে গ্রামীণ ভারতবর্ষে বার

বার আমাদের যাওয়া দরকার, থাকা দরকার, বিভিন্ন সাধারণ মানুষের সগে মেশা দরকার।

তুমি হয়তো বলবে, তোমার স্বভাবসিদ্ধ রসবোধের সঙ্গে। "একদিনের পক্ষে জানাটা একটু বাড়াবাড়ি রকমের বেশি হয়ে গেল না?"

আমি বলব, অবশ্যই। তবে সবটুকু জানাই এখুনি চর্বণ করার জন্যে নয়। গবাদি পশুরা যেমন যাই গেলে, তাই সঙ্গে সঙ্গে চর্বণ করে না, গলার থলেতে ভরে রাখে এবং অনেক পরে একটু একটু করে সময় সুযোগ ও প্রয়োজন মতো গলা থেকে মুখে এনে খাদ্যকে চর্বণ করার পরই তা উদরস্থ করে, তেমন করেই এই একদিনের জানাকে জমিয়ে রেখে জারক রসে ভিজিয়ে, ধীরে ধীরে হজম করব।

তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি এ চিঠি। এত চিঠি নয়, আমার চলে আসার কৈফিয়ত। অত মানুষের সামনে তো এত সব কথা বলা যেত না। তোমার দুই ইন্টারেস্টিং সঙ্গীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসতে পারলাম না, আসার সময়ে। ওদের বোলো যে আমি কিছুই মনে করিনি। ওরা বরং এই মোহগ্রস্ত স্বপ্ন-দেখা বুড়োকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে বাস্তব কি তা বুঝিয়ে দিয়েছে। ওদের আমার ধন্যবাদ জানিয়ো।

কলকাতা ফিরে, যদি ইচ্ছে হয়, তবে একটি ফোন কোরো। তোমাকে লাঞ্চ খাওয়াব বলেছিলাম। সে নেমন্তন্ন আছে এখনও। মনে করালাম সে কথা। যদি আসতে চাও, তো এসো।

আম মুরহুতেই থাকব। কাল টেবো ঘাটে যাব এবং চক্রধরপুরেও। কলকাতা থেকে যখন ছুটি করেই বহুদিন পর তখন যেমন কথা ছিল তেমনই ফিরব। সত্যি কথা বলতে কি সারাঙ্গাতে যাওয়ার পরে এবং তোমার সঙ্গে আর ইন্দ্রজিৎ ও সুমিতার সঙ্গে আলাপিত হবার পরে প্রকৃতির পরশ এমনভাবে জীবনে প্রথমবার পেয়ে কলকাতাতে আর ফিরতেই ইচ্ছে করছে না।

দে দম্পতি বারবার বলেছিলেন বলে আজই সকালে বারিয়াতুতে গেছিলাম। দেসাহেবদের প্রজেক্ট সত্যি খুব ভালো লাগল দেখে। ইন্দ্রজিৎ শুধু পণ্ডিত ব্যক্তি নন, একজন অত্যন্ত প্রাণবন্ত প্রকৃতি-পরায়ণ অতিথি-পরায়ণ পুরুষ। আর ঠিক ততখানিই ভালো সুমিতা। এদের দু জনের মধ্যে যেন পুরুষ ও প্রকৃতির বাস্তবায়ন হয়েছে। তোমারই জন্যে আলাপ হল আমার ওদের সঙ্গে। সে জন্যেও কৃতজ্ঞতা জানাই আবার। এ এক পরম প্রাপ্তি আমার জীবনে। তুমি কি আমাকে বলেছিলে যে, সুমিতার আদিবাসী মহিলাদের নিয়ে যে ক্রিয়াকাণ্ড তার নাম "ভূমিকন্যা"? ওঁরা একটি মহিলা ফাউন্ডেশানও করেছেন, নাম দিয়েছেন, ভূমিকন্যা ফাউন্ডেশন। তোমরা যে কেঁচো সার বা Vermi-compost, পাতা-সার বা Leaf-compost করছ, কেমিক্যাল পেস্টিসাইডস এর বদলে Bio-pestisides করছ, নিম-করৌঞ্জ, রসুন, লংকা ইত্যাদি থেকে সে সব তো আমার জানাই ছিল না। শুনলাম যে করৌঞ্জ আর নিম-এর সার বাজার ইতিমধ্যেই ধরে নিয়েছে। সারের নাম হয়েছে ভূমিজ। ভূমিকন্যা ফেডারেশনই ওইসব প্রডাক্ট মার্কেট করছে। এছাড়াও আদিবাসী মেয়েদের কাঁথা স্টিচ-এর কাঁথা করছে এবং তাও বাজারে সমাদৃত হয়েছে। ইকোলজিকাল ফার্মও দেখালেন দেসাহেব। মাশরুম, ডেয়ারি, পোলট্রি, র‍্যাবিটরি, ডাকারি এবং সেরিকালচারও দেখলাম। এও শুনলাম যে ভবিষ্যতে লাক্ষা নিয়েও কিছু করার ভাবনাচিন্তা চলছে।

সব দেখে শুনে মনে হয়েছে মিথ্যেই শামলা এঁটে পাথর আর ইটের লাল দালানে জীবনটা "মি লর্ড। মি লর্ড!" করে কাটিয়ে দিলাম। প্রকৃতির মধ্যে থেকে প্রখর গ্রীষ্মের পরে মাটির নীচের বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম দেখা, শুকনো ডালে ডালে প্রথম গুঁড়ি গুঁড়ি কিশলয় আসতে দেখা যে কত বড়ো এক গা-শিরশিরানি অভিজ্ঞতা তা কি এখানে না এলে কখনওই জানতাম।

বারিয়াতুতে ন্যাড়া পাহাড়টিতে আর্মিকে রাজি করিয়ে হেলিকপ্টার থেকে ঘাসের বীজ ছড়িয়ে দেসাহেব কি করে সেই পাহাড়ের সবুজায়ন করেছেন তা শোনা আর কোনো যুদ্ধ জয়ের অভিজ্ঞতা একইরকম। আমি তো পুরুষ, গর্ভবতী হবার অভিজ্ঞতা কখনওই আমার হবে না। কিন্তু দেসাহেবের

এই ন্যাড়া অথবা নেড়ি পাহাড়কে সবুজাভ করে তোলার মধ্যে আমি যেন গর্ভাধানের অভিজ্ঞতাই পরোক্ষ অনুভব করলাম।

নাঃ! ঠিক করেছি এই ক্রিয়াকাণ্ডে আমিও দু-হাতে আস্তিন গুটিয়ে লেগে পড়ব। এখনও জীবনে যেটুকু সময় বাকি আছে তা কাজের মতো কাজে লাগাব। ইন্দ্রজিৎবাবুর তো সুমিতা আছেন, তুমি কি আমার ওই যজ্ঞে আমার কর্মসহচরী হবে? নর্মসহচরী তুমি কিংশুক আর অন্তুরই থাকবে—আমার কর্মসহচরী হলেই আমি সুখী।

পুনশ্চ :

একটা কথা আমার মনে হয়েছে তাই বলি।

অন্তু আর কিংশুক হয়তো পরিকল্পনা করেই নিজেদের ভিলেইন প্রতিপন্ন করাতে এসেছিল এখানে। ওরা হয়তো দেখতে চেয়েছিল আমার সম্বন্ধে তোমার মনোভাবের প্রকৃতিটা কিরকম? ওদের ওইরকম ব্যবহারে তোমার রি-অ্যাকশন কেমন হয়? আমি বিশ্বাস করি না, বিনা প্ররোচনাতে কেউ অপরিচিত কোনো বয়স্ক মানুষের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে পারে। এটা হয়তো পুরোপুরিই ভান ওদের, তোমাকে বোকা বানাবারই জন্যে।

আমার অনুরোধ এই যে, ওদের ওপরে কোনো অবিচার কোরো না। আমার কারণে অন্তত কোরো না। করলে, নিজেকে অপরাধী বলে মনে করব।

আফটার অল, ওরাই তো তোমার সব। আমি কে? আমাকে তো তুমি ভালো করে চেনোই না। ঘাটে বাঁধা থাকলে জোয়ার এলে ঢেউয়ের ছলাত ছলাত ধাক্কা লাগেই। ভুল করে সেই দোলানিটুকুকেই বিপজ্জনক ভেবে যদি নৌকো খুলে দিয়ে ভেসে পড়ো তবে বড়ো বড়ো ঢেউয়ে ছোটো তরী ডুবে যাবে। ঘাট যে পেয়েছে, সে মাঝনদীর ভয়ের কথা জানে না বলেই তার অমন ভুল করা উচিত নয় কোনো মতেই।

আমি তোমার চেয়ে অনেক বড়ো বয়সে। তোমার চেয়ে আমার অভিজ্ঞতা বেশি বলেই এই কথা লিখলাম। কিংশুক আর অন্তু খুবই ভালো ছেলে, খারাপ ছেলের অভিনয় করতে এসেছিল ওরা এবারে তোমার সারাঙ্গাতে।

ইতি— তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
এইচ. পি.

১০

এইচ. পি-র চিঠিটি পড়ার পর দেবীর শরীর মনে এক অভূতপূর্ব মন্থরতা এল। এক ধরনের অবসাদ। দূরপাল্লার দৌড়বীর দৌড় শুরু করার আগে যেমন স্থির হয়ে যান, সংকল্প কঠিন, শরীর মনের সমস্ত পেশি শিথিল হয়ে যায় তাঁর, পরে পরম কাঠিন্য আনার জন্যেই, দেবীর শরীর মনেরও এখন ঠিক তেমনই অবস্থা।

এ চিঠির জবাব কি দেবে। কেমন করে দেবে ভাবল ও সারারাত। জবাব না দিলেও হয়। উনি তো চিঠিতে কোনো প্রশ্ন রাখেন নি যে জবাব দিতে হবেই। তাঁকে জবাব দেওয়ার চেয়েও বড়ো সমস্যা হয়ে উঠছে এখন তার নিজের জীবন। তার জীবন এমনই এক প্রশ্নের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যে সেই প্রশ্নের জবাব তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। দেরি করার উপায় নেই কোনো। এবং সেই জবাবের ওপরেই তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে।

কি করবে দেবী?

বড়ো উতলা বোধ করতে লাগল ও।

রাতে সুরাতিয়া খেতে ডাকলে বলেছিল, কিছু খাবে না, শরীর ভালো নেই। এমনিতে ওরা রান্নাঘরেই খায় মেঝেতে বসে। আমকাঠের পিঁড়ি বানানো আছে, তাতেই বসে প্লাস্টিকের থালা বাটিতে খেয়ে নেয়। বাটিও অধিকাংশ সময়ে ব্যবহার করে না। গরম গরম, যাই রান্না হয় থালাতেই দিয়ে দেয় হাতা করে। অতিথিদের জন্যে বাইরে কাঠের টুল এনে দেওয়া হয়। চেয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয় গাছতলার বেদিকেই।

সারারাত মেঘ-ছেঁড়া চাঁদের আলো খেলা করে গেল তার চিন্তিত মুখের ওপরে। ঘুমোতে পারল না দেবী। শুয়ে শুয়ে নানা রাত-চরা পাখি আর ছোটো বড়ো জানোয়ারের আওয়াজ শুনল। প্রথম প্রথম ভয় পেত। আজকাল অভ্যেস হয়ে গেছে। স্বাভাবিক ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক-এর মতো মনে হয়। তারপর শেষ রাতে দুটি র‍্যাকেট টেউলড ড্রঙ্গোর ধাতব কর্কশ আওয়াজে চমকে উঠে বসল চৌপাই-এর ওপরে। তখনও অন্ধকার।

সারারাত ধরে মনের মধ্যে একটা চিঠির খসড়া করেছে শুধু। সেই চিঠি 'এইচ. পি.'র চিঠির উত্তরও বটে এবং কিংশুক ও অন্তুকেও লেখা বটে, যদি শেষ পর্যন্ত লিখে উঠতে পারে। তবে এ চিঠি ওরা হাতে পাবে না। আজ মুসলিমদাদা যাবে রাঁচিতে, ইন্দ্রজিৎদার কাছ। গত কাল লাতেহারের কো-অপ থেকে নিম আর করৌঞ্জের Bio-pesticide বিক্রির টাকা নিয়ে এসেছে হিসেব শুদ্ধ। তাই পৌঁছে দিতে যাবে। কারণ ইন্দ্রজিৎদা বেশ কিছু দিন ও পথে আসতে পারবেন না। উনি লোহারডাগার কাছের একটি গ্রামে ভূমিকন্যার একটি নতুন প্রজেক্ট-এর পত্তন নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। যদি উত্তর একটা লিখতে পারে তবে মুসলিমদাদার হাতেই পাঠিয়ে দেবে রাঁচিতে। বারিয়াতুতে পৌঁছোলে সুমিতাদি অথবা সুমনাদি ব্যাহেল সাহেবদের রাঁচির বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে পারবেন। আর ওঁরা পেলে, সে চিঠি মুরহু পৌঁছোতে সময় লাগবে না। কিন্তু কি লিখবে দেবী?

আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই বন জাগল। হাজারো পাখির কলকাকলিতে ভরে উঠল বনভূমি। দেবী ঠিক করল, চিঠিটা লেখা শেষ করে মুসলিমদাদার হাতে দিয়ে সে একবার সেই গাছতলাতে যাবে। সেখানে গিয়ে নুড়ি ছুঁড়ে দিয়ে এক ঘণ্টা বসে থাকবে। তার মন কাল থেকে বড়োই অশান্ত হয়েছে নানা কারণে। মনের শান্তি এবং মনের মধ্যে ঝড়-তোলা নানা প্রশ্নর উত্তরের জন্য তাকে আজ সেখানে যেতেই হবে। এর আগে, ওর মায়ের ডায়ালিসিস আরম্ভ হবার পর পরই একবার গেছিল সেখানে। সে সময়ে সে মায়ের এবং কাকুর কাছে গিয়ে থাকবে কি না কিংশুকদের সঙ্গে ছেড়ে তা নিয়ে মনের মধ্যে বড়ো টানাপোড়েন চলেছিল ওর। সেই টানাপোড়েনের হাতে থেকে বাঁচতেই গেছিল সে। আজকে তার জীবনে তার চেয়েও অনেক বড়ো সংশয় উপস্থিত। এই সংশয় এই সমস্যার সমাধান তাকেই করতে হবে। এই সিদ্ধান্তের ওপরে তার পুরো ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে। তাকে পরামর্শ দেবার কেউই নেই।

তারপর ভাবল, চিঠিটা এখন লিখবে না। ওই পাহাড় থেকে ঘুরে এসে তারপরই লিখবে। মনস্থির করে নিয়ে সুরাতিয়াকে বলে, দেবী চলে গেল।

ফিরে যখন এল প্রায় ঘণ্টা দুই পরে, যেতে-আসতে এক ঘণ্টা তো লাগেই, তখন রোদ উঠে গেছে। কাল বিকেল থেকে জমতে-থাকা মেঘের আস্তরণ সরে গেছে। মুসলিমদাদা, ভিগু, ভরতদাদা, সুরাতিয়া সকলের মুখেই হাসি ফুটেছে। আজকের দিনটা যদি এমন রোদ-ঝলমল থাকে তবে মেরামতি-করা বাঁধটাকে নিয়ে আর চিন্তা নেই। মুসলিম দাদাও বাঁধে যাওয়ার জন্য তৈরি।

দেবী বলল, মুসলিমদাদা তুমি আজ সুরাতিয়া দিদিকে নিয়ে যাও। এভাবে বেচারি আসার পরে রান্নাঘর থেকে এক দিনও ছুটি পায়নি। আজ ভরতদাদাই রেঁধে রাখবে, তোমরা দুপুরে এসে খেয়ো। রাঁচি রওনা হওয়ার আগে তুমি আমার কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে যেয়ো মনে করে। ভুলে যেয়ো না। আমি আজ যাব না বাঁধে সকালে। বিকেলে যাব। আমার কিছু নিজস্ব কাজ আছে।

ওরা চলে গেলে, চা খেয়ে চানটান করে এল দেবী। এখানেই যখন থাকবে তখন চান করে

উঠে—একটা লাল আর কালো খড়কে-ডুরে শাড়ি পরল। উলঙ্গ থাকা যায় না। তাই কিছু একটা পরতে হয়ই। মেয়েরা শাড়ি বা গয়না পরলে তো অ্যাপ্রিশিয়েট করার মতো কেউই যদি না থাকে তবে এসব পরতে একেবারেই ইচ্ছে করে না। কিংশুক ও অন্তু এক দিনের জন্যেও তার পোশাক নিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। সুসজ্জিত, সালংকারা দেবীর দিকে কখনও ভালো করে চেয়েও দেখেনি। ভাব দেখে মনে হয়, কিছু না পরলেই যেন ছিল ভালো।

কিংশুক এক দিন বলেও ছিল মেয়েদের সব সাজই তো খুলে ফেলার জন্যই। মানে, মেয়েদের নিরাবরণ রূপটিই একমাত্র বিবেচনার। কিছু বলেনি দেবী। ভেবেছিল, যারা এত বড়ো প্রাচীনপন্থী তারাই আধুনিকতার বুলি কপচায়। প্রকৃত আধুনিকতার সঙ্গে সৌন্দর্য-পিপাসার কোনো বিরোধ আছে বলে জানে না দেবী কিন্তু ওরা তাই মানে। যাবৎ ট্রাডিশনের বিরুদ্ধেই ওদের জেহাদ। দুর্বিনয়, অভব্যতা, চিরাচরিতের বিরোধিতা করার মধ্যেই ওদের সব আনন্দ। কোনো কিছু ভাবাভাবি ওদের কাছে সময়ের নিছক অপব্যবহার। ওদের এই could not care less অ্যাটিটুডের সঙ্গেই দেবীর বিরোধ। দেবীর মনে হয়, পুরোনো ট্রাডিশনকে ভাঙার আগে নতুন ট্রাডিশনের ভিত করে নেওয়া উচিত। নইলে, মানুষের সঙ্গে কচুরিপানার কোনো তফাত থাকে না আর।

অনেক ভেবে টেবে চিঠিটা আরম্ভই করে ফেলল দেবী। সম্বোধনে লিখল, মাননীয়েষু। শ্রীচরণেষু লিখতে পারলে খুশি হত কিন্তু বঙ্গভূমে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার মতো মানুষ ভারতের একশৃঙ্গ গন্ডারেরই মতো অতি বিরল হয়ে গেছে। তা ছাড়া, যতখানি ভালো করে জানলে এবং ভক্তি করলে শ্রীচরণেষু লেখা যায় কারোকে এইচ. পি. স্যারকে ততখানি ভালো করে তো এখনও জানেনি দেবী।

তাই লিখল —

সারাঙ্গা
পালামু
ঝাড়খণ্ড

মাননীয়েষু, ২৫/০৮/০১

আপনার চিঠি পেয়ে বড়ো লজ্জা পেলাম। লজ্জিত হয়েই ছিলাম, সেই লজ্জার বোঝা আরও বাড়ল।

সেদিন মিউজিয়ামের আশুতোষ সেন্টেনারি হলে নারী প্রগতির ওপরে আপনার বক্তৃতাতে আপনি যা বলেছিলেন তাই প্রকৃত নারী প্রগতি। তবে দুঃখের বিষয় এই যে ভারতীয় নারীরা এখনও ততটা স্বয়ম্ভর ও স্বাধীন হয়নি যতটা হলে "প্রগতি" শব্দটার যাথার্থ্য থাকে। তা ছাড়া নারীর অনুষঙ্গ এবং পরিবেশের অনেকখানিই পুরুষ নিয়ন্ত্রিত। এখনও। এবং পুরুষ জাতটার মধ্যে যে আপনার মতো পুরুষ বিধাতা বেশি সৃষ্টি করেননি। নারী যদি আধুনিক হতে চায় তবে তার চারপাশের পুরুষদেরও আধুনিক হতে হবে। শারীরিক এবং অর্থনৈতিক দৌর্বল্যের কারণে এ দেশের নারীকে পুরুষের ওপরে এখনও অনেকই দিন নির্ভর করতে হবে। এবং সেই পুরুষদের অধিকাংশই কিংশুক আর অন্তুরই মতো।

আপনার প্রতি এবং ইন্দ্রজিৎদার প্রতিও ওদের দুর্ব্যবহারটা যে একটা পোজ মাত্র তা কিন্তু আমার মনে হয় না। ওরা আসলে এতই দুর্বল যে, বয়সে আপনি ওদের চেয়ে অনেক বড়ো এবং অন্য সব দিক দিয়েও। তা জানে বলেই আপনাকে সরাসরি অপমান করে আমার কাছ থেকে আপনাকে চিরদিনের মতো সরিয়ে দিতে চেয়েছিল।

প্রাণে না মেরেও মানুষকে সরানো যায় মানে মেরে। পুরুষের আত্মসম্মানজ্ঞান আজকাল নারীর সতীত্বরই মতো সদা-বিপন্ন।

আপনার সম্মানে আঘাত লেগেছিল বলেই তো আপনি সেই সন্ধেতেই ইন্দ্রজিৎদার সঙ্গে চলে গেলেন। যা দিনকাল পড়েছে, এখন পুরুষের সম্মানও নারীর সম্মানেরই মতো সযত্নে অনুক্ষণ বাঁচিয়ে রাখতে হয়। একটু অসাবধানী হলেই তা হারিয়ে যেতে পারে। সম্মানহৃত নারী বা পুরুষের বাঁচাতে আর যাই থাক, আনন্দ থাকে না। আর আনন্দেই যদি না বাঁচা গেল তা হলে বাঁচাই বা কেন?

ওদের প্রসঙ্গ এবার বন্ধ করি। আমার জীবনের এক বিপজ্জনক অধ্যায়ে কিংশুক আমার জীবনে এসেছিল। তাই কৃতজ্ঞতাবশেই মা-মরা বাপ-খেদানো ছেলের সঙ্গে থাকতে রাজি হয়েছিলাম। আমারও তো পটভূমি খুব একটা সুস্থ ছিল না। আমার বাবার এক বন্ধুর সঙ্গে আমার মায়ের ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমার মাও দ্রৌপদী ছিলেন। তাতে দোষ দেখিনি কিন্তু দোষ দেখেছিলাম অসুস্থ ও অসহায় বাবার সঙ্গে মা এবং তাঁর প্রেমিক যে ব্যবহার করেছিলেন তারই মধ্যে।

আমি আর কিংশুক দমদমে শস্তাতে বাড়ি ভাড়া নেবার পরে অন্তু স্রেফ অর্থনৈতিক কারণেই আমাদের সঙ্গে এসে জুটল। আমাদের দু জনেরও নুন আনতে পান্তা ফুরোচ্ছিল কিন্তু যৌবনের অকৃপণ উষ্ণতাতে একে অন্যকে বুকে জড়িয়ে আদর করে আমাদের অন্য অনেক অভাবই আমরা পুষিয়ে নিতাম। যৌবনের দান অকৃপণ। অনেক অভাবকেই একজন যুবক ও যুবতীর শারীরিক সান্নিধ্যের আনন্দ অবলীলায় ভুলিয়ে দিতে পারে।

অন্তু প্রথমে এসে জুটেছিল প্রাণের দায়ে। ওর বাড়ি বহরমপুরে। মামাবাড়িতে থাকত। রাজনীতি করত। গান গায় বলে বাম দলে নাম লিখিয়েছিল। এখন তো নাম লেখালেই হল। অর্থ যশ পৃষ্ঠপোষক সবই জুটবে। গলায় সুর থাকুক আর নাই থাকুক। তবে ওই করে তো বেশি দিন চলে না। ঝঞ্ঝাট সেনের খপ্পরে পড়ে "ঝঞ্ঝাটিয়া পাখিরা" নাম দিয়ে ব্যান্ড তো করল কিন্তু ঝঞ্ঝাট সেন ঝঞ্ঝাট বাধাতে লাগল। রোজগারের সিংহভাগই তার পকেটে যেতে লাগল, কারণ পার্টিতে তাকেই চেনে সকলে পুরোনো ক্যাডার হিসেবে। ফলে ওর পক্ষে ওই সামান্য রোজগারে কলকাতাতে বাড়ি ভাড়া করে একা থাকা অসম্ভব ছিল। প্রথমে অর্থনৈতিক কারণে আমাদের সঙ্গী হল, পরে সে আমার শরীরের সঙ্গীও হল। কিংশুকেরও আপত্তি ছিল না কারণ ব্যাপারটা ওর ভাষাতে দারুণ "Mod" হল। অন্তুও নিজেকে Mod প্রমাণিত করার জন্যই ভিড়ে গেল, যতখানি না আমাকে ভালো লাগার জন্যে।

স্যার। আপনি বিয়ে করেননি কিন্তু শারীরিক সম্পর্কও কি করেননি কোনো নারীর সঙ্গে? করে থাকলে, অবশ্যই জানবেন যে, মন-বিবর্জিত শারীরিক সম্পর্ক কুকুর বা গোরুকে যতখানি মানায় মানুষকে ততখানি মানায় না। তা ছাড়া সিকিওরিটির ব্যাপারটাও থাকে। মেয়েরা বহু হাজার বছর ধরে সিকিওরিটির কারণেই পুরুষের কণ্ঠলগ্না হয়েছে এবং একই পুরুষের ঘর করেছে। এই নির্ভরতা-প্রবণতা তার রক্তে বইছে। আমাদের তিন জনের রোজগার এক করে তবেই বাড়ি ভাড়া খাওয়াদাওয়া টেলিফোন ইলেকট্রিক বিল মেটাই আমরা। আমিও সমান টাকা দিই। রান্নাবান্নাও তিন জনে ভাগ করে করি। আমি উপরন্তু দিই শরীর। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমারই ঠকা হয়। ওরাও সেটা জানে।

আসলে সমস্ত সম্বন্ধের গোড়ার কথা হল শ্রদ্ধা। সে দাম্পত্যই হোক, কি অপত্য, কি বন্ধুত্ব। স্বামী বা স্ত্রীকে, বাবা বা মাকে, বন্ধুকে শ্রদ্ধা করতে না পারলে তাকে ভালোবাসা যায় না। সাম্প্রতিক অতীত থেকে আমার কেবলই মনে হত যে, ওরা আমাকে ইচ্ছে করে ঠকাচ্ছে। আমার মন-বিবর্জিত শরীরটাকে ওরা পারকুইজিটস এর মতো ভাগ করছে। পারফ্যুম বা শাড়ি বা অন্য উপহারের কথা বাদই দিলাম, ওদের মধ্যে কেউ আমাকে ভালোবেসে কোনো দিন একটু ফুলও এনে দেয়নি।

আপনার বক্তৃতা যেদিন শুনতে যাই আশুতোষ সেন্টিনারি হলে তখনই আমার মধ্যে এক বিদ্রোহ বাসা বেঁধেছিল। বারুদে ঠাসা ছিল আমার মনের ঘর। আপনার বক্তৃতা তাতে দেশলাই

কাঠি ঠুকে দিল। এই ফাঁকি আমি আর বইব না বলেই ঠিক করেছি আমি। আপনাকে যে আমি বলেছিলাম কিছু দিনের মধ্যে আমি কনসিভ করব সেই কথাটা মিথ্যে কথা ছিল। তবুও যদি ওদের সঙ্গে থাকতাম তবেও না হয় ব্যাপারটা ঘটতে পারত কিন্তু ওরা এখানে যা করে গেল তারপরে ওদের সঙ্গে আমি একদিনও থাকতে পারব না। ফিরে গিয়ে আমার এক বান্ধবীর সঙ্গে বাগবাজারে একটি মেয়েদের মেসে উঠব। তারপর কি করব তা পরেই ভাবব। ভাবছি, কলকাতা ছেড়ে চলে আসব এখানেই চিরদিনের মতো।

এসব কথা থাক। শুধু একটি কথা বলি। তা হল আমি যদি ঘুণাক্ষরেও জানতাম যে, ওরা আপনার সঙ্গে এমন করবে তবে আপনাকে আদৌ আসতে বলতাম না। আমাকে আপনি যদি ক্ষমা না করেন স্যার তাহলে আমি বড়ো অপরাধী হয়ে থাকব।

আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছিলাম অনেক কল্পনা নিয়ে। গতবারে যখন এসেছিলাম তখন ইন্দ্রজিৎদা সুমিতাদি আর আমি লোহারডাগার কাছে একটি গ্রামে গেছিলাম নতুন একটি প্রজেক্ট শুরু করা যায় কি না তার প্রসপেক্টিং করতে। সেখানে পৌঁছে তো আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমরা। সেখানে একটি পুরো রাজধানী আবিষ্কৃত হয়েছে। রাজবাড়ি, বাহিরমহল, অন্দরমহল, পুকুর। একটা পুকুরের জলে রানি মুখ ধুতেন, অন্য পুকুরে চান করতেন। সেই পুকুর থেকে সোনার মাছ পাওয়া গেছে তিনটি। সরকারি আমলারা এসে নিয়ে গেছেন। ভালো করে খুঁড়লে আরও কি না জানি বেরোবে কিন্তু এখন পর্যন্ত যা খোঁড়াখুড়ি তা গ্রামের মানুষেরাই করেছেন। আর্কিয়োলজিকাল সার্ভের অফিসারেরা এখনও সেখানে পৌঁছোননি।

সত্যি! ভাবা যায় না। আপনি দুটি বই পড়তে বলেছেন কলকাতাতে ফিরে—তার মধ্যে The Wonder that was India বইটি ফিরেই পড়ব ঠিক করেছি। আমাদের দেশের বন-পাহাড়ে যে কত এবং কতরকম ধনরত্নই ছড়ানো আছে তার খোঁজ আমরা নিজেরাই রাখি না।

কোন উপজাতির রাজবাড়ি ওটি, কে জানে! এখানে, এই পালামৌতে কত উপজাতির বাস, চেরো, খাঁরওয়ার, ওরাওঁ, মুন্ডা, হো। আপনি কি 'কোয়েলের কাছে' বইটি পড়েছেন? না পড়ে থাকলে, অবশ্যই পড়বেন। তাতে পালামৌ ফোর্ট-এর প্রসঙ্গে কিছু প্রাক-ইতিহাস আছে। 'পালামৌ' শব্দটি আসলে দ্রাবিড় শব্দ। 'পল + আম্মা + উ' এই তিনটি শব্দ থেকে সাহেবদের উচ্চারণে PALAMU হয়েছে। এই শব্দ তিনটির মানে হল দাঁত বের করা নদী। পালামৌ ফোর্টের পেছন দিক দিয়ে ঔরঙ্গা নদী বয়ে গেছে। বর্ষার সময়ে জল যখন বাড়ে তখন নদীর বুকে বড়ো বড়ো কালো পাথর জেগে থাকে কলরোলে বয়ে-যাওয়া জলের মধ্যে, তখন মনে হয় নদী দাঁত বের করে আছে। সেই কারণেই, জায়গার নাম পালামৌ।

জানেন স্যার, ওই গ্রামের মানুষেরা যে ভাষাতে কথা বলে তার নাম কুরুক। মুন্ডাদের ভাষারই একটি উপভাষা। ইন্দ্রজিৎদা আমাকে একটি বই পড়তে দিয়েছেন ফাদার হফ্ম্যান-এর ওপরে নানা জনের লেখা। লুথেরান জার্মান মিশনের ফাদার ছিলেন ফাদার হফ্ম্যান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি জার্মান বলেই তাঁকে ডিপোর্ট করা হয় কিন্তু অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় জাহাজে করে। মুন্ডাদের বা ওরাওঁদের ভাষার কোনো লিপি নেই। যুগযুগান্ত ধরে এই সব ভাষা মুখে মুখে বাহিত হয়ে বেঁচে আছে। লোহারডাগার ওই গ্রামের কুরুক ভাষাও তেমনই এক ভাষা।

আমি ভেবেছিলাম আপনাকে নিয়ে যাব ওই গ্রামে। গ্রামের নামটা আমি জানতাম কিন্তু মনে পড়ছে না। ইন্দ্রজিৎদা বলতে পারবেন।

জানি না, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন কি না এবং ক্ষমা করে সত্যি সত্যি আবারও আসবেন কি না। যদি আসেন, তাহলে কত কিছু যে দেখাবার আছে আপনাকে। আমি বাকি জীবন এখানেই কাটাব আর সর্বজ্ঞদের শহর কলকাতাতে ফিরব না ঠিক করেছি। দু-জায়গার খরচ চালানোও আমার পক্ষে সম্ভব নয়, বিশেষ করে ওদের সঙ্গে যখন আর থাকব না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েইছি।

আপনি কি যেদিন ফেরার কথা সেদিনই ফিরছেন? তাই ফিরবেন। আমার ফেরার ঠিক নেই কোনো। আগেও যেতে পারি, পরেও। গিয়ে নিজের একটা অস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নিয়ে আপনাকে ফোন করব একদিন।

কী আর বলব! আপনার মতো মানুষের ভালোবাসা, থুড়ি, ভালোবাসা নয় অকৃপণ স্নেহ যে পেয়েছি এ আমার পরম সৌভাগ্য। ভালো থাকবেন স্যার। আমাদের মতো অনেক মানুষের জন্যে আপনার ভালো থাকাটা দরকার।

প্রকৃতির মধ্যে চলে আসুন স্যার। অনেক তো উপার্জন করেছেন। আর কেন? এবার কষ্টার্জিত ধন যোগ্য কারণে ব্যয় করুন। দেখবেন, আনন্দে আপনার মন ভরে উঠবে। ইন্দ্রজিৎদা আর সুমিতাদির সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন, দেখবেন নতুন এক সবুজ অনাবিল জগৎ খুলে গেছে আপনার সামনে। জীবন আর প্রশ্বাস নেওয়া আর নিশ্বাস ফেলা যে এক নয় তা অবশ্যই বুঝতে পারবেন।

রাঁচিতে বারিয়াতুতে যখন গেলেন তখন সুমনা চক্রবর্তী দত্তর সঙ্গে দেখা হয়নি আপনার প্রজেক্ট অফিসে? দারুণ, না, মহিলা! উনিও একজন ডিরেক্টর—তবে অন্য নানা বিষয় দেখেন। কালোর মধ্যে অমন সুশ্রী, একমাথা চুলওয়ালা মহিলা আপনি ভারতে বেশি দেখেননি নিশ্চয়ই।

কলকাতা ফিরে আপনাকে একটি বই পড়াব। ভেরিয়ার অলউইনের ওপরে লেখা—রামচন্দ্র গুহর Savaging The Civilized। এখন আপনিও তো জঙ্গলে আসবেন বারে বারে—এসব বই পড়তে হবে initiation এর জন্য। জঙ্গলও তো এক বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে ভর্তি হতেও তো কিছু প্রস্তুতি লাগবেই।

ভালো থাকবেন স্যার।

ইতি—আপনার অনুরাগী
দেবী

শ্রী এইচ. পি. চ্যাটার্জি
প্রযত্নে : সোহনলাল ব্যাহেল আচ্ছুরাম
কালকাফ প্রা. লি.
পো : মুরহু, জেলা : রাঁচি

১১

এইচ. পি.-কে মুরহুর গেস্টহাউসে পৌঁছে দিয়ে সোহনলালবাবু চলে গেছেন রাঁচিতে। যদিও এঁরা সরদার পাঞ্জাবি কিন্তু ওঁদের পুরো পরিবারই নিরামিষাশীই শুধু নন, জৈনদের মতো সূর্যাস্তের আগেই খাবার খেয়ে নেন। মশা-মাছিও মারেন না। তা ছাড়া পথটা নির্জন। একটা ছোটো ব্রিজ আছে, সরু, যেখানে গাড়ির গতি কমাতেই হয় এবং সে কারণেই সেখানে প্রায়ই নাকি ডাকাতিও হয়।

চানটান করে তারপর খাবেন উনি। ভারি ভালো লাগল টেবো ঘাটের জঙ্গল পাহাড় এবং হিরনি জলপ্রপাতটি। চক্রধরপুরে গিয়ে বিয়ার কিনে দুপুরের খাবার আগে জঙ্গলে পিকনিক করলেন। সোহনলালবাবু এসব ছোঁন না। চমৎকার শুকনো পরোটা, আলুর ও পটলের শুকনো তরকারি, ক্যাপসিকাম স্টাফড, ছানা দিয়ে, নানা রকম আচার এবং বড়ো ফ্লাস্কে করে মশলা দেওয়া চা। মুরহুর এই গেস্টহাউসে খাওয়া নিরামিষ হলে কি হয়, খাঁটি ঘিয়ে সব কিছু তৈরি। ইংল্যান্ড থেকে জার্সি গোরু আনিয়েছিলেন। সেই গোরুর বন্যার মতো দুধ। চমৎকার বাগান। আটজন মালি কাজ করে। সকাল-বিকেল চায়ের সঙ্গে মাঠরী খান। খুব ভালোবেসে খান এইচ. পি। তিনি যে খেতে এত ভালোবাসেন তা নতুন করে জেনে সুনিশ্চিত হলেন। যে মানুষ খেতে ভালো না

বাসেন, যাঁর সব ঔৎসুক্য মরে গেছে তিনি যথার্থই বুড়ো বার্ধক্য শরীরের ব্যাপার নয়, মনেরই ব্যাপার পুরোপুরিই।

রোগ অনেকই রকম হয়েছে কিন্তু কোনো রোগকেই বিশেষ পাত্তা দেন না উনি। উনি বিশ্বাস করেন দে'জ মেডিক্যালের ভূপেনবাবুরই কথায়। আর বিশ্বাস করেন মানুষ বাঁচেও মনের জোরে, ডাক্তারের দয়ায় নয়।

মাঝে মাঝে তাঁর জীবনের গন্তব্যহীনতা, পরিণতিহীনতা তাঁকে হতাশ করে দেয়। বড়ো একা বোধ করেন। পাগল পাগল লাগে। তখন তাঁর বাঁচার ইচ্ছাটা পুরোপুরি অন্তর্হিত হয়। এমনকী মাঝে মাঝে আত্মহত্যা করতেও ইচ্ছা হয়। এইচ. পি. চ্যাটার্জির মতো প্রত্যেক সফল মানুষই জানেন যে, সাফল্যও মানুষকে ফ্রাস্ট্রেট করে। ফ্রাস্টেশান শুধুমাত্র অসফল মানুষদেরই অসুখ নয়। সাফল্য যখন ফ্রাস্ট্রেট করে তখন পুরোপুরিই করে। অসফল মানুষের নানা স্বপ্ন থাকে। সেই সব স্বপ্ন সফল করার ভাবনাতে বুঁদ হয়ে তাঁরা নতুন করে বাঁচার চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু সফল মানুষেরা ডেড এন্ড-এ পৌঁছে যান বলেই তাঁদের বাঁচার মতো কোনো তাগিদই আর থাকে না।

তবে মিথ্যে বলবেন না তিনি, দেবীর সঙ্গে আলাপিত হবার পর থেকেই তার মনে নতুন করে সুন্দরভাবে বাঁচার একটা ভীরু ইচ্ছা প্রবলভাগে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। অর্থহীন নানা সুখকল্পনাতে নিমজ্জিত আছেন তিনি। চান করতে করতে গান গাইছেন প্রায়ই গুনগুন করে।

কলেজ জীবনে গান গাইতেন। গান বলতে শুধুই রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং অতুলপ্রসাদের গান। একটা গানের স্কুলে কিছু দিন গান শিখেও ছিলেন। কিন্তু কাজের জগতে ঢুকে পড়ার পরে গান তাঁর জীবন থেকে ছুটি নিয়েছিল। কিন্তু সাঁতার কাটা বা সাইকেলে-চড়ারই মতো, গান এক বার শিখলে মানুষ জীবনেও তা ভোলে না। স্বর হয়তো নড়ে যায়, দম হয়তো কমে যায়, তবলার সঙ্গে না গাওয়াতে তালের হয়তো গণ্ডগোল হয়, উঁচু স্কেল-এ হয়তো গাওয়া যায় না কিন্তু গান ঠিকই বেঁচে থাকে সেই মানুষের বুকের মধ্যে। বসন্তের আগমনে বা আষাঢ়ের প্রথম বর্ষণে সেই সুপ্ত বীজ হঠাৎই অঙ্কুরিত হয়ে অপ্রস্তুত মানুষকে চমকিত করে।

একটি গান আজকাল তিনি প্রায়ই গুনগুন করে গাইছেন। করছেন। সচেতনভাবে যে গুনগুন করছেন তা নয়। তাঁর অবচেতন থেকে গানের কলিগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাজির হয়ে তাঁকে একেবারে আপ্লুত, সিক্ত করে দিচ্ছে। দেবব্রত বিশ্বাস এই গানটি ভারি ভালো গাইতেন, মানে যে গানটি কিছু দিন হল গুনগুন করছেন উনি। জর্জ বিশ্বাসের মৃত্যুর পরে হঠাৎ এতো মানুষ ওর ছাত্র ছিলেন বলে সোচ্চারে দাবি করছেন যে লজ্জাতেই এইচ. পি. কারোকেই বলেন না যে জর্জদার রাসবিহারী অ্যাভিনিউর ওপরের ত্রিকোণ পার্কের পাশের বাড়িতে গিয়ে তিনিও বেশ কিছুদিন গান শিখেছিলেন।

সেই গানটি হল, 'আমার বেলা যে যায় সাঁজ বেলাতে তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে/একতারাটির একটি তারে গানের বেদন বইতে নারে/তোমার সাথে বারে বারে হার মেনেছি এই খেলাতে/তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে/'...

গানটি পূজা পর্যায়ের কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনেক পূজার গানই প্রেমের গান বলে ধরে নেওয়া যায়, যেমন অনেক প্রেমের গানকেই পূজার গান বলে। আসলে, প্রেম আর পূজাতে তো কোনো তফাত নেই। বিরোধ তো নেই-ই!

কেন যে এই গানটিই আজকাল ঘুরতে ফিরতে, স্বপনে জাগরণে ফিরে ফিরে মনে আসে তা তিনি বলতে পারবেন না কিন্তু এই গানটির "SPELL"-এর মধ্যে বাস করছেন তিনি কিছুদিন হল। নিশিতে ডাকার মতো এই গানটি তাঁকে অনুক্ষণ ডাকছে রাতে দিনে।

যাঁরাই একটু আধটু গানবাজনা করেছেন কখনও তাঁরাই জানবেন এমনটা সত্যিই ঘটে। আর যখন ঘটে, তখন "নিশিতে পাওয়া" মানুষের মতোই অবস্থা হয় সেই মানুষের।

এইচ. পি. ঠিক করলেন যে, কিছুক্ষণ পায়চারি করে তারপর চান করবেন। তারপর কলকাতাতে ক-টি ফোন করতে হবে মোবাইল ফোন থেকে। এখানে যদিও ফোন আছে তবে তা ব্যবহার করতে অফিস ঘরে আসতে হয়। কী দরকার! তাঁর স্যুইটের ড্রইং রুমের সোফাতে বসেই যখন করা যাবে মোবাইলে। এখানে এসেই মোবাইল ফোনটা চার্জ করে নিয়েছেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পায়চারি করা হল—বিশুদ্ধ পরিবেশে। প্রায় সারাদিনই গাড়িতে বসে ছিলেন। কোমরে ব্যথা হয়ে গেছে। পলিউশান বলতে কিছুমাত্রও নেই। সারা দিনে হয়তো এই পথ দিয়ে পনেরো কুড়িটা গাড়ি ও বাস যাওয়া-আসা করে। পরিবেশ বিশুদ্ধ কিন্তু বড়ো ন্যাড়া হয়ে গেছে এই অঞ্চলে। বন নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। সেই তুলনাতে সারাঙ্গাতে দুটি দিন কাটিয়ে যে এলেন তাকে স্বর্গ বলে মনে হচ্ছে এখন।

এমন সময়ে একটা সাদা ফোর্ড আইকন এসে ঢুকল কারখানার গেটে। গেস্টহাউসটি কারখানার চৌহদ্দিরই মধ্যে। ওর কাছে যখন এল গাড়িটা মস্ত চওড়া ড্রাইভ-ওয়ে বেয়ে, তখন দেখলেন সোহনলালবাবুর ছোটো ছেলে বাব্বি যার ভালো নাম জগদীপ এবং তার ভালোবেসে বিয়ে করা গুজরাটি স্ত্রী বিন্দু। বিন্দুর কাকা এইচ. পি-র সঙ্গে কলেজে এক সঙ্গে পড়তেন।

গুড ইভনিং আংকল।

বলে, গাড়ি থেকে নামল বাব্বি।

গুড ইভনিং। তুম কব আয়া কলকাত্তা সে?

আজই সুবে আংকেল। ম্যায় আয়া, ঔর কুকু গ্যায়া।

তো আন্ধেরামে কিঁউ আয়া খুবসুরৎ বিবিকো লে কর? ড্যাকাইতি তো হোতে হি রহতা হ্যায় হিয়াঁ। পিতাজি বলতে থেঁ।

জি হাঁ! মগর ক্যা করু? আপকে লিয়ে জরুরি খত আয়াথা বারিয়াতু সে। দে সাহাবনে ভেজিন। উসি লিয়ে পোস্টম্যান বনকর উও খত লেতে আয়া। বহতই জরুরি খত হোগী।

খত?

অবাক হলেন এইচ. পি।

তারপর বললেন দেসাহাব তো ফোনসে ভি বাত কর সকতে যে ইতমিনান সে।

খ্যয়ের উনকি লিখা হুয়া খত নেহি না হ্যায়। দুসরা কোই ভেজা হোগা।

চিঠিটা হাতে নিতে নিতে বললেন, এইচ. পি. আও অন্দর চলো। খানা খা কর যাও না হামারা সাথ।

বলেই, লজ্জা পেলেন।

বললেন, ম্যায় তুমহারা মেহমান হুঁ ঔর বাত অ্যায়সী কর রহা হ্যায় কি, যো লাগতা হ্যায় তুম দোনো হামারি মেহমান হো।

উও বাত তো বিলকুল সাহি হ্যায়। আপহি কো তো হ্যায়ই হ্যায় সব কুছ। পিতাজিকি ছোড়কর হামলোগোকি শর মে হাত রাখনেওয়ালা আদমি ঔর হ্যায় কিতনা?

এইচ. পি. বললেন, খানা নেহি খানা তব হিঁয়া জাদা দের তক রোকো মত। জলদি লওট যাও। সাম্নাটা রাস্তে হ্যায়, রাস্তে লম্বে ভি হ্যায়। সাথমে বহুজি হ্যায়।

বাব্বি ও বিন্দু গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিল।

হেসে বলল, দুধ লেনা না হোগা। দুধ ঔর ফুল। সুবা সাম দো দফে দুধ ঔর ফুল লেনেকে লিয়ে কিসিকো না কিসিকো আনাহি পড়তা। ঔর আজকালকি বিবি শাসকি সাথ জাদা দের তক রহ নেহি শকতি।

বিন্দুকো রাস্তেমে চাট ঔর ভেলপুরি খিলা কে তবহি না ঘর যাও গে।

উও ডিউটিতো আনেকা ওয়াক্তই পুরি কিয়া।

বলে, হাসল বাব্বি। বিন্দুও হাসল।

বিন্দু বলল, আঙ্কেল সাদী-শুদা আদমি নেহি হোনেসে ক্যা হোগা, সবহি চিজকি খয়াল রাখতে হেঁ।

ওয়াহ! ওয়াহ! বাহাদুর লেড়কি হো তুম।

তারপর বললেন, ইসসাল বিজনেস ক্যায়সা? এক্সপোর্ট? এক্সপোর্টকি অ্যাওয়ার্ড ইস সালভি মিলেগি না?

ইস সাল লাগতা হ্যায় কি সময় সিং জয়সোয়াল কোহি অ্যাওয়ার্ড মিলেগি।

অ্যাইসি বাত?

জি হাঁ। হর সাল মিলনা ভি নেহি চাহিয়ে। সবহিকো মিল-জুলকে মিলনা চাহিয়ে। শেল্যাককি ট্রেডমে জেলাসি ক্যাফি হ্যায়। সবকুছ শোচ-সমঝকর করনা চাহিয়ে।

বাঃ বেটা তুমতো বাহাদুর বন গ্যায়ে। বহত খুউব।

ওরা দু জনে গাড়ি থেকে নেমে পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিল আবার যাবার সময়েও পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

তাঁর মক্কেলদের মধ্যে ভারতের সব প্রদেশীয়রাই আছেন, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীর। বাঙালি ছাড়া, এই সহবত, এই বিনয়, অন্য সব প্রদেশীয়ের মধ্যেই দেখতে পান এইচ. পি.। বিশেষ করে যিনি তাঁদের চোখে "কাজের মানুষ" তাঁর প্রতি সম্মানের কোনো ঘাটতিই থাকে না। শুধু বাঙালিরাই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম তো দূরস্থান, নমস্কারও করেন না। এইচ. পি-র কাকা, ব্যারিস্টার নরেন চ্যাটার্জি বলতেন, বাঙালি ব্যবসা কী করবে রে! ওরা দু হাত জোড় করে সুন্দর করে নমস্কারই করতে শিখল না আজ অবধি। আদৌ কোনো দিন শিখবে কি না কে জানে! ব্যবসার নব্বই ভাগই হচ্ছে ব্যবহার, বিনয়। এই সকল সত্যটুকু বাঙালি যত তাড়াতাড়ি বোঝে ততই মঙ্গল।

এখন যে নবজাগরণের ঢেউ উঠেছে। তারা তো মনে হচ্ছে বাঙালিকে জাগিয়েই ছাড়বে।

সেদিন বার লাইব্রেরিতে ঘোষসাহেব বলছিলেন।

তাকে মৈত্র বলেছিল, যে-জাত আত্মহত্যা করে নিজেরাই করবে সেঁধিয়েছে সেই জাতের 'নবজাগরণ' হওয়া মুশকিল। জিশুখ্রিস্ট Ressurrected হয়েছিলেন বলে সকলেই তো আর তা হতে পারেন না।

গাড়ির ডিকি ভর্তি ফুল আর বড়ো বড়ো মুখবন্ধ স্টেইনলেস স্টিলের পাত্রে দুধ নিয়ে ওরা চলে গেলে তীব্র ঔৎসুক্যে ড্রাইভওয়ের হ্যালোজেন লাইটের তলাতে দাঁড়িয়েই খামটা ছিঁড়লেন এইচ. পি। খামের ওপরে গোটা গোটা অক্ষরে মেয়েলি হাতের লেখাতে লেখা ছিল প্রতি/শ্রী হরপ্রসাদ চ্যাটার্জি, মুরহু। প্রেরক দেবীশ্রী ভট্টাচার্য, সারাঙ্গা।

চিঠিটা খুলতেই দেখলেন সম্বোধনটি : মাননীয়েষু স্যার,

হাসি পেল ওঁর। কখনওই অধ্যাপনা না করেই এমন 'স্যার' হবার ভাগ্য সকলের হয় না। কে জানে! একটা দূরত্ব বজায় রাখার জন্যেই বোধহয় এইচ. পি-কে স্যার বলে দেবী, দেবীশ্রী। কই ইন্দ্রজিৎ দে-কে তো স্যার বলে না ও, 'ইন্দ্রজিৎ দা' বলেই সম্বোধন করে। আসলে তিনি দূরের মানুষ বলেই তাঁকে দূরে দাঁড় করিয়ে রাখবার জন্যেই এই স্যার সম্বোধন।

চিঠিটা পড়া শুরু করেও পড়লেন না তিনি। ঠিক করলেন, চান করে উঠে খাওয়ার আগে সোফাতে বসে কুশান দেওয়া স্টুলের ওপরে পা তুলে দিয়ে একটা হুইস্কি ঢেলে নিয়ে তারপই পড়া শুরু করবেন চিঠিটা। কি লিখেছে দেবী কে জানে!

সোডা দিয়েই হুইস্কি খান। সারাঙ্গাতে সোডা ছিল না। সোহনবাবু লেহারের প্লাসটিকের বোতলের দু ডজন সোডা আনিয়ে রেখে দিয়েছেন। রান্না যে করে, তাকে এবং খিদমতগার দু জন আদিবাসী মুন্ডা ছেলেকে বলে দিয়েছেন চারটে করে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখতে, অন্যগুলো স্টোর রুম-এ থাকবে।

যে কোনো চিঠিই খুলে ফেললে তা তুলে-ফেলা ফুলেরই মতো হয়ে যায়। তারপর অবশ্য চিঠি পড়তে শুরু করলে আবার নতুন নতুন ফুল ফুটতে থাকে মনের বাগানে। রংমশালের নানারঙা আলো উড়তে থাকে চারদিকে। নিজে চিঠি আদৌ ভালো লিখতে পারেন না, বাংলায় চিঠি লিখতে তো জানেনই না, কিন্তু ভালো চিঠি পেতে ভারি ভালো লাগে ওঁর। অসমের গোয়ালপাড়ার গৌরীপুরের এক পাতানো-বউদি এমন সুন্দর সব চিঠি লিখতেন এইচ. পি-কে যে, সেই সব চিঠি পড়েই তাঁর সঙ্গে গভীর এক প্রেমের অশরীরী সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মনে মনে সেই মহিলাকে অদেয় তাঁর কিছুই ছিল না।

সেই পাতানো বউদি মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় মারা যান। বেঁচে থাকলে কি হত বলা যায় না। এই ফোন, ফ্যাক্স, ইমেল-এর দিনেও চিঠির কোনোই বিকল্প নেই, মনে হয় এইচ. পি-র। ওই সব হচ্ছে ব্যবসার উপকরণ আর চিঠি হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পর্কের সেতু। জাপানিজ গার্ডেনের লিলিপুলের ওপর যেমন সুদৃশ্য কাঠের পুল থাকে তেমন সেতু। সে সেতুর চারপাশে ভ্রমর আর প্রজাপতি ওড়ে, চেরি ফুল আর অমলতাস ফোটে। চিঠির মধ্য দিয়ে এক জন মানুষ অন্য জনকে যেমন করে সুগন্ধি প্রজাপতির মতো ছুঁয়ে যেতে পারে, তেমন করে আর কোনো মাধ্যমই পারে না বলেই মনে হয় ওঁর। তবে উনি ব্যাক ডেটেড—'ফ্যাটসো', 'ধুমসো' একজন মানুষ। এই নব্য যুগে একেবারেই বাতিল। তাঁর মতামতের দাম হয়তো কারো কাছেই নেই।

চান করতে করতে এইচ. পি. ভাবছিলেন, ইন্দ্রজিৎবাবুদের নানা প্রজেক্ট দেখার পর এই লাক্ষার কারখানা দেখা আর এক অভিজ্ঞতা। সোহনলালবাবুর কাছ থেকে সারা দিনে অনেকই শিখলেন। লাক্ষাকে এখানে বলে 'লা'। 'লা' কোনো ফল নয়, ফুলও নয়। লা নানা গাছের এক রকমের পোকার ক্রিয়াকাণ্ড থেকেই হয়। নানা রঙের লা বা লাহি হয়। এই লাহিরই ইংরেজি নাম Seed-Lac। এই Seed-Lac থেকেই Shellac উৎপাদিত হয়। যারা লাহি উৎপাদন করে, মানে Seed-Lac-এর গাছ করে, তাদের বলে গাছোয়াল। কুল, কুসুম, পলাশ এই সব নানা গাছে লাহি হয়। পাঞ্জন এবং লিপসি গাছেও হয়। বাংলাতে যে-গাছকে পাকুড় গাছ বলে সে গাছেও হয় না কি। পাকুড় গাছ দেখেন নি কখনও এইচ, পি.। কিই বা দেখেছেন! পোকা-লাগা ডাল থেকে চিলতে কেটে সে গাছেরই অন্য ডালে লাগিয়ে দিলে কলমের মতো সেখানেও পোকা হয়। লাহি নানারঙের হয়। আষাঢ় মাসে কুসুম গাছে যে লাহির কলম বাঁধা হয় তা কাটা হয় কার্তিক মাসে। সেই লাহির নাম কাতকি। কার্তিক মাসেই সেই ডাল কাটে। পোকা-ধরা ডাল চলে যায় হাটে হাটে আর সেখান থেকেই পাইকারেরা তা সংগ্রহ করে বিভিন্ন Shellac ফ্যাক্টরিতে চালান দেয়। 'কাত্‌কি'কে "রঙিন"ও বলে। রঙিন কুল ও পলাশ গাছেও হয়। এই রঙিন লাহি পলাশ ফুলের মতো লাল বা লালের বিভিন্ন শেডস-এ হয়। কার্তিক মাসে ফুল গাছে যে কলম করা হয় তা ওঠে বৈশাখ মাসে। তাকে বলে "বৈশাখী"। কুসুম গাছে যে লাহি হয় তার নাম "কুস্‌মি"। হাটে যে লাহি যায় তাকে লাহি বলে না, বলে খাদন। খাদন হচ্ছে Impurities. পাটের যেমন 'ধলতা', সোনার বা কাঁসা পেতলের যেমন 'গলতা', লাহির খাদনেরও তেমন 'খাদ'। হাটে হাটে গাছের ডালের টুকরোগুলোই আসে। খাদন সুদ্ধু লাহি। খাদন থেকে লাহি আলাদা করে ওজন করা হয় কে জি হিসাবে। সেই লাহিকে, মানে খাদন ছাড়া লাহিকে বলে চৌরী। চৌরীর দাম স্বভাবত বেশি হয় খাদনের চেয়ে। সোহনলালবাবু বলেছিলেন যে, দার্জিলিং, আসাম আর সিঙ্গাপুরে লাহি নাকি অড়হর গাছেও হয়।

কত কিছুই জানার আছে। সত্যি। জানার ইচ্ছা যদি কারো থাকে তাহলে জীবনে জানার শেষ নেই বোধহয়।

চান করে উঠে একটি হুইস্কি ঢেলে নিয়ে সোডা মিশিয়ে চুমুক দিলেন। সারা দিনের দৌড়াদৌড়ি বা কাজের পরে গরম জলে চান করে উঠে দুতিনটি স্কচ খাবার আনন্দই আলাদা।

তবে, তাঁদের কলেজের অধ্যাপক পি. এম. নারিয়েলওলা বলতেন, "You must earn your scotch. I must have done something good in my youth or in childhood." জীবনের প্রত্যেকটি জিনিসই অর্জন করতে হয়। ওরা সেই অর্জনের কষ্ট হয়তো স্বীকার করেনি তাই অনেক কিছুই হারাবে। অথবা এও হতে পারে যে ওরা জীবনে সুযোগই পায়নি নিজেদের প্রমাণ করার। এইচ. পি. যেমন পেয়েছিলেন। যদি তাই হয়, তবে সেটা ওদের দুর্ভাগ্য। এই সমাজেরই গ্লানি সেটা। সমান সুযোগ প্রত্যেকেরই থাকা উচিত, তারই পরে যোগ্যতা বা অযোগ্যতার বিচার হওয়া উচিত। আজকেও লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণীদের সামনে সেই সুযোগ এনে দেওয়া যে গেল না সেটা এই সমাজব্যবস্থার ও রাষ্ট্রেরই অযোগ্যতা। স্বাধীনতার পরে এত বছরে সেই সুযোগ আসা ও থাকা অবশ্যই উচিত ছিল।

এসব কথা সব সময়ে যে ভাবেন তা নয় কিন্তু যখন ভাবেন তখন মন খারাপ হয়ে যায়।

কিন্তু এখন তিনি দেবীর চিঠিটা পড়ছেন তারিয়ে তারিয়ে শিশুরা যেমন করে আইসক্রিম খায়। এখন তিনি দেশ কাল সমাজ কিংশুক বা অন্য কারো ভাবনাই ভাবতে চান না। For a change উনি একটু, না একটু নয়, ভীষণই স্বার্থপর হয়ে উঠতে চান। জীবনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বার্থপর না-হওয়াটা পরম মূর্খামি। এই কথাটা বুঝতে বড়ো বেশি সময় নিলেন এইচ. পি।

মাননীয়েষু স্যার...

চিঠিটা পড়তে আরম্ভ করলেন এইচ. পি. চ্যাটার্জি, মুরহুর আচ্ছুরাম কালকাফ্ক-এর লাক্ষা কারখানার নির্জন গেস্টহাউসে বসে। এখন বিরাট ল্যাংকাশায়ার বয়লারটার একটানা নীচুগ্রামের আওয়াজ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই। চারদিকে সুষুপ্তি। কারখানার হাতার মধ্যে বিরাট বিরাট সব গাছ, কোনোটাতে এখন ফুল আছে, কোনোটাতে শরতে বা বসন্তে আসবে। গাছগুলো চেনেন না এইচ. পি. কিন্তু তারা যে প্রহরীর মতো তাঁকে এই নির্জনে পাহারা দিচ্ছে তা তিনি বুঝতে পারছেন। এক একটি বড়ো গাছ সব দেখে, সব বোঝে, ভালোবাসে। এই কথা সারাঙ্গাতে না এলে এ জীবনে অজানাই থাকত এইচ. পি-র কাছে।

১২

সোহনলালবাবু বলেছিলেন, রাঁচিতে গরম গরম খেয়ে ওঁদের বাড়ি থেকে রওনা হতে। অবাঙালি ব্যবসায়ীরা যে ব্যবসাতে কেন এত সফল তা তাঁদের স্ত্রী, পরিবার এবং রান্নাঘর দেখলেই বোঝা যায়। এটা বানানো কথা নয়। যাঁরা লক্ষ্য করে দেখেছেন তাঁরা সকলেই জানেন।

মুরহু থেকে চান টান করেই বেরিয়েছিলেন। রাঁচির বাড়ি 'বৃন্দাবনে' পৌছোতেই কুকু ও রেশমি, বাব্বি ও বিন্দু এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। ছোটো ছেলে গুল্লু আর তার স্ত্রী তখন ছিল না। রেশমির বাবা রাজাসাহেব ছিলেন এন. সি. ডি. সি-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর। আর বিন্দুদের পারিবারিক ব্যবসা ছিল কয়লাখনির। জাতীয়করণ হয়ে যাবার পরেও তাঁরা কয়লার ব্যবসাই করেন। সোহনলালবাবু স্ত্রী কৃষ্ণা দেবী বসার ঘরে এসে আপ্যায়ন করলেন। নাতি ও নাতনিরাও সবাই পড়া ছেড়ে প্রণাম করতে এল। এই সব ট্র্যাডিশন শিশুকাল থেকেই গড়ে ওঠে ওদের মধ্যে। বাঙালিদেরও অনেক সব সুন্দর ট্রাডিশান ছিল কিন্তু এইচ. পি-র মনে হয়, অকারণ ঔদ্ধত্য ও অজ্ঞতা ও বুলি কপচানো রাজনীতিই সব কিছু Rituals-এর গভীরতা ও সৌন্দর্যকে শেষ করে দিল।

ওঁরা শুনলেন না। খাবেন না যখন তখন তিনটি হট কেসে গরম খাবার দেওয়া হল। ফ্লাস্কে গরম দুধ। এইচ. পি. হেসে বললেন, জার্সি গোরুর দুধ কি বাঙালির পেটে সইবে? তা ছাড়া, রাতে দুধ খাই না আমি। হুইস্কি খাই।

কুকু বলল, সোডা ফ্রিজে রাখা আছে বের করিনি। গাড়িতে বসার সময়ে বের করব, যাতে ঠান্ডা থাকে। তারপর জিজ্ঞেস করল আংকল জি, হুইস্কি তো হ্যায় না? নেহি তো আভিভি ফোন করবে মাঙ্গা লেতা হুঁ—সিধা স্টেশন মে পৌঁছ যায়েগা ব্ল্যাক ডগ।

নেহি নেহি বেটা, সব কুছ হ্যায়। ফিক্কর মত করো।

কুকুর খিদমতগারি দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না সে স্টেটসে পনেরো বছর ছিল এবং ফিজিক্স পড়িয়েছে তার মধ্যে পাঁচ বছর। এই বিনয়ই বাঙালি ছেলেদের শেখার ছিল ওদের কাছে।

সবাইর কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন এইচ. পি। সঙ্গে দুই ছেলে চলল তাঁকে ট্রেনে উঠিয়ে দিতে। আসবার সময়ে ওদের সকলের আন্তরিকতা ও ভালোবাসাতে একা-থাকা ব্যাচেলর এইচ. পি.-র মন দ্রব হয়ে উঠল।

দুপুরে ইন্দ্রজিৎ আর সুমিতার সঙ্গে কথা হয়েছিল। ওঁরাও স্টেশনে আসবেন বলেছিলেন, এইচ. পি. মানা করেছিলেন। অনেক কথাই হয়েছিল কিন্তু সঙ্কোচে জিজ্ঞেস করতে পারলেন না যে দেবী ফিরে গেছে কি না, না কি সারাঙ্গাতেই আছে? না ফিরে গিয়ে থাকলে, কবে যাবে? সঙ্কোচটা কেন যে হল তা নিজেই বুঝতে পারলেন না। কিন্তু সঙ্কোচই হল না, সঙ্কোচটা লজ্জা হয়ে তাঁকে পীড়িতও করল। তবে এই পীড়াতে কোনো জ্বালা ছিল না, একধরনের আনন্দ ছিল। ঠিক এই ধরনের সঙ্কোচ ও লজ্জার শরিক উনি বহু বছর হননি।

ওরা একটা রিসেপশনে যাবে স্ত্রীদের নিয়ে, ছোটোভাই গুল্লুর শ্বশুরবাড়ির কারো বিয়েতে, ওই কারণেই গুল্লু ছিল না বাড়িতে, তাই এইচ. পি-র ব্যাগ দুটি এবং তিনটি হট কেস এনে দিয়ে আবার প্রণাম করে বলল, গাড়ি ছাড়তে দশ মিনিট দেরি আছে। আমরা কি যেতে পারি আংকলজি? আপনার ঠান্ডা সোডা ও জল সব কোচ অ্যাটেনড্যান্টকে দিয়ে দিয়েছি। আর এই রাখুন আপনার টিকিট।

কুকু বলল, আপনার সঙ্গে যিনি এসেছিলেন, উনি যাবেন না? ওঁর টিকিটও তো কাটা হয়েছে। আপনার আসার টিকিট তো আমার কাছেই রেখে দিয়েছিলাম সেই জন্যেই, যখন এলেন তখন গেটে দিইনি চেকারকে।

এইচ. পি. বললেন, খুব অন্যায় হয়ে গেছে আমার। তোমাদের বলে দেওয়া উচিত ছিল। এখন ফেরত দিলে তো এক পয়সাও ফেরত হবে না। সরি।

যাকগে। ভালোই হল। খেয়ে দেয়ে দরজা লক করে শুয়ে পড়তে পারবেন। মুড়িতে বা টাটাতে কেউ ঝামেলা করতে পারবে না এসে। চলি আমরা। নমস্তে আংকলজি।

এইচ. পি. ওদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। সময়ে বিয়ে করলে ওঁরও এইরকম ছেলেরা ও বউমারা থাকতে পারত। কিন্তু থাকলেও তারা এত ভালো ও বিনয়ী কি হত? কলকাতার সংস্কৃতি থেকে বিনয়, সহবত সব উধাও হয়ে গেছে। কিংশুক আর অন্তুদের শহর এখন ওটি।

ওরা চলে গেলে যখন একা হয়ে গেলেন তখনই দেবীর কথা মনে হল তাঁর। কবে ফিরে গেল কে জানে মেয়েটা। গেলেও হয়তো নন-এসি থ্রি টিয়ারে যাবে গুঁতোগুঁতি করে। ওর মতো মেয়ের অত কষ্ট করা ঠিক নয়। জঙ্গলে কষ্ট করে, ঠিক আছে। কিন্তু হৃদয়হীন শহরের পথে-ঘাটে, ট্রেনে-বাসে ঝুলোঝুলি করাটা ওকে মানায় না। সাদা সিট কভার লাগানো একটি সাদা রঙা ওপেল-করসা গাড়ি থাকা উচিত ছিল ওর। সাদা উর্দি পরা ওয়েল-ম্যানারড স্মার্ট এক জন ড্রাইভার। ওর ওঠা-নামার সময়ে যে দরজা খুলে ওকে ওঠাবে এবং নামাবে।

ভাবনা শেষ হবার আগেই অ্যাটেন্ড্যান্ট এসে বললেন, স্যার, সোডা কখন লাগবে বেল টিপে জানাবেন, আর এম. এস. ডি. ভট্টাচার্জি যাবেন কি? সময় তো আর মাত্র পাঁচ মিনিট আছে।

হয়তো কাজে আটকে গেছেন কিন্তু উনি না আসতে পারলেও পয়সা দিয়ে টিকিট যখন কাটা হয়েছে তখন অন্য কারোকে কুপেতে ঢোকাবেন না। খাওয়ার পরে আমি লক করে শুয়ে পড়ব।

ঠিক আছে স্যার।

আচ্ছা একটা সোডা আর একটা গ্লাস দিয়েই যান।

এখুনি আনছি।

সোডা ও গ্লাস দিয়ে যেতেই ব্রিফকেস-খুলে টিচার্স-এর বোতলটা বের করে একটা হুইস্কি ঢেলে নিয়ে সোডা ভরে নিলেন। অ্যাটেন্ড্যান্ট দরজাটা টেনেই দিয়ে গেছিলেন। কোচটা ফাঁকাই। ভিড় নেই তেমন। এ সি কোচ-এর জানালা দিয়ে রাতের বেলা কিছুই দেখা যায় ন। বড়ো অস্বস্তি লাগে। বাইরে থেকে ভিতরেও কিছু দেখা যায় না। পর্দাগুলো টেনে দিলেন উঠে। ওয়াশ বেসিনের ওপরের আয়নাতে তাঁর মুখটাকে দেখা গেল। একেবারে সান-ট্যানড হয়ে গেছেন। চেনা যায় না। টাকটা যেন আরও বড়ো হয়েছে। নাঃ সামনে ও জুলপিতে রুপোলি চুল ঝিলিক মারছে। তা মারুক। কলপ করাতে তাঁর রুচি নেই। কলপ করা মানুষদের মধ্যে কারো কারোকে উনি জানেন। সে মানুষগুলো কপট এবং ভণ্ড। তা বলে সবাই কি তেমন? তা নিশ্চয়ই নন।

গ্লাসে একটা চুমুক দিলেন। ভাবছিলেন, দেবী যদি ওঁর সঙ্গেই ফিরত, বেশ হত। অনেক কথা ছিল তাঁর ওর সঙ্গে। যা হবার নয় তা হবার নয়। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল এইচ. পি-র। আবার সেই গানটা নিশির মতো তাঁকে ডাকল। মাথার মধ্যে গুঞ্জন তুলল। "আমার বেলা যে যায়, সাঁঝবেলাতে তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে।"

এমন সময়ে দরজাতে কেউ নক করল। সম্ভবত টিকিট-চেকার। ওপাশ থেকে কোচ অ্যাটেড্যান্ট-এর গলা শোনা গেল, স্যার!

ইয়েস। কাম ইন। বললেন, এইচ. পি.।

দরজাটা খুলে গেল। অ্যাটেন্ড্যান্ট বললেন, উনি এসে গেছেন স্যার। আর দু'মিনিট দেরি হলে ট্রেন ফেইল করতেন।

এইচ. পি. উঠে দাঁড়ালেন।

দেবী হেসে বলল, আমি এসেছি।

ভালো। আসবে যে সেটা একটু জানিয়ে আশ্বস্ত করলে ভালো হত না কি?

আসতে যে পারব তার কোনো ঠিক ছিল না। তারপর মন বলল, হয়তো আপনি ফেরার টিকিটও এক সঙ্গেই কেটেছেন। হয়তো না এলে আপনি দুঃখ পাবেন। কি করে যে এসেছি তা আমিই জানি। মুসলিম দাদা তার প্রিহিস্টরিক মোটর সাইকেলে বসিয়ে চান্দোয়া-টৌড়িতে পৌঁছে দিল, সেখান থেকে চাতরা থেকে রাঁচি যাওয়া একটা বাস ধরে রাতু রোড-এর বাস স্টপেজ। সেখান থেকে সাইকেল রিকশা করে স্টেশনে। রিজার্ভেশন চার্ট-এ দেখলাম আপনার নাম তো আছেই আমার নামও আছে। তাই উঠে এলাম।

যদি নাম না থাকত, কি করতে?

আনরিজার্ভড সেকেন্ড ক্লাসে চড়ে যেতাম।

বসার জায়গা না পেলে?

দাঁড়িয়ে যেতাম। কতবার গেছি এসেছি. বই পড়তে পড়তে রাত কাবার করে দিতাম। কত মানুষই তো অমনি করেই যান, আমার চেয়ে অনেক বিদ্বান, বুদ্ধিমান সব মানুষ।

তারপরই বলল, বাথরুম থেকে একটু পরিষ্কার হয়ে আসি। আজ সারাদিন যা গেছে। দুপুরেও খাওয়া হয়নি। আমাদের কেঁচো কম্পোস্ট-এর পিট-এ একটি মেয়েকে কিং-কোবরাতে কামড়ে দিল।

কী সাংঘাতিক! তারপর?

তারপর কি? বাঁধন দিয়ে মুসলিমদার মোটরসাইকেলের পেছনে তাকে ধরে বসে জঙ্গলের

শর্টকার্ট দিয়ে লাতেহারে হাসপাতালে। তাও আবার ইনজেকশন ছিল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা বেরল...।

মেয়েটি বেঁচেছে তো?

তা বেঁচেছে। মেয়ের জাত। কপালে আরও কত কষ্ট আছে সারা জীবন, অত সহজে কি পার পাবে? তবে কষ্টের এখনও শুরুই হয়নি।

মানে?

মানে বিয়ে হয়নি এখনও।

ওঃ।

বললেন, এইচ. পি.।

স্যার, ফার্স্ট এ সি-তেও খাওয়ার দেয় না? কি খিদে যে পেয়েছে। অন্য ক্লাসে দেয় না। জানি।

নাঃ। কিন্তু তুমি অভুক্ত থাকবে জেনেই সোহনলালবাবুর স্ত্রী তোমার জন্যে সব গরম খাবার দিয়ে দিয়েছেন। চার রকম আচারই আছে।

দেবী, বাচ্চা মেয়ের মতো জিভটাকে টাগরাতে ঠেকিয়ে টাক করে একটা শব্দ করল। তারপরই বলল, যাই।

যাচ্ছ কোথায়? তোয়ালে নিয়ে যাও। লিকুইড সোপ তো বাথরুমেই আছে। আর কেক চাও তো আমার সাবান নিয়ে যাও নতুন। ব্যবহার না-করা।

ব্যবহার করলেই বা কী! কিন্তু লাগবে না।

দেবী চলে গেলে এইচ. পি. বটম-আপ করলেন। আরেকটা হুইস্কি ঢাললেন, বড়ো করে। সোডা মেশালেন। তারপর মনে মনে বললেন, কিংশুক না অন্তু কে যেন বলেছিল, যারা গুনে গুনে হুইস্কি খায়, তারা মানুষ খুন করতে পারে, সুদের কারবার করতে পারে। ঠিকই বলেছিল হয়তো। আজ থেকে না-গুনে হুইস্কি খাবেন এইচ. পি.। কী খুশি যে লাগছিল তাঁর, তা বলার নয়। যেদিন লানডান-এর ওয়াটসন অ্যান্ড ওয়াটসন-এ জয়েন করেছিলেন গ্রে'জ ইন থেকে ব্যারিস্টার হবার পরে সেদিন যেন আনন্দ ও উত্তেজনা হয়েছিল আজ যেন ঠিক তেমনই হচ্ছে।

প্রায় মিনিট দশেক পরে ফিরল দেবী ঝকঝকে হয়ে। কুপের আলোতে ওকে দেবীর মতোই দেখাচ্ছিল। শুধু দেবী তো নয়, দেবীশ্রী। মেয়েরা যে এক জন পুরুষের জীবনের সব শূন্যতা কী দীপ্তির সঙ্গে পূরণ করে তা দেবী শেষ মুহূর্তে ট্রেনে এসে ওঠাতে এইচ. পি. যেন প্রথম বার বুঝতে পারলেন।

দেবী বলল, স্যার, আপনাকে এবার বাস্তুহারা করব।

মানে?

মানে একটু বাইরে যেতে হবে। আমি চেঞ্জ করে নেব। শাড়ি টাড়ি তো আনিনি। যে সালোয়ার-কামিজ পরে এসেছিলাম সেটা আর পরার মতো নেই। সকাল থেকে পরে আছি জিনস। যা ঘেমেছি না সারাটা দিন। মেয়েদের গরমে বড়ো কষ্ট। পুরুষেরা সেই কষ্টের কথা কখনও জানবেন না। কাল সকালে তো নাইটি পরে প্লাটফর্মে নামতে পারব না। এই জিনসই পরতে হবে। রাতটা তো কাটাই নাইটি পরে।

এইচ. পি. দ্বিতীয় হুইস্কিটাও শেষ করে বললেন, কতক্ষণ বাস্তুহারা করে রাখবে?

দু-তিন মিনিট। হয়ে গেলেই আমিই দরজা খুলে ডাকব আপনাকে।

বেশ।

বলে, এইচ. পি. দরজা খুলে বাইরে গেলেন কামরার। ভেতর থেকে দরজা লক করার আওয়াজ হল।

যখন দরজা খুলে ভিতরে ডাকল তাঁকে দেবী তখন কামরাটা সুগন্ধে ম-ম করছিল একটি

হালকা-বেগনি রঙা কটন-এর নাইটি পরে আছে দেবী। স্লিভলেস। বুকের, গলার ও ঘাড়ের কাছে লেস এর ফ্রিল দেওয়া।

বাঃ।

এইচ. পি. বললেন।

এটা গত বছরে পুজোর আগে পছন্দ করে কিনেছিলাম। এটা কি রং জানেন?

না। কি রং?

ফলসা। পড়েননি রবীন্দ্রনাথের কবিতা? "ফলসাবরণ শাড়িটি চরণ ঘিরে।"

তুমি তো সুন্দরই।

এইচ. পি. ভাবছিলেন, ভাবলেন। নাইটি তো বাইরের মানুষদের দেখাবার জন্যে নয়। স্বামীকে অবশ্য জন্মদিনের পোশাকই দেখায় দেবী এবং মানবীরাও।

মুখে বললেন, কথা পরে হবে। আগে খাও।

হ্যাঁ। খাব আজ খুব।

ক্যাসারোল খুলতেই খাঁটি ঘিয়ের রান্নার খুশবু ম-ম করে উঠল দেবীর শরীরের সুগন্ধকে পাল্লা দিয়ে। দেবী নাক কুঁচকে ঠোঁটের একটা সুন্দর ভঙ্গি করে বলল উ ম-ম-ম-ম। ডিল্লিসাস।

না খেয়েই?

ঘ্রাণেন অর্ধভোজনম।

তুমি চুপ করে বোসো। অত ছটফট কোরো না। আমি পরিবেশন করছি, তুমি খাও।

বাবাঃ। এত আদর কি সইবে? আমার বাবা আমাকে এমন করেই খাওয়াতেন ছোটোবেলাতে। ভুলেই গেছি এসব।

কেন মা খাওয়াতেন না?

নাঃ। আমার মা...।

নাও খাও পরোটা, দেখি তো, কি কি দিয়েছেন কৃষ্ণা ভাবি? এই যে, মুচমুচে পরোটা উনি জানেন যে আমি মুচমুচে ভালোবাসি, তাই, মটরশুঁটি আর আলুর তরকারি, বেগুন বাসন্তী, পটলের দোলমা। ভিতরে কি সব দিয়েছে, কিশমিশ বাদাম পেস্তা এসব। পনির বাটার মশালা, ধোঁকার ডালনা, আলুবখরা আর আনারসের চাটনি, লেবু, আম, আমলকী আর লংকার আচার। রাবড়ি। পেট ভরবে তো?

দেবী বলল, আপনার প্লেট কই? প্লেট তো একটাই দিয়েছে।

তুমি খেয়ে নাও, চামচ আর কাঁটা নাও, এই। তোমার খাওয়া হয়ে গেলে প্লেটটা ধুয়ে নেব আমি তারপর খাব। যা খাবার দিয়েছে তাতে চার জন খেতে পারে। তুমি শুরু করো, আমি ততক্ষণে আর একটা হুইস্কি খাই।

কটা হল?

এটা নিয়ে তিনটে।

চারটের বেশি খেতে দেব না আপনাকে।

এইচ. পি. চুপ করে রইলেন।

বললেন, নাও শুরু করো।

ভাবছিলেন আজ অবধি মা-বাবার মৃত্যুর পরে এমন শাসন করে কেউই তাঁর সঙ্গে কথা বলেননি। তখন, শাসনকে অত্যাচার-বলে মনে হত। আজকে জীবনে অনেক দূর হেঁটে জীবনের সন্ধেবেলাতে এসেই বুঝলেন যে যেটাকে অত্যাচার মনে করেছিলেন সেটাই আসলে আদরের পরাকাষ্ঠা। স্তব্ধ হয়ে বসে হুইস্কিতে চুমুক দিলেন। সোডা কম হয়ে গেছে। বেলটা টিপলেন একবার অ্যাটেন্ড্যান্টকে সোডা আনতে বলবেন বলে। দেবী, সিটের ওপরে জোড়াসনে বসে একটা

তোয়ালে কোলে ছড়িয়ে কোলের ওপরে ডিশ নিয়ে ওর সুন্দর আঙুলে পরোটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। ওর এই ঘরোয়া ফলসা রূপ অ্যাটেন্ড্যান্টও দেখবে এটা ওঁর পছন্দ হল না। দুটি অনাবৃত সুডৌল উজ্জ্বল বাহু, সুগঠিত দুটি কবুতরি স্তন, যদিও নাইটিমোড়া। তবুও। না, উনি দরজা একটু খুলে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর ওইভাবেই হাত বাড়িয়ে সোডাটা নিয়ে দরজা লক করে দিলেন।

দেবী কারণটা বুঝল না। বলল, দারুণ রান্না। কী খিদে যে পেয়েছিল, এখন বুঝছি।

তারপর বলল, খাওয়া হয়ে গেলে আপনার মোবাইল ফোন থেকে ইন্দ্রজিৎদাকে একটা ফোন করতে পারি?

নিশ্চয়ই! একটা কেন? দশটা করো।

না একটাই করব। মুসলিমদাদা চাঁদোয়া থেকে ফোন করে খবরটা দিয়েছে। কি বলতে কি বলেছে। আমি বললে আশ্বস্ত হবেন। আমি খেয়ে আপনাকে বেড়ে দেব। ডিশটা এই ওয়াশ বেসিনেই ধুতে পারব তো স্যার?

হ্যাঁ হ্যাঁ। তোমার নাইটি পরে বাইরে যেতে হবে না।

দেবী অবাক এবং একটু কৌতুকের চোখে এইচ. পি-র মুখে চেয়ে রইল। ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি এসেই মিলিয়ে গেল।

ওর খাওয়ার পরে এইচ. পি-কে ডিশ ধুতে দিল না কিছুতেই। তারপর এইচ. পি-র কোলের ওপরে তোয়ালেটা বিছিয়ে দিয়ে খাবার পরিবেশন করে খাওয়াতে লাগল। এইচ. পি. বললেন, ট্রেনে হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা গেলে কি ভালো হবে? এক জনকে সাপে কামড়াল আর আমাকে কি তোমার হাতেই মরতে হবে? রাতে আমি খুব কম খাই।

এটা তো কলকাতা নয়। আর আপনাকে খাওয়ায় তো বেয়ারা-বাবুর্চিরা নিশ্চয়ই। ইদ্রিস আলি না কি নাম বলেছিলেন। আমি তো আর ইদ্রিস আলি নই। আমি যা বলব সব শুনতে হবে। আমি তো আপনার চাকরি করি না স্যার যে চাকরি যাবার ভয়ে মরব।

আবারও স্তব্ধ হয়ে গেলেন এইচ. পি। চাকরি খাবার ভয় যে করে না, যে তাঁকে অবহেলায় ধমক দেয়, তেমন একজন মানুষের ভারি অভাব ছিল তাঁর জীবনে। কী যে হবে তিনি জানেন না। কালকের ভোর তাঁর জীবনে কী যে বয়ে আনবে! বড়োই বিপদে পড়লেন তিনি জীবনের সন্ধ্যাকালে এসে।

খাওয়াদাওয়ার পরে দেবী ইন্দ্রজিৎ ও সুমিতার সঙ্গে কথা বলল। তারপর এইচ. পি.-ও বললেন। বললেন, কলকাতাতে গিয়ে ডাইরি দেখে পরের বার কবে আসছি তা জানব। ডোনেশন-এর ব্যাপারেও জানাব। ইট ওজ আ প্লেজার মিটিং উ বোথ।

ইন্দ্রজিৎ বললেন, পারলে মেয়েটাকে একটু দেখবেন চ্যাটার্জিসাহেব। বড়ো ভালো মেয়ে, গুণী মেয়ে, কিন্তু বড়ো দুঃখী মেয়ে।

থ্যাংক উ্য। নিশ্চয়ই। ডোন্ট ড্য ওয়ারি প্লিজ।

তারপর সোহনলালবাবুর স্ত্রী কৃষ্ণাজিকে একটা ফোন করে বললেন, ভাবিজি মেরি মাতাজীকি ইয়াদ আয়ি বহুত সাঁলো বাদ। সিরফ খানাহিতো নেহি ভেজি থি আপনে, প্যায়ার সে ডুবা হুয়ে থে বিলকুল। লিজিয়ে, মেরি কম্পানি ক্যা বোলতি হ্যায় উ শুনিয়ে।

দেবী বলল, নমস্তে চাচিজি। অ্যায়সা খনা তো ম্যায় কওভি নেহি খায়িথি পহিলে।

কৃষ্ণা ভাবি বললেন, কলকাত্তাসে যবভি আওগে, জরুর আও বেটি মেরি ঘর পর। মুরহুমে ভি আও।

মুরহুই ঠিক রহেগা। মেরি কাম কে লিয়ে তো হামারি খুঁটি, তামার, বুণ্ডু, তাজনা ইয়ে সব জাগে মে যনাহি পড়তি হ্যায়।

তব ঔর ক্যা, আ যাও। আপনাহি ঘর শোচো। যব দিল করতি তব আ যাও।

দেবী বলল, কটা হল? স্যার? এইটা নিয়ে চারটে হবে।

ব্যস। এবার ঘুম। আমারও সত্যি ভীষণই ঘুম পেয়েছে। কিন্তু বললেন না তো কেমন বেড়ালেন? কলকাতায় ফিরে আপনাকে একটা 'সাসানডিরি' উপন্যাস কিনে দেব। ওইসব অঞ্চলের পটভূমিতে লেখা। আমার দারুণ প্রিয় বই. কত যে গান আছে বইটিতে মুন্ডাদের। মুন্ডা মিথোলজি। একটি ঠাসবুনোন প্রেমের কাহিনির মধ্যে মধ্যে এসবই বুনে দিয়েছেন লেখক।

দিয়ো। ওইসব গানের একটা শোনাও না।

এসব তো নেচে নেচে গাইবার গান।

নেচেই গাও। আমি ছাড়া আর কে দেখবে?

দুষ্টুমিভরা হাসি হেসে দেবী বলল, আসলে আমি এত ভালো গাই আর নাচি যে শুধুমাত্র এক জনকে দেখানো, Waste of talent।

এইচ. পি. হাসলেন। দেবীর সেন্স অফ হিউমারে প্রীত হলেন।

দেবী উঠল। তারপর হাত দুটি মাথার পেছনে নিয়ে সামনে ঝুঁকে গান ধরল নীচু গলাতে।

"সোনালেকান দিশুম তাবু, রুপালেকান গামায় তাবু
ছোটোনাগাপুরেহো, মুন্ডাতুয়া হুডুম্‌সুকুরাসি, লিঙ্গিজোরতানা...
জোমতানকে জোমতানা নুতানকে নুতানা,
ছোটানাগাপুরেহো, মুন্ডাতুয়া হুডুম্‌সুকুরাসি লিঙ্গিজোরতানা...
আদা কানতো দানাকোয়াবু মিসিহানকো খোজার খোয়াবু
ছোটানাগাপুরেহো, মুকুতুয়া হুডুমসুকুরাসি লিঙ্গিজোরতানা...

মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন ফলসা-রং নাইটি-পরা গান-গাওয়া আর নৃত্যরতা দেবীর দিকে। একটি অল্প বয়সি জ্যাকারান্ডা গাছ যেন বেগনি ফুলের পসরা নিয়ে চৈত্র পবনে দুলে দুলে গান গাইছে।

গান ও নাচ থামিয়ে দেবী বলল, উফ। ভর পেট খেয়ে এমন কোমর ঝুঁকিয়ে কি নাচা যায়?

তা ঠিক। ভরপেট খাওয়ার পরে...

স্বগতোক্তির মতো বললেন এইচ. পি।

এবারে তা হলে ঘুম?

তুমি যা বলবে। বিষাদমগ্ন গলাতে বললেন, এইচ. পি।

তারপর একটু দ্বিধা ভরে বললেন, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা ছিল।

হবে। কাল তো রবিবার। আপনি তো কোর্টে যাবেন না। আমি তো আপনার সঙ্গে আপনার বাড়িতেই যাব। বলবেন কথা সারা দিন দরে।

রাতে কোথায় যাবে? তোমার মায়ের কাছে?

কোথাওই যাব না। মায়ের কাছে যাব, তবে পরে। কাল থেকে আমি আপনার সঙ্গেই থাকব। আপত্তি আছে কি আপনার?

আমার...মানে...

এইচ. পি. কিছুই না বলতে পেরে থেমে গেলেন।

তুমি তো ওপরে উঠবে। দাঁড়াও সিঁড়িটা লাগিয়ে দিই।

না স্যার। ওপরে উঠব না। আমি আপনার হাতে মাথা দিয়ে শোব আজ রাতে, আপনার পাশে। আমার বাবার হাতে যেমন শুতাম মাথা দিয়ে। আপনি আপত্তি করবেন?

এইচ. পি. কোনো কথা বললেন না।

শুয়ে পড়ুন স্যার। আপনি শুলে তবে না আমি পাশে শোব। ভীষণই ক্লান্ত আমি।

কোন হাতের ওপর মাথা দিয়ে শোবে?

আপনি যে হাত বাড়িয়ে দেবেন স্যার।

ডান হাতের ওপরে শোও।

ঠিক আছে। আপনি শোন আগে।

তারপর বলল, আলো কি সব নিভিয়ে দেব স্যার?

সব নিভিয়ে দাও। তুমি তো আলো করে রইলেই আমার পাশে। অন্য আলোর কি দরকার?

শব্দ না করে হাসল, দেবী।

আলো সব নিভিয়ে দিয়ে সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা এইচ. পি-র ডান হাতে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল দেবী। তার চুল তখনও ভিজে ছিল. এইচ. পি-র হাতটি দেবীর সুগন্ধি চুল ভিজে গেল।

এইচ. পি. বললেন, তুমি কি ডিসিশান নিয়ে ফেলেছ?

হ্যাঁ।

কেন? এই ধুমসো-ফ্যাটসোর মধ্যে কী দেখলে তুমি।

খুব নীচু কিন্তু গাঢ় স্বরে দেবী বলল, একজন পুরুষের মধ্যে মেয়েরা যা দেখে। মেধা, অর্থ, সাফল্য, ভালোত্ব এবং যশই মেয়েদের কাছে সবচেয়ে বড়ো পৌরুষ, বিশেষ করে সে সব স্বোপার্জিত যদি হয়, চালাকির দ্বারা না-পাওয়া হয়। শরীরটা যদি এতই দামি হত তবে মেয়েরা পুরুষদের বিয়ে না করে ঘোড়াদের বা ষাঁড়দেরই বিয়ে করত। অনেকে তা করেও অবশ্য।

আর কিছু বলবে?

এইচ. পি-র হাতের ওপরে পাশ ফিরে তাঁর গালের সঙ্গে গাল লাগিয়ে দেবী ফিশফিশ করে বলল, আপনার কাছে থাকলে আমি নিরাপদ এবং নিশ্চিন্ত বোধ করব। আপনি আমাকে ফেলে দেবেন না তো স্যার?

না। কোনো দিনও না।

আমাকে একটা গাবলু-গুবলু ছেলে দেবেন?

এইচ. পি-র গলা ধরে এল। অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। তারপরে ফিশফিশ করে, প্রায় স্বগতোক্তি করার মতো করেই উনি বললেন, দেব।

দেবী বলল, সন্ধেবেলাতে দাড়ি কামাননি বুঝি স্যার? আমার গাল জ্বালা করছে। প্রত্যেক দিন দু'বেলাই দাড়ি কামাতে হবে কিন্তু।

এইচ. পি. দেবীকে জড়িয়ে ধরলেন। মুখে কিছুই বললেন না। চলন্ত ট্রেনের অন্ধকার কামরাতে শায়ীন একজন প্রাগৈতিহাসিক পুরুষের দু চোখে নিঃশব্দে আনন্দাশ্রু বইতে লাগল।

এই উপন্যাসে বর্ণিত ব্যারিস্টার হরপ্রসাদ চ্যাটার্জি (এইচ. পি.), ব্যারিস্টার মৃগেন মিত্র এবং তাঁর স্ত্রী, দেবী (দেবীশ্রী), কিংশুক এবং অন্তু পুরোপুরিই কাল্পনিক চরিত্র। বাস্তবের কোনো চরিত্র সঙ্গে এঁদের বিন্দুমাত্র মিল লক্ষিত হলেও তা দুর্ঘটনাপ্রসূত বলেই জানতে হবে। —লেখক

পাখিরা জানে

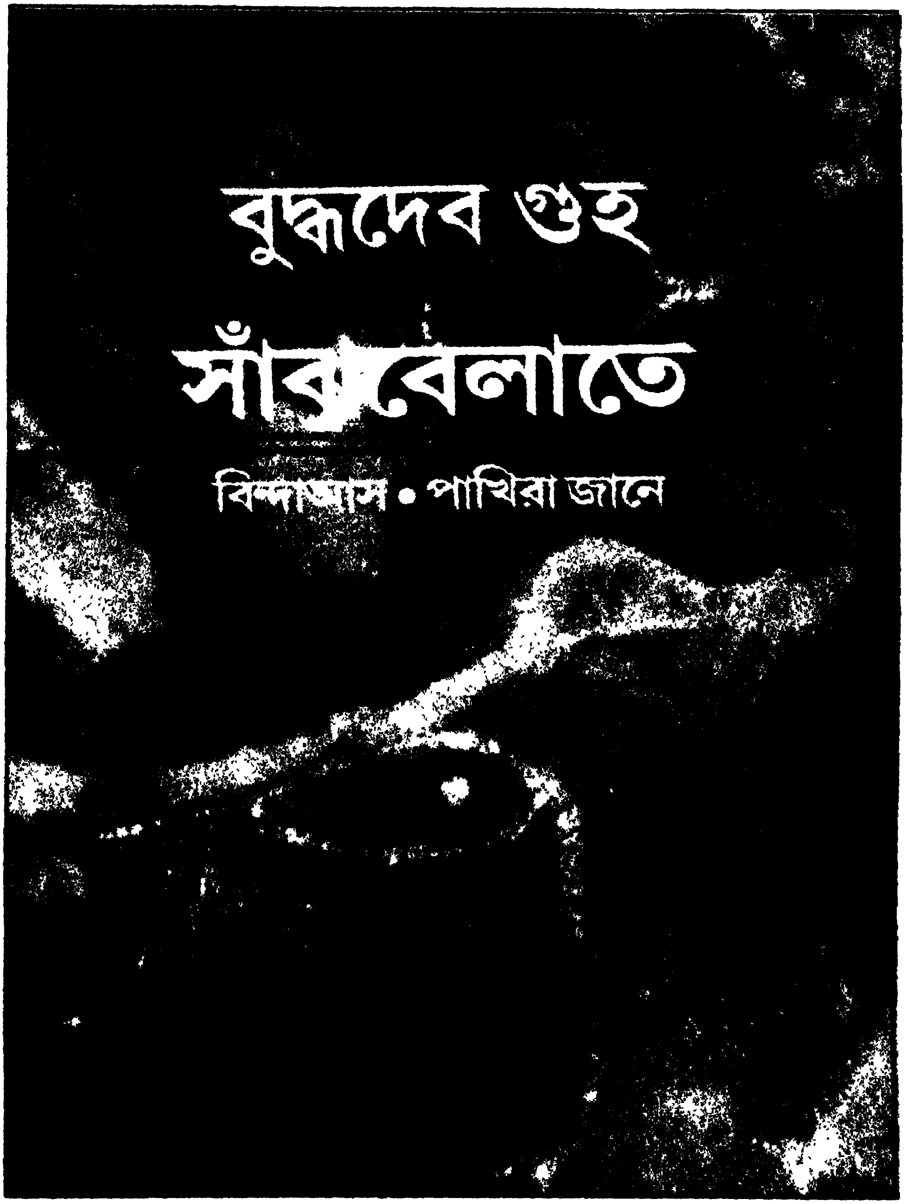

উৎসর্গ

সুভাষ এবং শুক্লা ভৌমিক-কে

প্রচ্ছদ

বুদ্ধদেব গুহ

আর বড়জোর আধঘণ্টা। সামনের উলঝি সাব-স্টেশনের সিগন্যালে যদি না আটকায় তবে হৃদয়পুরে ট্রেন পৌঁছে যাবে আর আধঘন্টার মধ্যে।

তকাই বলল, তার হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে।

অনিকেত নিজের হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল প্রায় বারোটা বাজে। বড় জংশনে গাড়ি বদল করেছিল সকাল নটাতে। তারপর বিহার ছেড়ে পশ্চিমবাংলায় ঢুকে আবারও বিহারে ঢুকেছিল কি না তা ও বলতে পারবে না। কারণ, হাইওয়েতে যেমন বোর্ড থাকে, 'উ্য আর লিভিং বিহার অ্যান্ড এনটারিং ওয়েস্ট বেঙ্গল কি ওড়িশা' এবং 'ওয়েলকাম'—সে রকম কোনও বোর্ড-টোর্ড তো থাকে না রেলের ট্র্যাকে তাই নিত্য-যাত্রী ও অভিজ্ঞরা ছাড়া অন্যের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় কোথা দিয়ে চলেছে ট্রেন। আমাদের দেশের তো বটেই পৃথিবীর অনেক দেশেই এক রাজ্য বা এক দেশ থেকে অন্য রাজ্যে পৌঁছলে তাৎক্ষণিক কোনও ভৌগোলিক তফাত চোখে আদৌ পড়ে না।

কী রে। খিদে পেয়েছে নাকি? ভেটকু? অনিকেতের ডাক নাম ভেটকু। তবে সে নামে খুব অল্প মানুষই ডাকে তাকে।

পেয়েছে। তবে তেমন কিছু নয়।

চল। পৌঁছে গেলে স্টেশন থেকে মামাবাড়ি পৌঁছতে বড়জোর মিনিট কুড়ি-পঁচিশ লাগবে। ছোটমামা নিশ্চয়ই আসবেন স্টেশনে তাঁর পক্ষীরাজ নিয়ে।

পক্ষীরাজ মানে?

মানে, ছোটমামার জিপ গাড়ি। এখন ছোটমামার। আগে দাদুর ছিল। নাইন্টিন ফিফটিতে আমেরিকান ডিসপোজাল থেকে দাদু কিনেছিলেন। তখন দাদুর শিকারের সখ ছিল। আর তখন এই সমস্ত অঞ্চলেই তো ঘন বন ছিল। পাহাড়, নদী আর পশু-পাখিও ছিল অনেক। চাষাবাদই করা যেত না তাদের উৎপাতের জন্য। তখন শিকার করতে হত বাধ্য হয়ে, প্রাণ ও ধন রক্ষারই জন্য। অতএব, তা দোষের ছিল না। দাদুর মৃত্যুর পরে দাদুর প্রিয় ছোট ছেলে ওয়ারিশন হয়েছে ওই জিপ গাড়ির। একটা আকাশি-নীল রঙা রোভার ছিল, একটা উলসলি গাড়ি, কনভার্টিবল। মানে, ছাদ সরানো যেত। সে সব অন্য মামারা পেয়েছিলেন। দাদুকে আমি দেখিনি। চল্লিশ বছর আগে দাদু মারা গেছেন। তার এক বছর পরে আমার জন্ম। এসবই মায়ের কাছেই শোনা।

ছোটমামা ওই জিপ নিয়েই খুশি। চাষাবাদ এখনও ছোটমামাই সব দেখেন। বিয়ে-থা করেননি। জিপটাকে এখনও এত আদরে রেখেছেন যেন মনে হয় তৃতীয় পক্ষের বউ। নিজেকে বলেন 'শিক্ষিত চাষা'। বেনারস ইউনিভার্সিটির ইংরেজির এম এ। উর্দু শের-এর রসিক। ভারি ইন্টারেস্টিং মানুষ। আমাদের চেয়ে বয়সে কম করে কুড়ি বছরের বড় হলেও তোর মনে হবে যেন তোর সমবয়সি বন্ধু।

তোর ছোটমামার নাম কী?

ভবতোষ চাটুজ্যে।

তকাই বলল।

তারপর বলল, ছোটমামার নাম ভবতোষ, মেজমামার নাম মহীতোষ আর বড়- মামার নাম আশুতোষ। এই সব 'তোষামোদী' সবই দাদুর কীর্তি। তিনি ছিলেন দেবতোষ। সেটাও ঠাকুর্দার কুকীর্তি।

আর দেবতোষের মেয়েদের নাম? তাও কি সব তোষ দিয়ে?

ভেটুক শুধোল।

বলছি। আশুতোষ মুখুজ্যেদের দেখে টুকলিফাই করেছিল বড়মামা। ওই পরিবারেও যেমন সকলেই হয় 'প্রসাদ' নয় 'তোষ' আমার মামাবাড়িতেও তেমনই। মেজমামা এক সময়ে কাজ করতেন কলকাতার সায়েবদের কোম্পানি ম্যাকিনটোশ অ্যান্ড বার্ন-এ। তাঁর খাস কাজের লোকের নাম ছিল মকিচোস। লোকে বলত, হৃদয়পুরের চাটুজ্যেরা নিজেরা তো বটেই, তাদের মনিব এবং চাকরদের এই প্রসাদ আর তোষে-চোষে মুড়ে রেখেছে।

অনিকেত হাসল।

বলল, ইন্টারেস্টিং তো।

আর মেয়েদের বেলা? মেয়েদের নাম বললি না?

তারা সব 'দায়িনী'। শুধু মেয়েরাই নন, নাতনীরাও। প্রাণদায়িনী, মানদায়িনী, প্রেমদায়িনী, এরকম। ভাগ্যিস কারওর নাম প্রাণঘাতিনী রাখেননি। শুধুমাত্র বড়মামার ছোট মেয়েই বিদ্রোহ করেছে। সে তার স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার আগে কারওকে না জানিয়ে কলকাতার এক নোটারি পাবলিক-এর কাছে গিয়ে অ্যাফিডেভিট করে নাম পাল্টে করে নিয়েছে হিমিকা।

তার অরিজিনাল নাম কী ছিল?

প্রেমদায়িনী।

জাস্ট ভেবে দ্যাখ। কলকাতাতে প্রেসিডেন্সিতে পড়ার কথা ছিল, পড়েওছিল। কোনও মেয়ের নাম যদি প্রেমদায়িনী হয় কো-এড কলেজে, তবে তার ঝক্কির কথাটা একবার ভাবত।

হিমিকা! সে তো আরও কিম্ভূত নাম।

অনিকেত বলল।

কেন কিম্ভূত নাম কেন? তুই তো ইলেকট্রনিক্সের এঞ্জিনিয়ার, তুই বাংলা ভাষার কোনও খোঁজই রাখিস না তাই এমন কথা বলছিস। কম্পিউটার-সর্বস্ব তোরা। মাতৃভাষাকে পর্যন্ত বরবাদ করে দিলি। ছ্যাঃ।

মানেটা বল না, আজেবাজে না বকে। তোর চেয়ে ভাল বাংলা জানি আমি।

হিমিকা মানে হচ্ছে কুয়াশা। হিমিকা তো সিম্পল নাম, এ বাড়ির ট্রাডিশন অনুযায়ী ও তো নাম রাখতে পারত নিজের কুজ্ঝটিকাও।

তা অবশ্য ঠিক।

অনি বলল।

বলেই বলল, এই গাছগুলো কী গাছ রে? বড় বড় গাছ, কী সুন্দর সব ফিনফিনে মসৃণ বড় বড় ফুলে ভরা। আর ফুলগুলোর রঙই বা কী সুন্দর। এই লালকে তো গেরুয়া লাল, লামা লাল, সিঁদুরে লাল, ভগুয়া লাল, কিছু বলেই ব্যাখ্যা করা যায় না।

এতো মাছের রক্ত-ধোয়া জলের মতো লাল।

সাব্বাস!

তকাই বলল।

অনেক লালের কথা শুনেছি আমি আমার আর্টিস্ট বন্ধু সুমন্ত্রর কাছে কিন্তু 'মাছের রক্ত-ধোয়া লালের' কথা কোথাও শুনিনি। 'চাল-ধোয়া জলের মতো সাদা' শুনেছি, 'ফলসার মতো বেগুনি' কিন্তু নাঃ...

গাছগুলোর নামটা বলবি।

অনি এবারে বিরক্ত হয়ে বলল।

এই গাছগুলোর নাম কুসুম। রবীন্দ্রনাথের গানে আছে না? 'কুসুমবনেতে'।

এগুলোই কুসুমগাছ?

ইয়েস, মিস্টার ভেটকু।

এত বড় বড় গাছ হয়?

ইয়েস। আর ফর ইওর ইনফরমেশন, ওগুলো ফুল নয়, পাতা।

পাতা! বলিস কী রে?

ইয়েস। নতুন পাতা। এগুলোকেই বলে, কিশলয়। 'বনময় ওরা কার কথা কয় রে'। এই গানও শুনিসনি?

তুই সব গুলিয়ে দিস না তকাই। এক এক করে বল।

কী আর বলব বল। বছরের এ সময়টা কী তা জানিস?

মার্চের মাঝামাঝি। বাংলা মাসের কথা জানি না।

খুব গর্বের কথা। মাসটা চৈত্র। 'চৈত্রপবনে মম চিত্তবনে বাণীমঞ্জরী সঞ্চলিতা ওগো ললিতা' শুনিসনি? সেই চৈত্র।

কিন্তু এ হল বসন্ত ঋতুও। তুই তো জল-বসন্ত ছাড়া অন্য বসন্ত কিছু দেখিসনি। আসল বসন্ত তো আজকাল ভদ্রলোকদের হয় না। এই হৃদয়পুরের মানুষদের কাছে আসল বসন্তের নাম চীচক্। মায়ের কাছে এখন শুনেছি যে, যে 'মায়ের দয়া' হলে তখনকার দিনে বাঁচাই কঠিন ছিল। তবে অনেকে বেঁচেও যেত। কিন্তু এই বসন্ত ঋতু যদি তোকে তেমন করে আক্রমণ করে তবে বাঁচার কোনও সম্ভাবনাই নেই। এ চীচক্-এর বাবা। এ তো আর তোদের দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারী অ্যাভিন্যু নয়। জায়গার নাম হৃদয়পুর। সময়ের নাম বসন্ত, মাসের নাম চৈত্র, এবং পক্ষর নাম শুক্ল। তুই এবারে মানে মানে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলে হয়। ফুল, পাখি চাঁদ এরাই হচ্ছে ওই বসন্তর দূত।

দমদম এয়ারপোর্টের কাছেও তো হৃদয়পুর বলে একটা জায়গা আছে।

অনি বলল।

জানি না। থাকতে পারে। তবে হৃদয়ে হৃদয়ে তফাত যেমন থাকে তেমন হৃদয়পুরে হৃদয়পুরেও তফাত থাকে। কোথায় আমাদের মামাদের হৃদয়পুর আর কোথায় ধ্যাড়ধ্যাড়ে গোবিন্দপুর। ছাড় তো!

সেটা কী আবার? পক্ষই বা কী? শুক্লই বা কী?

ধন্যি বাঙালি! শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষর নামও শোনোনি। পূর্ণিমা অমাবস্যা? কেন? তোর দাদুর বাত বাড়ে না পূর্ণিমা অমাবস্যাতে?

ঠিক বলেছিস তো। দাদু বলতেন বটে, ওরে ভেটকু, আজ কি অমাবস্যা? দাদুরে আমার, পা-টা একটু টিপে দিবি? পা-টা যে চিবিয়ে খেয়ে নিলে রে!

হ্যাঁ। তবে তো জানিসই। পূর্ণিমার আগে চোদ্দদিন শুক্লপক্ষ আর অমাবস্যার আগের চোদ্দদিন হল কৃষ্ণপক্ষ। বুয়েচ?

তা শুক্লপক্ষের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী?

সম্পর্ক ছিল না। এবারে হবে। ফুরফুর করে বসন্তর হাওয়া দেবে যখন, মহুয়া আর করৌঞ্জ এবং আরও কত নাম না জানা বনফুলের গন্ধ বয়ে আনবে, যখন হলুদরঙা চাঁদটা উঠবে ভালু-টোংড়ি পাহাড়ের গায়ে শাল আর কুসুমবনের মাথাতে, পিউ-কাঁহা বুকের মধ্যে বারে বারে চমক তুলে 'পিউ কাঁহা' করে ডাকতে থাকবে তখন তোর মনে হবে শাল্লা, কী করতে এলুম এই হৃদয়পুরে। সেই ডাক তোর হৃদয়ে চাবুক মারবে। মন বলবে, 'চাঁদের বনে যার পাশে যাই তারেই লাগে ভাল।' তোকে পাহাড়ের ওপরে হৃদি-ঝোড়ার পাশে নিয়ে যাব। তখন দেখবি যে, এই হৃদয়পুরেই তোর হৃদয় খসবে, চৈত্র শেষের শালপাতার মতো, তারপরে ব্যালেরিনার মতো নাচতে নাচতে ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে এসে বনের পায়ের কাছের কোনও কালো শিলাসনের ওপরে মুচমুচিয়ে পড়বে। তোর বড়ই বিপদ হবে রে ভেটকু। চাঁদের বনে যে জীবনের প্রথমবার আসে তার পক্ষে বেঁচে ফিরে যাওয়া মুশকিল। জিন-পরীরা তোকে হয়তো তোর হাত না ধরেই ধরে নিয়ে যাবে, ডাক দেবে নিশির ডাকের মতো, বনের গভীরে নিয়ে যাবে, ডাইনি-জ্যোৎস্নার ভিতরে, তুই

আর ফিরে আসতে পারবি না। কলকাতাতে আমি একা ফিরলে, মাসিমা কেঁদে কেঁদে বলবেন, বিধবার একমাত্র ছেলেটাকে কোথায় ফেলে এলে বাবা তকাই? আমার যে আর কেউই নেই।

তকাই বলল।

তারপর সিরিয়াস গলাতে বলল, তবে এ যাত্রায় হয়তো বেঁচে যাবি কারণ তোর হৃদয় নেবার মতো এখন এখানে কেউই নেই।

ভেটকু বলল, সকলেই তোর মতো সেন্টিমেন্টাল ফুল নয়। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র। চাঁদ, পাখি, বসন্তের হাওয়া, ডাইনি না ফাইনি জ্যোৎস্না, এ সব ফালতু ব্যাপার আমার ওপরে কোনও প্রভাবই ফেলবে না।

তকাই বলল, ঠিক আছে। দেখব, কিন্তু সত্যিই যদি না ফেলে, তাহলে বুঝতে হবে তুই একটা রামছাগল। মানুষও খুন করতে পারিস। যে মানুষ বসন্ত না ভালবাসে সে অবশ্যই মানুষ খুন করতে পারে।

ট্রেনটার গতি কমে এল। দু পাশেই লাল খাপরার চালের মাটির ঘর, বাঁশের বাখারি বা শালকাঠের খুঁটির বেড়া দেওয়া। কোনও কোনও বাড়ি থেকে উঁচু বাঁশে বা গাছের খুঁটিতে লাল পতাকা উড়ছে দুপুরের হাওয়াতে পত্ পত্ করে।

অনিকেত তা লক্ষ করে বলল, এদিকের মানুষেরা কি সবাই কম্যুনিস্ট নাকি? এত লাল পতাকার ছড়াছড়ি।

তকাই হেসে বলল, এরা কম্যুনিস্টদের যম। শুধু লালে কি কম্যুনিস্ট হয়? কাস্তে হাতুড়ি লাগে না? এরা কম্যুনিস্ট নয়, কম-অনিষ্ট।

মানে? কী বলছিস খুলে বল।

মানে, এই ঝাণ্ডাগুলোর নাম হনুমান-ঝাণ্ডা। আর এই ঝাণ্ডা হচ্ছে রামসেবক হনুমানের। যার ভাল নাম, বজরংবলী।

কী বলি?

বজরংবলী।

তারপর বলল, কম্যুনিস্টদের অনেক কিছুই ভাল কিন্তু তারা পশ্চিমবঙ্গ আর ভারতবর্ষর মধ্যে গুলিয়ে ফেলেছে। পশ্চিমবঙ্গ আর কেরালাই যে ভারতবর্ষ নয়, ভারতবর্ষ যে একটা বিরাট দেশ এবং সেই ভারতবর্ষে রাম তো অনেক বড় ব্যাপার, তার চ্যালা-হনুমানও যে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ভারতীয়দের কাছে, এই কথাটার সত্য বুঝতে হলে সারা দেশকে জানতে হবে। কুয়োর ব্যাং হয়ে বসে থাকলে এই জ্ঞানচক্ষু কোনওদিনই উন্মীলিত হবে না।

এসব কথা ছাড়ত। নিয়ে এলি মামাবাড়িতে বেড়াতে। কোথায় তিনটে দিন একটু রিল্যাক্স করব তা নয়...

না, তুই তো আবার কিছু দাদা আর গোদার ভক্ত কিনা! তা তোর দিক দিয়ে ভালই করিস। তোর আখেরে লাভই হবে।

তুই থামত। মাথা ধরে গেল।

ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে। খোলা প্ল্যাটফর্ম। শেড-টেড নেই।

অনি বলল, তুই আজকাল বড় বেশি কথা বলিস। ধান ভানতে শিবের গীত।

তকাই বলল, ওই তো ছোটমামা এসেছেন।

কোন জন?

ওই যে রে। উ্য কান্ট মিস হিম।

সুভাষ চক্রবর্তী নাকি? এমন মড পোশাকে।

ভাগ।

প্ল্যাটফর্মের আতা গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে আছেন।

ওইটা বুঝি আতা গাছ?

হ্যাঁ।

ওই জিন-এর প্যান্ট, নাইক আর গেঞ্জি, মাথায় হ্যাট আর মুখে সিগার দেওয়া ভদ্রলোক। উনিই তোর ছোটমামা? শিক্ষিত চাষা?

ইয়েস। শিক্ষিত চাষা। এই পোশাকটা ভেক। তোর মতো সাহেবকে রিসিভ করার জন্যেই পরে এসেছেন। তোকে বাজিয়ে নিতে চান আর কী! উনি কিন্তু সত্যিই শিক্ষিত চাষা। আমার ছোটমামার মতো অরিজিনাল, জেনুইন, ভণ্ডামিহীন মানুষ এই দেশে অনেক বেশি সংখ্যাতে থাকলে দেশটার চেহারাই আজ অন্যরকম হয়ে যেত।

'নরাণাং মাতুলক্রমঃ'। সেই জন্যেই বোধহয় তোর সঙ্গে মিল আছে তোর ছোটমামার।

এটা প্রশংসা না গালি তা বুঝতে পারলাম না। এখন নামত। তার পরে দেখব। তুই পালাবি কোথায় রে ভেটকু। এখন তো আমারই কব্জায়। তোকে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাব।

ওভারনাইটার আর কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা তুলে নিয়ে অনি তকাই-এর পেছন পেছন নামবার জন্যে এগোল।

অনি বলল, এটা আবার কী রকম এক্সপ্রেশন।

আমরা তো বাঙাল। মামারা পশ্চিমবঙ্গীয়। ছেলেবেলাতে গ্রামে শুনেছি এই কথা—'কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাব'। বহু বছর বাদে ঠোঁটের ডগায় এসে গেল, তাই দেগে দিলাম তোকে।

আয়। আয়। বলে তকাই-এর ছোটমামা ভবতোষ চাটুজ্যে এগিয়ে এলেন। প্ল্যাটফর্মের ওপরে।

এই যে আমার বন্ধু অনিকেত রায়। আর এই আমার ছোটমামা। তোমার কথা ওকে অনেক বলেছি। ওর ডাকনাম ভেটকু।

অনি বলল, আপনার সম্বন্ধে যা বলেছে তকাই ছোটমামা, তাতে তো মনে হচ্ছে আপনার সব সম্পত্তি হাতাবারই মতলবে আছে তকাই। নইলে, এত প্রশংসা কেউ এমনি এমনি করে বলে আমার মনে হয় না।

ভবতোষ বললেন, তোমার অনুমান ভুল। কারণ, এই ভবা চাটুজ্যে মরে গেলে দেখা যাবে তার দেনাই আছে বিস্তর। সম্পত্তি থাকবে না আদৌ। তকাই আমাকে সত্যিই ভালবাসে। এবং ভালবাসা অন্ধ বলেই এ রকম বলে। ওর কথা সিরিয়াসলি নিও না বাবা।

বলেই, পাশেই দাঁড়ানো প্রায় ওদেরই সমবয়সি ছেলেটিকে বললেন, এই সাঁটুল। হাঁ করে কথা গিলছিস কি? মালগুলো নে না অতিথি আর তকাইদার হাত থেকে। সহবত যদি একটুও শিখলি! নতুন মানুষ দেখলেই ভোঁদা বনে যাস তুই।

ওভারনাইটারটা দিয়ে কাঁধে ঝোলানো ডিজিটাল-লক-এর ব্যাগটা হাতেই রাখল।

ছোটমামা বললেন, ওতে বুঝি টাকা আছে? তা থাকুক। দিয়ে দাও সাঁটুলকে। আমাদের হৃদয়পুরে চোর নেই। সবাই হৃদয়বান এখানে। তাছাড়া সাঁটুল বলতে গেলে, আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার।

লজ্জা পেল খুবই অনিকেত। সত্যিই ওর মধ্যে ওর পার্সটা ছিল। হাজার ছয়েক টাকা ছিল। যদিও প্রয়োজন হবে না হয়তো, তবু বাইরে গেলে সঙ্গে নিয়ে বেরোয়। অভ্যাসবশেই।

না, না, মানে, এখানে তো ক্রেডিট কার্ড চলবে না, তাই...

লজ্জিত হয়ে ব্যাগটা সাঁটুলকে দিতে দিতে বলল, অনিকেত।

এখানে ক্রেডিট কার্ড না চললে কোথায় চলবে বৎস? হৃদয়পুরে তুমি তকাই-এর মামাবাড়িতে এসেছ, দু-চোখ বুজে সই কর। তোমার সব সইই এখানে অনার্ড হবে—কোনও লিমিট নেই কিছুরই ওপরে। আনলিমিটেড ক্রেডিট।

হাসল অনিকেত। ভাবল, তকাই-এর ছোটমামা ভারি ওভার-কনফিডেন্ট মানুষ। অন্যে অপ্রতিভ হল কি হল না তা নিয়ে তাঁর কোনও মাথাব্যথা নেই।

যেন অনিকেতের মনের কথা বুঝতে পেরেই ছোটমামা বললেন, সম্পত্তির ওয়ারিশানের কথা বলছিলে বাবা তুমি, সম্পত্তি বলতে তকাই পেয়েছে আমার টাক আর বুকের চুল। বুকের চুল তো নয়, আমাদের পরিবারের এ বস্তুকে জঙ্গল বলাই ভাল। বড়দার মেয়ে হিমিকা ছেলেবেলাতে আমার পেটের ওপরে বসে বলত, 'থোতোকাকু, তোমার বুক কম্বলে থোব একটু?'

বলেই, বললেন, ভাল কথা, তকাই, তোকে বলাই হয়নি, হিমি এসেছে পরশু।

ও কি এখনও ব্যাঙ্গালোরেই আছে? বম্বেতে ট্রান্সফার হবার কথা ছিল না।

না। এখনও ব্যাঙ্গালোরেই। পনেরো দিনের ছুটিতে এসেছে।

ওভারব্রিজ দিয়ে লাইন পেরিয়ে ওরা যখন আবার প্ল্যাটফর্মে নেমে গেটের দিকে এগোতে লাগল, তকাই বলল, হিমি কি বিয়ে করবে না?

ওসব কথা তুইই ওকে জিজ্ঞেস করিস। আজকালকার সব ছেলেমেয়ে। ওদের কথা, ওরাই জানে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, কাল রাতেই খেতে বসে বড়দাকে বলছিল। বড়বউদি তো মরে গিয়ে বেঁচে গেছেন। হিমি বলছিল যে, বাবা, অল্পবয়সে না বুঝে-সুঝে ওই অপকর্মটি যারা চোখ-কান বুজে ক্যাস্টর অয়েল গেলার মতোই করে ফেলতে পারে তাদের কথা আলাদা। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে বিয়ে করাটা বাঘ মারার চেয়েও সাহসের কাজ। ভীষণই রিস্কি ব্যাপার। তোমাদের সময় তো আর নেই। বিয়েটা আর এখন Means to an end নয়। ডিভোর্স হতে কতক্ষণ? তাহলে বিয়ে আদৌ করা কেন?

ভবতোষ ভেটকুর দিকে ফিরে বললেন, তোমার ছেলেমেয়ে কী বৎস?

আজ্ঞে?

প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে না পেরে, অনিকেত প্রশ্ন করল।

উনি বিশদ করে বললেন, মানে, তোমার সন্তানাদি কী? 'হাম দোনো, হামারা দোনো' এক ছেলে এক মেয়ে? ব্যস। ফ্যামিলি প্ল্যানিং কমপ্লিট?

অনি অপ্রতিভ হয়ে বোকা বোকা হাসল।

অনিকেত তো বিয়েই করেনি ছোটমামা।

তকাই বলল।

তাই? তারপর বললেন, ভেরি স্ট্রেঞ্জ ইনডিড। স্ট্রেঞ্জই বা বলি কী কেন। বাড়িতেই তো একটি স্যাম্পল আছে।

তারপর বললেন, তা, তোমার বয়স কত হল বাবা?

আটত্রিশ।

চমৎকার।

তকাই বলল, তাতে কী হল? আমারও তো বউ নেই।

সে তো তোর বউ ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়াতে মরে গেল বলে নেই। আহা! সুমির কথা মনে পড়িয়ে দিয়ে মনটা খারাপ করে দিলি রে।

তকাই বলল, আচ্ছা ছোটমামা, তুমি নিজে ব্যাচেলর হয়ে বিয়ে বিয়ে করে খেপে উঠলে কেন বল তো? তুমি নিজে কেন ব্যাচেলর থাকলে?

সে কথা তোরা জানিস না? সেই যে কথা আছে না "a bachelor is a souvenir of a woman who had found a better one at the last moment."

তারপর বললেন, না, এই পৃথিবীটার কোনও রোগ হয়েছে। হয় তাই, নয় আমরা সব অবসলিট হয়ে গেছি। তোমাদের কাণ্ড-মাণ্ড ক্রিয়া-কলাপ কিছুমাত্র বুঝি না। মাঝে মাঝেই এই পৃথিবীকে বড় অচেনা লাগে।

জিপের ড্রাইভিং-সিটে ছোটমামা উঠে বসে তকাই আর ভেটকুকে পাশে বসালেন। ভিতরে

তকাই, বাইরে ভেটকু। জিপটার মাথার ওপর ক্যানভাসের চাঁদোয়া থাকার কথা ছিল। সেটা এখন নেই। নেই-ই, না আপাতত খুলে রাখা হয়েছে, তা বুঝতে পারল না তকাই।

ছোটমামা এঞ্জিন স্টার্ট করেই বাঁই বাঁই করে স্টিয়ারিং ঘোরাতে লাগলেন কিন্তু জিপ একটুও ডান দিক বাঁ দিক হল না। স্টিয়ারিং বার দশেক পুরো ঘোরালেন তার পরে টাই-রড কথা বলল স্টিয়ারিং-এর সঙ্গে। তারপর জিপটা বাঁদিকে মুখ ফেরাল।

ছোটমামা বললেন, দশ পাক ফলস আছে স্টিয়ারিং। এ গাড়ি আমি ছাড়া আর কেউই চালাতে পারবে না। হিন্দিতে একটা কহবৎ আছে না? 'জিসকি বাঁদরী ওহি নাচায়' এও হচ্ছে সেই ব্যাপার। এই জিপের মান-অভিমান-রাগ এসব কোনও কিছুই আমি ছাড়া অন্যে আদৌ বোঝে না।

বলেই বললেন, কীরে তকাই, 'টিকিয়া উড়ান' চালাই?

তকাই বলল, চালাও।

ছোটমামা হ্যাটটাকে পেছনে, মালপত্র সামনে বসে থাকা সাঁটুলের হাতে চালান করে দিয়ে বললেন, আমার তো মাথা ভরা টাক। টিকি থাকলে তবুও না হয়...

তকাই বলল, কহবৎটার মানে বুঝলি?

বোকার মতো ভেটকু বলল, না।

কহবৎ কী?

আরে, কহবৎ হচ্ছে প্রবাদ।

'টিকিয়া উড়ান' চালানো মানে, গাড়ি এতই জোরে চলবে যে ড্রাইভারের টিকিটা উড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠবে মাথার পেছনে। সেই রকম ড্রাইভিংকেই বলে 'টিকিয়া উড়ান' চালানো।

২

খুব ভোরেই উঠে ট্রেন ধরেছিল তাই দুপুরের ভূরিভোজের পরে ঘুমিয়ে পড়েছিল অনিকেত।

তাকে যে ঘরটি দেওয়া হয়েছে তার জানালা দিয়ে তাকালে দেখা যায় একটি পাহাড়, গভীর জঙ্গলে ভরা। তবে পাহাড়টি কাছে মনে হলেও অবশ্যই অনেক দূরে। তার পাদভূমিতে নানা গাছের জঙ্গল। দুপুরের উথাল পাথাল করা চৈতি হাওয়াটা এখন শান্ত হয়েছে, তবু বনমর্মর শোনা যাচ্ছে মৃদু। বিছানা ছেড়ে উঠে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল অনিকেত। কী সুন্দর এই প্রকৃতি। এক মিশ্র গন্ধ ভেসে আসছে পাহাড় ও বনকে ছুঁয়ে আসা ওই বাসন্তী হাওয়ায়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ও জানালারই সামনে রাখা ইজিচেয়ারটাতে বসল। এই ঘরটা নাকি গেস্ট-রুম। আরও দুটি ঘর আছে এ রকম এই বাংলোতে। তকাই বলছিল।

এখন চারটে বাজে, চারদিক লালে লাল হয়ে রয়েছে। ট্রেন থেকে যে কুসুম গাছ দেখিয়েছিল তকাই সেই গাছও আছে পাহাড়তলিতে অনেকগুলো। আরও নানা গাছে লাল ফুল ফুটেছে। গাছগুলোর একটারও নাম জানে না। জানতে হবে। তকাই-এর মামাবাড়িটি বাংলো ধাঁচের। বাইরে চওড়া বারান্দা। ভিতরেও বারান্দা। বারান্দার পরে উঠোন। উঠোনের ও পাশে রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর। কাজের লোকদের থাকার জায়গা।

তকাই-এর মেজমামা মারা গেছেন বছর পাঁচেক আগে। তাঁর একই ছেলে। স্টেটস-এর হ্যস্টনে থাকে। বিয়ে করেছে। একটি মাত্র মেয়ে। পুজোর সময়ে আসে। হৃদয়পুরে তকাই-এর মামাবাড়িতে প্রতি বছর দুর্গাপুজো হয় নাকি সব রীতিনীতি মেনে। সবাই উপোস করেন, অঞ্জলি দেন। পাঁঠাবলিও হয়। হৃদয়পুরে দুটি বারোয়ারি পুজো হলেও ওঁদের বাড়ির পুজো দেখতে বহু দূর দূর থেকে মানুষ আসে নাকি। আসলে কলেজে পড়ার দিন থেকেই তকাই ভেটকুকে মামাবাড়ির পুজোর কথা বলে আসছে। বহুবার যেতে বলেছে কিন্তু আসা হয়ে ওঠেনি। অবশেষে এল এত বছর পরে। যদিও পুজোর সময়ে নয়। আগে যে কেন আসেনি, তা ভেবে আফসোস হচ্ছে এখন ভেটকুর।

বড়মামা ভারি চমৎকার মানুষ। বয়স হয়েছে। খুব রাশভারি। পাইপ খান। দিনে রাতের অধিকাংশ সময়ই নিজের লাইব্রেরি ঘরে কাটান। হৃদয়পুরের পাবলিক লাইব্রেরি, হাসপাতাল ইত্যাদিতেও তাঁদের অনেক দান-ধ্যান আছে। গত বছরই নাকি একটি প্রাথমিক স্কুলের পত্তন করেছেন সরকারের কোনও রকম অনুদান না নিয়েই। ভবিষ্যতেও নেবেন না।

খাওয়ার সময়ে উনি বলছিলেন যে, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থারই সবচেয়ে অবনতি হয়েছে এবং স্বাস্থ্য পরিষেবারও। সারা রাজ্যের মানুষের যদি পাঠ্যপুস্তকের মান, শিক্ষকদের মান, তাদের নিয়োগ এবং বদলি ইত্যাদি নিয়ে কিছুমাত্র মাথাব্যথা না থাকে, তাহলে ভুগবেন তাঁরাই। যথেষ্টই ভুগেছেনও। ক্ষতি যা হবার তা হয়েছে অনেকদিনই।

রাজ্যে যা হবার হোক, উনি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ হিসেবেই এই স্কুলের পত্তন করেছেন। তাঁদের বাবা দেবতোষের নামে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রায় অবৈতনিক। স্কুলে অনেক ছাত্র-ছাত্রী হয়েছে ইতিমধ্যেই। কলকাতার দু-তিনটি ভাল প্রাইভেট স্কুলের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছেন তাঁর স্কুলের ছেলেমেয়েরা যাতে সরাসরি সেখানে ভর্তি হতে পারে। সপ্তম শ্রেণী অবধি রেখেছেন তাঁর স্কুলে। সরকারের অ্যাফিলিয়েশন চাননি, অনুদান তো নেনই নি কোন, ভবিষ্যতেও নেবেন না। ভদ্রলোক অত্যন্ত শক্ত ধাতের মানুষ। যাকে অন্যায় বলে জেনেছেন তার বিরুদ্ধে তাঁর যা করণীয় তা একা হাতেই করতে তিনি বদ্ধপরিকর। তাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের কম্যুনিষ্ট বানানোর চক্রান্তকে অন্তত ঘৃণ্য বলে মনে করেন তিনি। এতে শিশুদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে পুরোপুরি এমনই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

হৃদয়পুরের স্কুলের ছেলেমেয়েরা সপ্তম শ্রেণীর পড়াশুনো শেষ করে যাতে কলকাতার ইন্ডিয়ান স্কুল লিভিং সার্টিফিকেটের পরীক্ষাতে বসতে পারে সে বন্দোবস্তও দুটি প্রাইভেট স্কুলের সঙ্গে লিখিত-পড়িত করেছেন। তাঁর স্কুলের ছাত্রদের প্রথম ব্যাচ দু-হাজার আট খৃষ্টাব্দে কলকাতা যাবে। কলকাতাতে তাদের থাকার জন্য এজমালি সম্পত্তি থেকে একটি বাড়ির বন্দোবস্তও করে ফেলেছেন। সেখানেই ছাত্ররা স্কুলের পরীক্ষা পাশ করা অবধি থাকবে ও খাবে। যাদের অবস্থা তেমন ভাল নয় এবং যারা মেধাবী, তারা যদি সচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েও হয়, তবুও তাদের জন্যে হৃদয়পুরের স্কুলে যেমন বিনা পয়সাতে পড়াশুনো, বইপত্রের এবং বিশেষ প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করেছেন তেমনই কলকাতাতেও তাদের বইপত্র এবং যাবতীয় অন্যান্য খরচের ভার যাতে উনিই নিতে পারেন সে জন্যে একটি ট্রাস্ট গঠন করে সেই ট্রাস্টে পনেরো লক্ষ টাকা সরিয়ে রেখেছেন। সাত বছর পরে সুদ সমেত সেই টাকা দু-গুণেরও বেশি হবে। সচ্ছল ঘরের ছেলেরা ন্যাশনাল স্কলার হলেও তাদের বৃত্তি দেওয়া হয় না, শুধু সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। অল্পবয়সে বৃত্তির টাকা হাতে পাওয়াটা যে কত আনন্দের, তা থেকে সচ্ছল হওয়ার অপরাধে তারা বঞ্চিত থাকে। ওরকম উদ্ভট নিয়ম পৃথিবীর কোথাও আছে বলে জানেন না তিনি।

উনি রবীন্দ্রনাথের কথা বলছিলেন—রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন এবং 'পূর্ণ মানুষের' সংজ্ঞার কথা বলছিলেন। উনি বলছিলেন, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা সব ব্যাপারেই এখন তোষণ-নীতিই একমাত্র নীতি। বড় বড় সংবাদপত্র ও ব্যবসায়ীদেরও রাজ্যের ভালর জন্যে, দেশের ভালর জন্যে অনেক কিছুই করার ছিল। দেশ ও দশের জন্যে কারওরই কোনও মাথাব্যথা নেই। ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল এবং রাজনৈতিক দলগুলোর লীলাক্ষেত্র অধিকাংশ বাংলা মিডিয়াম স্কুলগুলোতে যে সব ছেলেমেয়ে পড়ে পাশ করে বেরোচ্ছে তাদেরও চরিত্র গঠন, ন্যায়-অন্যায় বোধ, আদর্শ, কিছুই গড়ে উঠছে না। আমাদের সময়ে ও রকম ছিল না। সেই সব ছেলেমেয়েদের মা-বাবারাও অবশ্য সে জন্যে সমান দায়ী। তাঁদেরও তো জীবনের একমাত্র গন্তব্য শুধুমাত্র চাকরি, বা ব্যবসা বা যেন তেন প্রকারেণ টাকা রোজগার।

উনি বলছিলেন, আমার একমাত্র মেয়ে হিমিকাকেও এই সব কথা বোঝাবার চেষ্টা করেছি কিন্তু তারও কোনও গরজ দেখি না। আমি আর কতদিন বাঁচব? আরও সাত বছর না বাঁচারই সম্ভাবনা।

কিন্তু আমি থাকতে থাকতে এই স্কুলের একটি পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করে যেতে পারলে শান্তিতে মরতে পারতাম।

বেড়াতে এসে এমন সব গুরুভার জ্ঞানের মধ্যে পড়ে যাবে ভাবেনি অনিকেত। তবে সত্যি কথা বলতে কী, কথাগুলো শুনতে আদৌ খারাপ লাগেনি। শুধু যে খারাপ লাগেনি তাই নয়, নিজেদের কথা ভেবে লজ্জিতও বোধ করেছে। তার মনে, জীবন এই প্রথমবার মনে হয়েছে আদর্শহীন জীবনও কি জীবন? পয়েন্টলেস, গন্তব্যহীন জীবনের সার্থকতা কী? মানুষ হয়ে জন্মে শুধু কি খেতে-পরতে, ভাল থাকতে এবং নিজের নিজের আখের গোছাতেই এসেছে এখানে? তাহলে আর ওর সঙ্গে অন্য দশজন ধান্দাবাজ ভণ্ড মানুষের তফাত কী থাকল!

মনের মধ্যে, সত্যি বলতে কী, ঝড় উঠেছে দুপুর থেকেই। বাইরেও চৈতি হাওয়ার ঝড় ছিল কিন্তু সে হাওয়াতে সুগন্ধ ছিল। বুকের মধ্যের এই গম্ভীর ঝড়ে দমবন্ধ হয়ে আসছে। ঝড়ে ঝড়ে তফাত থাকেই!

আজকাল তো আদর্শবান মানুষ দেখাই যায় না। দেশ বা দেশের মানুষকে ভালবাসেন এমন মানুষও নয়। যে যার নিজের ভোগ, নিজের বিলাস, নিজের পরিবারের মানুষদের সুখবিধান নিয়েই ব্যস্ত। টাকা, আরও টাকা, ক্ষমতা আরও ক্ষমতা, প্রাইজ আরও প্রাইজ, এই সবই প্রার্থনা মানুষের। তা তাঁরা চাকরিজীবীই হন, কী ব্যবসায়ী বা পেশাদার বা অধ্যাপক বা সাহিত্যিক। চরিত্র-দূষণ গত কয়েক বছরে সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এতখানিই ঘটেছে যে, ভাবলে সত্যিই আতঙ্কিত হতে হয়। সবচেয়ে দূষিত আজকাল বুদ্ধিজীবীরা। প্রকৃত বুদ্ধিজীবী এখন কমই আছেন পশ্চিমবঙ্গে। অধিকাংশ দুর্বুদ্ধিজীবী, সুবিধা ও সুযোগজীবী।

অনিকেত জানালার সামনে একটি ইজিচেয়ারে বসে হৃদয়পুরের বসন্তের রূপ দেখতে দেখতে এসব ভাবছিল। এমন সময়ে একটা কোকিল এমন করে ডাকতে লাগল যেন সাপে তার বাসাতে উঠে ডিম খাচ্ছে বলে মনে হল।

দরজায় টোকা দিল কে যেন।

অনিকেত উঠে দরজা খুলতেই তকাই এসে ঢুকল।

বলল, কী রে ভেটকুবাবু, রাতের গাড়িতেই কলকাতা ভেগে পড়বি কি না তাই ভাবছিস বুঝি?

কেন?

না, বড়মামার জ্ঞান হজম করা তো সোজা কথা নয়। সকলে পারে না। দেখলি না, আমাকে না বলে তোকেই সব বললেন।

অনিকেত বলল, কী বলিস তুই! এমন মানুষ পশ্চিমবঙ্গে আরও কয়েকজন থাকলে দেশের অবস্থা অন্যরকম হয়ে যেতে পারত। তোর দু-মামাই গ্রেট। এমন বাঙালি আমি বেশি দেখিনি।

বলল, সেটা ঠিকই বলেছিস। আই অ্যাম রিয়ালি প্রাউড অফ মাই বড়মামা। অ্যান্ড ছোটমামা অ্যাজ ওয়েল।

বলেইছি তো! তোর ছোটমামাও ভাল। দুজনেই অরিজিনাল মানুষ।

তকাই বলল মেজমামাও চমৎকার মানুষ ছিলেন। উনি এম. আর. সি. পি., এফ. আর. সি. এস. ডাক্তার ছিলেন। কিন্তু কলকাতাতে টাকা কামাবার কল না খুলে এই হৃদয়পুরেই প্র্যাকটিস করতেন। মেজমামার কাছে গরুর গাড়ি, সাইকেল রিকশা, মোটর সাইকেল এবং গাড়ি করে যে কত দূর দূর থেকে রোগীরা আসত, তা বলার নয়। সবাই বলত 'ধন্বন্তরী'। সার্জিকাল কেস খুব একটা নিতেন না কারণ কলকাতার হাসপাতালে যে সব সুবিধা ছিল তা তো এখানে ছিল না। মেডিসিনের প্র্যাকটিসই বেশি করতেন।

রোগীর ভিড়ের ঠেলাতে হিমশিম খেতে দেখে মেজমামাকে বড়মামা আর ছোটমামা মিলে এখানেই আলাদা হাসপাতাল করে দিলেন। অধিকাংশ রোগীর কাছ থেকেই পয়সা নিতেন না মেজমামা। অন্য মামারা, যে সব রোগীরা অ্যাফোর্ড করতে পারে, তাঁদের বলেছিলেন শেষের দিকে,

মানে অসময়ে চলে যাবার আগে, যাঁর যেমন ইচ্ছে ফিজ দিতে। শেষের দিকেঅপারেশনও করতেন নিজেদের হাসপাতালেই। মডার্ন অনেক ইকুইপমেন্টস এনে দিয়েছিলেন অন্য মামারা হৃদয়পুরেই। হৃদয়পুরের হাসপাতালের একতলাতেই মেজমামার নতুন চেম্বার হয়। জুনিয়ার আগে মাত্র একজন ছিলেন হাসপাতালে, পরে মেজমামাকে নিয়ে সবসুদ্ধ দশজন ডাক্তার হলেন। নার্সও এলেন অনেক। একটি নার্সিং স্কুলও করে দিলেন মামারা।

মেজমামা আজকে না থাকলে কী হয়, ডঃ দাশ আর ডঃ মাহাতো কী চমৎকার ঝকঝকে তকতকে রেখেছেন হাসপাতালটি। ওঁরা দুজনেই রেসিডেন্ট। একজন সার্জন আর অন্যজন মেডিসিনের। রোগীরা ধন্য ধন্য করে। ফিজও দেয়। চিকিৎসা বিনিপয়সাতে করা গেলেও সুশ্রুষা করতে তো খরচ লাগেই। তাই এখন হাসপাতালে যাঁরা ভর্তি হন তাঁদের জন্যে একটি ফিজ ধার্য হয়েছে।

কতগুলো কেবিন আর বেড আছে জেনারেল ওয়ার্ডে?

কেবিন-ফেবিন নেই। শুধুই জেনারেল ওয়ার্ড। তবে মেল-ফিমেল ওয়ার্ড অবশ্যই আলাদা। বড়মামার বা মেজমামার তেমন অসুখ হলে ওই জেনারেল ওয়ার্ডের রোগী হিসেবেই চিকিৎসা হয়।

ওঁরা প্রকৃতই সোশালিস্ট আমাদের নেতাদের মতো নন। ডাবল-স্ট্যান্ডার্ড-এর মানুষ নন তাঁরা। তুই যদি সত্যিই দেখতে চাস তো কাল সকালে তোকে সব দেখাব ঘুরিয়ে। কালকে হিমিও থাকবে। ওর তো আজই বিকেলে ফিরে আসার কথা ছিল। এখনও তো এল না দেখছি।

কোথায় গেছে তোর বোন হিমিকা?

সে গেছে দুর্গা পাহাড়ে। সেখানে চিরবাবু 'পাখি-পাহাড়' করছেন না? পাহাড় কেটে ছেনি দিয়ে অগণ্য পাখি আঁকছেন পাহাড়ের গায়ে। তিনি তো এক পাগল। দেখতে চাস তো নিয়ে যাব। চিরবাবুর ওই প্রজেক্টের জন্যে ব্যাঙ্গালোর থেকে চাঁদা তুলে নিয়ে এসেছে হিমি। সেই টাকা ড্রাফ্‌ট করে নিয়ে এসেছে, দিতে গেছে চিরবাবুকে। অযোধ্যা পাহাড়েও একজন, সম্ভবত চিত্ত দে এ রকম করছেন বলে শুনেছিলাম। পাহাড়তলির এক আদিবাসী গ্রামে হিমির এক সহেলি থাকে। তার কাছেও যাবে। সেইখানেই বোধহয় আটকে গেছে। মেজমামিমা বলছিলেন, দুপুরে সেখানেই খেয়েদেয়ে আসবে। নিজেই গেছে গাড়ি চালিয়ে। মেজমামার সাদা মারুতি গাড়িটা ওর জন্যেই গ্যারাজে রাখা থাকে। যখন আসে, ওই ব্যবহার করে।

তারপর বলল, চা-টা খাবি না?

খেলে হয়। শুধু চাই যথেষ্ট। বেলা দুটোতে তো অত পদ দিয়ে খেয়ে উঠলাম, 'টা' খাবার জায়গা কোথায়?

তা বললে তো হবে না ভেটকুবাবু। পড়েছ যবনের হাতে খানা খেতে হবে সাথে। তোর জন্যে তো বটেই হিমির জন্যেও এই তিনদিন বিশেষ ব্যবস্থা হবে খাওয়া-দাওয়ার। বাড়িতে গিন্নি বলতে তো ওই একজনই, কিন্তু মেজমামি একাই একশো। তোর জন্যে মাংসের সিঙাড়া, মাছের কচুরি আর ছানার গজা হচ্ছে 'টা' হিসেবে।

তোর মামাবাড়ির মানুষেরা কি রাক্ষস?

না, তাঁরা সকলেই মিতাহারী। মেজমামি আর ছোটমামা তো নিরামিষাশী। এসবই অতিথির জন্যে। তাছাড়া হিমি অতিথি না হলেও প্রবাসে থাকে, যখন আসে তখন বাবা-হারানো মেয়ের ওপরে সকলেরই স্নেহ স্বাভাবিক কারণেই উপচে পড়ে।

আমার কিন্তু সত্যিই পালাতে হবে। বড়মামা ভাববেন তাঁর জ্ঞান শুনে পালাচ্ছি কিন্তু আসলে পালাব খাওয়ার অত্যাচার থেকে বাঁচতে।

তকাই বলল, খা, খা। তোর ওপরে অত্যাচার করে যদি অন্যে সুখী হন তবে সে অত্যাচার সহ্য করতে হয়। তোদের বাড়ি গেলে মাসিমাও তো আমাকে কত কি খাওয়ান। প্রাণ গেলেও, ওঁর মুখে

হাসি দেখার জন্যে প্রতিবাদ করি কি আমি? তাছাড়া আমার সুমি চলে যাবার পরে আমার নিজের মা তো মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে গেছেন। আমার বাড়ি গেলে আমি তো তোকে আলু পোস্ত আর বিউলির ডাল ছাড়া আর কিছুই খাওয়াতে পারি না আজকাল।

ভেটকু বলল, আচ্ছা, সত্যিই তুই একটা বিয়ে কেন করছিস না বলত? বিয়ে একটা করলে, মাসিমা এসে এখানে নিজের দু ভাই আর মেজমামিমার কাছে কত আরামে থাকতে পারতেন। তোর একটা হিল্লে না করে তো ওঁর পক্ষে আসা সম্ভব নয়। মাত্র দু-বছরই তো সংসার করেছিলি। তার স্মৃতি কি ভোলা সত্যিই যায় না? তাকে অপমান করা হবে কি আবার বিয়ে করলে?

তকাই একটু চুপ করে থেকে কান খাড়া করে বাইরে কোকিলের ডাকটা শুনেই হেসে ফেলল। বলল, হৃদয়পুরে সত্যিই বসন্ত এসেছে।

কেন?

এই পাগলা কোকিলটাই বসন্তের পেয়াদা। বসন্তে এখানে এখন ডিক্রি জারি করেছে। প্রতি বসন্তে এ আসে এবং পাগলের মতো ডাকতে থাকে। ওই দ্যাখ, ওই গামহার গাছে ও বাসা বানায়। মেজমামা বেঁচে থাকতে একদিন বলেছিলাম, আচ্ছা, মেজমামা! তুমি এত রোগীকে ভাল করো, এই কোকিলটার পাগলামি কি ভাল ভরতে পার না?

মেজমামা মুখ থেকে সিগারেটটা নামিয়ে বলেছিলেন, সব পাগলকে ভাল করতে নেই।

বলেছিলাম, কেন?

কিছু পাগল সংসারের, সমাজের উপকার করে। পাগল পাখি যেমন করে, পাগল মানুষ তেমনই করে। মাঝে মাঝে আমারই পাগল হয়ে যেতে হচ্ছে হয়। তুই কলকাতার হাসপাতালগুলোর অবস্থা দেখেছিস? বড়লোকেরা না হয় নার্সিংহোমে যান। কিন্তু গরিবেরা? সরকার যদি সত্যিই জনগণেরই হতো তবে জনগণের সরকারি হাসপাতালগুলোর অমন অবস্থা হয়? জনগণের এমন হেনস্তা হয়? নোংরা, খাবারে চুরি, ওষুধে চুরি, চোখে দেখা যায় না। পুরুলিয়ার হাসপাতালের কথা ছেড়েই দিলাম, আমি খাস রাজধানী কলকাতার হাসপাতালের কথাই বলছি। যদি পাগল হতাম তবে মুখে একটা চোঙা লাগিয়ে পথে পথে ঘুরে কলকাতার হাসপাতালের অবস্থাটা জানাতাম মানুষকে। পাগল নই বলেই পারি না। পাগলদের পাগলই থাকতে দে। তাছাড়া বাঙালিদের সহ্যশক্তিরও শেষ নেই। কী করে মুখ বুজে এই অন্যায় তারা দিনের পর দিন সহ্য করে তা জানি না।

অনিকেত বলল, তবে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং তাঁর নতুন ক্যাবিনেট অন্যরকম। মানুষটা সত্যিই অন্যরকম। মনে হয়, উনি কিছু করার চেষ্টা সত্যিই করছেন। তাছাড়া মানুষটি সৎও। দেখাই যাক কী করতে পারেন!

তকাই বলল, তাঁর ব্যক্তিগত এবং অর্থনৈতিক সততা, ঠিক আছে। মানছি। ওই সততা দিয়ে উনি যদি ওঁর সরকারকে সত্যিই স্বচ্ছ করে তুলতে পারেন তবেই বোঝা যাবে। উনি চেষ্টা অবশ্যই করছেন কিন্তু কতদূর কী করতে পারবেন জানি না। গত পঁচিশ বছরে বামফ্রন্ট সরকার যে পশ্চিমবঙ্গের কর্মসংস্কৃতিকে একেবারেই খতম করে দিয়েছেন। খালি কথা আর বক্তৃতা। তাছাড়া সততার তো আরও অনেক রকম আছে। সেই সব ক্ষেত্রেও ওঁর সততা ওঁকে প্রমাণ করতে হবে। তাছাড়া যা দেখছি তাতেও মনে হচ্ছে ওঁর দল ওঁর হাত পা বেঁধে রাখার চেষ্টা করছে। ঠুঁটো জগন্নাথ করে দিলে তিনি সত্যিই কি করতে পারবেন করার মতো কিছু?

দাদাবাবু, মা ডাকছেন আপনাদের খাবার ঘরে চা খেতে।

একজন কাজের মেয়ে এসে বলল। সে দুপুরেও ছিল খাবার ঘরে। মামিমাকে সাহায্য করছিল।

চল ভেটকু। বলল, তকাই।

৩

খাওয়ার ঘরে গিয়ে অনিকেত দেখল, বিরাট আয়োজন। বড়মামা ও ছোটমামাও বসে আছেন খাবার টেবিলে ওদের অপেক্ষায়। মেজমামিমা বললেন, এসো বাবা, বসো।

দশ গাঁয়ের মানুষ যে আপনাদের 'বুর্জোয়া' কেন বলে তা এখন বুঝছি। সত্যি! দুটোর সময়ে খেয়ে উঠে চা-এর সঙ্গে এত পদ খাওয়া যায় বিকেলে।

অনিকেত বলল।

বড়মামা বললেন, বুর্জোয়া আমরা হতে পারি কিন্তু পঞ্চায়েতের টাকা মেরে বা সরকারি তহবিল কেটে বুর্জোয়া হইনি বাবা। যা কিছু দেখছ এবং দেখবে সবই আমাদের স্বোপার্জিত। আমার বাবার, দাদাদের এবং আমারও। কোনও পার্টি বা দাদা বা গোদার দয়াতে হয়নি কিছুমাত্রই। রবীন্দ্রনাথও তো বুর্জোয়া। এই হা-ভাতেদের দেশে, নিশ্চেষ্টদের দেশে, মতলববাজদের দেশে যেই একটু ভাল থাকে, ভাল খায়, সেই বুর্জোয়া। কে কী বলল, তাতে আমাদের বয়েই গেল। আমরা বুর্জোয়াই থাকতে চাই। সবকিছুর জনগণায়ন আমরা কেউই সমর্থন করি না। এতে দেশের ক্ষতি যতখানি হয়েছে ভাল তার ছিটেফোঁটাও হয়নি।

ছোটমামা বললেন।

মামিমা বললেন, ঠাকুরঝির চিঠি এসেছে রে তকাই আজই দুপুরে। কতবার বলি হপ্তাতে একটা ফোন কোরো। তা নয়, ঠাকুরঝি আমার চিঠি লিখতে খুবই ভালবাসে আর চিঠি লেখেও ভারি সুন্দর। আমার শাশুড়ি মা মেয়েকে নিজে হাতে বাংলা পড়তে-লিখতে শিখিয়েছেন। বুঝলে বাবা অনিকেত, এ বাড়িতে বউ হয়ে এসেছিলাম পাটনা থেকে এ আমার পরম সৌভাগ্য। অমন দেবতুল্য শ্বশুর, শাশুড়ি-মা, দেবতুল্য ভাসুর এবং নিজের সহোদরের চেয়েও বেশি কাছের আমার একমাত্র দেওর এই ভবা।

তারপরেই বললেন তকাইকে, তকাই, 'ভেটকু' আবার কী নাম? এমন সুন্দর ছেলের নাম ভেটকু হল কী করে! দিদির চিঠিতে জানলাম যে ওর নাম ভেটকু।

সুন্দর বলেই হয়তো ছেলেবেলাতে কপালে কাজলের ফোঁটা দিয়ে প্যারামবুলেটরে করে ছেলেকে বেড়াতে পাঠাতেন মাসিমা পাছে আরও কারও নজর লাগে, তাই হয়তো একটা বিচ্ছিরি নাম দিয়েছিলেন, 'ভেটকু'।

সকলেই হেসে উঠলেন তকাই-এর কথাতে।

মেজমামিমা স্বগতোক্তি করলেন, হিমিটা এখনও এল না। বলি যে দু-দুজন ড্রাইভার বসে আছে, একজনকে নিয়ে যা, তা না, মেয়ের জেদ। সে বলে, ব্যাঙ্গালোরে কি আমার ড্রাইভার আছে? নিজেই তো চালাই হয়। আর এখানে নিজের জায়গাতে এবং এমন ফাঁকা জায়গাতে গাড়ি চালানোটা তো একটা আনন্দই। কষ্ট তো একটুও নেই।

পরক্ষণেই মামিমা বললেন, বুঝলি তকাই, অনিকেত সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখেছেন ঠাকুরঝি। তোমার যে এত রকম গুণ তা তো তকাই আমাদের কখনও বলেনি। বাবা তোমরা দুজনে তো এতদিনের বন্ধু, আগে এলে না কেন? এত বছর লাগল এটুকু পথ এসে পৌঁছতে?

অনিকেত বলল, তকাই যে আমাকে ঈর্ষা করে। তাই বলেনি মামিমা। তাছাড়া ভাল করে আসতে বললে তো আসব। আমি এলে ওর যত্ন-আত্তি যদি কম হয়ে যায় এই ভয়েই হয়তো নিয়ে আসেনি এতদিন।

তারপরই বলল, গুণ না ছাই। মা-মাসির চোখে সব ছেলেই গুণের আধার। আর মাসিমা, মানে, তকাইয়ের মায়ের মুখে তো আমি কারওরই নিন্দা শুনিনি আজ অবধি। এমনকী ভুলেও কখনও জ্যোতি বসুরও নিন্দা করেননি। তাই মাসিমার প্রশংসার সার্টিফিকেটের কোনোই দাম নেই।

মাছের কচুরি ভেঙে আদার আচার দিয়ে খেতে খেতে তকাই বলল, কী ছোটমামা, আমার বন্ধুতো শুক্লপক্ষ-কৃষ্ণপক্ষর তফাত বোঝে না। তাকে ভালু-টোংড়িতে নিয়ে গিয়ে হৃদি-ঝোড়ার পাশে বসিয়ে এই বাসন্তী রাতের রূপ দেখাবে না?

আজ আমি তোদের সঙ্গে যেতে পারব না। তবে বন্দোবস্ত সব করে রেখেছি। আমি বোধহয় তোর মন পড়তে পারি। সাঁটুলকে সঙ্গে নিয়ে যা। আমার কিছু জরুরি কাজ আছে হিমির সঙ্গে। সে এসে গেলে অবশ্য অন্য কথা ছিল। সেও যেতে পারত। আমিও যেতাম।

তা তো পারতই।

তারপর বলল, তোমার জিপটাই নিয়ে যাব কি?

একদম না। ওই আমার একমাত্র স্ত্রী। বহু পুরনো স্ত্রী। এমন চাঁদের রাতে বনপাহাড়ে দুজন যুবকের হাতে তাকে আমি ছাড়তে একেবারেই রাজি নই। বড়দার ফোর্ড-আইকনটা নিয়ে যা তোরা।

তুমি যা বলবে।

বড়মামা বললেন, কদিনের ছুটি নিয়ে এসেছ অনিকেত?

বড়মামার চা খাওয়া হয়ে গেছিল। তখন পাইপ খাচ্ছিলেন। পাইপের টোব্যাকোর গন্ধে খাওয়ার ঘরটা ভরে ছিল।

অনিকেত বলল, তিনদিনের। মানে, পরশু অবধি।

দোল অবধি থেকে যেতে পারবে না? এখানের দোল দেখার জিনিস। তোমাকে আমাদের ফার্ম হাউসে নিয়ে যাব। আমাদের যারা ভালবাসে সেই সব গ্রামীণ ও আদিবাসী মানুষেরা সকালে দোল খেলতে আসবে আর রাতে নাচ-গান করবে। তা বলে ভেবো না যে ভদ্রলোকেরা আমাদের ত্যাগ করেছেন। না, তাঁরাও আসবেন অনেকে। তবে সত্যি কথা বলতে কি অশিক্ষিত মানুষজনই আমার বেশি ভাল লাগে। এদেশে যাঁরাই শিক্ষিত হন তাঁদের অধিকাংশই কপট মতলববাজ এবং চোর। এ বড় দুঃখের কথা। তবু, তাঁদের বাদ দিয়েও তো সমাজ চলে না।

কীর্তন হবে দোলের আগের রাতে ঠাকুর-দালানে।

মেজমামিমা বললেন।

কে গাইবেন কীর্তন?

অনিকেত জিজ্ঞাসা করল।

নিমীলা রায়। বড় ভাল গান বলে শুনেছি। নবদ্বীপ থেকে তিনি আসবেন আগের দিন। ছবি ব্যানার্জির কাছে নাকি শিখেছিলেন। সত্যি! ছবিদি গান গাওয়া তো প্রায় বন্ধই করে দিয়েছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য। তেমন কীর্তনীয়া তো আর কেউই নেই, কী পুরুষ কী মেয়ে।

মেজমামিমা বললেন, অনিকেতের পাতে মাংসের সিঙাড়া তুলে দিতে দিতে।

শুনতে পাই, কীর্তন নাকি ধর্মীয় সঙ্গীত। তাই এই "ধর্মনিরপেক্ষ" রাজ্যে কীর্তনের উন্নতিকল্পে সরকারের পক্ষে কিছু করাটাও নাকি সম্ভব নয়। বাংলার এত বড় একটা সম্পদ নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে চোখের সামনে। অথচ...

বড়মামা বললেন।

এখন তো পুজো করা, পার্বণ মানা, ধর্মাচরণ করাটাও আউট অফ ফ্যাশন। বুদ্ধিজীবীদের "ইমেজ"-এর পক্ষে ক্ষতিকারক। প্রাইজ পাওয়ার পক্ষে অসুবিধের। দুর্গাপুজোতে অঞ্জলি দেওয়াটাও তো এখন অন্ধ কুসংস্কার।

ছোটমামা বললেন।

বড়মামা বললেন, এখন মন্ত্রীদের এবং রাজনীতিকদের ফ্যাশন হচ্ছে রমজানের শেষে মাথাতে রুমাল চাপিয়ে ইফতার পার্টিতে কবজি ডুবিয়ে খাওয়া। সেটা কুসংস্কার নয়। তা করাটা গর্বের ব্যাপার।

অনিকেত বলল, একটা উপন্যাস আমাদের পড়া উচিত। আপনাদের যা মানসিকতা তাতে অবশ্যই ভাল লাগবে।

কোন উপন্যাস?

চাপরাশ। ঈশ্বরের চাপরাশ যাঁরা বহন করেন সেই চাপরাশিদের নিয়েই লেখা ওই বইটি।

ছোটমামা বললেন, একটা পাঠিয়ে দিস তো তকাই। তুই তো কালাপাহাড়। তুই তো পড়বি না।

ওই বইটা পড়েছি। ইন্টারেস্টিং বই। তবে আমি তো অ্যাথেইস্ট। দেব তোমাদের পাঠিয়ে। আনন্দ পাবলিশার্স-এর বই।

৪

চা-টা খেয়ে ওরা যখন বেরোল তখন সাড়ে পাঁচটা বাজে।

তকাই স্টিয়ারিং-এ বসল, পাশে ভেটকু। পেছনে-বসা সাঁটুলকে তকাই বলল, জলের বোতল আর টর্চ নিয়েছিস তো সাঁটুল সঙ্গে।

হ্যাঁ তকাইদা।

আর বন্দুক?

নিলে ভাল হত তবে বন্দুক নিইনি। ছোট যন্তর আছে আমার কোমরে। দিনকাল তো ভাল নয়। ছোটবাবু ডি. এম.-কে বলে ছোটবাবুর বডি-গার্ড হিসেবে আমার একটা লাইসেন্স করিয়ে দিয়েছেন।

এখন দেশে যাদেরই লাইসেন্স্‌ড আর্মস আছে তাদেরই বিপদ। এদিকে কার কাছে যে আর্মস নেই, মায় এ. কে. ফর্টিসেভেন পর্যন্ত, তা ঈশ্বরই জানেন। কোথা থেকে আসছে, কারা তা সংগ্রহ করছে, সে বিষয়ে কোনওই মাথাব্যথা নেই পুলিশের। ডাকাতি-কিডন্যাপিং লেগেই আছে। কারা ও সব করছে তাদের নাম তো কাগজে রোজই বেরোচ্ছে কিন্তু হোম ডিপার্টমেন্টের তাতেও কোনও মাথাব্যথা নেই। আমরা এক আগ্নেয়গিরির ওপরে বসে আছি। উই আর লিভিং ইনা আ ওয়ার্লড অফ উইশফুল ফিকিং। ভবিষ্যৎ অত্যন্তই খারাপ পশ্চিমবঙ্গের। অত্যন্তই খারাপ।

অনি বলল, এলাম এখানে বেড়াতে আর তোরা মামারা আর বোনপো মিলে কী শুরু করলি বলত? দেশ দেশ করে মাথা খারাপ করে দিলি। বলেই বলল, যোগেন একটা প্রবাদবাক্য বলে না?

কী?

"মামা ভাগ্নে যেখানে আপদ নেই সেখানে।" প্রবাদটি যে কত বড় সত্য এখন তা বুঝছি।

যোগেনরা কি বাঙাল? 'ভাগ্নে', 'ভাস্তে' এসব বলে কেন? বোনঝি বোনপোকে?

বলে। এক এক জায়গায় এক এক রকম বুলি। এতে আশ্চর্য হবার কী আছে।

তকাই বলল।

তারপর সাঁটুলকে বলল, কী রে। কোমরে তো যন্ত্র গুঁজেছিস কিন্তু সেটা কি শুধুই দর্শনধারী? না চালাতেও শিখেছিস। চালাতে না জানলে এসব যন্ত্র যারা প্রকৃত যন্ত্রী তারা গালে থাপ্পড় মেরে কোমর থেকে খুলে নিয়ে যাবে। কী যন্ত্র তোর? কত বোরের?

ওয়েবলি স্কট। ইংলিশ। রিভলবার। পয়েন্ট থ্রি-টু। বড়মামার নামে ছিল আমার নামে ট্রান্সফার করে দিয়েছেন।

ছোটমামার নিজের নেই?

আছে না? কোল্ট পিস্তল। আমেরিকান। পয়েন্ট থ্রি টু ই।

মাঝে মাঝে হাত ঠিক করেন তো? তুই করিস?

হ্যাঁ। করে তো। আমিও করি। ওই ভালু-টেংড়িতে গিয়েই করি।

ভালু-টোংড়িতে ভালু আছে এখনও? নাকি ছোটমামা আর তোর গুলির আওয়াজে সব ভাগলবা হয়েছে?

না, না, অনেক আছে। পেছন দিকের পাহাড়টাতে যে অনেকগুলো বড় বড় গুহা আছে। সেখানে থাকে। গাবলু-গুবলু বাচ্চারাও থাকে।

তকাই বলল, বাচ্চারা কি আর চিরকাল গাবলু-গুবলু থাকে। আমি-তুই সকলেই তো শিশুকালে গাবলু-গুবলুই ছিলাম। আমাদেরও তো ধেড়ে হতে হল। ওরাও ধেড়ে হয়ে যাবে। অবশ্য ওদেরও গাবলু-গুবলু বাচ্চা হবে।

সাঁটুল বলল, কপালে থাকলে আজই দেখা হয়ে যেতে পারে। এখন তো মহুয়ার সময়। এখনই তো ওদের দেখতে পাওয়া ভারী সহজ।

মহুয়া কী রে?

ভেটকু বলল।

তোকে নিয়ে চলে না। কলকাত্তাইয়া বাবু। দাঁড়া। তোকে মহুয়া দেখাই আর মহুয়া শোঁকাই।

বলেই, গাড়িটা পাহাড়ে পাহাড়ে যাবার লাল মাটির পথে দাঁড় করাল।

সাঁটুল বলল, এখানে না দাঁড়িয়ে একটু আগেই মোড়ে দাঁড়ালে ভাল হবে।

কেন?

ওখানে অনেকগুলো বড় বড় মহুয়া গাছ আছে। তাছাড়া দিদি যদি ফেরে অযোধ্যা পাহাড় থেকে তবে ওই মোড়েই দিদির সঙ্গে দেখাও হয়ে যাবে। যদি দিদি পরে, বলে, আমাকে ফেলে চলে গেলি কেন তোরা?

তকাই বলল, ভাগ। তোর দিদি তো থাকবে এখনও অনেকদিন। আমার বন্ধু তো চলে যাবে দুদিন পরেই। তোর দিদির সঙ্গে আমাদের কী?

কিছু না। তবে যদির কথা ভেবে মা দিদির জন্যে হটকেস-এ মাছের কচুরি আর মাংসের সিঙাড়া দিয়ে দিয়েছেন। ন্যাপকিন, প্লেট, কাঁটা-চামচ সব। জলও আছে। ফ্লাস্কে কফিও আছে।

তোর জন্যে কিছু দেননি মামিমা?

দেননি আবার? তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে হল, আমার খাওয়া হল না বলেই তো আমার ভাগটাও দিয়ে দিয়েছেন। দিদির সঙ্গে দেখা হলে ভাল। নইলে তো সব আমার পেটেই যাবে।

খেয়ে খেয়ে তো একটা রাক্ষস হয়েছিস।

দেবতা পাহারা দিতে রাক্ষসদেরও দরকার।

কথাও তো শিখেছিস দেখছি অনেক। গত বছর যখন পুজোতে এসেছিলাম তখন তো সাত চড়ে মুখ দিয়ে 'রা'ও বেরতো না।

হেঁ। তখন কি আর ভালু-টোংড়িতে এসেছিলাম তকাইদা। বড়বাবুদের সামনে আর মায়ের সামনে আমি বোবা হয়েই থাকি।

আর ছোটবাবু?

ছোটবাবু বন্ধুর মতো। শুধু আমারই নয়, উনি সকলেরই বন্ধু। ছোটবাবু যে দিন মরে যাবেন সে দিন কত হাজার যে লোক হবে তা ভেবেই আমি আনন্দে আটখানা হয়ে যাই।

তকাই বলল, কথা শুনলি ভেটকু?

তারপর সামনের মোড়ে পৌঁছে গাড়িটা থামিয়ে দিয়ে বলল, আমার ছোটমামার মরেও দরকার নেই আর তোরও আনন্দে আটখানা হবার দরকার নেই। নাম এবারে। আমার বন্ধুকে সব গাছ-টাছ চেনা। শুধু মহুয়া গাছই নয়।

গাড়ি থেকে নেমে জোরে নাক টেনে প্রশ্বাস নিয়ে তকাই বলল, না। যখন পাহাড়ে উঠব, কাচ নামিয়ে নেব। এয়ারকন্ডিশন্ড গাড়িতে বসে বনের শব্দ-গন্ধ কিছুই উপভোগ করা যায় না।

দরজাটা বন্ধ করে বলল, মেজমামি তো তোর জন্যে আর হিমি দিদির জন্যে অনেক কিছুই দিলেন তা আমার ছোটমামা আমার আর আমার বন্ধুর জন্যে কিছু দেননি রে সাঁটুল?

সঙ্গে সঙ্গে সাঁটুলের থার্টি-টু অল আউট হয়ে গেল।

সব দাঁত বের করে বলল, তা কি আর না দিয়েছেন? মামা-ভাগ্নে বলে কথা।

কী দিয়েছেন?

আজ্ঞে রাম্। ছোটবাবু বললেন, তকাইটা একটা হনুমান। রাম্-এ বড় ভক্তি। তার বন্ধু তো ওর মতো হনুমান নাও হতে পারে, হয়তো খায়ই না। যদি খায় তো জেনে আমাকে বলিস কাল ওর জন্যে একটা সিভাস-রিগ্যাল দেব। হুইস্কি। গত মাসে কলকাতা যখন যাই তখন পার্ক স্ট্রিটের জুবিলি স্টোর্স-এর পল্লব ব্যানার্জি দিয়ে দিয়েছিলেন। কোনও বিশেষ উপলক্ষর জন্যে জমিয়ে রেখেছিলাম। তা, বলিস আমাকে।

যে মক্কেল এসব খায় না তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বই হত না। তবে আমার বন্ধু খুব বড়লোক তো! আজে বাজে জিনিস খায় না। ছোটমামাকে বলিস। ও রাম্ খেলে বাকার্ডি রাম্ খায়।

সেটা আবার কী?

সাদা রাম্।

রাম্ সাদা? অবাক হয়ে বলল সাঁটুল। কখনও দেখিনি তো।

থাম তো। এই বিপুলা পৃথিবীর কতটুকু জানিস তুই? আমিই বা কতটুকু জানি।

তবে হ্যাঁ যতটুকু জানিস তাই দেখা এবং শোনা আমার বন্ধুকে।

ভেটকু বলল, যোগেনের প্রবাদটা সত্যিই একশোতে একশো পাবে।

দেখা দেখা, বাবুকে মহুয়া গাছ দেখা। গাছ গাছালি সব চিনিয়ে দে কলকাতার বাবুকে।

হ্যাঁ। ওই যে বাবু। ওই যে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ওই সবগুলো গাছই মহুয়া। গন্ধ পাচ্ছেন না হাওয়ায় একটা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ?

হ্যাঁ। তাই তো। ভারি মিষ্টি তো গন্ধটা।

মিষ্টি তো হবেই বাবু। এ দিয়ে তো মদ তৈরি হয়।

ও হ্যাঁ। সে তো শুনেছি। নানা বইয়ে পড়েওছি।

আর ওই যে গন্ধটা...

কোন গন্ধ ...

মহুয়ার থেকে আলাদা গন্ধ, পাচ্ছেন না? ওটা হচ্ছে করৌঞ্জের গন্ধ।

তকাই বলল, আরে প্রথম দিনই কি গন্ধর ফারাক করতে পারবে? বার বার আসবে যখন তখন পারবে। সবাই কি গন্ধ-গোকুল?

বার বার আসবেন বুঝি বাবু? এলে তো ভারি ভাল হয়। মা, তাই বলছিলেন।

মামিমা? কী বলছিলেন?

তকাই জিজ্ঞেস করল।

বলছিলেন...।

বলেই, তকাই-এর দিকে ফিরে বলল, না, না, কিছু না...

তকাই ধমকে বলল, কিছুই না যখন তখন বলতে গেলি কেন?

আমার চাকরি চলে যাবে। মানে, বললে, আমার চাকরি চলে যাবে।

তোর চাকরি, আমাকে না বললে, আমিই ছোটমামাকে বলে খেয়ে দেব। কী বলছিলেন মামিমা, তাই বল?

বলব?

আঃ! কী ন্যাকামি হচ্ছে।

বলছিলেন যে, হিমিদিদির যদি এমন একটা বর থাকত, কী ভালই না হত। একেবারে সৌমিত্র চ্যাটার্জির মতো, মানে যৌবনের। ভদ্র সভ্য, কম কথা বলে, তাছাড়া কত বিদ্বান এবং বড়লোক।

তকাই খুবই লজ্জা পেল ভেটকুর সামনে। কথাটা যে এই, তা আগে জানলে জানবার জন্যে পীড়াপীড়ি করত না।

ও অস্ফুটে বলল, সরি ভেটকু।

অনিকেত বলল, কী যে বলিস।

কিছু মনে করিস না।

এতে মনে করার কী আছে বল? আমি কি বোকা না পাগল?

আমার বিধবা মামিমার যদি তোকে খুবই ভাল লেগে গিয়ে থাকে তাহলে সে অপরাধ নিজ গুণে ক্ষমা করে দিস।

দ্যাখ তকাই। বাড়াবাড়ি করিস না। জীবনে আমাকে যদি একজনের ভালই লেগে থাকে সে তো পরম আনন্দেরই কথা। মামিমার ভাল লাগলে যে তোর বোনেরও ভাল লাগবে আমাকে এমন কোনও মানে নেই। তাছাড়া যদি আমাদের দুজনের দুজনকে ভাল লেগেই যায় তবেও বিয়ে হবার কোনও সম্ভাবনা কষ্ট-কল্পনা। আমরা দুজনেই যদি এতগুলো বছর বিয়ে না করে থাকতে পারি নিজ নিজ নিজস্ব কারণে তাহলে দুজনেই হঠাৎ বিয়ে করে ফেলব একে অন্যকে সেটাও সুদূরপরাহত। মাসিমাকে দোষ দেবার প্রশ্নই হয় না। বরং আমি রীতিমত যাকে বলে elated। আমি নিজেই মামিমাকে বলব গিয়ে প্রণাম করে যে, আমি সম্মানিত বোধ করছি।

তকাই পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে লাইটার দিয়ে ধরিয়ে বলল, নে ভেটকু, খাবি না কি?

নো। নেভার। কী করে যে শিক্ষিত মানুষ হয়ে এখনও সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিস ভাবতে পর্যন্ত পারি না। গত সপ্তাহেই বস্টনে যেতে হয়েছিল দুদিনের জন্যে। অত বড় এয়ারপোর্টে দেখি একটি ছ বাই ছ ফিট-এর এনক্লোজার। তার চারধারে দড়ি দেওয়া। দেওয়ালে লেখা আছে Smokers। দুজন মাত্র দেখলাম, তোরই মতো অ্যাডিক্ট। তার মধ্যে ঢুকে একজন সিগারেট আর অন্যজন পাইপ খাচ্ছেন আর পুরো এয়ারপোর্টের মানুষে গ্রামের মেলাতে যেমন চোখ-মুখ করে তাঁবুর মধ্যে টিকিট কেটে ঢুকে চার পা-ওয়ালা ছেলে বা তিন মাথা-ওয়ালা মেয়ে দেখে, তেমন চোখ করেই তাদের দিকে চেয়ে আছে। ছিঃ।

নরাণাং মাতুলক্রমঃ।

তকাই বলল।

তারপর বলল, আমার মামাদের জ্ঞান দিয়ে পাইপ আর সিগার খাওয়া ছাড়াতে যদি পারিস তাহলে আমিও ছেড়ে দেব। প্রমিস।

ভেটকু সাঁটুলকে জিজ্ঞেস করল, ওটা কী গাছ?

ওই গাছটার নাম ফাগুন বউ। অনেকে বসন্তিও বলে। এই সময়েই ফুল আসে ওদের। সুন্দর হলুদ ফুল হয়েছে দেখেছেন। পাতা ঝরে যায় এখন। শুধু ফুলগুলো থাকে, কী সুন্দর যে দেখায়। সুন্দর দেখাচ্ছে না। ওই দেখুন. ওদিকে নীল কৃষ্ণচূড়া। বেগুনি জাকারান্ডা। সবই এই সময়েই ফোটে। আর ওই সাদা সাদা কাগজের মতো ফুল যে গাছটাতে, ওটা অস্ট্রেলিয়ান গাছ। ওদের নাম সুপার্বা গ্লিনিসিডিয়া।

ভেটকু সাঁটুলের জ্ঞান দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিল। বলল, আঙুল দিয়ে দূরে দেখিয়ে, ও গাছগুলো কী গাছ?

তকাই স্বগতোক্তি করল, 'প্রাঙ্গণে মোর শিরিষ শাখায়'।

তুই চিনিস?

শান্তিনিকেতনে দেখেছিলাম।

ওগুলো তো শিরিষই। সাদা শিরিষ আর কালো শিরিষ। দু'রকমের হয়। আর ওইটা হচ্ছে আফ্রিকান টিউলিপ।

সাঁটুল, তুমি জানলে এত কী করে?

ছোটবাবুর কাছেই শিখেছি। মাও অনেক গাছ চেনেন। এসব গাছের অধিকাংশই তো ছোটবাবুরই লাগানো।

তাই? এই সব জমিও কি ওঁদের?

জমি? না তো। জমি তো বনবিভাগের।

তবে?

আনন্দ করে, ভালবেসে নিজের পয়সা খরচ করে গাছ লাগিয়ে বনকে আরও সুন্দর করছেন ওঁরা, বনবিভাগ আপত্তি করবেন কেন? তাছাড়া, বনবিভাগের সাহেবরা সবাই তো আসেন আমাদের ওখানে। গত সপ্তাহেই রাহা সাহেব এসেছিলেন?

কে তিনি?

অতনু রাহা। চিফ কনজার্ভেটর, পার্কস। মানে, পশ্চিমবঙ্গের সব ন্যাশনাল পার্ক, টাইগার প্রজেক্ট শুদ্ধু তাঁরই এক্তিয়ারে।

কিন্তু ঠিক এই জায়গাটা কি পশ্চিমবঙ্গ?

সেটাই তো মজা। আমরা বাংলা-বিহারী, থুড়ি, ঝাড়খণ্ডী। আমরা ঝালেও আছি, ঝোলেও আছি, ছোটবাবু বলেন। দু'পা এগোলেই পশ্চিমবঙ্গ আর দু'পা পেছলেই ঝাড়খণ্ড।

তুমি এত সব জানলে কী করে।

সবই বাবুদের কাছে শিখেছি। পনেরো বছর তো হয়ে গেল চাকরির।

এখন তোমার বয়স কত?

চৌত্রিশ। দিদি আর আমি সমবয়সি।

বলেই বলল, আচ্ছা এটা কী গাছ বলুন তো?

কোনটা?

ওই যে লাল ফুল ফুটেছে।

আমি গাছ-টাছ চিনি না। আমি কি বনবিভাগের আমলা?

তারপরে বলল, কী গাছ এটা? অশোক?

না।

পলাশ?

না।

তবে? শিমুল?

তাও নয়।

তবে?

ওটা মাদার। মাদার খুব জল খায়। মাদার বাংলাতেই ভাল হয়। এসব জায়গা তো রুখুসুখু। সেইজন্যেই এ পথ দিয়ে যখনই যাই আমি, ছোটবাবুর অর্ডার আছে, পলিথিনের জ্যারিকেনে জল রাখি গাড়িতে সব সময়ে। জল ঢেলে দিয়ে যাই। এখন থেকে আগামী তিনমাস নিয়মিত জল দিতে হবে। তারপরে বলল, দূরে আঙুল দেখিয়ে, ওই হল গিয়ে শিমুল। কত বড় বড় হয় গাছগুলো, দেখেছেন? গুঁড়িটাতে কেমন ভাগ ভাগ আছে দেখেছেন? আর সারা গায়ে কাঁটা। এই শিমুলের ফুল এখনই তো আসে—যে দিকে তাকাবেন লালে লাল। পলাশে আর শিমুলে। তবে পলাশ এদিকে বেশি হয়। বাড়ও খুব। সব গাছেরই আশেপাশে চারা গজিয়ে যায়। পলাশ না থাকলে গরিব মানুষদের হাঁড়ি চড়ত না। জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে ওরা। পলাশ একেবারে রাবণের গুষ্টি। যতই কাটা হোক না কেন সমানে বাড়ে, সমানে গজায় বিনা আদর-যত্নে।

তারপর একটু থেমে বলল সাঁটুল, শিমুলের ফুল কোটরা হরিণরা খুব ভালবেসে খায়।

এখানে হরিণ আসে নাকি?

এখন নামে না, আমাদের ছেলেবেলাতে তো এখানে গভীর বন ছিল, তখন দূরে দেখেছি। এখনও আছে, তবে পাহাড়ের ওপরের ঘন জঙ্গলে। ভালু-টোংরিতে আছে।

আর শিমুলের মগডালে যে বড় কালো পাখিটা বসে আছে সেটা কী পাখি বলুন তো?

তকাই বলল, তুই কি আমার বন্ধুর পরীক্ষা নিচ্ছিস না কি?

সাঁটুল হেসে ফেলল। তারপর জিভ বের করে দু কানে হাত দিল।

অনি বলল, আমি জানি না, কী পাখি ওটা?

ওটা এক ধরনের ঈগল। এর নাম শাবাজ। এরা একাই থাকতে ভালবাসে। অদ্ভুত ডাক ওদের - কি - কি - কিই করে।

এদের ইংরেজি নাম Crested Hawk Eagle।

তকাই বলল।

সাঁটুল বলল, আপনাকে ওই যে আফ্রিকান টিউলিপ দেখালাম তার নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই দিয়েছিলেন নাকি আকাশমণি। এখন আকাশমণি বলেই সকলে চেনে ওই গাছকে। আরও কত ...

বলেই, থেমে গেল সাঁটুল।

স্বগতোক্তি করল, ওই তো দিদি আসছেন।

জীবনে নার্ভাস ফিল করেছে খুব কমই অনিকেত। কিন্তু লাল ধুলো উড়িয়ে একটা সাদা ছোট মারুতিকে আসতে দেখে কে জানে কেন, ওর বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। ও একটা ফেডেড জিনস, গল্ফ খেলার হলুদ রঙা গেঞ্জি আর জগিং শু পরেছিল।

তকাই মুখ তুলে অনিকেতের মুখে চাইল একঝলক, অনিকেতের নাড়ি বুঝতে।

অনিকেত টের পেয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিল।

দেখতে দেখতে গাড়িটা ওদের গাড়ির কাছে এসে গেল। পথের উল্টোদিকে গাড়িটাকে পার্ক করে রেখে হিমিকা চট্টোপাধ্যায় নামল। একটা ফিকে বেগুনি রঙা শাড়ি, স্লিভলেস, সাদা ব্লাউজ এবং কোলাপুরি চটি পরে। গলাতে সাদা ঝুটো মুক্তোর মটরদানার হার, দু হাতে ওই রকমই মটরবালা, দুকানে মুক্তোর ইয়ার-টপ, হাতে সাদা রঙা স্ট্র্যাপে বাঁধা কালো ডায়ালের ঘড়ি, চোখে রে-ব্যানের রোদ চশমা। মেয়েটি বেশ লম্বা তাই আজকালকার অনেক মেয়েরই মতো লম্বা হবার জন্যে দু-ইঞ্চি রাবার হিলের জুতো পরতে হয়নি তাকে।

চোখ থেকে রোদ-চশমাটা খুলে ফেলে তকাইকে বলল, কী রে তকুদা। তুই তো ভুলেই গেছিস আমাদের। Long time no see!

তকাই বলল, তা তো বটেই। অফেন্স ইজ দ্যা বেস্ট ডিফেন্স। আমি তো প্রায়ই আসি, যে, বাড়ির মেয়ে, তাকেই দেখতে পাই না।

আর বলিস না রে। যা বিচ্ছিরি চাকরি না। ছুটি বলতে কি কিছু আছে? আমেরিকান কোম্পানিদের এই ধারা। মাইনে দেবে দারুণ, অন্য সব কিছু দেবে, কিন্তু তোকে নিশ্বাস ফেলার সময় দেবে না। আর পান থেকে চুন খসলেই চাকরি যাবে। ওরা সব মার্সেনারি—অর্থনৈতিক ব্যাপারে।

সেটা অবশ্য ঠিকই। আমার অভিজ্ঞতা আছে।

তারপরই বলল, পরে কথা হবে। আগে তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। আমার বন্ধু অনিকেত রায়। অনিকেতের দিকে ফিরে বলল, আমার মেজমামার মেয়ে হিমিকা, যার কথা তুই শুনেছিস।

নমস্কার। দুহাত জড়ো করে বলল, হিমিকা।

অনিকেত বলল, নমস্কার।

ভাল লাগল অনিকেতের। মনে মনে ও আসলে এখনও বেশ প্রাচীনপন্থী আছে। মেয়েরা শাড়ি পড়লে ওর খুব ভাল লাগে। বাঙালির সঙ্গে কথোপকথনের সময়েও অকারণ ইংরেজি তো বটেই

আমেরিকান কায়দা-কানুনও ওর আদৌ পছন্দ নয়। হিমিকা যে 'হাই' না বলে, 'নমস্কার' বলল তাতে সত্যিই ভাল লাগল ওর। নিজেদের এমন ঐতিহ্য, এমন সব সুন্দর সামাজিক ও ধার্মিক রীতিনীতি থাকতে কেন যে অনেকেই অন্যদের অন্ধ অনুকরণ করে বোঝে না ও। যারা অগভীর তারাই সম্ভবত ও রকম করে। ইংরেজি জানতে হয়, বলতে হয়, লিখতে হয়। আজকাল কম্পিউটারের যুগে ইংরেজি না জানলে অবশ্যই চলে না। তবুও ই-মেইল-এ 'আই মিস ইউ' না লিখে Tomar janye mon kharap lage লেখাটাই অনেক উচিত বলে মনে হয় ওর।

চশমাটা খুলে ফেলতেই দুটি উজ্জ্বল, ফিঙের মতো কালো চোখ প্রকাশিত হল, কখনও কখনও কারও হৃদয় যেমন 'প্রকাশিত' হয় তেমন। অনিকেত ভাবল, পরে বলবে হিমিকাকে যে, যাকে ঈশ্বর এমন এক জোড়া চোখ দিয়েছেন তার রোদ-চশমা পরা উচিত নয়। চোখই তো মনের জানালা। চোখে চেয়েই তো একজন মানুষের শিক্ষা, পটভূমি, বুদ্ধি, মানসিকতা সব কিছু বোঝা সবচেয়ে সহজ। ধোঁকা যে খেতে হয় না একেবারেই এমন নয় কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখেছে যে চোখ মিথ্যা বলে না।

হিমি দুষ্টুমিভরা হাসি হেসে বলল, ও আপনিই সেই গ্রেট অনিকেত রায়। আপনার বন্ধু তো আপনার মস্ত ভক্ত। আপনাকে না দেখেও আপনার সম্বন্ধে এত কিছু জানি যে আপনি জানলে বিস্ময়ে অজ্ঞান হয়ে যাবেন।

অনিকেত হেসে বলল, কী রকম?

আপনার একটা বিচ্ছিরি ডাকনাম আছে না? ভেটকু?

অনি হেসে ফেলল।

দাঁড়ান মশাই। এখনই কি? আপনি ইউনিভার্সিটির ক্রিকেট ব্লু ছিলেন? ক্রিকেটের ক্যাপ্টেন ছিলেন? আপনি সুবিনয় রায়-এর কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছিলেন, ভাল গান করেন, আপনার বাঁ পায়ের উরু এবং ডান বাহুতে চারটে করে লাল তিল আছে।

অনিকেতের দুকান লাল হয়ে উঠল, কিন্তু জোরে হেসে উঠে তকাই-এর দিকে ফিরে বলল, সত্যিই তকাই। তুই রিয়ালি ইনকরিজিবল।

তকাই বলল, চল হিমি, আমাদের সঙ্গে, আমরা ভালু-টোংড়ির মাথাতে সেই মস্ত বড় চ্যাটালো পাথরটাতে বসে থাকব হৃদি-ঝোড়ার পাশে। এক কলকাত্তাইয়াকে চাঁদ দেখাব। ওর গান শুনব। তুই গেলে তোরও। তোর খিদে পেয়েছে জানি কিন্তু তোর গর্ভধারিণী মা তাঁর খুকির জন্যে হটকেসে মাংসর সিঙাড়া ও মাছের কচুরি দিয়ে দিয়েছেন।

তাই?

বলল, হিমিকা।

কিন্তু ওসব খাবার পর যে চা বা কফি খেতে ইচ্ছে করবে।

তাও আছে।

হাউ থটফুল অফ হার।

ইয়েস। গরম কফি আছে ফ্লাস্কে। মিস্টার সাঁটুল শুধু ছোটমামার বডিগার্ডই নয়, সে তোর 'ভ্যালে'ও হবে।

বলছিস। তাহলে চল, যাওয়াই যাক। এখনও সময় আছে। ওখান থেকে তোর বন্ধুকে সূর্যাস্তটা দেখাতে পারবি। হৃদি-ঝোড়ার একটু দূরেই তো 'সানসেট পয়েন্ট'।

ঠিক তো। ভুলেই গেছিলাম।

তারপর বলল, তুই এ গাড়িতে আয়। ভার্সেটাইল সাঁটুল চন্দ্র তোর গাড়ি নিয়ে আসবে।

সবই ভাল কিন্তু সাঁটুল তো গিয়ার বদলায় না। কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালাদের মতো থার্ড আর ফোর্থ গিয়ারে গাড়ি চালায় অথচ গিয়ারই হচ্ছে গাড়ির প্রাণ। এ কথা হাজারবার বলেও ওকে বোঝাতে পারিনি।

তকাই বলল, আয় ওঠ। ক্ষমা করে দে, ক্ষমা করে দে। আর কত কিছু জানবে বলত সাঁটুল? কোন ফসলে কোন সার দিতে হবে, পোকা লাগলে কোন ওষুধ দিতে হবে, ছোটমামার ড্রাইভিং লাইসেন্স কবে রিনিউ করতে হবে, বড়মামার ডেঞ্চার আনতে কবে কলকাতায় যেতে হবে ডেন্টিস্ট বারীন রায়ের কাছে ওয়াটারলু স্ট্রিটে, কবে ফাগুন বউ গাছে ফুল আসবে, এ বছর পুজোর কতদিন আগে থেকে হরশৃঙ্গার ফোটা শুরু হবে?

হরশৃঙ্গারটা কী ব্যাপার?

হিমিকা বলল।

ফোর্ড আইকন-এর পেছনের দরজা খুলে হিমিকাকে গাড়িতে বসাতে বসাতে অনিকেতও বলল, হরশৃঙ্গারটা কী ব্যাপার? হরধনু অবধি আমি জানি।

হিমিকা বলল, আমিও জানি না। হরশৃঙ্গার কোন গাছ? দেখতে কেমন?

রিয়ার-ভিউ মিরারে দেখে নিল তকাই, সাঁটুল গাড়ি ঘোরাল কি না। তারপর গাড়ি ঘোরালো, ওকেই আগে আগে যেতে বলল। স্বগতোক্তি করল, ও তো প্রায়ই যায়, ওকে ফলো করাটাই ভাল হবে।

তা ঠিক। তবে ধুলো খেতে হবে।

এসি চালিয়ে দিচ্ছি কাচ তুলে দিয়ে।

তকাই বলল।

ফুলের গন্ধ, পাখির ডাক?

অনিকেত বলল।

সব পুষিয়ে দেব ওপরে পৌঁছে।

ঠিক আছে। কিন্তু হরশৃঙ্গার-রহস্যটা কী?

হরশৃঙ্গার মানে শিউলি। আমি জেনেছি ছোটমামার কাছ থেকে। ছোটমামাই একদিন বলেছিলেন। বিয়ের আগে...

ছোটমামার বিয়ে?

ভাগ্। প্রমথ চৌধুরী আর ইন্দিরা দেবীর বিয়ের আগে, মানে, কোর্টশিপ পিরিয়ডে, প্রমথ চৌধুরীর ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে পড়েছিলাম হরশৃঙ্গারের কথা। কী দারুণ লিখেছিলেন। ও রকম চিঠি লিখতে না পারলে কি ইন্দিরা দেবীর মতো রূপসী এবং সর্বগুণসম্পন্না কারওকে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ প্রমথ চৌধুরী ওরফে বীরবল বধ করতে পারতেন। তাঁর নিজের অগ্রজকে সুপারসিড করে!

কী লিখেছিলেন চিঠিতে?

সেটা মনে করে রাখার মতো বলেই মনে করে রেখেছি। ছোটমামারও মুখস্থ ছিল। আসলে জানিস তো, আমার ছোটমামা এত বড় রবীন্দ্র-ভক্ত বলেই আমিও রবীন্দ্রনাথের এত বড় ভক্ত হয়েছি। আমি তো আমি, দেখলি তো সাঁটুলও হয়েছে। নইলে রবীন্দ্রনাথ আফ্রিকান টিউলিপ-এর নাম 'আকাশমণি' রেখেছিলেন এ কথা তো সাঁটুলের জানার কথা নয়?

হিমিকা বলল, শুধু ছোটমামাই কেন, বাবা, জেঠুমণি সকলেই রবীন্দ্র-ভক্ত। বলতে গেলে, ইট র‍্যান ইন দ্যা ব্লাড।

বল এবারে চিঠির কথাটা।

গাড়িটা গিয়ারে দিয়ে এসি-টা চালিয়ে তকাই বলল, বলছি। সঠিক মনে নেই, থাকার কথাও নয়। লিখেছিলেন ঃ ভৈরবীর মধ্যে কড়িমধ্যম এলে প্রাণের মূলে গিয়ে যে রকম আঘাত করে ঠিক সেই ভাবে একটুখানি চাঁদের আলো, একটি ফুলের গন্ধ, একটি গানের সুর আমাদের প্রকৃতির আসল অংশটা একেবারে হঠাৎ খুলে দেয়। তুমি সৌন্দর্য, কবিতা, মহত্ত্ব, বলে জিনিস যে পৃথিবীতে আছে তা বিশ্বাস কর, আমিও করি। কিন্তু জিনিসগুলোর পূর্ণ বিকাশ কেবলমাত্র গুটিকতক

মাহেন্দ্রক্ষণেই হয়। নিজের চেষ্টায় হয় না। বাইরের সৌন্দর্য, কবিত্ব, মহত্ত্ব এসে তা ফুটিয়ে তোলে। একটি মানুষের ভিতর যা কিছু মহৎ, সুন্দর, মধুর, গভীর ভাব আছে তা একটি ফুলের গন্ধ যেমন করে ফুটিয়ে তুলতে পারে, তা দশ ভল্যুম ফিলজফিতেও পারে না।

যে-ফুলের গন্ধর উল্লেখ উনি করেছেন এখানে তাই হরশৃঙ্গার বা আমাদের চিরচেনা শিউলি।

তকাই বলল, তুই এতখানি মুখস্থ করে রেখেছিস?

ইচ্ছে করে করিনি। বহুজনকে বহুবার বলতে বলতে নিজের অজান্তেই মুখস্থ হয়ে গেছে।

হিমিকা বলল, আমাদের জেঠুমণি ও ছোটকাকুর তো পুরো গীতা এবং চণ্ডীও মুখস্থ আছে। বাবারও ছিল। মুখস্থ করবেন বলে তো মুখস্থ করেনি। বাবা বলতেন, দাদুর আদেশানুসারে ঘুম থেকে উঠে যোগাসনে বসে কোনওদিন পুরো গীতা এবং কোনওদিন পুরো চণ্ডী পাঠ করতে হত। করতে করতে পুরোটাই নিজেদের অজান্তেই মুখস্থ হয়ে গেছিল। কেন? মুসলমানেরা কোরাণ মুখস্থ করে না?

যাকগে যাক। এ সব কথা আর কারোকেই বলিস না। কলকাতার বুদ্ধিজীবীরা জানতে পেলে তোকে বর্বর বলবে। গীতা বা চণ্ডী পড়লে পাপ হয়। ও সব "গৈরিকীকরণের" হাতিয়ার। এখন শুধু মার্কস আর কোরাণই পড়া চলতে পারে। হয়ত বাইবেলও।

তকাই বলল।

ভেটকু বলল, সত্যি! যে সংস্কৃত ভাষাকে ভর করে আমাদের তাবৎ ধর্ম-কর্ম, বিয়ে ও শ্রাদ্ধ সেই ভাষাই এখন বাঙালিদের কাছে ব্রাত্য হয়ে উঠেছে। এমন ঘোর দুর্বুদ্ধিজীবী, সুযোগ-সন্ধানী এবং আত্মবিস্মৃত জাতি ভারতবর্ষে আর বোধহয় একটিও নেই। ভাবলেও লজ্জা করে!

অনিকেত বলল, এতদিনে বুঝলাম তকাই-এর পুরো ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, পুরো কোম্পানি অ্যাক্ট কী করে মুখস্থ হয়েছিল। সাব-সেকশন মায় সব প্রোভাইসো শুদ্ধু মুখস্থ বলতে পারত তকাই ওর সি এ পরীক্ষার আগে, বালিগঞ্জ লেক-এর বেঞ্চিতে বসে আমরা অবাক হয়ে যেতাম। এখন বুঝতে পারছি যে, রবীন্দ্র-ভক্তিরই মতো মুখস্থ করার শক্তিও also ran in the blood।

তকাই বলল, কথা না বলে দু'দিকে দ্যাখ। পথটা কেমন ঘুরে ঘুরে পাহাড়ে উঠেছে। দু'পাশে পর্ণমোচী বন। আহা! আমি Fall-এর সময় কানাডাতে থেকেছি...

আমিও থেকেছি। স্টেটস-এ ইয়্যালোস্টোন ন্যাশানাল পার্ক-এ গেছি ঐ সময়ে।

হিমিকা বলল।

অনিকেত বলল, আমি ইয়োরোপের Fall দেখেছি। বহুবর্ণ পাতার সে কী রূপ।

হিমিকা বলল, আমাদের হেমন্তকালকেই ত পশ্চিমী দেশে Fall বলে। ও সব দেশে আমাদের মতো এমন ছয় ঋতুতো নেই।

অনিকেত বলল, আঃ! তখন ওসব দেশে পাতার কী রং হয়। কর্বুর।

হিমিকা বলল, কর্বুর মানে?

কর্বুর মানে, বহুবর্ণ। তকাই বলল।

তাই?

সত্যি। তুই কত যে জানিস তকুদা।

তকুদা, এবারে যা বলছিলি তা বল। সেনটেন্সটা শেষ কর।

হ্যাঁ। বলছিলাম, দু'পাশে পর্ণমোচী বন এবং এই বসন্তে আমাদের ভারতবর্ষের বন, পাহাড়, প্রকৃতি যেমন সুন্দর তেমন সুন্দর সম্ভবত পৃথিবীর আর কোনও জায়গার জঙ্গলই নয়। আর যেহেতু আমাদের সব গাছ-গাছালি পাতা পশ্চিমী দেশের মতো একই সময়ে ঝরে না, পাতা, কিছু গাছের ঝরলেও অনেক গাছেই তখনও পাতা থাকে। গ্রীষ্মে কিছু গাছের পাতা ঝরে আর কিছু গাছের ঝরে শীতে।

তাই? বলল হিমি।

তারপর বলল, মারুতিকে তো দেখাই যাচ্ছে না রে তকুদা। সাঁটুল কি পাহাড়ের ঘাটরাস্তাতেও 'টিকিয়া উড়ান' চালাচ্ছে?

তাই তো মনে হচ্ছে। ছোটমামার বডি-গার্ড তো।

তাড়াতাড়ি চালা তকুদা। সূর্য ডুবে গেলে তোর বন্ধুর সান-সেট পয়েন্টে গিয়ে সান-সেট আর দেখা হবে না।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই ভালু-টোংড়ির ওপরে গিয়ে পৌঁছল গাড়ি। পাহাড়টা তো খুব উঁচু নয়। খুব উঁচু হলে তার নাম টোংড়ি হত না। ওপরে উঠে বোঝা গেল জায়গাটা মালভূমির মতো। তবে অধিকাংশই জঙ্গলে ভরা। দূরে মাঠমতো জায়গাটার অন্য প্রান্তে হিমিকার সাদা মারুতিটা দেখা গেল।

হিমিকা বলল, ঐ দেখো! দেখেছ, টাঁড়-এর শেষ প্রান্তে নিয়ে গেছে গাড়ি। আমরা কি ফুটবল খেলতে এসেছি এখানে। আশ্চর্য।

তকাই সেখানে নিয়ে গেল তার গাড়িও। গাড়ি থেকে সকলে নেমে একটা মস্ত গাছের নীচে একটি পাথরে বসল। সূর্য তখন পশ্চিমাকাশে দিগন্তরেখা থেকে হাতখানেক ওপরে আছে। প্রকাণ্ড একটা লাল থালার মতো।

অনিকেত বলল, এই তাহলে সান-সেট পয়েন্ট।

সাঁটুল বলল, এ জন্যেই গাড়ি এখান অবধি এনেছে, যাতে সময় নষ্ট না করে আমরা তাড়াতাড়ি স্পট-এ পৌঁছই।

তকাই অনিকেতের কনুই ধরে ফিসফিস করে বলল, ভেটকু।

বলেই, পুবে তাকাতে বলল।

অনিকেত তাকালে, বলল ও, আজ তো পূর্ণিমা নয়। একটু পরে উঠবে চাঁদ আজ। এখনই দেখা যাবে না।

সাঁটুল বলল, দিদি, সূর্য ডোবা দেখে এখানে বসেই কি খাবে তুমি? কাগজের প্লেট, ন্যাপকিন, হট-কেস সব বের করব?

তকাই বলল, দাঁড়া না সাঁটুল। সান-সেট দেখে সবাই গিয়ে আমরা হৃদি-ঝোড়ার কাছে সেই বড় পাথরটার ওপরেই বসব। আমাদেরও তো সেবা-টেবা করবি তুই নাকি? গ্লাস এনেছিস?

আজ্ঞে হ্যাঁ। সবই গুছিয়ে এনেছি। ঘি-এ ভাজা মাঠ্‌রীও এনেছি—রাম্‌-এর সঙ্গে খাওয়ার জন্যে।

সাঁটুলের খিদমতগারিতে কোনও ফাঁক থাকে না।

হিমি বলল।

তারপর তকাইকে বলল, তাই ভাল।

অনিকেত বলল, সত্যিই দারুণ।

অনেকটা পালামৌর নেতারহাটের সান-সেট দেখার জায়গা, 'ম্যাগনোলিয়া পয়েন্টের' মতো এই জায়গাটা।

তারপর বলল, একটা ক্যামেরা আনলে ছবি তোলা যেত।

সান-সেটের ছবি?

হিমি বলল।

হ্যাঁ।

সান-সেটের ছবি তা সমুদ্রেই হোক কি পাহাড়ে, এখন 'ক্লিশে' হয়ে গেছে।

তা অবশ্য ঠিক।

আমাদের সকলের তবু ছবি তুলতাম। থেকে যেত।

আমরা কেউ কি পটল তুলেছি? সকলেই যখন বেঁচে আছি এবং আরও বহুদিন বহাল তবিয়তে থাকব তখন ছবির দরকার কী?

তকাই বলল, মামিমা কিন্তু আমাকে বারবার করে আসতে বলছেন দোলে। আসবি নাকি? উইক এন্ডে একটা দিন ছুটি ম্যানেজ করতে পারলেই হয়ে যাবে।

তোর আবার ছুটি কি? নিজের ফার্ম। নিজেই তো নিজের মালিক।

আর সেই জন্যেই তো অসুবিধা। নিজের মালিক হলেই ছুটি নেওয়াটা সবচেয়ে অসুবিধের।

দ্যাখ চেষ্টা করে। হিমি তুই থাকবি তো দোল অবধি?

থাকব বলেই তো বলছি। তোরা এলে খুব মজা হবে। একদিন দুর্গা পাহাড়ে যাব, আরেকদিন মহাদেব-ঝুঁটিতে। পিকনিক করব।

অনিকেত একটু চুপ করে থেকে বলল, এখন তো সূর্যকে ডোবাই আগে, তারপর ভাবা যাবে।

তোর গান শোনাতে হবে কিন্তু হিমিকে।

ভাগ।

ভাগ মানে?

অমি তো বাথরুম সিঙ্গার।

হলে কী হয়। ইউনিভার্সিটিতে কত মেয়ে ওর গান শুনে প্রেমে পড়েছিল, জানিস হিমি।

বেচ্চারিরা! সব ব্যর্থ প্রেমিকা।

বলল, হিমি।

অনিকেত দিনের শেষ আলোতে তাকাল হিমির দিকে। কাটা-কাটা নাক-চিবুক। ঠোঁট দুটি ভীষণই ব্যক্তিত্বময়। গায়ের রং বেশ কালোই। মাথাতে চুল খুব বেশি নেই। পনি টেইল করে বাঁধা শাড়ির রঙ মেলানো একটি হালকা বেগুনি রিবন দিয়ে। আজ অবধি যত মেয়ে দেখেছে অনিকেত, হিমি তাদের কারও মতোই নয়। সুন্দরী বলতে সাধারণত যা বোঝায় তাও নয়। এই স্বাতন্ত্র্যটুকুই অনিকেতের চোখে হিমিকে বিশিষ্ট করে তুলল। গলার স্বরটি গাঢ়। যখন কথা বলে তখন থতড়ন-এ কথা বলে কিন্তু অনেক নারী-পুরুষেরই স্বরের মতো তা ইচ্ছাকৃত নয় আদৌ। গলার স্বরটিকে গাঢ় বললে ঠিক বলা হয় না। ভরা কলসের মতো।

অনিকেত বলল, আপনি গান গান না?

গা-ই-তা-ম। বিয়ের জন্যে এক সময়ে সব বাঙালি মেয়েদেরই অন্তত গোটা ছয়েক গান তো শিখতেই হত। সেই সময়ে মা জোর করে শিখিয়েছিলেন। বিয়ে তো হল না, গানগুলো রয়ে গেছে। ওই ছটা গানের যে কোনওটি আপনাকে শোনাতে পারি কিন্তু তকুদা আর সাঁটুল এতবার শুনেছে ওর সবকটিই যে ওরা ভীষণই আপত্তি করতে পারে।

তকাই বলল, নারে ভেটকু। ইয়ার্কি। ও রীতিমতো ক্লাসিক্যাল শিখেছে এক সময়ে। বড়মামিমা খুব ভাল গাইতেন। বলতেন, এমনিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদের, রজনীকান্তর, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং নজরুলের অনেক গানই বেশি গায় মানুষে কিন্তু ক্লাসিক্যাল যদি ছেলেবেলাতে না শেখা যায় তবে ভালভাবে গান গাওয়া যায় না।

থামত তকুদা তুই।

হিমি বলল। তারপর অনিকেতের দিকে ফিরে বলল, আপনি কোথায় শিখেছিলেন? সুবিনয় রায়-এর কাছে তো শুনলাম, আর কোথায়?

'গীতবিতান' থেকে ডিপ্লোমা নিয়েছিলাম।

বাবা। তাহলে তো পাকা গাইয়ে একেবারে।

'গীতবিতান' বা 'দক্ষিণী' থেকে ডিপ্লোমা নিলেই বুঝি সবাই পাকা গাইয়ে হয়ে যান? তাহলে তো কথাই ছিল না।

থাক তো এ সব তাত্ত্বিক আলোচনা।

এবারে আমি একটা কথা বলি?

তকাই বলল।

কী কথা?

এবারে আধঘণ্টা আমরা সবাই চুপ করে থাকি। শহুরেরা এক হলেই একই কথা আলোচনা করে। এবার শোন ভেটকু এই শুক্লপক্ষের রাতে ভালু-টোংড়ির কী বলার আছে। আধঘণ্টার মধ্যে চাঁদও উঠে আসবে হামাগুড়ি দিয়ে গাছ-গাছালির মাথায়। তারপরে হিমি চা খাবে, আমরা অন্য কিছু। তারপরে গান শোনা যাবে হিমি এবং তোরও। এখন অ্যাবসল্যুট সাইলেন্স।

ওর কথা বন্ধ করতেই বন বাঙ্ময় হয়ে উঠল। পাগলের মতো একটা পিঁউ কাঁহা পাখি, যার ইংরেজি নাম ব্রেইন-ফিভার, সত্যিই যেন মস্তিষ্কের জ্বরে আক্রান্ত হয়ে প্রচণ্ড জোরে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল ওদের মাথার ওপরে দিয়ে। তারপরই হৃদি-ঝোড়া নামক জলপ্রপাতের মৃদু মর্মর স্পষ্ট হল। হাওয়াটা বনময় ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল মিশ্র বনগন্ধ নিয়ে। অনিকেতের যেন ঘোর লাগল।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল ও আধো অন্ধকারে। তকাই-এর এবং হিমির মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। যাচ্ছিল না বলেই এক আশ্চর্য রহস্য যেন ঘিরে ছিল তাদের। সাঁটুল পেছনে একটা নিচু পাথরে বসেছিল তাই তাকে দেখা যাচ্ছিল না। অনিকেতের মনে হচ্ছিল তকাই-এর অত চেনা মুখটিও যেন অচেনা হয়ে গেছে সেই রহস্যময় অন্ধকারে আর হিমির অচেনা মুখটি তার কল্পনাতে ধীরে ধীরে চেনা হয়ে উঠতে লাগল।

হৃদি প্রপাতের নীচের দিক থেকে একটা চিতল হরিণ টাঁউ টাঁউ টাঁউ করে ডেকে উঠল। বনের রহস্য তাতে আরও নিবিড় হল। দুটো পেঁচা কিঁচি-কিঁচি-কিঁচর শব্দ করে ওদের মাথার ওপরে ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে ঝগড়া করতে লাগল। একটা পাখি, ওরা যে সান-সেট পয়েন্টে বসেছিল তার সামনের খোলা প্রান্তরের বুকের মধ্যে চমক তুলে তুলে ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে দিয়ে ডাকতে লাগল ডিড-উ-ড্যু-ইট, ডিড-উ-ড্যু-ইট। পাথরটার নীচে শুকনো পাতার মধ্যে সরসর শব্দ করে কী একটা সরীসৃপ ধীরে ধীরে চলে গেল। অস্বস্তিতে অনিকেত ওর পা'টা তুলে বসল। তকাই দেখল, কিন্তু কথা বলল না কোনও। ভালু-টোংড়ির নীচের কোনও গ্রাম থেকে মাদল আর ধামসার সঙ্গে আদিবাসীরা গান ধরল। আশ্চর্য সে গান। নারী-পুরুষের সেই সম্মিলিত গানের দোলানি সুরে, ঘুম পেতে লাগল অনিকেতের-মনে হল, এ যেন কোনও ঘুমপাড়ানি গান, শিশুকালে মা তাকে কোলে করে যে রকম গান গাইতেন নিচু গ্রামে, তেমন। গান তারা জোরেই গাইছিল কিন্তু অনেক দূরে থাকায় ওদের কাছে তা নিচু গ্রামে এসে পৌঁছচ্ছিল।

তারপরে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল সেই মালভূমি। গন্ধবাহী হাওয়াটাও যেন কার অদৃশ্য আঙুলের সঙ্কেতে থেমে গেল। কিছুক্ষণ পরে আবার দুলে উঠল হাওয়াটা। শুকনো পাতা গড়িয়ে উড়িয়ে। আবার ফিসফিসানি শুরু হল। এমন সময়ে এক জোড়া কী যেন বড় জানোয়ার সেই ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে চলে যেতে যেতে হঠাৎ তাদের দিকেই ঘুরে এগিয়ে আসতে লাগল। কী জানোয়ার, কে জানে! প্রায়ান্ধকারে আকাশের পটভূমিতে তাদের কালো শরীরের শিল্যুট ক্রমশ বড় হয়ে উঠতে লাগল।

তকাই হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সাঁটুলকে চাপা গলায় কী যেন বলল। সাঁটুল তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে ওদের ছাড়িয়ে সামনে একটু এগিয়ে গেল। পরক্ষণেই কোমরের বেল্টে বাঁধা রিভলবারটা বের করে পরপর দুটো গুলি করল। জানোয়ার দুটোর সামনে হাত দশেক আগে মাটিতে গুলি দুটো গিয়ে পড়তেই ওরা মুখ ঘুরিয়ে হাস্যকর ভঙ্গিতে অর্ধেক দৌড়ে অর্ধেক লাফিয়ে চলে গেল বাঁদিকে। তারা মাঠ ছেড়ে জঙ্গলে পৌঁছতেই তাদের নীচে নেমে যাবার শব্দ জঙ্গলের শুকনো পাতা এবং ঝোপেঝাড়ে স্পষ্ট শোনা গেল। তাদের চলে যাওয়াটা তারা গোপন রাখল না। যদিও আসাটা রেখেছিল। কিছুক্ষণ পরে তাদের শব্দ একেবারে থেমে গেল। থেমে যাওয়ার পরে সাঁটুল বলল,

ভাগ্যিস তোমরা চুপ করে ছিলে। নইলে বাবাজীদের আসাটা তো আমরা লক্ষ্যই করতাম না। রিয়্যাল কেলো হয়ে যেত।

অনিকেত একটু ভয়ও যে পায়নি এমনও নয়। এতক্ষণে ও কথা বলল। বলল, কী ও দুটো?

ভাল্লুক। আবার কী? তাদেরই তো জমিদারী এটা। আমরা বিনা অনুমতিতে এখানে হাজির হয়েছি, আমরা কারা, কী মতলবে এসেছি তাই খোঁজ করতে আসছিল আর কী। ভাগ্যিস গুলির শব্দ শুনেই তারা চলে গেল।

উল্টোটাও তো ঘটতে পারত।

ওরা তেড়ে এলে খুবই মুশকিল ছিল। সাঁটুল বলল, রিভলবার দিয়ে যত সহজে মানুষ মারা যায় অত সহজে অত বড় ভালুকদের ক্ষতি করা যেত না। তাছাড়া তাদের গায়ে গুলি লাগলে অন্য ক্যাসাদেও পড়তে হত। বনবিভাগ কেস করত। তার ওপরে তারাই হয়ত আমাদের ফেড়ে দিয়ে যেত একেবারে। ভাল্লুকের মতো খারাপ জানোয়ার আমাদের দেশের বনে-জঙ্গলে আর দুটি নেই। সম্পূর্ণ বিনা অপরাধে, বিনা প্ররোচনাতেও তারা মানুষের নাক চোখ ঠোঁট খুবলে নিতে খুব ভালবাসে। মাংস খায় না, অথচ কেন যে অমন করে কলকাতার কোনো কোনো বুদ্ধিজীবীর মতো, কে জানে! গত জন্মে সব ভাল মানুষদের সঙ্গেই বোধহয় ওদের বিশেষ কোনও শত্রুতা ছিল।

তাহলে খুবই বেঁচে গেছি আজকে আমরা। কী বল সবাই।

দোষ তো তোমারই সাঁটুল। দ্যাখো, ওটা কী গাছ।

তকাই বলল।

তাই তো। এখানে বসাটাই ভুল হয়েছিল আমাদের।

হিমিকা বলল।

অনিকেত বলল, কেন?

ওটা মহুয়া গাছ। ফলে ভরে আছে এখন। গন্ধ পাচ্ছিস না? তীব্র মিষ্টি একটা গন্ধ হাওয়ার ঝলকে ঝলকে? মহুয়াই খেতে আসছিল ওরা।

আবারও যদি আসে?

অনিকেত বলল, ভয়ার্ত গলায়।

আপাতত আর আসবে না। পরে হয়তো আসবে।

বাবাঃ। সত্যিই খুব বেঁচে গেলাম আমরা আজকে। কী দরকার ছিল এখানে রাতের বেলাতে আসার?

অনিকেত রিয়াল কলকাত্তাইয়ার মতোই বলল।

তকাই বলল, ভয় আছে বলেই তো ভালু-টোংড়ির সৌন্দর্য দশগুণ বেড়ে গেল। ভালবাসার মধ্যে অনিশ্চিতি এবং ভয়ই যদি মিশে না থাকে তবে সেই ভাললাগা ভালবাসা বড়ই আনইন্টারেস্টিং।

অনিকেত বলল, কী জানি বাবা!

তকাই বলল, হিমিও বেঁচে গেলি খুব। ভাল্লুকেরা, হনুমানদেরই মতো, মেয়েদেরই বেশি পছন্দ করে।

তার মানে?

মানে, ভাল্লুকে মেয়েদের রেপও করে। অ্যানাটমিকালি অসুবিধের নয়, তাই। তাই বনেজঙ্গলে ফল-কুড়োনো কাঠ-কুড়োনো মেয়েরা বাঘের চেয়ে ভাল্লুককেই বেশি ভয় করে।

হিমি হেসে বলল, যত আজগুবি গল্প তোর তকুদা। তাছাড়া ওরা তো মিস্টার অ্যান্ড মিসেসই ছিল।

আরে পুরুষ জাতটাই ছিঁচকে চোর। স্ত্রীর সামনে সবাই মহৎ, সবাই সৎ, সচ্চরিত্র। একা থাকলে তবেই না তাদের চরিত্র দাঁত বের করার সাহস পায়। তকাই বলল।

তারপর বলল, সত্যি বলছি রে। বিশ্বাস না হয় তো জিজ্ঞেস কর সাঁটুলকে।

সাঁটুল বলল, সে রকম হয় না যে তা নয়। তবে আমার অভিজ্ঞতায় জানি না। বাবার কাছে অমন একটা কথা শুনেছিলাম বটে। অবশ্য ছেলেবেলায়।

তকাই বলল, আচ্ছা মিস্টার সাঁটুল। এক সন্ধের পক্ষে আমার বন্ধুর অনেকই অভিজ্ঞতা হয়েছে। তোর মাধ্যমে নানা গাছ-গাছালি চেনা, হিমিকা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, সান-সেট পয়েন্ট থেকে সূর্যাস্ত দেখা এবং তারও পরে ভাল্লুক-দম্পতি দর্শন, এবারে হিমির কফি ও 'টা' এবং আমাদের রাম্ পান করাও মাঠ্‌রী সহযোগে তা না হলে ছোটমামাকে নালিশ করে দেব আমাদের মোটেই দেখাশোনা করিসনি বলে।

ঠিক আছে। দিচ্ছি। বলেই, সাঁটুল গাড়ির বুট খুলে খাদ্য-পানীয় সব বের করতে গেল।

তকাই বলল, মিস্টার ভেটকু, ওপরে চেয়ে দ্যাখ, মিস মুন তোর জন্যে অপেক্ষা করছেন চার চোখের মিলনের জন্যে।

সকলেই ওপরে তাকাল একই সঙ্গে।

হিমি হেসে উঠল তকাইয়ের কথা বলার ধরনে।

দেখেছিস? এ রকম চাঁদ কখনও কলকাতাতে দেখেছিস? না দেখবি? শিরিষ গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে মুখ দেখাচ্ছে আর উল্টোদিকে মুখ করে দ্যাখ, পশ্চিমাকাশে নীল, স্নিগ্ধ সন্ধ্যাতারাটা কেমন নিঃশব্দে উঠে তার দ্যুতিতে বিশ্ব চরাচরকে শান্তিতে ভরে দিয়েছে।

বাবাঃ। তুই তো দারুণ বাংলা বলছিস রে তকুদা। আজকাল।

ভুলে গেলি এরই মধ্যে যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষাতে বাংলাতে আমি সবচেয়ে বেশি নাম্বার পেয়েছিলাম।

ভোলা কি কখনও সম্ভব? বাবা-কাকারা, মা ও কাকিমারা তো উঠতে বসতে সে জন্যেই কথা শোনাতেন। বলতেন, লজ্জা করে না? তকুকে দ্যাখ। তুই খোট্টা হয়েই থাক। তোর আর বাংলা পড়ে দরকার নেই।

মেজমামা বেঁচে থাকলে জানতেন যে, আজকে সচ্ছল বাঙালি পরিবারের ছেলেমেয়েরা বাংলা আর হিব্রুর মধ্যে তফাত জানে না আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বদান্যতায় বাংলা মিডিয়াম স্কুলের ছেলেমেয়েরাও যা বাংলা শিখছে তা আর বলার নয়।

কেন এমন হচ্ছে?

মাস্টারমশাইরা নিজেরা তেমন জানলে তো শেখাবেন! স্কুল মাস্টার, কলেজের অধ্যাপক সবের নিয়োগের ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক প্রভাব এতখানিই পড়ে আজকাল যে তা বলার নয়। লেখাপড়া করে কী হবে। রাজনীতি করলেই হবে।

এটা তোর একটু বাড়াবাড়ি হল।

অনিকেত বলল।

হলে হল। আমার যা মনে হয় তাই তো আমি বলব।

তারপরই বলল, মাঝে মাঝেই আমার কী মনে হয় জানিস ভেটকু?

কী?

মনে হয়, কলকাতার কাজ সত্যিই বন্ধ করে এখানে চলে আসি। মামাদের বহুদিনের ইচ্ছে। ওঁদেরও তো বয়স হচ্ছে। নানা Trust ওঁরা করে গেছেন কিন্তু তবু নিজেরা ভালবেসে না দেখাশোনা করলে কি হাসপাতাল, স্কুল এসব চলে। এখানে আমার কত কীই না করার ছিল। সত্যিকারের দেশের কাজ, দশের কাজ। মামারা আমার ওপরে কোনওদিনই তেমন জোর করতে পারেননি কারণ নিজেদের ছেলেমেয়েরাই তো কথাটা বুঝল না। হিমিও তো চাকরি করতে চলে গেল ব্যাঙ্গালোরে। মনে ওঁদের সকলেরই খুব দুঃখ এবং অভিমান। মুখে প্রকাশ করেন না। একমাত্র ছোটমামা মাঝেমধ্যে প্রকাশ করে ফেলেন।

বলেই বলল, আসবি এখানে ভেটকু? ছোটমামা আমাকে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল খুলতে বলেছিলেন। কিন্তু এলে আমি প্রথমে মোটর ড্রাইভিং-এর স্কুল দিয়েই আরম্ভ করব। কলকাতার ড্রাইভারদের মাইনে কত জানিস? তিন-চার হাজার। পার্কস নিয়ে অনেকে দশ হাজারেরও ওপরে পায়। অথচ তিন-চার হাজার মাইনেতে মাড়োয়ারি গুজরাটিদের ফার্মে গলায় টাই ঝুলিয়ে হাতে ব্রিফকেস নিয়ে কত বাঙালি ছেলে চাকরি করে সেলসম্যানের। ওই টাইগুলো দেখলে আমার ইচ্ছে করে ওদের বলতে, গলায় দড়ি দিয়ে মরো না কেন বাছারা?

বাঙালি ড্রাইভার প্রায় কেউই রাখে না। বাঙালিরাও রাখে না। সব বিহারী, নয় ওড়িয়া, নয় উত্তরপ্রদেশীয়।

কেন? রাখে না কেন?

কামাই করে, সময়ে আসে না, নানা অজুহাত, বাহানা। মানুষেরা টাকা বেশি দিতেও কার্পণ্য করেন না যদি ঠিক মতো কাজ পান। তার ওপরে বাড়তি গুণ ইউনিয়নবাজি। এই ইউনিয়নবাজি, স্ট্রাইক, ঘেরাও, চোখ রাঙানি, পথ অবরোধ, রেল রোকো এ সব যে কবে বন্ধ হবে? অগণ্য কাজের মানুষের সব রকম অসুবিধা করে মিছিল, পথ-সভা এসব পশ্চিমবাংলার যা ক্ষতি করেছে তা বলার নয়। জানি না, কাদের ইমপ্রেস করার জন্যে এসব করা হয়। মানুষ কি গরু-গাধা? খেটে খাওয়া মানুষের কি বুদ্ধি নেই? তারা কাজ করতে চায়, কাজ চায়, চাকরি চায়, নির্বিঘ্নে ব্যবসা করতে চায়, তারা নানা নেতার মেদিনী কাঁপানো বক্তৃতা শুনতে চায় না। তারা চায়, ট্রাম-বাস-রেল ঠিক মতো চলুক, পথে ট্র্যাফিক জ্যাম না হোক। সকলেরই নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। সকলেই জেগে গেছে এবং প্রকাশ্যেই বলে, বাঙালি কাজও করে না, উল্টে ইউনিয়নবাজি করে। কার দরকার পড়েছে বাঙালিকে চাকরি দেবে? "ডিম্যান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই"-এর স্বাভাবিক নিয়মে যে চাকরি বাঙালিরই পাওয়ার কথা সেই চাকরি বিহার, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশের মানুষ পেয়ে যাচ্ছে।

হিমি বলল, খাবার আর কফি খেতে খেতে, যাঃ বাবা। তোমরা কি এই সব আলোচনা করতেই আর ভাল্লুকের কামড় খেতে এই ভালু-টোংড়িতে চড়েছিলে। এমন পাগলের মতো করলে তো তোর স্ট্রোক হয়ে যাবে তকুদা। নিজেকে শান্ত কর।

কী করব। আমার রাজ্যকে, আমার দেশকে আমি ভালবাসি বলেই তো চুপ করে থাকতে পারি না।

সাঁটুল গ্লাস নিয়ে আর প্লেটে মাঠ্‌রী নিয়ে তকাইকে বলল তকুদা, এই যে ধরুন।

তকাই রীতিমতো ওয়ার্কড-আপ হয়ে গেছিল। রাম্-এর গ্লাসটা হাতে ধরেই চুপ করে গেল। বলল, ওরে, অতিথিকে আগে দে। তুই কী রে সাঁটুল!

দিয়েছি তো।

তকাই বলল, সরি। আমাকে তোরা ক্ষমা করে দিস।

কী যে বলিস তুই তকুদা।

হিমি বলল।

অনিকেত বলল, বক্তৃতা না দিয়ে এখানেই চলে আয় বরং। করে দেখা। তুই যে, পারিস, করে দেখা। তা দেখাতে পারলেই করার মতো কিছু করা হবে। মতলববাজ রাজনীতিকদের গালে থাপ্পড় মারা হবে।

কারও গালেই থাপ্পড় মারতে আমি চাই না। আমি চাই নিজের রাজ্যকে বাঁচাতে। শুধুমাত্রই নিজের পকেট ভরার জন্যে নিজের নাম-যশ-প্রাইজের জন্যে বেঁচে থাকতে চাই না।

তাই তো বলছি। চলে আয়। আর তুই যদি আসিস তাহলে কথা দিচ্ছি, আমিও আসব।

হিমি খাওয়া থামিয়ে বলল, তকুদা, তোরা যদি আসিস, তুই তো আসতেই পারিস, তোর মামাবাড়ি, কিন্তু অনিকেতবাবু যদি আসেন বাইরের মানুষ হয়ে, তবে আমিও আসব। আসব মানে, এও বলতে পারি যে, ব্যাঙ্গালোরে আর ফিরেই যাব না।

তকাই দাঁড়িয়ে উঠে বলল, হুররে। হিপ্ হিপ্ হুররে।

তারপরই বলল, সাঁটুল, ফেরার সময়ে আমাদের কিচলির মোড়ে নামিয়ে দিবি।

কেন? তকুদাদা?

সাঁটুল বলল।

না, তুই আগে গাড়ি নিয়ে গিয়ে বড়মামা, মেজমামিমা আর ছোটমামাকে খবরটা দিবি। বুড়ো-বুড়িরা আনন্দেই না আজ রাতে স্ট্রোক হয়ে মারাই যায়। তাঁদের কত দিনের স্বপ্ন, আমাকে যে কতবার বলেছেন!

হিমি বলল, আমাকেও। কতবার যে সকলে কতভাবে বলেছেন। অনুনয়-বিনয় বললেও কম বলা হয়। তবে যাওয়ার সময়ে ডঃ মাহাতোকে তুলে নিয়ে যাস। সঙ্গে যেন তাঁর ব্যাগটা নিয়ে যান। আমি ঠাট্টা করছি না। আনন্দের shock-টা দুঃখের shock-এর চেয়ে একটুও কম নয়।

সাঁটুল মুখ ব্যাজার করে বলল, এ তো আর সাইকেল নয় যে একটা নিজে চালালাম আর অন্যটাকে পাশে পাশে গড়িয়ে নিয়ে গেলাম! এ যে গাড়ি! একটা গাড়ি তো তোমাদেরও চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

ঠিকই তো। তবে এই এখান থেকে আধঘণ্টা আগে রওয়ানা হয়ে যা।

তা হবে না। তোমাদের কারও কাছেই কোনও যন্ত্র নেই। ভাল্লুক দুটো যদি আবার আসে। তার চেয়ে চলো — নেমে তোমরা কিচলির মোড়ে গাড়িতে বসে বা পায়চারি করতে করতে চাঁদের আলোয় জঙ্গল দেখ। নীচে কোনও খতরনাক জানোয়ার নেই। শেয়াল, খরগোশ এসবই আছে। আমি না হয় আগেই চলে যাব।

রাতে কী রান্না হচ্ছে জানিস?

ঠিক জানি না, তবে মা বলছিলেন লুচি আর কচি পাঁঠার মাংস হবে। ফুদিয়ার দোকান থেকে পাঁচুকে দিয়ে রাবড়িও আনিয়ে রেখেছেন ফ্রিজ-এ। আর কাঁচা আমের চাটনি।

তকাই বলল, গিয়ে স্টপ করা। আমার বন্ধু ভেটকু ভুনি খিচুড়ি খেতে খুব ভালবাসে। মেজমামিকে বলবি, তাঁদের বাপের বাড়িতে হাজারিবাগে যেমন ভাজা মুগের ভুনি খিচুড়ি হয় তেমন ভুনি খিচুড়ি করতে আর সঙ্গে কষা মাংস। আজ ভেটকুকে মামাবাড়ি ও আমার তরফেও একটা Treat দেব—নরাণাং মাতুলক্রমঃ বলে কথা।

বলেই বলল, আচ্ছা হিমি, তোর সঙ্গে না ছোটমামার কী জরুরি কথা ছিল বলে উনি এলেন না আর তুই না বলে কয়ে এখানে আমাদের সঙ্গে ভিড়ে গেলি। বুড়ো মানুষের চিন্তা হবে না? তুই তো ভারি ইরেসপনসিবল।

ভেব না যে আমি অমন দায়িত্বজ্ঞানহীন। তোমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই ছোটকাকার কাছে তোমরা ভালু-টোংড়িতে আসছ জানতে পেরে আমি গাড়ি থেকেই মোবাইলে কথা বলে নিয়েছিলাম।

তাই? হাউ থটফুল অফ ইউ। তা তোর সঙ্গে মোবাইল আছে তো, মামিমাকে তো মোবাইলেই বলে দেওয়া যায় লুচি-ফুচি করে ফেলার আগে।

মোবাইল তো আমার কাছেও আছে। ছোটবাবু দিয়েছিলেন।

সাঁটুল বলল।

আছে? এতক্ষণ বলিসনি কেন? ইডিয়ট।

তোমরা মোবাইল ফোন আনোনি তকুদা?

হিমি জিজ্ঞেস করল তকাইকে।

না, আমরা কেউই আনিনি। কলকাতাতেই রেখে এসেছি। ইনফরমেশন টেকনোলজির এমন বাড়াবাড়িটা আমাদের দুজনের কারওই পছন্দ নয়। আমরা এখন ডিস-ইনফরমেশন টেকনোলজি প্রোমোট করব।

হিমি বলল, তুইই বল না মাকে তকুদা। মা খুশি হবে। আর shock absorb-ও করতে পারবে। আমাদের দেশের মেয়েদের মতো shock absorber-তো ঈশ্বর আর তৈরি করেননি।

তবে দে ফোনটা।

তকাই বলল।

সাঁটুল, আমার গাড়ির ড্যাশবোর্ডে আছে। নিয়ে এসো তো।

তকাই বলল চল, আমি যাচ্ছি। এত বড় একটা ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাসাইনমেন্ট — একটু নির্জনে দাঁড়িয়ে ক্যারি-আউট করাই ভাল।

বলেই, সেই মাঠ বা টাঁড়ের দিকে এগিয়ে গেল।

তারপর অনিকেতের দিকে ফিরে বলল, কী রে অনি। মেনু যা বললাম, তাতে হবে তো?

একটা আইটেম add করতে হবে?

কী সেটা?

কুড়মুড়ে আলু ভাজা।

বাঃ দারুণ। আর মামাবাড়ির বুধিয়া গাই-এর গাওয়া ঘিও থাকবে। শুকনো লঙ্কা ভেজে দিতে বলব তো গরম গরম খাওয়ার সময়ে?

আলবাৎ। আমি রেড রাম্ সত্যিই খাই না। ছোটমামা ভালবেসে পাঠিয়েছেন। রাম্-এর মুখে ভুনি খিচুড়ি যা জমবে না।

তুই তো মেজমামির হাজারিবাগী ভুনি খিচুড়ি খাসনি। খেলে, অক্কা যাবি।

তকাই ফোন করার জন্যে সাঁটুলের কাছ থেকে গাড়ির চাবি নিয়ে জ্যোৎস্নার মধ্যে গাছেদের ছায়ার বুটি-কাটা গালচের ওপর দিয়ে শুকনো পাতা মাড়িয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। ওর পেছন পেছন রাম্-এর গ্লাস ধরে সাঁটুলও গেল।

ভেটকু মনে মনে বলল, তকাই একটা রিয়াল বুর্জোয়া।

ঠিক সেই সময়েই পিউ কাঁহা পাখিটা কোথা থেকে ফিরে এসে আবার সমানে ডাকতে লাগল। সেই ডাকের তীব্র শিহরন তোলা অনুরণন উঠল পাহাড়ে খাদে, প্রান্তরে এবং ঝরনাতলাতে। তার প্রিয়াকে খোঁজা এখনও শেষ হয়নি বোধহয় পাখিটার। অনিকেত ভাবছিল যে, তার প্রিয়া তো এখনও কেউই হয়নি। খোঁজা শুরু করতে হবে।

হিমি বলল, কী ভাবছেন? আপনার সর্বনাশ হল আমার সঙ্গে দেখা হয়ে?

না, তা নয়। তাছাড়া কী সর্বনাশ আর কী পৌষমাস তা কি আমরা নিজেরাই জানি।

তারপর বলল, আপনি 'চার অধ্যায়' পড়েছেন? রবীন্দ্রনাথের?

পড়ব না?

তাহলে তো পড়েইছেন, 'প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্র মাস, তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ'।

সত্যি। রবীন্দ্রনাথ কী মডার্ন। কোনওদিনও পুরনো হবার নয়। কিন্তু আপনি কী ভাবছিলেন তা তো বললেন না?

না, ভাবছিলাম, একজন মানুষের জীবনে কত কীই ঘটে যায় এক নিমেষে। এমন এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে খুব ভীরু ও দ্বিধাগ্রস্ত মানুষও এক নিমেষে যে, নিজেই অবাক হয়ে যায়। কলকাতা ছেড়ে আসার সিদ্ধান্তটা তো সহজ নয়। তকাই আমাকে বলেছে আগে অনেকবার। ভেবে দেখতে বলেছে। অথচ আশ্চর্য। কোনও ভাবাভাবি ছাড়াই এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম কী করে কে জানে! তাছাড়া...

তাছাড়া মনে হচ্ছে, যেন আপনাকে কতদিন ধরে চিনি — আর ছোটমামা, বড়মামা, মেজমামিমা যেন আমার কত জন্মের আপনজন। তকাই তো আমার অত্যন্ত কাছের মানুষ অবশ্যই। কিন্তু আপনি — এমনকী সাঁটুলও। এসব কি এই প্রাকৃতিক অভিঘাতের জন্যেই হল?

'চাঁদের বনে যার পাশে যাই তারেই লাগে ভাল' বলছেন?

বলে, চাপা হাসি হাসল হিমি।

এ কথা ঠিকই। এই প্রকৃতি যে কতখানি অঘটন—পটিয়সী তা শুধু সে নিজেই জানে।

তারপর বলল, কাল সকালে রোদ উঠলেই এই ঘোর কেটে যাবে না তো? আমাদের প্রতি আমার পরিবারের সকলের প্রতি এই ভাললাগাটা?

জানি না। কালকের কথা কালই জানে।

আমিও ভাবছি, ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে চলে আসার সিদ্ধান্তটা কী করে হঠাৎ নিলাম। জীবনে অনেক ব্যাপারেই বছরের পর বছর ভেবেও কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায় না, কিন্তু কোনও বিশেষ মুহূর্তে সেই সিদ্ধান্ত বিদ্যুৎ-চমকের মতো পাকা হয়ে যায়। সত্যি! মানুষের মনের মতো দুর্জ্ঞেয় আর কি কিছু আছে!

তারপর দুজনেই একটুক্ষণ চুপ করে থাকল।

আপনার কিন্তু একটা গান গাইবার কথা ছিল।

হিমিকা বলল, অনিকেতকে।

রাম্‌টা খেয়েনি। দু-তিনটি ড্রিঙ্ক-এর পর নিজের মধ্যের নানা অদৃশ্য বাঁধন যখন ঢিলে হয়ে যায়, যখন খুশি খুশি লাগে, তখনই শুধু গাইতে ইচ্ছে করে। গান গাইবার মতো মন কি সব সময়ে থাকে? আমি কি আর আপনার মতো গায়িকা!

'আমার মতো' 'আপনার মতো' বলে কোনও ব্যাপার নেই। যার মধ্যে গান আছে, যার কান আছে, তিনিই গায়ক। আসলে, মানুষ নিজের জন্যে। যতখানি গান করেন, মানে নিজের ভাললাগার জন্যে, তেমন তো অন্য কারও জন্যেই করতে পারেন না।

এটা ঠিকই বলেছেন আপনি।

বলেই, চুপ করে গেল অনিকেত।

ওপাশ থেকে তকাই-এর উল্লসিত চিৎকার শোনা গেল। বলল, আমাকে কী দেবে বল মেজমামি।

তকুদাটা বড্ড চেঁচায়। এই সন্ধের শান্তিটা ছিঁড়েখুঁড়ে দিল।

অনিকেত বলল, আপনি কী ভাবছিলেন?

ভাবছিলাম, আমার ফিরে যাবার তো সবই ঠিক ছিল। কলকাতা থেকে ব্যাঙ্গালোর ফ্লাইটের রিটার্ন টিকিটও নিয়ে এসেছি। অফিসের গাড়ি আসবে এয়ারপোর্টে। হঠাৎ কী যে হয়ে গেল। তবে একবার যেতে তো হবেই, নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে আনতে, গ্রাচুইটি, পি এফ, শেয়ার সব সেটল করতে। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি তো। কিছু শেয়ারও দিয়েছিল। শিকড় বেশ গভীরেই ছড়িয়েছিলাম। আমার জি. এম. তো হাত-পা ছুঁড়বেন। বলবেন, ইউ হ্যাভ গান ক্রেইজি।

তারপর বলল, দেখি। আপনি যদি আমাদের পরিবারের এই যজ্ঞে শামিল হন তাহলে আমারও শামিল না হওয়াটা খুবই খারাপ দেখাবে। বিবেক যাকে বলে, "দংশন" করবে।

খারাপ দেখাবে বলেই আসবেন না। মন থেকে আসবার তাগিদ বোধ করলেই আসবেন।

সেটা ঠিক।

ইতিমধ্যে তকাই আর সাঁটুল ফিরে এল। এসেই তকাই বলল, এই সাঁটুল আমার বন্ধুকে দেখছিস না। দ্যাখ গ্লাস খালি হয়ে গেছে কি না?

সাঁটুল অনিকেতের হাত থেকে গ্লাস নিয়ে নিল। দোলের তো মাত্র আটদিন বাকি। দু'দিন পর গিয়ে আবার ফিরে আসবি, না থেকেই যাবি ভেটকু?

না না, অনেক কমিটমেন্টস আছে। তাছাড়া, মা তো একা থাকেন।

মাসিমা এখানে আসতে আপত্তি করবেন না তো?

তকাই বলল।

মনে হয় না। মা কলকাতাতে আর থাকতেও চান না।

সত্যি। কলকাতায় আর থাকা মুশকিলও। না গাড়িতে করে কোথাও যাওয়া যায়, না হেঁটে। প্রশ্বাসও তো নেওয়া যায় না, যা পলিউশন। নেহাত রুজি-রোজগারের জন্যেই থাকতে হয় মানুষের। তাছাড়া এখানে তোদের মামাবাড়িতে একটা ধার্মিক আবহাওয়া আছে, পুজো-আচ্চা, দোল-দুর্গোৎসব, মায়ের ভালই লাগার কথা।

তারপর বলল, কিন্তু আমি এলে মাকে নিয়ে থাকব কোথায়?

কেন? মামাবাড়িতে?

তকাই বলল।

না, তা কেন? সেটা অনিকেতবাবু এবং তাঁর মায়ের পক্ষে সম্মানের হবে না। তবে থাকবার জায়গা জ্যাঠা-কাকার অবশ্যই বন্দোবস্ত করে দেবেন।

হিমি বলল।

তাহলে আমি তোর সঙ্গেই থাকব। আমার মা থাকবেন তাঁর দু'ভাই আর ভাই-বউ-এর সঙ্গে।

হিমির থাকার কথা স্বাভাবিক কারণেই উঠল না। হিমি চুপ করেই রইল।

একটা সিগারেট খাওয়া।

অনি বলল তকাইকে।

সিগারেট! তুই!

হ্যাঁ। ভীষণ টেনশন হচ্ছে।

তকাই খুব জোরে হেসে উঠতে গিয়েও সামলে নিয়ে বলল, নে, খা।

এবারে গান গা একটা হিমি। আমি কিন্তু আজ ড্রাঙ্ক হয়ে যাব। জীবনের কোনও কোনও দিন ড্রাঙ্ক হওয়া দরকার।

সেটা ভাল। কিন্তু ব্যাঙ্গালোরে মিস্টার মুখার্জি আছেন। তিনি বলেন, যেদিন বৃষ্টি পড়ে সেদিন ড্রাঙ্ক হই আর যেদিন পড়ে না সেদিন।

তকাই আর অনিকেত হেসে উঠল।

গা হিমি। তুই খাবি নাকি একটা রাম্? ভেটকু যখন সিগারেট খাচ্ছে। তোর কোনও টেনশন হচ্ছে না তো?

না। কীসের টেনশন? আই অ্যাম ড্রাঙ্ক উইথ লাইফ।

ঠিক আছে। একটা গান গা না।

আচ্ছা গাইছি। বসন্তের একটি গান। যদিও সকালবেলার রাগে বাঁধা।

রবীন্দ্রনাথের গানের পর্যায় সব উনি ভাগ করেছেন বলেই খোদার ওপর খোদকারি করা উচিত নয় কিন্তু অনেক গানকেই অন্য পর্যায়েও সহজেই ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তাই না?

অনিকেত বলল।

অবশ্যই। যে গানটি গাইছি সেটি বসন্তর গান কিন্তু প্রেমের গান বললেও কারও মারামারি করা উচিত নয়। তাছাড়া এটি সকালবেলার গান, তবুও গাইছি, মন যখন করেছি।

গা এবারে। বড় বেশি কথা বলছিস।

হিমি ধরল গান,

'তুমি কিছু দিয়ে যাও মোর প্রাণে গোপনে গো
ফুলের গন্ধে বাঁশির তানে, মর্মরমুখরিত পবনে॥
তুমি কিছু দিয়ে যাও বেদনা হতে বেদনে -
যে মোর অশ্রু হাসিতে লীন, যে বাণী নীরব নয়নে॥.
তুমি কিছু দিয়ে যাও মোর প্রাণে..."

গান শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল অনিকেত। যেমন স্বরস্থাপনা, তেমন সুরজ্ঞান, তেমনই ভাব। এই গানটি বহু বড় বহু গাইয়ের গলাতেও শুনেছে। তাও যখন এতখানি ভাল লাগল তার মানে হিমি অবশ্যই ভাল গায়। খুবই ভাল গায়।

ভাবছিল অনি।

রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষিতদের গান। এখন সকলেই রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক ও বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছেন। তা দেখে ও শুনে রবীন্দ্রসঙ্গীত যাঁদের প্রাণের গান তাঁদের প্রাণে যে কতখানি আঘাত লাগে তা শুধু অন্য যাঁরা সেই রকম, তাঁরাই বোঝেন, জানেন।

হিমি বলল। ওই "বুর্জোয়া" কবির গানকে যে সমস্ত শিক্ষিত মানুষ যথার্থ সম্মানের ও ভালবাসার সঙ্গে জীবনে গ্রহণ করেছেন, শুধুমাত্র সেই গানেই আত্মনিবেদন করেছেন তা তাঁদেরই হয়ে থাকলে সুখের হত। সব কিছুরই 'জনগণায়ন' কোনও জাতির পক্ষেই সুস্থতার লক্ষণ নয়। রবীন্দ্রসঙ্গীত কোনোদিনই আপামর জনগণের গান ছিল না। তেমন ভাবাটাও উচিত নয়। জনগণ জনগণোচিত ব্যাপার স্যাপার নিয়ে থাকলেই সেটা সুখের হতো।

অনিকেতের আরও একটা কথা মনে এল। ওর মন বলল, রবীন্দ্রসঙ্গীত এমন পরিবেশেই শুনতে হয়। হাজার আলো-জ্বলা কোনও শহরের কনসার্ট হলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের তাৎপর্যই নষ্ট হয়ে যায়। শান্তিনিকেতনে ছেলেবেলায় শান্তি ছিল। তখন সেখানের পৌষোৎসবে কি বসন্তোৎসবে গান শুনলে প্রকৃতির ছোঁয়া তখনও পাওয়া যেত। কিন্তু আজকে ভিড়ের চোটে তা আর পাওয়া যায় না। অনির কাছে এ এক আবিষ্কার। হিমির গানটি যেন ওর মরমে বিঁধে গেল। এই প্রকৃতি এবং প্রকৃতির নানারকম অভিঘাতও পরম আবিষ্কার।

তকাই বলল, গ্লাসটা ধর। বটমস্-আপ কর ভেটকু।

অনি বলল, হ্যাঁ। ভাবছি। আজকে আমিও ড্রাঙ্ক হব।

হিমি একবার তাকাল অনিকেতের মুখে।

তকাই বলল, আমার বোনের গান কেমন শুনলি তা তো বললি না?

সব জিনিস কথা দিয়ে বোঝানো যায় না। বোঝানোর চেষ্টা করাও উচিত নয়।

তবে?

চোখের ভাষা দিয়ে বোঝাতে হয়।

এই সপ্তমীর শুক্লপক্ষের আলোতে তো অন্য মানুষের চোখ দেখা যায় না তেমন করে।

যে দেখতে জানে সে ঠিকই দেখে।

বুঝলাম। এবার তুই গা।

না। ওই গানের পরে অন্য গান আর হয় না। গানটির রেশ কেটে যাবে। অন্যদিন হবে।

তাহলে চল আমরা সকলে মিলে 'আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে গাই'। আমার বডিও আজ গান চাইছে।

তকাই বলল।

হিমি হেসে বলল, ফাজিল কোথাকার।

রবীন্দ্রনাথের ওই গানটিও 'ক্লিশে' হয়ে গেছে সূর্যাস্তর ছবিরই মতো। গান যে গাইতে হবেই তার কি মানে আছে? একটু না হয় চুপ করেই থাক। প্রকৃতির কথা শুনি, রূপ দেখি।

অনি বলল।

আরে বাব্বা। এ যে দেখি 'গুরু গুড় চেলা চিনি'।

তারপর হেসে বলল তকাই, 'দুদিনের সন্ন্যাসী, ভাতকে বলে অন্ন'।

সাঁটুল বলল, আর পনেরো মিনিট বসে তারপর গেলেই ভাল।

অনি বলল, ড্রাঙ্ক হয়ে বাড়ি ফিরলে মামারা কিছু বলবেন না? আর মামিমা? খাওয়ার সময়ে তো মামিমা থাকবেনই।

মামারা বলবেন না, তবে মামিমাকে বলব, মামাদের খাইয়ে দিতে। বড়মামা তো সাড়ে আটটাতে খান। ছোটমামা জেগে থাকলেও কিছু হবে না। তাছাড়া ড্রাঙ্ক হবই বা কেন? ভদ্রলোকে কখনও ড্রাঙ্ক হয় না, 'হাই' হতে পারে কখনও কখনও।

যেমন তোরা ঠিক করবি।

তারপর বলল, চল, আমরা আবার চুপ করে থাকব, আগের মতো।

আবার যদি ভাল্লুক আসে।

হিমি বলল।

এলে আসবে।

সাঁটুল বলল।

আরও চারটে গুলি তো আছে রিভলবারের চেম্বারে। ভয় নেই। তাড়িয়ে দেব।

তাহলে সবাই চুপ।

অনিকেত বলল।

সেই রুপোঝুরি রাতে ঝিরিঝিরি ছায়ার মধ্যে চন্দ্রাহত হয়ে ওরা তিনজনে বসে রইল, মস্ত বড় কালো পাথরটার ওপরে। ওরা চুপ করতেই ঝরানার শব্দটা জোর হল। ভারি সুন্দর নাম ঝরনাটার। হৃদি-ঝোড়া। আস্তে আস্তে নানা রাত-পাখির ডাক স্পষ্ট হতে লাগল। অনিকেত হিমির মুখটা ভাল করে দেখার চেষ্টা করতে লাগল। তার কাটা-কাটা-নাক। চিবুক ঠাহর করতে পারল কিন্তু ওই স্বল্পালোকে তার চোখ পড়তে পারছিল না। আর চোখই তো মনের আয়না। মনের জানলা।

হিমিও তাকিয়ে ছিল অনড় হয়ে বসে অনিকেতের মুখে। যদি দেখতে পায় চোখ অনিকেতের, পড়তে পারে তার ভাষা।

একটা কপার-স্মিথ পাখি ডাকছিল ঝরনাতলার কাছ থেকে আর তার দোসর সাড়া দিচ্ছিল পাহাড়ের নীচ থেকে। যে পাখিটা ঢাব-ঢাব-ঢাব-ঢাব করে ডাকে এমন চাঁদের রাতে রাতভর, সেটা ডাকা শুরু করল। সামনের জ্যোৎস্নালোকিত বিস্তীর্ণ ফাঁকা টাঁড়-এর ওপরে একটি একলা ইয়ালো-ওয়াটেলড ল্যাপউইঙ্গ ডেকে ফিরতে লাগল ডিড-ইউ-ড্যু-ইট-ডিড-ইউ-ড্যু-ইট করে।

কে যে কী করল, কেন করল, কেমন করে করল, তা কে জানে!

পাখিরাই শুধু জানে বুঝি। শুধু পাখি জানে। পাখিরা জানে।

ভাবছিল, হিমি।

সুখের কাছে

উৎসর্গ

অনিশা দত্ত

কল্যাণীয়াসু

প্রচ্ছদ

সুধীর মৈত্র

এক

চাঁদের আলোয় দু-পাশের এবড়োখেবড়ো রুক্ষ প্রান্তর, দূরের ধুঁয়ো-ধুঁয়ো পাহাড়, কাছের জঙ্গল সমস্ত মিলিয়ে একটা রাত্রিকালীন অপরিচিতিজনিত গা-ছমছম অস্বস্তির সৃষ্টি করেছে।

মহুয়ার ঘুম পেয়ে গেছে। সেই সকালে কলকাতা থেকে বেরুনোর পর তিনশো মাইলেরও বেশি গাড়িতে এসেছে ওরা!

দিনে বেশ গরম ছিল। মার্চের শেষ। ক-টার সময় যে পৌঁছোবে সে কুমারই জানে। মনে মনে কুমারের উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছে মহুয়া।

বহুক্ষণ হয়ে গেছে—কোনো লোকালয়, জনমানব চোখে পড়েনি। রাস্তাটাও কাঁচা। কোথায় চলেছে ওরা কিছুই বোঝার উপায় নেই এখন।

একটু আগেই দুটো শেয়ালকে দেখেছে রাস্তা পেরোতে। জানালার নামানো কাচ দিয়ে হাওয়ার সঙ্গে এক এক ঝলক মিষ্টি গন্ধ আসছে। কিসের গন্ধ মহুয়া জানে না। জানতে ইচ্ছে করছে।

সামনেই একটা হেয়ারপিন বেন্ড। কুমার গাড়ি চালাচ্ছিল। কুমারের পাশে সান্যালসাহেব। পিছনের সিটে মহুয়া। মহুয়ার পাশে টুকিটাকি—জলের বোতল, সন্দেশের বাক্স, ডালমুট এই-ই সব।

মোড়টা ঘুরেই, গাড়িটা হঠাৎ প্রচণ্ড আওয়াজ করে বন্ধ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ থেকেই ইঞ্জিনটা ধাক্কা দিচ্ছিল—কিন্তু শব্দটা বনেটের নীচে থেকে এল না। মনে হল গাড়ির চেসিসের নীচ থেকে এল। বন্ধ হতে হতেও, গতিতে ছিল বলেই অনেকটা এগিয়ে যাবার পর গাড়িটা থামল।

কুমার স্টিয়ারিং বাঁদিকে কাটিয়ে একটা গাছের নীচে রাস্তার পাশে দাঁড় করাল গাড়িটাকে।

মহুয়া উদ্বিগ্ন গলায় বলে উঠল, কী হল? সাংঘাতিক কিছু নিশ্চয়ই!

সান্যালসাহেব পাইপ মুখে ভুরু তুলে কুমারের দিকে তাকালেন।

কথা বললেন না কোনো।

কুমারের প্রোফাইল দেখা যাচ্ছিল পেছন থেকে। একটা উঁচু কলারের কালো-সাদা খোপ-খোপ টেরিকটের জামার আড়ালে বৃষ্টিতে ভেজা কাকের মতো রোগা গ্রীবা, একমাথা হিপিদের মতো চুল—ছ ইঞ্চি সাইড-বার্ন—তীক্ষ্ণ নাক।

কুমার কথা না বলে, দরজা খুলে নেমে, বনেট তুলে টর্চ জ্বেলে এটা-ওটা নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল।

সান্যালসাহেবও নামলেন।

সামনে বনেটটা তুলে দেওয়াতে এখন কাচটা পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেল। সামনে আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

মহুয়া পথের দু দিকে তাকাল।

এতক্ষণ গাড়ি চলছিল বলে গাড়ির আওয়াজে গতির মত্ততায় এবং গন্তব্যে পৌঁছোনোর একাগ্রতায় শুধু সামনের দিকেই চেয়ে বসেছিল ও। গাড়ির চলার শব্দে নিজেদের মধ্যের টুকিটাকি কথার মধ্যেই ডুবেছিল। বাইরে যে একটা চন্দ্রালোকিত এবং অত্যন্ত সুখপ্রদ রাত জেগেছিল, সেই রাতের কোনো অস্তিত্বই ছিল না ওর কাছে।

গাড়িটা থেমে যাওয়াতে এবং হেডলাইট নিবিয়ে দেওয়ার পর চাঁদের আলোয় এই জংলি পাহাড়ি পরিবেশের আসল রূপ স্পষ্ট হল।

কতরকম রাত-চরা পাখি চমকে চমকে আবছায়া প্রান্তরে ডেকে ফিরছে। আলতোভাবে ঝিঁঝির আওয়াজ ভেসে আসছে দূর থেকে। আরও কতরকম ফিশফিশানি উঠছে হাওয়ায় হাওয়ায়। শুকনো পাতা গড়িয়ে যাচ্ছে পাথরের বুকে—একটা অপার্থিব সড়সড় শব্দ উঠছে। আরো কতরকম শব্দ ও গন্ধ। মহুয়া অবাক হয়ে বাইরে চেয়ে রইল।

কুমার তার বাবার সহকর্মী। একই সাহেবি কোম্পানিতে কাজ করেন দুজনে। মহুয়া নিজেও একটা সাহেবি কোম্পানির রিসেপশনিস্ট। কলকাতায় তাদের ফ্ল্যাটে কুমার এসেছে, সে-ও গেছে কুমারের ফ্ল্যাটে বাবার সঙ্গে। ও যেখানে যেখানে গেছে সেইসব জায়গায়—এ-পার্টিতে ও-পার্টিতে ক্লাবে গেট টগেদারে কুমারের সঙ্গে দেখা হয়েছে।

কুমারের সঙ্গে আলাপ সান্যাল সাহেব অথবা মহুয়ার কারোরই বেশিদিনের নয়। বলতে গেলে কুমারের পীড়াপীড়িতেই দোলের আগে সান্যাল সাহেবরা দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন—পালামৌর বনজঙ্গল দেখতে।

এ.এ.ই.আই থেকে ইটিনিরারি নেওয়ার কথা বাবা তুলেছিলেন কিন্তু কুমার বলেছিল যে, এসব অঞ্চল তার হাতের রেখার মতো মুখস্থ। কিন্তু কী করে যে ওরা এতখানি পথ সুন্দর মসৃণ পাকা রাস্তায় আসার পর হঠাৎ এমন কাঁচা রাস্তায় এসে পড়ল মহুয়া বুঝতে পারছে না। ওর মন বলছে ওরা নিশ্চয়ই রাস্তা ভুল করেছে। রাস্তা যে ভুল করেছে এ-বিষয়ে মহুয়ার কোনোই সন্দেহ নেই। কারণ কুমার বেশ কিছুক্ষণ হল মোটেই কথাবার্তা বলছে না। অথচ সারা রাস্তা কথার ফুলঝুরি ফোটাতে ফোটাতে আসছে ও।

এই সাহেবি কোম্পানিতে ঢোকার আগে কুমার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে ছিল। সেখানকার অভিজ্ঞতা, মুসৌরি পাহাড়ে তাদের ট্রেনিং সেন্টারে পোলো খেলার কথা, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা রকম গল্প। সত্যি কথা বলতে কি, ওর বকবকানি শুনতে শুনতে মহুয়া এই দশ-বারো ঘণ্টা বেশ বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। হয়তো সান্যাল সাহেবও হয়েছেন। কারণ তিনিও বেশ অনেকক্ষণ হল কোনো কথাই বলছেন না।

মহুয়ার ভেবে আশ্চর্য লাগছে যে, শহরে কারো সঙ্গে বহু বছরের আলাপ থাকলেও তার সম্বন্ধে বা তাকে যতখানি না জানা যায়, তার সঙ্গে বাইরে বোরোলে তাকে আট-দশ ঘণ্টার মধ্যেই অনেক বেশি জানা হয়ে যায়।

সান্যালসাহেব একবার মহুয়ার জানালার কাছে এলেন।

বললেন, কি রে মৌ, ভয় করছে নাকি?

মহুয়ার একটু গা ছমছম করলেও বলল, না বাবা! ভয়ের কি? তারপর বলল, কিন্তু গাড়ি কি ঠিক হল?

সান্যালসাহেব পাইপ ভরতে ভরতে বললেন, চেষ্টা করছে কুমার।

মহুয়া বলল, গাড়ি খারাপ হওয়ার কথা ছেড়ে দাও। কিন্তু আমরা কি ঠিক রাস্তায় এসেছি?

সান্যাল সাহেব চারিদিকের লোকালয়শূন্য রাতের চন্দ্রালোকিত বন-প্রান্তরের দিকে চেয়ে বলললেন, বোধহয় না।

ক-টা বাজছে বাবা?

সাতটা।

মহুয়া আর কথা না বাড়িয়ে গাড়ির দরজা খুলে বাইরে এল। কুমার ওর বাইরে আসার শব্দ এগিয়ে এল। এসেই স্মাগলড বিলিতি সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, সরি! আ অ্যাম, রিয়্যালি সরি।

মহুয়া সোজাসুজি বলল, কী ব্যাপার? আমরা কোথায় এসেছি? বেতলা থেকে কত দূরে? গাড়ি কী করবেন কিছু কি ভেবেছেন?

কুমার বলল, উই হ্যাভ বিন ডিসকাসিং অ্যাবাউট দ্যাট। কিছু একটা করব নিশ্চয়। প্লিজ, ডোন্ট গেট আপসেটে। এভরিথিং উইল বি অল রাইট।

মহুয়া কথা না বলে দূরের পাহাড়ের দিকে চেয়ে রইল। ওর ভয় করতে লাগল খুব। সন্ধের আগে আগে যেখানে ওরা চা খেয়েছিল, ভুলে গেছে জায়গাটার নাম—সেখানে শুনেছিল যে গতরাতে নাকি আঠারোটি রাইফেল নিয়ে গয়া জেলা থেকে ডাকাতরা এসে এই রাস্তাতেই ডাকাতি করে গেছে। অবশ্য এই রাস্তাই সেই রাস্তা কি না একমাত্র কুমারই তা বলতে পারে। এও বলেছিল যে, মেয়েদের নিয়ে রাতে এসব পথে যাওয়া ঠিক নয়।

আসলে এই মুহূর্তে ভয়ের চেয়েও বেশি রাগ হচ্ছে মহুয়ার। কুমারের প্রকৃত স্বরূপ এত তাড়াতাড়ি মহুয়া না বুঝলেই ভালো হত। মানুষটাকে বড়ো কৃত্রিম বলে মনে হয়েছে মহুয়ার এরই মধ্যে। বাঙালিদের সঙ্গেও সব সময় দাঁত টিপে টিপে টেঁশো ইংরেজি বলে কী যে আনন্দ পায়, কী যে এরা প্রমাণিত করতে চায়, তা মহুয়া বোঝে না। এ বোধহয় একরকম হীনম্মন্যতা মনে হয়, সঠিক জানে না মহুয়া।

সান্যালসাহেব মুখে একবারও না বললেও মহুয়ার বুঝতে ভুল হয়নি যে, এইবারে বেড়াতে আসার আসল কারণ মহুয়া আর কুমারকে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ দেওয়া। মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে সান্যাল সাহেব স্বাভাবিক কারণেই উদ্বিগ্ন। বছর পাঁচেকের মধ্যেই রিটায়ার করবেন উনি।

ছেলে হিসেবে কুমার ভালো। পাত্র হিসেবেও ভালো। সত্যি কথা বলতে কি, আজ ভোরে মহুয়া যখন ওদের হিন্দুস্থান রোডের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বসন্তের মিষ্টি হিমেল আমেজ-ভরা সকালে একটা অফ হোয়াইটের মধ্যে কালো কাজ করা ছাপা শাড়ি পরে কুমারের গাড়িতে ওঠে, তখন ওর ভারি ভালো লাগছিল। ও ভেবেছিল যে-কুমারকে ও কিছুদিন হল জেনেছে; সেই সপ্রতিভ, যোগ্য ছেলেটিকে তার আরো অনেক বেশি ভালো লাগবে এবং তার সঙ্গে ঘর করতে চাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে ওর বেশি দেরি হবে না।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে ওর খারাপ লাগতে শুরু করবে ও তা বুঝতে পারেনি।

ডাকাতির ভয়ের কথাটা সান্যালসাহেব এবং কুমারের মনেও এসেছিল। কিন্তু মহুয়া ভয় পাবে বলে তা নিয়ে আর আলোচনা করছেন না ওঁরা।

বনেটটা বন্ধ করে দিতেই ফুটফুটে চাঁদের আলোয় দেখা গেল সামনেই একটা পাহাড়। এবং পথটা সেই পাহাড়ের মধ্যে মিশে গেছে ঘুরে ঘুরে।

কুমার ওইদিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকাতে সান্যালসাহেব বললেন, কী দেখছ?

না। মানে দিস ওয়াজ নট সাপোজড টু বি হিয়ার, কুমার বলল।

হোয়াট ডু ইউ মিন? রাগত গলায় সান্যালসাহেব শুধোলেন কুমারকে। বললেন, ভৌতিক ব্যাপার নাকি? এতক্ষণও পাহাড়টা নিশ্চয়ই ছিল। যখন আলো জ্বলছিল ও টর্চ জ্বালিয়েছিলে তখন কাছটাই নজরে আসছিল। দূরে আমরা কেউ তাকাইনি।

কুমার বলল, তা নয়। পথের এইখানে কোনো পাহাড় থাকার কথাই ছিল না।

সান্যাল সাহেব রাগ চেপে, ধরা গলায় বললেন, রাস্তা ভুল করলে রাস্তায় আনচার্টেড পাহাড় নদী অনেক কিছুই পড়বে। যে-রাস্তায় তোমার আসার কথা, সে-রাস্তা নিশ্চয়ই কোথাও ফেলে এসেছে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে গম্ভীর হয়ে বললেন, গাড়িটাও গেল বন্ধ হয়ে। তোমাকে এতবার করে বললাম রামবিলাসকে নিই, আমার গাড়ি নিয়ে আসি—তা তুমি জেদ ধরলে যে তোমার গাড়িতেই যেতে হবে। গাড়ি নিয়ে না চালালে রাফিং হয় না। এখন করো রাফিং।

মহুয়া ব্যাপারটাকে লঘু করার জন্য মধ্যে পড়ে হেসে বলল, কুমার আপনি তো গাড়ির সবকিছু বোঝেন বলেছিলেন, বলুন তো দেখি কী হয়েছে?

কুমার ঠোঁট থেকে সিগারেটটা নামিয়ে বলল, বুঝতে পারছি না। এখন হোয়াট টু ডু?

কুমার কিন্তু তখনও সপ্রতিভ। পুরো ব্যাপারটা যে তার জন্যই ঘটেছে সে-কথা সে তখন স্বীকার করলেও, পুরোপুরি মেনে নিতে রাজি নয়।

সে বলল, আসুন গাড়িতে বসে ভাবা যাক কী করা যায়!

সান্যালসাহেব দরজা খুলে সামনের সিটে বসলেন। তাঁকে ভীষণ চিন্তিত দেখাচ্ছিল। পায়ের কাছে রাখা ছোট্ট ব্যাগ থেকে হুইস্কির বোতল বের করে ওয়াটার বটল থেকে গ্লাসে জল ঢেলে মেশালেন। তারপর চুমুক দিলেন।

কুমারকে বললেন, খাবে নাকি?

কুমার নিস্পৃহ গলায় বলল, আ-স্মল ওয়ান।

বলেই আবার বলল, কাছাকাছি নিশ্চয়ই গ্রাম-টাম থাকবে। আপনারা বসুন। আমি একটু এগিয়ে গিয়ে দেখে আসি।

সান্যালসাহেব বললেন, তা কি হয়? এই জংলি জায়গায়, অচেনা অজানা পরিবেশ—একা যাবে কেন?

কুমার বলল, এইরকম জায়গা বলেই বলছি। মহুয়াকে সঙ্গে নিয়ে পায়ে হেঁটে এমন জায়গায় কি ঘুরে বেড়ানো সেফ? তারপর ডাকাতির কথা তো শুনলেন।

সান্যাল সাহেবের গলার স্বরে কেমন এক শুষ্ক বিরক্তি ও রাগ ঝরে পড়ল। বললেন, কী করা উচিত তুমিই বলো—কী করাটা সেফ?

ইতিমধ্যে পেছন থেকে একটি আগন্তুক জিপের শব্দ শোনা গেল। অসমান প্রস্তরাকীর্ণ লাল ধূলি-ধূসরিত পথে জিপের উঁচু হেডলাইটের আলোটা লাফাতে লাফাতে এগিয়ে আসছিল।

হঠাৎ কুমার বলল, মহুয়া, তুমি মাথা নিচু করে বসে পড়ো। তোমাকে যেন দেখা না যায়।

মহুয়া বলল, আপনারা থাকতে আমার ভয় কি?

কুমারের গলায় ভয়। বলল, যা বলছি করো। তর্ক করো না। লিসন টু মি।

মহুয়া ভয় এবং বিরক্তিসূচক একটা সংক্ষিপ্ত চ-কারান্ত শব্দ করে সিটের নীচে আধশোয়া ভঙ্গিতে বসে পড়ল।

সান্যালসাহেব পাইপ কড়কড় করে বললেন, বন্দুকটা আনার কথা বললাম; তাও আনতে দিলে না তুমি। তুমি...রিয়্যালি....।

জিপটা যত কাছে আসছিল ততই যেন গতি কমে আসছিল—এবং মহুয়ার গলায় কাছে কী একটা অননুভূত অনুভূতি দলা পাকিয়ে উঠেছিল। ওর প্যারিসে-থাকা মায়ের কথা মনে পড়ল ওর—আরো অনেক কথা। হঠাৎ।

কুমার তাড়াতাড়ি জানালার কাচটা তুলে দিল। একটা সিগারেট ধরাতে গেল। কিন্তু পারল না। ওর কাঁপা হাতে দেশলাইটা জ্বালাতে পারল না। একবার যদিও বা জ্বালাল পরক্ষণেই জ্বলন্ত কাঠিটা গাড়ির মধ্যেই হাত থেকে পড়ে গেল।

মহুয়া ফিশফিশ করে বলল কী করছেন! আগুন লাগাবেন নাকি?

সান্যালসাহেব কুমারের দিকে এবার ঘৃণার চোখে তাকালেন। তারপর হঠাৎ বাঁ দিকের দরজা খুলে নেমে পড়ে রাস্তার পাশে এসে সাহসের সঙ্গে গাড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

চলন্ত জিপের মধ্যে হিন্দিতে অনেক লোক কথা বলছিল। কারা যেন হাসছিল। এমন সহজ শিকার পেয়েছে দেখে বুঝি ওদের আনন্দের সীমা ছিল না।

সান্যাল সাহেব হাত তুললেন।

জিপের ইঞ্জিনটা ওদের গাড়ির ঠিক পিছনে এসেই যেন বন্ধ হয়ে গেল। প্রথমে মনে হল বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই মহুয়া বুঝল বন্ধ হয়নি—গাড়িটা থেমে গেছে। কিন্তু ইঞ্জিনের ধকধক শব্দ শোনা যাচ্ছে।

দু পাশ থেকে একসঙ্গে চার-পাঁচজন লোকের লাফিয়ে নামার শব্দ শুনল মহুয়া। কুমারের সাড়াশব্দ পেল না। মনে হল ভয়ে ও গাড়ির মধ্যে জমে গেছে। মরেই গেল বুঝি-বা।

বাবার গলা শুনতে পেল মহুয়া। বাবা পাইপটা ধরিয়ে শুধু হাতে, বিপদের মুখে, শুধুমাত্র গলার স্বরে যতখানি ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করা যায় তা করে বললেন, হিঁয়া কোই মেকানিক মিলেগা? গাড়ি জারা খারাপ হো গ্যায়া।

ডাকাতদের মধ্যে একজন অডাকাতসুলভ অত্যন্ত ভদ্র গলায় বাংলায় বলল, আপনারা বাঙালি—কলকাতার নম্বর দেখেই বুঝেছিলাম। কী, হয়েছে কী?

গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে। এখানে মিস্ত্রি-টিস্ত্রি পাওয়া যাবে?

ওঁদের মধ্যে থেকে একজন বললেন, এই পাহাড়টা পেরিয়েই ওপাশে ফুলটুলিয়া গ্রাম। সুখন মিস্ত্রির একটা কারখানা মতো আছে।

ওঁদেরই মধ্যে আরেকজন বললেন, সুখন মিস্ত্রি কে রে?

প্রথম ভদ্রলোক বললেন, আরে দুখন মিস্ত্রির ভাই। দুখন মারা গেছে তা মাসখানেক হল। ওর ভাই সুখন এসে কারখানার জিম্মা নিয়েছে।

সান্যালসাহেব বললেন, আমাদের মধ্যে কেউ কি একটু যেতে পারি আপনাদের সঙ্গে কারখানা অবধি?

ওঁরা সমস্বরে বললেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

ইতিমধ্যে মহুয়া সিটের তলা থেকে শরীর বের করে সিটের উপরে বসেছে আস্তে আস্তে। যারা ডাকাত নয়, তাদের কাছে অমন লুকিয়ে থাকা অবস্থায় ধরা পড়তে চায়নি ও।

মহুয়া ভেতর থেকে ডাকল, বাবা!

নারীকণ্ঠ শুনে জিপের আরোহীরা অবাক গলায় বললেন, সঙ্গে মেয়েছেলে আছে নাকি? তাহলে তো মুশকিল করলেন। তাহলে আপনারা সকলেই থাকুন এখানে—আমরা গিয়েই সুখনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আরেকটা কাজ করা যায়। আমরা টো করে নিয়ে যেতে পারি আপনাদের গাড়ি। কিন্তু আমাদের কাছে দড়ি নেই। আপনাদের কি আছে?

কুমার এতক্ষণে নেমেছে গাড়ি থেকে। নেমে বলল, নেই।

সান্যালসাহেব বললেন, কী আছে তোমার সঙ্গে? কিছুই না নিয়ে এত লম্বা পথে বেরিয়েছ?

মহুয়া মনে মনে বলল, গলায় দড়ি দেওয়ার জন্যও তো কিছুটা আনা উচিত ছিল।

কী করা হবে এই নিয়ে সান্যালসাহেব ও কুমার ভদ্রলোকদের সঙ্গে কথা বলছেন। এমন সময় পাহাড়ের উপরের রাস্তা থেকে একটা আশ্চর্য উদ্ভট আওয়াজ কানে এল। চোখে পড়ল একটা স্তিমিত এবং কম্পমান ঘূর্ণায়মান আলো।

ওঁরা সকলেই ওদিকে তাকালেন।

হঠাৎ একজন চেঁচিয়ে বললেন, অন্যজনকে, আরে এ তো সুখনের গাড়ি।

তারপর সান্যালসাহেবের দিকে ঘুরে আশ্বস্ত করার জন্য বললেন, পর্বতই চলে আসছে মহম্মদের কাছে। বলেই কুমারের দিকে ঘুরে বললেন, যান মশাই, আর ভয় নেই। সুখনকে ভগবান পাঠিয়ে দিয়েছে ঠিক সময়মতো।

যে যন্ত্রটা পাহাড় বেয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে, সেটাকে গাড়ি বলে ভুল করার কোনো কারণ নেই। একটা নড়বড়ে ধাতব ব্যাপার টুং-টাং-ঠিন-ঠিন-টকা-টক-ঝকা-ঝং আওয়াজ করতে করতে লাফাতে-থাকা ঘুরন্ত মিটমিটে একটা মাত্র হেডলাইট নিয়ে পাহাড় বেয়ে অন্য কোনো গ্রহের এক কিম্ভূতকিমাকার অদৃশ্যপূর্ব জন্তু যেন হামাগুড়ি দিয়ে নামছে পাহাড় থেকে।

সকলেই সেদিকে নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন। এমনকি জিপের আরোহীরাও। এঁরা বোধহয় সুখন মিস্ত্রির এই গাড়িটাকে দিনমানে দণ্ডায়মান অবস্থাতেই দেখে থাকবেন এতদিন।

রাতের অন্ধকারে তার চলন্ত রূপটি দেখে তারা সকলেই বিস্ময়বিমূঢ় এবং চলচ্ছক্তিহীন হয়ে গেছেন।

গাড়িটা যতই এগিয়ে আসতে লাগল ততই তার আওয়াজ বাড়তে লাগল। এতক্ষণ অর্কেস্ট্রার দূরাগত ঐকতান শোনা যাচ্ছিল। এখন কাছে আসায় বিভিন্ন যন্ত্রবিশেষের বিভিন্ন আওয়াজ আলাদা আলাদা হয়ে কানে লাগছে।

পথের মধ্যে দু-দুটো গাড়ি ও এত লোকজন দেখে বোধহয় সুখন মিস্ত্রি হর্ন বাজাল।

সেই চন্দ্রালোকিত হলুদ বাসন্তী রাতে তাবৎ জীবন্ত পশুপাখি, কীটপতঙ্গ মায় সমবেত জনমণ্ডলীর হৃৎপিণ্ড চমকিয়ে দিয়ে সেই যন্ত্রযান একটি প্রাগৈতিহাসিক মোরগের মতো ডেকে উঠল—কঁরর—র-র-র। আবার ডাকল, ক-'ক' র র-র-র।

এরা সকলেই হই চই করে উঠল। প্রায় চিৎকার করেই থামাল যন্ত্রটাকে।

ইঞ্জিনের সঙ্গে এক-চোখা আলোটাও মাথা দোলাতে দোলাতে এসে ওদের সামনে থেমে গেল। ঘটাং শব্দ করে ব্রেক কষে দাঁড় করাল ড্রাইভার গাড়িটাকে।

সুখন, এ সুখন বলে জিপের আরোহীদের মধ্যে কে যেন ডাকল।

সিটের উপরে একটা তাকিয়া রেখে তার উপর বসে গাড়ি চালাচ্ছিল কালো হাফপ্যান্ট ও লাল-গেঞ্জি পরা একটি বছর বারো-তেরোর বেঁটে-খাটো কালো-কোলো ছেলে। সে গুড়গুড়িয়ে নেমে এসে বলল, হুয়া কা?

জানা গেল ও সুখন নয়, সুখনের খিদমদগার। গাড়ি নিয়ে সুখনের জন্য গুঞ্জা বস্তিতে যাচ্ছিল মহুয়ার মদ আনতে। সুখন কারখানা সংলগ্ন তার বাড়িতেই আছে।

মহুয়ার মদের কথা শুনে সান্যালসাহেব চিন্তিত হলেন ও কুমার আঁতকে উঠল।

জিপের আরোহীদের দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকালেন ওঁরা দু'জনেই। বোধহয় সুখন মিস্ত্রির চরিত্র সম্বন্ধে নীরব প্রশ্ন করলেন।

তাঁদের মধ্যে যিনি নেতা-গোছের, তিনি বললেন, আরে নে—হী। মহুয়া তো হিঁয়া সব কোই-ই পিতা। সুখন বড়া আচ্ছা আদমি। আপলোগ বেফিক্কর রহিয়ে। অ্যায়সা কুছ দুগগি-তিগগি আদমি নহি হ্যায়। উও বড়েখানদানকে পড়ে-লিখে আদমি—আভি পেটকা লিয়ে গাড়ি মেরামতিকা কামমে লাগা হুয়া হ্যায়।

তারপর বললেন, কইভি ডর নেহি। আপলোগ ইতিমিনান-সে যানে সকতা।

দুই

কখন ওরা সুখন মিস্ত্রির কারখানায় পৌঁছেছিল—কখনই-বা কারখানার লাগোয়া সুখনের বাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েছিল খিচুড়ি খাওয়ার পর, আর কখনই-বা রাত পেরিয়েছিল মনে নেই মহুয়ার।

এদিকে কাছাকাছি কোনো ডাকবাংলো-টাকবাংলো নেই। একটা ছিল; সেটা নাকি দশ মাইল দূরে। এতখানি আসার পর আর কোথাও যাবার মতো অবস্থা ছিল না কারোরই। তাই বাবা এবং কুমার ডিসাইড করেছিলেন যে এখানেই রাত কাটাবেন।

টালির ছাদ উপরে। সিলিং-টিলিং নেই। টালির ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে আলো চুঁইয়ে এসে ঘরে পড়েছে।

দেওয়ালের দিকের চৌপাইয়ে মহুয়া শুয়েছিল। মধ্যের চৌপাইতে বাবা, ওপাশে কুমার। শেষ রাতে বেশ শীত-শীত করছিল। চাদর মুড়ে শুয়ে মহুয়া আলস্যে পড়ে থাকল অনেকক্ষণ। আড়মোড়া ভাঙল।

কুমারের শোয়াটা বিচ্ছিরি। তাছাড়া অমন ছিপছিপে চেহারার লোক যে অমন নাক ডাকাতে পারে এ-কথা মহুয়ার জানা ছিল না। কুমারের দিকে তাকিয়ে এক বিষণ্ণ হতাশায় ওর মন ভরে এল।

মহুয়া উঠল। শাড়িটা ঠিক করল। তারপর দরজা খুলে বারান্দায় এল। বারান্দায় আসতে দেখল, কাল রাতের সেই যন্ত্রযানচালক-কাম-তাড়াতাড়ি খিচুড়ি রেঁধে-দেওয়া মংলু যেন তারই অপেক্ষায় বসে আছে।

মংলু বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসেছিল। মহুয়াকে দেখেই বলল, চা করব দিদিমণি?

মহুয়া বলল, করো, কিন্তু এক কাপ। ওঁরা এখনও ওঠেননি।

তারপর বলল, তোমার বাবু কোথায়?

মংলু বলল, কে? ওস্তাদ? ওস্তাদ তো কারখানায়। গাড়ি নিয়ে পড়েছেন। আপনাদেরই গাড়ি।

বাথরুম থেকে ঘুরে এসে বারান্দার মোড়ায় বসে চা খেল মহুয়া।

শেষ রাত থেকেই কী একটা চাপা অনামা খুশিতে ওর মন ভরে রয়েছে। ভেতরে একটা ছটফটে কষ্ট। কষ্ট মানে আনন্দ।

বাবা এবং কুমার যে এখানে রাত কাটাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেজন্য ওঁদের দুজনের কাছেই মহুয়া খুব কৃতজ্ঞ।

বারান্দা ঘেঁষে থামের গায়ে পর-পর নানারঙা বোগেনভোলিয়া লতা। মেরি পামার ও আরো অনেকরকম ফুলে-ফুলে ছেয়ে আছে। তার মধ্যে একটা নিমগাছ। কোনায় একটা কুয়ো—লাটাখাম্বা লাগানো আছে। এপাশে-ওপাশে ছড়ানো-ছিটোনো মবিলের টিন, টায়ার-টিউব, নানারকম গাড়ির মরচে পড়া রিম। একটা ম্যাটমেটে লালরঙা পুরোনো ভাঙাচোরা চাকাহীন গাড়ি মাটিতে বুক দিয়ে বসে আছে।

বারান্দায় বসে সে উদ্দেশ্যহীনভাবে তাকিয়ে এই সকালে একা-একা চা খেতে ভারি ভালো লাগছিল মহুয়ার। অনতিদূরে শালবন থেকে কোকিল ডাকছে শিহরন তুলে। অন্য দিক থেকে সাড়া দিচ্ছে অন্য কোকিল। তখন হিম-হিম ভাব। পলাশে শিমূলে দূরের লাল এবড়োখেবড়ো প্রান্তর ভরে আছে। এই ভোরের সমস্ত সত্তা ভরে রয়েছে কি যেন কি ফুলের উগ্র গন্ধে। চতুর্দিক ম্' ম্' করছে।

নাক দিয়ে জোরে হাওয়া টানল মহুয়া।

মংলুকে শুধোল, কিসের গন্ধ এ? কোন ফুলের?

মংলু অবাক চোখে তাকাল মহুয়ার দিকে।

মহুয়া বুঝতে পারছিল মংলুর মুখ-চোখ দেখে যে, জীবনে মহুয়ার মতো কখনো কারো খিদমতগারি করতে পারার এত সৌভাগ্য যে আসবে, তা বোধহয় ও কখনও ভাবেনি। তাই মহুয়াকে কোথায় বসাবে, কী খাওয়াবে ভেবেই পাচ্ছে না মংলু।

মহুয়ার প্রশ্নে অবাক চোখে তাকাল ও। এই অপার অজ্ঞানতায় আশ্চর্য হয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর বলল, এ তো মহুয়ার গন্ধ!

মহুয়ার লজ্জা পাওয়ার কথা ছিল না। তবুও ও লজ্জা পেল; ওর ভালোও লাগল। ওর নামের ফুলে-ফলে যে এমন-মাতাল-করা গন্ধ তা বুঝি ও নিজে এখানে না এলে জানতে পেত না। নিজেকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করল।

বারান্দার ওপাশে আর একটা ঘর। দরজা খোলা রয়েছে হাঁ করে।

মহুয়া শুধোল, এটা কার ঘর?

ওস্তাদের। মংলু বলল।

তুমিই ওস্তাদের রান্না করে দাও?

মংলু হাসল।

বলল, ওস্তাদ কিছুই খেতে চায় না। রাঁধব আর কী? কার জন্য? সারাদিন কাজ করে, তারপর সন্ধের পর যা-হয় দুজনে কিছু ফুটিয়ে নিই।

মহুয়া শুধোল, কেন? দুপুরে কিছু খাও না তোমরা?

আমি খাই। পাঁড়েজির দোকানে গিয়ে পুরি, আলুর তরকারি এসব খেয়ে আসি। রান্না করি না কিছু। একার জন্য কে ঝামেলা করে? ওস্তাদ তো কিছুই খায় না। চা আর পান আর একশো বিশ জরদা—ব্যস। সারাদিনে ওই।

কাল রাতেই বিহারী নামের এই বাঙালি লোকটাকে দেখা অবধি মহুয়ার যেন কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে ভেতরে। এমন প্রচণ্ড গোলমাল ওর অন্তর্জগতে এবং হয়তো শরীর-জগতেও আগে কখনও ও অনুভব করেনি। লম্বা, রোদে-পোড়া সবল চেহারা। জুলপির চুলে একটু পাক ধরেছে। শক্ত চোয়াল। কথা কম বলে—চোখ দুটোতে এক স্তব্ধ ঔজ্জ্বল্য—কিন্তু সব মিলিয়ে এই সুখন মিস্ত্রিকে প্রথম দেখার পরই এমন কিছু ঘটে গেছে মহুয়ার ভেতরে যে, তাদের গাড়ির মতো তার মনেরও বুঝি মেরামতির বড়ো দরকার হয়ে পড়েছে এখুনি।

এ-কথা ও কাউকে বলতে পারেনি। পারবেও না। মহুয়া এই মিস্ত্রিকে স্বপ্নও দেখেছে রাত্রে। এক ঝলক দেখেছে। ঘুমের মধ্যে এক দারুণ ভালোলাগায় ও ভরে গেছে। কেন ও জানে না। আজ এই স্পষ্ট ভোরেও অস্পষ্টতায় ভরা রাতে-দেখা এবং স্বপ্নে-দেখা সুখন মিস্ত্রি তার সমস্ত সত্তায় একটা অদ্ভুত সুখময় আভাস রেখে গেছে। আভাসটা কোন সত্যের, মহুয়া এখনও বুঝে উঠতে পারছে না।

শেষে কিনা পালামৌর একটা অখ্যাত গ্রামের এক মোটরমিস্ত্রি কিন্তু তাই কি?

নাঃ। নিজেই নিজেকে বকল মহুয়া। বলল—ওর রুচি বড়ো খারাপ হয়ে গেছে। বলল, নিজেকে সংযত করো। এ-সব ভালো নয়।

মংলু বলল, দিদিমণি, আর একটু চা খাবেন?

মহুয়া বলল, করো।

বলতেই মংলু ঘর ছেড়ে রান্নাঘরে গেল। যেতে যেতে বলল, নাস্তার বন্দোবস্ত করে রেখেছি. ওস্তাদ সূর্য ওঠার আগেই নিজে গুঞ্জা বস্তিতে গিয়ে আপনাদের জন্য আনাজ, ডিম, মুরগি সব নিয়ে এসেছে। এখানে তো মাছ পাওয়া যায় না। যখনি বলবেন পরোটা, আলুভাজা, ডিমের তরকারি বানিয়ে দেব। ওস্তাদ বলেছেন, আপনাদের কোনোরকম কষ্ট হলে আমার চাকরি যাবে। দুপুরে মুরগির ভোলো, বাইগনকা ভাত্তা, পুদিনার চাটনি, কাঁচা আম আর লংকা বাটা; আর সবশেষে গুঞ্জার প্যাঁড়া। আপনি শুধু বলবেন, কখন কী খাবেন!

মহুয়া বলল, কেন? গাড়ি সারাতে কি খুব দেরি হবে? গাড়ির কী হয়েছে আগে সেটাই জানা যাক।

বিকেলের আগে নিশ্চয়ই হবে না। চিন্তা করবেন না দিদিমণি। ওস্তাদ সময়মতো ঠিকই জানাবে।—মংলু বলল।

মহুয়া একবার ঘরের মধ্যে তাকাল। দেখল বাবা ও কুমার এখনও ঘুমিয়ে কাদা। রাতে হুইস্কিটা বেশি খেয়েছেন দু জনেই। তার উপর বিপদ থেকে ত্রাণের আরাম বোধহয় ঘুমের ওষুধের কাজ করেছে ওদের স্নায়ুতে।

চা-টা খেয়ে মহুয়া একবার ঘরে গেল। ঘরের দেওয়ালে একটা আয়না ছিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে একটু দেখে নিল। চুলটা ঠিক করে নিল। বাথরুমে গিয়ে কালকের সারাদিনে পরা শাড়িটা ছেড়ে একটা কালো আর লাল ডুরে পাছাপেড়ে শান্তিপুরী শাড়ি পরল। একটু আলতো করে কাজল লাগাল চোখে। মহুয়া জানে যে, মহুয়ার চোখ দুটো ভারি সুন্দর। ও-যে সুন্দর, ওকে

দেখে যে অনেক পুরুষ আত্মহারা হয়, এ-জানাটা ও ফ্রক-পরা বয়স থেকেই জেনেছে। কিন্তু কাল, রাতের লণ্ঠনের আলোয় হঠাৎ যে-লোকটিকে দেখেছিল—সেই লোকটির মতো কাউকে নিজে এর আগে ও দেখেনি। ও-যে নিজেও কাউকে দেখে আত্মহারা হতে পারে—লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট বলে একটা সুতীব্র বেদনাময় অনুভূতি যে তার জীবনেও সত্যি হবে এই এতদিন পরে, ও কখনই তা ভাবেনি। ওর ভেতরে যে একটা ভীষণ দামি আসল-আমি ছিল, সেই আমিটাকে—সেই মুখটি, সেই ব্যক্তিত্বটি বড়ো চমক তুলে ডাক দিয়েছে। ওর হৃদয়ের গভীরে কেউই আর এমন করে পথ কাটেনি আগে।

অথচ আশ্চর্য! কেমন করে কী হয়ে গেল, হয়ে গেছে. ও জানে না। ওর শরীরের জোর পাচ্ছে না। এই বাসন্তী সকালের কোকিলের ডাকে, মহুয়া আর শালফুলের গন্ধে, এই অলস হাওয়ায়, অনতিদূরের জঙ্গলের মধ্যে চরে বেড়ানো মোষের গলার কাঠের ঘণ্টার গম্ভীর ডুং, ডুং শব্দে ও নিজেকে সম্পূর্ণ খুইয়ে ফেলেছে। ওর সব গর্ব, সব অহংকার, সব কিছুই বুঝি এই ফুলটুলিয়ার ধুলোয় ফেলা গেল।

মহুয়া বাইরে গেল। তারপর ওরা ওঠার পর ওদের চা দেওয়ার জন মংলুকে বলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে কারখানার দিকে পা বাড়াল।

পাশেই কারখানা। মধ্যে সরু সরু বাঁশ পুঁতে একটা বেড়ার মতো দেওয়া। বেড়ার উপর ওদেরই গাড়ির কার্পেট পাপোশ, সব রোদে দেওয়া হয়েছে।

কারখানায় ঢুকে মহুয়া দেখল, ওদের গাড়ির বনেটটা তোলা। ভদ্রলোক মাথা নামিয়ে কী যেন ঠুকঠাক করছেন। কাল রাতে-পরা খয়েরি-রঙা জীনসের প্যান্ট—পায়ে টায়ার-সোলের চটি। ঝুঁকে-পড়া সবল সুগঠিত পা ও পেছনের আভাস, সুন্দর বলিষ্ঠ হাতের কনুই অবধি দেখা যাচ্ছে। মুখ নামিয়ে ইঞ্জিনের গভীরে কী যেন দেখছেন, যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করছেন। আর পায়ের কাছে মাটিতে ল্যাজ গুটিয়ে বসে আছে একটা কালো নেড়ি কুকুর। এই পরিবেশে কুকুরটি অদ্ভুত মানিয়ে গেছে।

লক্ষ্য করে দেখল মহুয়া যে কুকুরটার পিছনের একটা পা ভাঙা।

মহুয়া কথা না বলে একটা খালি মবিলের ড্রামে হেলান দিয়ে মানুষটিকে দেখতে লাগল নিমগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে। নামটা বাজে—সুখন।

ওর অস্তিত্ব টের পায়নি সুখন?

এত সকালে কারখানায় অবশ্য কেউ আসেনি। নিমগাছে কাক ডাকছে, দূরের বনে কোকিল। ঝিরঝিরে হাওয়ায় কারখানার তেল-মবিলের গন্ধ ছাপিয়ে শালফুলের. মহুয়া ফুলের আরো কত কিছুর বনজ গন্ধ ভাসছে।

কুকুরটা একদৃষ্টে দেখছিল মহুয়াকে। ঈর্ষাকাতর চোখে চেয়েছিল। কুকুরটা বোধহয় মেয়ে। মহুয়ার প্রতি মনোভাবটা ঠিক কী রকম হওয়া উচিত তা ঠিক করে উঠতে পারছিল না বুঝি।

কিছুক্ষণ পরে কুকুরটা হঠাৎ ভু-উক ভুক—ভুক-ভুঃ করে ডেকে তিন-পায়ে নড়বড়ে তে-পায়ার মতো দাঁড়িয়ে উঠল। উঠেই ছুঁচোলো মুখে কানখাড়া করে মহুয়ার দিকে চেয়ে ক্রমান্বয়ে ডাকতে লাগল।

সুখন মুখ না তুলেই বলল, 'আঃ কালুয়া, চুপ কর।'

তাতেও যখন কালুয়া চুপ করল না তখন সুখন মুখ তুলল। মুখ তুলেই মহুয়াকে দেখে অবাক হল। একটা অপ্রতিরোধ্য ভালোলাগা এসে তার মুখের রং বদলে দিল। পরক্ষণেই সামলে নিল সুখন নিজেকে। সুখন মিস্ত্রি—নিজের কারখানার পটভূমিতে ফিরিয়ে আনল নিজেকে। নিজেকে মনে মনে চাবকাল।

কালিমাখা দু হাত তুলে নমস্কার করল। বলল, নমস্কার।

সুখনের বাঁ গালে অনেকখানি কালি লেগেছিল। ওর চওড়া চোয়াল, ছোটো ছোটো করে ছাঁটা খেলোয়াড়দের মতো চুল, উদ্ধত চিবুক, বুক খোলা গেঞ্জির মধ্যে দিয়ে দেখা-যাওয়া চওড়া বুকের একরাশ কোঁকড়া চুল—এ সব মহুয়া এক নিমেষে দেখে নিল। দেখে ভালো লাগল। শুধু ভালোই নয়, কেমন যেন গা শিরশির করে উঠল ওর। সে অনুভূতিটা যে কেমন, তা শুধু মেয়েরাই জানে, বোঝা সম্ভব নয়।

অনেকক্ষণ পরে যেন ঘোর কাটার পর মহুয়া বলল, নমস্কার। তারপর একটু দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বলল, আমার নাম মহুয়া।

সুখন অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। কী বলবে ভেবে পেল না। সুখন জীবনে এই প্রথমবার অপ্রতিভ বোধ করল। ও যে এমন ক্যাবলা হয়ে যেতে পারে তা কখনও জানেনি আগে; বিশ্বাস করেনি।

সুখন নিচু গলায় প্রায় স্বগতোক্তির মতোই বলল, এখন তো বসন্তের দিন। এই-ই তো সময় মহুয়ার। গন্ধ পাচ্ছেন না বাতাসে?

আপনি?

মহুয়া জবাব না দিয়ে উলটে প্রশ্ন করে দু চোখ তুলে পূর্ণদৃষ্টিতে সুখনের দিকে তাকাল।

সুখন বলল, পাচ্ছি। সবসময়ই পাই। মহুয়ার আমি ভীষণ ভক্ত—মহুয়া ফুলের।

আর মহুয়ার মদের না?—বলেই মহুয়া হেসে উঠল।

সুখনও হাসল।

সুখনের হাসি মেলানোর আগেই মহুয়া বলল, আমি কিন্তু মদও নই, ফুলও নই। শুধুই মহুয়া।

সুখন পাশ ফিরে একটা রেঞ্চ হাতে নিয়ে বলল, মদ খাই না তা নয়; আমরা মিস্ত্রি-মজুর লোক। তবে মদের চেয়ে ফুলই ভালো লাগে আমার।

পরক্ষণেই রক্ষীহীন একজন অপরিচিতা সুন্দরী ভদ্রমহিলার সঙ্গে মোটর মেকানিকের এতখানি অন্তরঙ্গতা ঠিক হচ্ছে কিনা ভেবে নিয়েই সুখন গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, আপনি রাগ করলেন তো? আমি কোথায় কী কথা বলতে হয় ঠিক জানি না। দোষ করে থাকলে মাফ করে দেবেন।

মহুয়া কথার জবাব না দিয়ে বারান্দায় একটা কাঠের বাক্সে অনেকগুলো গোল গোল চকচকে বল-বিয়ারিং পড়েছিল সেদিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আমি একটা নিতে পারি?'

নিন না। কিন্তু কী করবেন? অবাক হয়ে শুধোল সুখন।

কিছু না। এমনিই স্টিলের তৈরি না? দেখতে একেবারে মার্বেলের মতো। আচ্ছা আমি কি দুটো নিতে পারি?

নিন না, আপনার যতগুলো ইচ্ছে নিন। বলেই হেসে ফেলল সুখন।

মহুয়া দুটো গোলাকৃতি বল তুলতে তুলতে বলল, আপনি খুব দিলদরাজের লোক তো।

কথার জবাব দিল না সুখন।

সুখন মনে মনে একটু ভয় পেতে আরম্ভ করেছে।

কুমার ভদ্রলোককে ওর মোটেই ভালো লাগেনি। টিপিক্যাল শহুরে চালিয়াত। ক্লাস-কনশাস। এ-লোকগুলোই দেশের জন্য ভালো লোকগুলোরও সর্বনাশ করে দিল। কুমার কতখানি উদার সে সম্বন্ধে সুখনের সন্দেহ ছিল। মহুয়াকে সুখনের সঙ্গে একা দেখে যদি সুখনকে কিছু বলে সে আকারে-ইঙ্গিতেও, তাহলে সুখন কিন্তু ঘুষি-টুষি মেরে দেবে। যেদিন ভদ্রলোক ছিল, ছিল। আজ আর সে ভদ্রলোক নেই। ভদ্রলোকদের কারো কাছেই সে ভদ্রলোকি পায় না; হয়তো আজ চায়ও না। তাই ছোটলোকি কায়দায় কথায় কথায় ঘুষি চালাতেও ওর আজকাল একটুও দেরি হয় না। সহ্যশক্তি, পরিমাণজ্ঞান, সভ্যতা-জ্ঞান ওর আর নেই বললেই চলে। ও নিজেকে আর ভদ্রলোক ভাবে না। ভদ্রলোক হবার ইচ্ছাও আর ওর নেই।

সুখন এড়িয়ে গিয়ে বলল, আমি হলাম একজন সামান্য মিস্ত্রি। দরাজদিল থাকলেও বা তা দেখাবার সামর্থ্য কোথায়?

তারপর কথা ঘোরাবার জন্য বলল, আপনি চা-টা খেয়েছেন?

খেয়েছি।—মহুয়া বলল।

তারপর বলল, আপনি চা খাবেন না? সকালে কি চা খেয়েছেন? আমি নিয়ে আসব? শুনলাম, চা আর জরদা পানই নাকি আপনার প্রধান খাদ্য-পানীয়?

সুখন অবাক হল; বলল, কে বলল? মংলু বুঝি?

বললেন না তো চা খাবেন কিনা? মহুয়া বলল।

না, না থাক আপনি মাথা ঘামাবেন না। একটু পরে মংলুই নিয়ে আসবে। ও জানে। একবার তো খেয়েছি।

আহা, আজ না হয় আমিই আনলাম? আমাদের গাড়ি সারাচ্ছেন এত কষ্ট করে গালে কালি লাগিয়ে—আমি...

ওকে থামিয়ে দিয়ে সুখন বলল, কষ্ট কি? এ তো আমার কাজ। এই তো রুজি। কাজ হয়ে গেলে টাকা দেবেন না বুঝি? টাকাও দেবেন—আবার এত ভালো ব্যবহারও করবেন, এটা ঠিক নিয়ম হচ্ছে না।

মহুয়া বলল, ওসব কথা আমার সঙ্গে নয়। এটা কুমারবাবুর গাড়ি। এ ব্যাপারটা তাঁর। আমি জাস্ট প্যাসেঞ্জার।

একটু থেমে মহুয়া আবার বলল, কি? খাবেন কিনা বলুন? নাকি আমার হাতে খাবেন না? আমি কিন্তু ব্রাহ্মণের মেয়ে। বাবার পদবি যখন সান্যাল। বোঝা উচিত ছিল।

সর্বনাশ করেছে। আপনারা বারেন্দ্র নাকি? আমার তো খেয়ালই হয়নি। বলেই হেসে ফেলল সুখন।

মহুয়াও হেসে উঠল হোঃ হোঃ করে। বলল, আমাদের এত গুণ যে পুরো বাংলাদেশের লোক আমাদের এঁটে উঠতে পারল না বলেই মেনেও নিতে পারল না—তাই-ই তো সকলে পিছনে লাগে।

শুধু গুণ কেন? রূপও আছে!—সুখন বলল।

কথাটা বলেই সুখন মুখ নামিয়ে নিল। নিজেই লজ্জা পেল বলে ফেলে।

মহুয়াও উচ্ছলতার মধ্যে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর চটির মধ্যে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল ঘষতে ঘষতে বলল, আহা! কী রূপ!

নিমগাছের মগডালে হঠাৎই কাকেদের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল! ওরা উড়ে-উড়ে ঘুরে-ঘুরে, কা-খবা-খবা-কা করে ভোরের সমস্ত শান্তি, নির্লিপ্তি, সমস্ত আমেজটুকু নষ্ট করে দিল।

মহুয়া আর সুখন দু জনেই একই সঙ্গে নিমগাছের দিকে তাকাল। দেখল একটা ছিপছিপে মেয়ে-কাককে নিয়ে দুটো কর্কশ পুরুষ কাকের মধ্যে ভীষণ লড়াই বেধেছে। আর সমবেত কাকমণ্ডলী দু দলে ভাগ হয়ে গিয়ে দুই লড়িয়েকে চিৎকার করে মদত দিচ্ছে।

সুখন একটা পাথর তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল উপরে। মুহূর্তের মধ্যে সব কাক নিমগাছ ছেড়ে উড়ে চলে গেল। কিন্তু রয়ে গেল শুধু সেই মেয়ে কাকটা। ও নড়ল না। ডালে বসে মসৃণ ছাই-ছাই গ্রীবা বেঁকিয়ে লাল পুঁতির মতো চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একবার এ-কোটরে আরেকবার ও-কোটরে এসে কত কী ভাবতে লাগল।

কিছুক্ষণ উপরে তাকিয়ে থেকে সুখন স্বগতোক্তির মতো বলল, এবার আপনি বাড়ি যান। মিস্ত্রি-টিস্ত্রিরা এক্ষুনি এসে পড়বে। চিৎকার, চ্যাঁচামেচি, আওয়াজ, গালিগালাজ—এর মধ্যে থাকতে নেই। গিয়ে ভালো করে চান-টান করে নাস্তা করুন। বেলা হলে কুয়োর জল গরম হয়ে যাবে। মংলুকে বলবেন, আরো জল লাগলে কুয়ো থেকে বাথরুমে এনে দেবে।

মহুয়া কপট রাগের গলায় বলল, আপনি তাহলে আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন?

সুখন বলল, আপনি আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করলে গাড়ি সারাতেই আমার দেরি হবে। কারিগরিটা এখনও রপ্ত হয়নি যে।

তারপর একটু থেমে বলল, আপনারা তো বেতলা যাবেন; তাই না? বেতলা যাবার জন্যই তো কলকাতা থেকে বেরিয়েছেন। এইখানে দেরি ও কষ্ট করবার জন্য তো আসেননি? প্লিজ যান। আরাম করুন গিয়ে।

ফিরে আসতে আসতে ও মনে মনে বলছিল যে, এত তাড়া কেন তোমার, আমাকে তাড়াবার? চলে তো আমরা যাবই। থাকার জন্য তো আসিনি! তবু গাড়িটা এক্ষুনি না-সারালেই কি নয়? গাড়ি সারাতে সময়ও তো লাগতে পারত।

মনের মধ্যে একটা চাপা কষ্ট, প্রচ্ছন্ন অভিমান, অস্বস্তিকর এক অপমানবোধ নিয়ে মহুয়া ধীর পায়ে ফিরে এল ডেরায়। ওঁরা তখনও ঘুমোচ্ছিলেন।

ডেরাটা চুপচাপ। মংলু বারান্দায় বসে তরকারি কাটছিল।

বারান্দায় একটা ঠান্ডা ভাব। ঝিরঝির করে প্রভাতী হাওয়া বইছে।

মহুয়াকে আসতে দেখে হঠাৎ-ই মংলু বলল, দিদিমণি, ওস্তাদের ঘর দেখবে?

কী হবে?

উদাসীনতার গলায় বলল মহুয়া। মনে মনে বলল, লাভ কি অপরিচিত লোকের ঘর দেখে? পরক্ষণেই পরম অনিচ্ছা সহকারে বলল, আচ্ছা চলো দেখি।

কিন্তু সুখন মিস্ত্রির ঘরে মংলুর সঙ্গে ঢুকেই মহুয়া অবাক হয়ে গেল।

বইয়ে-বইয়ে ভরা ঘরটা। সব জায়গাই বই। ইংরেজি বাংলা মেশানো। থ্রিলার-টিলার নয়, রীতিমতো সাহিত্যের বই। বিছানার মাথার কাছে বই, পায়ের কাছে বই, কোল-বালিশ করে রাখার মতো করে রাখা দু পাশেই বই—জানালার তাক, মেঝে, কিছুই প্রায় বাকি নেই।

চৌপাই-এর মাথার কাছে একটা-টুল। টুলের উপর একটা দিশি মদের খালি বোতলে খাবার জল আধা ভর্তি। তার পাশে একটা ডট পেন এবং একটা মোটা খাতা।

ঘরে আর কিছুই নেই। আয়না নেই, ড্রেসিং টেবল নেই, আলমারি নেই। কাঠের খুঁটিতে পেরেক মেরে তাতে ঝোলানো আছে একটা নীলরঙা তালি-মারা কিন্তু পরিষ্কার জিনসের প্যান্ট, হাতাওয়ালা টেনিস খেলার গেঞ্জির মতো গেঞ্জি, পায়জামা, দেহাতি খদ্দরের মোটা পাঞ্জাবি, একজোড়া কাবলি জুতো ঘরের কোনায়। ব্যস-স, আর কিছুই না।

মংলু ঘর ছেড়ে চলে যেতেই মহুয়া টুলটার দিকে এগিয়ে গেল। লণ্ঠনটা তখনও জ্বলছিল। পলতেটা কমিয়ে নিবিয়ে দিল সেটাকে। তারপর অন্যমনস্কভাবে টুলের ওপর রাখা খাতাটা তুলে নিল।

সেই লেখার খাতার প্রথম পাতাতে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা আছে সুখরঞ্জন বসু, ফুলটুলিয়া, গুঞ্জা, জেলা—পালামৌ। তারপর লেখা আছে, "রোজকার কথা—হিজিবিজি"।

প্রথম পাতা খুলতেই অবাক হয়ে গেল মহুয়া। ও নিজে সাহিত্য ব্যাপারটা ভালোবেসেই পড়েছে। কিছু যা-হয় একটা পড়তে হয় বলে পড়েনি। তাই ডায়ারিগোছের খাতাটা দেখে ওর ঔৎসুক্যটা স্বাভাবিক ছিল। এই ঘরে, এমন হাতের লেখায় এমন ডায়ারি দেখবে, ও আশা করেনি। ও ভাবল যে, তাহলে ও ভুল করেনি। কাল রাতের মুখটি, সেই গভীর গলার স্বরের মানুষটি, যে তার সমস্ত সত্তাকে শুধু চোখচাওয়াতেই, শুধু কণ্ঠস্বরেই অমন করে নাড়া দিয়েছে—তার মধ্যে কিছু একটা অসাধারণত্ব নিশ্চয়ই রয়েছে। মিস্ত্রির পরিচয়টা যেন তাকে মানায় না।

২৯শে জুন '৭৪
ফুলটুলিয়া

আজ আমার জন্মদিন। জন্মদিন হয় বড়ো-লোকদের, যাদের পয়সা আছে; আর সেই সব বড়ো-লোকদের, যাদের যশ আছে। আমি দুখন মিস্ত্রির ভাই সুখন মিস্ত্রি—আমার আবার জন্মদিন!

যখন ছোটো ছিলাম, মনে আছে, ছোট পিসিমা আসতেন কোডারমা থেকে ওই সময় আমার জন্মদিন উপলক্ষে নয়—আসতেন ঠাকুরমাকে দেখতে। প্রতি বছর দু'টাকা করে হাতে ধরে দিতেন। বকশিবাজারে গিয়ে মাধুবাবুর বইয়ের দোকানে ঢুকে একটা বই কিনতাম—নিজের ছেলেমানুষী কাঁচা হাতের লেখায় লিখতাম—"আমার জন্মদিনে আমাকে দিলাম।"—

ইতি সুখরঞ্জন

কত কী ভেবেছিলাম। ছোটোবেলায় কত কী স্বপ্ন দেখেছিলাম। এই করব, সেই করব; এই হবো, সেই হব।

আর কী হলাম! কী হলাম; মানে মোটর মেকানিক হয়েছি বলে কোনো দুঃখ নেই। আমি কারো কাছে হাত পেতে খাই না, ভিক্ষা করি না। কারো দয়ার অন্ন নিই না—ভালো খাই, মন্দ খাই—খেটে খাই। ঘামের ভাত খাই এতে লজ্জা নেই। কে কী করে সেটা অবান্তর। কোনো কিছু করার মধ্যেই কোনো গ্লানি নেই—গ্লানিটা বরং কিছুই না করার মধ্যে। ছোটোলোকির কাজ না করে যারা ভদ্রলোকি কেতায় হাত পাতে, পরের ঘাড়ে স্বর্ণলতার মতো ঝুলে থাকে—তারা মানুষ নয়। সে বাবদে আমি মানুষ। এ জীবনে কারো বোঝা হইনি আমি। কারো বোঝাও নিইনি অবশ্য।—এক বউদি আর শান্তর দায়িত্ব ছাড়া। সে দায়িত্বকে আমি বোঝা বলে মনে করি না। দাদা মারা গেলেন। এই মিস্ত্রিগিরি করেই আমাকে কোনোভাবে ঋণ শোধের সুযোগ না দিয়েই নিজের জীবনটা প্রায় অবহেলায় নষ্ট করেই তো দাদা মারা গেলেন।

আজ আমার একটাই আনন্দ। দাদা হয়তো বুঝতে পারেন, জানতে পারেন যে, ভাইটা তাঁর অমানুষ হয়নি। বাংলায় এম. এ. পাস করার পর একটুও দ্বিধা না করে দাদার হঠাৎ মৃত্যুর পর দাদার কারখানার ভার সহজে গ্রহণ করেছিলাম। মনে হয় যে, দাদার আত্মা এ কথা জেনে শান্তি পান।

দুঃখটা এই কারণে যে, চিরদিন এই কারখানা আঁকড়েই পড়ে থাকতে হবে—শান্তটা যতদিন না নিজের পায়ে দাঁড়ায়। সে তো অনেক বছর। বউদিকে যতদিন না তাঁর স্বাবলম্বনের মতো কিছু করে দিতে পারি—ততদিন আমার ছুটি নেই। পড়াশুনা করতে পরি না, লিখতে পারি না এক লাইন। গাড়ির মিস্ত্রি হয়ে কি কখনও লেখা যায়? দুঃখ এইটুকুই রয়ে গেল এ-জীবনে। এ-জীবনে আমাকে অভ্যস্ত হতে হবে কখনও ভাবিনি।

সুখন মিস্ত্রির জীবনে জন্মদিনের কোনো দাম নেই। তার জন্মদিন কেউ মনে রাখেনি কখনও, সে নিজেও না। যার জন্ম একটা জৈবিক বা যৌন দুর্ঘটনা—তার জন্মদিন আবার পালন করার কী? তাছাড়া পালন করেই বা কে? নিমগাছের ঝরা পাতার মতো প্রতি বছর এই উত্তর-তিরিশের গাছ থেকে অনেক পাতা ঝরে যায়। এখানে শুধুই লাল-টাগরা দেখানো ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত কাকেদের বাস—ঝরা পাতার দীর্ঘশ্বাস। ঘুমভাঙা—কাজ করা—ঘুম পাওয়া—ঘুম ভাঙা। এ জীবনে কখনও কোনো কোকিল আসেনি, আসবেও না। যতদিন না সব পাতা ঝরে, সব সাধ বাসি ফুলের মালার মতো না শুকোয়, ততদিন শুধুই প্রশ্বাস নেওয়া ও নিশ্বাস ফেলা। সুখন মিস্ত্রির সব জন্মদিনের গন্তব্যই এক। তারা একই দিকে গড়িয়ে যাবে—তার মৃত্যুদিনে।

মহুয়া অনেকক্ষণ চুপ করে সেই ঘরে দাঁড়িয়ে রইল ডায়ারিটা হাতে করে। এই ফাটা-ফুটো গ্যারেজ-বাড়িতে যে তার জন্য এত বড়ো একটা বিস্ময় লুকানো ছিল, তা ও স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

সেই স্বল্প-পরিচিত পুরুষের শোবার ঘরে দাঁড়িয়ে তার বুকের মধ্যে ধড়াস-ধড়াস করতে লাগল। সে কী আনন্দে বিস্ময়ে, ভয়ে না বেদনায় তা বোঝার মতো ক্ষমতা মহুয়ার ছিল না।

তাড়াতাড়ি কাঁপা-কাঁপা হাতে ও পাতা উলটে যেতে লাগল—ওর মন যেন কী বলতে লাগল ওকে—ওকে যেন কী এক নীরব ইঙ্গিত দিতে থাকল।

দ্রুত মহুয়ার সুন্দর আঙুলগুলি এসে থেমে গেল ডায়ারির একেবারে শেষে।

মহুয়া উত্তেজনায় স্তব্ধ হয়ে গেল। ওর হৃৎপিণ্ড যেন বন্ধ হয়ে গেল।

২৪/৩/৭৫

এত সৌভাগ্যও কি সুখন মিস্ত্রির ছিল।

যাকে সে জীবনে চোখে দেখেনি অথচ আকৈশোর স্বপ্নে দেখেছিল, যার সঙ্গে আলাপ হয়নি অথচ মনে মনে যে ভীষণ আপন ছিল, যে পৃথিবীর সব সৌন্দর্যের সংজ্ঞা যে সুরুচির শান্ত স্নিগ্ধ প্রতিমূর্তি, যে নারী-সুলভতার সেই চিরন্তন সান্ত্বনাদাত্রী গাছের নিবিড় নরম নিভৃত ছায়া—সে কিনা এমন করে ঝড়ের ফুলের মতো উড়ে এল। উড়ে এল সুখন মিস্ত্রির ভাঙা ঘরে।

এল যদিও, কিন্তু ক্ষণতরে এল, চলেও যাবে ক্ষণপরে।

হায় রে সুখন! তোর সাধ্যি কি একে আদর করিস; একে যত্ন করিস। এ কোকিল সুখন মিস্ত্রির দাঁড়ে বসার জন্য জন্মায়নি। দু দণ্ডের জন্যও না। তোর জন্য নিমগাছভরা দাঁড়কাক। দিনভর, জীবনভর, কা-খবা-খবা-কা।

আমি জানি, তুমি ক্ষণিকের অতিথি। তুমি তোমার বড়োলোক প্লে-বয় বয়-ফ্রেন্ডের সঙ্গে বয়স্ক বাবার সঙ্গে, ক-দিনের জন্য মজা করতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছ। গাড়ি খারাপ হওয়াতে, এই মোটর মেকানিকের ডেরায় এসে রাত কাটালে—কত কষ্ট হল তোমার। গাড়ি সারা হলে কতগুলো টাকা মিস্ত্রির মুখে ছুঁড়ে দিয়ে তোমরা চলে যাবে।

জানি সব জানি। তবু সুখন, বড়ো কষ্ট পেলি রে সুখন, বড়ো কষ্ট পাবি। পৃথিবীটা এরকমই। বাঘবন্দির ঘর। সে ঘরে সুখন শুধুই মোটর মিস্ত্রি। সুখনের মনের ঘরে, কি টালির ঘরে—কোনো ঘরেই জায়গা নেই মহুয়ার।

তোমাকে জানাবার সুযোগও আসবে না কখনও যে, তোমাকে আমি কী চোখে দেখেছি। তা ছাড়া, জানিয়ে লাভই বা কি? নিজেকে ছোটো করা, অপমানিত করা ছাড়া আর তো কিছুই পাওনা নেই আমার তোমার কাছে।

তুমি যে মহুয়া! আর আমি যে হতভাগা সুখন।

তবু, বাঃ মহুয়া! তুমি কী সুন্দর মহুয়া। তোমার মতো এক সুন্দর আর কিছুই আমি এ-জীবনে দেখিনি। কখনও বুঝি দেখবও না। দুঃখ এইটুকুই যে তোমাকে কখনও আপন করে পাওয়া হবে না।

আরাম করে পাশের ঘরে ঘুমোও। তোমার একটু কষ্ট হবে। একটা রাত একটা বেলা। বিশ্বাস করো—এ কথাটা—আজ আমার বড়ো আনন্দ কত যে আনন্দ, তা তুমি কখনও জানতে পাবে না। ঘুমিয়ে থাকো। সোনা মেয়ে।

ডায়ারিটা এবার নামিয়ে রাখতে পারলে বাঁচে মহুয়া।

ওর সারা শরীর যেন অবশ হয়ে এল। বুকটা উঠতে-নামতে লাগল। বারান্দায় বেরিয়ে এসে মহুয়া ডাকল, মংলু, আমাকে একটু জল খাওয়াও না। শিগগিরি।

বড়ো পিপাসা পেয়েছে মহুয়ার। এত পিপাসার্ত ওর সাতাশ বছরের জীবনে আর কখনোই বোধ করেনি ও আগে।

মংলু জল এনে দিল। জল খেয়ে মহুয়া আবারও বাইরে গিয়ে কারখানার পাশের গাছগাছালিভরা মাঠে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল।

মাঠটা থেকে কাজে-ডুবে-থাকা সুখনকে দেখতে পাচ্ছিল মহুয়া। পুরুষ মানুষদের কর্মরত অবস্থায় যতখানি সুন্দর দেখায়, তত সুন্দর বোধহয় আর কখনোই দেখায় না—মনে হল মহুয়ার।

পায়চারি করতে করতে মনোযোগের সঙ্গে কাজ করতে থাকা সুখনের দিকে আড়চোখে চেয়ে মহুয়ার হঠাৎ মনে হল, কাউকেই এমন চুরি করে দেখেনি ও এর আগে। কাউকে শুধু চোখের দেখা দেখেও যে এত সুখ, তা ও কোনোদিনও জানতে না।

আশ্চর্য! মহুয়া ভাবল এখনও ও কতকিছুই জানে না; বোঝে না। কতরকম অননুভূত অনুভূতিই না আছে! অথচ কাল এখানে আসার আগে অবধিও ও দুর্মরভাবে বিশ্বাস করত যে ও নিজে মোটামুটি সর্বজ্ঞ।

তিন

সান্যালসাহেব জেগেছিলেন একটু আগে। কুমার তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

বালিশের তলা থেকে বের করে হাতঘড়িটা দেখলেন, সাড়ে আটটা বেজে গেছে। লজ্জিত হলেন তিনি। পরের বাড়িতে এরকম যখন-খুশি ওঠা, যখন-খুশি খাওয়া যায় না। ধড়মড়িয়ে চৌপায়াতে উঠে বসলেন।

ডাকলেন, কুমার, ও কুমার!

অনেকক্ষণ ডাকার পর কুমার সাড়া দিল।

কুমার উঠলে বাইরে এলেন দুজনে। এসে মুখ-হাত ধুয়ে বারান্দায় বসলেন, মংলুর দেওয়া চা নিয়ে।

দূরে মেঘ—মেঘ পাহাড় দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের পর পাহাড়। কাছেপিঠেই টিলা আছে অনেক। ঝাটি জঙ্গল; পিটিসের ঝোপ। মাঝে মাঝেই ভরভর আওয়াজ করে ছাতারে আর দু-একটা তিতির ওড়াউড়ি করছে। দূর থেকে কলি-তিতির ডাকছে তুররর-তিতি-তিতি-তুররর। সান্যালসাহেব সকালের আলোয় চারিদিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন যে, বড়ো বড়ো গাছের মধ্যে বেশিই শাল। সাদা সাদা ফুল ধরেছে তাতে থোকা থোকা। বারান্দায় বসে সামনে প্রায় আধ-মাইল খোয়াইয়ে-ভরা লালমাটি, লালফুলে-ছাওয়া টাঁড় দেখা যাচ্ছে। তারপর পাহাড়।

কুমার বলল, বি-উটিফুল কান্ট্রি। কিন্তু ওই লাল লাল ফুলগুলো কি সান্যালসাহেব? চতুর্দিকে কার্ল মার্কস-এর বাণী ছড়াচ্ছে?

সান্যালসাহেবের মুখে মৃদু হাসি ফুটল। বললেন, তোমরা সব শহুরে ছেলে। মাটির সঙ্গে তো যোগ নেই। এসব জানবে কী করে? আমার ছোটোবেলা কেটেছে দেওঘরে, বুঝলে? তখন দেওঘর একটা ছোট্ট শান্ত জায়গা ছিল। ছোটোবেলার কথা বড়ো মনে পড়ে।

লাল ফুলগুলো কী?—অসহিষ্ণু গলায় বলল কুমার।

মনে মনে বলল, বুড়োগুলোর এই দোষ। কথায় কথায় এমন রেমিনিসেন্ট মুডে চলে যান যে, কথা বলাই মুশকিল। শুধোলাম লাল ফুল, এনে ফেললেন ছোটোবেলা; দেওঘর। সময়ের যেন মা-বাবা নেই।

সান্যালসাহেব বললেন, পলাশ, শিমুল, অশোক সবের রঙই লাল। তবে যেগুলো দেখছ, এগুলোর বেশির ভাগই পলাশ। পলাশ জংলি গাছ—বিনা যত্নে বিনা আড়ম্বরে জঙ্গলে পথেঘাটে সব জায়গায় ওরা বেড়ে ওঠে।

এমন সময় মহুয়াকে আসতে দেখা গেল।

কুমার লক্ষ্য করল মহুয়ার চোখেমুখে একটা খুশি উপচে পড়ছে। অথচ ও উলটোটাই হলে আনন্দিত হত। কোথায় ওরা এতক্ষণে বেতলাতে ডানলোপিলো সাজানো গিজার-লাগানো ওয়েল-ফার্নিশড ঘরের লাগোয়া বারান্দায় বসে ছিমছাম ট্রেতে বসানো টি-পট থেকে ঢেলে চা খেতে খেতে হরিণ দেখত, তা নয়—এই টালির ছাদের নীচে, ছারপোকা ভরা মোড়ায় বসে কেলে

কুৎসিত কাচের গ্লাসে বিচ্ছিরি চা খাচ্ছে। মহুয়া যে রকম ফাসসী মেয়ে—ফাসসী বলেই তো জানে কুমার; তাতে এইরকম পরিবেশে তার খুশি হবার কোনোই কারণ নেই।

কুমার মনে মনে বলল, ব্যাপারটা একটু ইনভেস্টিগেট করতে হচ্ছে। মহুয়ার এত খুশি, খুশবু হঠাৎ! কোত্থেকে?

মহুয়া সিঁড়ি অবধি আসতেই সান্যালসাহেব শুধোলেন, কোথায় গেছিলি মা?

কারখানা ঘুরে এলাম। গাড়ির কাজ হচ্ছে। উনি বললেন, বিকেলের আগে হবে না।

অ্যাই মরেছে! কোথায় ভাবলাম বেতলায় বসে চান-টান করে একটু বিয়ার খাব। দুস্‌স। কুমার বলল।

মহুয়া কথা ঘুরিয়ে সান্যালসাহেবকে উদ্দেশ করে বলল, এবার জলখাবার খাবে তো? মংলু একা পারবে না। আমি গিয়ে একটু সাহায্য করি।

কুমার কথা কেড়ে নিয়ে বলল, আরে বোসো বোসো। কী আমার ইংলিশ ব্রেকফাস্ট বানাচ্ছে যে পারবে না ছোকরা? যা পিণ্ডি বানিয়ে দেবে তাই-ই খাব!

তারপরই বলল, বুঝলেন সান্যালসাহেব, যেবার কন্টিনেন্টে যাই—কি কেলেঙ্কারি! ব্রেকফাস্ট মানে কি জানেন? ব্রেড-রোলস আর কফি অথবা চা। টেবিলের উপর মাখন আর জ্যাম বা মার্মালেড রাখা আছে। লাগিয়ে খাও। আর চা বা কফি সঙ্গে। সত্যি! ব্রেকফাস্ট খেতে জানে ইংরেজরা।

স্কচরা আরো ভালো জানে, সান্যালসাহেব বললেন।

আপনি কি ছিলেন নাকি ওদিকে?

খুব অবাক হয়ে গলা নামিয়ে কুমার শুধোল। ভাবল, অফিসে তো কখনও শোনেননি যে এই বৃদ্ধ ভাম বাইরে ছিলেন কখনও।

সান্যালসাহেব হাসলেন। বললেন, পাঁচ বছর ছিলাম ইংল্যান্ডে, ছ বছর সুইটজারল্যান্ডে। তুমি তখন পাড়ার গলিতে গুলি অথবা ড্যাংগুলি খেলছ।

কুমার মোড়া ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল। বলল, ওঃ বয়! আপনি এত বছর বিদেশে থেকে এখনো লুঙি পরেন?

সান্যালসাহেব হেসে উঠলেন। বললেন, তাতে কী হয়েছে? লুঙি পরতে ভালোবাসি তাই পারি, তুমি পায়জামা পরতে ভালোবাসো তাই পরো, কেউ কেউ বাড়িতে ধুতিও পরেন। লুঙি পরার সঙ্গে বিদেশে থাকার কী সম্পর্ক?

না, মানে কেমন প্রিমিটিভ লাগে—কুমার বলল।

সান্যালসাহেব পাইপের পোড়া তামাক ঝেড়ে ফেলে বললেন, আমরা কি সত্যিই প্রিমিটিভ নই? আমি তুমি এদেশের ক-জন? ক-পার্সেন্টি? আমরা দেশের কেউই নই, কিছুই নই। শহর ছেড়ে গ্রামে এসেছ, চোখ কান খুলে দ্যাখো, শোনো—অনেক কিছু জানবে, শুনবে।

কুমার চুপ করে থাকল। ওর চোখে অসহিষ্ণুতার ছাপ পড়ল। মনে মনে বলল, বুড়োগুলোকে নিয়ে এই বিপদ। কথায় কথায় এত জ্ঞান দেয় না! ভাবখানা যেন, জ্ঞান দেওয়ার টাইম চলে যাচ্ছে—এইবেলা না দিলে কখন কে ফুটে যায় কে জানে!

সান্যালসাহেব হঠাৎই শুধোলেন, তুমি কতদিন বিদেশে ছিলে?

কুমার অপ্রতিভ হল। বলল, সবসুদ্ধ বারো দিন।

তারপর সুবোধ্য কারণে কুমার অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল।

একটু পরে মংলুকে সঙ্গে করে মহুয়া জলখাবার নিয়ে এল। মেটে-চচ্চড়ি, অমলেট, আলু-কুমড়ো-পেঁয়াজ-কাঁচালংকা দিয়ে একটা গা-মাখা তরকারি আর গরম পরোটা। সঙ্গে প্যাঁড়া।

সান্যালসাহেব মংলুর দিকে সপ্রশংস চোখে চেয়ে বললেন, করেছ কী মংলু? এ যে বেজায় আয়োজন?

মংলু খুশি খুশি গলায় বলল, ওস্তাদ বলেছে আপনাদের কোনো কষ্ট হলে আমার চাকরি থাকবে না। তারপরই এক নিশ্বাসে বলল, মেটে চচ্চড়ি দিদিমণির করা।

কুমার বলল, একজন মোটর মেকানিকের ঘাড়ে এত অত্যাচার করাটা ঠিক হচ্ছে না। দিস ইজ আনফেয়ার। যাকগে, যাওয়ার সময় মেরামতের বিল ছাড়াও ভালো মতো টিপস দিয়ে যাব। নাথিং ইজ অ্যাজ এলোকোয়েন্ট অ্যাজ মানি। টিপস দিয়ে খুশি করে দেব সুখন মিস্ত্রিকে।

কুমারের কথাটা শেষ হতে না হতেই সুখন এসে দাঁড়াল। সিঁড়ির কাছে প্রায় নিঃশব্দ পায়ে।

মহুয়া পিছন ফিরে ছিল—দেখেনি।

হঠাৎ সুখনের গলা পেয়ে ফিরে দাঁড়াল।

সুখন বলল, গাড়ির একটা কাটিং শ্যাফট লাগবে। আর যা যা দরকার তার সবই আমার কাছে আছে। ফুয়েল ইনজেকশান পাম্পে গোলমাল আছে। কারবুরেটারে ভীষণ ময়লা জমেছে। এইসব আমার কাছে নেই। গুঞ্জা বস্তিতে যে দোকান আছে, তাতেও পাওয়া যাবে না। পাওয়া যেতে পারে একমাত্র রাঁচিতে। লোক পাঠিয়ে রাঁচি কিংবা ডালটনগঞ্জ থেকে আনতে হবে। কিন্তু মুশকিল হয়ে গেছে যে, আজ সকাল থেকে বাস-স্ট্রাইক! কাল মান্দারের কাছে এক বাসের ড্রাইভারকে খুব মারধোর করে লোকেরা—তাই আজ এ-রুটে সকাল থেকে বাস বন্ধ। অথচ ওটা না হলে ও গাড়ির কিছুই করা যাবে না। কলকাতা থেকে বেরোনোর আগে গাড়িটা দেখিয়ে বেরোনো উচিত ছিল। পথের যে-কোনো জায়গাতেই ভেঙে যেতে পারত। গাড়ি হাই-স্পিডে থাকলে সাংঘাতিক অ্যাকসিডেন্টও হতে পারত। এ-রকম অবস্থায় এ-গাড়ি নিয়ে বেরোনোটাই আপনাদের অন্যায় হয়েছে।

কুমারের মুখে পরোটা ছিল। গবগবে গলায় বলল, থামো মিস্ত্রি, থামো। তোমার কাছ থেকে দায়িত্বজ্ঞান শিখতে হবে না আমার। এ-রকম কারখানা রাখো কেন? আমরা এসেছি কাল রাতে, এখন বাজে সকাল ন-টা—এখন বলছ যে, গাড়ি সারানো যাবে না। এতক্ষণ কি ঘাস কাটছিলে? না, নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিলে?

সান্যালসাহেব ও মহুয়া একই সঙ্গে কুমারের দিকে চাইলেন।

কুমার কেয়ার না করে বলল, বলো তোমার কী বক্তব্য আছে? বলো মিস্ত্রি।

সুখন অবাক চোখে কুমারের দিকে তাকিয়ে ছিল! ভুরু দুটো কুঁচকে উঠেছিল. অনেকক্ষণ কুমারের দিকে তাকিয়ে থেকে সুখন ধীর গলায় বলল, আমার কিছু বলার নেই।

কুমার বলল, তোমার পক্ষিরাজ গাড়ি নিয়েও তো যেতে পারতে রাঁচি। এতক্ষণে তো পার্টস নিয়ে আসা যেত।

মংলু মধ্যে পড়ে রাগ রাগ গলায় বলল, ও গাড়ি গুঞ্জা বস্তি অবধি যায়—তাও অতি কষ্টে।

সুখন এক ধমক দিয়ে মংলুকে চুপ করিয়ে দিল।

কুমার বলল, গুঞ্জায় তো যাবেই। মদ আনবার জন্য যেতে পারে, আর আমাদের গাড়ির পার্টস আনার জন্য রাঁচি যাওয়া যায় না?

কুমার আবার বলল, বাস স্ট্রাইক তো ট্যাক্সির বন্দোবস্ত করে মাল আনালে না কেন? আমরা কি ফালতু লোক? কত টাকা চাই তোমার? টাকা নিয়ে যাও যত চাও, কিন্তু গাড়ি তাড়াতাড়ি ঠিক করে দাও।

সুখন শান্ত গলায় বলল, আমি কিন্তু আপনাকে বরাবর 'আপনি' করেই কথা বলছি সম্মানের সঙ্গে।

কুমার বলল, বলবে বইকী। সম্মানের জনকে সম্মান দেবে না! তুমিও কি আমাকে তুমি বলতে চাও নাকি?

সান্যালসাহেব সুখনের চোখে প্রলয়ের পূর্বাভাস দেখে থাকবেন। তিনি তাড়াতাড়ি করে কুমারকে ধরে টেনে নিয়ে গেলেন ঘরের দিকে।

কুমার ঘরে না গিয়ে, বাইরে বেরিয়ে চলে গেল। বলল, আমি জায়গাটা সার্ভে করে আসছি।

কুমার চলে যেতে সান্যালসাহেব কুমারের অভদ্র ব্যবহারের পাপস্খালন করে নরম গলায় বললেন, তার মানে, কাল সকালে লোক পাঠিয়ে বিকেলে নিয়ে আসতে পারবেন তো? এই তো বলতে চাইছেন আপনি? নিয়ে আসার পর কতক্ষণের মধ্যে গাড়ি ঠিক হয়ে যাবে?

মনে হয়, দু-তিন ঘণ্টা। সুখন বলল।

সুখন মুখ নীচু করে ছিল।

বেশ! বেশ! তাই-ই হবে। আমরা তো আর জলে পড়ে নেই। এমন সুন্দর পরিবেশ, আদর-যত্ন, ভালোই তো হল। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য!

তারপর সুখনের স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনবার জন্য বললেন, আপনি, কী বলেন?

সুখন প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে ঠান্ডা, ভাবাবেগহীন গলায় বলল, তাহলে রাতেই আমার লোককে টাকাটা দিয়ে দেবেন যাতে সকালের প্রথম বাসেই চলে যেতে পারে।

সান্যালসাহেব বললেন, রাতে কেন? এক্ষুনি নিয়ে যান। কত টাকা?

সুখন বলল, এখন দেবেন না। নেশাভাঙ করে উড়িয়ে দিতে পারি। আমরা সব ছোটোলোক, ভরসা কী? রাতেই দেবেন। তিনশো টাকা।

কথা ক-টি বলেই সুখন ফিরে, কারখানার দিকে পা বাড়াল।

মহুয়া ডাকল। বলল, শুনুন সুখনবাবু।

সুখন থেমে তাকাল।

মহুয়া বলল, আপনি খেয়ে যান। একটা তরকারি আমি নিজে রেঁধেছি।

সুখন হাত তুলে অত্যন্ত ভদ্রভাবে বলল, ধন্যবাদ। অনেকদিন হল আমার সকালে খাওয়ার অভ্যেস চলে গেছে। আপনারা খান। আপনারা খেলেই আমার খাওয়া হবে।

তারপরই বলল, মংলু, এঁদের ভালো করে যত্ন করছিস তো? সকলের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে আমাকে একটু চা দিয়ে যাস কারখানায়।

সুখন চলে যেতে, মহুয়াও ওর নিজের খাবার নিয়ে মংলুর সঙ্গে রান্নাঘরে চলে গেল।

যাবার সময় মুখ নিচু করে সান্যালসাহেবকে বলে গেল, বাবা তোমার কিছু লাগলে আমায় ডেকো।

একটু পরেই কুমার ফিরে এল। এসেই বলল, একটা ট্র্যাশ জায়গা। এমন ব্যাড লাক এবারে যেমন জায়গা তেমন মিস্ত্রি। কাল রাতে এলাম এখন সকাল ন-টায় বলছেন যে গাড়ির কাটিং শ্যাফট ভেঙে গেছে।

সান্যালসাহেব বললেন, আমরাও ন-টা অবধি ঘুমোচ্ছিলাম। দোষ তো আমাদেরও। তাছাড়া, তাড়া কিসের অত? এই-ই তো বেশ, আস্তে আস্তে যাওয়া—তোমার তো আর কনফারেন্স নেই বেতলার হাতি কি বাইসনদের সঙ্গে।

পরিবেশটাকে লঘু করবার জন্য বললেন সান্যালসাহেব।

কুমার বলল, না, আমার এইরকম পয়েন্টলেসভাবে টাইম ওয়েস্ট করা একেবারেই বরদাস্ত নয়।

সান্যালসাহেব একটু চুপ করে থেকে বললেন, কুমার, তোমাকে একটা কথা না বলে পারছি না। ভদ্রলোকের সঙ্গে এ-রকম ব্যবহার করলে কেন? মনে হয় উনি লেখাপড়া জানেন, লেখাপড়া

জানুন আর নাই জানুন, নিজে হাতে খেটে খান—সেটাই তো যথেষ্ট সম্মানের বিষয়—তোমার এই ব্যবহারের কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না আমি।

কুমার বলল, আই অ্যাম সরি! কিন্তু প্রথম দেখা থেকেই লোকটাকে আমি সহ্য করতে পারিনি! জিনসের প্যান্ট, ফ্রেডপেরি গেঞ্জি, মুখ-চোখের ভাব, তাকাবার কায়দা—লোকটার মধ্যে মডেস্টি বলতে কিছু নেই। এমন একটা ভাব যেন আমাদের সঙ্গে সমান-সমান ও। আই ওয়ান্টেড টু কাট হিম ডাউন টু হিজ ও-ওন সাইজ।

সান্যালসাহেব অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন কুমারের দিকে।

বললেন, স্ট্রেঞ্জ!

তারপর বললেন, যাই-ই হোক, তোমার ব্যবহারের দায়িত্ব আমাদের উপরও বর্তেছে। কারণ তুমি আমাদের সঙ্গী। আমি তোমাকে প্লেইনলি বলব, তোমার এই নিষ্প্রয়োজনীয় অভদ্রতা আমি পুরোপুরি ডিস-অ্যাপ্রুভ করি। তুমি তাতে যাই-না মনে করো না কেন।

কুমার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধত গলায় বলল, আমি একাই আমার দোষগুণের দায়িত্ব নিতে রাজি। কারো অ্যাপ্রুভাল বা ডিস-অ্যাপ্রুভালের তোয়াক্কা করি না আমি।

সান্যালসাহেব বললেন, ভালো কথা। জানা রইল আমার।

এর পরেই পরিবেশে একটা ভারি নীরবতা ছড়িয়ে গেল, জেঁকে বসল।

সবার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে, মহুয়া নিজে হাতে বেশি করে ময়াম দিয়ে চারটে পরোটা ভাজল। তারপর প্লেটে সাজিয়ে নিয়ে, চা করে মংলুর হাতে প্লেটের উপর চা বসিয়ে নিয়ে কারখানার দিকে চলল।

কুমার বারান্দায় বসে সিগারেট খাচ্ছিল। সান্যালসাহেব বাথরুমে গেছিলেন চান করতে।

কুমার বলল, কোথায় চললে?

কারখানায়।

কেন? বলেই কুমার উঠে দাঁড়াল রাগতভাবে।

মহুয়া বলল, আমাদের হোস্টকে খাওয়াতে।

তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, এতে আপনার কি কোনো আপত্তি আছে?

কুমার বলল, ঘরে এসো, একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।

এক মিনিট কী ভাবল মহুয়া। তারপরে বলল, আপত্তি আছে তাহলে। কিন্তু কেন? আপত্তি করার কে আপনি? আমার যা খুশি আমি তাই-ই করব। আমি কি আপনার পোষা পুড্‌ল?

কিন্তু তারপরই বারান্দায় উঠে এসে ঘরে গেল।

কুমার আগেই ঘরে গেছিল। ঘরের এদিকে জানালা ছিল না। দরজার অন্য পাশে মহুয়া গিয়ে পৌঁছোতেই কুমার তাকে জোর করে আলিঙ্গনাবদ্ধ করল। আবেগের সঙ্গে বলল, তুমি এরকম করবে নাকি? ব্যাপার কী? একটা মিস্ত্রির জন্য এত দরদ উথলে উঠল কেন? আমি তোমাকে ভালোবাসি মহুয়া—আই মিন ইচ...।

মহুয়া ছটফট করে উঠল. চোখে আগুন ঝরিয়ে বলল, সো হোয়াট?

কুমার জোর করে কামড়াবার মতো করে মহুয়ার ঠোঁটে চুমু খেল।

মহুয়া তাকে ধাক্কা দিয়ে চৌপায়ার ওপরে ফেলে দিয়ে গরম নিশ্বাস ফেলে বলল, শুনুন আপনি, ভালোবাসা ভিক্ষা করে পাওয়া যায় না, ভালোবাসার যোগ্য করতে হয় নিজেকে। আই হেট দিস। আই হেট ইউ।

তারপর বলল, আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি। আপনি এরকম জোর করেছিলেন আমাকে, একবার আমাদের ফ্ল্যাটে। সেদিন আপনাকে কিছু বলিনি। কারণ আপনার সম্বন্ধে আমার

তখনও দ্বিধা ছিল। ভেবেছিলাম, আপনাকে কোনদিন ভালোবাসতেও বা পারি। কিন্তু আজ দ্বিধা নেই আর। আপনার নামের পিছনে অনেক ডিগ্রি, ভালো চাকরি; যাকে তাকে—আপনি অনেক মেয়েকেই পেতে পারেন—যারা আপনার যোগ্য। আমি আপনার যোগ্য নই। আমার পথ ছাড়ুন।

কুমারের উত্তরের প্রত্যাশা না করেই মহুয়া ঝড়ের বেগে বাইরে চলে গেল।

গিয়েই অত্যন্ত সহজ গলায় হেসে বলল মংলুকে, চলো মংলু। তোমাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলাম। দাদাবাবু গেঞ্জি খুঁজে পাচ্ছিলেন না; খুঁজে দিয়ে এলাম।

কুমার চৌপাইতে আধ-শোয়া অবস্থায় বসে মহুয়ার কথা শুনল। মহুয়ার অভিনয় করার ক্ষমতা, সহজ হবার ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে গেল। কুমারের পেট তখনও ওঠানামা করছিল উত্তেজনায়। ও মনে মনে বলল, এই মেয়েরা এক অদ্ভুত জাত। এদের কিছুতেই বুঝতে পারল না সে।

সান্যালসাহেব তোয়ালে জড়িয়ে ঘরে এলেন চান সেরে। বললেন, কী হল তোমার?

কুমার বলল, বুকে ব্যথা করছে—বড়ো বেশি সিগারেট খাচ্ছি আজকাল।

সান্যালসাহেব ওর দিকে তাকালেন। অন্য সময় হলে হয়তো কিছু বলতেন, কুমারের ভাষায় 'জ্ঞানও' দিতেন। কিন্তু নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে এখন শুধু বললেন, বেশি সিগারেট খেয়ো না। বলেই জামাকাপড় পরতে লাগলেন।

কারখানার মধ্যে মংলুকে নিয়ে ঢুকতেই একটা শোরগোল উঠল। নানারকম ধাতব ও উচ্চগ্রামে বাজতে থাকা আওয়াজগুলো মুহূর্তের মধ্যে থেমে গেল। মিস্ত্রিরা কাজ থামিয়ে সকলেই মহুয়ার দিকে চেয়ে রইল।

মহুয়াকে চেহারায় সহজেই ফিল্ম আর্টিস্ট বলে ভুল করা যায়। লম্বা, ছিপছিপে। ভারি ভালো ফিগার। অত্যন্ত সুন্দর চোখ, নাক ও মুখ। মাথাভরা চুল। সরু কপালে মস্ত একটা টিপ। সবচেয়ে বড়ো কথা, ওর হাঁটাচলা কথা বলার মধ্যে এমন এক আড়ম্বরহীন আভিজাত্য ও ব্যক্তিত্ব আছে যে, ওর দিকে চাইলে যে-কোনো উচ্চশিক্ষিত, মার্জিত ও রুচিবান পুরুষেরই চোখ আটকে যায়। আর এই গণ্ডগ্রামে মিস্ত্রিদের কথা তো বলাই বাহুল্য।

সুখন মিস্ত্রি নেই। কোথায় গেছে কাউকে বলে যায়নি। মংলুর সঙ্গে মিস্ত্রিদের যে হিন্দিতে কথাবার্তা হল, তাতে মহুয়া বুঝতে পারল যে, সুখন মিস্ত্রি হলেও সুখনকে অন্য মিস্ত্রিরা অত্যন্ত সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার চোখে দেখে; হয়তো বা ভয়ও করে।

ওরা ফিরে এল। পিছন ফিরতেই কারখানার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মহুয়ার রূপ সম্বন্ধে নানা অশ্লীল মন্তব্য কানে এল মহুয়ার।

মংলু পিছন ফিরতেই ওদের ধমক দিল। বলল, ওস্তাদকে বলে দিলে জিভ ছিঁড়ে নেবে ওস্তাদ; তখন মজা বুঝবে।

ওরা সমস্বরে দেহাতি হিন্দিতে বলল, ওস্তাদকে বলিস না। আমরা তো বেয়াদবি করিনি। সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছি শুধু। প্রথমে মিস্ত্রিদের এই অশালীনতা মহুয়ার খুব খারাপ লাগল। তারপরই এক অদ্ভুত ভালোলাগা ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। কুমারের কাছে যে সুখন অপমানিত হয়েছে—সেই অপমানের দুঃখ, মিস্ত্রিদের মুখের বুলিতে নিজে অপমানিত হয়ে যেন কিছু পরিমাণে শুধতে পারল। এই শোধের বোধটা বড়ো সুখের বোধ বলে মনে হল মহুয়ার।

ফেরার পথে মংলুর সঙ্গে ফিশ ফিশ করে কী সব কথা হল মহুয়ার। ওরা দু জনে যেন কী সব বুদ্ধি-পরামর্শ করল। ওরা ছাড়া আর কেউই তা জানতে পারল না।

মহুয়া ফিরে এসে চান করতে গেল।

ও ফিরে আসতেই কুমার কারখানায় গিয়ে পৌঁছোল। মিস্ত্রিদের দামি সিগারেট খাইয়ে তার গাড়ির অবস্থা ও সুখন মিস্ত্রির স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে যা জানা যায়, জানার চেষ্টা করল।

যা জানল কুমার, তা ওর পক্ষে মোটেই সুখকর নয়। তার গাড়ির সম্বন্ধে যা জানল, তা অত্যন্ত খারাপ এবং সুখন সম্বন্ধে যা জানল, তা অত্যন্ত বিরক্তিজনকভাবে ভালো। এ-বাজারে এতগুলো মিস্ত্রি-হেল্পার লোকেদের হৃদয়ের একচ্ছত্রাধিপতি হওয়ার মতো এমন কী গুণ থাকতে পারে সুখনের, তা কুমার ভেবে পেল না।

কারখানার একপাশে নিমগাছের ছায়ায় বসে সিগারেটের পর সিগারেট পুড়িয়ে কুমার অনেক কিছু ভাবতে লাগল।

ওর একটা গুণ আছে—সেটা এই যে, ওর দোষগুণ সম্বন্ধে ও সম্পূর্ণ সচেতন। ও যে সুখন মিস্ত্রির সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে সেটা ও জেনেশুনেই করেছে। সুখনকে অপমান করে ওর দারুণ ভালো লেগেছে। ও জানে যে, অন্যায় করেছে ও—কিন্তু করেছে।

ও কাল রাতে বুঝতে পেরেছিল যে, মহুয়া ও সুখন দুজন দুজনকে দেখে কেমন যেন হয়ে গেছে। ও ঘাস খায় না। ওর বুঝতে ভুল হয়নি যে, এই বিহ্বলতার মানে কি। ও কপালে কোনোদিনও বিশ্বাস করেনি—পুরুষকারে বিশ্বাস করেছে—পুরুষালি জেদে বিশ্বাস করেছে—কিন্তু কপাল বলে যে কিছু আছে, এ-কথা অস্বীকার করবার মতো জোর পায় না আজকে, এই মুহূর্তে। কপাল না থাকলে—যে গাড়ি তাকে একদিনও ডোবায়নি গত চার বছরে—সে গাড়ি এমনভাবে ডোবাবে কেন? আর ডোবাবেই বা যদিও, তাও সুখন মিস্ত্রির গ্যারাজের কাছে? এইসব ঘটনাবলীর পেছনে কোনো শালা অদৃশ্য ভগবানের হাত অবশ্যই আছে।

মহুয়ার সঙ্গে এই বারে আসার পেছনে সবিশেষ ও গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল কুমারের। পৃথিবীতে সব কাজের পেছনে একটা 'মোটিভ' থাকে। এত এত পরীক্ষা পাস করে এসে, এত এত বাঘা-বাঘা ইন্টারভ্যু বোর্ডের মেম্বারদের ঘোল খাইয়ে শেষে কিনা একটা মোটর মেকানিকের কাছে হেরে যেতে হবে ওকে! যে কম্পিটিটরের হিট-এ ওঠারই কোনো সম্ভাবনা ছিল না, সে কিনা ফাইন্যালে জবরদস্তি করে ঢুকে পড়ে ওকে হারিয়ে দেবে?

অত সহজ নয়।—দাঁতে দাঁতে চেপে কুমার বলল।

ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট ধরে কুমার মনে মনে বলল, ভগবান বা আর যারই হাত থাক—মহুয়াকে ও চায়। ওর এই চাওয়াটা হয়তো ভালোবাসার আদালতের জুরিসপ্রুডেন্স জানে না। কিন্তু তবু ওর চাওয়াতে কোনো মেকি নেই। মহুয়াকে ও চেয়েছে এ জীবনে; ও জানে মহুয়াকে ও পাবে। জীবনে যা কিছু চেয়েছে—জেদ ধরে চেয়েছে; অথচ পায়নি এমন দুর্ঘটনা ওর জীবনে কখনোও ঘটেনি। যদি ভগবান থেকে থাকে—তবে সেই শালা ভগবানেরই নামেই ও শপথ করেছে যে, মহুয়াকে পাবেই—মহুয়াকে জীবন-সঙ্গিনী করবে ও। মহুয়াকে সত্যিই কুমার ভালোবাসে। ভালোবাসার সঠিক মানে হয়তো জানে না ও। শুধু জানে মহুয়াকে দেখলেই কেমন একটা সেনসেশান হয়। মাথার মধ্যে, তলপেটে কী যেন একটা পোকা ওকে কুরে কুরে নিঃশব্দে খেতে থাকে।

না, না, মহুয়াকে না পেলে ওর চলবে না। সিরিয়াসলি বলছে : হি মাস্ট হ্যাভ হার। বাই হুক ওর বাই ক্রুক।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর একটা ইরিটেটিং আলস্য। কিছুই করার নেই। গড়িয়ে, বসে, সিগারেট খেয়ে ধু-ধু গরম ধোঁয়া ওঠা উদোম টিডিয়াস-টাঁড়ের দিকে চেয়ে চেয়ে ক্লান্তি লাগছিল কুমারের। খেয়ে-দেয়ে পায়জামার দড়ি ঢিলে করে দিয়ে চৌপায়াতে শুয়ে পড়েছিল কুমার, এবং কখন যেন ঘুমিয়েও পড়েছিল।

সান্যালসাহেবের বয়স হলেও দুপুরে ঘুমোনোর অভ্যাস কোনোদিনই নেই। ছুটির দিনে, খাওয়ার পর মিনিট পনেরো ইজিচেয়ারে শুয়েই উঠে পড়েন। ম্যাগাজিন পড়েন, ক্রসওয়ার্ড নিয়ে

বসেন, তারপর বেলা পড়লে বাড়ি সংলগ্ন একফালি জায়গাটুকুতে ফুল, লতা গাছগুলোতে জল-টল দেন নিজে হাতে, দেখাশোনা করেন।

সান্যালসাহেব লুঙ্গি পরে হাতকাটা গেঞ্জি গায়ে সুখনের দরজা খোলা ঘর থেকে খুঁজেপেতে একটা এস্কিমোদের উপর লেখা বই বের করলেন—ফারলি মোয়াটের লেখা—'দ্যা পিপল অব দ্যা ডিয়ার'। তারপর বারান্দায় এসে ইজিচেয়ারে আধো শুয়ে, পাইপটাতে অন্যমনস্কতায় তামাক ভরে ধরিয়ে নিয়ে বইটা নিয়ে পড়লেন। ভাবলেন, সুখন ছোকরা এরকম জায়গায় বসে এমন এমন সব বই জোগাড় করল কোথা থেকে?

সান্যালসাহেবের বারান্দায় এসে বসার আরো একটা কারণ ছিল। উনি সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, সুখনকে নিয়ে কুমার আর মহুয়ার মধ্যে একটা চাপা মনোমালিন্য ঘটেছে। এ ব্যাপারটার জন্য সান্যালসাহেব খুশি ছিলেন না। চাইছিলেন যে ওরা একটু নিরিবিলি পেলে এই ব্যাপারটা মিটিয়ে নিক নিজেরাই।

সান্যালসাহেব ভাবছিলেন যে, কুমারের আর যাই দোষ থাক, কুমারের মতো ভবিষ্যৎসম্পন্ন জামাই এ যুগে পাওয়া দুষ্কর। ছেলেটা মেধাবী, চিরকাল স্কলারশিপ নিয়ে পড়েছে—ন্যাশনাল স্কলারশিপও পেয়েছে। কাজ খুবই ভালো জানে। কিন্তু অত্যন্ত অসচ্ছল অবস্থা ও সাদামাঠা জীবন থেকে এসে যারা নিজগুণে জীবনে সচ্ছলতার মুখ দেখে এবং আশাতীত ইম্পর্ট্যান্স পেয়ে যায়, তাদেরই মাথা খারাপ হতে দেখা যায় বেশি। তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে। সাইকেলের পেছনে গুড়ের বস্তা নিয়ে যে বাড়িবাড়ি গুড় বিক্রি করত, সেই ফেঁপেফুলে উঠে গাড়ি চড়ে বেড়াবার সময় সাইকেল-আরোহীকে ধাওয়া করে নর্দমায় ঠেলে ফেলে আনন্দ পায়। এ তিনি নিজের জীবনেই বহু দেখেছেন, আসলে প্রত্যেক মানুষই তার বুকের মধ্যের অন্য একটা পুরোনো চাপা পড়ে যাওয়া মানুষকে ভুলে যেতে চায়। কিন্তু ভুলতে না পেরে সেই মানুষের প্রতিভূ অন্য মানুষদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। একজন মানুষ, তার মধ্যের একখণ্ড মানুষকে যতখানি ঘৃণা করে, কোনো জানোয়ার তার নিজের কোনো অঙ্গকে অন্ধক্রোধে কামড়ালেও সেই ঘৃণার সমকক্ষ হয় না। সমস্ত মানুষকেই জীবনের কিছু কিছু ক্ষেত্রে জানোয়ারের কাছেও হার মানতে হয়। সান্যালসাহেবকেও হয়েছে। সান্যালসাহেব জানেন, কুমারের হার মানতে হবে।

জীবনের দুই-তৃতীয়াংশ অতিক্রম করে এসে আজ সান্যালসাহেব বুঝতে পারেন, শুধু বুঝতে পারেন যে তাই-ই নয়, উনি বিশ্বাস করেন যে, জীবনে ভারসাম্য না রাখলে, না থাকলে কোনো একটি ক্ষেত্রে দারুণ গুণী হয়েও কিছুমাত্রই লাভ নেই। বড়ো এঞ্জিনিয়ার, অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা বড়ো জার্নালিস্ট খুব সহজেই হওয়া যায়—কিন্তু সুস্থ, সীমাজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ হওয়া যায় না। সেটা বড়ো কঠিন কাজ।

কুমারের মেধা ও বাল্যকালের অসাচ্ছল্য ও অপ্রতীয়মানতার পরিপ্রেক্ষিতে যৌবনের সাচ্ছল্যই ওর সবচেয়ে বড়ো শত্রু হয়েছে। ওর সাফল্যই ওর সবচেয়ে বড়ো ব্যর্থতা।

সান্যালসাহেব ভাবছিলেন যে, এ-দেশে সবচেয়ে গরিবের ঘরের ছেলেরাই অবস্থার পরিবর্তন হলে সবচেয়ে বেশি ক্রূর দুর্মর ও নিষ্ঠুর বুর্জোয়া হয়। অথচ উলটোটাই হওয়া উচিত ছিল; হলে ভালো হত। তারা যদি অন্যের দুঃখ না বোঝে তো কারা বুঝবে?

এরা না অ্যারিস্টোক্র্যাট না প্রলেতারিয়েত। এরা ডুডুও খায়, টামাকও খায়।

যাই-ই হোক, এ-সবই দোষ। কিন্তু এমন কোনো দোষ নয় যে, কুমারকে জামাই হিসাবে ভাবা যায় না। আর বড়ো জোর বছর পাঁচেকের মধ্যে ও এত বড়ো কোম্পানির একটা পুরো ডিভিশনের নাম্বার ওয়ান হয়ে যাবে। অর্থাৎ মাইনেও ও পার্কস মিলিয়ে যা পাবে, তারপর সাপ্লায়ার কনট্রাক্টরদের ভেট-টেট তো আছে—সারাজীবন রাজার হালে হেলে-দুলে চলে যাবে।

বর্তমান সমাজে এই কুমারের মতো জামাইরা সুদুর্লভ। 'পাত্র-পাত্রী' শিরোনামা এদেরই আড়ম্বরপূর্ণ ও নির্লজ্জ ঢাকের শব্দে ভরে থাকে। সান্যালসাহেব সব জানেন, বোঝেন; তিনি বোকা

নন। জেনেশুনে তিনি তাঁর একমাত্র মেয়ের জন্য এমন জামাই হাতে পেয়েও হাতছাড়া করতে দিতে পারেন না। এর একটা আশু-বিহিত দরকার।

কিন্তু মহুয়া বড়ো জেদি মেয়ে। কলকাতায় বেশ ছিল—উইক এন্ডে ক্লাবে যেত, সিনেমায় যেত দু'জনে, কুমারের যখন আসবার কথা, তখন ইচ্ছে করে সান্যালসাহেব ফ্ল্যাট ছেড়ে অন্য কোথাও যেতেন—অন্য কারো ফ্ল্যাটে অথবা ক্লাবে অসময়ে গিয়ে বসে ম্যাগাজিন উলটোতে বিয়ার সিপ করতেন।

কুমার আর মহুয়ার সম্পর্কটা রীতিমতো ঘন হয়ে এসেছিল, চিকেন অ্যাসপারাগাস স্যুপের মতো। উনি তাতে বড়ো খুশি ছিলেন। কুমার ছেলেটার এমনিতে কোনো দোষ নেই, পেডিগ্রি নেই এই-ই যা, ব্যাড-ব্রিডিং, সে কারণে বস্তি বস্তি ভাবটা রয়ে গেছে ওর মধ্যে পুরোমাত্রায়। কিন্তু সান্যালসাহেব জীবনে অনেক দেখলেন, আজ এটা তিনি বিশ্বাস করেন যে, একটা মিনিমাম অ্যামাউন্ট অব ঔদ্ধত্য ও গর্ব ছাড়া এবং এমনকী ক্রুডনেস ছাড়াও জীবনে ম্যাটেরিয়ালি বড়ো হওয়া যায় না।

এই মিস্ত্রি ছোকরা ভালো ছেলে সন্দেহ নেই কিন্তু মহুয়া যদি তাকে কুমারের সঙ্গে তুলনীয় বলে ভেবে থাকে, তাহলে শুধু কুমারের প্রতিই নয়, তার নিজের প্রতিও অত্যন্ত অন্যায় করবে।

বইটা কোলেই পড়ে থাকল সান্যাল সাহেবের। উনি ভাবতে লাগলেন। বাইরে ধুলো উড়তে লাগল। লাল ধুলো। গরম হাওয়ার সঙ্গে লু চলছে। শুকনো শালপাতা পাথরে জমিতে গড়িয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ঘূর্ণি উঠছে। হলুদ, লাল, পাটকিলে শুকনো পাতা, খড়কুটো সব কুড়িয়ে জড়িয়ে হাওয়ার স্তম্ভ উঠছে উপরে ঘুরপাক খাচ্ছে—নাচছে; তারপর সেই স্তম্ভটা শালবনের কাঁধ ছুঁই-ছুঁই হলেই হাওয়াটা ওদের বিকেন্দ্রীকরণ করে রাশ আলগা করে ছেড়ে দিচ্ছে। একরাশ খুদে ভারহীন ছত্রীবাহিনীর মতো ওরা চতুর্দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে—মাধ্যাকর্ষণে নেমে আসছে যেখান থেকে ঊর্ধ্বলোকের আশায় রওয়ানা হয়েছিল সেই অধঃলোকে।

সান্যালসাহেব অন্যমনস্ক হয়ে দেওঘরের দিনগুলোয় ফিরে গেছিলেন। ডিগারিয়া পাহাড়—পাহাড়ের মাথায় রোদ সাঁঝেরবেলায় দেখা শান্ত সন্ধ্যাতারা একটি মিষ্টি সাধারণ শ্যামল মেয়ের মুখ—শালবনের ভেতরে। বিবাহিতা অল্পবয়সি একটি মেয়ে। সান্যালসাহেব তাকে ঘর থেকে বাইরে এনে নিজের ঘরে তুলেছিলেন। সান্যালসাহেব কখনও সংস্কার মানেননি, সমাজ মানেননি। লুঙি পরলে কি হয়, মনেপ্রাণে জানেন যে, পুরোদস্তুর সাহেব তিনি। কিন্তু সেই শ্যামলী মেয়েটি মহুয়াকে উপহার দেওয়ার পরই তাঁকে সেই ঘরে মেয়ের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একা রেখে এক দুর্মর উচ্চাকাঙ্ক্ষা—ও আরো বিলাসী জীবনের মোহে পড়ে ওদেরই কোম্পানির এক ফরাসি ডিরেক্টরের সঙ্গে পালিয়ে গেছিল। শ্যাম্পেনের দেশের লোকের নাকে বাংলার শ্যামলা মেয়ের গায়ের বনতুলসী গন্ধ ভারি ভালো লেগে গেছিল বুঝি। ঘর ভাঙতে, ঘর বাঁধতে এবং আবার ঘর ভাঙতে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল শ্যামলী। এর পরে তার কোনো খবর সান্যালসাহেব আর রাখেননি। রাখার প্রয়োজনও বোধ করেননি। লোকমুখে শুনেছেন যে, ভালোই আছে শ্যামলী স-পুত্র। সেদিন থেকে নারীচরিত্র সম্বন্ধে তাঁর মনে এক অসীম দুর্জ্ঞেয়তা ছাড়া আর কোনো অনুভূতিই অবশিষ্ট নেই। পুরো মেয়ে জাতটা সম্বন্ধে—একমাত্র নিজের রক্তজাত মেয়ে ছাড়া—তিনি একেবারেই নিস্পৃহ হয়ে গেছেন। প্রত্যেকটি মেয়েকে তিনি মনে মনে ঘৃণা করেন সেদিন থেকে। ঘৃণা বললেও ঠিক বলা হয় না; একটা ঘৃণাজনিত ও অনুশোচনাজনিত উদাসীনতার শিকার হয়েছেন তিনি।

আশ্চর্য! শ্যামলীকে আর মনেও পড়েনি কখনও। কিন্তু দেওঘরে যে সাধারণ অল্পেসন্তুষ্ট বিনয়ী ও বেসিক্যালি ভালো স্কুল-মাস্টারের স্ত্রী ছিল শ্যামলী, যার ঘর ভেঙে সান্যালসাহেব কোকিলের মতো উজ্জ্বল কালো শ্যামলীকে নিয়ে এসেছিলেন, সেই লোকটার কথা বার বার মনে পড়ে। তাঁর

লোকটার অনুযোগহীন, উদার উদাস চোখ দুটির কথা মনে পড়ে। পালিয়ে আসার পর ভদ্রলোক শ্যামলীকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন—একটিই—তাতে লিখেছিলেন যে, তুমি যদি খুশি হয়ে থাকো, সুখে থাকো, তাহলেই ভালো। তুমি যা চেয়েছিলে, যা আমি দিতে পারিনি ও কখনও পারতাম না, তা সুধীর সান্যালের কাছে পাবে শুধু এই কামনা করি।

সান্যালসাহেব জানেন যে একমাত্র এই লোকটার কাছেই উনি হেরে গেলেন, হেরে রইলেন, হেরে থাকবেন সারাজীবন।

চার

এখন দুপুর খাঁ খাঁ।

একমাত্র শীতকাল ছাড়া অন্য সব ঋতুতেই দুপুর আড়াইটে থেকে চারটে অবধি একটা ভারি, ক্লান্ত ও মন্তর নিস্তব্ধতা যে প্রকৃতিকে পেয়ে বসে।

সান্যালসাহেব বই পড়তে পড়তে কখনও যা করেন না, সেই কর্ম করলেন আজ। একটু গড়িয়ে নেওয়ার জন্য ঘরে গেলেন। ঘরের জানালা সব বন্ধ। দরজা ভেজানো। মধ্যেটা অন্ধকার, ঠান্ডা। উপরের টালির ফাঁক-ফোঁক দিয়ে ও জানালা-দরজার ফাটা ফুটো দিয়ে আলো এসে এক লালচে উদ্ভাসনায় ঘরটাকে চাপাভাবে উদ্ভাসিত করে রেখেছে। বাইরে লু বইছে তখনও। পাতা ওড়ানোর পাতা খসানোর আর পাতায়-পাতায় হাওয়ার ঝরনা ঝরানো আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। দূরের নির্জন যানহীন সড়ক বেয়ে গোঁ-গোঁ করে, ক্বচিৎ ট্রাক যাচ্ছে গরম হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। কুয়োর লাটাখাম্বা উঠছে-নামছে। কোনো মিস্ত্রি-টিস্ত্রি চান করছে বোধহয়। লাটাখাম্বার ক্যাঁচোর-ক্যাঁচোর একঘেয়ে যন্ত্রণাকাতর একটা আওয়াজ সমস্ত খাঁ খাঁ পরিবেশকে আরো বেশি উদাস ও বেদনাবিধুর করে তুলেছে।

সান্যালসাহেব ঘরে যাওয়ার পরই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কুমারেরও নাক ডাকছিল। মহুয়া দেওয়ালের দিকে মুখ করে পাশ ফিরে বাঁ-হাতটা দুচোখের উপরে রেখে শুয়েছিল।

একটুক্ষণ পরেই সান্যালসাহেবের গভীর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। ভেতরে ঘর-ভরা ঘুম; বাইরে দুপুর নিঝুম।

মহুয়া আস্তে উঠে নিঃশব্দে আয়নার সামনে দাঁড়াল।

ঘরের এই সামান্য আলোয় নিজের মুখ ভালো দেখতে পেল না মহুয়া। তবু, যতটুকু আলো ছিল, সেই আলো আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে তার দুটি গভীর চোখে পড়ল এবং পড়েই দ্বিতীয়বার প্রতিফলিত হল আয়নায়। হাতব্যাগ থেকে চিরুনি বের করে নিয়ে চুলটা একটু আঁচড়ে নিল; মুখে একটু ভেসলিন লাগাল, ঠোঁটেও। হাওয়াটা বড়ো শুকনো, সারা-গা, মুখ চোখ সব জ্বালা জ্বালা করছে। তারপর দরজায় একটুও শব্দ না করে বেরিয়ে পড়ল। বেরোবার সময় ঝোলানো থার্মোফ্লাস্কটা তুলে নিল দেওয়ালের পেরেক থেকে।

রান্নাঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে মংলু মেঝেতেই শুয়ে ছিল।

দরজায় টোকা দিতেই দরজা খুলল। শালপাতার দোনায় পুরি, তরকারি, প্যাঁড়া সব সাজিয়ে রেখেছিল ও। উনুনে তখনও আঁচ ছিল। এগুলো একটু গরম করে নিয়ে শালপাতার দোনায় আবার বেঁধে-ছেদে নিল। তাড়াতাড়ি নিজে-হাতে চা বানাল মহুয়া—দারুচিনি এলাচ এসব দিয়ে। যাতে বেশিক্ষণ ফ্লাস্কে থাকলেও গন্ধ না হয়ে যায় চায়ে। তারপর চা-টা ফ্লাস্কে ঢেলে মংলুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল মহুয়া।

ডানহাতের হাতঘড়িতে সময় দেখল একবার—চারটে বাজতে দশ। বাড়ির পেছনদিক বেড়ার মধ্যে একটা বাঁশের দরজা ছিল। তা দিয়ে গলে বাইরে বেরুতেই বড়ো অশ্বত্থ গাছ। ঝরনার মতো শব্দ হচ্ছিল হাওয়ায় এই গাছের পাতার।

তারপরেই একটু খোয়াই; খোয়াইটুকু পেরিয়ে একটু উঁচু বাঁধের মতো—বাঁধের উপরে সামান্য জল; একটা দহ। গোটা চারেক দুধ-সাদা গো-বক ঠা-ঠা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে। কালো-কালো ছোট্ট দুটো হাঁসের মতো পাখি জলে কিছুক্ষণ সাঁতার কাটছে, আর বা পরক্ষণেই জলে ঢেউয়ের বৃত্ত তুলে ডুব দিয়েই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

দাঁড়িয়ে পড়ে অবাক হয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে মহুয়া শুধলো, ওগুলো কি পাখি?

মংলু বলল, ডুবডুবা।

মহুয়া অবাক হয়ে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে চলেছে। ও বাবার সঙ্গে কাশ্মীরে গেছে, নৈনিতালে গেছে, উটীতে গেছে, যায়নি এমন ভালো জায়গা নেই ভারতবর্ষে, অথচ এই অখ্যাত অজানা ছোটো জায়গা—এই ফুলটুলিয়ার বিবাগি রুক্ষ দুপুরে যে, চোখভরে এত কিছু দেখার ছিল, কানভরে শোনার ছিল, ও কখনও তা স্বপ্নেও ভাবেনি।

দুটো শুয়োর কাদায় প্যাচ-প্যাচ আওয়াজ তুলে হাঁটু অবধি কাদা মেখে দৌড়ে গেল অন্যদিকে।

মহুয়া চমকে উঠে মংলুর বাহু ধরে ওকে দাঁড় করাল। বড়ো বড়ো চোখ করে ভয়-পাওয়া গলায় ওকে শুধোল, জংলি?

মংলু হাসল। বলল, না, না। এসব কাহারটোলার শুয়োর। একটু পরই পথটা শালবনের মধ্যে ঢুকে গেছে। এখানে গরম অনেক কম—ছায়া আছে বলে। আঁকাবাঁকা লাল মাটির পথ চলে গেছে নালা পেরিয়ে, টিলা এড়িয়ে বনের অভ্যন্তরে। জঙ্গলের মধ্যে পাতার শব্দে হাওয়াটাকে ঝড় বলে মনে হচ্ছে। মাথার উপরে দিয়ে ঝড়ের চেয়েও দ্রুতগামী টিয়ার ঝাঁক, ঘন সবুজের মধ্যে কচি-কলাপাতা সবুজের ঝিলিক তুলে, মস্তিষ্কের কোষে কোষে চমক হেনে, উধাও হয়ে যাচ্ছে নীল নির্জন ঝকঝকে আকাশে।

কি একটা পাখি ডাকছিল দূর থেকে। চিঁহা...চিঁহা...চিঁহা...চিঁহা...চিঁহা...চিঁউ...চিঁউ...চিঁউ।

মহুয়া অবাক হয়ে শুধোল, এটা কী পাখি?

মংলু বিজ্ঞের মতো বলল, তিত্তর। আগে ডাক শোনেননি?

মহুয়া বাচ্চা মেয়ের মতো সরল হাসি হাসল। বলল, কখনও না।

মহুয়ার মন এক দারুণ ভালোলাগায় ভরে গেছিল। এই পরিবেশে, অত্যন্ত স্বল্প পরিচিত একটা মানুষ, কিন্তু যার প্রথম পরিচয়ের শিকড় অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত হয়ে গেছে মহুয়ার ভেতরে সেই সুখনের জন্য এই নিজে হাতে খাবার বয়ে নিয়ে যাওয়া, অপরিষ্কার জীর্ণ রান্নাঘরে চা বানানো উবু হয়ে বসে—এ-সবের মধ্যেও একটা ভীষণ আনন্দ পেয়েছিল। নিজেকে কষ্ট দিয়ে অন্যকে আনন্দিত করতে যে এমন অভিভূত হতে হয় তা ও আগে কখনও জানেনি।

আনন্দ আর সুখ এ দুই অনুভূতি একই পাড়ার বাসিন্দা ছিল আগে ওর মনে। এরা যে সম্পূর্ণ বে-পাড়ার লোক মহুয়া জানত না। প্রথম জানল।

কুমার তাকে অপমানসূচক কথা বলার পরেই কারখানায় গিয়ে, মিস্ত্রিদের কাজ-টাজ বুঝিয়ে সুখন উধাও হয়ে গেছিল। একমাত্র মংলু জানত ও কোথায় যায়; যেতে পারে। কালুয়াকে আর দেখা যায়নি তারপর। মানে, সুখন চলে যাওয়ার পর থেকে।

মংলু বলছিল, কালুয়া ওস্তাদকে এত ভালোবাসে যে, ওস্তাদ বলছে, ওস্তাদ মরে গেলে তাকে শাকুয়া-টুঙে কবর দিয়ে কালুয়ার জন্য তার পাশেই যেন একটা ঘর বানিয়ে দেয় মিস্ত্রিরা।

মহুয়া মংলুকে শুধোল, এই শাকুয়া-টুঙ ব্যাপারটা কি?

উত্তরে মংলু উৎসাহের সঙ্গে বলল, শাকুয়া-টুঙ শালবনের মধ্যের একটা টিলার চুড়ো। সেখানে বসে পুরো পালামৌ জেলার এবং হাজারিবাগ জেলারও কিছু জঙ্গল চোখে পড়ে। ওস্তাদ ওখানে একটা ছোট্ট ঘর বানিয়েছে। মাটির দেওয়াল, মাটির মেঝে, উপরে ঘাস। বেশিরভাগ ছুটির

দিনে, অথবা মনে দুঃখ-টুঃখ হলে ওস্তাদ ওখানে গিয়ে কাটায়। কোনো-কোনোদিন সারারাতও থাকে।

মহুয়া অবাক হবে বলল, বাবু সেখানে করেন কি?

মংলু তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, কী-সব লেখাপড়ি করে চুপ করে বসে থাকে।

আর খান কী? মহুয়া আবার শুধোল।

কিছুই না। মহুয়ার দিনে মহুয়ার ফল চিবোয়। পিপাসা পেলে নিচের ঝরনায় গিয়ে জল খায়। ওস্তাদ বলে—'বুঝলি মংলু, আমি হচ্ছি ময়াল সাপের জাত। একবার খেলে বহুদিন আমার খেতে হয় না।'

মংলুর সঙ্গে কথা ছিল মহুয়াকে সুখনের কাছে পৌছে দিয়ে ও দৌড়ে ফিরে যাবে। কুমার আর বাবাকে বিকেলে চা-জলখাবার করে দেবে। আর ঘুণাক্ষরেও জানাবে না কাউকে যে, মহুয়া কোথায় গেছে। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে যে বড়ো রাস্তার দিকে যেতে দেখেছে ও দিদিমণিকে। যাওয়ার সময় দিদিমণি ওকে বলে গেছেন—একটু বেড়িয়ে আসছি, সন্ধ্যার আগেই ফিরব।

আর একটু এগোতেই টিলাটার কাছাকাছি এল ওরা। এমন সময় দুরে কোথা থেকে মাদলের আওয়াজ ও একটানা ঝিম-ধরা গানের সুর শোনা গেল। কিছু অসংলগ্ন দূরাগত কথাবার্তা। পুরুষকণ্ঠই বেশি—স্ত্রীকণ্ঠও ছিল, মাদল মাঝে মাঝে থামছে—টুকরো টুকরো কথার পরই আবার বেজে উঠছে।

মংলুকে শুধোতে সে বলল যে, কোনো শাদি-টাদি আছে বোধ হয়। নিচে ছোট্ট একটা বস্তি আছে গঞ্জুদের।

ওরা ছোটো টিলাটা চড়তে শুরু করেছে পাকদণ্ডি পথ দিয়ে, এমন সময় একটা মোড় ঘুরতেই মহুয়া হঠাৎই সুখনের একেবারে মুখোমুখি এসে পড়ল। সুখন হনহনিয়ে কোথায় চলেছিল, বোধহয় কারখানার দিকেই। ধাক্কা লাগছিল আর একটু হলে।

সুখন হঠাৎ মহুয়াকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল।

বলল, এ কী? কি ব্যাপার? আপনি এখানে কেন?

তারপরই আবার বলল, এটা কি একটু বাড়াবাড়ি হল না?

মহুয়ার আনন্দ, উৎসাহ সবই এক মুহূর্তে নিভে গেল। রোদে হেঁটে ওর সমস্ত মুখ লাল হয়ে গেছিল।

কিন্তু সুখন মহুয়ার অমন সুন্দর, ভালোলাগা আর ভালোবাসায় মোহিত অমন অনুতাপ-কাতর মুখটির দিকে একবার তাকালও না।

অন্যদিকে চেয়ে বলল, কি রে মংলু? তোকে কে আনতে বলেছিল দিদিমণিকে এখানে? মেরে শালা তোর দাঁত ভেঙে দেব!

মংলু ভয়ে সিটিয়ে গেল।

কালুয়া সুখনের পায়ে-পায়ে এসেছিল—সে-ও সুখনের রাগ দেখে কেঁউ কেঁউ করে উঠল।

সুখন ধমক দিয়ে বলল, বল কে আনতে বলেছিল?

মংলুকে আড়াল করে হতভম্ব মহুয়া মুখ তুলে বলল, এটা অন্যায়। কিছু বলার থাকলে আমাকে বলুন। ওর কী দোষ?

তখনও সুখন অন্যদিকেই মুখ ঘুরিয়ে ছিল।

বলল, দেখুন, ন্যায়-অন্যায় আমাকে শেখাবেন না। এখন ভালোয় ভালোয় এখান থেকে চলে যান। বলেছি তো, আপনাদের গাড়ির পার্টস এলেই ঠিক করে দেব। ভাঙা হোক, যাই-ই হোক, আমারই বাড়ি থেকে তো অন্যায়ভাবে অপমান করে আপনারা আমাকে তাড়ালেন—তবু সুখন

মিস্ত্রির কি একটু নিরিবিলি থাকারও উপায় নেই—নাকি গাড়ির মালিকদের কাছে তামাম জিন্দগী বিকিয়েই বসে আছে সে?

পরক্ষণেই, সোজা মহুয়ার চোখে তাকিয়ে ধমকের গলায় সুখন বলল, কী চান কি আপনারা সবাই, আপনি; অমার কাছে। বলতে পারেন, কী চান?

মহুয়া মুখ নামিয়েই ছিল।

মংলু সুখনের এই ব্যবহারের কারণ বুঝতে না পেরে অত্যন্ত ব্যথিত মুখে জঙ্গলের দিকে তাকিয়েছিল, কাঁধে থার্মোফ্লাস্ক ঝুলিয়ে আর হাতে খাবার নিয়ে।

মহুয়া মুখ তুলে সুখনের দিকে তাকাল।

হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকের মতো সুখন মুখ তুলে আবিষ্কার করল; আবিষ্কার করল মহুয়াকে। আবিষ্কার বলব না, বলা উচিত পুনরাবিষ্কার করল। আবিষ্কার তো কাল রাতের লণ্ঠনের আলোতেই সে করেছিল।

সুখন তার অন্তরের অন্তরতম তলে অনুভব করল যে, ওর দিকে আজ পর্যন্ত কখনও কোনো নারী এমন চোখে তাকায়নি।

সুখন দেখল দু' ফোঁটা জল মহুয়ার চোখের পাতার চিকন-কালো গভীরে টলটল করছে—শীতের সকালের গোলাপের পাপড়ির গায়ের শিশিরের মতো উজ্জ্বল নির্মল। তার মুখ, কপাল, গাল যেন এতখানি রোদে হেঁটে এসে লাল হয়ে উঠেছে পদ্মকলির গোড়ার দিকের কোমল লালে। সুখনের খুব একটা ইচ্ছে করেছিল। মংলু সামনে না থাকলে, সে ইচ্ছেকে ও সফল করত—করতই—। ইচ্ছে করছিল, দুটি চকিত চুমুর উত্তাপের বাষ্পে মহুয়ার সেই দু চোখের জল ও শুষে নেয়; মুছে দেয়!

সুখন মহুয়ার চোখে চোখ রেখেই স্তব্ধ হয়ে গেল।

দু ফোঁটা জল চোখ ছাড়িয়ে, গাল গড়িয়ে, বুক টপকে এসে লাল মাটিতে পড়ল। রুক্ষ মাটি মুহূর্তে তা শুষে নিল।

সুখন অপ্রস্তুত অপ্রতিভ গলায় বলল, যাঃ বাবা! এ আবার কি? মহাঝামেলা দেখছি।

বিশ্বাস করুন—বলেই ওর দু হাত মহুয়ার দু বাহুতে রাখবে বলে হাত উঠিয়েই পরক্ষণেই অবাক মংলুর দু কাঁধে রাখল। রাখল তো না, যেন থাপ্পড় মারল।

এবার বলল, কিরে মংলু, সেই সকাল থেকে কিছু খাইনি। কিছু খেতে দিবি, না হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবি?

বলেই মহুয়াকে উদ্দেশ করে বলল, আসুন আসুন এতদূর যখন আমারই জন্য, এ-হতভাগাকেই খাওয়াবেন বলে এলেন, তখন চলুন আমার ডেরাটা দেখে যাবেন।

সুখন আগে আগে চলতে লাগল। একটু উঠেই ঘরটা চোখে পড়ল। জায়গাটার তুলনা নেই। ঘরটারও না। লাল ও হলুদ, মাটির দেওয়াল, তাতে নানা রকম আদিবাসী মোটিফ আঁকা! পরিষ্কার করে গোবর-নিকোনো বারান্দা।

সামনেটাতে কি এক মন্ত্রবলে যেন পৃথিবী হঠাৎ বেঁটে হয়ে গিয়ে এই মালভূমির পদপ্রান্তে নেমে গেছে—প্রায় পাঁচশ ফিট—নেমে গিয়েই যেন গড়িয়ে গেছে শ'য়ে শ'য়ে মাইল সবুজ, ঘন সবুজ, হলদেটে-সবুজ, লালচে-সবুজ এবং পত্রশূন্যতার পাটকিলে রঙা জমাট-বুনন গালচে হয়ে গড়াতে-গড়াতে চতুর্দিকে যতদূর চোখ যায়, বিস্তৃত হয়ে গিয়ে দিগন্ত-রেখার তিন সীমানায় পৌঁছেছে।

ঘরটা ছোটো। একদিকে একটা চৌপাই—বারান্দায় একটা দড়ির ইজি-চেয়ার। শালকাঠের বুক-র‍্যাক। তার উপর কিছু বইপত্র। কোনায় মেটে কলসি; জল রাখার।

ঘরে পৌঁছে সুখনের মেজাজটা একটু শান্ত হল মনে হল। শামুক যেমন অভ্যন্তরে তুলতুলে থাকে, তেমন তার স্বাভাবিক নম্রতার স্বভাবে ফিরে গিয়ে, বাইরের শক্ত খোলস তুলে গিয়ে সুখন বারান্দার কোনায় বসে বলল, দে মংলু, খেতে দে।

মহুয়া মুখ নামিয়েই বলল, এবার মংলুকে ছুটি দিলে ভালো হত। মংলুর ওখানে কাজ আছে। মংলু মতো অত ভালো না পারলেও, আপনাকে খাবারটুকু দিতে পারব আশা করি।

সুখন চকিতে মুখ তুলে মহুয়ার দিকে তাকাল। মহুয়া যে সুখনকে একা চায় এ-কথা বুঝল ও। অনভ্যস্ত ভালো-লাগায় সুখনের বুকটা মুচড়ে উঠল।

মুখে বলল, আপনার বাবাকে, কুমারবাবুকে খাবার-টাবার দিতে হবে—তাই না। তারপর বলল, যারে মংলু, তুই যা।

মংলু মহুয়ার দিকে তাকাল। অনেকক্ষণ পর ওর মুখে হাসি ফুটল। বলল, চললাম দিদিমণি।

কেন জানে না, মংলু এই দিদিমণির প্রেম পড়ে গেছে—একজন বারো-তেরো বছরের দেহাতি সরল ছেলের দাবিহীন মিষ্টি প্রেম।

যেতে নেই; এসো।—মহুয়া বলল মংলুকে।

নড়বড়ে দড়ির ইজিচেয়ারটা এনে পেতে দিল সুখন। বলল, বসুন। কিন্তু হেলান দিয়ে বসবেন না; ছারপোকা আছে।

মহুয়া হাসল। বলল, আপনি কোথায় বসবেন?

এই যে—বলেই সুখন জিনস-পরা অবস্থাতেই মাটির বারান্দার উপর আসন করে বসে পড়ল।

মহুয়া বলল, খুব খিদে পেয়েছে, না? পায়নি খিদে?

খিদে? না না। আমার খিদে-টিদে সব মরে গেছে। মেরে ফেলেছি।

তারপর একটু থেমে উদাস গলায় বলল, সব খিদেই।

সুখনের সামনে মাটিতে বসে পড়ে, শালের দোনার বাঁধনটা ঢিলে করতে করতে মহুয়া বলল, কার উপর এত অভিমান? খালি পেটে চা আর জরদা-পান খেয়ে কী প্রমাণ করতে চান আপনি?

সুখন হাসল।

দারুণ দেখাল হাসিটা—অন্তত মহুয়ার চোখে।

সুখন বলল, প্রমাণ কিছুই করার নেই। জ্যামিতির অঙ্ক মেলানোর দিন চলে গেছে। বলতে পারেন, এখন যা কিছুই করি তার সবটাই কিছু অপ্রমাণ করা জন্য।

মহুয়া চুপ করে থাকল একটু। সুখন মিস্ত্রির হঠাৎ-উত্তরের অভাবনীয়তায় অবাক হয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ।

তারপর বলল, পুরিগুলো ঠান্ডা হয়ে গেছে! যে ঠান্ডা খাবার দেয়, তার খারাপ লাগে। তাছাড়া, ঠান্ডা কেউ কি খেতে পারে?

আমি পারি।—সুখন বলল।

তারপর খেতে খেতে বলল, আমাকে খাওয়াতে আপনার খারাপ লাগছে হয়তো, আমার কিন্তু আপনার হাতে থেকে ভারি ভালো লাগছে। এমন আদর করে কেউ আমাকে কখনও খাওয়ায়নি। মা-র কথা মনে নেই। তারপর তো স্কুল-কলেজের হস্টেলেই কেটেছে।

মহুয়ার চোখের দৃষ্টি নরম হয়ে এসেছে। বাইরে রোদের তাপও নরম হয়েছে। হাওয়ার তোড় কমে আসছে। লম্বা হয়ে শাল-সেগুনের ছায়া নামছে জঙ্গলে। নিচ থেকে নানারকম পাখির ডাক ভেসে আসছে মাদলের আওয়াজের সঙ্গে মিশে।

মহুয়া বলল, খান তো; ভালো করে খান। বাড়িতে একটু আচার-টাচার রাখেন না কেন?

আচার?—বলেই একটু হাসল সুখন।—বলল, আচার-টাচার তাদেরই মানায়, খাওয়াটা যাদের কাছে একটা বিরাট ব্যাপার, মানে, সুখের ব্যাপার। আমরা খাই তো খেতে হয় বলে। গরমের দিন

মাসের পর মাস বিউলির ডাল আর একটা তরকারিতে চলে। শীতের দিনে প্রায় রোজই খিচুড়ি, সঙ্গে আলু কি বেগুনভাজা। খাওয়া ব্যাপারটাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কোনো মানেই দেখি না আমি। তারপর একটু থেমেই বলল, খুবই সুখের বিষয়, মংলুও দেখে না।

বেশ। এবার খান। খাওয়ার সময় অত কথা বলতে নেই। হজম হবে না। বলেই মহুয়া উঠে ঘরে গিয়ে কুঁজো থেকে গড়িয়ে চটে-যাওয়া কলাই-করা একটা গ্লাসে করে জল নিয়ে এল।

সুখন বলল, খাওয়ার সময় জল খাই না। তারপরেই বারান্দার কোণে নামিয়ে রাখা ফ্লাস্কের দিকে চেয়ে বলল, ফ্লাস্কে কি?' চা? তাহলে খেয়ে উঠে চা খাব।

মহুয়া বলল, আমি তাহলে জলটা খাই? ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে।

খাওয়া থামিয়ে সুখন বলল, পাবেই তো! অতখানি পথ, রোদে। তার উপর আপনাদের তো অভ্যেস নেই। কেন যে এত কষ্ট করলেন, বুঝলাম না। কুমারবাবু খারাপ ব্যবহার করেছেন আমারই সঙ্গে। তাতে আপনার অপরাধবোধ কেন? আপনি না থাকলে ও-ইঁদুরটাকে মেরে দু-পা ধরে তুলে পুরোনো মবিলের টিনে মুখ চুবিয়ে দিতাম। সুখন মিস্ত্রিকে চেনে না! শুধু আপনার জন্য, আপনারই জন্য সহ্য করতে হল; করলাম।

মহুয়া জল খেয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে বলল, কেন? আমার জন্যই বা কেন? আমি আপনার কে?

সুখন খাওয়া থামিয়ে মুখ তুলল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। কী বলবে, ভেবে পেল না। তারপর বলল, কেউ নন। কেউ নন বলেই তো!

একটু ভেবে বলল, হঠাৎ এসে পড়লেন, একদিনের মেহমান।

খেতে খেতে সুখন মনে মনে বলল—কেন জানি না, আপনাকে দেখার পর থেকেই কেমন হয়ে গেলাম। আমার মধ্যে যে এতসব নরম ব্যাপার-ট্যাপার ছিল, আমি জানতাম না। গাড়ির শখ অ্যাবজর্বারের মতো আমার মনটাও একটা যন্ত্র হয়ে গেছিল। কোনোরকম আনন্দ বা দুঃখই আর সাড়া জাগাত না তাতে। এক দিনের জন্য এসে আমার সব গোলমাল করে দিলেন।

তারপরই চোখ তুলে মহুয়ার দিকে অনেকক্ষণ পূর্ণদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলল, কেন এলেন বলুন তো?

মহুয়া মুখ নামিয়ে চুপ করে রইল। কথা বলল না কোনো। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল।

মনে মনে ও নিজেকে বলল—আমিই কি জানতাম যে আমি এমন? আমি তো নিজে আসিনি। পুরো ব্যাপারটাই বুঝি প্রি-কন্ডিশানড।

তারপর বলল, আপনার তো নাম সুখ। এখানে স্থানীয় লোকেরা আপনাকে সুখন বলে ডাকলে ডাকুক, আপনি নিজেও নিজেকে সুখন বলেন কেন? বিচ্ছিরি শোনায়।

কি জানি? কখনও ভেবে দেখিনি। সুখ নামটা হয়তো আমাকে মানায় না বলে।

মহুয়া কথা কেড়ে নিয়ে বলল, সুখরঞ্জন তো একেবারেই মানায় না। আমি কিন্তু আপনাকে সুখ বলে ডাকব।

সুখন বিদ্রূপের হাসি হাসল। বলল, ক-ঘণ্টা। আর ক-ঘণ্টা থাকছেন এখানে। সুখ বা অসুখ যা আপনার ইচ্ছে, তাই বলেই ডাকতে পারেন। যে নামেই ডাকুন না কেন, এখান থেকে চলে গেলেই লোকটাকে ভুলে যাবেন। মানুষটাকেই যখন মনে থাকবে না, তখন একটা নাম নিয়ে এত তর্ক কিসের?

আপনি জানেন, আপনি সবই জানেন, না?

কি জানি! সুখন শুধোল।

তারপর আবার বলল, বোধহয় জানি। কিন্তু যা জানি, সেটা ঠিক কি না জানি না।

তারপরই গেঞ্জির হাতায় জংলির মতো মুখ মুছে বলল, চা দিন।

মহুয়া এতক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিল মানুষটার ছটফটে, ছেলেমানুষি স্বভাব। বয়স হয়েছে; কিন্তু বড়ো হয়নি একটুও।

কালুয়া দূরে তিন-ঠ্যাঙে বসে একদৃষ্টিতে সুখনের খাওয়া দেখছিল। সুখন শালপাতা মুড়ে একটা পরোটা ও মেটের তরকারি দিয়ে এল তাকে পলাশ গাছের গোড়ায়। খাবারটা দিতে গিয়ে সামনে তাকিয়েই থমকে দাঁড়াল। মহুয়ার দিকে ফিরে বলল, দেখেছেন? বেলা পড়ে যাওয়াতে কেমন দেখাচ্ছে সামনেটা এখান থেকে?

মহুয়া তাকাল ওদিকে। ধুলোর ঝড়ের মধ্যে, প্রখর উষ্ণ ঝাঁজের মধ্যে পলাশের লাল বুঝি এতক্ষণ ঝাপসা ছিল। সারা দুপুর আগুনে পুড়ে সব খাদ ঝরে গেছে সোনার এখন লালে একটা নরম স্নিগ্ধতা লেগেছে। লালের ছোপে-ছোপে সবুজের মহিমা আরো খুলেছে যেন।

ও বলল, সত্যি! আপনার এই শাকুয়া-টুঙ-দারুণ!

ফ্লাস্ক খুলতে-খুলতে একদৃষ্টে ওদিকে চেয়ে মহুয়া জীবনে এই প্রথমবার জানল, ওর সাতাশ বছর বয়সে যে, প্রকৃতির কী দারুণ প্রভাব মানুষের মনের উপর! এই উদার উন্মুক্ত জঙ্গলে যার যা-কিছু দাবি আছে সবই বুঝি দিতে পারা যায় কাউকে, কিছুই বাকি না রেখে।

সুখন ফ্লাস্কের ঢাকনিতে চা নিল। পরক্ষণেই মহুয়ার কথা মনে হওয়াতে ও বলল, আপনি এটা নিন, আমাকে গ্লাসেই চা ঢেলে দিন।'

না না। ঠিক আছে। মহুয়া বলল।

সুখন কঠিন কলায় বলল, কথা শুনতে হয়। আপনি আমার চেয়ে অনেক ছোটো।

ই-শ—! কতই যেন ছোটো। ঠোঁট উলটো মহুয়া বলল।

হাসতে হাসতে সুখন বলল, অনেক ছোটো। দশ-বারো বছরের ছোটো তো বটেই।

আহা, মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি ম্যাচিয়োরড হয়। এই ডিফারেন্সই নয়।

হুমম—বলল সুখন।

পরক্ষণেই চায়ে চুমুক দিয়েই চমকে উঠে বলল, চা কে বানিয়েছে? এ তো মংলুর হাতের চা নয়? আপনি?

মহুয়া মুখ নামিয়ে বলল, কেন? খারাপ হয়েছে?

সুখন পুলকভরে বলল, খারাপ কি? দারুণ হয়েছে। একেবারে টাটী-ঝারীয়ার পণ্ডিতজির দোকানের চায়ের মতো ফারস্ট ক্লাশ।

চা খাওয়া হলে, মহুয়া ব্যাগ হাতড়ে কাগজের মোড়ক বের করল একটা। বলল, এই নিন।

সুখন হাত বাড়িয়ে নিল।

মহুয়া ঠোঁট টিপে হাসছিল।

আবার বলল, এই নিন, এটাও; আমি আপনাকে দিলাম, আমার প্রেজেন্ট। বলেই, ছোটো টিনটা এগিয়ে দিল সুখনের দিকে।

হাসছিল সুখনও। প্যাকেটের মধ্যে পান এবং একশো-বিশ জরদার আস্ত একটা টিন পেয়েই, খুশিতে ওর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বলল, একি? কোত্থেকে পেলেন?

মহুয়া বলল, কি কিম্ভূতকিমাকার নাম রে বাবা। একশো বিশ!

সুখন হাসল। বলল, চারশো বিশ হলে খুশি হতেন?

দুজনেই হেসে উঠল। তারপর দুজনেই অনেকক্ষণ চুপচাপ।

বেলা পড়ে এসেছিল। রোদের তেজ নেই আর। পশ্চিমাকাশে ম্লান একটা গোলাপি আভা ঝুলে রয়েছে। শাকুয়া-টুঙে বসে অস্তগামী সূর্যকে তখনও দেখা যাচ্ছে। আর তারই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে উলটোদিকে উদীয়মান চাঁদ। দোলের আর তিনদিন বাকি। সূর্য আর চাঁদে মিলে পৃথিবীকে চব্বিশঘণ্টাই উজালা করে রাখবে বলে স্থির করেছে যেন।

এখানের এই এক মজা। দিনে যত গরমই থাক না কেন, আলোটা কমে আসতেই কেমন শীত-শীত করতে থাকে। অন্ধকার হয়ে গেলে তো কথাই নেই। তখন পাতলা সোয়েটার বা চাদর থাকলে, বাইরে বসতে ভালো লাগে।

চা খেয়ে, পান খেয়ে, একটা সিগারেট ধরিয়ে সুখন চুপ করে পেছনে একপাশে বসে মহুয়াকে দেখছিল।

মহুয়া বারান্দাটার সামনের দিকে বসে নিচের উপত্যকার দিকে চেয়েছিল।

মহুয়ার মদের নেশা যেন সুখনকে এখানে বহু রাত ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, তেমন মহুয়া নামের এই মেয়েটির আশ্চর্য সান্নিধ্যের আমেজ ওকে যেন আরো কোনো তীব্রতর নেশায় আবিষ্ট, আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। মহুয়াকে অবশ করেছে এই প্রকৃতি, এই হঠাৎ-দেখা, হঠাৎ কাছে-আসা, রুক্ষ, ছেলেমানুষ ও বর্বর পুরুষটি। মহুয়ার সাতাশ বছরের জীবনের পরমপুরুষ।

অনেকক্ষণ এমনি করেই দুজনে চুপ করে বসেছিল। দুজনে বারান্দার দুদিকে, আগে পিছনে! মধ্যে অনেকখানি ব্যবধান। ব্যবধান শুধু ভূমির নয়, অনেক কিছুর।

বাইরে দিনের নিভন্ত রং, সন্ধের আসন্ন তরল অন্ধকার, চাঁদের ফুটন্ত আলো, ঘরছাড়া টিটি পাখির বুক-চমকানো ডাক ও ঘরে-ফেরা টিয়ার দলের তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মতো স্বগতোক্তি, সব মিলে-মিশে ভেঙে-চুরে যখন দারুণ কোনো একটা মিশ্র ও অলৌকিক আবেশের সৃষ্টি হচ্ছে ধীরে ধীরে—চুপিসারে—প্রকৃতির আধো-খোলা বুকের মধ্যে, তখন সুখন আর মহুয়ার বুকের মধ্যেও অনেক কিছু বোধ-সংস্কার, আনন্দ-দুঃখ, পাহাড়ি নদীর স্রোতের মধ্যের তাণ্ডবে গড়াতে থাকা ক্ষয়িষ্ণু নুড়িগুলোরই মতো ক্রমান্বয়ে ভাঙচুর হচ্ছিল। ওরা কেউই চেতনে ছিল না। অবচেতনের আশ্চর্য কুঠুরিতে এক পরিপূর্ণতায় স্বপ্নে ওরা দুজনেই ডুবে গেছিল। ওরা দুজনে ভাঙচুর হচ্ছিল যে-যার মনের মধ্যে। একের ভাবনা অন্যে জানছিল না। ভাবনা তা দেখানো যায় না। দু জনের অজানিতে, এই ফিশফিশে গুমরানো বনজ বাতাসে ওরা একে-অন্যের পরিপূরক হয়ে উঠছিল।

নীচের নদীর অন্ধকার খোলে-খোলে প্যাঁচা ডেকে ফিরছিল—কিঁচর কিঁর, কিঁ-চিঁ-কিঁ-চিঁ-কিচর—। ওদের কানে আসছিল অথচ সে ডাক কানে আসছিলও না। এক নিষিদ্ধ অথচ নির্মল আত্ম-অবলুপ্তির মধ্যে ওরা দু জনেই দু জনের সান্নিধ্যের নরম নেশায় যেন বেদম বুঁদ হয়েছিল।

কতক্ষণ যে ওরা ওইভাবে বসেছিল, ওরা কেউই জানে না। যখন হুঁশ হল তখন একেবারে বেলা পড়ে গেছে। নিচু থেকে নানারকম রাত-চরা পাহাড়ি পাখি ডাকছে। চারদিকে বারান্দায়, উপত্যকায় তরল সুগন্ধি ক্ষণিক অন্ধকার তখন।

আলোর মধ্যে ওরা নিরুচ্চার ছিল। অন্ধকারে ওদের দুজনেরই মন কিছু বলার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে।

হঠাৎ নিচের পাহাড়ি নদীর খোল থেকে হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে একটা ভয়-পাওয়ানো বুক-চমকানো ডাক ভেসে এল।

মহুয়া ভীষণ ভয় পেয়ে, কী করবে ভেবে না পেয়ে এক দৌড়ে সুখনের একেবারে কাছে চলে এল।

দেওয়ালে হেলান দিয়ে, দু-পা সামনে ছড়িয়ে বসেছিল সুখন। কাকে এই সমর্পণ জানে না সুখন। কিন্তু এমন সমর্পণী অবস্থায় কখনো ও নিজেকে অবিষ্কার করেনি।

সুখন ওর সবল ডান হাতে মহুয়াকে অভয় দিয়ে ওকে কাছে টেনে বসাল।

মহুয়ার বুক ওঠা-নামা করছিল সত্যি-সত্যি-সত্যি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল ও।

সুখন মহুয়ার রেশমি-চুলের মাথাটি ওর বুকের কাছে নিয়ে এসে ডান হাত দিয়ে ওকে আশ্বাসে, অভয়ে, বড়ো যতনভরে জড়িয়ে রইল।

ফিশফিশ করে বলল, ভয় পেয়েছেন?

লজ্জা, ভয়, এই হঠাৎ অভাবনীয়ভাবে সুখনের বুকে আসার আনন্দ সব মিলিয়ে মহুয়া অস্ফুটে বলল, হুঁ।

সুখন কথা বলল না কোনো। ওর থুতনিটা মহুয়ার সিঁথির উপর ছুঁইয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ।

মহুয়া মুখ তুলে এক সময় বলল, ওটা কিসের ডাক?

হায়নার। সহজ গলায় বলল সুখন।

আপনি এখানে একদম একা-একা থাকেন ভয় করে না আপনার?

কিসের ভয়? কোনোরকম বাহাদুরি না দেখিয়েই বলল সুখন।

তারপর বলল, আপনি একা থাকলেও ভয় করত না! থাকলেই অভ্যেস হয়ে যেত।

তারপর কথা ঘুরিয়ে বলল, আপনি আশ্চর্য মেয়ে। এই রাতে বনের হায়নাকে ভয় পেলেন, আর এই অশিক্ষিত লোকটাকে, যে লোকটার সঙ্গে আপনার কোনো ব্যাপারেই, কোনোদিকেই মিল নেই, সেই মিস্ত্রিটার সঙ্গে রাতের বেলায় এখানে থাকতে ভয় পেলেন না? আপনাকে সত্যিই বুঝতে পারলাম না। আপনি ভীষণ অন্যরকম।

আপনিও—মহুয়া ভয় কাটিয়ে উঠে বলল।

সুখন বলল, আমি যদি আপনাকে নিয়ে ওই সামনের গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যাই, তখন কী করবেন?

কিছুই করব না। স্পষ্ট গলায় মহুয়া বলল।

তারপরই বলল, পারবেন? আমাকে নিয়ে সত্যিই পালাতে পারবেন? তাহলে বুঝব আপনার সাহস কত? আমি কিন্তু পালাতে পারি! এমন সুন্দর জায়গা—আহা!

আশ্চর্য! বলেই সুখন উঠে দাঁড়াল।

উঠে প্যান্টের পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাল। সুখনকে রীতিমতো চিন্তিত দেখাচ্ছিল। ওর মনে হল, এমন চিন্তায় ও জীবনে আগে পড়েনি। ওর সমস্ত বুদ্ধি দিয়েও মহুয়াকেও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারল না। এই মুহূর্তে নিজেকেও না।

ও পায়চারি করতে লাগল বারান্দায়—সিগারেট টানতে টানতে।

মহুয়া আড়চোখে দেখছিল সায়ান্ধকারে জ্বলন্ত সিগারেটের আগুনটা একবার বাড়ছে আর একবার কমছে।

সিগারেট খাওয়া শেষ করে, হঠাৎ আগুনটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল সুখন।

কালুয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘরে সামনে শুয়েছিল। ও হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল—যেমন অদ্ভুত দীর্ঘশ্বাস একমাত্র কুকুররাই ফেলতে পারে।

কালুয়ার দিকে এক ঝলক তাকিয়েই সুখন সহজ গলায় বলল, চলুন এবার যাওয়া যাক। আপনার বাবা ও কুমারবাবু চিন্তা করবেন। ইতিমধ্যে ওঁরা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন নিশ্চয়ই।

মহুয়া বলল, এখন না। এখুনি আমি যাব না। আমি এখানে থাকব।

তারপর হঠাৎ ধরা-গলায় আবার বলল, আমি এখানেই থাকব।

সুখনের মনে হল, 'এখানেই' এবং 'থাকব' কথা দুটির উপর অস্বাভাবিক জোর দিল মহুয়া!

সুখন দৌড়ে এল মহুয়ার কাছে! এসে মহুয়ার চোখে খুব কাছ থেকে তাকাল।

মহুয়া ওর চোখে চাইল। অস্ফুটে বলল, আমি কিন্তু সত্যি-সত্যিই থাকব সত্যি।

সুখন হেসে ফেলল। বলল, পাগলি। আপনি একেবারে পাগলি। কী যে বলেন, তার ঠিক নেই।

মহুয়া রাগ করে, জেদ ধরে বলল, আমি যা বলছি, অনেক ভেবে বলছি।

তারপরই বলল, আমাকে বুঝি আপনার অপছন্দ?

সুখন ওর ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে ওর ঠোঁট বন্ধ করে দিল। বলল, এবারেই ঠিক বলেছেন।

তারপর বলল, আপনাকে অপছন্দ করবার মতো লোক কি কেউ আছে? কিন্তু আপনি কী বলছেন, আপনি জানেন না। আমি কী, কেমন লোক, কী পরিবেশে থাকি, কিরকম মিস্ত্রিগিরি করি সবই তো নিজের চোখে দেখলেন—তারপরও কি করে বলি যে, আপনি সুস্থ? আপনার সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

সুখন অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমাকে কষ্ট দিয়ে আপনার কী লাভ? কালই তো গাড়ি সারানো হয়ে গেলে চলে যাবেন—আমি যা, যেমন আছি, তাই-ই থাকব। আমি থেমে থাকা গাড়ি সারাই—এই-ই আমার কাজ।

তারপরই একেবারে চুপ করে গেল সুখন।

মহুয়া তেমনই দাঁড়িয়ে রইল ওর সামনে নিথর হয়ে।

দীর্ঘ নীরবতার পর সুখন বলল, সব গাড়িই সারানো হয়ে গেলে এক সময় ধুলো উড়িয়ে, হর্ন বাজিয়ে চলে যায়। আমি যেখানে থাকার সেখানেই থাকি, থাকবও। আমার সঙ্গে এতবড়ো রসিকতা করবেন না। প্লিজ, আপনাকে বারণ করছি, এমন করবেন না।

মহুয়া সুখনের কাছে সরে গিয়ে ভীষণ রেগে গিয়ে বলল, কি? আমি রসিকতা করছি?

মহুয়ার ছোট্ট কপালের মস্ত টিপটার অর্ধেক মুছে গেছিল, এক কোমর চুলের খোঁপাটা ভেঙে গেছিল—কপালের চুল লেপটে ছিল কানের পাশে। ওর নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠেছিল, চোখে আগুন জ্বলছিল।

মহুয়া বলল, ভিতু ভীষণ ভিতু আপনি।

সুখন কী করবে ভেবে পেল না। কী করবে, কেমন করে ওর অন্তরের তীব্র আনন্দ এবং অসহায়তা ও মহুয়াকে বোঝাবে তা বুঝতে পারল না।

সুখনের ইচ্ছে হল অনেক কিছু বলে, কিন্তু কিছুই না বলে ও চুপ করে রইল।

মহুয়া ঝাঁপিয়ে এসে সুখনের বুকে ওর নরম হাতের ছোট্ট ছোট্ট মুঠি দিয়ে বারবার আঘাত করতে লাগল। বলতে লাগল, ভিতু কাপুরুষ!

সুখন কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

চাঁদটা আরো উপরে উঠেছে এটা হলুদ থালার মতো। হলুদ চাঁদের আলোয় বিশ্বচরাচর ভরে গেছে। সন্ধের পর থেকেই যে ঠান্ডা হিম-হিম ভাবটা বনে-পাহাড়ে ভরে যায়, তাতে মহুয়া করৌঞ্জ আর শালফুলের গন্ধ মিশে গেছে। পাশ থেকে একটা কোকিল নাভি থেকে স্বর তুলে ডাকছে—কুহু-কুহু-কুহু-কুহু—দূর থেকে তার সঙ্গিনী সাড়া দিচ্ছে শিহর তুলে—কুহু-কুহু-কুহু।

সুখনের মাথার মধ্যে একজন মিস্ত্রি হাতুড়ি পিটিয়ে কোনো গাড়ির বাঁকা মাডগার্ড সিধে করছিল ক্রমান্বয়ে—হাতুড়ির পর হাতুড়ি মেরে।

সুখন সেই সুন্দরী হাওয়া-লাগা আমলকী বনের মতো থরথর করে ভালোবাসায় কাঁপতে থাকা সুগন্ধি মহুয়ার দিকে একবার ভালো করে চাইল! তারপরই তার হাত ধরে বলল, চলুন।

সুখনের মনে হল, সে তার জন্মস্থানের গ্রহ-নক্ষত্রের নির্ভুল নির্বন্ধ-র দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। এই গন্তব্য যেন বহুদিন আগে থেকেই নির্দিষ্ট ছিল।

সুখন নিজেকে বুঝতে পারল না। সুখনের মনে হল, এই বড়োলোকের বেড়াতে-আসা মেয়েটি—সুখনের অনেকানেক জমিয়ে রাখা অপমানের গ্লানি, অসম-ব্যবহারের ক্রোধ—এই সবকিছুকে নিবিয়ে ফেলার সুযোগ দিতে এসেছে।

সুখনের চোখ জ্বলে উঠল মুহূর্তের জন্য। ও আর মানুষ নেই, ও হায়নার মতো কোনো অশ্লীল জানোয়ার হয়ে গেছে বলে ওর মনে হল।

মহুয়া একটু ভয় পেল। বলল, কোথায়? বলেই ঘরের দিকে পা বাড়াল।

সুখন বলল, এখানে নয়, আপনি ঘরের মধ্যে নন, আপনি যে মহুয়া—প্রকৃতির; জঙ্গলের; জঙ্গলের; জঙ্গলে চলুন।

মহুয়ার হাত ধরে পাহাড়ি ঘুরালের মতো নেমে চলল সুখন পাকদণ্ডি দিয়ে নিচের ঝরনার দিকে।

মহুয়া হাঁপাচ্ছিল, অমন খাড়াপথে নামা ওর অভ্যেস ছিল না। ওর হাঁটু, দু' উরু উত্তেজনায়, নিষিদ্ধ ভালো-লাগায় একটু ভয়েও থরথর করে কাঁপছিল। সুখন ওকে এক ঝটকায় কোলে তুলে নিল; তারপরই কাঁধে।

তারপর তরতর করে নেমে এল নদীর খোলে। সেখানে পৌঁছেই মহুয়াকে নামিয়ে দিয়ে ওর দুই সবল হাতে মহুয়ার নরম মহুল ফুলের মতো ছিপছিপে শরীর জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চুমু খেতে লাগল সুখন যে মহুয়ার নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল। ছটফট করতে লাগল মহুয়া।

সুখন ওকে ছেড়ে দিতেই মহুয়া এতক্ষণের, হয়তো এত বছরের রুদ্ধ আবেগ ও মেয়েলি কামের তীব্র অথচ চাপা উচ্ছ্বাসে সুখনকে চুমুতে চুমুতে ভরে দিল।

মহুয়া থামলে, সুখন বলল, আসুন, সব কিছু খুলে আসুন।

মহুয়া মুখ নামিয়ে, অন্যদিকে চেয়ে, লাজুক গলায় বলল, সব?

হ্যাঁ, সব—কঠিন গলায় বলল সুখন।

সুখনের চোয়াল শক্ত হয়ে এল।

চাঁদের আলোয় সুখনের দিকে চেয়ে মহুয়ার মনে হল যে, এ লোকটাকে জানে না ও। একেবারে চেনে না।

মহুয়ার মনে হল, একটা নিরীহ, ঘুমন্ত বাঘকে গুহা থেকে বের করে এনেছে ও খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে। বাঘটা এবার বদলা নেবে। বাঘটার শরীরের পেশি ফুলে উঠছে, গলায় ঘড়ঘড়ানি শব্দ উঠছে। বাঘটা বুঝি ওকে আঁচড়ে-কামড়ে রক্তাক্ত করে দেবে।

পাথরের মধ্যে কী যেন একটা পড়ার শব্দ হল। জিনিসটা পড়েই পাথরে গড়িয়ে বালিতে থামল। সুখন তুলে নিল জিনিসটা। চাঁদের আলোয়, গোলাকার পদার্থটা চকচক করছিল।—বল-বেয়ারিং।

সুখন হেসে ফেলল। বলল, এ কি?

মহুয়াও লাজুক হাসি হাসল। বলল, বুকের মধ্যে রেখেছিলাম।

এত ভালোবাসেন আপনি এগুলো? আপনি এখনও ছোটোই আছেন। সত্যিই ছোটো আছেন। আপনি মিছেই ভাবেন যে, আপনি বড়ো হয়ে গেছেন।

তখন জঙ্গলের ভেতর থেকে, নদীর অববাহিকায় ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে একটা পিউ-কাঁহা পাখি ডাকছিল। ক্রমান্বয়ে ডেকেই চলছিল, পিউ-কাঁহা, পিউ-কাঁহা বলে। অন্য পাশ থেকে ঢাব পাখি ডাকছিল, গম্ভীর ভুতুড়ে গলায় ঢাব-ঢাব-ঢাব-ঢাব। পিউ-কাঁহার গলায় মহুয়া আর সুখনের আসন্ন মিলনের আনন্দ উড়ছিল, আর ঢাবপাখির স্বরে ওদের অসমাজিক নিষিদ্ধ সম্পর্কের গোপনীয়তা।

কালো পাথরের পাশে পেছন ফিরে দাঁড়ানো বিবসনা, চুলখোলা মহুয়াকে চাঁদের আকাশের পটভূমিতে দেখে সুখনের মনে হচ্ছিল যে, মহুয়াই পৃথিবীর প্রথম ও শেষ নারী। এই শালফুল, করৌঞ্জ আর মহুয়ার গন্ধের মধ্যেই ও জন্মেছিল, এরই মধ্যে ওর পরম পেলব পরিণতি।

সুখন নিজের বশে ছিল না। উচিত-অনুচিত বোধ, ভবিষ্যতের সব কথা ওর মস্তিষ্ক থেকে মুছে গেছিল।

সে-মুহূর্তে সুখনের মনে হচ্ছিল যে, নারীমাত্রই বুঝি মহুয়ার মতো। তারা জন্মায়, হাসে, খেলে, তারা খেলায়; নিজেরা পূর্ণ হয়, পরিপ্লুত করে পুরুষকে। করেই, আবার চাঁদের আলোয় ফুলের গন্ধে ভাসতে ভাসতে অনন্য পরিপ্লুতির দেশে, নতুন আবেশের আবেগের দেশে ভেসে যায়।

নারীরা কাছে থাকে, বাঁচে ও বাঁচায়। পুরুষকে উজ্জীবিত করে, পুরুষের জীবনে নরম সুগন্ধি সব ফুল ফোটায়; কিন্তু তারা নিজেরা কখনও ফুরোয় না; ঝরে যায় না।

সাদা বালির মধ্যে হোলির চাঁদকে সাক্ষী রেখে, ফুলের গন্ধে মন্থর বাতাসকে সাক্ষী রেখে, মহুয়া সুখনের সঙ্গে এক দারুণ সুগন্ধি খেলায় মাতল।

খেলে, খেলিয়ে, আনন্দ দিয়ে, আনন্দ পেয়ে, ফুরিয়ে দিয়েই নতুন করে ভরিয়ে দিয়ে ওরা দুজনেই এক তীব্র ভালোবাসায় বিভোর হয়ে যেতে লাগল। করৌঞ্জের গন্ধের মতো, চাঁদের আলোর মতো ওরা একে অন্যের মধ্যে এবং দুজনে প্রসন্ন প্রকৃতির মধ্যে অঙ্গীভূত হয়ে গেল।

পাখিটা ডেকেই চলল, পিউ-কাঁহা, পিউ-কাঁহা পিউ-কাঁহা।

মহুয়া অস্ফুটে বলল, সুখ, আপনি কোথায়? আপনাকে দেখেতে পাচ্ছি না।

সুখন মহুয়ার চোখে চুমু খেল। ফিশফিশ করে বলল, এই তো আমি, আমি এই যে!

তারপর ওর ঠোঁটে ঠোঁট নামিয়ে এনে বলল, সুখকে দেখা যায় না। শুধু অনুভব করতে হয়।

ক্ষণকালের জন্য মহুয়ার মন একেবারে অসাড় হয়ে গেছিল। সমস্ত সাড় তখন তার শরীরেই শুধু দাপাদাপি করে ফিরছিল। এমনটি ওর জীবনে আর কখনও হয়নি।

উপরে তারা-ভরা, চাঁদ-ওড়া আকাশ, ঝুঁকে-পড়া শালবন, ঝিঁঝিদের ঝিনঝিনি।

তখন চতুর্দিকে রাত ঝরছিল, চাঁদ ঝরছিল; মহুয়ার শরীরের ভেতরে মহুয়া ঝরছিল ধীরে-ধীরে। ফিশ-ফিশ-ফিশ-ফিশ-ফিশ।

পাঁচ

একটা চ্যাটালো চওড়া পাথরে সুখনের পাশে পা ঝুলিয়ে বসেছিল মহুয়া। একটা একলা টিটি পাখি টিটির-টি-টিটির-টি করে ডাকতে ডাকতে জঙ্গলের গভীরে উড়েছিল।

ওরা কতক্ষণ যে অমন করে বসেছিল তা ওদের দু জনেরই হুঁশ ছিল না কোনো।

অনেকক্ষণ পর যেন স্বপ্নোত্থিতের মতো মহুয়া বলল, শুনুন।

সুখন বলল, উঁ...।

—এখানেই থাকা হবে?

—থাকুন। আপনি তো বললেন চিরদিন থাকবেন।

—বলেছিই তো!

—জানি।

—কী জানেন?

—বলেছিলেন যে, সে কথা।

—আপনার কি এখনও সন্দেহ আমাকে?

—আপনাকে? না, না। আপনাকে সন্দেহ নয়।

—তবে?

সুখনের মনে এখন বড়ো প্রশান্তি। এত সুখ এত শান্তি ও জীবনে আগে কখনও জানেনি! পৃথিবীর সব অশিক্ষিত পয়সাওয়ালা গাড়ি-চড়া খদ্দেরদের ও ক্ষমা করে দিল। এই মুহূর্তে সুখন বড়ো উদার, মহৎ; সুখী মানুষ।

মহুয়ার প্রশ্নের উত্তরে সুখন বলল, আমাকে আমি চিনি না।

—আমি চিনি।

—চেনেন? ভাবতে ভালো লাগছে যে, আমাকে কেউ, অন্তত একজনও চেনে।

তারপরই বলল, চলুন। ক-টা বাজে বলুন তো?

—আটটা। রেডিয়াম দেওয়া হাতঘড়িতে দেখে বলল মহুয়া।

তারপর বলল, যেতে ইচ্ছে করছে না।

ও উঠে দাঁড়াতেই কালুয়া পাথরের আড়াল থেকে কুঁই-কুঁই করে ডেকে উঠল।

সুখন মহুয়ার শাড়ি থেকে বালি ঝেড়ে দিতে দিতে বলল, দেখছেন, কালুয়াটার কিরকম ঈর্ষা। মেয়েরা, মানে মেয়ে মাত্রই ঈর্ষাকাতর।

মহুয়া বলল, আমি কি শুধু কোনো কুকুরিরই ঈর্ষার পাত্র?

সুখন হাসল। বলল, যেমন আপনার রুচি। সুখন মিস্ত্রিকে যার ভালো লাগল তাকে ঈর্ষা করবে আর কে?

মহুয়া উম্‌ম্—ম্‌ম্ করে একটু মিথ্যে আপত্তি জানাল।

সুখন বলছিল, নিজের মনেই—তুমি বড়ো সুন্দর মহুয়া।

সত্যিই তোমার মতো সুন্দর কিছুই আমি দেখিনি জন্মের পর থেকে।

দেখতে দেখতে ওরা শাকুয়াটুঙ-এ উঠে এল।

সুখন বলল, জানেন, আমি মিস্ত্রিদের বলি যে, আমি মরলে এখানে আমাকে কবর দিয়ে রাখতে। ওরা বলেছে দেবে। ভাবছি, এখন থেকেই এ জায়গাটাতে অনেকগুলো মহুয়া গাছ লাগিয়ে রাখব।

মহুয়া রাগত গলায় বলল, থাক, অন্য কথা বলুন।

সুখন বলল, হ্যাঁ, যা যা কথা আছে বলে ফেলুন। সময় খুব কম। সময় বড়ো তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়।

মহুয়া আবার বলল, আশ্চর্য, আপনি এখনও আমাকে সিরিয়াসলি নিলেন না? আরো কিছু কি চান আপনি আমার কাছে?

বাইরে থেকে ঘরের দরজা বন্ধ করতে করতে বলল, কিছু না। যা দিয়েছেন, সেটুকুর দামই দিতে পারব না এ জন্মে। আর কী চাইব?

মহুয়া চুপ করে রইল।

মনে মনে বলল, যে-দামের কথা সুখন বলছে তার দাম কিছুই নয়। যা ওকে মহুয়া সত্যিই দিয়েছে তার দাম কি ও কখনও বুঝবে?

ওরা শাকুয়াটুঙ-এর টিলা ছেড়ে নীচের শালবনে নেমে এল। তারপর পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।

সুখন মহুয়ার হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় নিল।

বলল, আপনার হাতের আঙুলগুলো কি সুন্দর! আপনার সব সুন্দর।

মহুয়া জবাব দিল না। বলল, আমি একটা কথা ভাবছি।

—কী কথা? বলুন?—সুখন মুখ তুলে বলল।

মহুয়া অনেকক্ষণ দ্বিধা করল। তারপর বলল, যদি কিছু হয়?

সুখন প্রথমে বুঝতে পারেনি মেয়েলি কথাটা। বুঝতে পেরে বলল, কিছু হবে না!

—আহা আপনি যেন সব জানেন!

—সব জানি না। তবে আমার মন বলছে, কিছুই হবে না।

—তবুও যদি কিছু হয়ে যায়!

—আপনার এখন ভয় করছে বুঝি? খারাপ লাগছে?

—ভয় নয়। খারাপ তো নয়ই। কিরকম অবাক লাগছে!

—স্বাভাবিক। কি করে যে হঠাৎ ব্যাপারটা ঘটে গেল, আমিও বুঝে উঠতে পারছি না।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, আপনি কী চান?

—মানে?

—মানে, কি—ছেলে না মেয়ে?

মহুয়া লজ্জা পেল। মুখ ঘুরিয়ে নিল।

সুখন অবাক হল।

মেয়েদের সত্যিই বোঝা মুশকিল। কিসে যে লজ্জা পায়, আর কিসে যে পায় না!

একটুক্ষণ পর মহুয়া লাজুক গলায় বলল, ছেলে।

তারপরই বলল, ঠিক আপনার মতো।

সুখন স্বগতোক্তির মতো বলল, যদি ছেলে হয় তার নাম রাখবেন পলাশ।

পলাশ? মহুয়া মুখ তুলে তাকাল।

—পলাশ ভালো না?

—ভালো। খুব ভালো। মহুয়া বলল।

—আর যদি...? মহুয়া শুধোল।

—মেয়ে হলে তার নাম রাখতে পারেন—টুঁই।

—টুঁই?

—হ্যাঁ। টুঁই। টুঁই পাখি দেখেননি। টিয়ার মতো। কিন্তু খুব ছোট্ট পাখি—নরম কোমল কচিকলাপাতা-সবুজ তার গায়ের রং, চিকন গলায় ডাকে, টি-টুঁই-টুঁই-টি-টুঁই-টি-টুঁই। প্রাণে ভরপুর। গাছের চারায় চারায় উড়ে বেড়ায়—ছটফটে—মিষ্টি। কোথাও একদণ্ডের বেশি স্থির হয়ে বসে না।

—বাঃ বেশ নাম তো!

জঙ্গলটা পেরিয়ে আসতেই দূরের বড়ো রাস্তায় চোখ গেল ওদের।

আলো-জ্বালা একটা বাস হু-স করে চলে গেল রাঁচির দিকে।

—এই রে!—বলল সুখন।

তারপর বলল, কপালে খুব গালাগালি আছে আপনার বয়-ফ্রেন্ডের কাছে।

—কেন? সন্ত্রস্ত চোখে মহুয়া তাকাল।

—মনে হচ্ছে বাস স্ট্রাইক মিটে গেছে। সকাল থেকে আমি উধাও। শাকুয়া-টুণ্ডে চলে না গেলে এতক্ষণে তো আপনাদের গাড়ি ঠিক করে দেওয়া যেত। তাহলে আর আপনাদের এতক্ষণ কষ্ট করে ফুলটুলিয়ায় থাকতে হত না। এত বড়ো দুর্ঘটনা থেকেও হয়তো বেঁচে যেতেন আপনি।

মহুয়া প্রথমে জবাব দিল না কথার। তারপর বলল, দুর্ঘটনা বলছেন কেন?

না। এমনিই বললাম। সুখন বলল।

একটু পর মহুয়া বলল, আমরা দু জনে কি একসঙ্গে বাড়ি ফিরব।

এই কথাটার সঙ্গে সঙ্গে এতক্ষণের এই কয়েক ঘণ্টার পরজবসন্ত আবহাওয়াটা উধাও হয়ে গেল। কেমন বেসুর, বেতাল। ওরা দু জনেই একই সঙ্গে বুঝতে পারল যে, ওদের ছাড়াছাড়ি হওয়ার সময় হয়েছে। জঙ্গলে অনেক কিছু হয়, কিন্তু শহরে হয় না। জঙ্গলের সত্য এখানে মিথ্যা। সব মিথ্যা।

সুখন বলল, একসঙ্গে বাড়ি ঢুকতে আমার আপত্তি নেই, ভয়ও নেই। তবে আপনার দিক থেকে বোধহয় সেটা ঠিক হবে না। জঙ্গলের যাদুর বশে জংলি লোকের সঙ্গে যা ব্যবহার করেছেন, এই লোকালয়ে, আপনার বাবার সামনে, বয়-ফ্রেন্ডের সামনে তো তেমন করলে চলবে না। জঙ্গলের গন্ধ জঙ্গলেই থেকে যাবে। সেই জঙ্গলের মধ্যের ঝরনার বুকের মহুয়া, আর যে-মহুয়া সকালে চলে যাবে সে তো এক নয়!

মহুয়া মুখ ঘুরিয়ে একবার সুখনকে বলল, আমরা একসঙ্গেই যাব।

না। আমরা একসঙ্গে যাব না।—সুখন বলল।

ততক্ষণে ওরা দহটার পাশ দিয়ে বাঁধের উপরে এসে পৌঁছেছে। পেছন ফেলে আসা জঙ্গলের শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ সমস্তই সেই চন্দ্রালোকিত রাতে এক মোহময় স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে!

সুখন জানে যে, সেই স্বপ্নে সে আবার ফিরে যাবে। রোজই ফিরে যাবে। কারণ জঙ্গলের মধ্যেই তার জীবন, তার জীবনের অঙ্গ এই স্বপ্ন। কিন্তু মহুয়া আর কখনও এখানে ফিরবে না। ফিরতে পারবে না। কালি পোকা যেমন আলোর দিকেই ওড়ে, তেমনই শহুরে পরিবেশের কাছাকাছি এসে মহুয়া ওর ভেতরে নিশ্চয়ই একটা প্রবল প্রত্যাবর্তনের তাগিদ অনুভব করছে। বড়োলোকের সুন্দরী মেয়ের এক ক্ষণিক খুশির খেয়ালে সুখন মিস্ত্রিকে তার ভালো লেগেছিল, জঙ্গলের আবেশে তার নেশা ধরেছিল, শহরে ফিরলেই সে যে সমাজের লোক সেই সমাজে পৌঁছোলেই পুরো ব্যাপারটাকে মহুয়া "আ গ্রেট ফান, আর অ্যান অ্যাকসিডেন্টাল এপিসোড" ছাড়া অন্য কিছুই হয়তো ভাববে না।

এই মুহূর্তে সুখনের বুকে ভারি একটা চাপা কষ্ট হচ্ছিল। সুখন জানে যে, এই কষ্টটা বেশ কিছুদিন তাকে পেয়ে বসবে; চেপে থাকবে বুকে ভারী পাথরের মতো। একটা গভীর ক্ষতর মতো দগদগ করবে অনেকদিন। যখনই বাতাসে মহুয়ার গন্ধ পাবে ও, তখনই এই রক্তমাংসের নরম মিষ্টি এক-কোমর চুলের, দিঘল কালো চোখের মহুয়ার কথা মনে পড়বে। তারপর একদিন সবই ঠিক হয়ে যাবে। রুখু বাতাসে, টান আবহাওয়ায়, ক্ষতটা একদিন শুকিয়ে যাবে। যদি তাড়াতাড়ি না শুকোয়, তখন বোতল বোতল মহুয়ার মদ ঢালবে গলায়—বিশল্যকরণী। তবু সুখন এও জানে যে, ক্ষত শুকোলেও ক্ষতর দাগটা থেকেই যাবে।

সুখন মহুয়ার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল যে মেয়েরা যত সহজে সবকিছু ভোলে নিজেদের স্বার্থে; নিজেদের প্রয়োজনে—পুরুষরা অত সহজে পারে না।

সুখন ওর জীবনে বেশি মেয়ে দেখেনি; কিন্তু যে-কজনকে দেখেছে, গভীরভাবে, মনোযোগের সঙ্গে, অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছে। তাদের দেখে সুখনের এই ধারণাই হয়েছে যে, যাযাবর বৃত্তিতে মেয়েদের কাছে বেদেরাও লজ্জিত হয়।

ঘোর কাটিয়ে সুখন বলল, মহুয়া, একটু দাঁড়ান!

মহুয়া ওর দিকে ফিরে দাঁড়াল।

সুখন ওকে বুকে টেনে নিল। নিয়ে চুমোয় চুমোয় ভরে দিল। ওর সুন্দর পাহাড়ি-ঘুঘুর মতো বুকের সন্ধিস্থলে নাক ডোবাল। মহুয়ার চোখ দুটি বড়ো সুন্দর। এমন আবেশ-ভরা দৃষ্টি সুখন কখনও দেখেনি; হয়তো আর দেখবেও না।

মহুয়া আবেশে চোখ বুজে রইল। তারপর সুখনের দাম সুখনকে ফিরিয়ে দিল। সুখনকে ছেড়ে দিয়ে বলল, সাধ মিটেছে?

সুখন হাসল। বলল, সাধ কি মেটবার?

তারপরই কেজো-গলায় বলল, আপনি এইদিক দিয়ে গিয়ে বড়ো রাস্তায় উঠুন। তারপর সামনে দিয়ে বাড়িতে ঢুকুন। কোনো ভয় নেই। তবুও আপনি ভয় পেতে পারেন বলেই আপনাকে লক্ষ রাখব। আপনি বাড়ি ঢুকে যাবার একটু পর আমি যাব—পিছনের দরজা দিয়ে। কেমন?

মহুয়া সামনের দিকে পা বাড়াল। সুখন তার ডান হাতটি নিজের ডান হাতে তুলে নিয়ে চুমু খেল। নরম গলায় বলল, আসুন মহুয়া।

মহুয়া থমকে দাঁড়াল। মুখ নামিয়ে নিল। বলল, আসি।

সুখন দেখতে পাচ্ছিল টর্চ হাতে কারা যেন এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছে। হয়তো সান্যাল-সাহেবরা। ওদের পক্ষে চিন্তিত হওয়া স্বাভাবিক।

মহুয়া চাঁদ-ভেজা অসমান জমি বেয়ে নিজস্ব পা-ফেলার অভিজাত ছন্দে হেঁটে যাচ্ছে বড়ো রাস্তার দিকে। লতানো হাতে জড়িয়ে খোঁপাটা বেঁধে নিয়েছে। ওর ছিপছিপে শরীর একটা আলতো সুগন্ধি ছায়ার মতো সরে যাচ্ছে—দূরে—ক্রমাগত দূরে; অন্য ছায়াদের গভীরে।

কালুয়াটা সুখনের পায়ের কাছে বসে মহুয়ার দিকে মুখ তুলে চেয়েছিল।

সুখন সিগারেট ধরিয়ে একদৃষ্টে সেই অপস্রিয়মান ছায়াটির দিকে চেয়ে রইল।

পেছনের খোয়াই-এর উপরে একটা একটা টিটি পাখি ডেকে ফিরছিল।

সুখন মিস্ত্রি জীবনে কখনও এত দুর্বল বোধ করেনি এর আগে। এত মঙ্গলকামনায়, এত শুভভাবনায় ভরপুর হয়ে চলে-যাওয়া কারও পথের দিকেই এমন করে আর তাকায়নি সে।

হঠাৎ সুখন অনুভব করল তার চোখের কোল ভিজে গেছে।

হঠাৎ সুখন এক ঝটকায় সিগারেটটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল—এই মিস্ত্রি! হচ্ছে কি! এটা কি হচ্ছে? শালা। বামন হয়ে চাঁদে হাত। চল শালা, আর্মেচারে তার জড়াবি। ডিস্ট্রিবিউটরের কার্বন পরিষ্কার করবি।

জীবনে এই প্রথমবার সুখনের মনে হল, ওর মনের ডিস্ট্রিবিউটরেও বড়ো ময়লা জমেছে। ভালো করে খুলে ওটাকে একদিন পরিষ্কার করতে হবে প্লাগগুলো থেকেও ঘষে ঘষে কার্বন তুলতে হবে।

ও জানে যে, রোম্যান্টিক রংবাজি সুখন মিস্ত্রিকে মানায় না। মানাবে না কোনদিনও।

কুমারের যখন ঘুম ভেঙেছিল, তখন বেলা পড়ে এসেছিল।

ঘর থেকে বারান্দায় এসে মোড়ায় বসল কুমার।

ওকে উঠতে দেখে মংলু চা বানিয়ে দিল, সঙ্গে হালুয়া আর পাঁপর-ভাজা।

এইব হালুয়া মালুয়া দিশি খাবার পছন্দ করে না কুমার। কেমন পিছলে- পিছলে যায়। যখনই ও হালুয়া খেয়েছে—এই সঙ্গে 'লে-হালুয়া' কথাটার কি সম্পর্ক ও ভাববার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ভেবে পায়নি।

চা খেতে খেতে একটা বিলিতি লম্বা সিগারেট ধরাল কুমার। মংলুকে শুধোল, এই ছোকরা, তোর ওস্তাদ কোথায়?

—জানি না।

—দিদিমণি কোথায়?

—বেড়াতে গেছেন।

—আর বুড়োবাবু?

—উনিও বেড়াতে গেছেন।

—একই সঙ্গে দু জন।

—না। আলাদা,আলাদা। আগে, পরে।

কুমারের মাথার মধ্যে 'লে-হালুয়া' কথাটা ফিরে এল।

তারপরই আবার ও মংলুকে জেরা করল, একই দিকে?

জানি না, দেখিনি। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল মংলু।

কুমার আর সময় নষ্ট করল না। পায়জামা পরে শুয়েছিল। ছেড়ে ফেলে জামা-কাপড় পরে নিল। ইমপোর্টেড হলুদ কাপড়ের ট্রাউজার আর ঘন বেগনি-রঙা গেঞ্জি। পোশাক পরে আয়নার সামনে দাঁড়াল।

মনে মনে বলল—এমনই মিস্ত্রি, ঘরে একটা ভদ্রগোছের আয়নাও রাখতে পারেনি। অবশ্য কিসের জন্যই বা রাখবে? অমন চাঁদবদন দেখার আর কী আছে?

আয়নার সামনে দাঁড়াতে খুব একটা পছন্দ করে না কুমার। ওর চেহারাটা দিন-কে-দিন গুড়ের হাঁড়িতে পড়া নেংটি ইঁদুরের মতো গুড়-চুক চুক অথচ পাকানো হয়ে যাচ্ছে। এত পরিমাণে মদ্যপান করছে প্রতিদিন যাতে গায়ে-গতরে একটু লাগে, কিন্তু কিছুতেই আর কিছু হচ্ছে না। অফিসে ওর ভার বাড়ছে, পদ বাড়ছে, ওর শরীরের ভার যেন ততই কমছে। এ-একটা প্যারাডক্স। কিছুই করার নেই।

কুমার বেরিয়ে মহুয়া যেদিকে গেছে বলে জানিয়েছে মংলু, সেদিকে হাঁটতে লাগল রাস্তা ধরে। রাস্তার যানবাহন কিছু নেই। কাঁচা লাল ধুলোর রাস্তা। সামনেই একটা নালা। তার উপর কজ-ওয়ে। গাছগাছালির বুনো বুনো গন্ধ, পাথর-মাথর রাজ্যের বোগাস জিনিস।

একটা মোষের গাড়ি চলেছে ক্যাঁচোর-কোঁচর করতে করতে। মাথার মধ্যে যন্ত্রণা হয় আওয়াজে।

মনে মনে বিরক্তির পরাকাষ্ঠা ঝরিয়ে কুমার ভাবল, এমনই জায়গা যে, একটা তেমন পানের দোকানও নেই যেখানে সোডা পাওয়া যায়। আজ রাতে তো করার কিছুই নেই। বৃদ্ধ ভাম তো মেয়ে সামলে সামলেই গেল। এক মুহূর্ত চোখের আড়াল করে না মহুয়াকে। এখানে মানে কলকাতার বাইরে আসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মহুয়ার সঙ্গে একটি শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন। আনলেস শি ইজ গুড ইন বেড, মহুয়াকে বিয়ে করবে না কুমার। ওসব মন-ফন আজকের মেট্রিক সিস্টেমের দিনে কনডেমড ব্যাপার। এখন শরীরম আদ্যম। এ-ব্যাপারে মিল না হলে, খামোকা বিয়ে ফিয়ের ঝামেলার মধ্যে যাবে না ও। তারপরই ভাবল সত্যিই কি যাবে না?

কুমার ভাবছিল, মেয়েটাও যেন কেমন। পদি-পিসি পদি-পিসি ভাব। এ নিয়ে কিসের এত ফাসস করা তো এরকম নেকুপুষমুনু মেয়েরাই জানে।

হঠাৎ কুমার দেখল যে, সান্যালসাহেব উলটোদিক থেকে আসছে হন্তদন্ত হয়ে। বিয়ার টেনে-টেনে তলপেটটা তরমুজের মতো করেছে বুড়ো।

কুমার ওঁকে দেখে কজ-ওয়েটার উপরে দাঁড়াল। মোষের গাড়িটা হেভি ধুলো উড়োচ্ছে। এগিয়ে যাক ওটা। তাছাড়া মোষেদের গায়ে একটা বোঁটকা গন্ধ। বুড়ো চান করে বেরোবার পর বাথরুমে এরকম একটা গন্ধ পেয়েছিল কুমার।

সান্যালসাহেবের হাতে বাঁশের লাঠি। খাকি শর্টস। গায়ে সাদা কলারওয়ালা গেঞ্জি। অনেকখানি হাঁটাতে, ঘামে কপাল মুখ সব একরকম ভিজে গেছে।

সূর্য হেলে গেছে পশ্চিমে, অথচ এখনও পাথর থেকে গরমের ঝাঁজ বেরোচ্ছে। হরিবল জায়গা।

সান্যালসাহেব কাছে এসেই বললেন, বড়ো চিন্তার কথা হল।

কুমার ঠান্ডা, ইমপার্সোনাল গলায় বলল, কি?

—মহুয়া কি ফিরেছে?

না তো।—কুমার বলল।

—সেই বিকেলে নাকি বেরিয়েছে। কোথায় গেল, কোনদিকে গেল কিছুই বলে যায়নি। প্রায় দু আড়াই ঘণ্টা হতে চলল। এখুনি সন্ধে হয়ে যাবে। কি করি বলো তো?

সান্যালসাহেবের গলায় চিন্তার রেশ ছড়িয়ে পড়ল।

কুমার বলল, সেই মিস্ত্রি ব্যাটা কোথায়?

—সে তো তুমি গালাগালি করবার পরই বেপাত্তা। ওই ছোকরা চাকরটা বলল ও নাকি খেতেও আসেনি।

ওরই কনসপিরেসি নয় তো? মহুয়ার যা সফট-কর্নার দেখছিলাম ওই মিস্ত্রির জন্য। চিবিয়ে চিবিয়ে কুমার বলল।

—আহা। কি যা তা বলো কুমার। উই শুড নট ফরগেট দ্যাট আফটার অল শি ইজ মাই ডটার। তুমি এমন কথা বলছ বা ভাবছ কী করে?

কুমার বলল, আমি কিছু ভাবছি যা বলছি না। আপনাকে ভাবতে বলছি। আফটার অল শি ইজ ইয়োর ডটার। আমার কে?

কথাটা বলে এবং বুড়োকে আরো একটু দুশ্চিন্তায় ফেলে, কুমার খুশি হল। ও লক্ষ করেছে চিরদিনই যে, লোককে আঘাত করে ও ভীষণ আনন্দ পায়। বাক্যবাণে লোককে বিদ্ধ করার আর্টটা ও দারুণ রপ্ত করেছে। সত্যি কথা বলতে কি ওর ইচ্ছে আছে যে, এই আর্টটা ও কমপ্লিটলি মাস্টার করে ফেলবে।

চিন্তান্বিতভাবে সান্যালসাহেব আগে আগে এবং কুমার পেছনে পেছনে আবার সুখনের ডেরায় ফিরলেন।

সান্যালসাহেব আশা করেছিলেন যে, ফিরে এবার মহুয়াকে দেখতে পাবেন। দেখবেন মহুয়া গা-টা ধুয়ে শাড়ি বদলে বারান্দায় বসে পড়েছে। মেয়েকে সান্যালসাহেব বড়ো ভালোবাসেন। তাছাড়া স্ত্রীর বিকল্পও বটে। মানে, ওর অত বড়ো ফ্ল্যাটে একজন নারীর বিকল্প। মহুয়ার জন্য যত বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন তিনি, তত বেশি করে বুঝতে পারেন মহুয়াকে তিনি ঠিক কতখানি ভালোবাসেন।

উঠোনো পৌঁছেই তিনি শুধোলেন, কি রে? আসেনি এখনও দিদিমণি?

না। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল মংলু।

এই উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মংলুর মুখেও চিন্তার ছাপ দেখা দিল। দিদিমণি এতখানি দেরি করবে বলে বুঝতে পারেনি মংলু। যদি কোনো বিপদ আপদ হয়, সাপে কামড়ায়, ভাল্লুকে খোবলায়, দায়িত্ব পড়বে মংলুর ঘাড়ে। যদি কেউ দেখে থাকে যে মংলুর সঙ্গে দিদিমণি শাকুয়া-টুঙের দিকে গেছে, তাহলে গুঞ্জার দারোগাবাবু এসে নির্ঘাত ওকে হাতকড়া লাগিয়ে থানায় নিয়ে যাবে, তারপরে মারের চোটে বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেবে।

সুখনের কারখানার রঙের কাজ করে যে মিস্ত্রি, তার বাড়ি কারখানার কাছেই। সান্যাল সাহেবের পীড়াপীড়িতে মংলু তাঁকে নিয়ে তার বাড়ি গেল।

কুমার বলল, আমি এখানেই থাকি। যদি মহুয়া এসে পড়ে তবে একা পড়ে যাবে। তাছাড়া আমি একটু ভেবে দেখি যে, কি করা যায়, কি করা উচিত। একটা অ্যাকশান প্ল্যান।

সান্যালসাহেব দিশেহারা হয়ে গেছেন। রাত অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। যদিও চাঁদের আলো আছে ফুটফুটে, তবুও অচেনা-অজানা বুনো জায়গা। কোথায় গেল? কী হল মেয়েটার?

রঙের মিস্ত্রি সবে জামাকাপড় ছেড়ে গামছা পরে, লুঙি আর গোলা-সাবান নিয়ে কুয়োতলায় যাচ্ছিল, এমন সময় মংলুর সঙ্গে সান্যালসাহেব গিয়ে হাজির।

সব শুনে মিস্ত্রি বলল, এখানে তো ভয়ের কিছু নেই, তবে জঙ্গলের দিকে সাপের ভয় আছে। গরমের দিনে মহুয়ার সময় ভালুকের ভয়ও আছে। কিন্তু—দিদিমণি জঙ্গলে যাবেনই বা কেন একা একা? খারাপ লোকের ভয় এখানে নেই। আজ হাটবারও নয়। হাটের দিনে লোকে একটু মহুয়া টহুয়া পচানি খায়— তখন অনেক সময় মাতাল হয়ে মেয়েদের উপর হামলা-টামলা করে। কিন্তু আজ তো হাটবারও নয়।

তারপর আশ্বাস দিয়ে বলল, যাই হোক বাবু, আপনি যান, আমি তো বাড়িতেই আছি। রাত দশটা পর্যন্ত না ফিরলে আমাকে খবর দিবেন। থানায় নিয়ে যাবো আপনাদের।

সান্যালসাহেব বললেন, যাবে কিসে করে? বাস তো স্ট্রাইক। এখানে ট্যাক্সি পাওয়া যাবে?

বাস স্ট্রাইক তো বিকেল চারটেয় মিটে গেছে। বিকেলে বাস গেল দেখলেন না আপনারা?

অবাক গলায় সান্যালসাহেব শুধোলেন, মিটে গেছে? আশ্চর্য।

তারপর বললেন, তাহলে তো আমরা আজই গাড়ি সারিয়ে চলে যেতে পারতাম।

রঙের মিস্ত্রি বলল, তা পারতেন। কিন্তু আপনার সঙ্গের বাবু ওস্তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলেন বলে ওস্তাদ রাগ করে চলে গেল। উনি থাকলে তো সবই হয়ে যেত। ওই বাবু খারাপ ব্যবহার করেছে শুনে মিস্ত্রিরা বলছিল বাবুকে মারবে। তা ওস্তাদই ওদের বকল। বলল, একদিনের মেহমান; ক্ষমা করে দে।

সান্যালসাহেব এক মুহূর্ত মহুয়ার কথা ভুলে গিয়ে বললেন, তা তোমার ওস্তাদ গেলেন কোথায়?

—কে জানে কোথায়? ওস্তাদের কথা! পড়েলিখি আদমি। মিস্ত্রি হলে কি হয়। মাথায় অনেক পোকা আছে। বোধহয় শাকুয়া-টুঙে বসে পড়া-লিখা করছে।

—সেটা আবার কী?

—ওই টিলার উপরে ওস্তাদের আস্তানা আছে একটা। চলে যায় সেখানে রাগ-টাগ হলে ছুটিছাটার দিনে।

সান্যালসাহেব মহা বিপদেই পড়লেন। ফেরার পথে সান্যালসাহেব মংলুকে শুধোলেন, এই শাকুয়া-টুঙটা কোনদিকে রে? তুই চিনিস?

রঙের মিস্ত্রি কথা শুনে এমনিতেই মংলুর টাগরা শুকিয়ে গেছিল। এবার শুকোল।

বলল, চিনি। কিন্তু ওস্তাদ ওখানে যাননি।

—কি করে জানলি যে, যাননি?

—গেলে আমি জানি, গেলে আমাকে বলে যান, জিনিসপত্র নিয়ে যান।

অ......। বললেন সান্যাল সাহেব।

ডেরার কাছে এসে অনেকক্ষণ এ-পাশে ওপাশে ঘুরে ঘুরে তারস্বরে মহুয়া মহুয়া বলে ডাকলেন।

চাঁদনি রাতের বন-পাহাড় সে ডাককে ফিরিয়ে দিল বারে বারে গম্ভীর স্বরে সান্যালসাহেবের ক্লিষ্ট বুকে; কিন্তু মহুয়া সাড়া দিল না।

বারান্দার সামনে এসে সান্যালসাহেব দেখলেন যে কুমার টুলের উপর হুইস্কির বোতল রেখেছে—নিজেই কোথা থেকে জলটল জোগাড় করে একা একা বসে হুইস্কি খাচ্ছে।

কুমার আরেকটা মোড়া এগিয়ে দিয়ে বলল, বসুন, বসুন। বলেই একটা বড়ো হুইস্কি ঢেলে ওঁকে দিয়ে বলল, আরো একটু দেখুন। তারপর যা করার করতে হবে। সার্চ পার্টি অর্গানাইজ করে চারদিকেই বেরোনো যাবে। এখনও তার সময় হয়নি। তাছাড়া নিন—এটা এক গালে শেষ করুন—উই উইল ফিল বেটার।

তারপর একটু থেমে বলল, "দেয়ারস নো পয়েন্ট ইন্ ট্রায়িং টু ডু সামথিং, হোয়েন দেয়ারস নাথিং টু বি ডান", ডক্টর চেসারের একটা বইয়ে পড়েছিলাম। নিন, হ্যাভ অ্যানাদার ওয়ান। কুইক।

সান্যাল সাহেব দিশেহারা, হতাশ অবস্থায় কুমারের কথামতো পর পর দুটো বড়ো হুইস্কি খেয়ে ফেললেন।

তারপর বললেন, তোমার কি মনে হয় কুমার?

কুমার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, আমার মনে হল আর আধ ঘন্টার মধ্যে মহুয়া ফিরে আসবে। তার একটু পরেই সুখন মিস্ত্রি। আর আমার যা মনে হয়, তা ঠিকই মনে হয়। চিরদিনই।

তারপর সান্যালসাহেবকে অভয় দিয়ে বলল, আপনি হুইস্কি খান, হুইস্কি খেতে খেতে দেখুন মহুয়া আসে কি না।

সান্যালসাহেব উত্তর না দিয়ে মাথা নীচু করে চুপ করে বসে রইলেন। কুমার সান্যালসাহেবকে প্রায় জোর করেই একটার পর একটা হুইস্কি খাইয়ে যেতে লাগল। কিন্তু নিজে অতটা খেল না।

কুমারের মাথার মধ্যে পুঞ্জীভূত রাগ এবং প্রতিশোধের স্পৃহা একটা সামুদ্রিক কাঁকড়ার মতো দাঁড়া নাড়তে লাগল।

হঠাৎ উঠোনের দরজায় আওয়াজ হল। সান্যালসাহেব, কুমার মংলু সকলেই একই সঙ্গে মুখ তুললেন ও তুলল।

মহুয়া দাঁড়িয়েছিল। চুল এলোমেলো, শাড়ি ক্রাশড। টিপ ধেবড়ে গেছে। মুখের মধ্যে অপরাধ ও ভয় মেশানো একটা আনন্দের ছাপ।

কুমারের মনে হল, আনন্দের ছাপটাই প্রধান।

সান্যালসাহেব এতক্ষণ মেয়ের শোকে পাগল হয়েছিলেন। ভাবছিলেন, মহুয়া ফিরলে মহুয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরবেন। কিন্তু মহুয়া তাঁর চোখের সামনে এসে দাঁড়াতেই বহু বছর আগে দেওঘরের শালবনের মধ্যে ভরদুপুরে দেখা একটি মেয়ের মুখ তাঁর মনে পড়ে গেল। সান্যালসাহেবের বুঝতে ভুল হল না যে মহুয়া সেই মায়েরই মেয়ে। একই রক্ত বইছে এরও শরীরে। এরা শিকল কাটার দলে। পায়ে শিকল রাখে না এরা। কোনো শিকলই।

সান্যালসাহেব রাগে প্রায় চিৎকার করে বললেন, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

—বেড়াতে গেছিলাম বাবা।

—বেড়াতে? এত সময়? তোর চেহারা এরকম হয়েছে কেন? মহুয়া হাসল। এক দারুণ বিশ্বজয়ী হাসি!

তারপর বলল, সে অনেক গল্প বাবা, দারুণ ইন্টারেস্টিং। পরে তোমাকে বলব। কিন্তু আই অ্যাম সরি যে, তোমাকে এতক্ষণ ভাবিয়েছি। রাগ কোরো না প্লিজ। সোনা বাবা।

এতক্ষণ কুমার চুপ করেছিল। হুইস্কি সিপ করতে করতে মহুয়ার দিকে তাকাচ্ছিল।

হঠাৎ কুমার বলে উঠল, সময়টা ভালোই কাটল। কি বলো তাই না?

মহুয়া সোজা সর্পিনীর মতো ফণা তুলে তাকাল কুমারের দিকে—তারপর হাসল—আবার সেই হাসি। তারপর চোখে আগুন ঝরিয়ে ঠান্ডা গলায় বলল, দ্যাটস নান অফ ইয়োর বিজনেস।

কুমার এক ঢোকে গ্লাসটা শেষ করে বলল, সার্টেনলি। আই নো দ্যাট। ইট ইজন্ট্। থ্যাংক ইউ।

কুমারের কথা শেষ হতে না হতেই দরজা ঠেলে দাঁড়াল এসে সুখন।

সুখন অন কাউকে কিছু বলতে না দিয়েই বলল, টাকাটা দিলে ভালো হয়। তিনশো টাকা।

কুমার ওকে দেখে যেন খেপে গেল, তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে মিস্ত্রি? বিকেল চারটেয় স্ট্রাইক মিটে গেল—এতক্ষণে আমরা গাড়ি সারিয়ে চলে যেতে পারতাম বেতলা—কিন্তু তুমি ছিলে কোথায়? তুমি কি মনে করো যে, তোমার এই ফাইভস্টার হোটেলে আমরা চিরজীবন থেকে যাব আর তুমি আমাদের যেমন খুশি তেমন ট্রিট করবে? তুমি ভে-ভে-ভে-ভে বেছ কি!

কুমারের মুখ দিয়ে একটু থুথু ছিটল। কুমার অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ায় তোতলাচ্ছিল।

সুখন ওর দিকে চেয়ে শান্ত গলায় বলল, যতখানি উত্তেজনা আপনার সয়, শুধু ততখানিই উত্তেজিত হওয়া উচিত। বেশি নয়। সেটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। কার্ডিয়াক অ্যাটাক হতে পারে।

হোয়াট? হোয়াট? বলেই কুমার সিঁড়ি দিয়ে নেমে সুখনের দিকে তেড়ে গেল। বলল, স্কাউনড্রেল—সব জিনিসের সীমা থাকা দরকার। ইউ হ্যাভ সারপ্যাসড অল লিমিটস। বলেই, কেউই যা ভাবতে পারেনি, যা কারো পক্ষেই, এমনকী কুমারের নিজের পক্ষেও ভাবা সম্ভব ছিও না, হয়তো একমাত্র অন্তর্যামী হুইস্কিই য্য জানত, তাই করে বসল কুমার।

ঠাস করে এক চড় মেরে বসল সুখনকে।

গুলি-খাওয়া বাঘের মতো প্রথমে রুখে দাঁড়াল সুখন। সান্যালসাহেবের মনে হল আজ কুমারের কুমারত্বের আখরি দিন। আর কিছুই করার নেই।

কিন্তু পরমুহূর্তেই গায়ে জল-পড়া মেনি বিড়ালের মতো, নিজের থেকেই সম্পূর্ণ অজানা কারণে সুখন নিজেকে নেতিয়ে, গুটিয়ে নিল।

যেন বলল, আদুরে গলায়, মিঁয়াও।

কুমার ওর সামনে তখনও দাঁড়িয়েছিল ছাতের কার্নিশে ঘাড়ের লোম-ফোলানো ল্যাজ-ওঠানো হলো বেড়োলের মতো এক অদ্ভুত হাস্যকর ভঙ্গিতে।

হঠাৎ মহুয়া সুখনকে উদ্দেশ করে বলল, আপনি কি মানুষ? আপনার গায়ে কি রক্ত নেই? যে যা বলবে, বা করবে তা আপনি মুখ বুজে সহ্য করবেন? চুপ করে মার খেতে পারেন—আপনি মারতে পারেন না। বলেই মহুয়া কেঁদে ফেলল।

সুখন একবার মহুয়ার দিকে আর একবার কুমারের দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে আশ্চর্য এক হাসি হাসল। তারপর বলল, আমি কাপুরুষ। আমি বীরপুরুষ নই। বলেই বেরিয়ে গেল।

বেরিয়ে যেতে যেতে উঠোনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সান্যালসাহেবকে উদ্দেশ করে বলল, টাকাটা মংলুর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন।

কুমার যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেইখানে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ।

এক সময় স্বগতোক্তির মতো কুমার বলল, কিন্তু মহুয়াকে শুনিয়ে—লম্বা চওড়া পাঠানের চেহারা থাকলেই বীরপুরুষ হয়-হয় না। পুরুষত্ব অন্য ব্যাপার। ফুঃ। বলেই হুইস্কির বোতল থেকে অনেকখানি হুইস্কি ঢালল গলায়।

সাত

টাকাটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাঠিয়ে দিয়েছিল কুমার মংলুকে দিয়ে।

মংলু চলে যাবার পরই সান্যালসাহেব কুমারকে বললেন, তোমার কি এখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফেরার ইচ্ছে নেই?

কুমার বলল, পৃথিবীতে আমার প্রাণের এন্ট্রান্সও যেমন আমার ইচ্ছাধীন ছিল না. এগজিটও নয়। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন? কুমার শুধোল।

কুমার ও সান্যালসাহেব দুজনেই বেশি হুইস্কি খাওয়ার দরুন "হাই" হয়েছিলেন। কুমার কম। সান্যালসাহেব বেশি।

সান্যালসাহেব বললেন, রঙের মিস্ত্রির কাছে শুনলাম যে, সকালে তুমি সুখনবাবুকে গালাগালি করার জন্যই মিস্ত্রিরা বলেছিল মারবে তোমাকে। সুখনই নাকি তাদের থামিয়েছিল। আর এখন তুমি সুখনকে থাপ্পড় মেরেছ জানলে তো আমাদের ঘরসুদ্ধ আগুন দিয়ে মারবে।

কুমার বলল, করে তা আর কী করা যাবে? আপনার অত ভয় লাগলে নিজের ইজ্জত রুমালে মোড়া শিকনির মতো পকেটে ভরে আপনি আপনার মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যান কোথাও। আমি একাই থাকব।

সান্যালসাহেব বললেন, আহা। সে কথা নয় সে কথা নয়।

এরপর বেশি কিছু কথা-টথা হল না। কথা বলার মতো অবস্থা বা মনের ভাব মহুয়া, তার বাবা বা কুমার কারোরই ছিল না।

রাতেও মুরগির মাংস আর পরোটা বানিয়েছিল মংলু। সান্যালসাহেব ও কুমার খেলেন। মহুয়া কিছুই খেল না। খাওয়া-দাওয়ার পর ওঁরা শুয়ে পড়লেন।

সান্যালসাহেব বললেন, আমার বড়ো গরম লাগবে ঘরে—আমি বারান্দাতেই শুচ্ছি।

দরজার পাশে, বারান্দায় তাঁর চৌপাই বের করে দিল মংলু।

উনি কুমারকে বললেন, দরজাটা ভেজিয়ে শুয়ো আর মহুয়াকে দেখো। আমি তো দরজার

সামনেই রইলাম। ভয় নেই। তোমাকে কেউ মারতে এলে আমাকে মেরে তারপর তোমাকে পাবে।

মংলু যখন কারখানায় গেল টাকা নিয়ে, তখন সুখন কারখানাতেই ছিল। মংলু মুখ নীচু করে টাকা দিল সুখনের হাতে। মংলুর চোখ জ্বলছিল। বলল, ওস্তাদ তুমি ছেড়ে দিলে কেন ওই লোকটাকে।

সুখন হাসল। বলল, দুর, ইঁদুর মেরে কী হবে। তুই কিন্তু ওদের যত্ন টত্ন করিস ভালো করে। টাকা ফুরিয়ে গেলে টাকা চেয়ে নিস আমার কাছ থেকে। আশা করি কাল দুপুর নাগাদ গাড়ি ঠিক হয়ে যাবে। দুপুরেই ওরা চলে যেতে পারবে যেখানে যাবার।

মংলু বলল, আপদ বিদেয় হবে।

সুখন আবার শুধোল, ওরা সকলে খেয়েছে রে?

—হ্যাঁ, কিন্তু দিদিমণি খাননি।

তাই বুঝি? স্বাভাবিক গলায় বলল সুখন।

মংলু শুধোল, আপনি ঘরে যাবেন না?

না। সুখন বলল।

মংলু মনে হল ওস্তাদ 'না'-টাকে ওর দিকে ছুঁড়ে দিল যেন।

মংলু আবার শুধোল, খাবার নিয়ে আসব এখানে?

—দূর। আবার কী খাব? দুপুরে এত খেলাম। তুই খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়। আমার ঘর থেকে একটা বালিশ আর চাদর দিয়ে যাস। আজ কারখানাতেই শোব।

কিছুক্ষণ পর বালিশ আর চাদর বগলে কারখানায় ফিরে এসে মংলু দেখল যে, কারখানার শেডের নীচে, অনেকগুলো নামনো ইঞ্জিন ও গিয়ার-বক্সের মধ্যে প্যাকিং-বাক্সের উপরে, পাঁচ লিটারের মবিলের টিন রেখে একটা টেবিল-মতো বানিয়ে নিয়েছে ওস্তাদ। তারপর চৌপাইয়ে বসে সামনে লণ্ঠন রেখে, কাগজ কলম বাগিয়ে বসেছে।

মংলু যেতেই সুখন বলল, একটু পান আর সিগারেট এনে দিবি মংলু? মিশিরজির দোকান কি খোলা আছে?

খোলা না থাকলে খুলিয়ে আনব। উৎসাহের গলায় বলল মংলু।

ওস্তাদকে বড়ো ভালো লাগে মংলুর। আরো ভালো লেগেছিল দিদিমণিকে। দিদিমণি যদি এখানে থেকে যেতে পারত, বড়ো মজা হত। আজ সকালে দিদিমণি ওর সঙ্গে লুডো খেলেছিল। কি মিষ্টি করে কথা বলে দিদিমণি। কি সুন্দর করে তাকায়। ভদ্রলোকদের সব মেয়েরাই কি এত ভদ্র, এত ভালো?

মংলু রাস্তায় মিশিরজির দোকানে পান আনতে গেছিল। দোকান তখনও খোলা ছিল। একদিকের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেলেও হ্যাজাক জ্বলছিল দোকানে, হ্যাজাকের আলোর ফালি এসে পথে পড়েছিল। দোকানঘরের পাশে কতগুলো সেগুন গাছ। হাওয়ায় সেগুনের বড়ো পাতা থেকে সড়সড় আওয়াজ উঠছিল। হাতির দাঁতের মতো দেখতে পাতাগুলো খসে যাচ্ছিল হাওয়াতে।

মহুয়া জানালায় দাঁড়িয়েছিল। ঘরে কোনো আলো ছিল না। ফিতে কমিয়ে রাখা হারিকেনটা বারান্দায় বাবার চৌপায়ার পাশে রাখা ছিল। দরজাটা আধভেজানো। দরজার দিকে কুমারের চৌপায়া। মহুয়ারটা ভেতরে।

বাবার উপর খুব রাগ হচ্ছিল মহুয়া। এত বেশি হুইস্কি খাওয়ার কোনো মানে নেই। কুমারের সঙ্গে তাকে এক ঘরে দিয়ে নিজে বারান্দায় শোওয়ারও মানে নেই। বাবার মনের ইচ্ছেটা মহুয়া বুঝতে পারে, কিন্তু কী করবে; কুমারকে কলকাতায় যাও-বা ভালো লাগত বাইরে এসে এ দু দিনেই একেবারে বিরক্ত হয়ে উঠেছে ও। কুমারকে বিয়ে করবার কথা ভাবতেও পারে না আজ মহুয়া। অ্যাপার্ট ফ্রম বিয়ে, ওর সঙ্গে অন্য কোনো সম্পর্কের কথাও ভাবতে পারে না।

জানালায় দাঁড়িয়ে ফুটফুটে কাক-জ্যোৎস্নায় ভেসে যাওয়া পথ, প্রান্তর, কজ-ওয়ের নীচের ঝিরঝির করে জল-বয়ে যাওয়া নালাটা—দূরে পাহাড় সব দেখছিল মহুয়া।

ও ভাবছিল যে, সুখ শাকুয়া-টুণ্ড থেকে ফেরার সময় বলেছিল, আরো কদিন পরে এলে দেখতে পেতেন পাহাড়ে পাহাড়ে কেমন আগুনের মালা জ্বলে—মালা বদল হয়। পাহাড়দের বিয়ে হয়। কী আশ্চর্য অনাবিল স্বল্প চাহিদার সরল জীবন সুখের। চাহিদা নেই কিছু ওর, অথচ দেওয়ার ক্ষমতা কী অসীম। এ পর্যন্ত মহুয়া একাধিক পুরুষের সান্নিধ্যে এসেছে—কিন্তু কখনও এত ভালো লাগেনি ওর আগে। অবশ্য ওর সর্বস্ব দেয়ওনি আগে ও কাউকে এমন করে। সমস্ত শরীর কারো পরশমাত্রই এমন মাধবীলতার মতো মুহূর্তের মধ্যে ফুলে ফুলে ভরে যায়নি। এই রুক্ষ অথচ ভীষণ নরম লোকটা কি যেন জাদু জানে।

মংলুকে দেখতে পেল মহুয়া। মংলু আলোর সামনে দাঁড়িয়ে পানওয়ালার সঙ্গে কথা বলছে। হাসছে কি যেন বলছে অপাপবিদ্ধ মুখে! বেশ ছেলেটা।

মহুয়া ভাবছিল, সুখন খেল কি না কে জানে? এখন আর শুধোনো যাবে না। বাবা অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। কুমার ঘুমিয়েছে কি না তাও মহুয়া জানে না। কুমার ঘুমিয়ে পড়ার আগেই মহুয়া ঘুমিয়ে পড়তে চায়—নইলে এত কাছে কুম্ভকর্ণের নাক ডাকার আওয়াজে ঘুম আসবে না কিছুতেই।

কিন্তু আজ কি মহুয়ার ঘুম আদৌ আসবে? ঘুম কি আসবে কিছুতেই? নাই-ই বা ঘুমোল এক রাত। এমন রাত। এমন সুখ-স্মৃতির; আবেশের রাত। কাল কী করবে ভাবতে হবে মহুয়াকে! ও কি সত্যিই থাকবে সুখের কাছে? যদি নাই-ই পারবে, তাহলে এত বড়ো বড়ো কথা বলল কেন ও মুখে? সুখ কি আগেই জানত যে, ও থাকতে পারবে না; থাকতে চায় না তাই-ই কি অমন করে হাসছিল তখন? যদি কিছু সত্যিই হয়, হয়ে যায় তবে কি সুখের কাছে ফিরে আসবে মহুয়া—কোনো ভিক্ষা নিয়ে? সে যদি আসেই, সুখ কি তাকে চিনতে পারবে তখন?

জানে না, মহুয়া কিছুই জানে না। এই বন-জঙ্গল বড়ো খারাপ। ফিশফিশ ফিশফিশ করে কারা যেন কথা বলে, আড়ালে আড়ালে; হাসে কারা যেন গান গায়, দীর্ঘশ্বাস ফেলে, অভিশাপ দেয়। বিড়বিড় করে ডাইনীর মতো—তাদের দেখা যায় না।

সুখকে প্রথম দেখাতেই সে সব দিতে রাজি ছিল, তবুও তার সংস্কার, তার শিক্ষা, তার সহজাত লজ্জা সব কিছু অত সহজে হারাত না ও, যদি না ভুল করে শাকুয়া-টুণ্ড-এ যেত। প্রকৃতির বুকের মধ্যে গিয়ে পড়তেই, এত বছরের শিক্ষা, শিক্ষার দম্ভ, রুচির অহংকার, লজ্জার আড়াল যেন এক মুহূর্তে কাচের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল। প্রকৃতির মধ্যে এলে কোনো আড়ালই বুঝি থাকে না; রাখা যায় না। এখানে না এলে, এ কথা জানতে পেত না মহুয়া।

এখনও পুরো ব্যাপারটা ভাবলে একটা স্বপ্ন বলে মনে হয়। দুঃস্বপ্ন নয়, একটা দারুণ সুন্দর স্বপ্ন; সে-স্বপ্ন বুঝি এ-জন্মে আর কখনও মহুয়া দেখতে পাবে না। কিংবা পাবে হয়তো, কে জানে, যদি কখনও আবার অমন পাথরের উপর, নদীর সাদা বালিতে এমন চাঁদের আলোয় সুখের বুকে আশ্লেষে ঘুমিয়ে থাকার সুযোগ আসে।

বাইরের বাতাসে মহুয়ার গন্ধ ভাসে। মহুয়ার ভীষণ গর্ব হয়। ওর নামের জন্য। কে যেন তাকে প্রথম এ নামে ডেকেছিল? যখন ডেকেছিল সে তো একটা ডাক মাত্র ছিল। আজ এই চাঁদের রাতে, দোলপূর্ণিমার কাছাকাছি, হাওয়ায়-ওড়া এত সুগন্ধের মধ্যে ও ওর নামের মাহাত্ম্য খুঁজে পেল। নাম, সে যে-কোনো নামই হোক না কেন, সে তো শুধু ডাকনাম নয়। সে-যে নিছক ডাকের চেয়ে অনেক বড়ো; হৃদয়ের অন্তঃস্তলে, মস্তিষ্কের কোষে কোষে সে ডাক হাজার হাজার কুঁড়ি ফোটায়, কুঁড়ি ঝরায়। মহুয়া ভাববারর চেষ্টা করছিল। কে—কে প্রথম তাকে ডেকেছিল মহুয়া বলে?

মংলু পান আর সিগারেট দিয়ে চলে গেল।

সুখন টেবিল ঠিক করে কারখানা থেকে বেরিয়ে কুয়োতলায় গিয়ে চান করল। তোয়ালে-টোয়ালে নেই। ভিজে গায়েই আবার ছাড়া জামা-কাপড় পরল। আঙুলগুলোকে চিরুনি করে মাথা আঁচড়াল, তারপর কারখানায় এসে তার চৌপাইয়ে বসল।

ছোটোবেলা থেকে সুখন লেখক হবার স্বপ্ন দেখেছিল। হয়েছে মোটর মিস্ত্রি। লেখার মধ্যে কলেজ ম্যাগাজিনে একটি গল্প লিখেছিল। একটি মাত্রই লেখা তার ছাপা হয়েছিল। সুখন পড়েছে, শুনেছে যে অনেক বিখ্যাত লেখকের হাতেখড়ি হয়েছে প্রেমপত্র লিখে। সে জীবনে প্রেমপত্র লেখেনি কাউকে। কলেজের একটি মেয়ে, যে তাকে চোখের ভালো-লাগা জানিয়েছিল, তার উদ্দেশে কবিতা লিখেছিল একটি, কিন্তু পৌঁছোয়নি তার কাছে। এক বন্ধু চানাচুর কিনে সেই কবিতা মুড়িয়ে বাড়ি নিয়ে গেছিল।

আর লিখেছে ডায়ারি। অনেক। কিন্তু তার ডায়ারির সে নিজে ছাড়া আর কেউ পড়েনি।

আজ সে জীবনে এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে প্রথম প্রেমপত্র লিখতে বসেছে। এ এক আশ্চর্য প্রেমপত্র।

প্রেমপত্রের উদ্দেশ্য সাধারণত প্রেমের পাত্রর কাছ থেকে প্রেম পাওয়া বা ঈপ্সিত প্রেমিক প্রেমিকাকে পাওয়া। ওর জীবনের প্রথম প্রেমপত্র সে এমন একজনকে লিখছে যে, সে কিছু চাইবার আগেই যে তাকে সবই দিয়ে দিয়েছে কিছুই বাকি না রেখে। একজন মেয়ে কাউকে ভালোবেসে যা কিছু দিতে পারে তার প্রেমিককে সেই সব-ই। তার এই প্রেমপত্রের উদ্দেশ্য, কিছু পাওয়া নয়, বরং যা পেয়েছে সেই প্রাপ্তিকে স্বীকার করা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে।

এই প্রথম এবং হয়তো বা শেষ চিঠি মহুয়াকে লিখতে বসার জন্যে সে মনে মনে নিজেকে ধন্যবাদ দিচ্ছে। একটা দারুণ ভালোলাগা, এক সার্থকতার উষ্ণবোধ তাকে অত্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। জীবনে কারো ভালোবাসা পায়নি সে এতদিন; কিন্তু আজ ওর মনে হচ্ছে যে কাউকে ভালোবাসা ও কারো কাছ থেকে ভালোবাসা পাওয়া ব্যতিরেকে কোনো পুরুষেরই পক্ষেই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। কুমারকে আজ ক্ষমা করে দিয়ে সে নিজেই নিজের কাছে প্রমাণ করেছে যে, ভালোবাসা মানুষকে বড়ো বদলে দেয়। হয়তো নিজের সত্যিকারের নিজত্বের চেয়ে কাউকে অনেক অনেক বড়ো করে; হয়তো বা ছোটোও করে কাউকে। কিন্তু যে কোনো মানুষের জীবনেই ভালোবাসার অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব যে তাকে প্রচণ্ডভাবে পরিবর্তন করে— একথা সুখন এই কয়েক ঘন্টাতেই নিশ্চিতভাবে বুঝেছে। ভালোবাসার জনের সুখে আনন্দে, যে ভালোবাসে তার যে কত গভীর সুখ, সেই জনের জন্য একটু কিছু করতে পারার মধ্যে যে কত ভালোলাগা, তা সুখন জেনেছে।

রাস্তায় বীরজু শাহর গদির কুকুরগুলো এক সঙ্গে ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে। শেয়াল-টেয়াল দেখে থাকবে কিংবা কোনো শুয়োরের দল। টাঁড় পেরিয়ে জঙ্গলের দিকে যাচ্ছে বোধহয়।

চাঁদের আলোয় মশারির মতো রাত ঝুলে আছে বাইরে।

একটা পিউ-কাঁহা ডাকছে গুঞ্জার দিকের টাঁড়ে। চারদিকে এই চাঁদের রাতে এক চকচকে অথচ স্থির স্নিগ্ধ উজ্জ্বলতা। করৌঞ্জ, শালফুল ও মহুয়ার গন্ধ ভাসছে সমস্ত আবহাওয়ায়। আঃ মহুয়া। তুমি বড়ো সুন্দর। তোমার মহুল ফুলের মতো ছিপছিপে শরীর, তোমার লাজুক লতানো ব্যক্তিত্ব— তোমার সব, সব, সব। তোমার চোখ, চিবুক তোমার ঠোঁটের তিল।

'মহুয়া', 'মহুয়া' বলে কে যেন ডাকল্ল মহুয়াকে।

মহুয়া ঘুমিয়ে পড়েছিল যে তা নয়। কিন্তু কেমন একটা মদির আবেশে নিমগ্ন ছিল। চোখ খুলে, অন্ধকারেই মহুয়া দেখল কুমার কখন তার চৌপাইয়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

বাইরে বাবার গভীর ঘুমের নিশ্বাসের একটানা ওঠানামার শব্দ শোনা যাচ্ছে। মহুয়া কিছু বলার

আগেই কুমার তার ঠোঁটে হাত রাখল। তারপর এক হাত ওর মুখে চেপে, অন্য হাতে তার বাহু ধরে তাকে তুলে নিজের চৌপাইয়ে উঠিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগল।

মহুয়ার মনে হয়েছিল, ওকে নিশিতে ডেকেছে। স্লিপ-ওয়াকিং করে পথটুকু চলে গেলে ওর আর কিছুই বাকি থাকবে না। মহুয়া আর মহুয়া থাকবে না।

তখনও সুখের সঙ্গে কাটানো সন্ধের, সেই শিরশিরানি সুখ তার শরীরে মনে মাখামাখি হয়েছিল— খুশবু আতরের মদিরতার মতো। ও তখনও নিজের বশে ছিল না। কুমার যা-কিছু করতে চাইল তার কোনো কিছুতেই মহুয়ার বিন্দুমাত্র সায় ছিল না। কিন্তু প্রথমে ও বাধা দিল না। ওর মনে হল কুমার যেন জন্মাবধি বুভুক্ষু কোনো মন্বন্তরের কাঙালি।

সুখের সঙ্গে একটুও মেলে না।

এককালীন ক্ষুধা, রুচিহীনতা, আদেখলেপনা ও অস্থির আনরোম্যান্টিক তার সঙ্গে কুমারকে কুৎসিতভাবে কুটুরে ব্যাঙের মতো জড়িয়ে ধরল।

কুমারের এই জান্তব ব্যবহার মহুয়ার ভালো অথবা মন্দ কিছু লাগল না। ওর উদাসীনতায় ও ভরে রইল। ওর মনে হল সুখনের কোলেই যেন বনজ-গন্ধে ভরা পাহাড়ি নদীর খোলে ও শুয়ে রয়েছে এখনও, আর একটা শেয়াল তার শরীর শুঁকছে, কামড়ে খাচ্ছে। ও-যে ওর সুখের কাছেই আছে, এই সুখময় বোধটুকু ছাড়া মহুয়ার আর কোনো বোধই ছিল না সেমুহূর্তে।

মহুয়া সে মদির ঘোরের মধ্যে যেন পাশ ফিরে শুল। তারপর হঠাৎ দু হাতে জোড়া করে আসুরিক শক্তিতে রোগা-পাতলা ও নেশাগ্রস্ত কুমারকে বুকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিল।

কুমার পড়ে গেল চৌপায়ার উপরে। চৌপাইটা নড়ে উঠল—হঠাৎ খুব জোর আওয়াজ হল তাতে।

বাইরে থেকে সান্যালসাহেব ঘুম ভেঙে চেঁচিয়ে উঠলেন—প্লিজ, মেরো না, ওকে মেরো না, মাফ চাইছি বাবা আমরা, আমরা মাফ চাইছি।

মহুয়া দৌড়ে এল বাইরে। বলল, বাবা, জল খাবে?

সান্যালসাহেব উঠে বসেছিলেন, স্যারা শরীর ভয়ে ঘেমে গেছিল ওঁর। মহুয়াকে দেখে উনি শুধোলেন, কুমারকে কি খুব মেরেছে ওরা? মেরে ফেলেছে?

মহুয়া ঘর থেকে জল এনে দিয়ে সান্যালসাহেবের কপালে হাত দিয়ে বলল, কুমার তো ঘুমোচ্ছে বাবা! তুমি স্বপ্ন দেখছিলে!

তবে শব্দ? শব্দ কিসের হল ঘরে। সান্যালসাহেব ঘুম জড়ানো গলায় বললেন।

কুমার ঘর থেকে বাইরে এসে বলল, বেড়াল।

মহুয়া কথা কেড়ে বলল, একটা উপোসি হুলো বেড়াল ঘরে ঢুকেছিল।

আট

আধ-ফোটা ভোরের প্রথম বাসেই সুখন নিজেই রাঁচি যাবে। এমন জিনিসই ভাঙল গাড়িটার যা, এ-তল্লাটে পাওয়া অসম্ভব। চিঠিটা শেষ করল সুখন।

হাতঘড়িতে দেখল তিনটে বাজে। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই আলোর আভাস জাগবে পুবে। মদনলাল কোম্পানির বাস ঠিক চারটে বেজে দশ-এ এসে দাঁড়াবে মিশিরজির দোকানের সামনে। তখন শেষরাত। ঝিরঝির করে আসন্ন ভোরের গন্ধ-মাখা একটা হাওয়া ছেড়েছিল।

সুখন একটা বড়ো হাই তুলল। আড়মোড়া ভাঙল। পায়েরা কাছে শুয়ে থাকা কালুয়া নড়েচড়ে বসল, ডান পা দিয়ে খচর খচর করে ঘাড় চুলকোলো, তারপর একটা বড়ো নিঃশ্বাস ফেলে সামনে দু পায়ের উপর মুখটা রেখে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

একটা সিগারেট ধরাল সুখন। সারা রাত পান খেয়ে জিভটা ছুলে গেছে। জরদাও বেশি খাচ্ছে আজকাল। মাঝে মাঝে বাঁ দিকের বুকে ব্যথা করে। কেয়ার করে না ও। নিজেকে নিয়ে, নিজের শরীরকে নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নিও। আবার একটা পান মুখে দিল। তারপর চিঠির পাতাগুলো এক সঙ্গে করে চিঠিটাকে পড়বে বলে, চৌপাইতে এসে শুয়ে পড়ল। সারারাত সোজা বসে থেকে কোমরটা ভীষণ ব্যথা করছিল। ঘুম না এসে যায়। মনে মনে নিজেকে বলল সুখন।

২৫শে মার্চ
ফুলটুলিয়া, গুঞ্জা
পালামৌ

তোমাকে মহুয়া বলেই ডাকতে পারতাম। কিন্তু তুমি চলে গেলে যে-ডাকে কেউই সাড়া দেবে না, সে ডাকে ডেকে লাভ কি?

তোমাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব, জানি না আমি। ধন্যবাদ ব্যাপারটাই পোশাকি সৌজন্যর এবং তোমার বয়-ফ্রেন্ডের গাড়ির মতোই, 'ইম্পোর্টেড'। কোনোরকম পোশাক এবং পোশাকি ব্যাপারকেই যখন আমার দুজনেই প্রশ্রয় দিইনি, তখন পোশাকি সৌজন্য আমাদের মানায় না।

এখন রাত গভীর। পায়ের কাছে কালুয়া শুয়ে আছে। কালুয়ার মন খুবই খারাপ। কালুয়া তোমাকে ভালো মনে নেয়নি। ও ওর স্বাভাবিক সারমেয় স্বভাবে ভেবেছিল, চিরদিন ও একাই আমার মালকিন থাকবে। কেউ একদিনের জন্য এসে যে আমার উপর এমন জবরদখল দেবে তা ওর ভাবনার বাইরে ছিল।

আমার ধারণা, তুমি কালুয়ার মুখের দিকে ভালো করে একবারও তাকাওনি। কালুয়া বন সুন্দরী। সাধারণত সব কুকুরের মুখশ্রীই অত্যন্ত সুন্দর। পথের কুকুরের মুখেও যে বুদ্ধিমত্তা এবং চোখে যে ব্যক্তিত্বময় ঔজ্জ্বল্য দেখা যায় তা অনেক মানুষের মুখেও দেখিনি। অনুরোধ যাওয়ার আগে আমার কালুয়ার মুখে একবার ভালো করে চেয়ো এবং ওকে একবার আদর করে যেয়ো।

তোমার সঙ্গে হয়তো আর দেখা হবে না। তবু, আমি হারিয়ে যেতে চাই না। পালাতে তো নয়ই। তাছাড়া, আমার পালাবার মতো কোনো জায়গাও নেই। সুখন মিস্ত্রি এই ফুলটুলিয়া বস্তিতেই থাকবে আমৃত্যু। তোমাদের মতো গতিবেগসম্পন্ন মানুষদের গতি যাতে অব্যাহত থাকে, তা দেখাই আমার কাজ। অথচ আমরা নিজেরা গতিমান নই; অনড়, স্থাবর।

যা ঘটে গেছে, তার জন্য আনন্দেরও যেমন সীমা নেই আমার, দুঃখের নয়। তোমার মতো একজন উচ্চবংশের, শিক্ষিতা অভিজাত মেয়েকে আমি কোনোরকম বিপদেই ফেলতে চাইনি। আশাকরি যা ঘটে গেছে তার দায়িত্ব তুমি আমার সঙ্গে সমানে ভাগ করে নেবে।

মনে কোনো পাপবোধ রেখো না এ বাবদে। যে মিলনে আনন্দ নেই, সে মিলন অভিপ্রেত নয়। আনন্দই যেন থাকে, আর আনন্দের স্মৃতি। এ নিয়ে আমার অথবা তোমার মনে কখনও যেন কোনো অনুশোচনা না হয়। তা হলে এই পরম প্রাপ্তির সব মিষ্টত্ব তেতো হয়ে যাবে চিরদিনের মতো।

তবে স্বীকার করো আর নাই-ই করো, তুমি বড়োই ছেলেমানুষ। ছেলেমানুষ বলেই তুমি এখনও অপাপবিদ্ধ, মহৎ। পৃথিবীর নীচতা, দৈনন্দিন জীবন জাত ব্যবসায়ীসুলভ সাবধানতা এখনও তোমার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করেনি। সে কারণেই তোমার পক্ষে অত সহজে সহজ হওয়া সম্ভব হয়েছিল। প্রার্থনা করি, তোমার এই সহজ-সত্তাকে চিরদিন এমনিই রাখতে পারো তুমি।

তুমি আমার জীবনটাকে, এই নিরুপায় মেনে নেওয়া মিস্ত্রিগিরির জীবনটাকে, বড়ো নাড়া দিয়ে গেলে। আমার গর্ব ছিল যে, নিজেকে বইয়ের মধ্যে, কাজের মধ্যে, ডায়ারি লেখার মধ্যে এবং আমার উৎসারিত আনন্দের উৎস এই প্রকৃতির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়ে দিয়ে আমি বুঝি এখন

স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ করতে পেরেছিলাম নিজেকে। সে নিজেকে নিয়ে, নিজের কাজ এবং অকাজ নিয়েই এ যাবৎ ষোলো আনা খুশি ছিল, খুশি ছিল শাকুয়া টুণ্ড-এর একাকী এবং একক অস্তিত্বে, বাইরের কোনো কিছুতেই তার প্রয়োজন ছিল না বলেই সে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিল।

জানো মহুয়া, শাকুয়া-টুণ্ডের নির্জন নির্মোক প্রদোষে অথবা উষার আমার প্রায়ই মনে হত আমি বোধহয় স্বয়ম্ভু। শুধু তাই-ই নয় আমি সম্পূর্ণ স্বয়ম্ভর এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ।

কিন্তু তুমি, আমার এই মিথ্যে গর্বকে ভেঙে টুকরো করে দিয়ে গেলে। বুঝিয়ে গেলে যে, জীবনে ষোলো আনা প্রাপ্তিই সব নয়। ষোলো আনার উপরেও কিছু থাকে, যা উপরি, পড়ে পাওয়া, অথচ যার উপর জীবনের সার্থকতা দারুণভাবে নির্ভরশীল! তোমার চোখের পূর্ণ শান্ত দৃষ্টিতে তোমার নম্র শান্ত ব্যবহার তোমার স্বচ্ছতোয়া শরীরের সুগভীর স্নিগ্ধ উষ্ণতায় তুমি আমাকে চিরদিনের মতো জানিয়ে দিয়ে গেলে যে পৃথিবীর কোনো পুরুষই স্বয়ম্ভর নয়। হতে পারে না।

যতদিন অভাব পূরিত হয়নি, ততদিন অভাবটাকেই একমাত্র অমোঘ এবং অনস্বীকার্য ভাবো বলে মেনে নিয়েছিলাম। সেই অবস্থাকেই স্বয়ংসম্পূর্ণতা বলে সাংঘাতিক এক ভুল করেছিলাম। তুমি আমাকে এক আশ্চর্য আকাশতলের আনন্দযজ্ঞে ডাক দিলে। আমার প্রাণের কেন্দ্রের সব শূন্য পূরণ করে জানিয়ে গেলে বরাবরের মতো যে, পুরুষের শেষ এবং একমাত্র গন্তব্য, তার চরম চরিতার্থতা শুধু কোনো নারীতেই।

তোমরা যে আমাদের রুক্ষ, ধুলোমাখা জীবনের,আমাদের নির্বুদ্ধি সর্বজ্ঞতার, আমাদের দুর্দম পুরুষালি বোধের উপর কিছুমাত্র নির্ভরশীল নও, তোমরা যে তোমার চোখ-চাওয়া, তোমাদের হাসি, তোমাদের ভালোবাসায় ঐরাবত-প্রবর স্থূল-গর্ব সর্বস্ব পুরুষদের ইচ্ছেমতো ভাসিয়ে দিতে পারো অবহেলায়, একটা দারুণ জানা।

মহুয়া, তোমাকে দিতে পারি এমন আমার কিছুমাত্র নেই। সত্যিই নেই। তোমার হয়তো প্রয়োজন কিছুতেই নেই; তবু আমার দেওয়ার আগ্রহটা তোমার প্রয়োজনের তীব্রতার উপর ডিপেন্ডেন্ট নয়। তোমাকে কিছু একটা; কোনো কিছু দেবার বড়ো ইচ্ছে ছিল—যাতে আমাকে কিছুদিন অন্তত তোমার মনে থাকে। কিন্তু এই স্বল্প সময়ে কিছুতেই ভেবে পেলাম না পার্থিব কোনো দানের কথা। কতটুকু আমার ক্ষমতা! আমার কী-ই বা আছে তোমাকে দেওয়ার মতো। তোমার যে সবই আছে, সমস্ত কিছু!

হাতে করে কিছু দিই আর নাই-ই দিই, তুমি জেনো যে, তোমাকে এমনই কিছু দিয়েছিলাম যা আর কাউকেই দিইনি, হয়তো কখনোই দিতে পারবও না।

তুমি রানির মতো চলে যাবে কাল, আমাকে ভিখিরি করে। যা-কিছু আমার ছিল, এতদিনের, এত বছরের যা-কিছু যত্ন করে রাখা—তার সবই তুমি নিয়ে যাবে তোমার সঙ্গে।

বিনিময়ে যা দিয়ে যাবে, তার সঙ্গে শুধু তুলনা চলে কোনো মহীরুহর বীজের। এই মুহূর্তে ভবিষ্যতের স্পষ্ট অনুমান ও কল্পনাও বুঝি সম্ভব নয়। আশা করি, তোমার এই দান একদিন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে আমার মনের গভীরে এক সান্ত্বনা-দাত্রী ছায়ানিবিড় গাছের মতো প্রতিষ্ঠিত হবে। তোমার স্মৃতি বুকে নিয়ে বাকি জীবনটা সুখন মিস্ত্রির দিব্যি পান জারদা খেয়ে, গাড়ি মেরামত করে হেসে খেলেই চলে যাবে।

আমার আজকে মনে হচ্ছে, বার বার মনে হচ্ছে যে জীবনে একজন মানুষ কত পায়, কতবার পায়; তাতে কিছুই যায় আসে না; কিন্তু সে কী পায় এবং কেমন করে পায় তাতে অনেক কিছুই যায় আসে।

যারা সাধারণ তারা দস্তুরের দাগা বুলিয়েই বাঁচে। একজন আর্টিস্ট-এর সঙ্গে সাধারণ লোকের এখানেই তফাত। তুমি একজন উঁচুদরের আর্টিস্ট। তোমার জীবনটাকে নিয়ে ইচ্ছেমতো রংতুলির

আঁচড় বোলাতে এবং এমনকী ইচ্ছেমতো জীবনের ইজেলটাকে ছিঁড়ে ফেলতেও বুঝি তোমার বাধে না। তুমি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোটো। তবু তোমাকে আমি এক বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছি; আমার মনে।

আমার মতো অখ্যাত লোকের মস্ত সুবিধে এই-ই যে, তাদের লেখা কোনো পত্র-পত্রিকায় ছাপা হবে না; খ্যাতি যেমন তার নেই, তেমন পাড়া-বেপাড়ার গণ্ডমূর্খদের তাকে সমালোচনা করার অধিকারও সে দেয়নি। বিখ্যাত লোকের বিচারক সকলেই, তাদের সে বিচারের যোগ্যতা থাক আর নাই-ই থাক। আমার বিচারের ভার রইল শুধু তোমারই হাতে। আমার মহুয়ার হাতে।

পরিশেষে, তোমাকে একটা কথা বলব। কথাটা হচ্ছে এই-ই যে, কুমারবাবু তোমারই শ্রেণীর লোক। তুমি এবং তোমার বয়সি অনেকেই হয়তো শ্রেণীবিভাগ মানে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই-ই যে, তোমার কি আমার মানা-না-মানার উপর আজও শ্রেণীবিভাগের কালাপাহাড় অস্বিত্বের কিছুমাত্র যায়-আসে না। তার শিকড় বড়ো গভীরে প্রোথিত আছে। তাই বলছি যে, কুমারবাবুকে বাতিল করার আগে দু বার ভেবো।

ভেবে অবাক লাগছে যে তোমার কারণেই কুমারবাবুর উপরে আমারও একটা দুর্বোধ্য দুর্বলতা জন্মে গেছে। নইলে সান্যালসাহেবকে হয়তো তার লাশ নিয়ে ফিরতে হত এখান থেকে। সুখন মিস্ত্রি গাড়ির কাজ ভালো না জানলেও খুন-খারাবিটা খারাপ জানে না। আমার যা কাজ, যাদের নিয়ে কাজ, তাতে আমার নিজেরই অজান্তে আমি অনেক বদলে গেছি। কখনও সুযোগ এলে কুমারবাবুকে বোলো, তোমার খাতিরে সুখন মিস্ত্রি ছেড়ে দিলেও অন্য অনেকে ভবিষ্যতে নাও-ছাড়তে পারে। তাঁর নিজের মুখের টোপোগ্রাফি রক্ষার স্বার্থেই তাঁকে একটু ভদ্রতা শিক্ষা করতে বোলো।

চিঠিটা অনেক বড়ো হয়ে গেল। এক সঙ্গে এত কথা মনের মধ্যে ভিড় করে আসছে যে, গুছিয়ে লিখতে পারা গেল না। আমার সমস্ত অস্তিত্বটাই বড়ো অগোছালো করে দিয়ে গেলে তুমি।

ভালো থেকো মহুয়া, সব সময় ভালো থেকো। নিঃস্বার্থভাবে মঙ্গল কামনা করার অন্তত একজন লোকও তোমার রইল, বড়ো কম পাওয়া বলে ভেবো না।

যা করলাম, অথবা করলাম না, তা সবই তোমার ভালোর জন্যই, এটুকু জেনো। তুমি যা বলেছিলে, যা করতে চয়েছিলে, তা যে নিতান্তই ছেলেমানুষি, তা তুমি এখান থেকে চলে গেলেই বুঝতে পারবে। এই চলে যাওয়ায় আমার প্রতি যেটুকু মমত্ববোধ জাগবে তোমার, হয়তো থাকবেও; সেটুকু আমার কাছাকাছি চিরদিন থাকলেও জাগত না। এটা সত্যি। বিশ্বাস করো।

যাকে কাছে রাখতে চায় কেউ, তাকে দূরে দূরে রাখাই বুঝি তাকে কাছে রাখার একমাত্র উপায়। বড়ো বেশি কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি বেশিদিন থাকলে ভালোলাগার, ভালোবাসার রংটা ফিকে হয়ে যায়।

সব সময় আমাকে মনে পড়ার দরকার নেই। পড়বে যে না সেও জানি। মাসান্তে কি বৎসরান্তে কোনো একলা অবসরের মুহূর্তে হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে-আসা জঙ্গলের বনজ গন্ধের মতো আমার কথা যদি মনে পড়ে তোমার, তাহলেই আমি ধন্য বলে জানব নিজেকে।

আমি জানি, তুমি চলে গেলে, বড়োই ফাঁকা লাগবে। আমি, কালুয়া, মংলু—আমাদের তিনজনের সংসার। পাগল-পাগল লাগবে—জানি আমি। কিন্তু কিছু করার নেই।

মহুয়া, আমার ঝড়ের ফুল; ভালো থেকো, সব সময় ভালো থেকো

—ইতি সুখন মিস্ত্রি

চিঠিটা আরো একবার পড়ল সুখন। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে অনেকক্ষণ ভাবল।

অনেকক্ষণ ভেবে-টেবে, তারপর হঠাৎ কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলল চিঠিটাকে। মনে মনে বলল, দুসস্ কী লাভ? লাভ কী?

চিঠিটা ছিঁড়ে মুঠো পাকিয়ে কাগজের কুচিগুলো কারখানার আবর্জনার স্তূপে ফেলে দিল। তারপর একেবারে নিশ্চল রইল বহুক্ষণ।

সুখন খুব বিষণ্ণতার সঙ্গে ভাবল, ছিঁড়বে যদি তাহলে এত কষ্ট করে রাত জেগে এ চিঠি লিখল কেন? কি লাভ হল?

বিড় বিড় করে বলল, সব ফেলা গেল। তারপরই ভাবল, সত্যিই কি ফেলা গেল? জানে না সুখন এতসব। এমন করে কখনও ভাবেনি আগে। কখনও যে ভাবতে হবে, তাও ভাবেনি।

সুখন বলল আবার নিজেকে, যানে দেও মিস্ত্রি। তুমি যেখানে থাকার, এই পোড়া মবিলের, ওয়েল্ডিং করার গ্যাসের গন্ধে, নানারকম যান্ত্রিক ও ধাতব শব্দের মধ্যে যেমন আছ তেমনই থাকো। হঠাৎ হাওয়ার ঝলকানিতে যেটুকু বাস পাও মহুয়ার সেটুকুই ঢের—এর বেশি আশা কোরো না, ভুলেও চেয়ো না। ভুলে যেয়ো না যে তুমি শালা দুখন মিস্ত্রির ভাই সুখন। যা পেয়েছ তা স্মৃতিটুকুই বুকে করে রেখো, রোমন্থন কোরো—গায়ের লোম পড়া দহের পাঁকে গা-ডুবানো বুড়ো মোষ যেমন করে জাবর কাটে, তেমনি করে—এর বেশি কিছু এই পোড়া জীবন থেকে তোমার পাবার নেই।

নয়

মনের মধ্যের সুখজনিত লুকোনো অথচ তীব্র আনন্দটা মহুয়াকে আধো-ঘুমে আধো জাগরণে কোথায় যেন ভাসিয়ে নিয়ে চলেছিল, হাওয়ার ভেসে যাওয়া সেগুন পাতাদের সঙ্গে।

কিন্তু মধ্যরাতে সেই আনন্দ যখন বিঘ্নিত হয়েছিল,হঠাৎ তলা-ফেঁসে যাওয়া নৌকোর মতো মনে মনে ও তালিয়ে গেল। পরক্ষণেই ফেঁসে যাওয়া মিথ্যে এবং ভেসে যাওয়াটা সত্যি একথা জানতে পেরে ও আবার আনন্দিত হয়েছিল।

কিন্তু ঘুম ভাঙতেই দেখল বেলা অনেক, শরীর মন সব ক্লান্তিতে এবং আলস্যে ভরা।

হঠাৎ চোখ মেলে শূন্য মস্তিষ্কে উপরে মাকড়সার জালভোলো টালিরা ছাদে চেয়ে রইল। অনেকক্ষণ বুঝতে পারল না যে, ও কোথায় তারপর ধীরে ধীরে সব মনে পড়ল; স-ব কিছু। মস্তিষ্কের শূন্যতা আস্তে আস্তে পাখির ডাকে রান্নাঘরের শব্দে লাটাখাম্বার জল ওঠার ক্যাঁচোর কোঁচর এই সমস্ত টুকরো টুকরো শব্দের ঝুমঝুমিতে ভরে গেল। লাল কালো কুঁচফলের মতো চোখের সামনে লাগল গতকালের স্নিগ্ধ রঙিন মুহূর্তগুলিকে। স্যাকরার নিক্তির মতো ও নিজের বিবেকবুদ্ধি বিবেচনার পাল্লায় একধারে সেই সব উজ্জ্বল মুহূর্তগুলিকে বসাল আর অন্যদিকে বসাল তার একান্ত মেয়েলি বাস্তব ও সাংসারিক বোধকে। দেখল গতকালের মুহূর্তগুলির সমষ্টির ঔজ্জ্বল্য চোখ-ভরানো মন-ভরানো; কিন্তু তার ভার কম।

মহুয়া জানল যে, তাকে আজ কুমার ও তার বাবার সঙ্গে চলেই যেতে হবে।

সুখ বাসের জানালায় বসে বাইরে চেয়েছিল। মান্দার পেরিয়ে এসেছে। একটু পর রাতু হয়ে রাঁচি পৌঁছোবে সুখন। ভোর হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। বাইরে চেয়ে নিদ্রাহীন চোখে অনেক কিছু ভাবছিল ও।

ভাবছিল কাল বিকেল ও রাতের কথা। ও জানে, এই ভাবনাটুকু ছাড়া তার নিজের বলতে আর কিছুই রইবে না। সবই চুরি হয়ে যাবে। ভাবনার মধ্যে একটি মুখ, একরাশ রেশমি চুল, দুটি দিঘল কালো চোখ, চিকন চিবুক, ঠোঁটের ছোট কালো তিলটি বারে বারে বহুদিন বহু বছর তার ঘুম কাড়বে, একটা চাপা অসহায় যন্ত্রণা বোধ করবে ও সব সময়। কাজের মধ্যে তাকে অন্যমনস্ক করে দেবে। হয়তো এমনি কোনো অন্যমনস্ক মুহূর্তেই বুকে ইঞ্জিনব্লক চাপা পড়ে তার দাদার মতো

সুখনও মারা যাবে। কিন্তু তবুও ভাবনাটুকু ছাড়া আর কোনো কিছুই রইবে না থাকার মতো, তার নিজের বলতে।

মহুয়া মুখ-টুখ ধুয়ে বারান্দায় এসে বসল।

মংলু চা দিয়ে গেছিল। রান্নাঘরের চালে বসে একটা কাক ডাকছিল।

চা-এর গ্লাস হাতে নিয়ে উদাস চোখে দূরে চেয়ে মহুয়ার মন এক বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেল।

এখানে এসেছে পরশু রাতের অন্ধকারে। আজ বোধহয় দুপুরেই চলে যাবে। সবসুদ্ধ আটচল্লিশ ঘন্টাও নয়। অথচ এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে যেন চিরদিন এখানেও ও থাকত। এত সহজে, এই স্বল্প সময়ে এক একটা জায়গার উপর কী করে যে এমন মায়া পড়ে যায় তা ভাবলে আশ্চর্য লাগে।

মংলু এসে দাঁড়াল। হাসল একগাল। শুধোল, নাস্তা কী হবে?

মহুয়া চমকে উঠল। হাসি পেল ওর। যেন এ ওরই সংসার। নাস্তা কী হবে, দুপুরে কী হবে এবং যেন মহুয়া না বললে চলছিল না।

মহুয়া বলল, মংলু তোর ওস্তাদ কী কী খেতে ভালোবাসে রে?

মংলু অবাক হল প্রথমটা—তারপর অনেক ভেবে-টেবে বলল, ওস্তাদ কিছু ভালো-টালো বাসে না। তারপরই বলল এঁচড়ের তরকারি।

মহুয়া হেসে ফেলল ওর বলার ধরন দেখে। তারপর শুধোল, এখানে এঁচোড় পাওয়া যায়?

—রঙের মিস্ত্রির বাড়িতে একটা কাঁঠাল গাছ আছে। তবে ভালো হয় না এখানে কাঁঠাল। যদি বলেন তো খোঁজ করতে পারি এঁচোড় ধরেছে কি না।

মহুয়া উৎসাহের সঙ্গে বলল, যা না এক দৌড়ে;দেখে আয়।

—এখন? মংলু দ্বিধায় পড়ে বলল।

—কেন, এখন যেতে অসুবিধা?

—না। তবে বাবুরা বেড়াতে গেলেন—ফিরে এসেই তো নাস্তা করবেন, নাস্তার বন্দোবস্ত করতে হবে তো।

—সে আমি করছি। তুই যা না।

মংলু চলে গেলে মহুয়া ভাবল—যেমন বাবা, তেমন কুমার। সব সময় কী ভাবে, কেমন করে খাবে এই ভেবেই দিন কাটিয়ে দিল।

রান্নাঘরে গিয়ে অনেকগুলো ডিম একসঙ্গে ভেঙে অমলেট বানবে বলে কাঁচা লংকা, পেঁয়াজ আদার কুঁচি এসব কেটে ফেটিয়ে রাখল। চিজ থাকলে চিজ অমলেট বানাতে পারত। গত রাতের মুরগি ছিল কিছু, মহুয়া ও সুখন কেউই খায়নি। দুটো ঠ্যাং থেকে মাংস ছাড়িয়ে কিমা মতো করে নিয়ে ও ঠিক করে রাখল। আটা মেখে রেখেছিল মংলু—লেচি বানিয়ে রাখল মহুয়া। তারপর আলু আর কুমড়ো কাটল একটা ছেঁচকি মতো বানাবে। তারপর সব ঢেকে-ঢুকে রেখে সুখনের ঘরে এল।

সত্যি! ঘর না যেন একটা কি! একেই বোধ হয় বলে ব্যাচেলারস ডেন।

কাল সন্ধেয় সুখনের রোমশ বুকে শুয়ে থাকার সময় ও যেমন একটা উগ্র অথচ মিষ্টি গন্ধ পেয়েছিল, সারা ঘরে সেই গন্ধই ছড়িয়ে আছে। হাওয়ায় ভাসছে। বাঘের মতো প্রত্যেক পুরুষের গায়েই বোধ হয় নিজস্ব গন্ধ থাকে। বাবার গায়ের গন্ধ মহুয়া চেনে। বাবার ছাড়া-জামাকাপড় ধোপাবাড়ি পাঠাতে, কাচতে দেবার সময় সে গন্ধটা চিনেছে মহুয়া। কিন্তু সুখনের গায়ে অন্যরকম গন্ধ। বুনোফুলের মতো ঝাঁঝালো।

মহুয়া ঠিক করল চলে যাবার আগে আজ নিজের হাতে সুখনের ঘরটা মনমতো সাজিয়ে দিয়ে যাবে। ফুলদানির বিকল্প, সুখনের ঘরের ভাঙা কাচের গ্লাসের ফুলসুদ্ধ একটা মহুয়ার ডাল আনিয়ে রেখে যাবে। মহুয়া চলে যাবার পরও যেন ওর গন্ধ থেকে যায় সুখনের গন্ধের সঙ্গে।

সুখনের খাটের উপর বসল মহুয়া। বুকের মধ্যে ভারী একটা চাপা কষ্টবোধ করতে লাগল। বাবাকে বলে সুখনের জন্য কলকাতায় একটা চাকরির বন্দোবস্ত যে করতে পারে না মহুয়া তা নয়, কিন্তু প্রথমতো সুখন তা গ্রহণ করবে না বলেই মহুয়ার বিশ্বাস। দ্বিতীয়ত, এই পরিবেশ থেকে—এই শাকুয়া-টুঙ, পলাশ, টুঁই পাখিদের এলাকা থেকে সুখনকে উপড়ে নিয়ে গেলে সুখন আর এই সুখন থাকবে না। তা করে কোনই লাভ নেই।

মহুয়া ভাবছিল সুখন কি চিঠি লিখবে ওকে। যদি না লেখে। চিঠি লিখবে না সুখ? তাহলে এই হঠাৎ নামা, হঠাৎ থাকা, হঠাৎ-হঠাৎ-ঘটা ঘটনাগুলো ঘটার কী দরকার ছিল।

কাঁচা রাস্তা ধরে গুঞ্জার দিকে বেড়াতে গেছিলেন সান্যালসাহেব ও কুমার। বেরিয়েছিলেন অনেকক্ষণ। এখন ফিরে আসছেন।

সান্যালসাহেব বলছিলেন, হ্যাঁ, তোমাকে যা বলছিলাম, মাঝে মাঝে ও-রকম কষ্ট করা ভালো। এ-রকম ভাঙা টালির ঘর, নোংরা আন অ্যাটাচড বাথরুম, নানারকম অসুবিধা—এতে পার্সপেক্টিভরা অনেক ব্রডার হয়।

কুমার চুপ করেছিল। ওর চোখের সামনে ভেসে উঠছিল ছোটোবেলার কথা। বস্তির মধ্যে ওদের ঘর। দাওয়ায় বসে মুড়ি-খাওয়া। টু হেল উইথ পার্সপেক্টিভ।

কুমার কথা ঘোরাল। বলল, যাক, আপনি তখন ঠিকই বলেছিলেন রাফিং হয়ে গেল জবরদস্ত। এখন দেখুন সে ব্যাটা মিস্ত্রি আজও ডোবায় কি না। এদিকে বেতলাতে ঘর পাওয়া গেলে হয়। এতদিন কি আর ওরা আমাদের জন্য ঘর রেখে দিয়েছে?

সান্যালসাহেব বললেন, আরে চলো, বন্দোবস্ত একটা হবে।

কুমার বলল, হ্যাঁ, যেখানেই হোক এর চেয়ে অন্তত ভালো অ্যাকোমোডেশন পাওয়া যাবে।

সান্যাল সাহেব স্বগতোক্তির মতো বললেন, যতই ভাবছি ব্যাপারটা খুবই অবাক করছে আমায়।

কোন ব্যাপারটা? কুমার শুধোল।

—এই মহুয়ার ব্যাপারটা।

কোনটা? তাড়াতাড়ি শুধোল কুমার। একটু ভয়ও পেল।

বুড়ো কি রাতে জেগেছিল নাকি?

সান্যালসাহেব বললেন, মহুয়ার এই অ্যাডজাস্টএবিলিটির ক্ষমতা।

তারপর বললেন, মেয়ে যে আমার এমন সুন্দর মানিয়ে নেবে তা কল্পনারও অতীত ছিল। ওর মধ্যে খুব একটা শিক্ষার জিনিস দেখলাম। জীবনের সব কিছু মানিয়ে নিয়ে, মেনে নিয়ে তার মধ্যে থেকে আনন্দ নিংড়ে নেবার ক্ষমতাটা একটা দারুণ গুণ।

কুমার বলল, তা যা বলেছেন। তবে আপনি ইনডায়রেক্টলি আমাকে যা-ই বলার চেষ্টা করুন না কেন, আমি ওই ভাঙা গেলাসের কেলে ও পুরোনো মোজার গন্ধের চা, ছারপোকা ভরা মোড়ায় বসা—এ-সবই মানিয়ে নিতে রাজি আছি, মানিয়ে নিয়েওছি; কিন্তু ওই অ্যারোগ্যান্ট মিস্ত্রিকে মানিয়ে নিতে বলবেন না আমায়।

সান্যালসাহেব একটু চুপ করে থেকে বললেন, জানো কুমার, যত লোক আমরা দেখি তারা কেউই খারাপ নয়। এমনকী অন্ধকারতম চরিত্রের মধ্যেও একটা আলোকিত জায়গা থাকে। আসল কথাটা হচ্ছে, এই আলোকিত জায়গাটা আবিষ্কার করে ফেলতে পারলে দেখবে যে, পৃথিবীতে সকলেই তোমার বন্ধু, বশংবদ, শত্রু তোমার কেউই নয়। কোনোই গুণ নেই এমন মানুষ কি কেউ আছে? আর দোষ নেই এমনও তো কেউ নেই। দোষগুলো ভুলে গুণ দেখলেই যেকোনো মানুষের মধ্যেই একটা চমৎকার মানুষকে আবিষ্কার করা যায়।

কুমার মনে মনে বলল, মাই ফুট। বৃদ্ধ ভাম আবার জ্ঞান দিতে শুরু করেছে।

কুমারের নীরবতাকে সম্মতি ভেবে ভুল করে সান্যালসাহেব আবার শুরু করলেন, সেদিন আমার বন্ধু ভ্যাবলা রায়, ভ্যাবলা রায়কে চেনো তো, ইনকাম ট্যাক্সের বাঘা অ্যাডভোকেট, আমাকে একটা বই পড়তে দিয়ে গেছিল। জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির লেখা। বইটা পড়ে আমি রীতিমতো চমকে গেছি। উনি বলেছেন যে আমরা সকলেই হয় ভবিষ্যতের জন্য বাঁচি অথবা অতীতের স্মৃতি মন্থন করে, কিন্তু বাঁচা উচিত শুধু বর্তমানে। কারণ বর্তমানের প্রতিটি মুহূর্তের মালা গেঁথেই জীবন।

কুমার মনে মনে বলল, খেয়েছে। আবার মালা-ফালা গাঁথতে লেগেছে বুড়ো। সকাল থেকেই মনে হচ্ছে আজ দিনটা খারাপ যাবে।

একটা লোক একটা হাঁড়ি মাথায় নিয়ে টাঁড় পেরিয়ে যাচ্ছিল। প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার জন্য প্রায় বেপরোয়া হয়ে কুমার হঠাৎ তাকে উদ্দেশ করে বলল, হাঁড়িমে কেয়া হ্যায়, তাড়ি?

নেহি বাবু।—লোকটা অনিচ্ছাসহকারে বলল। তারপরেই সাহেবি পোশাক পরা দুজন লোককে আসতে দেখে আবগারি অফিসার টফিসার ভেবে টাঁড় পেরিয়ে ভোঁ-দৌড় লাগল। দৌড় লাগাবার আগে বলে গেল, কুচ্ছু নেহি ইসমে কুচ্ছু নেহি হ্যায়।

কুমার তার বাঁশপাতার মতো শরীর থেকে একটা বাজখাঁই আওয়াজ বের করে বলল, অ্যাই। ইধার আও! ইধার আও!

লোকটা ততক্ষণে ওধারে চলে গিয়ে উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার করেছেও হয়তো বা কুমারকে সান্যালসাহেবের হাত থেকে।

কুমার বলল, একটু খেজুরের রস পেলে খাওয়া যেত।

—কোথায় আর পাবে।

তাই-ই তো ভাবছি, কুমার বলল।

মহুয়া সুখের ঘর গোছাতে লাগল। দেখতে দেখতে সুন্দর করে গুছিয়ে ফেলল ঘরটা। বিছানার চাদর, জামা-কাপড় সব বের করে বারান্দায় রাখল। আজ নিজ হাতে কেচে দেবে যাওয়ার আগে। সুখ ওকে অনেক সুখ দিয়েছে; মনের সুখ, শরীরের সুখ। ওর জন্য এইটুকু না করলে, না করে যেতে পারলে বড়োই ছোটো লাগবে নিজেকে।

সান্যালসাহেব ও কুমার বেড়িয়ে ফিরলেন। মংলুও ফিরল হাতে একটা এঁচোড় নিয়ে, কুমার দেখেই আঁতকে উঠল। বলল, এ কি এঁচোড়? এঁচোড় কি ভদ্রলোক খায়? আজ কি এঁচোড় রান্না করবে নাকি তুমি? বলেই মহুয়ার দিকে তাকাল।

মহুয়ার আজ সকাল থেকেই ইচ্ছে করছিল যে, কুমারের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে। কিন্তু কুমার কোনো সুযোগ দিচ্ছে না।

মহুয়া বলল ছোটোলোকেরাই না-হয় খাবে, ভদ্রলোকরা না খেলেই তো হল।

সান্যালসাহেব বললেন, এই যে মংলু, তাড়াতাড়ি নাস্তা লাগাও তো বাবা। বহুত ভুখ লাগা হ্যায়।

তারপর কুমারের দিকে ফিরে বললেন, জায়গাটার গুণ আছে—জলহাওয়া খুবই ভালো—দেড়-দিনেই কেমন বেটার ফিল করা যাচ্ছে, তাই না?

কুমার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, হ্যাঁ। জল আর হাওয়া ছাড়া আর কিছুই তো এখানে নেই। তাই জল হাওয়াও যদি ভালো না হতো তবে তো বিপদের কথা ছিল।

কিছুক্ষণ পর ওরা মুখ-হাত ধুয়ে বারান্দায় বসেই নাস্তা করছিল। মহুয়া ও মংলু তদারকি করছিল। কুমার বলল, এ-রকম প্রিমিটিভ হাউসওয়াইফের মতো শেষে খাওয়ার মানে নেই। বসে পড়ো আমাদের সঙ্গে, বসে পড়ো।

মহুয়া বলল, ঠিক আছে। আপনারা খান না। সামনে বসে খাওয়াতে ভালো লাগে আমার।

কথাটা বলতে বলতেই, মহুয়ার চোখের দৃষ্টি নরম হয়ে এল। কাল বিকেলে, তার সামনে মাটির দাওয়ায় আসন পিঁড়ি হয়ে বসে থাকা একজন পূর্ণবয়স্ক শিশুর কথা মন পড়ল।

কথাটা শুনে কুমারের ভালো লাগল। ও ভাবল, কাল রাতের পরই মহুয়া ওর সঙ্গে খুবই অ্যাটাচড ফিল করছে। ইট ওয়াজ আ গ্রেট এক্সপিরিয়েন্স—যদিও একতরফা।

কুমার চোখ তুলে মহুয়ার চোখে তাকাল। বলল, ইউ আর রিয়েলি গ্রেট।

মহুয়া কুমারের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই চোখ নামিয়ে নিল।

কাল ঘরের মধ্যে ঘুমের ঘোরের গ্লানি, লজ্জা এবং হয়তো ঘৃণাও তার মনে ছেয়ে এল। ওর মনে হল, সুখ হচ্ছে গিয়ে ডাকাত, আর এটা একটা ছিঁচকে চোর। লুণ্ঠিতই যদি হতে হয়, তাহলে ডাকাতের হাতে হওয়াই ভালো।

হঠাৎ কুমার বলল, মংলু যা তো একবার দেখে আয় তোর ওস্তাদ এল কি না। গাড়িটা যে কখন ঠিক হবে তার কোনো হদিসই পাওয়া যাচ্ছে না।

মংলু চলে যেতেই কুমার বলল, আমাদের হাবভাব দেখে মিস্ত্রি ভাবছে আমাদের এখানে থেকে নড়ার ইচ্ছে নেই—কি যেন মধু পেয়েছি আমরা—এমনই মধু যে দু বেলা বারান্দায় কাঙালি ভোজনের মতো করে চেটেপুটে খেয়ে আমরা দিব্যি আনন্দে আছি—আমাদের যেন ফ্রন্ট গিয়ার, রিভার্স গিয়ার সবই অকেজো হয়ে গেছে। একেবারে যাচ্ছেতাই অবস্থা।

একটু পর মংলু এসে বলল, ওস্তাদ ফিরে এসেছে। গাড়ির কাজ শুরু হয়েছে। ওস্তাদ নিজে তো আছেই আর চার-পাঁচজন মিস্ত্রি হাত লাগিয়েছে। বেলা একটার মধ্যেই গাড়ি ঠিক হয়ে যাবে।

কুমার চেঁচিয়ে উঠল। বলল, থ্রি চিয়ারস ফর মংলু। হিপ হিপ হুররে, হিপ-হিপ হুররে।

পরক্ষণেই খুশি খুশি গলায় হিন্দিতে বলল, মংলু, গরম গরম পরোটা লাও।

সান্যাল সাহেবকেও খুশি খুশি দেখাল। এই দেড় দিনের গতিহীনতা তাঁর মধ্যে কেমন একটা স্থবিরত্ব এনে ফেলেছিল। আবার গাড়ির সামনের সিটে বসবেন, আবার হাওয়া লাগবে চোখে-মুখে কত নতুন পথ, মোড়, পাহাড়, বন—ভালো লাগা। সবচেয়ে আশ্বস্ত হলেন তিনি মনে মনে এই ভেবে যে, এই সুখন মিস্ত্রির খপ্পর থেকে মহুয়াকে উদ্ধার করে নির্ভাবনায় এবার কুমারের জিম্মায় দেওয়া যাবে। সুখন মিস্ত্রির উপর রাগ কুমারের যতটা না ছিল, তাঁর ছিল তার চেয়েও বেশি। আসলে কুমারের খুব অ্যাডমায়ারার হয়ে গেছেন তিনি কাল রাতে সুখনকে চড় মারার পর। ছোকরার বাহাদুরি আছে। লিকপিকে হলে কি হয়, মেরে তো দিল চড়। ওই চড়টা মারাবার ইচ্ছে ছিল তাঁরই। কিন্তু ছোটোবেলা থেকে অন্তর ও বাহিরের মধ্যে একটা ব্যবধান রচনা করে এসেছেন। তিনি। মনে যাই-ই থাক, মুখে কিছু বলেননি কখনও কাউকেই। মন আর মুখ এক করা ব্যাপারটা তিনি মূর্খামি ও ব্যাড স্ট্রাটেজি বলেই চিরদিন বিশ্বাস করে এসেছেন।

সুখনকে কিছু বলতে পারেননি, পাছে মহুয়া তাঁকে বুঝে ফেলে। মহুয়ার চোখের সামনে তাঁকে সব সময় একটা নিরপেক্ষতার মুখোশ পরে থাকতে হয়েছে। সান্যালসাহেব জানেন যে, অভিনয়টা তিনি ভালোই বোঝেন এবং কুমার যতই লাফাক-ঝাঁপাক না কেন, বুদ্ধি জোরে তিনি কুমারকে ট্যাঁকে করে নিয়ে এক হাট থেকে অন্য হাটে গিয়ে বিক্রি করে আসতে পারেন। 'শো অফ এমোশনস' কোনো বুদ্ধির লক্ষণ নয়। সেন্টিমেন্ট এমোশন এসব বাজে বোধ তাঁর কখনও ছিল না। ঠান্ডা মাথায় দাবার চাল চেলে এসেছেন তিনি সব সময়—অনেক হাতি ঘোড়া নৌকো উলটেছেন আজ অবধি।

পরোটাতে অমলেট জড়াতে জড়াতে ভাবছিলেন সান্যালসাহেব যে, একমাত্র একটা চালেই তিনি ভুল করেছিলেন জীবনে। সে শ্যামলীকে দেওয়া চাল। শ্যামলী, একমাত্র সে-ই, তাকে বড়ো বোকা বানিয়ে দিয়েছিল এ জীবনে। শোধ তোলার উপায়ও নেই আর।

মহুয়াকে তিনি ভালোই বোঝেন। এই জেনারেশানের ছেলে-মেয়েদের জানতে তাঁর আর বাকি নেই। সুখন মিস্ত্রিকে মহুয়াই যে নাচিয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কালকে মহুয়ার অন্তর্ধানের মানে সান্যালসাহেব বিলক্ষণ বুঝেছিলেন, প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন। মহুয়া সারা সন্ধে ওই মিস্ত্রির সঙ্গেই ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই সান্যালসাহেবের। মিস্ত্রির সঙ্গে মহুয়ার একটা অ্যাফেয়ার যে হয়েছে তা তিনি বুঝতে পারেন। কিন্তু ঠিক কতখানি গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে তা উনি জানেন না—তবে কুমার যা বলেছিল তা ঠিকই। সময়টা নিশ্চয়ই খারাপ কাটেনি মহুয়ার।

এইসব কারণে, গাড়ি সারানো হচ্ছে, গাড়ি একটু পরেই ঠিক হয়ে যাবে, এই খবরে সবচেয়ে খুশি হয়েছিলেন তিনি। জীবনে পরের বউ ভাগিয়ে এনে এক স্ক্যান্ডাল করলেন। তারপর সেই বউ অন্য লোকের সঙ্গে চলে গিয়ে আর এক স্ক্যান্ডাল করল। তার উপর মেয়ে মোটর মিস্ত্রির সঙ্গে চলে গেলে সমাজে আর মুখ দেখাতে পারবেন না তিনি। সেদিক দিয়ে শ্যামলী তার মুখোজ্জ্বলই করেছে বলতে হবে। পালিয়েছে তো কোম্পানির ফরাসি ডিরেক্টরের সঙ্গে। চলে যাওয়ার পর লোকে বলেছে—শ্যামলীর তাহলে রূপগুণ কি একবার ভেবে দেখো। সে মেয়ে যে এতদিন তোমার সঙ্গে ছিল এই-ই তো যথেষ্ট সম্মান তোমার।

কিন্তু সেই পরিপ্রেক্ষিতে মহুয়া যদি সুখন মিস্ত্রির সঙ্গে এখানে থেকে যেত, তাহলে কী যে হতো ভাবতেই পারেন না সান্যালসাহেব। স্ক্যান্ডাল বড়ো ভয় করেন তিনি। ঘোমটার নীচে খ্যামটা নাচো। জানছে কে? লোকসমাজে না জানিয়ে যা খুশি করো না। আপত্তির কোনো কারণ দেখেন না তিনি। কিন্তু এ সব কী?

মহুয়ার দিকে নরম গলায় সান্যালসাহেব বললেন, এবারে চান-টান করে তাহলে তুই খেয়ে নে মা।

তারপরেই কুমারের দিকে ফিরে বললেন, কখন বেরোবে ঠিক করেছ কুমার?

কুমার বলল, একটায় গাড়ি ঠিক হলে, তখনই বেরিয়ে পড়া যাবে।

বেতলা এখান থেকে ক-ঘন্টার রাস্তা। কুমার বলল।

—তা হলে তো দুপুরটা রেস্ট করে বিকেল বিকেল বেরোলেই হয়।—মহুয়া কী বলিস?

মহুয়া নিচু, অন্যমনস্ক গলায় বলল, আমার কিছু বলার নেই। তোমরা যা বলবে।

কুমার খাওয়া শেষ করে বলল, মহুয়া তুমি চান-টান করো। ততক্ষণে আমরা গিয়ে গাড়ির কাজ একটু তদারকি করি। যা ঢিলে লোক—ওর উপর ছেড়ে দিলে আবার কী ঘটাবে কে জানে?

সান্যালসাহেব ও কুমার কারখানার দিকে চলে গেলেন। মহুয়া মংলুকে রান্নাঘরে বারান্দায় খেতে বসাল। মহুয়া মংলুকে ভালো করে আদর করে খাওয়াচ্ছিল। মংলু অভিভূত হয়ে পড়েছিল। এ-রকম আদর-যত্নে ও অভ্যস্ত নয় মোটেই।

মহুয়া বলল, ডিমটা নে আর একটু।

মংলু বলল, আপনি না খেলে আমি খাব না।

মহুয়া ধমক দিল। বলল, আমি বড়ো না তুই বড়ো? কথা শুনতে হয়।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, তোর ওস্তাদ রাতে কিছু খেয়েছে?

—নাঃ। জরদা পান শুধু।

—একটু পরে গিয়ে ওস্তাদকে ডেকে আনবি। তোর ওস্তাদ খেলে তবে আমি খাব।

মংলু বলল, আমি যেতে পারব না। আমাকে মারবে ওস্তাদ। তার উপর তোমাদের সঙ্গে ওই বাবু থাকবে তো সঙ্গে—কে যাবে ওর স্যমনে?

আমি চিঠি দিয়ে দেব তোর ওস্তাদকে। আমার চিঠি পেলে নিশ্চয়ই আসবে।—আত্মবিশ্বাসের গলায় বলল মহুয়া।

মংলু বলল, তা আসবে। আপনি আসতে বললে আসবে।

একটু পর মংলু বলল, দিদিমণি, আপনি থেকে যান না এখানে?

মহুয়া বলল, এ কথা বলছিস কেন?

মংলু বলল, আপনাকে খুব ভালো লেগেছে বলে। আর জানেন দিদিমণি আপনার কথা ওস্তাদ যা শোনে আর কারো কথাই তেমন শোনে না। আপনি থাকলে ওস্তাদ আর সকলের উপর ওস্তাদি করতে পারবে না। ওস্তাদেরও একজন ওস্তাদ হবে।

মহুয়া চোখ দিয়ে হাসছিল, বলল, আমি কোথায় থাকব।

—কেন? তোমার যে ঘরে আছ এখন, সে ঘরে। তুমি দেখো তোমার কোনো অযত্ন করব না আমরা। দুপুরে রোজ আমি আর তুমি লুডো খেলব। খুব মজা হবে, তাই না?

'হুঁ।' মহুয়া বলল। তারপর বলল, থাকতে পারলে বেশ হত।

মংলুর খাওয়া হয়ে গেলে, মহুয়া সুখের ঘর থেকে কাগজ আর ডট পেন নিয়ে একটা চিঠি লিখল—

"সুখ,

আপনার জন্য খাবার নিয়ে বসে আছি আপনার ঘরে। একবার এখুনি আসবেন।

মংলু মুখ-টুখ ধুয়ে চিঠিটা নিয়ে কারখানায় চলে গেল। তারপর ওস্তাদকে ডেকে নিয়ে চিঠিটা দিল।

সুখন চিঠিটা পড়েই ছিঁড়ে ফেলল। সুখনের না-কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি, রোদে মাটিতে ধুলোতে ঘামে বিচ্ছিরি চেহারা, রাত-জাগা লাল-লাল চোখ দেখে মংলু ভয় পেল।

সুখন বলল, এখন সময় নেই কোথাও যাবার। আগে গাড়ি সারাব, তারপর অন্য। বলে দিস গিয়ে।

মংলু আর কথা বাড়াল না। মহুয়াকে এসে সব বলল।

মহুয়া ভীষণ ক্ষুব্ধ হল। মহুয়া ভেবেছিল, তার নিজের হাতের লেখা চিঠি এবং নিরিবিলিতে তারই একা ঘরে আমন্ত্রণ জানাবার মানে বুঝবে সুখ। মহুয়া অনেক কিছু কল্পনাও করে নিয়েছিল। কল্পনা করেছিল যে সুখ ঘরে ঢুকেই তার সবল হাতে ওকে জড়িয়ে ধরবে, আদর করবে। মহুয়া ভালো লাগায় মরে যাবে।

খুব রাগ হল মহুয়ার।

মংলু শুধোল, যাবেন না দিদিমণি? চলুন, আপনার খাবার দিই।

মহুয়া বলল, না। কিছু খাব না আমি। আমাকে এক কাপ চা করে দে তো মংলু।

একা ঘরে, সুখনের ঘরময় পায়চারি করতে করতে অভিমানে মহুয়া দু চোখ জলে ভরে এল। লোকটা সত্যিই জংলি, অভদ্র, মেয়েদের সম্মান করতে জানে না।

চা-টা খেয়ে, মহুয়া এক সময় এঁচোড়ের তরক্যারিটা নিজে হাতে রাঁধবে বলে রান্নাঘরে গেল। ঠিক করল তরকারি রেঁধে তারপর ভিজোনো কাপড়গুলো কেচে দেবে।

সুখন ও আরও তিনজন মিস্ত্রি কাজ করছিল। মিস্ত্রিরা যত তাড়াতাড়ি পারে হাত চালিয়ে কাজ সারছিল। কারখানার মধ্যে নিমগাছের ছায়ায় একটা ভাঙা মাডগার্ডের উপর বসে কুমার তদারক করছিল কাজের।

একটা ছোকরা মিস্ত্রি বনেটের উপর রাখা রেঞ্জটা তুলে নেবার সময় হাত ফসকে সেটা বনেটের উপর পড়ে যেতেই সেখানের রঙটা সামান্য চটে গেল এবং একটা টোল মতো পড়ে গেল।

কুমার এক লাফে এগিয়ে বলল, করেছ কী? এটা কী হল? এই যে কলকাতার মির্জার গ্যারাজ থেকে রং করিয়ে নিয়ে এলাম সদ্য, আর রং যে চটালে বড়ো? যত সব গেঁয়ো উজবুক-বুড়বাকের দল।

ছোকরা মিস্ত্রিটা লাল চোখে একবার তাকাল কুমারের দিকে, কিন্তু কিছু বলল না। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই সেই মিস্ত্রির হাত থেকে আবারও রেঞ্চটা বনেটের উপর পড়ল।

কুমারের মনে হল মিস্ত্রিটা যেন ইচ্ছে করে এবং আছাড় মারার মতো জোরে ওই ভারী রেঞ্চটাকে ফেলল। রেঞ্চটা পড়তেই একটা বড়ো টোল পড়ল বনেটে।

কুমার দৌড়ে এসে বলল, বাস্টার্ড!

কথাটা বলতেই, ছোকরা মিস্ত্রিটা এক লাফে চিতাবাঘের মতো এসে পড়ল কুমারের ঘাড়ে। তারপর এক বেদম চড় কষাল কুমারের গালে।

চড় কষাতেই কুমার থতোমতো খেয়ে পিছিয়ে গেল। সমস্ত কারখানার মিস্ত্রিরা কাজ থামিয়ে ঐদিকে চেয়ে রইল। দু'একজন এগিয়েও এল।

ছোকরা মিস্ত্রি বলল, আর একটা কথা বলেছ তো পেঁয়াজীর বার করে দেব। শালা তেল দেখাতে এসেছ এখানে? দু দিন ধরে তেল দেখাচ্ছ। এ জায়গারা নাম ফুলটুলিয়া। এ তোমার কলকাতা নয়। এখানে মেরে, গুঁড়িয়ে তোমার অ্যাশ ধরিয়ে দেব বুড়োর হাতে। কোথায় খাপ খুলতে এসেছ জানো না।

মিস্ত্রিদের সকলের মুখ-চোখের অবস্থা দেখে কুমার নিজের দামি টেরিকটের প্রিন্টের শার্টের মধ্যে ধুকপুক করা কলজেটাকে গুটিয়ে নিল।

ওর মুখ শুকিয়ে গেছিল। চড়টা বড়ো জোর মেরেছে ছোকরা। মনে হচ্ছিল ওর গালে কেউ লংকাবাটা লাগিয়ে দিয়েছে, এমনই জ্বলছিল গালটা।

ছোকরা মিস্ত্রি আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল। এমন সময় সুখন জলদ-গম্ভীর গলায় বলল, এ রামলাল, মেরে তোর খুপরি খুলে নেব, কারখানার মধ্যে দাঁড়িয়ে খদ্দেরের গায়ে হাত? তোরা ভেবেছিস কি? আমি কি মরে গেছি।

তারপর কুমারের দিকে ফিরো কালিমাখা হাত দুটো জোড় করে বলল, মাফ করে দেবেন। আমি ওর হয়ে মাফ চাইছি। রেঞ্চটা ওর হাত থেকে অ্যাকসিডেন্টলি পড়ে গেছিল। যাই-ই হোক, আমি ক্ষমা চাইছি।

সান্যালসাহেব এতক্ষণ ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে এগিয়ে এসে সেই ছোকরা মিস্ত্রিটির কাছে গিয়ে নরম গলায় বললেন, তুমি বড়ো ছেলেমানুষ ভাই। অত সহজে মাথা গরম করে? তার পর কুমারের দিকেও ফিরে বললেন, উই আর ভেরি আপসেট। এসো, এসো। বসে একটা সিগারেট খাও কুমার। ডোন্ট গেট এক্সাইটেড। যা হবার তা হয়ে গেছে।

কুমার সরে আসতে বলল, আই উইল টিচ দিস বাস্টার্ডস আ গুড লেসন—

কুমারের কথা শেষ হবার আগেই সেই ছোকরা মিস্ত্রিটি আবার মুহূর্তের মধ্যে উড়ে এসে কুমারের পেছনে কষে এক লাথি লাগাল। লাথি লাগিয়েই বলল, শালা তোর মাকে ডাক। এ জন্মের মতো চারদিক দেখে নে ভালো করে—নাক ভরে মহুয়ার গন্ধ শুঁকে নে—তোর আজই শেষ দিন।

সুখন এবার দৌড়ে গিয়ে ওদের মধ্যে পড়ল। পড়ে ওকে টেনে আনল জামার কলার ধরে। বলল, বড়ো রংবাজ হয়েছিস তো তুই। আমি বারণ করা সত্ত্বেও তুই এমন করছিস?

ছোকরা বলল, তুমি ঠিক করছ না ওস্তাদ। আমরা কি মানুষ নই? ও শালা যা-তা গালাগালি করছে কেন ফের?

সান্যালসাহেব দেখলেন পরিস্থিতিটা এমন হয়ে যাচ্ছে যে তাঁর মতো বিচক্ষণ মাথাঠান্ডা লোকের পক্ষেও এটা নিয়ন্ত্রণ করা খুব মুশকিল হয়ে পড়ছে। তিনি হাতজোড় করে থিয়েটারি কায়দায় দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, ভাই সব, আমি এর হয়ে ক্ষমা চাই। রাগের মাথায় একটা অন্যায়

কথা বলে ফেলেছে। এর মাথা খারাপ হতে পারে, আমার তো হয়নি—আমি একে এখানে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। বলেই তিনি কুমারকে নিয়ে বাড়ির দিকে এগোতে লাগলেন।

যেতে যেতে সান্যালসাহেবের হাত-ধরা অবস্থাতেই কুমার আবারও চিৎকার করে হাত নাড়িয়ে গিলে-ফেলা অপমানটার হজমি দাওয়াইয়ের মতো বলল, আমি তোমাদের দেখে নেব স্কাউন্ড্রেলস—পুলিশ না এনেছি তো আমার নাম নেই। এই ওস্তাদ সমেত সবগুলোকে আমি জেলে....।

কথা শেষ করার আগেই সান্যালসাহেব কুমারের মুখ চেপে ধরলেন।

কিন্তু মুখ চাপার আগেই মুখনিঃসৃত আওয়াজ মিস্ত্রিদের কানে পৌঁছেছিল। পৌঁছোতেই একই সঙ্গে চার-পাঁচজন মিস্ত্রি ওদিকে দৌড়ে গেল। পুরোভাগ সেই ছোকরা মিস্ত্রিটি। তার হাতে একটা বড়ো রেঞ্জ—যে রেঞ্জ নিয়ে সে এতক্ষণ কাজ করছিল।

সুখন বিদ্যুৎবেগে তাদের আগে গিয়ে পৌঁছোল। বলল, 'কী করছিস রামলাল, কী করছিস, ছেড়ে দে ছেড়ে দে।

কিন্তু সুখনের কথা শেষ হবার আগেই রামলালের ডান হাতটা রেঞ্জ সমেতো ডান কাঁধের উপরে উঠে গেছিল। ততক্ষণে সুখন কুমারের পাশে গিয়ে পৌঁছেছে।

রামলালের হাতটা যখন প্রচণ্ড জোরে নেমে আসতে লাগল কুমারের মাথা লক্ষ্য করে, কুমার কুকুরের মতো ভয় পেয়ে বিদ্যুৎগতিতে মাথাটা নিচু করে সুখনের দু হাঁটুর মধ্যে ঢুকিয়ে বসে পড়ল মাটিতে।

মুহূর্তের মধ্যে রেঞ্জটা এসে পড়ল সুখনের কপালে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল। দেখতে দেখতে রক্তে সুখনের মাথা, চোখ-মুখ, জামা-কাপড় সব ভিজে গেল। সুখনের মাথার রক্ত দেখেই রামলাল রেঞ্জটা ফেলে দিয়ে সুখনকে বুকে জড়িয়ে ধরে অনুতপ্ত গলায় বলল, হা রাম, ম্যায় ক্যা কিয়া ওস্তাদ, ম্যায় ক্যা কিয়া।

সুখনের চোটটা মারাত্মক হয়েছিল। সুখন প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় রামলালের কাঁধে ভর করে ঝুঁকে পড়ল। নইলে মাটিতে পড়ে যেত ও। সঙ্গে সঙ্গে অন্য মিস্ত্রিরা সুখনের সেই ছ্যাকরা গাড়িটা বের করে নিয়ে তাকে চওকের কম্পাউন্ডারবাবুর কাছে নিয়ে যাবে বলে বেরোল।

রামলাল সঙ্গে গেল। শেষ মুহূর্তে সান্যাল সাহেবও দৌড়ে এসে সার্কাসের ক্লাউনের মতো গাড়ির পাদানিতে উঠে পড়লেন।

স্ট্র্যাটেজিক এবং টাইমলি মুভ।

গাড়িটা ছেড়ে দিতেই রামলাল জানালা দিয়ে মুখ বের করে কুমারকে বলল, ফিরে আসছি। তোমাকে শেখাব ফিরে এসে।

সুখন গোঙাতে গোঙাতে বলল, গাড়ির কাজ যেন বন্ধ না হয়— ও গাড়ি যত তাড়াতাড়ি পারো রেডি করো; আমি আসছি।

মংলু গোলমাল শুনে কারখানায় দৌড়ে এসেছিল। মহুয়াও কাপড় কাচা ছেড়ে এসে ভিজে কাপড়ে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। মংলু এক দৌড়ে আবার ফিরে গিয়েই হাঁপাতে হাঁপাতে মহুয়াকে সব বলল।

কুমার ভয় ও আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে টলতে টলতে ফিরে এসে ঘরের মধ্যে দিনদুপুরেই হুইস্কির বোতল খুলে বসল।

মহুয়া খোলা দরজায় কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে। চিড়িয়াখানায় লোকে যেমন গরাদের ফাঁক দিয়ে জংলি জন্তু দেখে, তেমন চোখে পূর্ণদৃষ্টিতে কুমারকে দেখল অনেকক্ষণ করে। মুখে কোনো কথা বলল না। তারপর ফিরে গিয়ে আবার কাপড় কাচতে লাগল।

কারখানার মিস্ত্রিরা বলল—এটা অ্যাকসিডেন্ট। কিন্তু ওস্তাদ যেমনভাবে বারবার অন্যায়ভাবে সমর্থন করছিল, ওস্তাদকে মিস্ত্রিরা সকলে মিলেই এক সময় মারতে বাধ্য হত। আজ রামলালের হাত দিয়ে অ্যাকসিডেন্ট হয়ে ভালোই হয়েছে। ওস্তাদ ভবিষ্যতে অন্যায়কে আর মদত দেবে না।

একজন বয়স্ক মিস্ত্রি বলল, আরে ওস্তাদের ভীমরতি ধরেছে। অনেক ব্যাপার আছে। বলেই, এদিক ওদিক চেয়ে গলা নামিয়ে বলল, ওই সুন্দর বাঙালি মেয়েটার সঙ্গে ওস্তাদ ফেঁসে গেছে। শ্বশুরালের লোকের সঙ্গে লোক কি খারাপ ব্যবহার করে? না করতে পারে?

সেই মিস্ত্রির কথা শেষ হতে না হতে অন্য মিস্ত্রিদের মধ্যে চার-পাঁচজন সমস্বরে বলল, এই গফুর, সাবধানে কথা বল। আমরা তোর মুখ ভেঙে দেব। শালা নেমকহারাম। ওস্তাদ না থাকলে এতদিন যক্ষ্মায় মারা যেতিস, এই তোর কৃতজ্ঞতাবোধ! তুই শালা এক নম্বরের নেমকহারাম।

কম্পাউন্ডার ইনজেকশন দিয়ে ভালো করে ড্রেসিং করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে বললেন, বেশ সাবধানে থাকতে হবে। কাজকর্ম ক-দিন বন্ধ। কোনো রকম স্ট্রেইন নয়। একেবারে বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে দিনকয়েক। সঙ্গে আরো কি সব ওষুধ-টষুধ দিলেন খাওয়ার জন্য।

সুখন যখন ফিরে এল কারখানায়, তখন রামলালও গাড়ি থেকে নেমে কানে হাত দিয়ে নিজের থেকেই ওঠবস করল। বলল ওস্তাদ, মাফ করে দাও ওস্তাদ।

সান্যাল সাহেব কম্পাউন্ডার বাবুকে টাকা দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মিস্ত্রিরা দিতে দেয়নি। এখন কারখানায় ফিরে এসে সান্যালসাহেব বেশ কিছুক্ষণ মিস্ত্রিদের সঙ্গে থাকলেন। এমন কী কখনও যা করেন না তাই করলেন। এক মিস্ত্রির দেওয়া দুটো পান টিপিক্যাল কেরানির মতো খেলেন। একজনের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে বিড়িও খেলেন একটা। যখন ওঁর মনে হল অবস্থা সম্পূর্ণ শান্ত তখন উনি বাড়ি যাবেন বলে পা বাড়ালেন। চলে যাবার আগে সুখনকে বললেন কাঁধে হাত দিয়ে আপনি বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়বেন চলুন।

সুখন গাছতলায় মাটিতে বসেছিল। বলল, আমি ঠিক আছি। তারপর বলল, আপনি যান। আমাকে থাকতে হবে। আপনাদের গাড়ির কাজ শেষ হয়নি এখনও।

সুখনের মুখ দেখে মনে হল ওর খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে ওর।

সান্যালসাহেব বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

কুমার চান-টান করেনি। অপমানটা তখনও হজম হয়নি ওর। সান্যালসাহেব চান করে নিলেন। মহুয়াও আগেই চান করেছিল। রান্নাও হয়ে গেছিল। ওরা খেতে বসবে, এমন সময় সান্যালসাহেবের হুঁশ হল যে মহুয়া ঘরে নেই। মংলুও নেই।

মহুয়া আর মংলু দুজনেই সুখনকে ধরে নিয়ে আসবার জন্য কারখানায় গেছিল। সুখন পা ছড়িয়ে নিমগাছে হেলান দিয়ে বসে খুব মনোযোগের সঙ্গে গাড়ি মেরামতের কাজ দেখছিল।

হঠাৎ সমস্ত মিস্ত্রির কাজ থামানো দেখে ওদের চোখ অনুসরণ করে সুখন দেখল যে, মহুয়া আর মংলু বেড়ার কাছে দাঁড়িয়েছে এসে।

সুখন মহুয়াকে দেখে হাসল।

হাসতে ওর কষ্ট হচ্ছে, পরিষ্কার বোঝা গেল।

মহুয়া এগিয়ে এসে আদেশের স্বরে বলল, আপনাকে এখন ঘরে যেতে হবে।

এই আদেশের স্বরে সুখন অভ্যস্ত নয়। ও জানে, ওর মধ্যে একটা জানোয়ার বাস করে, যে কখনই কারো আদেশেরই ধার ধারেনি। আদেশের গলায় কেউ কথা বললেই ওর রক্ত মাথায় চড়ে যায়। সে যেই-ই হোক।

সুখন ইশারায় মিস্ত্রিদের কাজ করতে বলল। মাথায় রক্ত ফুটে ওঠা ব্যান্ডেজে বাঁধা সুখনের সে চেহারা দেখে মহুয়ার বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল।

সুখন মংলুর হাত ধরে উঠে, বেড়ার বাইরের এটা শিশুগাছের তলায় এসে দাঁড়াল। বলল, মংলু একটু চা করে নিয়ে আয় আমার জন্য, দৌড়ে যা।

মংলু চলে যেতেই মহুয়া আবার বলল, আপনাকে এখন ঘরে যেতেই হবে।

সুখনের মনে হল, মহুয়ার গলার স্বরে একটা গর্ব ঝরে পড়ছে। সুখনের জীবনে বোধ হয় এর আগে ভালোবেসে আদেশ করার মতো কোনো লোক আসেনি। মনে মনে ক্ষমা করে দিল সুখন মহুয়াকে।

সুখন বলল, ঘর মানে কি শুধুই একটা টালির ছাদ? ঘর মানে তো তার চেয়ে অনেক কিছু বেশি। ঘর মানে, ঘর মানে।

তারপর একটু থেমে বলল, এই-ই আমার ঘরবাড়ি, এই-ই আমর সব; এই কারখানা আর মিস্ত্রিরা।

মহুয়া অভিমানের গলায় বলল, সকালে আসতে বলে চিঠি লিখে পাঠালাম, এলেন না কেন? কাল দুপুর থেকে খাননি। তার উপর এমন কাণ্ড।—কী যে করেন ভালো লাগে না। আপনার দিকে তাকাতে পারছি না আমি। বাঁচাতে গেলেন কেন এমনি করে অন্যকে?'

তারপরই বলল, না। আমি কোনো কথাই শুনব না। আপনাকে এখন আমার সঙ্গে যেতেই হবে। আমি নিজে হাতে আপনার জন্য এঁচোড়ের তরকারি রান্না করেছি। আপনাকে আসতেই হবে। খেতেই হবে। রান্না কখন হয়ে গেছে; খেয়েদেয়ে ঘরে চুপচাপ শুয়ে থাকতে হবে। এই বলে দিলাম।

যেতেই হবে? সুখন বলল। তারপর একটু হেসে বলল, কিসের এত জোর আপনার আমার উপর?

—তা আমি জানি না। কিন্তু আমি জানি যে, আমার অনুরোধ আপনি ফেলতে পারবেন না।

সুখন অদ্ভুত হাসি হাসল। বলল, জানেন? জানেনই যদি; তাহলে এত দ্বিধা কেন নিজের সম্বন্ধে?

তারপর এটু চুপ করে থেকে বলল, যান, লক্ষ্মী মেয়ে ফিরে যান, রোদ লেগে আপনার সুন্দর মুখটা লাল হয়ে গেছে। আর চলে যাওয়ার আগে চুপ করে এখানে একটু দাঁড়ান দেখি। কথা বলবেন না, নড়বেন না একটুও; আপনাকে শেষবারের মতো ভালো করে দেখি একবার।

মহুয়া লজ্জা পেল, খুশি হল এবং খুব দুঃখিতও হল। বলল, তাহলে আপনি আসছেন না?

নাঃ।—বলল সুখন। বলেই মহুয়ার চোখের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল।

হেরে-যাওয়া অপমানিত হওয়া মুখে চোখ-নামিয়ে মহুয়া বলল, আমরা একটু পরেই চলে যাব কিন্তু।

সুখন বলল, জানি।

—তবুও আসবেন না? আমার ঠিকানা নেবেন না আপনি?

—না।—কাটাভাবে বলল সুখন।

—আপনি ভীষণ খারাপ, পচা আপনি। আপনি বড়ো দাম্ভিক, অবাধ্য।

সুখন নৈর্ব্যক্তিক গলায় বলল, হয়তো তাই।

মহুয়ার চোখ ছলছল করে উঠল।

আবার বলল, আপনি সত্যিই আসবেন না?

—না। এখন যেতে পারি না। অনেক কাজ। যাওয়া সম্ভব নয়।

মহুয়া বলল, আমি চললাম তাহলে। আর কিন্তু দেখা হবে না।

সুখন বলল, দাঁড়ান।

হঠাৎ ওর গলার স্বরটা কেমন কেঁপে গেল। সুখন বলল, অমন করে যেতে নেই। একটু হাসুন

তো দেখি। এই হাসি আবার কবে দেখতে পাব—পাব কি না তাই-ই বা কে জানে? লক্ষ্মীটি, একবার হাসুন শেষবার।

মহুয়া বলল, ইয়ার্কি, না? বলেই হেসে ফেলল। এবং সঙ্গে সঙ্গে কেঁদেও ফেলল। ওর গাল গড়িয়ে জলের ফোঁটা নামল।

সুখনের বুকের মধ্যেটা হুহু করে উঠল। কিন্তু এখন কিছুই করবার নেই। মহুয়া ছেলেমানুষ নয়। এখন দিনের সুস্পষ্ট আলো, কত লোকজন, বুদ্ধি-বিবেচনা চারদিকে। কাল জঙ্গলের নির্জনতার চাঁদের আলোয় যে ছেলেমানুষি ভুল করেছিল, আজ তার পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়। ও যে মহুয়াকে এক দারুণ ভালোবাসা বেসে ফেলেছে। সুখন যে মহুয়ার ভালো চায়।

সুখন চুপ করে মহুয়ার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়াল না। বলল, অসভ্য। আপনি একটা জংলি। বলেই মহুয়া চলে গেল।

যতক্ষণ না মহুয়া বেড়ার আড়ালে চলে যায়, ততক্ষণ সুখন তার সুন্দর চলার ভঙ্গির দিকে চেয়ে রইল। মহুয়ার প্রতি মঙ্গলকামনায়, ভালোলাগায়, ভালোবাসায়, তার সুস্থ, বয়স্ক দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মন কানায় কানায় ভরে উঠল এবং সেই সঙ্গে ওর মনের মধ্যে যে ছেলে-মানুষটাও বাস করে, সেই মানুষটা ধুলোর মধ্যে পা-ছড়িয়ে বসে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

সে কান্না শোনা গেল না।

কুমার চান করে উঠেও ঘরে বসে হুইস্কি খাচ্ছিল। সান্যালসাহেব মানা করছিলেন। বলেছিলেন, এই গরমে কী করছ এ সব? এখন মানে মানে এখান থেকে রওনা হওয়া গেলেই বাঁচা যায়। আবার হুইস্কি খেয়ে কাকে ঘুষি মেরে বসবে, তখন আর প্রাণ বাঁচানোর উপায়ই থাকবে না।

হুইস্কির দয়ায় কুমারের হারানো বিক্রম আবার ফিরে পেয়েছে ও। কুমার বলল, প্রাণ যাওয়া অতই সহজ কিনা? নেহাত মেয়েছেলে সঙ্গে আছে নইলে দেখে নিতাম এদের।

সান্যালসাহেব মনে মনে বললেন, এ যাত্রা মহুয়া সঙ্গে আছে বলেই বেঁচে গেলে, নইলে তোমাকে কে বাঁচাত তাই-ই দেখতাম। মুখে বললেন, সব তো মিটে গেছে, আর তো কয়েক ঘন্টার ব্যাপার। আর পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটা কেন?

মহুয়া ফিরে আসতেই সান্যালসাহেব বললেন, কোথায় গেছিলি?

—এই একটু দেখে এলাম গাড়ির কতদূর।

মহুয়া চোখ ভেজা—বৃষ্টির পরের জঙ্গলের মতো। সান্যালসাহেব ঘাঁটালেন না ওকে। বললেন, কী দেখলি?

—প্রায় হয়ে এসেছে।

বলেই মহুয়া অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সুখনের ঘরের দিকে চলে গেল।

তাহলে তো এবার বিল-টিল মিটিয়ে দিতে হয়। গোছগাছ করে নে মহুয়া—এখুনি রওনা হবো।—সান্যালসাহেব বললেন।

ততক্ষণে মহুয়া সুখনের ঘরে ঢুকে গেছে। কুমার বলল, এখনি পালাবার কী হয়েছে? আমরা কি ভয় পেয়েছি নাকি?

কুমারের গলার স্বর শুনে পরিষ্কার বোঝা গেল যে, সে বিলক্ষণ ভয় পেয়েছে।

কুমার আবার বলল, খেয়ে-দেয়ে রেস্ট নিয়ে এক কাপ করে চা খেয়েই বেরোনো যাবে। তাছাড়া অ্যাট দ্য মোমেন্ট আই অ্যাম নট ফিজিক্যালি ফিট টু ড্রাইভ।

মহুয়া সুখনের ঘরে ঢুকেই বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। বাইরে দড়িতে কেচে-দেওয়া সুখনের জামা-কাপড়, বিছানার চাদর, টেবল-ক্লথ সব শুকোচ্ছিল। যা কড়া রোদ—একটু পরেই

তুলে নেওয়া যাবে। ভাবল মহুয়া। সব তুলে এনে সুখনের ঘরটা সুন্দর করে আবার সাজিয়ে দিয়ে চলে যাবে ও।

মহুয়া ভাবছিল যে, ও এই ঘরের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে চেয়েছিল, যদি সুখন তাকে একটু জোর দিত। লোকটা অদ্ভুত। নিজে ভালোবাসতে জানে ভীষণ, অথচ অন্যের ভালোবাসা নিতে জানে না। সমস্ত সুখ তার নিজের ভালোবাসার ক্ষমতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, অন্যকে ভালোবাসতে দিতে জানে না। তাকে ভালোবেসে, তার জন্য কিছু করে অন্যের যে সুখ, সেই সুখ থেকে সে বঞ্চিত করতে চায় অন্যকে। বড়ো দাম্ভিক লোকটা। স্বার্থপরও হয়তো বা। কিন্তু এমন একটা অদ্ভুত লোককেই বা ওর এমন করে ভালো লেগে গেল কেন?

কিছু ভালো লাগে না মহুয়ার। মহুয়ার কিছুই ভালো লাগে না।

এত করে যত্ন করে রান্না করল, মুখের উপর বলে দিল যে আসবে না, খাবে না। কপাল দিয়ে এখনও রক্ত চোঁয়াচ্ছে—তবুও বলল আসবে না।

মহুয়া নিজের মনে, জল-ভেজা চোখে অঝোরে বলে চলল—তুমি যে ঘর চাও সে ঘর তোমাকে কেউ দিতে পারবে না সুখ। তোমার চিরজীবন এমনি একাই থাকতে হবে। সুখী হতে হলে সাধারণ হতে হয়, আত্মসম্মানজ্ঞানহীন লোভী হতে হয়, কুমারের মতো; ছোট্ট মাছরাঙা পাখির মতো। বারে বারে জলে ছোঁ মেরে মেরে সুখের ছোটো ছোটো মাছ কুড়িয়ে এনে জড়ো করে সুখের ডালি ভরাতে হয়। তুমি সমস্ত সুখকে একেবারে কবজা করতে চাও, তাই-ই তো তোমার আঁজলা গলে সব সুখই গড়িয়ে যাবে। কোনো মহুয়াকেই ধরে রাখতে পারবে না তুমি। হয়তো ধরে রাখতে চাও না। জানি না। বুঝলাম না তোমাকে।

মহুয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুখনের বিছানায় নড়েচড়ে শুয়ে মনে মনে বলল—তোমাকে আমি সব সুখ দিতাম, সুখ, স—ব সুখ—কিন্তু তুমি মহুয়াকে দাম দিলে না। দম্ভ ভরে তাকে ফিরিয়ে দিলে। ঠিক আছে। তুমি নিষ্ঠুর হৃদয়হীন হতে পারো, আর—আমিই কি পারি না? তুমি দেখো, যাওয়ার আগে তোমার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করব না। সন্ধেবেলা ঘরে ফিরে যখন দেখবে, ঘরময় আমার হাতের ছাপ, মহুয়ার গন্ধ, চারদিকে আমি, টুকরো টুকরো আমি, তখন দেখব তুমি কাঁদো কি না আমার জন্য। দেখব তখন।

আমি তোমাকে স—ব দিলাম। আর তুমি আমর শেষ অনুরোধের দামটুকুও দিলে না! জংলি।

দশ

গোছগাছ করার বিশেষ কিছুই ছিল না। যা নামিয়েছিল, সেগুলোই সুটকেসে ভরে নেওয়া। চটিটটি তো পেছনের সিটের পায়ের কাছেই রাখা যাবে।

মহুয়া দুপুরে ঘুমোয়নি। খাওয়নি। খিদে পেয়েছিল প্রচণ্ড। তবুও খায়নি। না খাওয়ার আর কোনোই কারণ ছিল না। শুধু একমাত্র কারণ ছিল,জেদি, একগুঁয়ে লোকটা রাতে ফিরে এসে জানতে পারবে মংলুর কাছে যে, সে নিজে না খেয়ে মহুয়াকেও অভুক্ত রেখেছিল। লোকটাকে বড়ো দুঃখ দিতে ইচ্ছা করে, কাঁদাতে ইচ্ছা করে; যেমন করে সে কাঁদাল ওকে।

বাবা ও কুমার তখনও ঘুমোচ্ছিলেন। সত্যি ঘুমোতে পারেন। আর এই কুমারের মতো লোকেরা কেন যে বাইরে আসে তা মহুয়ার জানা নেই। শুধু খেতে, হুইস্কি খেতে; আর দরজা বন্ধ করে তাস খেলতে। বন্ধ দরজার বাইরে যে এমন একটা দারুণ সুন্দর মর্মরধ্বনি তোলা পৃথিবী পড়ে রয়েছে তার দিকে এদের চোখ নেই। এদের চোখ হয়তো আছে, কিন্তু দেখার শক্তি নেই। চোখের লেন্সে ক্যামেরার লেন্সের মতো অব্যবহারে ফাংগাস পড়ে গেছে। এদের কানে ট্রাম-বাস-গাড়ির শব্দ তালা লাগিয়ে দিয়েছে। অলস মন্থর হাওয়ায় পাথরের উপর শুকনো পাতা গড়ানোর চলমান

ছবি এদের চোখে পড়বে না। দূর থেকে ভেসে আসা মৌটুসি পাখির চিকন গলার স্বর এদের কানে কখনও পৌঁছোবে না।

এই স্নিগ্ধ মধুর অপরূপ পটভূমিতে তাই-ই তো ওই আশ্চর্য লোকটা এমন করে আকৃষ্ট করেছিল তাকে, অমন শিহর ভরে পুলক তুলে ডাক দিয়েছিল তার বুকে, তার প্রাণের প্রাণে, তার শরীরের কেন্দ্রবিন্দুতে সে লোকটা সমস্ত সুখকে কেন্দ্রীভূত করেছিল।

বাইরে হাওয়ার বেগ কমে এসেছে। রাস্তার ওপারের টাঁড় তেকে তিতির ডাকছে ক্রমাগত। শালবন থেকে টিয়ার ঝাঁকের চমকে-দেওয়া ট্যাঁ ট্যাঁ রব ভেসে আসছে।

বড়ো উদাস, বিধুর এই সময়টা। এই বিধুর ভাবটা মহুয়ার মনের মধ্যে এসে বাসা বেঁধেছে। এখন মহুয়া প্রস্তুত। শরীরে মনেও।

যাওয়ার সময় হয়েছে। সুখনের ঘর গোছানো শেষ। মংলুকে দিয়ে মহুয়ার ডাল ভাঙিয়ে নিয়ে এসে ঘরে রেখেছে। রাতে এ ঘর মহুয়ার উগ্র গন্ধে ভরে যাবে। সুখনের গায়ের গন্ধ উগ্র। মহুয়া চেয়েছিল ওর নিজের স্নিগ্ধ সত্তার হালকা বাস রেখে যাবে না সুখনের জন্য।

মহুয়া ফুলের গন্ধের সঙ্গে মানবী মহুয়ার শরীর মনের গন্ধের মিল নেই।

মহুয়া জানে, এছাড়া সুখের জন্য রেখে যাবে এমন কিছুই ওর নেই। তবুও ও জানে, জাগতিক কিছু রেখে যাবে বলেই ও অনেক কিছু রেখে যাবে এখানে। ওর জীবনের এক আশ্চর্য সুরেলা সুখ ও বিষণ্ণ অভিজ্ঞতার স্মৃতি।

বাইরের হাওয়াটা সারা দুপুর পাতা উড়িয়ে, পাতা ঝরিয়ে মন্থর হয়ে এসেছে। বেলা পড়ে আসছে।

না। লোকটা সত্যিই এল না। গাড়ি সারানোর পর কোথায় যেন চলে গেছে। শাকুয়া-টুঙে? কে জানে? এখন শাকুয়া-টুঙ থেকে সামনের উপত্যকাটা কেমন দেখাচ্ছে? একদিনকে চাতরার জঙ্গল, সোজা অন্যদিকে সীমারীয়া-টুটিলাওয়া-হাজারিবাগের জঙ্গল আর বাঁয়ে আদিগন্ত পালামৌ। কি আশ্চর্য ভালো-লাগা জায়গাটাতে।

কে একজন মিস্ত্রিমতো লোক এসে দরজায় দাঁড়াল। মহুয়া বাবাকে ডাকল। তার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে দিল বাবার হাতে।

সান্যালসাহেব কাগজটা হাতে নিয়ে বললেন, একি? তাঁর গলায় অবাক হাওয়ার সুর। কুমারও পাশে এসে দাঁড়াল।

কাগজটা একটা ক্যাশমেমো। একটা মোটরপার্টসের দোকানের। লেখা তিনশো পনেরো টাকা। সঙ্গে একটা চিঠি। সুখন লিখেছে—

সবিনয় নিবেদন,

তিনশো টাকা দিয়েছিলেন, তার ক্যাশমেমো।

বেশি যা লেগেছে তা আর দিতে হবে না আপনাদের। মেরামতির কোনো বিল করিনি। কুমারবাবুকে বলবেন আমার যা কিছু অপরাধ ক্ষমা করে দিতে। আপনারা আপনার জনের মতো আমার পর্ণকুটিরে উঠেছিলেন—এতেই আমি বড়ো খুশি। আমার আপনার জন বলতে বিশেষ কেউই নেই। এখানে বাঙালির মুখও খুব বেশি দেখি না।

আপনাদের এ দুদিন বড়োই কষ্ট হল। আশা করি, এই কুঁড়ে ছেড়ে গিয়ে বেতলার বাংলোয় আপনারা সুখেই থাকবেন। এই কষ্টর কথা ভুলে যাবেন।

ইতি—
বিনীত
সুখরঞ্জন বসু
ফুলটুলিয়া, গুঞ্জা
২৭/৩/৭৫

কুমার চুপ করেছিল।

সান্যালসাহেব মিস্ত্রিকে শুধোলেন, সুখনবাবু কোথায়?

মিস্ত্রি বলল, জানি না। গাড়ি ঠিক করেই চলে গেছেন।

—কোথায় গেলেন? তাঁর না ঘরে শুয়ে থাকবার কথা?

মিস্ত্রি বলল, আমরাও বলেছিলাম। ওস্তাদ কারো কথা শোনেই না।

সান্যালসাহেব বললেন, দ্যাখো তো কি অন্যায়।

কুমার বলল, আমাদের একটা ধন্যবাদ দেওয়ারও সুযোগ দিল না মিস্ত্রি। কিন্তু গাড়ি সারাবার পয়সা না হয় না-ই নিল, কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার? এটাও এক ধরনের অপমান করা।

মিস্ত্রি নমস্কার করে চলে গেল। বলে গেল যে, গাড়ি ধুয়ে-টুয়ে পরিষ্কার করিয়ে রেখে গেছে ওস্তাদ কারখানার বাইরে শিশুগাছতলায়।

মিস্ত্রি চলে গেলে কুমার আবার বলল, বিনি পয়সায় তো আমি কারো খাবার খাইনি। আর খাবোই বা কেন? জোর করে নুন খাইয়ে গুণ গাওয়াবার ব্যবস্থা। কায়দাটা ভালোই।

মহুয়া একবার চোখ তুলে তাকাল কুমারের দিকে। তারপর চুপ করে রইল।

মংলু চা করে নিয়ে এসেছিল। চা খেতে খেতে সান্যালসাহেব ও কুমার জামা কাপড় পরে নিলেন।

দেওয়ালে ঝোলানো ফ্লাস্কটা সবার অলক্ষ্যে হাতে নিয়ে মহুয়া রান্নাঘরে গেল। মংলুকে বলল, এটা তোর ওস্তাদের জন্য রেখে দিস মংলু। যখন শাকুয়া-টুণ্ডে যাবেন তখন চা বানিয়ে দিস। আর এই লুডোটা তোর জন্য দিয়ে গেলাম। এই টাকাটা রাখ—মিষ্টি খাবি।—বলেই কুড়িটা টাকা গুঁজে দিল মংলুর হাতে। মংলু আপত্তি জানাল টাকাটা নিতে। বলল, ওস্তাদ রাগ করবে।

মহুয়া বলল, আর না-নিলে আমি যে রাগ করব? তোর ওস্তাদকে বলিস যে রাগ আমিও করতে পারি। আর বলিস যে, তোর ওস্তাদ বড়ো অসভ্য।

মহুয়া চলে আসছিল রান্নাঘরে ছেড়ে। কেন জানে না, তার চোখে জলে ভরে গেছিল। তার অভিমান, রাগ, তার উষ্মা যে দেখাবে সে সুযোগও লোকটা তাকে দিল না। এ যেন হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করা; আর ক্লান্ত হওয়া।

সান্যালসাহেব বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাইপে তামাক ভরছিলেন। বললেন, কইরে, মৌ হল তোর?

মহুয়া আসি বলে বাইরে এল।

সান্যালসাহেব বললেন, মংলু, বাবা, মালগুলো এক এক করে তোলা এবার গাড়িতে।

তারপর বললেন, কুমার যাও, বুটটা খুলে দাও গাড়ির।

কুমার বারান্দায় বেরিয়ে মংলুকে ডাকল। বলল, এই ছোঁড়া এদিকে আয়, তুই অনেক করেছিস আমাদের জন্য, তোকে একটু বকশিশ দিই।

মংলু বলল, না, না নেব না।

সান্যালসাহেব বললেন, সে কি? নিয়ে নে, বাবা, নিয়ে নে।

কুমার ভীষণ গর্বভরে দু পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে একটা এক টাকার নোট বের করে মংলুকে দিল সবাইকে দেখিয়ে।

মহুয়ার সমস্ত অন্তর কুমারের দীনতায় কুঁকড়ে গেল। এই এক ধরনের লোক। এরা দেখিয়ে দান দেয় এবং এমন দান যে, সে বলার নয়। এরাই গ্র্যান্ড হোটেলে খেয়ে উর্দি-পরা বেয়ারার সেলাম প্রত্যাশা করে দশ টাকার নোট ফস করে বের করে। ফাইভস্টার হোটেলের পেজবয়কে কিছুই না করার জন্য পাঁচ টাকার নোট ছুঁড়ে দেয়। যেহেতু মংলু এই দানের সাক্ষী শুধু তারাই, আর কুমারের নীচ অন্তঃকরণ তাই-ই এমন জায়গায় তার হাত দিয়ে শুধু এক টাকার নোট বেরোয়।

এরপর কুমার আরও কাণ্ড করল। দুটো দশ টাকার নোট বের করে মংলুকে দিয়ে বলল, তোর ওস্তাদকে দিয়ে দিস— আমাদের খাওয়ার টাকা।

সান্যাল সাহেব হইহই করে উঠলেন, বললেন, একি করছ কুমার? সুখনবাবু তো খাওয়া টাকা চাননি? এ দিলে তাঁকে অপমান করা হবে। তাছাড়া টাকার কথাই যদি বলো, উনি বোধহয় আমাদের জন্য এক এক বেলাতেই কুড়ি টাকার বাজার করেছেন। তাছাড়া টাকাটাই তো সব নয়।

তারপর মহুয়া দিকে চেয়ে বললেন, যে আদর-যত্ন, আন্তরিকতা উনি দেখিয়েছেন তার দাম কি টাকায় দেওয়া যায়?

কুমার টাকাটা পার্সে রাখতে রাখতে ভুরু তুলে বলল, টাকায় দাম দেওয়া যায় না, এমন কিছু আছে নাকি পৃথিবীতে? বেশ তো কুড়ি টাকা না হয় দুশো টাকাই নেবে—দুশো টাকাই দিচ্ছি।

সান্যালসাহেব বললেন, না, না। এতে আমি রাজি নই। উনি নিজে থাকলেও বা কথা ছিল, খাওয়ার টাকা এভাবে মংলুর হাতে দেওয়া যায় না।

মহুয়া বলল, বাবা তোমার একটা কার্ড দিয়ে যাও মংলুকে। আর ওঁর ঠিকানা তো আমরা জানিই। তুমি কলকাতায় ফিরে ওঁকে একটা চিঠি লিখে ধন্যবাদ জানিয়ো।

সান্যালসাহেব বললেন, কলকাতা কেন? বেতলা থেকেই লিখব। তুই ভালোই বলেছিস।

বলেই সান্যালসাহেব তাঁর বাড়ি ও অফিসের ঠিকানা লেখা একটা কার্ড মংলুকে দিলেন।

মহুয়া খুশি হল। সে নিজে থেকে তার ঠিকানা দিতে চেয়েছিল। সুখ নেয়নি, কিন্তু বাবার কার্ড থাকলে ঠিকানাও রেখে যাওয়া হল, আবার তার নিজের সন্ধানও রইল।

মংলু মালপত্র তুলে নিয়েছিল। ওরা ধীর পায়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। বেলা পড়ে গেছিল। এখন রোদ নেই, তবে আলো আছে। থাকবে এখনও আধঘণ্টা পৌনে এক ঘন্টা।

বারান্দা ছেড়ে নেমে আসবার সময় মহুয়ার বুকের মধ্যেটা মুচড়ে উঠল। গাড়ির খোলা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে একবার শকুয়া-টুঙের দিকে চাইল শেষবারের মতো। পশ্চিমাকাশে নীল শান্তির ছবি হয়ে সন্ধ্যাতারাটা সবে উঠেছে। অনেক রকম পাখি ডাকছে শাকুয়া-টুঙের দিক থেকে।

মংলুর গাল টিপে দিয়ে একবার আদর করে মহুয়া গাড়িতে উঠল। সান্যালসাহেব একটা দশ টাকার নোট মংলুর হাতে দিয়ে নিজেও উঠে পড়লেন। দরজা বন্ধ করার শব্দ হল। ইঞ্জিন গুমরে উঠল।

ধুলো উড়িয়ে মুখ ঘুরিয়ে গাড়িটা বড়ো রাস্তার দিকে চলল।

মংলু দাঁড়িয়েছিল। লাটাখাম্বার কে যেন জল তুলছিল। তার ক্যাঁচোর-কোঁচর শব্দে এই আসন্ন সন্ধ্যার নিস্তব্ধ বিষণ্ণতা আরো ভারী হয়ে উঠেছিল।

কাঁচা রাস্তাটা বন-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গেছে। বাঁদিক দিয়ে একটা নালা বয়ে চলেছে রাস্তার সমান্তরালে। ওরা আধ মাইলটাক এসেছে।

কুমার বলল, সব নিয়ে আসা হয়েছে তো? ফ্লাস্কটা? ফ্লাস্কটা তো দেখলাম না।

তারপর পেছনে মুখ ঘুরিয়ে মহুয়ার দিকে চেয়ে বলল, আছে?

মহুয়া বলল, এ মাঃ। একদম ভুলে গেছি। রান্নাঘরে ছিল—আনতে মনে নেই।

কুমার বলল রান্নাঘরে কেন? আমি তো বিকেলেও দেখলাম আমাদের ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ছিল।

ছিল বুঝি? কই আমি দেখিনি তো?

মহুয়া মিথ্যে কথাটা সত্যির মতো করে বলল।

কুমার বলল, ওই ছোঁড়া ঝেড়ে দিয়েছে। ওস্তাদের চ্যালা তো। আর কত হবে? তারপরই বলল, ব্যাক করব নাকি?

সান্যালসাহেব বললেন, ছাড়ো ছাড়ো, ফ্লাস্কের শোকে এত উতলা হওয়ার দরকার নেই। ফেরার ঝামেলা কোরো না।

রাস্তাটা একটা বাঁক নিয়েছে। বাঁক নিয়েই পাকা রাস্তা। একটা মোড়। দু-তিনটে কাঁচা-পাকা রাস্তা এসে মিশেছে ওখানে, কিন্তু গন্তব্য-নির্দেশক কোনো বোর্ড-টোর্ড নেই।

কুমার গাড়ির গতি কমিয়ে বলল, অ্যাই মরেছে। এখন কোন দিকে যাই? আবার রাস্তা ভুল করলেই তো চিত্তির। একবারেই যা নাজেহাল।

মোড়টার কাছেই রাস্তার ডানদিকে অনেকগুলো বড়ো বড়ো কালো ন্যাড়া পাথর। জায়গাটা শুধুই মহুয়া গাছ। পত্রশূন্য শাখা-প্রশাখা বিস্তার করা বহু পুরোনো সব মহীরুহ। ধুলো শুকনো গাছগাছালি, আর শেষ বিকেলের গায়ের গন্ধের সঙ্গে নেশা মহুয়ার গন্ধে জায়গাটা ম-ম করছে।

গাড়িটা ওইখানে থামতেই হঠাৎ মহুয়ার চোখে পড়ল একটা তিন-পেয়ে কালো কুকুর পাথর বেয়ে উপর থেকে লাফাতে লাফাতে নেমে আসছে গাড়ির দিকে। কালুয়া।

একি! বলেই কুমার থেমে গেল।

ওর গলায় বিরক্তি ঝরে পড়ল। বিড়বিড় করে বলল, শালা খাওয়ার টাকা নেবার জন্য পথে দাঁড়িয়ে আছে!

সান্যালসাহেব চাপা গলায় বললেন, কী হচ্ছে কুমার?

কালুয়ার পিছু পিছু মাথায় ব্যান্ডেজ-বাঁধা সুখন ধীরে ধীরে নেমে আসছিল নীচে। ওকে দেখে মহুয়ার মনে হচ্ছিল যে তার সুখ বড়ো বুড়ো হয়ে গেছে একদিনেই। অভুক্ত, বড়ো ক্লান্ত, শ্রান্ত।

মনে হচ্ছিল, এইটুকু আসতেই ওর এক যুগ লাগবে।

মহুয়া মনে মনে বলল লাগুক, এক যুগই লাগুক। তবু তুমি নেমে এসো সুখ, তুমি কাছে এসো।

কাছে আসতেই দেখা গেল সুখনের হাতে একটা মহুয়ার বোতল। আগে বোধহয় আরো খেয়ে থাকবে। ধীর পায়ে নামার এ-ও একটা কারণ।

মাঝপথে থেমে দাঁড়িয়ে সুখন মিস্ত্রি বোতলটাকে মুখে তুলে, মাথাটাকে পেছনে হেলিয়ে ঢকঢক করে আবার খেল অনেকখানি। গেঞ্জির হাতায় জংলির মতো মুখ মুছল। তারপর কাছে এগিয়ে এল।

কুমার ফিশফিশ করে বলল, অ্যাবসলুটলি ড্রাংক?

মহুয়া মনে মনে বলল—মহুয়া খেলেই ড্রাংক, আর হুইস্কি খেলে ড্রাংক নয়। বাঃ!

কুমার বলল, তুমি গাড়ি থেকে নেমো না মহুয়া। খুব সাবধান। ব্যাটা বেহেড মাতাল। তোমার গায়ে-টায়ে হাত দিয়ে বসতে পারে।

সান্যালসাহেব গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়েছিলেন। ইতিমধ্যেই সুখন কাছে আসতেই বললেন, আরে আসুন আসুন। আমরা তো ভাবলাম আর দেখাই হল না বুঝি। কী যে লজ্জায় ফেললেন না আপনি আমাদের।

ততক্ষণে মহুয়াও দরজা খুলে নেমে সান্যালসাহেবের পাশে দাঁড়িয়েছিল। সুখন সত্যিই মাতাল হয়ে গেছে বলে মনে হল মহুয়ার। ওর দিকে তাকিয়ে এক অপ্রকাশিতব্য কষ্টে মহুয়ার বুক ভেঙে যেতে লাগল।

কালুয়া ওর পায়ের কাছে দৌড়াদৌড়ি করে একবার রাস্তায় যাচ্ছিল, একবার গাড়ির কাছে আসছিল। সুখন জড়ানো গলায় ওকে ধমক দিয়ে বলল, এদিকে আয় কালুয়া। একটা পা তো গেছে, তোর কি গাড়ি চাপা পড়ে মরার ইচ্ছে হয়েছে? একটু পর আবার টেনে টেনে বলল, তুই ছাড়া—।

যে লোকটা সুস্থ অবস্থায় দৃঢ়, শক্ত, অন্যের দয়া ও ভালোবাসার প্রতি উদাসীনতার মুখ-ফেরানো, সেই লোকটা মাতাল অবস্থায় যেন শিশু হয়ে গেছে, বড়ো দুর্বল অসহায় হয়ে পড়েছে।

সুখন কাছে এসে বোতলসুদ্ধ হাত তুলে বলো, নমস্কার। তারপর আবার জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, নমস্কার সান্যালসাহেব, নমস্কার কুমারসাহেব।

মহুয়ার কথা যেন ভুলেই গেছিল এমনিভাবে মহুয়ার দিকেও জোড়হাত তুলে বলল, নমস্কার।

সান্যালসাহেব বললেন, আপনি এখানে কী করছেন?

আমি? কিছু না। কী আবার করব? তারপরেই বলল, ও না। হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি কি যেন একটা করতে এসেছিলাম এখানে। অ্যাই—এইবার মনে পড়েছে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, এখানে আপনারা রাস্তা ভুল করতে পারতেন। আপনাদের আগেই বলে দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু মনে হচ্ছিল না। ভুল রাস্তায় গেলে সন্ধের পর ডাকাতির ভয় আছে, এদিকে তাই এলাম। ভাবলাম, রাস্তা বাতলে দিয়েই আমার ছুটি। ঠিক রাস্তা। ঠিক রাস্তায় আপনারা সব ভালো মতো চলে গেলেই ছুটি।

সান্যালসাহেব উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, সে কি? মাথায় এত বড়ো একটা উন্ড নিয়ে এতখানি হেঁটে এসেছেন? আপনার না বিছানায় শুয়ে থাকার কথা? কী করে আবার এতটা ফিরবেন। চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

সুখন হাসল। মাতালের অপ্রকৃতিস্থ হাসি। তারপর বলল, বিছানাও আছে। ওই যে। বলেই পাথরগুলোর দিকে দেখাল। বলল, ওইখানেই শুয়েছিলাম।

কুমার এতক্ষণে গাড়ি থেকে বেরিয়েছে। কুমারও দরদ দেখিয়ে বলল, সে কি? ওখানে বিছে আছে, সাপ আছে, গরমের দিন।

সুখন হাসল। বলল, বিছে তো কতই কামড়াল। কই? কিছু হল কি? কি কুমারসাহেব হল কিছু?

কুমার দ্ব্যর্থক কথাটার মানে বুঝতে পেরেই মনে মনে বলল—শালা। এখন তোমাকে একা পেয়েছি মাতাল অবস্থায়। গাড়ির জ্যাক বের করে মাথায় মারলে এখানেই তোমাকে চিরতরে শুইয়ে দিয়ে যেতে পারতাম—কিন্তু সঙ্গে সব মিস্ত্রি-দরদি সাক্ষি থেকেই গড়বড় হয়ে গেল।

কুমার উত্তর দিল না। তারপর শুধোল, আমরা কোনদিকে যাব?

সুখন হাত তুলে বলল, বাঁয়ে—সোজা বাঁয়ে চলে গেলেই ঠিক যাবেন।

মহুয়া কী করবে, কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। ও বুঝছিল যে, ওর কিছু একটা বলা উচিত। আর কিছু বলার সুযোগ আসবে কি না কে জানে? তাছাড়া ওর এই নীরবতার বাবা ও কুমার সন্দেহ করতে পারেন কিছু।

মহুয়া হঠাৎ বলল, ব্যথা কেমন আছে?

সুখন চমকে উঠল গলার স্বর শুনে। বলল, ব্যথা?

ব্যথার কথা যেন ভুলেই গেছিল। তারপর যেন মনে পড়ার বলল, ও ব্যথা একটু আছে। থাকবে কিছুদিন। তারপর চলে যাবে। ভাববেন না।

সান্যালসাহেব বললেন, আপনি যে কি করলেন না। গাড়ি সারাবার টাকা নিলেন না, দুদিন খুব খাওয়ালেন সব নিজের খরচে—সত্যি আপার ঋণ শোধবার নয়। আমরা তো আপনার খদ্দের বই আর কিছুই নই, আমরা আপনার কে যে আমাদের জন্য নিজের ক্ষতি স্বীকার করলেন?

সুখন একটুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর যেন অনেক দূর থেকে বলছে, যেন অন্য কেউ বলছে, এমন গলায় বলল, বলার আগে একবার মহুয়ার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিল বলল কি জানেন সান্যালসাহেব, জীবনে কিছু কিছু ক্ষতি থাকে, তা পূরণ হওয়ার নয়— তা চিরদিন ক্ষতিই

থেকে যায়। সে সব ক্ষতি শুধু স্বীকারই করার। তারপর বলল, মনে করুন এও সেরকম কোনো ক্ষতি। তাছাড়া যে ক্ষতিস্বীকার করে, সেই স্বীকার করার সুখটা তারই একার থাকে। সে কারণে যাদের জন্য অন্যের ক্ষতি হয়, তারা নিজেরা লাভবান হয় বলেই সুখের ভাগটা কিছুপায় না।

কুমার মনে মনে বলল—শালা হেভি যাত্রা করছে তো। শালা বহুরূপী।

সান্যালসাহেব বললেন, আপনার কথা শুনে কেউই বলবে না যে, আপনি মোটরগাড়ির মিস্ত্রি।

সুখন হাসল। বলল, সেইটিই দুঃখ। খদ্দেররাও স্বীকার করে না, আমার মিস্ত্রিরাও নয়। আমার মেরামতির গুণ কেউই স্বীকার করল না।

পরক্ষণেই বলল, অন্ধকার হয়ে এল। আর দেরি করা ঠিক নয় আপনাদের। এবার রওনা হয়ে পড়ুন। আবার কখনও এদিকে এলে, গাড়ি খারাপ হলে সুখন মিস্ত্রিকে খবর দেবেন—দুখন মিস্ত্রির ভাই সুখন মিস্ত্রিকে। আর কী বলব?

মহুয়ার পা দুটো মাটি আঁকড়ে ছিল! ওর মুখে আসছিল যে, আমি যাব না। আমি আপনার কাছে থাকব। আমাকে আপনি কেড়ে নিন, জোর করুন আমার উপর, আপনার জোর দেখান। পরক্ষণেই ওর মনে হল, বড়ো দাম্ভিক তুমি সুখ। তুমি নিজে দুঃখ পাবে, অন্যকে দুঃখ দেবে। তুমি এরকমই।

সান্যালসাহেব বললেন, আপনি এরকম করেন কেন? এরকম মহুয়া ফহুয়া খাওয়া খারাপ। এরকম করবেন না।

সুখন হাসল। বলল, এই—আমি একরমই। আমি ভালো না।

কুমার ছটফট করছিল। বলল, এবার এগোনো যাক।

সান্যালসাহেব কিছু বলার আগেই, কুমারকে উদ্দেশ করে সুখন বলল, ওহোঃ, ভুলেই গেছিলাম। আপনার জন্য একটা জিনিস এনেছিলাম।

বলেই, পকেট থেকে একগাদা পলাশ ফুল বের করে কুমারকে দিল সুখন।

কুমার স্মার্টনেস দেখিয়ে নাকের কাছে তুলল ফুলগুলোকে।

সুখন বলল, নাকের অত কাছে নেবেন না—এতে পিঁপড়ে থাকে—কামড়ে দেবে।

তারপর বলল, আরো একটা জিনিস দেব ভেবেছিলাম—একটা পাখি—টুঁই পাখি। কিন্তু এক অল্প সময়ে জোগাড় করা গেল না।

—সেটা আবার কী পাখি?

দেখেননি? ছোট্ট, মিষ্টি পাখি—সবুজ সবুজ—লেজ ঝোলা—উড়ে উড়ে ডাকে টি-টিই—টি-টি টুঁই.....।

কুমার এই পলাশ ও টুঁই পাখির ব্যাপারটা বুঝল না।

তবে এটুকু বুঝল যে, এর পেছনে কোনো রহস্য আছে।

শালা হেভি খচ্চর।

কুমার বলল, চলুন সান্যালসাহেব, এবার যাওয়া যাক।

বলেই কুমার গাড়িতে গিয়ে বসল ড্রাইভিং সিটে।

তারপর সান্যালসাহেবও সুখনকে নমস্কার করে উঠে বসলেন। মহুয়া উঠল শেষে।

সুখন মহুয়ার দিকে এগিয়ে গেল একটু। হঠাৎ মহুয়ার হাত দুটো দু হাতে ধরে বলল, নমস্কার দিদিমণি। অনেক কষ্ট করে গেলেন এখানে। সুখন মিস্ত্রিকে মনে থাকবে না, জানি আপনাদের করোরই; কিন্তু আপনাদের সবাইকেই মনে থাকবে সুখনমিস্ত্রির।

মহুয়া মুখ নামিয়ে নিল। চোখটা ভারী হয়ে এল মহুয়ার। গলার কাছে কী যেন একটা চাপা কষ্ট দলা পাকিয়ে এল। মহুয়া বলল, চলি।

সুখন দরজাটা নিজের হাতে বন্ধ করে দিল। তারপর বলল, চলি চলি বলতে নেই, বলতে হয় আসি। এও জানেন না? তারপর আবার নমস্কার করে বলল, এদিকে এলে আবার আসবেন দিদিমণি।

ইঞ্জিনটা স্টার্ট করেই আবার বন্ধ করে দিল কুমার। কুমার ডাকল সুখনকে। বলল, এই যে এদিকে শুনুন।

সুখন অবাক হয়ে ওদিকে যেতে যেতে বল, কী ব্যাপার? আপনি তো সুখন মিস্ত্রিকে তুমি করেই বলতেন। হঠাৎ অধমের এ উন্নতি কেন?

সান্যাল সাহেব ও মহুয়া অবাক হয়ে কুমারের দিকে তাকিয়ে ছিল। কুমার কেন ডাকল, ওরা বুঝল না।

সুখন সামনের ডানদিকের দরজার কাছে গেলে কুমার হিপ পকেট থেকে পার্স বার করে দুটো একশো টাকার নোট ফট করে বের করে সুখনের হাতে দিয়ে বলল, আমাদের খাওয়া-দাওয়া খরচা।

সুখন কুঁজো হয়ে গাড়ির জানলার কাছে মুখ নামিয়ে এনেছিল। টাকাটা হাতে নিয়ে ওইভাবেই অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।

তারপর খুব আস্তে আস্তে বলল, এটার কি খুবই দরকার ছিল?

কুমার বলল, এটা না নিলে আমার খুব ছোটো লাগবে নিজেকে।

সুখন আশ্চর্য হবার মতো মুখ করে থাকল অনেকক্ষণ। যেন ও বোবা হয়ে গেছে। তারপর বলল, আপনারও তাহলে ছোটো লাগে নিজেকে কখনও কখনও? আশ্চর্য।

কুমার রাগত গলায় বলল, মানে?

সুখন জবাব না দিয়ে মহুয়াকে উদ্দেশ করে বলল, এই যাঃ, একদম ভুলেই গেছিলাম। আপনার জন্যও একটা জিনিস এনেছিলাম। গরিব মিস্ত্রি—আর তো কিছুই দেওয়ার নেই—বলেই পকেট হাতড়ে একমুঠো চকচকে বল-বিয়ারিং বের করল সুখন। বের করে, জানালা গলিয়ে হাত ঢুকিয়ে মহুয়ার হাতে দিল।

প্রয়োজনে চেয়ে অনেক বেশিক্ষণ মহুয়ার হাতে হাত ছুঁইয়ে রাখল ও। তারপর বলল, আপনি এখনও বড়ো ছেলেমানুষ আছেন দিদিমণি।

সান্যাল সাহেবও চাইছিলেন যে এবার এগোনো যাক। টাকাটা দিয়ে ফেলে কুমার এখন কি নতুন বিপত্তি বাধাল কে জানে? কুমারটা একটা স্কাউন্ড্রেল। সব জিনিসেরই সীমা থাকা উচিত। ওর অভদ্রতার কোনো সীমা নেই।

কুমার আর কিছু না বলে ইঞ্জিনের সুইচ ঘোরাল। গাড়িটাকে গিয়ারে দিল।

সুখন তখনও গাড়ির পাশে দাঁড়িয়েছিল। সুখন বলল, এক সেকেন্ড, আর আপনার সঙ্গে দেখা হবে না। একটা কথা বলে নিই।

তারপর একটু থেমে বলল, কুমার সাহেব, টাকা—বড়ো বেশি টাকা চিনেছেন আপনি। তাই না? জিন্দেগিতে টাকার চেয়েও বড়ো বহত বহত জিনিস আছে। এখনও বয়স আছে দিন আছে; সেসব চিনুন।

তারপর, বলল এই নিন। বলেই একশো টাকার নোট দুটোকে ফসস ফসস করে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে কুমারের মুখে ছুঁড়ে দিয়ে সুখন বলল, এই জঙ্গলে পাহাড়ে এমন লক্ষ লক্ষ শুকনো পাতা এই চোত-বোশেখে হাওয়ায় ওড়ে।

তারপরই মুখ সরিয়ে নিয়ে বলল, যান স্টার্ট দিন।

কুমারকে বলতে হল না আর। অ্যাকসিলারেটর পুরো দাবিয়ে দিয়ে স্টিয়ারিং সোজা ধরে

বসেছিল কুমার। ক্লাচে পা রেখে। ক্লাচ থেকে হঠাৎ পা সরাতেই গোঁ-গোঁ আওয়াজ করে ভয় পাওয়া শুয়োরের মতো লাফিয়ে গেল গাড়িটা সামনে।

কুমার ভয় পেয়ে গেছিল। মনে মনে বলল, এ শালাকে বিশ্বাস নেই। টাকা ছিঁড়েও হয়তো শান্তি হয়নি, এবার দৌড়ে এসে হয়তো মেরেই বসবে।

সুখন ওইখানেই দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছিল। সান্যালসাহেব জানালা দিয়ে। মহুয়া পেছনের কাচ দিয়ে। একটু পরেই রাস্তা বাঁক নিল।

সুখনকে আর দেখা গেল না। আবছা অন্ধকার, কালো পাথর, ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গল, এ-সবের মধ্যে সুখনের দাঁড়িয়ে থাকা, হাত-নাড়া চেহারাটা হঠাৎ হারিয়ে গেল।

মহুয়া পেছনের সিটে হেলান দিয়ে আধশোয়া ভঙ্গিতে বসেছিল।

গাড়ির হেডলাইট জ্বালিয়ে দিয়েছিল কুমার। ড্যাশবোর্ডের আলোতে ও হেডলাইট ইন্ডিকেটরের সবুজ আলোতে ড্যাশবোর্ডের উপরে রাখা একগুচ্ছ পলাশের লাল রঙে কেমন সবুজ আভা লেগেছে।

মহুয়া হাতের মধ্যে বল-বিয়ারিংগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। অনেকক্ষণ হাতের মধ্যে থাকায় গরম হয়ে উঠেছে ওগুলো।

হঠাৎ সান্যালসাহেব বললেন, টুই পাখিটা কী পাখি?

কুমার তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, আপনিও যেমন। ব্যাটা মিস্ত্রি নিশ্চয়ই মন-গড়া নাম দিয়েছে কোনো পাখির। আজব চীজ একটি। সুখন মিস্ত্রি।

তারপরেই পেছনে মুখ ঘুরিয়ে খুশি গলায় কুমার বলল, মহুয়ার কী হল? চুপচাপ কেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বেতলা পৌঁছোব আমরা।

মহুয়া জবাব দিল না। সান্যালসাহেব বললেন, কি রে মৌ?

মহুয়া বলল, উঁ।

—কী হল তোর?

মহুয়া বলল, কিছু না।

—তবে, চুপ করে কেন?

মহুয়া উত্তর দিল না অনেকক্ষণ।

তারপর অস্ফুটে বলল, ভাবছি.....।

✸

বিন্দাআস

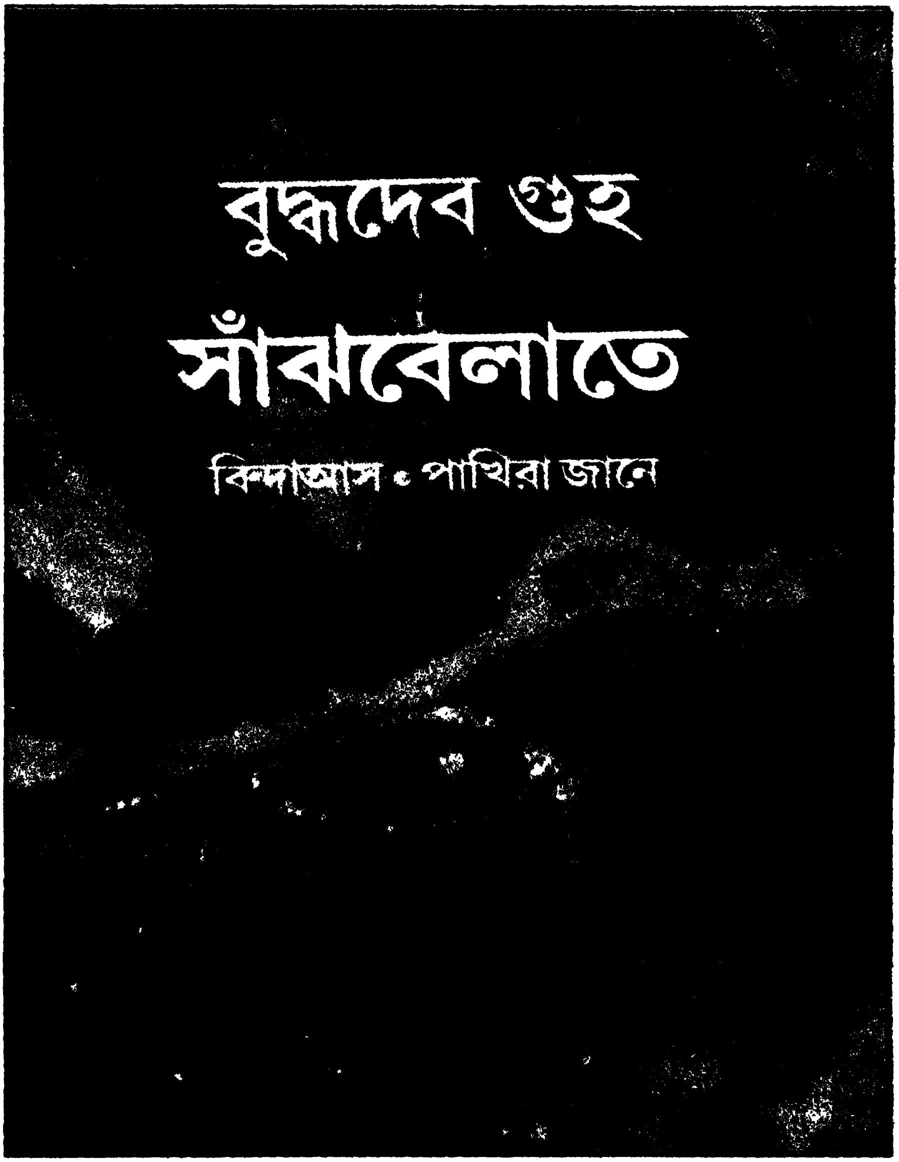

উৎসর্গ

সুভাষ এবং শুক্লা ভৌমিক-কে

প্রচ্ছদ

বুদ্ধদেব গুহ

১

কানহারি হিল রোডের পাণ্ডেবাবুর বাড়ি 'দ্যা জ্যাকারান্ডা' থেকে যখন বেরোল সুঘরাই সাইকেলটা হাতে করে ঠেলতে ঠেলতে, তখন রাত প্রায় দুটো।

হাজারিবাগ শহরের এ দিকটা বিশেষ নির্জন। কানহারি পাহাড়ে সবরকম জানোয়ারই আছে। লোকে যদিও বলে, বড় বাঘ নেই। কিন্তু চিতা বহত আছে। একবার এক খতরনাক চিতার সামনে পড়েছিল সন্ধেরাতে। ভাগ্যিস তার নাক খেয়ে নেয়নি। চিতারা নাকি বহতই খতরনাক হয়। কে জানে। হয়তো নাক খেতে ভালবাসে বলেই ওরা খতরনাক। ওর বন্ধু গিরধারী বলে।

ঠাণ্ডাটাও পড়েছে তেমনই এ বছর জব্বর। যাদের বউ নেই বা মোটা লেপ, তাদেরই মুশকিল। এতক্ষণ গান চলছিল বলে রাম-এর পাঁইটটা বের করতে পারেনি খদ্দরের পাঞ্জাবির পকেট থেকে। পাণ্ডেবাবু মানী লোক। পয়সাওয়ালা, তার উপর বয়োজ্যেষ্ঠ। তবে এতক্ষণ মস্ত ড্রয়িং রুমে ঘরের মধ্যে বহত দামি দামি গরম জামা আর জামদানি শাল গায়ে চড়ানো স্ত্রী-পুরুষের গায়ের গরম, টাকার গরম ছিল, ঠাণ্ডা তেমন মালুমও হয়নি। দুলারি বাইয়ের দরবারি কানাড়া শুনতে শুনতে এতক্ষণ শরীরের আর কোনও বোধই ছিল না, কোনওরকম দুঃখ-কষ্ট বোধই। শ্রবণসুখই এতক্ষণ একমাত্র ইন্দ্রিয় হয়ে অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কালটা শীত না গ্রীষ্ম না বর্ষা, সময়টা মধ্য-দুপুর না মধ্য-রাত্রি সে-সবের কোনও বোধই ছিল না সুঘরাইয়ের এতক্ষণ। গান শুনে সে একেবারে মস্ত্ হয়ে গেছে। মেয়েরা গর্ভবতী হলে যেমন মস্ত্ মনে করে নিজেদের। সার্থক, সেও দুলারি বাইয়ের গান শুনে তেমনই সার্থক মনে করছে নিজেকে। এ-জীবনে আর কোনও কিছু না পেলেও চলবে। এই মুহূর্তটির জন্যেই যেন সে এতদিন বেঁচে ছিল। এ যাবৎ গান বহতই শুনেছে। গান, মানুষকে অনেক কিছু দেয় বলেই জানত এতদিন কিন্তু গান যে এমন করে সব নেয়ও সেটা সুঘরাই জানত না। তাকে নাঙ্গা ফকির করে দিয়েছে একেবারে। দিওয়ানা করে দিয়েছে। দুলারি বাই তার গানকে বুঝি আজ সদ্‌কা করে দিয়ে দিয়েছে শ্রোতাদের। বিশেষ করে সুঘরাইকে। সেই দান ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা সেই গায়িকার নিজেরও আর নেই।

গান তো শিশুকাল থেকে বেনারসের ডাল-কা-মণ্ডি, মির্জাপুরের বাইজি-মহল্লা, লখনউয়ের তওয়াফদের মুখে কতই শুনেছে, গয়া আর পটনার বিভিন্ন ম্যাহ্‌ফিলে বাঘ-সিংহ পুরুষ গায়কদের মুখেও শুনেছে। মির্জাপুরে যখন ছিল মামাবাড়িতে স্কুলে পড়ার সময়ে, তখন ওর মামাতো দাদার সঙ্গে লুকিয়ে বাইজি মহল্লাতে যেত। শুধু গান শুনতেই যেত। সেই থেকেই গানের সঙ্গে ওর জীবন জড়িয়ে গেছে।

কাজের মানুষ যাকে বলে, তা আর হওয়া হল না এ জীবনে। ওই গানেরই জন্যে কাজের মানুষ হওয়া হল না, আবার ওই গানেরই জন্যে মানুষ হল!

'মানুষ' সংজ্ঞাটির মানে যে সকলের কাছে এক নয়।

উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ, উস্তাদ আমির খাঁ সাহেব, পণ্ডিত ভীমসেন যোশীর মুখেও ভোপালে ও ইন্দোরে একাধিকবার শুনেছে গান কিন্তু ঠিক এমনটি আর কার মুখেই শোনেনি। সত্যি কথা বলতে কি ওর ধারণা হয়ে গেছিল যে, দরবারি বুঝি পুরুষ গায়কেরাই গান, ও রাগ শুধু তাদের গলাতেই মানায়। আজকে সে ধারণা তার ভেঙে গেছে।

শুধু মস্তুই হয়নি, এই গায়িকার প্রেমেই পড়ে গেছে সুঘরাই। সাচমুচ্। ইংরেজিতে যাকে বলে "হেড ওভার হিল্‌স।" মনে মনে ঠিক করেছে যে, বাকি জীবন সে এই দুবলি-পাতলি মিষ্টি নারীর ফাই-ফরমাশ খাটবে—সে নারী সুঘরাইকে চাক আর না-ই চাক, ওই নারীর খিদমদগারি করেই কাটিয়ে দেবে বাকি জীবন। বান্দা হয়ে থাকবে। শুধু একটু কাছাকাছি থাকতে চায়, গান শুনতে চায় তার, আর তার ওই সুন্দর সুর্মা-চর্চিত বিষাদময় চোখ দুটির একটু প্রশ্রয় পেতে চায়।

যাকে এত গুণ দিলেন বিধাতা তাকে কোন আক্কেলে এমন স্নিগ্ধ রূপও দিলেন তা সেই বেআক্কেলেই জানেন। এর আগে অনেকই সুন্দরী গানেওয়ালি দেখেছে সুঘরাই কিন্তু তাদের সেই সৌন্দর্য বড় উগ্র। জ্বালাধরা তাদের রূপ। এমন স্নিগ্ধ শ্যামা রূপ এর আগে সম্ভবত আর কোনও গায়িকার দেখেনি। তা ছাড়া ......।

না থাক।

তা ছাড়া, এই মুখটিকে বড় চেনা চেনা মনে হয়েছে সুঘরাইয়ের। কোথায় যেন দেখেছে। স্বপ্নে দেখেছে কি?

উষ্ণ আরামে গানের আতরগন্ধি বাতাবরণের মধ্যে বাবু হয়ে বসেছিল এতক্ষণ সুঘরাই। 'দ্যা জ্যাকারান্ডা' বাংলোর বাইরে আসতেই কর্কশ বেসুরো পৃথিবীর খপ্পরে এসে পড়ল। শীতটা তার কান পাকড়ে নিঃশব্দে থাপ্পড়ের পর থাপ্পড় মারতে লাগল। সাইকেলটাও একেবারে বরফ হয়ে রয়েছে। শিশিরে ভিজেও গেছে চুপচুপে হয়ে। সেটাকে দঙ্গল থেকে তুলে নিয়ে একটা জ্যাকারান্ডা গাছে তাড়াতাড়ি হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে ওল্ড মংক রাম-এর পাঁইটটা পাঞ্জাবির পকেট থেকে বের করে ঢকঢক করে তিন-চার ঢোক মেরে দিল সুঘরাই। তারপর সাইকেলের হ্যান্ডেল দুটোর কান পাকড়ে, নিজের কান দুটো মাফলারে ঢেকে নিয়ে যখন প্যাডল-এ পা রাখল ঠিক তখনই ঠিক মির্জাপুরী মামাতো দাদা পরজের একটি প্রিয় শের মনে পড়ে গেল সুঘরাইয়ের—'দিল টুটনেসে থোড়িসি তকলিফ তো হুই লেকিন তামাম উমর কা আরাম মিল গ্যায়া।'

শেরটি কার লেখা এতদিন পরে আর মনে নেই। তারপরই উঠে পড়ল সে সাইকেলে। উঠতেই, পেছনটা যেন জমে গেল। সাড় চলে গেল। প্যাডল-এ চাপ দিল পা দিয়ে। যাবে মগমা। এই শীতের মাঝরাতেও ডি. ভি. সি-র মোড়ে চমনের বন্ধ হয়ে-যাওয়া হোটেলের সামনের আগুন ঘিরে শুয়ে-থাকা কুত্তার দল তার সাইকেলের পেছন পেছন কেঁউ কেঁউ করতে করতে আসবে। তাড়া করে যাবে ওকে প্রায় কাছারির মোড় অবধি। এস্থু আছে বটে ওই শালা কুত্তাদের।

গত বছরে এক হারামি কামড়েও দিয়েছিল ওর বাঁ পায়ে। প্রায়ই দাঁত কিড়মিড় করতে করতে ওই সময়ে ও ভাবে যে, একদিন বিষ-মাখানো লাড্ডু খাইয়ে ওই কুত্তার গুষ্টিই নাশই করে দেবে সুঘরাই। কিন্তু রাত পোহালেই আর মনে থাকে না। নিজেকে বলে, আহা। কেষ্টর জীব। প্রাণ নিয়ে আর কী হবে! সকলেই বাঁচুক। সুঘরাইও বাঁচুক, কুত্তারাও বাঁচুক।

কিছুটা যেতেই পেছন থেকে একটা গাড়ির জোরালো হেডলাইটের আলো এসে পড়ল তার গায়ে। শুক্লপক্ষের রাত। অষ্টমী নবমী হবে। তা ছাড়া গাড়িটা তখনও বেশ দূরেও ছিল কিন্তু তার হেডলাইটটা বড়লোকের মোসাহেবের মতো গাড়ির আগে আগে প্যায়েরভি করতে করতে নিঃশব্দে এসে হঠাৎই সুঘরাই-এর দু পায়ের মধ্যে ঢুকে গিয়ে তার আর তার সাইকেলটার কিম্ভূতকিমাকার ছায়া নিয়ে ভূতের নৃত্য করতে লাগল বৃত্তাকারে, ধুলো-মাখা, হিমে-ভেজা, পথের ধুলোর উপরে, তার সামনে সামনে। রাস্তা মসৃণ না হলে এবং শুক্লপক্ষের রাত না হলে এই ছায়াবাজির কারণে সাইকেলসুদ্ধু ও পড়েও যেতে পারত পথের উপরে। এ পথে এত রাতে তো কোনও গাড়িরই যাবার কথা নয়। তবে কি গানের ম্যাহ্‌ফিলেরই কেউ? অধিকাংশ শ্রোতারাই তো কাছাকাছি এলাকারই মানুষ এবং সাইকেলেরই আরোহী। অনেকের অবশ্য প্রাইভেট সাইকেল রিকশা আছে। কেউ এসেছে স্কুটার বা বাইকে। গাড়িওলাও ছিলেন জনা চার-পাঁচ। তাঁরা কেউই এখনও বাইরে

আসেননি। জানে না, হয়তো বিরিয়ানি-টিরিয়ানির বন্দোবস্ত আছে পাণ্ডে সাহেবের বাড়ির বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য। বিশিষ্ট মানে, বড়লোক। তবে সুঘরাইকে খেয়ে যেতে বলেননি পাণ্ডেবাবু। ও যখন বাড়িমুখো তখনও গাড়িওলা শ্রোতারা হয়তো ভিতরেই ছিলেন। গাড়ি চালাতে সুঘরাইও জানে। বাবাতো গাড়িতেই চড়তেন। এখনও গ্যারাজে একটি অস্টিন টেন আছে। কিন্তু সুঘরাই সাইকেলই চড়ে আজকাল।

রোড কনস্ট্রাকশনের কাজ করে গত পনেরো বছরে কোটিপতি হয়ে গেছে পাণ্ডেজি। আগে মালব্য চওক এ একটা সিঙাড়া-জিলিপির দোকান ছিল। তবে ভাল চলত। দিন রাত সিঙাড়া-জিলিপি ভাজা হত। তারপর পি ডাব্লু ডির এঞ্জিনিয়র, চিফ এঞ্জিনিয়র আর মিনিস্টারকে ধরে বরাত খুলে গেল। আজকাল তো 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।' রভিন্দর নাথই তো বলে গেছিলেন। সে কথা বর্ণে বর্ণে সত্য হল আজকে। এখন শত্রুঘ্ন পাণ্ডের দুটো জিপ, একটা কালিস, হারহাতের কাছে বাগানবাড়ি, বানাদাগে খেতিজমিন। তাকে দেখে কে!

হারহাতে তার রক্ষিতা বউ থাকে। ধরবাবুর এম এ পাশ বড়া লেড়কি। ধরবাবুকে মাসে দশ করে দেয়। শালা কামিনা আছে। মেয়ের শরীর ভাঙানো রোজগারে ফুটানি মারে। ছ্যাঃ।

পইসাই যখন হল তখন একটু পাওয়ারও তো চাই। এবারে মিউনিসিপালিটির ইলেকশনে দাঁড়িয়েছে পাণ্ডেবাবু। ক্ষমতাও যখন হচ্ছে তখন একটু আর্ট-কালচার ভি লাগবে তো। কী? লাগবে না?

বিলকুল। কমসে কম এক তবায়েফকি গানা তো হোনাই চাহিয়ে। উসহিকি ম্যাহ্‌ফিল থী আজ রাতমে। আর যাদের ডেকেছিল সব গিদ্ধড়, বেসুরো, বেকামকা আদমি। ওই সব মানুষের সঙ্গে এক ম্যাহ্‌ফিলে বসে গান শুনতে গা ঘিনঘিন করে সুঘরাইয়ের। কিন্তু ওই যে! পয়সা। ওদের জেব-এ যে বহুতই পয়সা আছে। একজন কবিকে ভি ডেকেছিল। যাকে দেখে মনে হয় কসাই। গানের 'গ'ও বোঝে না। বেজায়গায় সম দেখাচ্ছিল, বেতালে চাঁটি মারছিল ফরাসে।

এবারে গাড়ির শব্দটাও শোনা যেতে লাগল পেছনের শিশির ভেজা কাঁচা পথটাতে। তারপর শব্দটা ক্রমশই জোর হতে লাগল। লাহিড়ি সাহেবের বাড়ির কাছে ও পৌঁছতেই গাড়িটা তাকে পাশ কাটিয়ে আলোর ফোয়ারা ছুটিয়ে সামনের ফিকে অন্ধকারকে কিছুক্ষণের জন্যে অন্ধকারতর করে দিয়ে চলে গেল। যে বড়লোকেরা আগে সাইকেল চালাত তারাই সাইকেলে-বসা মানুষদের আলো দিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে পথে ফেলে আনন্দ পায়। অজীব সব ইনসান শালারা। গাড়িটার মিউজিক সিস্টেমে গাঁক গাঁক করে দুলারি বাইয়ের গাওয়া দরবারি কানাড়াই বাজছিল। নিশ্চয়ই ওই ম্যাহ্‌ফিলে বসেই টেপ করেছে। কাল সকালে নাস্তা করতে করতে শুনবে। গিধ্বর হয়তো ওইটুকুও জানে না দরবারি কখনকার রাগ।

অন্ধকারে গাড়িটা চেনা গেল না। তবে পেছনে নানা ঝিং-চ্যাক লাল নীল সবুজ হলুদ আলো দেখে মনে হল, গয়া রোডের অভিষেক সিংয়েরই হবে।

২

দারুণ কেয়ারি করা বাংলো। ধানবাদের কয়লা কিং অভিষেক সিংয়ের। আগেকার দিনে কয়লা-কিং বলতে বুঝাত খনির মালিকদের। আজকাল সব ঘুষের কারবারি খুনখারাবি-করা মাফিয়ারাই কিং। নানা ফুলের বাহার। মালী-বেয়ারা-বাবুর্চির টিপি। বছরে তিনবার আসে ধানবাদ থেকে ইয়ার-দোস্ত নিয়ে অভিষেক সিং। একবার গরমে, একবার শীতে, আরেকবার বর্ষাতে। খানা-পিনা-ফালানা-ঢামকানা চলে। শিকার করা কবেই বেআইনি হয়ে গেছে কিন্তু তবু চুরি করে সিমারিয়ার রাস্তাতে আর রাজডেরোয়াতে শিকার করে অভিষেক সিং আর তার দলবল। শিকার বলতে, মুরগি-ময়ূর-

তিতির-বটের-খরগোশ এই সব। যা পায়, তাই মারে। ট্রিগার টেনে হাতের সুখ করে। বড়ই ট্রিগার হ্যাপি তারা। খুব বড় শিকার হলে কখনও কোটরা একটা। ওইটুকুই তার শিভালরি। পটনাতে চাণক্যপুরীর শ্বশুরবাড়িতে গেলে, রোমহর্ষক শিকারের গল্প করে। তবে খতরনাক জানোয়ারের ছায়া মাড়ায় না সে আর তার দলবল।

অবশ্য চিতা বা বড় বাঘ মেরে হজম করাও মুশকিল। শীতকাল হলে তিলাইয়ার বাঁধের জলে বিদেশ থেকে উড়ে-আসা বড় বড় নাকটা হাঁস মারে। সবই বেআইনি। কিন্তু এখন এ দেশে যার পয়সা আছে আইন তো তার জেবেই বন্দি। বিহারের জমানাতে যা ছিল ঝাড়খণ্ডেও তাই। শুনতে পায়, পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাতেও নাকি তাই-ই। যথার্থই স্বাধীন হয়ে গেছে পুরো দেশই। তামাম দুনিয়া সেলাম ঠোকে সেই লোককেই যার পকেট-ভর্তি টাকা। অথবা যার হাতে ক্ষমতা। তার যা খুশি, তাই করে সে।

কয়েকবছর আগে সিন্দুর বস্তি থেকে ওই অভিষেক সিং পটকানের কাকা ভিখু কাহারের সুন্দরী মেয়েটাকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে তিলাইয়ার বাংলোতে ইয়ার-দোস্তদের সঙ্গে নিয়ে রেপ করে তারপর রাজভেরোয়া ন্যাশানাল পার্কের পাঁচ নম্বর ওয়াচ-টাওয়ার থেকে নীচের জংলাকীর্ণ খাদে মেয়েটার নাঙ্গা শরীরটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যায়। মেয়েটার নাম ছিল বুধিয়া। বুধবার জন্মেছিল বলে। শকুন লাশের উপরে পড়ে যাওয়াতে তার পরদিন দুপুরে এক ফরেস্ট গার্ডের নজরে আসে। লাশের হদিস হয়। ততক্ষণে সুন্দর শরীরটার কিছু বাকি ছিল না। শকুনেরা ঠুকরে ঠুকরে খেয়ে নিয়েছিল শবের সবই। ওপড়ানো-চোখ মাথাটা ছাড়া। আর কঙ্কালটা।

স্থানীয় মানুষেরা সকলেই অভিষেক সিংকেই সন্দেহ করেছিল কিন্তু কেউই কিছু বলল না বা করল না। সাক্ষী-প্রমাণেরও অভাব ছিল। বড়লোক বা গুণ্ডা-বদমাশদের রোষে পড়লে পুলিশ বা প্রশাসন তো বাঁচাতে আসবে না। ভারতের কোনও রাজ্যেই আসে না আজকাল। যা অবস্থা এখন তাতে মনে হয় ট্যাঙ্কো ফ্যাঙ্কো না দিয়ে নিজের নিজের মান-জান নিজেদেরই সামলাতে হবে। খামোখা নিজের বিপদ কে ডেকে আনতে চায়?

পটকানের কাকিমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল কিছুদিন আর তার বাবা ভিখুর চোয়াল দুটো চিরদিনের মতো শক্ত হয়ে গেছিল। হাসতে ভুলে গেছিল ভিখু কাহার। তবু একজনও প্রতিবাদ করেনি। এ এক অজীব দেশ। অন্যকে বলে কী হবে। সুঘরাইও করেনি। সেও অজীব। নিজের গায়ে মাঝে মাঝেই থুথু দিতে ইচ্ছে করে।

হাজারিবাগ এবং ঝুমরি তিলাইয়ার থানা, বাংলোর চৌকিদার, ফরেস্ট ডিপার্টের গার্ড, রেঞ্জার সকলকেই টাকার থলি ঘুষ দিয়ে চুপ করিয়ে দিয়েছিল অভিষেক সিং।

নিমপাতা বা ট্যাপারি কি পানিফল সকলে নাও খেতে পারে কিন্তু ঘুষ আজকাল সকলেই খায়। ইংরেজিতে যাকে "STAPLE FOOD" বলে, মূল খাদ্য, ঘুষ এখন তাই হয়ে গেছে স্বাধীন ভারতে। বহত পড়ে-লিখে সব মানুষই, প্রফেসর, ডাক্তার, এঞ্জিনিয়র, আর্মি-অফিসর, আমলা, সকলেই এখন চ্যাম্পিয়ন ঘুষখোর। থানাদার বা ইনকাম ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স ওয়ালাদেরও লজ্জা দিচ্ছে তারা। প্রয়োজন থাক আর নাই থাক ঘুষ খাওয়া অভ্যেস হয়ে গেছে সকলেরই। এ খেয়ে জোয়ানের আরক বা পুদিনহারাও খেতে হয় না। হজমের কোনওই গোলমাল হয় না।

এখন সকলেরই সব চাই। ছেলেবেলায় সুঘরাই দেখেছে যে, যোগ্যতার সঙ্গে প্রাপ্তির একটা সম্পর্ক ছিলই। এখন সে সব চুলোয় গেছে। ডাক্তার এঞ্জিনিয়র ছেলে পরীক্ষা পাশ করে গিয়ে জুটছে সরকারি নানা ডিপার্টে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পুলিশ, ইনকাম ট্যাক্স, তারজন্য কমপিটিটিভ পরীক্ষাতে বসে তা পাশ করে ঢুকে পড়েছে ঘুষ খাওয়ার জন্যে। যা এই দেশের অবস্থা এখন এই সব কমপিটিটিভ পরীক্ষা পাশ করার মধ্যেও ঘুষ-ঘাব ঢুকে পড়েছে কি না কে জানে। ঘুষ যে সর্ষের মধ্যেই ঢুকে গেছে। কোন ওঝা ওই ভূত ছাড়াবে কোন সর্ষে দিয়ে? ঘরে ঘরে ঘুষের মহোৎসব

লেগে গেছে। বিবেক-টিবেককে ছারপোকার মতো টিপে মেরে দিয়েছে সকলে। বিবেক আর কামড়ায় না কারওকেই। মেয়েটার অমন মর্মান্তিক মৃত্যুর পরে সকলেই বলেছিল, মানে আম-জনতা, হা রাম! যো হোনা থা উতো হোয়ি গ্যয়া, অব কর্না ক্যা?

বলে, দু তালুতে খইনি মেরে খেয়ে নিজের নিজের বিবেককে ধোঁকা দিয়েছিল। শুধু পটকান পনেরো দিন মুখে খাবার তুলতে পারেনি। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। অসহায়েরা যেমন চিরদিন সকলের অন্যায় সহ্য করে কেঁদেছে তেমনই করে। এতে আর নতুনত্ব কী? তা দেখে, নিজেকে অভিশাপ দিয়েছিল সুঘরাই। নিজের উপরে ঘেন্না হয়েছিল।

অন্যায় যারা করে, আর অন্যায় যারা সহ্য করে তারা যে সমান অপরাধী এ কথা কেউই বলে না আর আজকাল। আর তাই অন্যায়কারীদের সাহস ধীরে ধীরে সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ক্ষমতাবানের প্যায়েরভি, মোসাহেবি সকলেই করে। অনপড় থেকে পড়ে-লিখে। সেটাই সুবিধাজনক বলে।

সময় সবই ভুলিয়ে দেয়। বুধিয়ার এই নৃশংস মৃত্যুর শোককেও দিয়েছিল। নিজের নিজের স্বার্থ ও সুবিধা বিবেচনা করে সকলেই ভুলে গেছিল এত বড় অন্যায়টাকে। কিন্তু সুঘরাই ভোলেনি। প্রতি নিঃশ্বাসে, উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে সেই কাঁটা তাকে বাজে। কিছু একটা করতে তাকে হবেই। আজ আর কাল। নইলে আয়নার সামনে সে আর দাঁড়াতে পারবে না। সুঘরাই দলের জানোয়ার নয়, সে এক্‌রা। সকলেই যা করে সুঘরাই তা কখনওই করেনি। সে কোনও যূথপতি বা গোদার অঙ্গুলিহেলনে চলেনি জীবনে। একদিন মওকা পেলে বুধিয়ার মৃত্যুর বদলা সুঘরাই নেবেই। খুনকা বদলা খুন।

খয়ের, মওকা খোঁজে সে, যখনই অভিষেক সিং পটনা থেকে আসে। কিন্তু হারামি যে একা আসে না কখনওই। অনেক অন্যায় অনেকের প্রতি তারা করে বলেই নানা ভয়, নানা হীনম্মন্যতা, নানা পাপবোধ তাদের ছেয়ে থাকে সবসময়ে। তাই কোনও কামিনাই কখনওই একা থাকে না, একা চলাফেরা করে না। কী হাজারিবাগে, কী গয়ায়, কী পটনা-কলকাতায়, মুম্বইতে। তারা সব সময়েই দলে থাকে। দলবদ্ধ জীব বলেই একা থাকার সাহস ও ক্ষমতাই ওদের ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। মন্দিরে কি গোসলখানাতেও হারামিরা একা যেতে ভয় পায়। হারামিদের লক্ষণই এই।

যার যত টাকা তার প্রাণের ভয় তত বেশি। টাকা যত বাড়ে, ভয়ও তত বাড়ে। ঝুন্ড-এ থাকা জানোয়ারের মতো এদের স্বভাব, রাহান্-সাহান্ সবই। এদের সব সাহসও দলেরই সাহস। 'এক্‌রা' জানোয়ারের মতো এরা স্বনির্ভর নয়।

খায়ের, ভাবে সুঘরাই, একদিন না একদিন সুযোগ আসবে নিশ্চয়ই। নইলে পটকানটার কাছে কী করে সে মুখ দেখাবে? পটকান যে তারই আশ্রিত আর বুধিয়া ছিল তার বোন।

দু পা মাটিতে নামিয়ে, সাইকেলটা থামিয়ে, আবার ঢকঢকিয়ে খায় কিছুটা রাম। ডি.ভি.সি-র মোড় সামনেই। কুকুরগুলোর জন্য তৈরি হতে হবে। সে হারামিরাও দলবদ্ধ জীব। কুকুরে আর মানুষে তফাত রইল না কোনও।

এই হাজারিবাগ ছোট্ট জায়গা। এখানের সব বড়লোকদের বাড়িতেই কলকাতার রহিস আদমি পটা ঘোষের যাতায়াত আছে। যেমন আজ পাণ্ডে তাকে ডেকেছিলেন। বেজায়গাতে সম দেখিয়ে আঙুল দিয়ে নিজেকে সমঝদার জাহির করছিল গানের। এদের কেন যে আসতে বলা ম্যাহ্‌ফিলে।

কলকাতার পটা ঘোষ এলে তার বাড়িতে পার্টি লেকেই থাকে। আর উপোসী ছারপোকার মতো স্থানীয় কিছু স্বল্প-রোজগারি আর রিটায়ার্ড মানুষ নির্লজ্জর মতো মদ আর ভালমন্দ খাওয়ার জন্য তার বাড়িতে ভিড় করে মাছি পড়ার মতো। মোসাহেবি করে এমন যে, চোখে দেখা যায় না।

সুঘরাইদের ছেলেবেলাতে কিন্তু এমনটি ছিল না। আজেবাজে লোকের বাড়িতে, তার যতই পয়সা থাক, ডাকলেই মানুষে যেতেন না। আভিজাত্য, শিক্ষা এ সবের দেওয়াল ছিল।

পটা যা বলে, তাতেই আহা! আহা! করে সকলে। সর্বজ্ঞ পটা ঘোষ ক্লাসিক্যাল গান বোঝে, রভিন্দর সঙ্গীত বোঝে। গাড্ডু খাঁ সাহেব, নামী সেতারি পটা ঘোষের জিগরি দোস্ত। পটার হাতে সব খবরের কাগজ। কলকাতার বিবেকহীন জার্নালিস্টগুলো পরের পয়সায় মাছের মতো মদ গেলে আর পটার কথা মতো একে তোলে আর ওকে ফেলে। মানুষটা একটি অজীব চিজ।

পটা আদৌ মানুষ কি না সে সম্বন্ধেই সন্দেহ আছে সুঘরাইয়ের। সে জীবনে ও সংসারে একটিমাত্র সম্পর্কর কথাই জানে। সেই সম্পর্ক মালিক আর চাকরের সম্পর্ক। এ ছাড়া সংসারে যে আরও অনেক সম্পর্ক থাকতে পারে, এবং থাকে, তা তার ধারণার মধ্যেই নেই। শুনেছে যে, পটা ঘোষের পরমাসুন্দরী পুতুল-পুতুল বউ আছে একটি। ইট-চাপা ঘাসের মতো ফরসা। শুনেছে। যেমন বেন্টলি গাড়ি আছে, মার্সিডিজও আছে, আলিপুরে প্রাসাদোপম বাড়ি আছে, বারাসাতে, কালিম্পঙে এবং হাজারিবাগেও বাড়ি আছে। বউয়ের সঙ্গে সম্পর্কটাও চাকর-মনিবের কি না, তা জানে না সুঘরাই। বউ নিয়ে একবারও আসেনি হাজারিবাগে পটা ঘোষ।

সুঘরাইও যায়নি কখনও কলকাতায়। সুঘরাইয়ের পৃথিবীটা বড়ই ছোট। যদিও অন্তর্জগৎটা ছোট নয়। একদিকে রামগড় হয়ে রাঁচি, অন্যদিকে ঝুমরি-তিলাইয়া, আর আরেক দিকে সিমারিয়া, বড় জোর চাত্‌রা বা চান্দোয়া-টৌরি। এই নিয়েই সুঘরাইয়ের পৃথিবী।

নানা ছাইভস্ম ভাবতে ভাবতে মগমাতে তার ঠাকুরদার তৈরি পাথরের দোতলা বাড়িতে পৌঁছে গেল এক সময়ে সুঘরাই। তার খিদমদগার ছেলেমানুষ পটকান একতলার বসার ঘরের কোণে চৌপাইতে রাজাই মুড়ে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে ছিল নিভে যাওয়া কাঙ্গরির পাশে শুয়ে। দরজায় দুবার শিকলি নাড়তেই দরজাটা খুলে দিল পটকান ঘুম চোখে। যন্ত্রচালিতের মতো। কর্তব্যজ্ঞান টনটনে। পটকানের বাড়ি সিন্দুর গাঁয়ে। ভিখু কাহারেরই বোনের ছেলে ও। দরজাটা খুলে দিয়েই আবার রাজাইয়ের মধ্যে কুকুর-কুণ্ডলী পাকালো সে। পাশের বাড়ির বহত মালদার এম. ভি. আই. গাজু তিওয়ারির অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা দরজা খোলার শব্দে ঘাউ ঘাউ করে উঠেই চেনা শব্দ বুঝে নিয়ে আবার শুয়ে পড়ল মালিকের সাপ্লাই-করা সিঙ্গাপুরী কম্বলের উপরে।

সুঘরাই সাইকেলটাকে একতলার ঘরে রেখে, দরজা বন্ধ করে দোতলাতে উঠে নিজের ঘরে ঢুকে রাজাইটাকে হাত দিয়ে ছুঁল। বিছানার উপরে রাজাইটা চাপানোই ছিল। রাজাইয়ের উপরটা ডিপফ্রিজে রাখা মালাইয়ের মতো হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা, কিন্তু মসৃণ। চেয়ে দেখল দোতলার বারান্দাটা চাঁদের ফিরে আলোতে ভরে গেছে। তখুনি শুতে ইচ্ছে করল না। ঘরের দরজার সামনে আরাম-কেদারাটা টেনে নিয়ে বসে সুঘরাই মনে করার চেষ্টা করছিল কোথায় দেখেছে ও দুলারি বাইকে আগে। কিছুতেই মনে করতে পারল না।

দুটো পেঁচা একটা গামহার গাছকে ঘিরে ঘিরে চক্রাকারে ঝগড়া করছিল। টিভ্ভেল দম্পতির মতো। সব দম্পতিই কি একরকম হয়? কে জানে! ঝগড়া হবে এই ভয়েই তো বিয়েই করেনি সুঘরাই। করবেও না। বহত ঝামেলা। বেশ আছে! ডিগ্রি পায়নি কোনও, চায়ওনি, কিন্তু পড়াশুনো করে, হিন্দি, উর্দু, ইংরেজি। গান শোনে। নিজের পেট চলে যায়। সাইকেলটা আছে, যেখানে যেতে চায় চড়ে পড়ে। আর বেশি কী লাগে বাঁচতে?

বারান্দাতে কতকগুলো চন্দ্রমল্লিকা করেছে পটকান টবে। লতিয়ে উঠেছে কিছু লতা নীচের থাম বেয়ে ছাদে। হাসনুহানা, হেন্না। তবে শীতে কোনও গন্ধ নেই। তবু গাছ-পাতা-লতার একটা নিজস্ব গায়ের গন্ধ তো থাকেই। শিশিরে ভিজে সে গন্ধ আরও তীব্র হয়। চাঁদের আলো, চাল-ধোওয়া জলের মতো, কোরা শাড়ির মতো ছাদময় মেলা আছে। পূর্ণিমা হলে এ আলো ধবধবে সাদা হবে। সে দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আর দুলারি বাইয়ের মুখটি মনে করতে করতে হঠাৎই সুঘরাইয়ের বরিস পাস্তারনাক-এর ওর খুব প্রিয় কবিতার কটি পঙ্‌ক্তি মনে পড়ে গেল। ওর এরকম হয়। সুন্দরী নারীর মুখ আর সুন্দর কবিতার পঙ্‌ক্তি একই সঙ্গে মনে পড়ে যায়।

"The nights now sit down to play chess with me Where ivory moonlight chequers the floor. It smells of Acacia the windows are open. And passion, a grey witness, stands by the door." রাশ্যান পাস্তারনাক সাহেব রাশিয়ার শীত অবশ্যই হাড়ে হাড়ে জেনেছেন তবে হাজারিবাগের শীত দেখেননি। তাঁর কবিতাটি যদিও শীতে রচিত নয়। হাজারিবাগের শীতে লিখলে অন্যরকম করে লিখতেন। অবশ্যই।

সুঘরাই বারান্দার দরজার মোটা কাঠের হুড়কোটা দড়াম শব্দ করে বন্ধ করে লেপটা তুলে রাম-এর পাঁইটটা ঢকঢকিয়ে শেষ করে। দুটি হাত জোড়া করে দুই উরুর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। একটু উষ্ণতার জন্যে দুলারি বাইয়ের মুখটা মনে করার চেষ্টা করল একবার। এ মুখ তার খুব চেনা, খুবই চেনা, কোথায় যেন দেখেছে!

পরমুহূর্তেই ঘুমে কাদা হয়ে যেতে যেতে ভাবল, আজ কি স্বপ্নে দেখতে পাবে মুখখানিকে?

৩

গ্লাসে করে চা বানিয়ে নিয়ে এসে পটকান দরজাতে ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙাল সুঘরাইয়ের। পটকান প্রথম দিন থেকেই সুঘরাইয়ের নামটি ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে না, বলে সুঘাবাবু। নামটা অবশ্য একটু বিদঘুটেই। মির্জাপুরের মামা নাম দিয়েছিলেন ওদের দু ভাইবোনের সুহা ও সুঘরাই। দুই রাগের নামে। যারা রাগ-রাগিণীর বিষয়ে আনপড় তাদের পক্ষে এ সব নাম হজম করা মুশকিলও।

জবরদস্ত ধ্রুপদিয়া ছিলেন সুঘরাইয়ের মামা অনন্তপ্রসাদ চৌরাশিয়া। কোথায় না কোথায় তাঁর ডাক পড়ত গান গাইতে। তখনকার দিনে নিজের ছেলের নাম রেখেছিলেন পরজ আর ওদের দু ভাইবোনের নামও রেখেছিলেন মামা রাগের নামে। সুহা আর সুঘরাই। সুহা, সুঘরাইয়ের দিদি খুব ভাল গাইত। আগ্রা ঘরানার উস্তাদ ফৈয়াজ খা সাহাব-এর একজন তৈরি শিষ্য মুস্তাক আলি খাঁ সাহেবের কাছে খেয়াল-ঠুমরি সবই শিখেছিল। ওস্তাদ মুস্তাক আলি খাঁ সাহাব ম্যাহ্‌ফিলে গাইতেন না, মা সরস্বতীর সাধনা করতেন ঘরে বসেই। যাঁরা তাঁকে শুনেছেন তাঁরাই জানেন কোন জাতের গাইয়ে ছিলেন তিনি অথচ নিজের হাভেলি থেকে তাঁকে কেউ গান গাইবার জন্য বের করতে পারেনি। ইলাহাবাদের এক বহত পয়সাওয়ালা রহিস পরিবারে ওই গানের গুণেই সুহা দিদির বিয়ে হয়ে গেছিল। তেমন সুন্দরী ছিল না দিদি।

এখন সুহা ওর শ্বশুরবাড়িতে ম্যাহ্‌ফিল বসলে চিকের আড়ালে বসে তওয়ায়েফ বা উস্তাদ বা পণ্ডিতদের গান শোনে। নিজের তানপুরাতে ধুলোর আস্তরণ পড়েছে। কখনও চৈতি হাওয়াতে কোনও মৌমাছি বা নীল মাছি জানালা গলে তানপুরার তারে এসে অচানক পাখনা নেড়ে গেলে যে মুহূর্তের ঝংকার ওঠে তাতে নিজেই চমকে ওঠে সুহা দিদি। সুহা দিদির কথা ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। যে মানুষের মধ্যে গান আছে বা ছিল তার মধ্যে গান থেকেই যায়, বাইরে তার প্রকাশ হোক আর নাই হোক। দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে হলেও সেই গান প্রশ্বাস নিয়ে ঠিকই বেঁচে থাকে।

এই সব দেখে শুনে সুঘরাই বুঝেছে যে কোনও জিনিসই, সে গানই হোক, কী পড়াশুনো, কী প্রেম, শুরু করাটা খুবই সোজা, শেষ করাটাই আসল। দিদির গান শেষ অবধি হল না। নিজের পাঁচ ছেলেমেয়ে, দুই জা, তাদের দুটি করে, বৃদ্ধা অসুস্থা শাশুড়ি, বদমেজাজি বৃদ্ধ শ্বশুর, আঁচলে বাঁধা আলমারির চাবির গোছ, এতকিছুর মধ্যে গান কবে যে গোপনে বিদায় নিয়ে চলে গেছে তা বুঝতে পর্যন্ত পারেনি সুহা দিদি।

সুঘরাইয়ের মামা অনন্তপ্রসাদ আক্ষেপ করতেন মায়ের কাছে, মা যতদিন বেঁচে ছিলেন, যে, আমারই দোষে সুহা বেটির গানবাজনা হল না। নাড়া বেঁধে, হাতে সুতো বা সোনার চেন বেঁধে

অনেকেই গুরুর কাছ থেকে গানের আস্তাই আদায় করতে পারে সহজেই, কিন্তু গানের আলো আদায় করা অত সহজ নয়। সুহা দিদি উস্তাদ মুস্তাক আলি খাঁ সাহাবের কাছ থেকে আলোই আদায় করেছিল। মামাও পয়সাওয়ালা পরিবার দেখে ভেবেছিলেন, গান বাজনার কদর ওরা করবে। কিন্তু বহুত পয়সাওয়ালা বলেই বোধ হয় কদর করল না। তওয়ায়েফ-এর কদর করা আর মা সরস্বতীর কদর করা এক কথা নয়। তা ছাড়া বড় দেরি করে বুঝেছিলেন মামাজি, যে লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতী খুবই কম সহাবস্থান করেন।

সামনের প্রাচীন বটগাছের পাতাতে যে রোদ ঝিলমিল করছে তার উপরে কমপক্ষে শ পাঁচেক হরিয়াল এসে বসে বটের ফল খাচ্ছে। বটগাছে ফল আসে পুজোর সময়ে কিন্তু এ গাছটাতে ফল ধরে সারা শীত। রোদের চমকানিতে কোনটা পাতা আর কোনটা সদা-চঞ্চল সবুজ হরিয়াল তা বোঝা যাচ্ছে না।

ঝকমক করছে রোদ। বড়া মসজিদের দিক থেকে একটা টানা গুঞ্জরন আসছে। আজকে ওদের কোনও তেওহার আছে মনে হয়। সকাল থেকেই হইরই শোনা যাচ্ছে। হাজারিবাগ শহর আগে খুবই সুনসান ছিল। বাংলাদেশের যুদ্ধের পরে সেই যে দলে দলে এল ওরা পশ্চিমবঙ্গ হয়ে, সেই থেকে সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে লেগেছে। এখন এখানে হিন্দুরাই সংখ্যালঘু।

সুঘরাইয়ের অনেক মুসলমান দোস্ত আছে। বেশ লাগে ওদের। মনমৌজী। খানা-পিনা, গানা-বাজনা সবেতেই উৎসাহ আছে; হিন্দুদের মতো প্যানপ্যানানি নেই। ওর দোস্ত নাসির কথায় কথায় একটা শব্দ ব্যবহার করে—বলতে গেলে ও একাই ওই শব্দটাকে চালু করে দিল হাজারিবাগে। শব্দটা হল বিন্দাআস! ওকে কেউ ঠকিয়ে গেল তো নাসির বলল, বিন্দাআস। নাসির কাউকে ঠকিয়ে এল, তখনও মুচকি হেসে বলল, বিন্দাআস। ওর ছোটামামা ওর মেজদির সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে করল, নাসির বলল, বিন্দাআস। বদু মিয়ার নধর পাঁঠাকে দুপুরবেলা চুরি করে এনে জবাই করে কেটেকুটে চাঁব, পায়া, বিরিয়ানি, লাব্বা, চোরি করে রেঁধে সন্ধেবেলা দোস্ত-বিরাদরদের ডেকে রাম সহযোগে জোর খানাপিনা করল, তারপর চোখ মেরে বলল, বিন্দাআস।

বিন্দাআস শব্দটার মানে যে ঠিক কী তা সম্ভবত নাসির নিজেও জানে না। সুঘরাইয়ের মনে হয় ইংরেজি 'could not careless'-এর সঙ্গে খুব মিল আছে শব্দটার।

রোদের মধ্যে ছাদে বসে চা-টা খেতে খেতে সুঘরাইয়ের আজ নাসিরের কথা খুব মনে পড়ছিল। নাসিরেরও গান বাজনার খুব শখ। কাল রাতের দুলারি বাইয়ের গানের রেশ এখনও তার মনকে ভরে আছে আর সেই জন্যেই দুলারি বাইয়ের গানের সঙ্গে নাসিরের কথা মনে পড়ে গেল সাতসকালেই। নাসির ওর জিগরি দোস্ত। নাসিরকে ও মির্জাপুরে মামাবাড়িতেও নিয়ে গেছে ছেলেবেলায়। সুঘরাইয়ের ছোট মামাতো-বোন চামেলিকে খুবই পছন্দ ছিল নাসিরের। তখনকার দিনে হিন্দু-মুসলমানে বিয়ে হলে দাঙ্গা লেগে যেতে পারত।

ঘুম থেকে উঠেছিল আজ খুব দেরি করে। সকালের ডাক নিয়ে এল পটকান বাজার করে ফেরার সময়ে। চা-টা সুঘরাইয়ের হাতে ধরিয়ে দিয়েই চলে গেছিল। জলের ট্যাঙ্কের নীচে মাছওয়ালারা আসে তিলাইয়া ড্যামের মাছ নিয়ে। দেরি করে গেলে ভাল মাছ পাওয়া যায় না। সুঘরাই অত মাছের ভক্ত নয়। আসলে মাছ ভালবাসে পটকানই নিজে। তাই দৌড়ে যায়। সুঘরাই বোঝে, কিছু বলে না। আনন্দ পায় ছেলেটা একটু মাছ খেয়েই। আনন্দ পাক। কতই বা মাইনে পায়! খেতে পায় সেইটুকুই যা। ওদের বস্তির ঘরে তো বছরে কদিন ভাত খেতে পায় তাই অজানা। দু মুঠো ভাতই ওদের কাছে মস্ত বিলাস।

পটকান কথা কম বলে। ছাদে উঠে এসে বলল, নাসিরবাবু এসেছেন।

কোথায়?

চমকে উঠে বলল সুঘরাই। যার কথা ভাবছিল সেই এসে হাজির।

মোটর সাইকেল রেখে আসছেন উপরে।

তারপরই বলল, অভিষেক সিং কোররার মোড়ে একটা বাচ্চাকে গাড়ি চাপা দিয়েছে একটু আগে।

সে কী রে! তারপর?

লোকে গাড়ি ঘিরে ফেলেছিল। পাঁচশ টাকা দিয়ে চলে গেছে।

ছেলেটা?

হাসপাতালে।

অবস্থা কেমন।

শুনলাম ভাল না। নাও বাঁচতে পারে।

কার ছেলে?

লালু হাজামের। পথের পাশে বসে রোদ পোয়াচ্ছিল আর জিলিপি খাচ্ছিল। আর তার বাবা চুল কাটছিল লোকের। আজ তো জুম্মাবার। সকাল থেকেই ভিড়।

তারপর?

নাসির উঠে এল ছাদে।

বলল, তারপর আর কী? ওখান থেকে তো সোজা কোতোয়ালিতে চলে গেল সিং বাবু। বড় দারোগা ইমানদার নেক আদমি। কিন্তু মহা খচরা ছোট দারোগাটা। মনে হচ্ছে তাকে ফিট করে দিয়েছে এতক্ষণে। সকলে বলছিল। বড় দারোগা সিমারিয়াতে গেছে ইন্সপেকশনে। পটকান বলল, ইনসপিকশান।

সুঘরাই ভাবল, ছেলেটা মরে গেলেই বা কী হবে। পটকানের দিদি বুধিয়া মরে গেল তো কী হল? বিন্দাআস।

চা এনে দে দাদাকে।

সুঘরাই বলল।

তারপর পটকানকে বলল, গেলি মাছ কিনতে জলের ট্যাঙ্কের নীচে তা কোররার মোড়ে তুই কী করতে গেছিলি?

বা-রে। আপনি কাল রাতে বললেন যে, গরম জিলিপি আর সামোসা আনতে।

বলেছিলাম?

হ্যাঁ তো।

ছাদে উঠে এসে নাসির বলল, আরে মাঠ্রীভি লাও পটকান, দো চার ডরজন, কম সে কম, নেহি তো পটকা দেগা। স্রিফ চায়ে নেহি দেনা।

সমঝা না?

পটকান হেসে বলল, জী। আভ্ভি লায়া বাবু। গরম গরম সামোসা আর জিলাইবি ভি লায়েগা।

লাও। মগর মাঠ্রীভি লাও।

পটকানের হাতের ঘিয়ে ভাজা মাঠরী খুব প্রিয় নাসিরের।

পটকান চলে গেলে নাসির বলল, দুলারি বাইকি গানা শুননা হ্যায় তো সাত বাজি বিলকুল তৈয়ার হোকে রহনা। ম্যায় উঠাকে লে যাউঙ্গা।

কাঁহা হ্যায় ম্যাহ্ফিল?

ছদিবাবুকি ঘর।

কালভি তো থে পাণ্ডেবাবুকি ঘর। তু তো আয়া নেহি।

ম্যায় সব দাওয়াত পুরা নেহি করতা হুঁ।

তুমহারা থা দাওয়াত?

নেহি তো ক্যা?

কাহে? গ্যয়া কাহে নেহি?

বিন্দাআস।

নাসির বলল।

তারপর নাসির বলল, ইয়ে দুলারি বাই হ্যায় কওন তু জানতে হো?

জানতা তো নেহি মগর সকল অ্যায়সী লাগা কি ক্যা?....

খোয়াব মে দেখা হোগা।

বকওয়াস মতো কর্।

নেহি। উও নেহি, মগর, সাচ ....

দিখা তো তু জরুর।

নাসির বলল।

চমকে উঠে সুঘরাই বলল, কঁহা?

ওর বুকের মধ্যেটা ধড়ফড় করতে লাগল। নাসিরের কথা শুনে মনে হল নাসির যেন চেনে দুলারি বাইকে।

কঁহা?. ম্যায় ক্যাহে বাতাঁউ। শোচ, শোচ, শোচ, তব হি না জবাব মিলেগী।

বলেই, চোখেমুখে এক দুষ্টুমির হাসি এনে জিয়ার সেই বিখ্যাত শেরটি আউড়ে দিল ডান হাত নেড়ে।

'কৌনসা জখম কা খুলা হ্যায় টাকা
আজ ফির দিলমে দর্দ হোতা হ্যায়।'

কোন পুরনো ক্ষতের সেলাই খুলে গেল তা কে জানে! আবারও রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে আমার হৃদয়ে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সুঘরাই বলল, ইয়ার্কি না মেরে বলই না আসল কথাটা?

নাসির বলল, তোর মামাবাড়ি মির্জাপুরের কথা মনে আছে কিছু? সেই যে পরজদাদা আমাদের নিয়ে বাইজি মহল্লাতে গান শুনতে যেত?

আছে বইকী।

মুন্নি বাইয়ের কথা মনে আছে?

আছে না? আহা! হোরি ধামার কী গাইত। জীবনে কোথাও অমন না শুনেছি, না আর শুনব।

তার ছোট বোনকে মনে আছে? শবনম। যার জন্যে পরজদাদা চকলেট নিয়ে যেত আর যে মছিন্দাতে যেত আমাদের সঙ্গে চড়ুইভাতিতে। বিলাওল ঠাটের একটা বন্দিশ গাইত সে ভারী মিষ্টি করে—যেন মধু ঝরত। মনে নেই? দু বিনুনি করে থাকত মা-মরা মেয়ে। মোটা করে সুর্মা লাগাত আর ফিরদৌস আতর মাখত। মনে নেই? ছোট্ট ছিল তখন।

তুই বলতিস কানে কানে ফিসফিস করে, চোখ দুটো কী সুন্দর রে। বড় হলে আমি ওকে বিয়ে করব।

আমি বলতাম, বড় তুই নিজেই তো আগে হয়ে নে। তা ছাড়া, সে ঘটনা ঘটলে আমি সবচেয়ে আগে দাঙ্গা লাগাব।

আসল কথাটা বলই না।

অধৈর্য সুঘরাই বলল।

নাসিরউদ্দিন বলল, দুলারি বাই-ই সেই শবনম। পটনাতে থাকে এখন। নানা জায়গাতে যায় মুজরা নিয়ে। তবে শুধু গায়ই। বাজায় না কোথাও।

তাই?

তাই তো জানি।

রেকাব ভর্তি করে মাঠ্রী আর বরফি, জিলাইবি আর সামোসা আর গরম ধোঁয়া উঠা বড় এক গ্লাস চা নিয়ে এল পটকান নাসিরের জন্যে। তারপর আনতে গেল সুঘরাইয়ের জন্যে।

পটকান চলে গেলে সুঘরাই বলল, গায়, কিন্তু বাজায় না মানে?

মানে, বাজায় না। তুই একটা বুদ্ধু। এত তওয়ায়েফের গান শুনিস আর এটুকু জানিস না? খুব সামান্য সংখ্যক তওয়ায়েফই এখনও আছে যারা শুধুই গায়, শোয়-টোয় না। শুনেছি শবনম শুধুই গায়। তা ছাড়া ওর বয়সই বা কী?

শোওয়াকেই বাজানো বলে?

জী হাঁ, বুদ্ধুরাম।

তারপর বলল, মনে আছে তোর? ও তোর নাম দিয়েছিল ডাকু। জানি না, কী ড্যাকাইতি করেছিলি তুই আমার চোখের আড়ালে।

আর তোকে তো ডাকত চুহা বলে। আমার মনে আছে। কেন বলত তুইই জানিস।

সুঘরাই হেসে বলল।

আহা! মনে আছে এক বর্ষার বিকেলে মছিন্দাতে একটি কালো পাথরের উপরে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে শবনম আমাদের সবে শেখা মিয়াকি মল্লার শুনিয়েছিল। অতটুকু মেয়ে—কিন্তু কী তার গলা, কী ভাব। সারাজীবন হারমনিয়াম আর সারেঙ্গি ভেঙে ফেললেও কারও কারও গলাতে সুরের পাখিরা বাসা বাঁধে না আর কেউ কেউ জন্মায়ই কোকিল হয়ে। প্রতিটি পর্দাই ভরপুর সুরে বলে। মায়ের পেট থেকে পড়েই। তারপর বলল, মিয়াঁকি মল্লার পুরুষদের গলাতে ভাল খোলে কিন্তু শবনম ছাড়া আর কোনও মেয়ের গলায় আর কোনওদিনও আমরা মিয়াঁ কি মল্লার শুনতে পাব বলে মনে হয় না।

সুঘরাই বলল, আশ্চর্য! জানিস, কাল দরবারি কানাড়া গাইল। কোনও ম্যাহ্‌ফিলে কোনও গায়িকাকে আগে আমি দরবারি গাইতে শুনিনি। ও কি মিয়াঁদের চিবিয়ে খাওয়ার জন্যেই এসেছিল।

সে তো চোখের দৃষ্টি দিয়েই পারে।

গান গাইবার দরকার কী?

তারপর বলল, জানিস সুঘরাই, তোর মনে আছে কি না জানি না, পরজদাদা বলত, বুঝলি রে! আর্ট তো একটা এফেক্ট, আর সেই এফেক্ট বজায় থাকে পরিবেশনের কায়দায়। আলাপই বল, আর গানই বল, কায়দার শেষ কথা হল কীভাবে আখরি বাহার খুলে দিতে হয়—সেলাম জানিয়ে বিদায় নিতে হয়। জারিনের আওয়াজে যদি গায়কীই চাপা পড়ে যায়, আর গায়ক বা গায়িকা যদি সুর ছেড়ে দিয়ে দু হাতে আশরফির মতো তারিফের টুকরা জমা করতে মন দেয়, তো আমি বুঝব যে মানুষটা বহুতই কম দরের। বাজনা তো শুনেছি মিয়াঁ কি মল্লার অনেক ভাল ভাল বাজিয়ের কিন্তু আমাদের ছোট্ট শবনম সেই সন্ধেতে তার গলাতে এবং তাও আবার খালি গলাতে, যা গেয়ে শুনিয়েছিল তার তুলনা তো আজ অবধি কারও গলাতেই শুনলাম না।

মনে আছে?

আমরা পরজদাদার প্রতি কৃতজ্ঞভাবে মাথা নিচু করে নিঃশব্দে চেয়েছিলাম। আমার বা তোর কারও মুখ দিয়েই একটি বাক্য সরেনি।

হুঁ। মনে আছে।

শবনম আমাদের অনাবিল, উচ্ছ্বসিত, উদ্বেলিত প্রশস্তির লজ্জাতে মুখ নামিয়ে বসে ছিল। মেঘ-ছেঁড়া আলো এসে পড়েছিল তার সুডৌল সুন্দর মুখে। গঙ্গা মাঈয়ের উপর পরতে পরতে মেঘ সাজছিল আর কুন্দফুলের মালার মতো সাদা বকের পাঁতি সেই কালিমার পটভূমিতে দুলতে দুলতে

উড়ে যাচ্ছিল। আর তারই সঙ্গে ঝুরু ঝুরু করে একটা হাওয়া বইতে লেগেছিল। আমলকী গাছেদের পাহারাতে ঘেরা মছিন্দা নদীর উপরে যে দুটি মাছরাঙা এতক্ষণ উড়ে উড়ে মাছ ধরছিল তারাও ওড়া থামিয়ে শবনমের গান শুনছিল স্তব্ধ হয়ে, একটি ছোট্ট গাছের ভাঙা পত্রশূন্য ডালে বসে। গানও শেষ হল, তারাও উড়ে চলে গেল দিনান্তবেলাতে।

সুঘরাইয়ের মনে পড়ল, নাসির বলেছিল, সেই সন্ধেতে, তুমি এমন সুন্দর করে কথা বলতে শিখলে কার কাছে পরজদাদা?

সে আছেন আমার গুরু কলকাতার পাঁচুবাবু। হ্যাঁ গানতো শোনে অনেকেই কিন্তু সেই শোনার ঠিকঠাক তারিফ কজন করতে জানে। পাঁচু জ্যাঠা একই সঙ্গে জ্ঞানের আর রসের ভাণ্ডার। তাঁর পায়ের কাছেই বসে শিখেছি যা শেখার।

কত কথাই যে মনে পড়ে সুঘরাইয়ের। তা হলে এই দুলারি বাই-ই সেই শবনম। ভাবতেই গা শিরশির করে উঠল সুঘরাইয়ের। ভাবতেই তার কী যে ভাল লাগছে। আজকে আর কি সে ডাকাতি করতে দেবে কোনওরকম।

তবে ডাকাতি একটা করেছিল বটে। ছোট্ট ডাকাতি। জোর করে চুমু খেয়েছিল শবনমকে। কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল সুঘরাই। ভাবছিল, মেয়েরা বিধাতার এক আশ্চর্য সৃষ্টি। মেয়েদের বড় হয়ে ওঠার রহস্যটি বড় বিস্ময়ের। ফুল ফোটার মতো। গ্রীষ্মশেষের ঊষর রৌদ্রদগ্ধ ডালে ডালে যেমন করে একরাতের বর্ষণে সবুজ পর্ণাঙ্কুরে ঢেকে যায় গাছ, এ সেরকম নয়। এই রহস্যর সঙ্গে গাছেদের বেড়ে ওঠার মিল আছে। এক এক বর্ষা যায় আর তাদের রূপ খোলে, তারা লম্বাতে বাড়ে, আরও চাকচিক্য পায়। পুরুষ কি মেয়েদের জীবনে বর্ষা হয়ে আসে?

কে জানে! কতটুকুই বা জানে সুঘরাই।

৪

বিকেল বিকেল তৈরি হয়ে নিয়েছিল সুঘরাই। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর লম্বা ঘুম লাগিয়েছিল একটা। সকলে নাসির চলে গেলে, ধানখেতিতে গেছিল একবার। গেহুঁ বাজরা মকাই ধানের খবর করতে। লোকজন সকলেই আছে তবুও একবার না গেলে চলে না। খেতির লাগোয়াই ভাণ্ডার। তাতেই সব মজুদ হয় তারপর বাজার বুঝে বেচে। এই সুঘরাইয়ের তর রোজগারের উৎস। তার বাপ-ঠাকুরদার রেখে-যাওয়া সম্পত্তি।

এ দিকে নকশালদের দৌরাত্ম্য রোজই বাড়ছে। ও তো বুর্জোয়াই। তবে ওর কুলি-কামিন কর্মচারী কারও জীবনযাত্রার সঙ্গেই ওর নিজের জীবনযাত্রার বিশেষ তফাত নেই। সকলকেই বিরাদর মনে করে ও। এবং সে খবর নকশালেরাও রাখে। নইলে এত দিনে ও-ও হয়তো খুন হয়ে যেতও।

বাবার একটা ওয়েবলি-স্কট-এর রিভলভার ছিল। পয়েন্ট থ্রি-টু বোরের। সেটাও ঠাকুরদার কাছ থেকেই বাবা পেয়েছিলেন। ও-ও পেয়েছে বাবারই কাছ থেকে। বাবার জীবদ্দশাতেই সেকেন্ড লাইসেন্স করে নিয়েছিল ও, বাবাও যেমন করেছিলেন ঠাকুরদার জীবদ্দশাতে।

তা ছাড়া, বন্দুক রাইফেলও ছিল। টুয়েলভ বোর শটগান, ফোর টোয়েন্টি থ্রি সিংগল ব্যারেল রাইফেল। ঠাকুরদা ও বাবা শিকারও করতেন। ফসল বাঁচাবার জন্যে শুয়োর শম্বর কোটরা খরগোশ মারতেই হত। গাই বয়েল মেরে দিত বাঘে ও চিতাতে। সে জন্যে প্রয়োজনে তাদেরও মারতে হত।

ও নিজেও একটা কিনেছিল ইন্ডিয়ান অর্ডিনান্স কোম্পানির থ্রি-ফিফটিন রাইফেল। মানুষ মারার জন্যে আইডিয়াল। একটা সময়ে চুরি-ডাকাতি লেগেই থাকত। কোতোয়ালিতে না গিয়ে যার

যার ফায়সালা নিজেরাই করত একটা সময়ে। এখন তো যাদের লাইসেন্সড বন্দুক-রাইফেল আছে তাদেরই বিপদ সবচেয়ে বেশি। পুলিশ যেমন হয়রানি করে, তেমনই ছিনতাই হবার ভয় থাকে নকশালদের হাতে। থানা থেকেই নকশালেরা কার কার ঘরে কী ওয়েপন আছে তা জেনে নেয়। এ বড় অজীব সময়। শুনেছে, পশ্চিম বংগালেরও এমনই হাল ছিল একটা সময়ে।

এখন বন্দুক রাইফেল সব বেচে দিয়েছে কারণ এখন ড্যাকাইতি করতে যারা আসে তারা এ. কে. ফর্টিসেভেন নিয়ে আসে। স্পোর্টিং বন্দুক-রাইফেল ঐ অস্ত্রের সামনে বেকার। শুধু রিভলভারটাই রেখেছে মনকে প্রবোধ দেবারই জন্যে। প্রয়োজনে তা দিয়ে প্রাণ বাঁচানো যাবে কি না তা অজানা। তবে সন্ধের পর বেরোলে ধুতির উপরে বেল্টে গুলি ভরে বেঁধে নিয়ে যায়। তাকে কেউ মারতে এলে দাঁড়িয়ে মারা যাবে না সুঘরাইকে। সে যেই হোক।

নাসিরের কাছে আনলাইসেন্সড প্রহিবিটেড বোর-এর অ্যামেরিকান কোল্ট পিস্তল আছে। কলকাতার খিদিরপুর থেকে কেনা। নাসির বলে, ইস জমানেমে ইসব রাখনা বহতই জরুরি হ্যায়। পুলিশ অওর কানুন কি কুছভি সাহারা নেহি।

এই সব কেনবার টাকা কোথায় পেল নাসির, জানে না সুঘরাই। ওর রুজি বলতে তো ছোট একটা মোপেড মেরামতির কারখানা। তবে নাসির তার ল্যাঙ্গোটিয়া দোস্ত। স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত। ওদের দোস্তিতে কোনও শর্ত নেই। নাসিরের বাবা ছিলেন ট্রেজারির ক্লার্ক। নানা রহস্যময় ব্যাপার স্যাপার ঘটছে আজকাল চারদিকে। গুজগুজ ফুসফুস। ঠিক কী যে ঘটতে চলেছে আন্দাজ করতে পারে না ও তবে মনের মধ্যে একটা উদ্বেগের মেঘ জমছে সুঘরাইয়ের বেশ কিছুদিন হল।

এই সব বিষয় নিয়ে নাসিরের সঙ্গে আলোচনা করতে গেলে নাসির ফুতকারে উদ্বেগ উড়িয়ে দিয়ে বলে, বিন্দাআস। আবৃত্তি করে বলে—

"ভঁমর যে লড়ো তুন্দ লহরোঁ সে উলঝো
কঁহা তক চলোগে কিনারে কিনারে?"

মানে, পাড়ে পাড়ে আর কতদিন সাবধানী পা ফেলে ফেলে চলবে? ভয়ের সঙ্গে লড়াইয়ে নামো, ঢেউয়ের মধ্যে উলটাও পালটাও, তবে না!

জামাকাপড় পরা হয়ে গেছিল সুঘরাইয়ের। নীচ থেকে নাসিরুদ্দিনের মোটর সাইকেলের পিঁ পিঁ শোনা গেল। সুঘরাই নীচে নেমে নাসিরের মোটর সাইকেলের পাশে দাঁড়িয়ে পটকানকে বলল, আজ খনা বহার। মগর লওটনেমে দের হোগি। তুম খা-পিকর শো যানা।

নাসির বলল, ডাটকে খানা অওর মুতকে শো যানা।

পটকান হাসতে গেল কিন্তু সুঘরাইয়ের সামনে হাসতে পারলও না। নাসির এই রকমই। ও যখন সুঘরাইয়ের বাড়িতে আসে, শুধু সুঘরাইয়ের বাড়িই কেন, যেখানেই ও যায়, তখন সে বাড়ির মালিক ওই বনে যায়। দলিল-সনদের কোনও দরকার হয় না। সে বাড়ি নবাবের হাভেলিই হোক কি জমিদারের ভাণ্ডার কি সুঘরাইয়ের মতো কারও বাড়ি। আল্লার বহতই এক দোয়া আছে নাসিরের উপর।

ভাবে পটকান।

মোটর সাইকেলে ওঠার আগে মাফলারটাকে ভাল করে গলায় জড়াল সুঘরাই।

নাসির বলল, শালে বচপনকি পেয়ারি সে মিলনে যা রাহা হ্যায় তেরা কোঈ আচ্ছাওয়ালা মাফলার নেহি থা ক্যা?

ইসসেই চলেগা। বকোয়াস মতো কর।

নীচু গলায় বলল সুঘরাই।

ঈত্তর-উত্তর লাগায়া না ঠিক সে?

নেহি তো।

অপ্রতিভ হয়ে বলল, সুঘরাই।

তু সাচমুচ অজীব আদমি হ্যায়।

বলেই, পাশে দাঁড়ানো পটকানকে বলল, আরে এ সুরত হারাম, দিখতা ক্যা হ্যায়? যা জলদি। ঈত্বরদান লান।

পটকান হুড়দাড় করে দোতলাতে গিয়ে ইত্বরদান নিয়ে আনলে নাসির হেসে বল, লেঃ। তু অম্বর লাগালে। ড্যাকাইতি আজভি তো কুছ করোগে, ক্যা? কম সে কম, থোড়া বহত।

বলে, নিজেই ঘোর লাল রঙা অম্বর আতরের কাটগ্লাসের শিশি থেকে কাচের ঢাকনি খুলে সুঘরাইকে আতর লাগিয়ে দিল। কানের লতিতে, বুকের চুলে, মাফলারে। আর নিজে একটু ফিরদৌস লাগাল তার সুচোলো গোঁফে।

বলল, ম্যায় শবনম যেইসী মহকেগা আজ।

সুঘরাই পটকানের সামনে নাসিরকে কিছু বলতে না পেরে চুপ করে থাকল।

নাসির মোটর সাইকেল স্টার্ট করল। বলল, ওটাকে নিয়েছিস তো পেটে বেঁধে? ফিরতে রাত হয়ে যাবে। যা দিনকাল পড়েছে।

হ্যাঁ। আর তুই?

নিশ্চয়ই।

বলেই বলল, পান তো খাবি?

নিশ্চয়ই।

বলল, সুঘরাই।

নানকু পানওয়ালার দোকানের সামনে তখন রংবাজ ছোকরারা জমায়েত হয়েছে। সিনেমাতে সন্ধের শো-এর সময়ও হয়ে এল। 'তুম একেলি, ম্যায় একেলা' ছবি এসেছে। গড্ডন খাঁ আর বেবি লিটপিটিয়া হিরো-হিরোইন। বহত দামে টিকিট ব্ল্যাক হচ্ছে। শনিবারের বাজার।

কালিপিলি জর্দা দিয়ে পান নিল দুজনে। চারটে সঙ্গেও নিয়ে নিল।

আজকে রয়্যালস্টাগ-এর পাঁইট নিয়েছি রে তোর জন্যে।

নাসির বলল।

কামাই খুব জোর হচ্ছে বুঝি?

বেঁকা রাস্তা ধরেছি না। বলিস না কারওকে। আব্বা জানলে তো খাল খুলে নেবে।

ধান্দাটা কী?

চোরাই মোটর সাইকেল আর স্কুটারের রং আর নাম্বার প্লেট পালটে নতুন করে ঝেড়ে দিচ্ছি বাজারে।

ছিঃ ছি। তুই না শায়ের!

শায়ের বলেই তো একটু ভাল থাকা-খাওয়া দরকার। শরাব-টরাব। মির্জা গালিবও দেনাতে ডুবে ছিলেন, সবই মদে উড়িয়ে ছিলেন, সে সব কথা কি মানুষে মনে রেখেছে? মানুষ রেখেছে তাঁর শেরগুলোকে। নাঃ; জীবনটা বড় ছোট। বুঝলি সুঘরাই। বুড়ো হয়ে জীবন উপভোগ করার মতো ধৈর্য আমার নেই তোর মতো। তুই গেহুঁ বাজরা বেচ গিয়ে, খেতি-জমি বেচ খেপে খেপে, আমার পোষাবে না? পাণ্ডেবাবু তো আমারই লাইনের লোক। ক বছরের রহিস সে? দ্যাখ না। আমিও শালা ধান্দা যদি এমনি চলে তো কানাহারি হিল রোডে বাড়ি বানাব বা কিনব আর আমার পেয়ারিকে নিয়ে আসব আমার ঘরে।

পেয়ারি মানে?

মানে, নাজমা।

সে কি? সে তো শাদি-শুদা লেড়কি।

তো কী হল? বাতিল থোড়ি হয়ে গেল সে! তার খোদার খাসির মতো মরদটাকে সরিয়ে দেব দুনিয়া থেকে।

আর বাচ্চাটা?

কত পাখির বাচ্চার গলা মুচড়ে মারলাম আজ অবধি বচপন থেকে, আরও একটা বাচ্চা মারতে কী লাগবে?

নাঃ। তুই ....

সুঘরাইয়ের বুকের মধ্যে কষ্ট হচ্ছিল। বড়ই বদলে গেছে নাসির। ওর সঙ্গে আর বেশিদিন পটবে না সুঘরাই-এর।

একটু পরেই সন্ধে হয়ে যাবে। মাঘ মাসের নিস্তেজ লাল রোদে পথের লালমাটি ও ধুলোমাখা গাছপালাকে বিধুর দেখাচ্ছিল। পাখিরা কিচিরমিচির করতে করতে ঘরে ফিরছিল। ঝিঁঝিদের ঝিনিঝিনি শুরু হয়ে গেছিল। বড় চমৎকার শহর ওদের এই হাজারিবাগ। সীতাগড়া, সিলওয়ার আর কানহারি পাহাড় ঘেরা। এখানেই সে জন্মেছে, বড় হয়েছে, একটি সম্ভ্রান্ত বাতাবরণের মধ্যে—গান-বাজনা-সাহিত্য-সহবতের মোড়কে। সেই মোড়কের মধ্যে নাসিরুদ্দিনও ছিল। কিন্তু আজ যা শুনল তাতে বড় ধাক্কা খেল সুঘরাই। নাসিরুদ্দিনের মোটর সাইকেলের পিছনে বসে, তার পিঠের সঙ্গে বুক লাগিয়ে, সেজন্যে হঠাৎই যেন ভারি লজ্জা করতে লাগল ওর। কিন্তু তারই সঙ্গে নাসিরের প্রতি এক ধরনের সম্ভ্রমও জাগল। যখন ভাবল যে, অনেক মানুষই নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু সে যে নষ্ট হয়ে গেছে তা স্বীকার করে না, সেই সত্য সচেতনে লুকিয়ে রাখে। অথচ নাসিরের কোনও লুকোচাপা নেই। ভাবটা এমনই যে, আমি যেমন, আমাকে তেমনভাবেই স্বীকার করে নিলে নাও, নইলে ফেলে দাও, আমার যায় আসে না কিছু।

ছেলেবেলার বন্ধু। ফেলে দেবে কী করে। তা ছাড়া গুণও তো কম নেই নাসিরের। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় গুণ তার হৃদয়। এমন হৃদয়বান মানুষ খুব কমই দেখেছে সুঘরাই। বুকের মধ্যে ঝড় উঠল ওর কিন্তু মুখে কিছুই না বলে চুপ করে রইল।

কাছারির কাছে এসে বাঁ দিকে মোড় নিয়ে নাসির বলল, অভিষেক সিং কি আজও আসবে নাকি?

আমি কি করে বলব। তুইই তো তোর অতিথি করে নিয়ে যাচ্ছিস আমাকে ছদি রায়ের বাড়ি। আমি কি তাঁকে চিনি?

ছদিবাবু সাচমুচ রহিস আদমি। কাতরাস-এ তাঁর কয়লা খাদান ছিল। শখ ছিল শিকার, ক্যামেরা, বন্দুক, রাইফেল আর মাছধরা। ওঁকে প্রথমবার দেখি তোপচাঁচিতে। বাবার সঙ্গে বেড়াতে গেছিলাম স্কুলের অ্যানুয়াল পরীক্ষার পরে, এমনই এক শীতের দিনে। দেখি মিহি ধুতি আর খাকি ফুলশার্ট পরে এক ভদ্রলোক জলের পাশে কার্পেট বিছিয়ে বসে আছেন দু দিকে চারপাঁচটা হুইল নিয়ে। পাশে একটা হোয়াইট লেবেল হুইস্কির বোতল, জলের বোতল এবং গ্লাস। ধানবাদ ওয়াটার ওয়ার্কসের দুজন উর্দিপরা বেয়ারা আর জনা দুই খিদমদগার পেছনে দাঁড়িয়ে। দুপুরবেলা স্কচ খেতে আর কারওকেই দেখিনি আজ অবধি।

নসির বলল।

তারপরে উনি কাতরাস থেকে হাজারিবাগে এলেন কী করে?

আর কী করে। কলিয়ারিই তো সব চলে গেল। এখানে বাড়ি করেছেন। ইটখোরি পিতিজে ওঁর একটি ছোট ডেরা ছিল শিকারের জন্যে। সেটি আজও আছে। তবে রোজগার চলে গেলে সব কিছু তো আর আগের মতো চলে না। একটা অ্যামরিকান সিলড-ইউনিট ফ্রিজ আছে সেখানে এখনও। চলে না যদিও।

অবস্থা যদি পড়ে গিয়ে থাকে তবে এত মানুষকে খাওয়াবেন কী করে!

সুঘরাই বলল।

আরে অবস্থা পড়লেও দিলেরি আদমির দিল তো একই রকম থাকে। ছদিবাবুর বাড়িতে ম্যাহ্‌ফিল, আর খাওয়া থাকবে না? তা কি হয়?

তা হলে আর রয়্যাল-স্ট্যাগটা আনলি কেন?

মদ খাওয়া বহুদিন হল ছেড়ে দিয়েছেন। যখন খেতেন, নিজেও স্কচ খেতেন, খাওয়াতেনও স্কচ সকলকে। আজ খানও না, খাওয়ানও না। তবে খনা কী রকম কিমতি হবে দেখিস।

তা হলে অভিষেক সিং আসবে কি না তুই জানিস না?

না। তবে বার বার এ কথা তুই জিগ্‌গেস করছিস কেন?

করছি এই জন্যে যে বদমাসটাকে আমি সহ্য করতে পারি না। বিশেষ করে বুধিয়ার মৃত্যুর পরে। এত বড় শয়তান, আপাদমস্তক ভণ্ড, শুধু পয়সা আর ক্ষমতার জোরে, খবরের কাগজওয়ালাদের মদতে মাথা উঁচু করে সমাজে ঘুরে বেড়াবে আর মানুষে দু দিকে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করবে এতো আর চোখে দেখা যায় না।

সে তো এখানে দেখছিস। এর পরও তো কিছু আছে না, কী?

কী আছে?

দোজখ আছে আমাদের। তোদের নরক আছে।

সে সব তো অনেক পরের কথা।

জানি না, ছদিবাবু অভিষেককে বলেছেন কি না। তবে নিজে কয়লা খাদানের মালিক ছিলেন। তখন হয়তো অভিষেকের বাবা জ্যাঠা তাঁর খাদানেই কাজ করতেন বা ছোটখাটো ঠিকা নিয়ে দিন গুজরান করতেন। এখন মালিকেরা হল ভিখারি আর লুটেপুটে খাচ্ছে কিছু আমলা আর ঠিকাদার। ইন্দিরা গান্ধীর ব্যাঙ্ক ন্যাশনালাইজেশন, কোলিয়ারি ন্যাশনালাইজেশন সবই তো রিকশাওয়ালা আর গরিবদেরই ভালর জন্যে করা!

তো কিসের জন্যে?

ক্ষমতা ক্ষমতা আর ক্ষমতা। পড়িসনি কি? Power corrupts and absolute power corrupts absolutely?

বলেই বলল, এসে গেছি।

অনেক আগে এসে গেলাম মনে হচ্ছে। কোনও গাড়িটাড়িই তো দেখছি না।

আগে না এলে নিরিবিলিতে তোর প্রেমিকার সঙ্গে কথা হবে কী করে? গিধ্বর কাঁহা কি!

তারাই বা আসবে কেন এত আগে?

বাঃ। আসর তৈরি করতে সময় লাগবে না। ফুল সাজানো হবে, আতরদানি, গোলাপজল, মাইক, ঝাড়লণ্ঠন, সারেঙ্গিওয়ালা, তবলিয়া, হারমনিয়মওয়ালা, স্বরমণ্ডল, কত কিসের ইন্তেজাম লাগে। এই ফাঁকে আমরা একটু পুরনো দিনে ফিরে যাব।

বাইকটা লাগিয়ে বারান্দাতে উঠতেই একজন আপ্যায়ন করে নিয়ে গেলেন ভিতরে।

নাসির ঘাড় ঘুড়িয়ে বলল, সুঘরাইকে, ইনি ছদিবাবুর বড় ছেলে দীপুবাবু।

দুলারি বাই আপনাদের কথা জিগ্‌গেস করছিলেন। চলুন। উনি পাশের ঘরে বিশ্রাম করছেন।

নাসির যে কখন তলে তলে শবনমকে খবর দিয়ে রেখেছিল তা সেই জানে। শবনম নাকি উঠেছে পুপু ইমামের বাড়ি।

দুলারি বাই, ওরফে শবনম, হালকা নীল রঙের সালোয়ার কামিজ পরে জাজিমের উপরে বসে ছিল। তার চুলে সাদা ফুলের সাজ আর সারা শরীরে হিরের গয়না। একটি বড় নাকছাবি। চোখ দুটি ফিঙের মতো স্পন্দিত হচ্ছে। সিঁথিতে হিরের টায়রা।

সুঘরাইদের দেখে তার মনে এক বিহ্বল ভাব ফুটে উঠল। আমাদের যেন চিনল কিন্তু চিনল না। হাসল কী ব্রীড়া ভঙ্গি করে। নাসিরের তাতে কিছু গেল এল না। ঠোঁটকাটা সে বলল, আরে শবনম, তুমহারি ডাকু আয়ী ইতনি সাল কি বাদ, তুম ডরতি তো নেহি?

শবনম আরও অনেক সুন্দরী হয়েছে। সে হাসল। কিন্তু সুঘরাই বুঝল এ হাসি ছেনালির হাসি। দুলারি বাই দুলারি বাই থাকলেই ছিল ভাল। তার মধ্যে শবনমকে খুঁজতে যাওয়া মূর্খামি। তার মধ্যে সেই মির্জাপুরের দিনের মছিন্দার বিকেলের মেয়েটি আর নেই। সে মরে গেছে। অনেক শহরে মুজরা নিয়ে নিয়ে সে এখন একজন অভিজ্ঞ পেশাদার নারী হয়ে গেছে। নাই বা বাজাল, গাইয়েও পেশাদার হয়ে গেলে, তার নিভৃত পবিত্রতা হারিয়ে যায়।

কিছু কথা হল সুঘরাই নাসির আর শবনমের মধ্যে। বেশিই ফর্মাল কথাবার্তা, বললও বেশি নাসিরই। সুঘরাই শুনল বেশি, বলল কম।

তারপরই হঠাৎ কুর্নিশ করে শবনম বলল, তানপুরা জারা মিলা লেতি হ্যায়—ইজাজৎ দিজিয়ে।

সুঘরাই বুঝল যে এবার তাদের উঠতে অনুরোধ করছে শবনম। তা করতেই পারে। এত মানুষে গান শুনতে আসবেন সব কিছুর তৈয়ারি তো করতে হবেই। কিন্তু দিলে বেশ চোট পেল সুঘরাই। রাগও হল নাসিরের ওপর। নাসির ও ঘর থেকে ম্যাহ্ফিল যে ঘরে হবে সে ঘরে ঢুকে পকেট থেকে পানের মোড়ক বের করে সুঘরাইকে দিয়ে এবং নিজেও নিয়ে মুচকি হাসি হেসে বলল, বিন্দাআস।

সুঘরাই অবাক হল। অনেক বদলে গেছে নাসির। তার ধান্দা যেমন তাকে বদলেছে তার অভিজ্ঞতাও হয়তো তার মধ্যের সুকুমার ব্যাপারগুলোর ইতি টেনেছে। ও যেন জানতই যে এমনই হবে, এমনই হয়ে থাকে। নসিরের মনে কোনও আঘাত লেগেছে বলে মনে হল না। কিন্তু সুঘরাইয়ের মন খারাপ হয়ে গেল। দু-বিনুনি করা শবনমকে সেই মছিন্দাতে কালো পাথরের উপরে যেমনটি দেখেছিল, যেমন করে সেই সন্ধ্যার গানটি তার বুকে এতদিন অবধি জেগেছিল, তেমনটি থাকলেই যেন ভাল হত। বুকের মধ্যে যখন কোনো প্রিয় গান মরে যায়, তখন প্রিয় পাখি মরে যাওয়ার মতোনই আঘাত লাগে।

দুলারি বাইকে নিয়েই সে সুখী ছিল, শবনম-এ তার প্রয়োজন ছিল না কোনওই।

৫

ছদিবাবুর মস্ত বসার ঘর মানুষে ভরে গেছে। তানপুরা ও সারেঙ্গি মেলানোও হয়ে গেছে। সি শার্প-এ গাইবে শবনম। তানপুরা উঁচু ফরাসের পেছন দিকে রাখা। ধূপের গন্ধ, ফুলের গন্ধ, নানা বিদেশি পারফ্যুম ও দিশি ইত্বরের গন্ধে 'ম ম' করছে পুরো আবহ। তানপুরা ছাড়ছে স্থানীয় দুই নবীন যুবা। সুঘরাই এদের মুখ চেনে কিন্তু নাম জানে না। হারমনিয়ামে যিনি আছেন সেই মানুষটিই ভিতরের ঘরে ছিলেন এবং তাঁরই অঙ্গুলি হেলনে যেন শবনম চলছিল। শবনম তাঁকে 'আব্বাস সাব' 'আব্বাস সাব' বলে সম্বোধন করছিল। সুঘরাইদের সঙ্গে দুটি কথা কয়ে তারই মুখের দিকেই তাকাচ্ছিল শবনম বারবার। মানুষটি শক্ত সমর্থ, সুপুরুষ। সিল্কের সাদা কুর্তা পাজামার উপরে কালো সর্জ-এর জওহর কোট। চারটি কলম গোঁজা। দশ আঙুলে দশ আংটি। তার মধ্যে হিরে, পান্না, অ্যামিথিস্ট, রুবি, চুনি, পলা, নীলা সব আছে। তার বুক পকেটে লাল সিল্কের রুমাল এবং চারটি কলম গোঁজা। বাহুল্যর প্রতিমূর্তি যেন মানুষটি। গলায় ফিরৎ-করে জড়ানো সাদা-কালো খোপ-খোপ মাফলার। মাথাতে কালো ফেজ টুপি। মুখে পান-জর্দা। আর সারেঙ্গিতে যিনি বসেছিলেন তিনি যেন এই জগতের মানুষ নন। সাদা চুল, সাদা, দাড়ি, সাদা সাধারণ কুর্তা পাজামা। তার উপরে ফলসা রঙা ফ্ল্যানেলের একটি জওহর কোট। গলাতে ফলসা-রঙা মাফলার। দু হাতে একটিও আংটি নেই। দু কানে দুটি সোনার বড় মাকড়ি, পাহাড়ি, আদিবাসী গাঁওবুড়ারা যেমন পরে।

ছদিবাবু সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিলেন গায়িকার এবং সাথ সঙ্গতিয়াদের। ওই বৃদ্ধর নাম উস্তাদ রোশন আলি। সুঘরাইকে রোশন আলি জেব থেকে বের করে একটি কার্ড দিলেন। তাতে লেখা, মহম্মদ রোশন আলি, সারেঙ্গি প্লেয়ার, এস এফ এফ।

ছদিবাবু ফিস ফিস করে বললেন, মৎলব নেহি সমঝা, না?

নেহি তো।

সুঘরাই বোকার মতো বলল।

ছদিবাবু হেসে বললেন, স্কুল ফাইন্যাল ফেইল্।

মানুষটির মুখে এক স্বর্গীয় জ্যোতি আর এক স্বমহিম হাসি অনুক্ষণ মাখা আছে মুখে। আজকালকার দিনে খুব কম মানুষের মুখে ওরকমটি দেখতে পাওয়া যায়। ভারী ভাল লাগল সুঘরাইয়ের।

গলা বের করল দুলারি বাই। দুলারি বাই বলাই ভাল, সে যখন সুঘরাইদের কাছে সেই ছেলেবেলার মির্জাপুরের শবনম হতে চাইলই না। সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজের মিঠাস-এ ঘরের সব খুশবু ম্লান হয়ে গেল। সামান্যক্ষণ আলাপ করেই ভীমপলশ্রীর উপক্রমণিকা করে ধরে দিল গজলটি। পদ পুরা হতেই সুঘরাই আর নাসির দুজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। এ তো জাফরের একটি পরিচিত শের।

"ইন হসরগোঁসে কহদো কেঁহী আওর যা বসেঁ

ইতনী জগহ্ কঁহা হ্যায় দিলেদাগদার মে।"

মানে হল, এবার কামনা বাসনাদের বলো যে, তারা যেন একে একে আমার হৃদয় ছেড়ে চলে যায়। এই ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে তাদের বসতে দেওয়ার জায়গা যে আর নেই।

প্রথমে শবনম ধীরে ধীরে গানের ভাঁজটি জাহির করল। তারপরে ধীরে ধীরে লতাপাতা কেটে সুরের আলপনা দিয়ে জরির কাজের Frill দিয়ে যেন রাগের ছকটি ফুটিয়ে তুলতে লাগল। পরিষ্কার বোঝা গেল যে, গায়িকা অন্যকে শোনাবার জন্যে গান শেখেনি, সে শিখেছে গান, নিজেকেই আনন্দ দেবার জন্য। যে গায়ক বা গায়িকা নিজের আনন্দে গান না গান, তাঁর গান সম্ভবত শেষ অবধি গান হয়ে ওঠে না। প্রত্যেক গায়কেরই হয়তো চোখের মধ্যে একটা সুরের অগ্নিকোণ আছে। সেখানে যদি উত্তাপ দেখা দেয় তা হলেই সুরের ঝড়সৃষ্টি যে কিছু হবেই তা আশা করা যায়। তবে স্নিগ্ধ ঝিরিঝিরি বা ইলশে গুঁড়ি বৃষ্টিও হতে পারে।

"ইন হসরগোঁসে কহদো", এই "কহদো" শব্দটিতে যখন পঞ্চম এসে স্থির এবং কোমল মাধুর্যে প্রতিষ্ঠিত হল, আহা! মনে হল যেন সুরে চিরাগ জ্বলে উঠল। এ আলো বর্ষার অন্ধকারে ঝোপ-ঝাড়ের জোনাকির ঝিকিমিকি নয়, এ যেন বসন্তের পূর্ণিমা। সুঘরাই আর নাসির হতবাক হয়ে তাদের ছেলেবেলার শবনমকে দেখতে লাগল, শুনতে লাগল। সুঘরাই-এর পরজদাদার জন্যে বড় কষ্ট হতে লাগল। আজ প্রায় পনেরো বছর আগে পরজদাদা ইলাহাবাদের পথে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে চলে গেছেন। আজ থাকলে এই জল-পাওয়া ফুল-ফলন্ত দুলারি বাইকে নিজ চোখে দেখে নিজ কানে শুনে যেতে পারতেন।

একেকটি সুর এসে শ্রোতাদের নিয়ে যাচ্ছিল বর্তমানের গহীনে আর সুঘরাইদের নিয়ে যাচ্ছিল দিগন্তলীন অতীতে। শব্দের পর শব্দ নিয়ে খেলতে খেলতে এগিয়ে যাচ্ছিল শবনম যেন মধুকর মধু সংগ্রহ করতে করতে আর ছড়াতে ছড়াতে উড়ে চলেছে হালকা শরীর পলকা হাওয়াতে ভাসিয়ে দিয়ে। ধৈবত আর কোমল নিষাদের ঝটিতি নকশা এঁকে শবনম আবার এসে সমাধিস্থ হল পঞ্চমে। "দিলেদাগদার" শব্দে। সেই পঞ্চমের কী রূপ, কী তার স্মৃতি। ভীমপলশ্রী রাগের যত হিরে জহরত সবই হিরের ঝলকানির মতো জাহির করল সে, উজাড় করে দিল পঞ্চমের সঙ্গে নিজেকেও। তারই পরে কখন পঞ্চম আড়ালে চলে গেল, ছোট ছোট ফিরৎ, কোমল ঝটকা মেরে আবার এসে দাঁড়াল

শবনম দ্বিতীয় চরণে। মধ্যম, গান্ধার এবং রেখাবও হারিয়ে গেল দেখা দিয়েই তাদের গোপন এবং ক্ষণিক রহস্য জানিয়ে, তারও পর সুর এসে দাঁড়াল স্থির হয়ে। আহা কী ঠাহরান্। সুরের পদ্মটি দুলতে লাগল আবার পঞ্চমের আবেগে, যেন কামনা জরজর সে দুয়া মাঙছে খোদার কাছে, বলছে আরেকবার এসো পঞ্চম, এসে সুধন্য করো, সুধন্য করো।

নাসির বলল, শালা! গান তো নয় তোদের অষ্টমী পুজোর আরতিচক্রই সম্পূর্ণ হল বুঝি!

সুঘরাই চুপ করে রইল। তার বাক্‌রোধ হয়ে গেছিল। ভাল গানবাজনা একা শুনে মজা হয় না। সমঝদার দোস্ত বিরাদরকে পাশে নিয়ে শুনলে সেই গানের মহক পুরোপুরি উপভোগ করা যায়।

গজলটি শেষ হল একসময়ে এসে। তারিফের ঝড়ও একসময়ে শান্ত হয়ে এল।

বাইজির গজল শুনতেই অধিকাংশ মানুষ এসেছিলেন। খেয়াল বা ধ্রুপদ ধামারের সমঝদার ও কারবারি এমনিতেই চিরদিনই কম। কিন্তু এক কোণ থেকে কে যেন বলে উঠল বাগেশ্রী শুনব। তাতে চাপা শোরগোল উঠল ম্যাহ্‌ফিলে।

এমনই সময়ে দেখা গেল অভিষেক সিং তিন-চারজন ইহ্‌রককে নিয়ে ম্যাহ্‌ফিলে ঢুকল। বড়লোকের প্যায়েরভি করার অভাব কোনওদিনই হয় না। চারধার থেকে কথার ছেড়ছাড় ভেসে এল। অনেকেই তার সঙ্গে দুটি কথা বলে দেখাতে চাইল যে অভিষেক সিংকে তারা চেনে। সবচেয়ে বেশি যা অবাক করল সুঘরাই আর নাসিরকে তা দুলারি বাইয়ের আচরণ। অভিষেক সিং ঢুকতেই, শবনম তাকে বারবার কুর্নিশ করল। ছদিবাবুও অবাক হলেন কম নয়। অভিষেকের অতীতকালটার সঙ্গে তাঁর বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। তাঁর বাড়িতে, তাঁরই সামনে অভিষেক সিংয়ের এমন খাতিরদারিতে একটু চমকে গেলেন তিনি। পরক্ষণেই বাস্তবকে মেনে নিলেন। তিন তো কাতরাস-এর ছদি রায় নন আর। এখন অভিষেকের মতো কয়লা মাফিয়ারাই হিরো। চানচানি অ্যান্ড ওড়া, অর্জুন আগরওয়ালা, প্রভুদয়াল আগরওয়ালা, রাহারা, নন্দলাল জালানরাও আজকে পুরোপুরি বিস্মৃত। দিন বদলায়। টাকা যেখানে যায়, সম্মান, খাতির প্রতিপত্তি সব সেখানেই গড়িয়ে যায়। সে টাকা যেভাবেই উপার্জিত হোক না কেন। আর এই গড়িয়ে যাওয়াটাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিনা প্রতিবাদে দেখতেও হয় এক সময়ের রহিসদের।

নাসির সুঘরাইয়ের বাহু ধরে হঠাৎই, বলল, চল্। হিয়াঁ অওর নহ বৈঠা যায়।

কাহে লা?

অবাক হয়ে বলল সুঘরাই।

চল্, ওঠ।

বলে এক ধাক্কা দিয়ে সুঘরাইকে তুলে শবনমের দিকে একবারও না তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। অভিষেক সিংয়ের দিকেও চাইল না একবারও। শুধু ছদিবাবুর দিকে চেয়ে হাত জোড় করে বলল, ইজাজৎ দিজিয়ে ছদিবাবু। আভি যানাহি পড়েগা। বহতই জরুরি কাম হ্যায়।

খনা? অওর গানা?

ছদিবাবু বললেন।

শেকেগা তো আয়েগা লওটকর। কৌসিস জরুর করেগা।

বলেই, নাসির সুঘরাইকে প্রায় টানতে টানতে সমবেত রসিকবৃন্দর হাত পা মাড়িয়েই প্রায় বাইরে এসে দাঁড়াল। শীতের খোলা আবহে জোরে প্রশ্বাস নিল একটা। তারপরই পথের ধুলোতে থুথু ফেলে বলল, হিঁয়া আনাই নেহি চাহিয়ে থা। দিখা তুমনে, তুমহারি বচপনকি পেয়ারিকি হরকৎ?

সুঘরাই বলল, তুইই তো নিয়ে এলি।

আমি কি আর জানি। সব আওরতই সমান। ইয়ে ভি আউর ইক সুরাতিয়া নিকলি।

সুরাতিয়া নাসিরের প্রেমিকা ছিল। দেবদাসের পারুর মতো। তার জন্যেই আজও বিয়ে করেনি

নাসির। সুঘরাই বিয়ে করেনি অন্য কারণে। ও বড় ভীরু। ও মেয়েদের চিরদিনই ভয় পেয়ে এসেছে, দাদিমা, মা, ঠাম্মা শেষে শবনম পর্যন্ত সবাইকেই। ও পাখি বোঝে, গাই-বয়েল বোঝে, খেতি-জমি বোঝে কিন্তু মেয়েদের বোঝে না। তাই বিয়ে করেনি। কিন্তু নাসির ছেলেবেলা থেকেই হিরো, মেয়েদের কাছে। সুরাতিয়ার মতো একটা সাধারণ মেয়ে যে তাকে কী করে এমন দাগা দিয়ে গেল তা আজও বোঝে না সুঘরাই। নাসির বলে, কোনও মেয়েই সাধারণ নয়। মেয়েদের সঙ্গে সাপেদের খুব মিল আছে। তবে অমিল একটাই। সাপেদের মধ্যে অনেকেই নির্বিষ কিন্তু আওরৎ মাত্রই বিষধরী।

কী করবি এখন? পটকানকেও তো বাড়িতে বলে এলাম "নো-মিল"।

সুঘরাই বলল।

তাতে কী হল? শবনম তো মিজাজ বিগড়ে দিয়েছিলই তার উপরে ওই শালা অভিষেক সিংকে দেখে মিজাজ আরও বিগড়ে গেল। হায়! হায়! দুনিয়ার কী হাল! আমিও আজকাল বুঢ়া কাম করছি কিন্তু সে একটু ভাল থাকার ভাল খাওয়ার জন্যেই। আমি তো অভিষেকের মতো কামিনা নই।

এখন কী করবি তাই বল?

চল, কানহারির দিকে যাই। সান্নাটা জায়গা। পাহাড়ের উপরের বাংলোতে গিয়ে বারান্দাতে বসে হুইস্কিটা দুজনে শেষ করি, বড় বোতল এনেছি আজ। তারপর পাহাড় থেকে নেমে হান্নানের দোকানে বিরিয়ানি আর চাঁব খেয়ে তোকে নামিয়ে বাড়ি ফিরব। এখন, আমার মাথা গরম হয়ে আছে, গরম বেরুচ্ছে মাথা থেকে। ঠাণ্ডা জায়গাতে চল। সান্নাটা জায়গাতে।

সুঘরাই বলল ঠাণ্ডাতে আমার কানে ব্যথা করছে আর...। তুই দিনকে দিন এক অজীব আদমি বনছিস।

আমি চিরদিনই অজীব। তুইই চিনতে পারিসনি।

নাসির বলল।

নাসিরের মোটর সাইকেলের পেছনে বসে সার্কিট হাউসের সামনে দিয়ে গিয়ে, পুলিশ সাহেবের বাংলো পেরিয়ে কানহারি হিল রোড ধরে কানহারি পাহাড়ের উপরে উঠে যখন ফরেস্ট বাংলোতে পৌঁছানো গেল, ততক্ষণে সুঘরাই জমে বরফ হয়ে গেছে। আর নাসির বলছে, মাথা থেকে গরম ছুটছে আমার। গরম ছুটছে।

চৌকিদার বলল, বাংলো তো রিজার্ভ আছে। বাংলা খুলে দিতে পারব না।

বারান্দাতে বসি তা হলে। দুটো গ্লাস আর এক জাগ জল এনে দাও।

তাও পারব না হুজুর। সিং সাহাব কখন এসে পড়বেন কী করে জানব? তাঁর রিজার্ভ-করা বাংলার বারান্দাতে আপনাদের বসতে দিয়েছি জানলে সাব বিগড়ে যাবেন। ডি এফ এ সাহেবভি জানলে আমার চাকরিই চলে যাবে।

তা হলে?

নাসির বলল।

কী করব। আমি নাচার।

তা হলে এক কাজ করো। গারাজের মধ্যে আমরা বসছি।

তাও পারব না।

তাও পারবে না? তা হলে বাংলোর পেছনে গাছতলাতে বসছি।

গাছতলাতে এখন শিশির পড়বে।

তা হলে?

তা হলে আপনারা আমার কোয়ার্টারের বারান্দাতে বসতে পারেন। তবে মোটর সাইকেলটা এমন করে রাখতে হবে যেন ওঁরা দেখতে না পান।

তাই?

কী যেন ভাবতে ভাবতে বলল, নাসির।

তারপর বলল, তোমার সিং সাব এখানে খাওয়া দাওয়া করবেন না?

না হুজৌর। আমি কি আর তেমন রাঁধি। ওঁদের খাওয়ায় আসবে হাজারিবাগ ক্লাব থেকে।

কখন আসবেন তোমার সিং সাহাব?

দশটার আগেই আসবেন।

উনি কোথা থেকে আসবেন?

কোথা থেকে নয়, তাঁর তো হাজারিবাগেও বাড়ি আছে, গয়া রোডে।

নাম কি সাহেবের?

অভিষেক সিং সাহাব। বহুত দিলেরি আদমি। পয়সা ভি হ্যায়, দিল ভি হ্যায়।

তা ওঁর নিজের বাড়ি থাকতে এই রাতেরবেলা এই জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের উপর সান্নাটা বাংলোতে কী করতে আসবেন? তাও গরমের দিন হলে কথা ছিল। তা ঠিক জানি না হুজুর। তবে শুনেছি পটনা থেকে কোনও তওয়ায়েফ এসেছে, তাকে নিয়ে আসবেন।

রাত কাটাবেন?

না, রাত তো উনি নিজের বাড়ি ছাড়া কোথাওই কাটান না। মনে হয় ঘণ্টা দুই থাকবেন। এরকম করেন মাঝে মাঝেই।

তা চলো। তোমার কোয়ার্টারেই যাই। এখন বাজল কটা?

সুঘরাই ঘড়ি দেখে বলল, সাতটা।

মোটর সাইকেলটাকে তুলে ঠেলতে ঠেলতে চৌকিদারের কোয়ার্টারের দিকে যেতে যেতে নাসির ফিসফিস করে বলল, আজ খুদানে হামলোগোঁকো হিঁয়া ভেজিন।

আজ কুছ হাঙ্গামা হোগা।

মনে মনে বলল সুঘরাই।

নাসিরের মনের ভাব আর কথা শুনে সুঘরাইয়ের হাত-পা বরফ হয়ে গেল। এমনিতেই তো ঠাণ্ডাতে বরফ হয়েই ছিল।

সুঘরাই বলল, নাসির, ছোড় ইয়ার। চল, হামলোক ভাগেগা হিঁয়াসে। শবনমসে হামলোগোকা কেয়া মতলব?

জাহান্নমমে যানে দো ও রান্ডিকো। উসসে কুছ মতলব নেহি হামারা, মগর বুধিয়া। পটকানকো বহিন?

সুঘরাইয়ের মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে গেল। সেই প্রায় ভুলে-যাওয়া রাগটা হারিয়ে-যাওয়া প্রিয় কুকুরের মতো হঠাৎই ওর মাথাতে ফিরে এল।

সুঘরাই নিচু গলায় বলল, হাঁ। ম্যায়তো ভুলই গ্যয়ে থে।

৬

চৌকিদার তার কোয়ার্টারের ঢাকা-বারান্দাতে একটি চেয়ার এবং একটি টুল পেতে সামনে একটা নড়বড়ে তেপায়া লাগিয়ে দিল। তারপর স্টেনলেস স্টিলের জাগে করে এক জাগ জল আর দুটি স্টেনলেস স্টিলের গ্লাস দিয়ে গেল।

নাসির চৌকিদারকে একটি লাল নোট দিল কুড়ি টাকার।

চৌকিদার সেলাম করে বলল, নেহি ভি দেনেসে ক্যা হোতা থা বাবু।

দেনেসে ভি ক্যা হরজ। আগে দেওয়াই তো ভাল। আমরা যে লোক খারাপ নই তার প্রমাণ তো আগেই দেওয়া উচিত।

নাসির বলল।

পইসে সে ক্যা ভালা-বুঢ়া কি যাঞ্চ হোতা হ্যায়?

তব কওন চিজ সে হোতা হ্যায়?

তুমিই না বললে অভিষেক সিং সাহেব বড় ভাল লোক। পয়সাও আছে, দিলও আছে।

দিল কি দেখা যায়? পয়সাই তো দিল এখন।

নাসির বলল।

ঈ বাত সাহি বোলা আপনে।

তোমার নাম কী?

মুকান্দর।

ঘর কোথায়?

বড়কাগাঁও।

ঠিক আছে মুকান্দর, তুমি আরাম করো গিয়ে।

আপনাদের বাড়ি কোথায়?

মুকান্দর জিগগেস করল।

আমার বাড়ি কোররা আর এই বাবুর বাড়ি সিমারিয়া। হাজারিবাগে বেড়াতে এসেছেন বাবু আমার কাছে।

মিথ্যা কথা বলল নাসির।

মুকান্দর শুধোলো।

আপকি শুভ্ নাম?

মহম্মদ জাকির হুসেন।

সুঘরাই-এর হয়ে নাসিরই বলল।

সুঘরাই লক্ষ করছিল যে পরপর এতগুলো মিথ্যে বলতে নাসিরের একটুও কষ্ট হল না। নাসিরটা দু নম্বরী উঠছে দিনকে দিন। এ কথা ভেবে মন খারাপ হয়ে গেল সুঘরাইয়ের। ওর বন্ধু নেইই বলতে গেলে। বউও নেই। নাসির তাই তার কাছে খুব দামি। নাসিরকেও ত্যাগ করতে হলে থাকবে কাকে নিয়ে?

কাঁধের ঝোলা থেকে বোতলটা বের করে খুলল নাসির। দুটো গ্লাসেই বড় করে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে, মুকান্দর চলে গেছে কি না দেখে নিয়ে বলল, আজকাল ইমানদারকেই মানুষে বুদ্ধু বলে। দ্যাখ, তোর পেয়ারের শবনম নিজেকে ভাঙিয়ে কত টাকা রোজগার করছে, তার সঙ্গে কত ইজ্জত খাতিরও। যদিও ওর ইজ্জত বাজারি। পারচেজেবল। আর নিজের ইজ্জত বিক্রি করতে রাজি না থাকায় বুধিয়াকে মরতে হল। পটকানের কাকার মাথাতে যদি একটুও ঘিলু থাকত তবে বুধিয়াকে ভাড়া দিয়ে সে তার মাটির বাড়ি পাকা করে ফেলতে পারত, অনেক খেতি-জমিন-কাঁড়া-বয়েল কিনতে পারত অথচ তা না করে মেয়েটাকেই হারাল। বুধিয়া তো কম সুন্দরী ছিল না।

তা ছিল না।

সুঘরাই বলল।

তারপর বলল, শবনমের মতো গান কজন গাইতে পারে?

গান গেয়েই যা রোজগার করে, যা ইজ্জত পায়, তাই তো ওর রাখার জায়গা ছিল না তবু সে নিজেকে এমন করে ছোট করে যে কেন, তাই ভেবে পাই না।

টাকা আর যশ মানুষকে বড়ই ছোট করে দেয়রে সুঘরাই। যার টাকা আছে সে আরও টাকা চায়, যার যশ আছে সে আরও যশ চায়। এই দুই আকাঙ্ক্ষার কোনও শেষ নেই। "বাস্‌স" করতে

জানা বড়লোক আর যশস্বী তুই খুব কমই দেখতে পাবি। তা ছাড়া, আমার কী মনে হয় জানিস, এ সবই শবনম করে হতাশা থেকে।

হতাশা? ওর মতো সফল মানুষের কিসের হতাশা?

সাফল্যও মানুষকে হতাশ করে। যদি কেউ সবই পেয়ে যায়, আর চাইবার মতো তেমন কিছুই থাকে না, তখনই মানুষ হতাশাতে ভোগে।

তাই?

বলল, সুঘরাই। কথাটা এমন করে ভাবিনি তো কখনও।

নেঃ, ভাবাভাবি পরে করিস। এখন খা।

হাজারিবাগ এমনিতেই ঠাণ্ডা জায়গা তার উপরে ওরা চড়েছে কানহারির মাথাতে—

খুদাহর বাড়ির প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। ঠাণ্ডাটাও এ বছর জব্বর পড়েছে।

সুঘরাই বড় একটা ঢোক গিলল গ্লাস থেকে। যা কড়া বানিয়েছে নাসির। লণ্ঠনের আলোতে দেখাচ্ছে যেন কাড়ুয়া তেল। ওর পেটের মধ্যে ব্যথা করছে। টেনশনে। কী করবে নাসির, কে জানে। কী ফন্দি সে ফেঁদেছে সেই জানে। ও কি আজ জানেই মেরে দেবে অভিষেক সিংকে? নাকি একটু টাইট দিয়েই ছেড়ে দেবে? অভিষেক সিংয়ের সঙ্গে নাকি সবসময় বডিগার্ড থাকে। সেই বডিগার্ড যদি মেরে দেয় ওদের ওরা কিছু করার আগেই? নির্বিরোধী, শান্তিপ্রিয় সুঘরাই বড় ঝামেলাতেই পড়ল।

নাসির এক ঘুঁট খেয়ে বলল, কী ভাবছিস?

না। তুই কী ভাবছিস, তাই ভাবছি।

আগে থেকে আমি কিছুই ভাবি না। যেমন যেমন সময় এগোবে তেমন তেমন ভাবব। তার আগে বাইকটার সামনে-পেছনের নাম্বার প্লেটে এই কালো মার্কারটা ঘষে নাম্বার যাতে পড়া না যায় তেমন করে দিয়ে আয় তো। দেখিস, চৌকিদার যেন না দেখে ফেলে।

বাবাঃ। তুই তো দেখছি আজকাল পাক্কা দু-নম্বরী হয়ে গেছিস।

আমি কোথায় হলাম। দুনিয়াই যে দু-নম্বরী হয়ে গেল তাই আমাকেও জার্সি পালটাতে হল।

কটায় আসবে বলল ওরা এখানে? চৌকিদার?

সাড়ে নটা মতো তো বলল।

আগেও তো আসতে পারে।

তা তো পারেই। কাম একবার চেগে গেলে আর কি তর সয়?

এখন কটা বাজে?

সাড়ে সাত।

আমরা এখান থেকে সাড়ে আটটায় উঠব। না, তারও আগে উঠব।

মানে? কোথায় যাব?

পাহাড় থেকে নেমে জিব্রাণ্টর বাড়ির কাছে পথের পাশে ওদের অপেক্ষায় থাকব। জায়গাটা অন্ধকার। শীতের রাতে জনপ্রাণী থাকবে না। চৌকিদারও ঘটনার পরে কোনও সন্দেহ করতে পারবে না। কারণ, ও কিছু বুঝতেই পারবে না এত দূর থেকে। গুলিটুলি চললে অবশ্য গুলির শব্দ শুনতে পাবে। কোররার দিক থেকেও তো কেউ আসতে পারত। পুলিশও ধন্দে পড়বে।

কী, কী, কী করবি কী তুই?

ভয় পেয়ে সুঘরাই বলল। গুলিটুলি চললে মানেটা কী?

দেখি কী করি। ওয়াক্তপর শোচেগা। তোকে যা বলব তুই তাই করবি। ওদের গাড়ি আসতে দেখলেই তোর মাফলারটা দিয়ে মাথা মুখ এমন করে বাঁধবি যাতে রাজডেরোয়া ন্যাশানাল পার্কের হনুমানে আর তোতে তফাত না থাকে কোনও।

আর তুই?

আমার মুখোশ আছে।

মু-মু-মুখোশ? তুই আজকাল মুখোশ নিয়ে ঘুরছিস নাকি?

হ্যাঁরে ছুঁওড়াপুত্তান। একটা কেন? আজকাল সব ইনসানেরই একাধিক মুখোশ থাকে। যখন যেটার দরকার সেটা পরে নেয়। তারা সব ছুপা। আমার কতো মুখোশের কথা কেউই কবুল করে না।

সুঘরাই চুপ করে রইল। তারপর নাসির যা করতে বলেছিল তাই করে এল।

নাসির ওর গ্লাসটা শেষ করে আরেকটা বড় ঢালল। সুঘরাই ঘাবড়ে গিয়ে বলল, করছিস কী? তুই তো আউট হয়ে যাবি। এ দিকে সাংঘাতিক কাণ্ডমাণ্ড ঘটাতে চলেছিস।

হাঃ। আমি সবসময়েই ইন। আউট কখনওই হই না আমি। আই অ্যাম ওলয়েজ অ্যামংগস্ট ইন থিংগস। বলেই বলল,

"ও অওর হোঙ্গে যো পীতে হ্যায় বেখুদিকে লিয়ে।

মুঝে শ্রিফ চাহিয়ে থোরিসি জিন্দেগিকে লিয়ে।"

অর্থাৎ, ওরা মদ খায় জীবনকে ভুলে থাকতে আর আমার সামান্যই চাই, জীবনকে মনে রাখারই জন্যে।

সুঘরাই ভিতরে ভিতরে খুব উত্তেজিত বোধ করতে লাগল বলেই বাইরে একেবারে ঠাণ্ডা মেরে গেল।

সুঘরাই বলল, তুই মিছিমিছি অপমান করলি নিজেকেও এবং আমাকেও।

কী জন্যে? কার কাছে?

শবনমের সঙেগ আলাদা করে দেখা করতে চেয়ে ছদিবাবুর বাড়িতে। সে তো আমাদের যেন মনেই করতে পারল না অথচ পরজদাদা কত কীই না করেছে ওর জন্যে।

ছাড়তো। রাণ্ডি তো রাণ্ডিই। ও শালীরা মান দিলেই কী আর অপমান দিলেই কী? আমাদের অপমান করল আর মান দেবে অভিষেক সিংকে। নইলে কি রাণ্ডি এমনি বলে।

আমার ভাবতেও খারাপ লাগছে। যে মেয়ে এত সুন্দর গান গায়, যার গান শুনলে প্রাণ দিতেও আপত্তি থাকে না আর সেই কি না ....

ছাড়। আওরাত জাতটাই অমন। কলকাতায় বা বম্বেতে বা চেন্নাইতে কত নামীদামি অভিনেত্রী, পরিচালিকা আছে। সারা পৃথিবী থেকে সম্মান আনছে তারা। তাদের রূপ-গুণের অবধি নেই, বহত বহত পড়ে-লিখেও তারা। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই রাণ্ডি। সতী সেজে থাকে শালীরা।

কথাটা শুনে সুঘরাই আহত হল।

পাহাড়ের নীচ থেকে একটা কোটরা হরিণ ডাকতে লাগল ঘনঘন।

কী রে। বাঘ দেখল নাকি?

সুঘরাই বলল।

দেখল তো দেখল। আসল বাঘ তো দেখিনি। আমি নামি নীচে তখন আসল বাঘ দেখবে।

বাজল কটা?

নাসির বলল।

সুঘরাইয়ের ঘড়িতে রেডিয়াম আছে, তা ছাড়া ইন্ডিগ্লোও আছে। নাসিরই দিয়েছিল ঘড়িটা সুঘরাইকে গত বছরের সালগিরাতে। চাবি টিপে ও বলল, আটটা দশ।

তা হলে চল এবারে আমরা আস্তে আস্তে নামি। এক কাজ কর। আরেকটা করে খেয়ে নে। তারপর বোতলের মধ্যে জল মিশিয়ে নিয়ে যাব। বোতল থেকেই খাব। ওখানে আর জল কোথায় পাব? গ্লাসই বা কোথায়?

যেমন বলবি।

নাসির আবার সেজে দিল। চুমুক দিতেই লিভারে যেন কামড় দিল হুইস্কিটা। দোষটা হুইস্কির নয়, নাসির সেজেছেই ভীষণ কড়া করে।

সুঘরাই মুখ বিকৃত করল।

তারপর বলল, কী রে! মওত-এর স্বাদ কি তোর সেজে দেওয়া হুইস্কিরই মতন?

তুই যেন শালা কত বার মরেছিস আগে।

মরিনি। কিন্তু মৃত্যু কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে বহুবার। মনে আছে তোর? নাজিম মিয়াঁর কুসুমভার মাটির ঘরে তোর রাইফেলের গুলি লোড করার সময়ে আমার কানের পাশ ঘেঁষে গিয়ে দেওয়ালে গর্ত করে দিয়েছিল?

মনে আছে। ম্যান-ইটিং লেপার্ডটাকে মারতে গেছিলাম আমরা যেবারে, সে বারে তো?

জি হ্যাঁ।

তারওপর আরও কত বার।

আমি তো নাগরদোলাতেই পড়ে আছি রে সুঘরাই পনেরো বছর বয়স থেকে। জীবন আর মৃত্যুর হাতে দোল খেয়েছি। দোল খাচ্ছি। আই ওলওয়েজ হ্যাড লিভড ডেঞ্জারাসলি। প্যানপ্যান করে বেঁচে কী লাভ? বাঁচলে এমন করে বাঁচাই ভাল।

বলেই বলল, নে, শেষ কর।

বলেই, জাগ থেকে বোতলের মধ্যে জল ঢেলে বোতলটা ভর্তি করে নিল নাসির। তারপর নিজের থলেতে ভরে নিল। বলল, চৌকিদার মুকাদ্দরকে ডাক তো একবার।

চৌকিদার এলে আরও একটা লাল নোট দিল কুড়ি টাকার।

চৌকিদার হেসে সেলাম করল।

নাসির বলল, আমরা তো তোমার সিং সাহেবের মতো বড়লোক নই, হলে একশ টাকার নোট দিতাম।

সিং সাব আমাকে পাঁচশ টাকার নোট দেন একটা, যখনই আসেন।

নাসির বলল, খ্যয়ের, আমিও দেব পরের জন্মে। এবারে আমরা উঠি। বাড়িতে শশুরাল থেকে মেহমানেরা সব আসবেন। বেশি দেরি হলে গোলমাল হবে। আমার বিবির আবার এ সব একেবারে না-পসন্দ।

কী সব?

এই পিনা-উনা।

চৌকিদার মুকাদ্দর হেসে বলল, আমার বিবিরও। তবে আমি খাই মহুয়া। এ সব ভাল জিনিস কোথায় পাব? তবে হ্যাঁ! মিথ্যে বলব না, সিং সাহেব বোতলে যা থাকে তা আমাকে দিয়ে যান। কী সব শিশি হুজৌর। সেই সব শিশি পেয়ে বিবি আমার, আমার মদ খাওয়ার অপরাধই ক্ষমা করে দেয়। আসলে সব সাপকেই বশ মানানো যায়, যদি মন্ত্র জানা থাকে।

সাহী বাত্।

বলে, নাসির উঠল।

তারপর বলে, অব চলে মুকাদ্দর সাব। বহত মেহেরবানি আপকি।

সাব সম্বোধনে মুকাদ্দর অভিভূত হয়ে বলল, আপকি খানদান জরুর বহত উঁচা হোগি। অ্যয়সি এতলাখ অওর তমদ্দুন।

নাসির উত্তর দিল না কোনও। সুঘরাই নাসিরের পেছন পেছন চলল মোটর সাইকেলের দিকে, হাত তুলে মুকাদ্দরকে সেলাম এবং নমস্কারের মাঝামাঝি একটা কিছু করে। এই ব্যাপারটা ঘটল নাসিরেরই অনুপ্রেরণাতে।

মোটর সাইকেল স্টার্ট করে পাহাড়চুড়ো থেকে নামতে নামতে নাসির বলল, যার যা স্ট্যাটাস তাকে তার চেয়েও এক ধাপ বেশি সম্মান দিলে সে সঙ্গে সঙ্গে বান্দা বনে যাবে। হ্যাঁ, যদি ইনসান হয়। আর অভিষেক সিংয়ের মতো কামিনা হলে আবার উলটো ফলও ফলতে পারে।

বলেই বলল, আজ সকাল কার মুখ দেখে উঠেছিলিরে সুঘরাই?

কেন?

না, কানহারিতে হুইস্কি খেতে এসে আমাদের নিয়তির মুখোমুখি এসে পড়লাম কী করে তাই ভাবছি।

সুঘরাই একটু ভেবে বলল, একটা কাঠবিড়ালির। ও আমার দোতলার ঘরের লাগোয়া ছাদেই থাকে।

হাঃ। হাঃ। করে হাসল নাসির।

বলল, যেমন তুই এক ক্যারেকটার তেমনই তোর সাথ-সঙ্গতিয়ারা।

পাহাড় থেকে নেমে এসে কানহারি হিল রোডে জাস্টিস মল্লিকদের প্রাগৈতিহাসিক প্রাসাদের মতো ভৌতিক বাড়ি 'জিব্রাল্টর'-এর পাশে মোটর সাইকেল দাঁড় করাল নাসির। তারপর বলল, নে, খা। বোতলটা শেষ করতে হবে। প্রাণে যদি না বাঁচি তবে তো আর হুইস্কি খাওয়া হবে না কোনওদিনও।

সুঘরাই বলল, বাজে কথা রাখ।

বাজে কথা কী রে! একজন মানুষের প্রাণের উন্মেষ আর তার মৃত্যুর মতো এত সহজ ব্যাপার আর দুটি নেই। বলতে গেলে, সহজতম ব্যাপার। আর এই মানুষেরই কত না গুমোর তার জীবন-মরণ নিয়ে। ফুসস-স-স।

বোতল থেকে এক ঢোক খেয়ে বোতলটা নাসিরকে ফেরত দিয়ে সুঘরাই বলল, আমি আর খাব না।

কেন?

আমি পারি না।

তুই শালা কিছুই পারিস না।

হবে।

স্বগতোক্তির মতো বলল, সুঘরাই।

শীতের বনের রাতের এক বিশেষ গন্ধ আছে। শিশির-ভেজা হরজাই গাছপালার, পথের ধুলোর, বিস্তীর্ণ টাঁড়ের, টিটি পাখির, পেঁচার গায়ের গন্ধ মিলে-মিশে এক আশ্চর্য তিক্ত-মিষ্টি-কষায় গন্ধ। এই গন্ধে এক ধরনের যৌনতা আছে—যা ব্যাখ্যা করে বলতে পারবে না সুঘরাই। কিন্তু বিলক্ষণ আছে। ডানদিকের টাঁড়ের উপরে চমকে চমকে ডাকছে দুটি ডিড-ড্য-ডু-ইট পাখি। ডিড-ড্য-ড-ইট? ডিড-ড্য-ড-ইট? ডিড-ড্য-ড-ইট? সেই ডাক ভেসে যাচ্ছে দূর থেকে দূরান্তরে, উঠে যাচ্ছে তারাদের দিকে। গাছপালা থেকে শিশির ঝরছে। বছরের এই সময়ে রাতেরবেলা বাঘ ও চিতা বনের মধ্যে প্রধান পথ ধরে চলাচল করে শিশিরের হাত থেকে বাঁচতে। নাসিরও দেখেশুনে এমন জায়গাতে মোটর সাইকেলটা লাগিয়ে ছিল যেখানে উপর থেকে শিশির ঝরছে না। নাসিরও তো বাঘই। দেখতে দেখতে সাড়ে আটটা বেজে গেল। সুঘরাই একবার ঘড়ি দেখল। এমন সময়ে একটা গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। এ পথে ও সময়ে এখন কোনও গাড়িরই যাওয়া-আসার কথা নয়। ওদের ছেলেবেলাতে ওরা রাতেরবেলা এখানে খরগোশ মারতে আসত। জিব্রাল্টরের অব্যবহৃত কম্পাউন্ডে অগুনতি খরগোশ ছিল।

ভাল করে কানখাড়া করে শুনতেই বোঝা গেল গাড়ির শব্দটা কোররার দিক থেকে আসছে। গাড়ির হেডলাইটের আলো দেখা যেতেই দুজনেই বাইক থেকে নেমে এমন ভাবভঙ্গি করল যেন

বাইকটা খারাপ হয়ে গেছে। গাড়িটা একটা অ্যাম্বাসাডর। অভিষেক সিং কোন গাড়ি নিয়ে আসবে তা জানা নেই। কোন গাড়ি নিয়ে সে গান শুনতে গেছিল সেটা খেয়াল করা উচিত ছিল। তখন তো আর জানত না যে, ওরা কানহারিতে এসে ওর সঙ্গে টক্কর দেবে। যে গাড়িটা এল, সেটা পাহাড়ে না চড়ে হাজারিবাগ শহরের দিকে এগোল। ওদের পাশে এসে এক সেকেন্ড দাঁড়িয়েই এই খারাপ দিনকাল-এ রাতেরবেলা ঝুঁকি নেওয়াটা ঠিক হবে না মনে করেই বোধ হয় হঠাৎ গতি বাড়িয়ে চলে গেল। গাড়িটার এঞ্জিনটার বারোটা বেজে গেছে। পেট্রোলের গন্ধে বনপথের সুগন্ধ বিকৃত হয়ে গেল।

ওই গাড়িটা চলে যাবার পরেই হাজারিবাগ শহরের দিক থেকে একটি গাড়িকে আসতে দেখা গেল। উজ্জ্বল দুটি নিচু হেডলাইটের আলোই বলে দিল যে অ্যাম্বাসাডর নয়, নতুন কোনও গাড়ি। আলো দেখতে পেতেই কালো কাপড়ের মুখোশটাকে কপালে লাগিয়ে নাসির বাইকটাকে ঠেলে পথের মধ্যিখানে এনে তার পাশে হাঁটুমুড়ে বসে পড়ল। সুঘরাই পাশে দাঁড়িয়ে রইল। গাড়িটা ব্রেক করে দাঁড়াল। হেডলাইট-জ্বলা অবস্থাতেই সামনের বাঁদিকের দরজা খুলে গেল। একজন বেঁটেখাটো লোক নেমে এসে বলল, হুয়া ক্যা?

খরাব হো গ্যয়া।

নাসির বলল।

খরাব হো গ্যয়া তো সাইড করকে রাখনা চাহিয়ে থা। ঈ ক্যা মজাক হো রহ্যা হ্যায়?

নাসির বলল, বড়া তেজ বাতেঁ কর রহা হ্যায় আপনে। ঈ গাড়ি হ্যায় কিসকো?

অভিষেক সিং সাবকো।

আচ্ছা! অভিষেক সিং পহচানতা হ্যায় মুঝকো, জারা সালাম দেনা উনকো। মেহেরবানি করকে। আপকি শুভনাম?

ম্যায় হুঁ অভিষেক সিং কি মওত।

ইতিমধ্যে গাড়ির পেছনের দরজা খুলে গেল। শবনমের সুরেলা গলা শোনা গেল, মৎ উতারিয়ে, আপ উতারিয়ে মৎ। কিন্তু প্রায় ছ ফিট লম্বা অভিষেক সিং গাড়ির দরজা খুলে নেমে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, রে ভিখু, ঈ কওন বদতমিজ আদমি হ্যায়? মুঝকো জানতে নেহি হ্যায় যে রোডকি বিচমে বাইক উঠাকে মজাক কর রহা হ্যায়।

অভিষেক এগিয়ে আসতেই নাসির গুটোনো মুখোশটা নামিয়ে কোমরের হোলস্টার থেকে নাইন পয়েন্ট ফাইভ কোল্ট পিস্তল বের করে দমাদ্দম তিনটে গুলি করল। আর সঙ্গে সঙ্গে, মাঈরে! বলে অভিষেক পথের উপরেই পড়ে গেল, চারদিকের পথের ধুলোতে তার ঘামন্ড ছড়িয়ে ছিটিয়ে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভিখু নামের বেঁটে লোকটি তার কোমর থেকে রিভলভার খুলে নিয়ে পরপর দুবার গুলি করল নাসিরকে। নাসির এবং ভিখু দুজনেই পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করেছিল। নাসির পড়ে যেতে যেতে বলল, বিন্দাআস.....।

সুঘরাইয়ের হুঁশ হয়েছে ততক্ষণে, সেও তার রিভলভার বের করে ভিখুকে গুলি করল তার মাথাতে। ভিখু কিছু বোঝার আগেই। ভিখু সুঘরাইকে ট্যাড়স ঠাউরেছিল। এক পটকান দিয়ে ভিখু পথের উপরে পড়ে গেল চিৎপটাং হয়ে।

তার রিভলভার হাতেই ধরা রইল।

ইতিমধ্যে অভিষেক সিংয়ের ড্রাইভার তাড়াতাড়ি গাড়ি ব্যাক করে শহরে ফিরতে যেতেই সুঘরাই ড্রাইভিং সিট লক্ষ করে গুলি চালাল। কাচ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ল আর ভিতর থেকে শবনম আর্ত চিৎকার করে উঠল, বাঁচাও! বাঁচাও! ডাকু হ্যায়। বাঁচাও! বলে।

সুঘরাই রিভলভার হাতে গাড়ির দিকে এগিয়ে গিয়ে সামনের বাঁ দিকের দরজা খুলে মুখ

ভিতরে করে বলল, চুপ হো যা রান্ডি! আঁখ খোলকর দিখ তেরা ডাকু আয়া। মির্জাপুর কি ডাকু। তেরি বচপন কি ডাকু। বলেই, পরপর দুটি গুলি করল শবনমের সুন্দর দুটি বুক লক্ষ করে।

ড্রাইভারের হুঁশ ছিল না। তবুও সাবধানতার মার নেই ভেবে তার মাথাতে নল ঠেকিয়ে আরেকটি গুলি করল সুঘরাই। বাকি ছিল একটি গুলি। সেটিও অভিষেক সিংয়ের কানে নল ঠেকিয়ে তাকে শেষ নৈবেদ্য দিল।

তারপর?

তারপর কী করবে তা আর ভেবে পেল না সুঘরাই। বোতলে যেটুকু হুইস্কি ছিল ঢকঢকিয়ে খেয়ে গাড়ি থেকে ড্রাইভার আর শবনমের দেহ নামিয়ে পথের উপরে ফেলে নাসিরকে অভিষেকের গাড়িতে তুলে সে তাদের ছেলেবেলার বন্ধু ডাক্তার গিরধারী তিওয়ারির বাড়ির দিকে চলল যত জোরে পারে গাড়ি ছুটিয়ে। সুঘরাই ভাবছিল, নাসির যদি মরে গিয়ে থাকে তো বেঁচে গেছে।

সুঘরাইও হয়তো অন্যরকম বাঁচা বেঁচে যেতে পারত যদি সে মোটর সাইকেলটি নিয়ে পালিয়ে যেত। কিন্তু ভাবল, যদি নাসিরের দেহে প্রাণ থেকে থাকে? দেখা তো যাক। ফেলে-যাওয়া মোটর সাইকেলটিই তার ইন্তেকাল ঘটাবে। যাবজ্জীবন জেলে পচতে হবে সুঘরাইকে। কিন্তু রামজির দিব্যি, সেই মুহূর্তে তার একটুও ভয় করছিল না। কিছু তো করল তবু জীবনে। তার ম্যাদামারা জীবনে একটা কাজের মতো কাজ করল।

বুধিয়ার মুখটি মনে পড়ছিল, বুধিয়ার মা ও বাবার মুখ এবং পটকানের মুখও। ভারী এক তৃপ্তি লাগছিল সুঘরাইয়ের। আশ্চর্য। বুধিয়ার মুখটি মনে পড়ছিল কিন্তু শবনমের মুখটি আর মনে পড়ল না। তার এক সময়ের বড় আদরের সেই মুখটি মুছে গেছে চিরদিনের মতো।

গাড়ি চালাতে চালাতে সুঘরাই ভাবছিল, নাসির যদি এখন কথা বলতে পারত, তা হলে চেঁচিয়ে বলত, বিন্দাআস.....।

সুঘরাই নিজের অজানিতেই বিড়বিড় করে স্বগতোক্তি করল, বিন্দাআস।

সারেং মিঞা

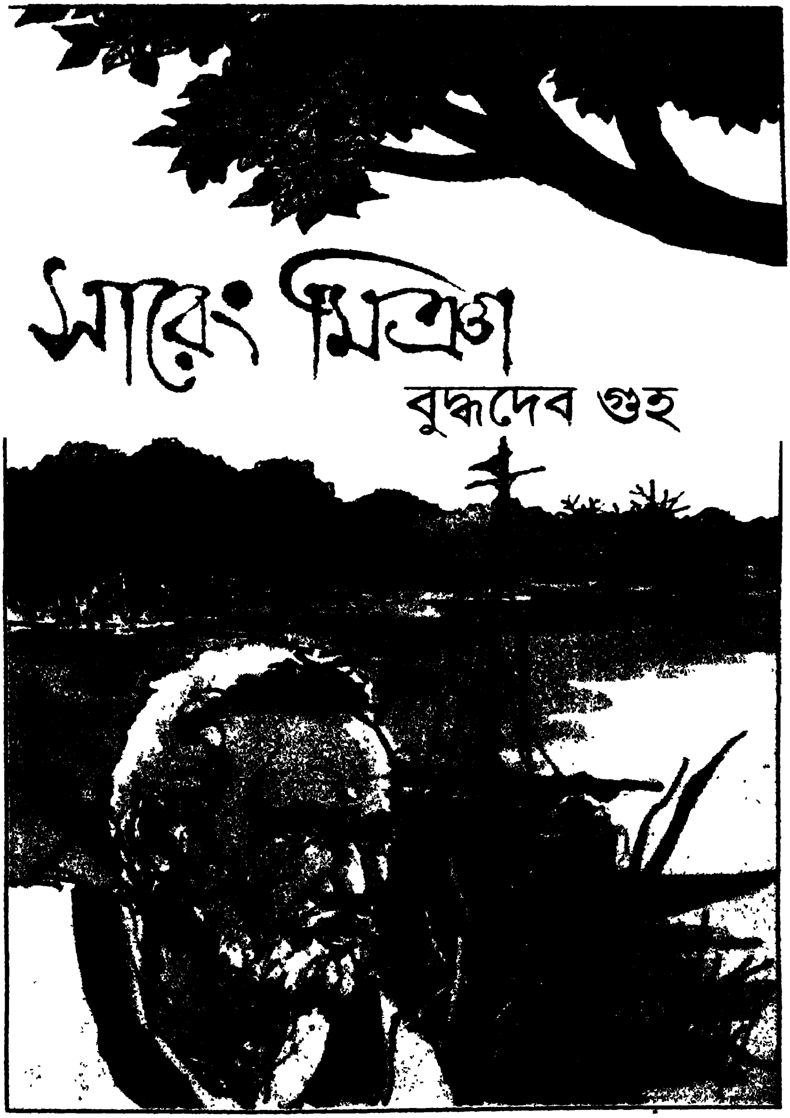

উৎসর্গ

জামশেদপুরের নীলডির
কল্যাণী দাশগুপ্ত কল্যাণীয়াসু
এবং
ডাঃ গৌতম দাশগুপ্ত কল্যাণীয়েষু

প্রচ্ছদ
সুধীর মৈত্র

ভূমিকা

এ বছরের পূজো সংখ্যায় 'নবকল্লোল'-এ 'সারেং মিঞা' একটি বড় গল্প লিখেছিলাম। ইচ্ছে ছিল, পরে ওই বীজ থেকে একটি উপন্যাস লিখব। কিন্তু বীজ হিসেবে ব্যবহার না করে ওই বড় গল্পটির বিস্তৃতি ঘটিয়েই 'সারেং মিঞা' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল।

এই উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষা নিয়ে, বিশেষ করে উপন্যাসের মাঝামাঝি থেকে আমার নিজেরই যথেষ্ট অসন্তুষ্টি এবং সংশয় আছে। অনেক জায়গাতে গুরুচণ্ডালি দোষও ঘটেছে যে, সে সম্বন্ধে আমি সচেতন। অত্যন্ত স্বল্পসময়ের মধ্যে লিখে দিতে হওয়ার কারণে এই ক্রটিবিচ্যুতি রয়ে গেল। ছাপার ভুলও রয়ে গেল অগণ্য। পরের সংস্করণে এই সব বাবদে কিছু মেরামতির অবশ্যই প্রয়োজন হবে। ভাষার জন্যে উপন্যাসের রস গ্রহণেও হয়ত বিঘ্ন দেখা দেবে এমন ভয়ও যে আমার নেই, তা নয়।

এ বিষয়ে আপনাদের মতামত নির্দ্বিধায় প্রকাশকের প্রযত্নে আমাকে জানালে, বাধিত হব।

পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকে ষাটের দশকের শেষ অবধি প্রতি বছরই সুন্দরবনে গেছি একাধিকবার। এবং গেছি, একেবারে গভীরতম বনে, 'মায়াদ্বীপে', সমুদ্রের মোহানাতে।

'সারেং মিঞা', আমার দেখা; সেই সময়কার সুন্দরবনের পটভূমিতেই লেখা।

'সারেং মিঞা'র প্রস্তুতিতে প্রকৃত গুণী ও গবেষক শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের 'বাংলার লৌকিক দেবতা' বইটির সাহায্য নিয়েছি। এবং সেই ঋণ অবশ্যই স্বীকার্য। আন্তরিক বিনয়ের সঙ্গে তা স্বীকারও করছি।

শ্রদ্ধেয় শিবশঙ্কর মিত্র'র কিছু লেখা আমার বহুবার পড়া। শ্রদ্ধেয় জনাব আবদুল জব্বার সাহেবের 'বাংলার চালচিত্র' বইটিও আমাকে মুগ্ধ করেছে। 'সারেং মিঞা' লেখার সময়ে তাঁদের লেখার কিছু প্রভাবও হয়তো পড়েছে আমার উপরে। অবচেতনে। তাঁদের কাছেও আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ অগ্রিম জানিয়ে রাখছি। বিনত

ইতি
বুদ্ধদেব গুহ

ভূমিকা

মাজা-ঘষা, যতটুকু সম্ভব, করে দিলাম। এই পরিমার্জিত সংস্করণে মহম্মদ খাত-এর লেখা "বোনবিবি জহুরানামা" বইটির ত্রিপদী উদ্ধৃত হল। সে কারণে লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞ রইলাম।

ইতি
—লেখক

হোই দুরে দেখা যেতেছে নিজেদের বিতিচি গেরাম।

এমন নাম কী কইরে হল কে জানে! হয়তো "বিতিকিচ্ছিরি" থেকেই হইয়েচে।

গরমের দুপুরে বিলের মধ্যি মস্ত সবজে-কালো কুমিরের মতো শুয়ে আচে গ্রামটা। আম জাম কঁ্যাটাল লিচু সজনে হিজল আর সাঁইবাবলার ছায়া বুকে কইরে। আর বিলের মধ্যে যে এট্টু ট্যাক মতো, যার মদ্দি মাঝে মাঝে উঁচকপালি এট্টা মদনটাকি পাখি বসে বসে ঢং করে, সেটি হতিচি গাজি পীরের দরগা। ইয়া বড়ো বড়ো গাছ। বট অশথ, নোনা, কালোজাম, কনকচাঁপা, গাব, কঁ্যাটাল, লিচু; নেই কি তাতে—! আর তারই কোণে কোণে আছে বেতবন। চিতেরাই বলে, বেতবন। পঞ্চাকাকা দু পাতা সংস্কৃত পড়িচে বলেই বলে, "বেতস"। আসলে, বেত না ছাই! বেতের মতো। এ অঞ্চলে আসল বেত তিরসীমানায় লাই।

এই ড্যাঙাতেই ঘোর বর্ষাতে কেয়াগাছগুলোতে ফুল আসে। আরে শালা! কী গন্ধ! কী গন্ধ! চিতের মনে হয়, ঘুমিয়েই পড়ে। কিন্তু ঘুমোয়ই বা কোন্ সাহসে! কেয়াবনে যে সাপের আড্ডা! জুম্মা চুম্মা।

অপু, যার ভালো নাম অপূর্ব, সে বলল, ঢাল না নিতে এট্টু। পরাণ যে শুকিয়ে এল বাপ।

ঢালতিচি, ঢালতিচি। অমন শিঙি মাছের মতো কাঁটা মারো কেন বলো তো দিকি সব সময়ে?

নিতে, হাঁড়ি থেকে কলাই-করা গেলাসে, বেলা বেড়ে যাওয়াতে এখন এট্টু হলদেটে-লালচে মেরে-যাওয়া খেজুরের তাড়ি ঢালতে ঢালতে বিরক্তির গলাতে বলল।

অপুর জন্ম পঞ্চাশের মাছামাঝি। তখন সত্যজিৎ রায় মশায়ের "পথের পাঁচালি" ছবিটো সবে এইয়েচে। ভেড়ির মালিক সুধাকান্ত নস্করের ছেইলে ধনুবাবু এট্টু "আর্ট-কেলচার" করতেন। তিনি নেপতি অর্থাৎ নেপোকে গিয়ে বললেন, "লাইপে এমন পিকচার কক্কনো দেখিসনি নেপো। আমার সঙ্গে চ বসুশ্রীতে। জীবন সার্থক হবেক।"

নেপো তখন মনোযোগ সহকারে বাবুদের ভেড়ির দাওয়াতে বইস্যে লালু কুকুরের আটালি মারতেচিল। সে কুকুরের কুঁই কুঁই শব্দের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কুঁই-কুঁই করে বলল, সিটা কী সামোগগিরি ধনুবাবু? বসুস্‌সিরি?

দুঃ শালা। বসুশ্রী সিনেমা হল। সাউথ কেলকাটাতেই তো। চল, সিকেনেই সত্যজিৎ রায়ের "পথের প্যাঁচালি" চলতিচে। সকলেই বলতিচে বটে, ওটা না দেকলি দশটা গাঁয়ের লোকে বেবাক আনকেলচার ভাইববে। টিকিট একটা বেশি আছে, যাবি তো চল। তোর চোদ্দো পুরুষ উদ্দার হইয়ে যাবে'খন ওই একটি পিকচার তুই দেখলি'।

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে, যেন তার কোষ্ঠ-কাঠিন্য হইয়েচে, এমন কইরে বইলেচিলো নেপো, পঁয়ত্রিশটা আটালি।

সে লালুর গায়ের আটালি গুনতে গুনতে চোটাল দিতেচিল।

তারপর বইলেচিল, তুমি যান গো বাবু পা চালায়ে! আমার মিথ্যাজিৎএর কারবার। কেলচার কইরে একবারটি ঘুরে যাবেন বরং আমার বাড়ি, ফেরার পথে। আপনার মুখ ঠেঙে শুনে শুনেই চালিয়ে দেবোকানে...

কিন্তু কেলচারের লোভ বড়ো লোভ! শেষমেষ সে লোভ সামলাতি না পেইরে আটালি মারা ছেইড়ে নেপো চইলেই গেচিল ধনুবাবুর সাতে। 'পথের প্যাঁচালি' দেখতি।

তা সেই নেপোর সঙ্গেই যখন পুঁটির বে হল, ঘোষেদের ভেড়ির নাইটগার্ড নকুল বাগদির বড়ো মেয়ে নার্গিস-এর সঙ্গে, নার্গিসেরই ঘরের নাম পুঁটি; আর বিয়ের ইগারো মাস না-ঘুরতি নার্গিসের বিয়োনো ছেলের খুব জম্পেস কেলচার করে নাম রাখল নেপো অপু। সে ব্যাটার বয়স হল এখন চৌত্তিশ-পঁয়তিশ।

কী করে সময় যায়! মাইরি!

কিন্তুক নাম রেখেই কেলো হয়েছে। ভগমানের নামে নাম হলে যেমন কখনো-সখনো ভগমানে ভয় করে, এই ভগমানের মতো মানুষের নামে নাম রাখাতে আর্ট-কেলচার ভর কইরলেন অপুর উপরে। মাঝে মাঝেই গম্ভীর গলায় কতা বলে সে। এমন ইঞ্জিরি বলে যে, নেপোরা কেন, পেরাইমারি ইশকুলের হরিপদ গায়েন পযযন্ত বুঝতি পারে না।

চারবার ইশকুল ফাইনালে টেঁইড়িয়ে পাট্টির দাদা ধরে 'বিতিচি' গেরামের ইঞ্জিরির ম্যাস্টর হইয়েচে। এখন মুখে ইঞ্জিরিও ফুটোয় খুব। তবে ওরা কেউই ইঞ্জিরিটা জানে না বইলেই সিটা যে ইঞ্জিরিই বটেক, তা লিশ্চয় করি বলতি পারে না কেউই।

বেলা বাইড়তিচে। রোদের ভাপও বাইড়তিচে। বাদার জলে রোদ চিকচিক কইরতিচে।

হোসেন মিঞা তার ডোঙা ঠেলি গুটিগুটি এইল। দাড়িতে মেহেন্দি লাগিয়েচে কষে। মোচলমানদের কোনো তেওহার আজ কি? কে জানে? দাড়ির খুব বাহার। কিন্তুক মাতার চুল পাতলা, এই সামান্য বয়সেই। সাদা ধবধবে হাফহাতা গেঞ্জি চাইপেচে গায়েতে, সবুজ আব লাল চেক চেক লুঙির উপরে।

ছোঁড়াটা ভালো। তবে কেমন খ্যাপ্যাটে আচে। কাজকম্মে এট্টুও মন লাই। একঘেঁড়ে টাইপ।

ভুস্‌স শব্দ করি মিঞার ডোঙাটার নামক আসি পারের দলদলি আর পাতা-পুতোয় গুঁতো মেইরেই থিতু হলো। পচা জল নিজের মনে পাঁকেদের সঙ্গি বিড়বিড় কইরতে কইরতে ইদিক-উদিক দৌড়াল। দুটো ব্যাঙাচি লাইপ্যে উঠল তিড়িং তিড়িং করে।

হোসেন মিঞা ডোঙা ভিড়িয়ে বলল, একটো বিড়ি দাও অপুদা।

নিতে বলল, কলসিতে তো একনও অমৃত আছে এট্টু, আর নজ্জা করা কেনে? চইল্যে আয় হোসেন। বইস্যে যা। বইস্যে যা। হইয়েই যাক ইক গেলাস।

বিড়িটা অপুর কাছ ঠেঙে নিয়ে হোসেন মিঞা বইললো দ্যাকো নিতেদা, এ নিয়ে রোজ রোজ ফাইজলামো করবেনি। একদিনে তোমাকে ধইরে আমি এই বাদার জলে চুইব্যে দিব। তোমারে কত্তদিন বইলেচি যে, মদ খাওয়াতে আমাদের ধম্মোর বারণ আছে।

যাঃ শালা! কত ধম্মো মানিস!

আমি বিলক্কনই মানি। তোমরাই কেউ ধম্মো মানো না। তোমরা ছেলের অসুক হলি মন্দিরে যাও, ফসল খারাপ হলি, কী বাড়িতে ডাকাতি হলি পর সত্যিনারাণের পুজো চড়াও। তোমরা আমাদের ধম্মোর তাপ-এর কথা বুঝবেনি। চার বেলা নামাজ পড়ি আমি। আমি ধম্মো মানি না, তা কি তোমরা মনো?

হিন্দুদের "ধম্মো" বলি কি দেশে কিচু আছে একন?

কে জানে! হয়তো সত্যিই বোঝে না ও।

নিতে বলল, মনে মনে।

ধম্মো কতাটার মানেটা কি? অপু বলল, স্বগতোক্তির মতো।

তাপ্পর অপু আর নিতে তাড়ি খেতে পেড়াপেড়ি না করে হোসেন মিঞাকে বিড়ি এগিয়ে দিল। শঙ্খ-মার্কা বিড়ি। লম্বা। খুব কড়া। ক্যানিং-বাসন্তী-গোসাবা মায় তামাম সোঁদরবনের মাল-এ খাল-এ ও এ-অঞ্চলে ওই বিড়ির মোকাবিলা করনেওয়ালা অন্য কোনো বিড়ি লাই।

আগুন?

রোদে-জলে পুড়ে বাদামি-রঙা হইয়ে যাওয়া ফরসা বাঁ পায়ের হাঁটুর উপরে ডান পায়ের পাতাখানি চড়িয়ে দিয়ে বিড়িটা দু'ঠোঁটের ফাঁকে গুঁইজে আগুন চাইল হোসেন মিঞা।

নিতে দেশলাই এগিয়ে দিল।

ফক্কাস করে দেশলাই বাক্সেতে কাঠি মেরে জম্পেস করে বিড়িটা ধরিয়ে মিঞা বললে, এগুই। মাছ তো প্যালাম না কিছুই। ইদিকে বাড়িতে মেহমান আসিচে। এত বেলায় খালি হাতে যাবামাত্রই তো আব্বাজান ঘাউ ঘাউ কইরে উইঠবেক। এখন মাছ গজাই কুথায় বলো তো দিকিনি।

কে? এসেচি কোন মেহমান?

সি আমার বড়ো বুনের মামা-শ্বশুর। বাংলাদেশ ঠেঙে এসিচে। বেশ কদিন এসিচে। সব তো মাছেরই দেশ। আব্বাজান গেইচলো তো গতবছর। এখনও সিখানের মাছ খাওয়ার গল্প করে। আর এমনই পোড়াকপাল আমার তার জন্যিই একগাচা মাছ আজ পেইলাম না।

অপু বলল, আমার গলুইয়ে গোদা গোদা মাগুর রইয়েছে দ্যাক। মেহমান যখন এইয়েচে, তখন নে যা হোসেন মিঞা। আম্মীরে বইলবি, কাঁচানংকা কালোজিরে দে ঝোল বাইন্যে দিতে। আমাদের বিতিচি গেরামের ইজ্জত তো রাখতি হইবেক। নয় কি?

নিতের নেশা চড়ে গেচিল। সে ওদের কথার মধ্যে ধাঁ করে বলে দিলে, হাঁ। টিক বইলেচিস সাঙাত। কতায়ই বলে :

"দোকনো মাগুরের ঝোল আর পরের মাগ-এর কোল।"

অপু বিরক্ত হয়ে নিতের দিকে চেয়ে হোসেন মিঞাকে বলল, দেইকেচো। সাঙাতের কথা শুইনলে মিঞা? এট্টুখানি পেটে পইড়েচে কী তো হল!

ওদের চেয়ে বয়সে অনেকই ছোটো ভালোমানুষ হোসেন, নিতের কথাতে লজ্জা পেলো।

হোসেন নিজের ডোঙার গলুই খুঁজে নিজের ডিঙি থেকে জল-ছ্যাঁচা অ্যালমুনামের সানকিটা বেইর কইর্যে নিয়ে অপুর ডোঙার গলুই থেকে চারটে মাগুর তুলে নিল। সত্যিই গোদা মাগুর।

বলল, চারটেই নিলম। বাকিগুলোন থাক।

নিতে উত্তেজিত হয়ে বলল, কেন? কেন? সে কি কতা? মেহমান এয়িচি বাড়িতে। সবগুলোই নে যা মিঞা। আমার বাড়িতে ন্যাবা-রুগি তো কেউ লাই যে মাগুর তারে খেতেই হবেক। আমাদের এই বিবির বিলেও কি মাছের অভাব পইড়েচে? তুই মাছ পাসনি তো কি হইয়েচে? গেরামের ইজ্জত তো মিটোতে পারিনে তা বলি।

সি বুড়ো যে এইয়েচে, সে বাংলাদেশের পাবনা জিলার চলনবিল থিক্যে এইয়েচে। তাদের সে বিল নাকি সমুদ্দুরের সমান। তাতে নাকি হাঙর-কুমিরও বাস করেন। আর মাছের কতা তো কহতব্য লয়।

অপু-নিতের ভব্যতায় অভিভূত হয়ে বললে হোসেন মিঞা।

অপু বলল, আহারে! শুনেই পেরান জুড়িয়ে গেল গো হোসেন। তা দেখা যায় না কি একবারটি সেই পাবনা জিলার চলনবিলের চলন?

হোসেন বলল, বিলক্কন। কুটুম বইল্যে কতা। মুখ ফুইটে একবার বললিই তো হয়। গেইলে সিখেনে কত্ত আদর-যত্নই না পাওয়া যিতো। তবে পাসপোর্ট? পাসপোর্ট লাগবি যে। ভিসা।

অপু বলল, ছাড়ো তো মিঞা! ওদিক থেইকে সকলেই যেন পাসপোর্ট ভিসা নে আসচিতে।

আর যাবার সময়ই কি অন্য নিয়ম? বর্ডারে সব সাঁট। লুঙির গ্যাঁজে হাত দিয়ে বের করে ঠেকিয়ে দেবে একখানি বড়ো পাত্তি। ব্যস্‌স। ভাগাভাগি করে নেবেন তেনারা। তুমি গড়িয়ে যাবে উইপারে। এক্কেরে বেলডাঙার কুমড়োর মতো।

কী বুজতিচ?

হাঃ। নইলে আর বলতিচি কি? বাংলা ভাগ তো হইয়েছে সুদু নকসাতেই গো! দেশ একই আচে।

অপু বলল, তুমরা ভাবচিচ তাই!

বেলা বাড়তে দেখে হোসেন মিঞা টেনশানে ভুগছিল। সে তার আব্বাজান মুনসের মিঞাকে এখনও ভারি ভয় পায়। সে বুড়োর বয়স আশি হলে কী হয়? হাতের কবজি সোঁদরবনের বাঘের মতো। ইয়া চওড়া চওড়া। এখনও দিনে চারবার ওজু করে নামাজ অদা করে। তিনবার তো বটেই। ফজিরের, জুম্মার, মগরিবের নামাজ আর ইশার নামাজ। আল্লার কিরপাতে সাইস্তো তার এমনই আচে যে একনও এক কেজি মাংস একাই সাবড়ে দেয়। দুবেলা খাবার সময়ে দুটি করে আস্ত কাঁচা পিঁয়াজ আর দু কোয়া করে বড়ো এক-কোয়ার রসুন খায়।

আদি দেশ ছেলো হোসেনদেরও ওই পাবনাতেই। এখন বাংলাদেশ। কিন্তুক দেশ ভাগের অনেক আগেই কী পাকে-চক্করে যে ইখানে এসে থিতু হলো, কে জানে! সামসের জ্যাটায় একদিন বইলেচিল আট-আটটা খুনের মামলা ঝুলতিচিল নাকি আব্বাজানের মাতার পরে। পাবনার ফৌজদারি আদালতে। সি কারণেই তার পাইল্যে আসা। তারপর কিন্তু আর ফিরে যাওয়া হয়নি। আব্বাজান তাই একনো বাঙাল ভাষাতেই কতা কয়। মানুষটা এই বিতিচি গেরামের বা অন্য দশটা গেরামের অন্য কোনো মানুষের মতোই লয়। এ কতাটা দশ গেরামের সকলেই জানে। যাই হোক। বহুতই মেহেরবানি। আমি তালে সবকটা মাগুরই নিতেচি। পারবর দিগারের দোয়া থাকুক তুমাদের উপরে।

হোসেন মিঞা বলল।

আরে বাস বাস। বাস করো। বন্নুই তো নে যাও। ম্যালা কতা কিসের আর? অত দোয়া কোতা রাকব?

গডরেজ-এর আলমারি কিনে লিয়ো একটা।

নিতে বলল, মাতালের গলায়।

হোসেন মিঞা চলি গেলো লগি ঠেইলে ঠেইলে বিচিচি গেরামের দিকে।

অপুর নেশা চড়ে গেইচলো। উদাস চোখে সে চেইয়িছিল বিবির বিল-এর দিকে। যে-কোনো কারণেই হোক মানুষটার মধ্যে একটু আর্ট-কেলচার ঢুইক্যে রইয়েচে। এমনিতে ছুপকি দিয়ে থাকে। পেটে মাল পড়লিই অন্য মানুষটা বেইর‍্যে পড়ে। উদোম গায়ে।

এ বিলটা মস্ত বিল। বিবির বিল। মাঝে মাঝে হোগলার মতো জঙ্গল। ওরা বলে, হোগি। একটা কোণ গিয়ে পইড়েচে মাতলাতে। সেই মাতলা বেইয়ে এগুতে পারলিই কেনিং, গোসাবা, সজনেখালি; সোঁদরবন।

আকাশে একফোঁটাও মেঘ নেই তাই জলের রং এখন নীলচে দেখাচ্ছে। একটা কাঁক পাকি উইড়ে যাতিচে গলা লম্বা করি। একন গ্রীষ্মকাল। তাই বিদিশি পাকিরা নেই। ইখানের বারো মাসের বাসিন্দা যেনারা, তেনারাই শুধু রইয়েচেন। কোন্ বিবির বিল ছেল এ, কে জানে? বিবির নাম কেউই জানে না। তবু সেই কবে থেকে নোকে "বিবির বিল" বইলেই ডেইকে আসতিচে।

জলপিপিরা রইয়েচেন। তেনাদের গোনা-গুনতি লাই কোনো। এই বিলের আরেক নাম তেনাদেরই নামে : "জলপিপির জলা"। একঝাঁক বেলে হাঁস। কুড়ি-বাইশ জোড়া পানকৌড়ি। শ'খানেক বক। সাদা বক, লালচে, কালচে; মেছো বক। ডুব-ডুবা কয়েক ঝাঁক। ডোবে আর ওট্টে,

ওট্টে আর ডোবে। আর আছে বড়ো একঝাঁক ডোমকুর, কালো-গা, সাদা-ঠোঁট। এনারাও বিদিশি। কাম পাকিও থাকে সদাসব্বোদা দুশোর মতো! ডোমকুর-এর আর কাম পাকির ইঞ্জিরি নাম, ধনুবাবুর কাছেই শুনেছে অপু; "কুট" আর "পিংক হেডেড মুরুহেন"।

কুটেদের বুদ্ধিও ভীষণ কূট। কুটকচালির রাজা। হোসেনমিঞার বাবা মুনসেরমিঞারই মতো কোনো একসময়ে এনারা এয়েচিলেন। কে জানে, কোন দেশ থিক্যে? এইসি আর ফিরে যাননিকো।

একন এমন দুপুরে জলের পাকিরাও মুখ হাঁ করে মাঝে-মইদ্দে। মৃদু কুঁই-কুঁই করে আওয়াজ উটোয়। পেটের তলার জল গরম হয়ে গেলে দলদলি আর ঝাঁঝির মইদ্দে চইলে যায় ঠ্যাং-উপুরে পোঁদ-উপুরে কইর‍্যে। ডুব দিয়ে। তারপরই উট্টে এসে ছায়া খোঁজে জলেরই মদ্দে।

পাকিদের যখন তিষ্টা পায়, তখন অপুরও তিষ্টা পায়। পাকিদের পিটেরই মতো হাত-পেছলানো মসৃণ, সুনসান, মেয়েচেলের তলপেটের কথা মনে পইড়ে যায়। হরিমতির। এই বাদার পাঁকেরই মতো সোঁদা-সোঁদা গন্ধ তার শরীলে। এই উষ্ণ উদোম দুপুরেরই মতো জোলো ঝাঁঝ।

হরিমতি তার কালোজাম আর নিম-এর ছায়াঘেরা মাটির ঘরের মেঝেতে চাটাইয়ের উপরে চুপটি করে শুইয়ে থাকে। সেও যেন কোনো হাজা-মজা নদীরই মতো। শান্ত, স্নিগ্ধ, জোলো গন্ধ নিয়ে টান টান পইড়্যে থাকে। নড়ে না, সমুদ্রে গিয়ে পড়ার জন্যি দৌড়োদৌড়ি করে না। তার মদ্দি জোয়ারও নেই, ভাঁটাও নেই। সব্বোসময়ে একই জল। ছলছলানি নেই কোনোই। অপু তার যেমন খুশি সাঁইতরে যায় হরিমতির সোঁতার ভেতরে ভেতরে। বাধাও দেয় না, আবার ইন্টারিস্টও দেকায় না হরিমতি। কোনো তাপ-উত্তাপই লাই তার! চিত হয়ে শুয়ে শুয়ে দ্যালের টিকটিকি দ্যাকে! টিকটিকির নজ্জা থাকলিও থাকতি পারে, কিন্তুক হরিমতির সি-সব বলাই লাই। অপু মজা-নদীর উপরে শেষ বিকেলের রোদেরই মতো স্থির হয়ে শুয়ে থাকে হরিমতির উপুরে। বাইরে স্তব্ধ দুপুরে ঘুঘু ডাকে। শান্তি। আঃ, কী শান্তি।

এমন এমন দুপুরে, এমন চুটিয়ে নেশা করার পরই হরিমতির কথা বারেবার মনে পড়ে যায় অপুর। অপু বিড়িতে একটা লম্বা টান লাগিয়ে গলা ছেড়ে গান ধরে। যে-গান ক-বছর আগে গোসাবাতে শুনেছেলো যাত্রাতে, দুগগোপুজোর সময়ে।

সে গান নিতে এতবার শুনেচে যে তার কোনো বিকারই হয় না। সে তাড়ির গ্লাস হাতে ধইর‍্যে বিবির বিলের দিকে উদাস চোখে চেইয়ে থাক্যে।

ফড়িং ওড়ে লালরঙা জলের ওপর ওপর। পেছনের গেরাম থেকি বকনা বাছুর ডেকে ওঠে। তার মায়ে সাড়া দেয় গম্ভীর গলায় হাম্বা-আ-আ। বিবির বিলের জলের ওপর সে ডাক হাঁকু-পাঁকু দৌইড়ে যায়। হাঁস ডাকে এবং। উঁচু গলায়। তার পেছু পেছু গাঁয়ের কুত্তা ভোকে।

নির্বিকারে অপু গান গেয়ে যায় তার নিজেরই আনন্দে।

"তুমি কার বিবিগো জানিনে তা
খোলো চুলের সোঁতা,
তোমার মদ্দি আমায় বুদ্ধি
বীজতলিতে পোঁতা।
কে কী বইললো আমায়
বইললো তোমায়
কেয়ার করে কে বা,
এই জনম আমার কইরেছি পার
কইরে ফুলের সেবা।"

অপুর সেই গান দুপুরে নিস্তরঙ্গ রোদভাসি বিল-এর রুপোর পাত-এর মতো ঝকমকে উজ্জ্বল জলের উপর দিয়ে পিছলে পিছলে চইলে যায় দূরে দূরে। চারিয়ে যায়।

জল-ঘেঁষা মাদার গাছের ডালে-বসা আধ-ঘুমন্ত গরম-ক্লান্ত পানকৌড়িরা একবার গলা লম্বা করে চায়, তারপর আবার ঝিমুতে থাকে। কালো ডোমকুরদের সাদা ঠোঁটের দুদিকের ঠিক উপরে বসানো নাকের ফুটো দিয়ে দুপুরের গরম ভাপ ঢোকে। ঠোঁট দিয়ে বারবার জল ঠোকরায়। অপুর গানের টুকরো-টাকরা ছিটকে-ছটকে যায় লাইপ্যে-ওটা জলকণাদের সইঙ্গে। দূরে, মেছো চিল ডাকে, ঘুরে ঘুরে। অদ্যকার ঝিম-মারা গরমের দুপুর সেই ডাকে চমকে চমকে ওঠে।

নিতে বলে, কিরে অপু, বাড়ি যাবিনি?

বাড়িতে কি?

বলেই, মনে মনে ভাবলে : বাড়িতে ছায়া, বাড়িতে মা, বাড়িতে দাওয়া, শেতলপাটি। বাড়িতে বৌ, পান্তা, তেঁতুল জল, শুকনো লংকা পোড়া, কাগজি নেবু : শান্তি।

তারপর ওর মনে পইড়ে গেলো হরিমতির কতা। সিখানেও শান্তি। অন্য শান্তি। অন্য পেকার। কিন্তু সেই শান্তির মধ্যে বড়ো অশান্তিও।

হরিমতি তো ভাড়াটে মেয়েচেলে। সে তো ভালো লয়ই! কিন্তুক অপুর যে কেন এমন ভালো লাগে তাকে! তার কাছে মদন জ্যাটা, প্যালা গড়াই, ফুচুক সাপুই—সব্বাই যায়। অপু ভালো করেই জানে। তবু এতজনকে এত দিয়েও, এতরকম করে দিয়েও হরিমতির মুখের হাসি কক্কনোই মেলান হয় না। তার ভালোবাসায় কুনো খামতি পড়ে না।

কিন্তুক হরিমতিকে অপু তার পুরোপুরি নিজের কইরে চায়। ইক্কেরে তার ইকার করে! সি জন্যে যা কিছু কইরবার, সবকিছু কইরতেই রেডি হইয়ে আচে সে। হরিমতির কাচে যে একবার গেচে, তার জীবনে অন্য কোনো মেয়েচেলেকে পছন্দ হব্বারই লয়!

চল। নে, উঠ। বাড়ি যাই!

নিতে বলল।

তুমি এগোও। আম যেতিচি।

তাড়ির শূন্য কলসিটা ডোঙাতে উটোতে উটোতে নিতে বলল, ধমক দিয়ে, একুনি চল। ইকানে সেই জোড়-আল-কেউটের বাস। তা জানিসনি বুঝি? নেশা করে পড়ে ঘুমুবি, তারপর কেউটে কাটলি সকলি আমাকেই গালমন্দি পাড়বে। ওর মদ্দি আমি লাই। আমি জাতে মাতাল কিন্তু তালে টিক।

নেশা করে একুনি ঘরে গেলি, মা যে বকবে ভীষণ।

অপু বলল, বিবেক-দংশিত হয়ে। তোর তো মা-ই। আমার বাবাকে তো চিনিসনি। মিস্টার নেপো বাইন! আমার ভবিষ্যতের গুষ্টি নাশ কইরে ছেইড়ে দেবে। বাপটা মরে না যে কেন, কে জানে।

মইরবে, মইরবে। আলবাত মইরবে। তোর চিন্তে নেই কুনো। না মরি সি যাবেটা কুতা? সক্কলের বাপকেই মরতি হয়, তোর বাপকেও হবেক। ইটাই পেরকিতির লিয়ম হে। একবার জম্মিলে, মরতি হবেকই। হুঃ।

ডান হাতের তর্জনি নাচিয়ে বলল অপু।

মনুষ্য কবার জম্মগোরোহন করে রে শালা? জন্মন্তর-ফন্মান্তর উসব ফুটুস। ইক্কবার। ছিরিফ ইকবার। ইকানে 'ফির ইকবার' চলে না। বুয়েচো?

নিতে বলল।

অপু ডোঙার পইছাতে বসে আবার গান ধরল...

> "তুমি কার বিবিগো জানি না তো
> খোলা চুলের সোঁতা..."

২

কার কপালে যে কোথায় মৃত্যু নেকা থাকে! বাংলাদেশ ঠেঙে এল মানুষটা। মেহমান। আর ইকানেই ইয়াকাইকাক শেষ হইয়ে গেল। হটাৎ ক-বার ভেদবমি আর বাহ্যি। ব্যস্‌স।

মহম্মদ সাগিরুদ্দিন হোসেন মিঞার বুনএর শাওহার শাকলু মিঞার মামুজান, পাবনার চলনবিলের সব শব্দ গন্ধ নিয়ে বিতিচি গেরামে এসে ফওত হয়ে গেল। মামুনীজানএর সঙ্গে দেখা হল না বলে শেষ মুহূর্তে দুঃখ কইরেচিলেন। শেষ মুহূর্তে কুরান শরিফটি আব্বাজানের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে নিজের বুকের উপরে রেখে চোখ বুজলেন।

মামুজানকে কবর দেওয়া হচ্ছিল গোরস্তানে।

সকাল থেকেই আজ একটা ঝোড়ো হাওয়া বইচে। টানজিস্টারে বইলেচে ঘূর্ণি-ঝড় আসতিচে। শেষমেশ হয়তো প্রতিবারের মতো কার্নিক মেরে বাংলাদেশেই গিয়ে হামলে পড়বে। এইরকমই দেকচে বচপন তেকে। কিন্তু কোনোবার তো গোঁত্তা খেয়ে পড়তেও পারে দোকনো বাংলাতে। ঝড়, দোকনো এলাকা না পেরিয়ে গেলে কিছুই বিশ্বেস নেই!

বৃষ্টিও এসে গেল। যেন এই ঝড়ের হাত ধরাধরি করেই। কিন্তুক আইন মোতাবেক তাঁর আসতে এখনও মাস দুয়েক দেরি। এইসেচেন বটেক কিন্তু চইলেও যাবেন। ফিরে আইসবার জন্যি। আজকাল আর আবহাওয়ার কোনো ঠিক-ঠিকানাই নেই। সমস্ত পিরথিবির আবহাওয়াই বইদলে গেচে।

হাজি সাহেব যখন মক্কাতে জায়রাতএ গেছিলেন, তখন তাঁর সারা দুনিয়ার মানুষদের সঙ্গেই দেখা হয়েচেল। সারা দুনিয়ার মানুষদের খাল-খরিয়াত পুছ-পাছ করে এইসেচেন তিনি। এসেই না একথা বললেন।

ঘুটঘুটিয়ার মসজিদের ইমামসাহেব এসেচিলেন মামুজানএর শেষের নামাজ পড়ে দেবার জইন্যে। তিনি নমাজ পড়া শেষ করার পরই কফন গোরস্তানে আনা হয়েছে। মামুজান মানুষটা খুবই রসিক ছিলেন। খাদ্যরসিক, জীবনরসিক।

মামুজানকে হাতে হাতে ধরে নিঃশব্দে মাটিতে নামানো হল। তারপর মাপমতো মাটি কাটা হল। মামুজানের চাদর ঢাকা শরীর যত্ন করে ধরাধরি করে সেখানে শুইয়ে দিল ওরা। শব-এর একটু উপরে মাটির চারধারে খাঁজ কেটে নিয়ে সেই খাঁজ-এর মধ্যে মধ্যে এমন কাঠের তক্তা সাজানো হল যেন চৌকো একটি বাক্স। আর সেই বাক্সের মধ্যেই গোর দেওয়া হল মামুজান মহম্মদ সাগিরুদ্দিনকে।

মনসুর মিঞা, হোসেন মিঞার আব্বাজান, এগিয়ে এসে দুহাতের পাতায় অঞ্জলি ভরে মাটি নিয়ে বইললো :

"মীনহ খালেক নকুম
ওফিহা নায়িদোকুম
বহ নোখরে জখুম তাহরতন উখ্‌রা।"

বিতিচি গেরামের হোসেনকে কেনিংএর জনস্টন সাহেব, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, বইলেচিল ইকবার যে, তোমাদের মুসলমান ধম্মোর সঙ্গে আমাদের কেরেস্টান ধম্মের এই গোর দেওয়ার ব্যাপারে খুবই মিল আচে।

যে কতাগুলি মৌলবীসাহেব আববিরিত্তি করলেন, সেই কতাগুলোর মানে হল : "তোমাকে এই মাটি থেকেই পয়দা করা হয়েছিল, এই মাটিতেই তোমাকে সঁপে দিলাম। সেই আখরতের দিন বিচারের সময়ে, এই মাটি থেকেই তোমাকে আবার তোলা হবে।"

"আল্লা হোম্মা সল্লে আল্লাহ্ সৈয়দনা মৌল না,
মহম্মদীন, ওবারিক ওয়াসিল্লীম আলেহ।"

হোসেন মিঞা যখন ছোট ছিল তখন আম্মীজান ওকে এই কথাগুলোর মানে সহজ বাংলাতে বুঝিয়ে দিয়েছিল। "হে খুদাতালা, হে পরবরদিগার, তুমি তোমার নবি মহম্মদ সল আল্লাহ বসল্লমকে তোমার অপার দয়া বর্ষণ করেছিলে। এই মৃত আত্মার প্রতিও তুমি দয়া করো।"

এর পরেই "কুল" পড়া শুরু হল। চারবার "কুল" পড়ার পর তিনবার সুরে "ফাতিহা" পড়া হল। তারপরও ফের দ্বিতীয় "সুরা"র আলিফ লাফ লিম পড়তে লাগলেন "জায়রীন" হাজি সাহেব। চারবার আলিফ লাফ লিম পড়বার পরে আবার দুরদ্ পড়লেন। তার ওপর সব শেষে মামুজানের আত্মার শান্তি কামনা, "ইসালে শবাব" করে, সকলে বাড়ি ফিরে চলল।

হোসেনের ডোঙা মস্ত কালোজাম গাছটার ছায়াতে রাখা ছিল। মামুজানকে গোর দেওয়া হয়ে গেলেও সে বাড়ি গেল না। সকলের পেছু পেছু গিয়ে এক সময়ে ডোঙায় বসে ভেসে গেল বৃষ্টিভেজা বিলে।

এই বৃষ্টি, সে বৃষ্টি যখনই আসুক না কেন, হোসেনকে বড়োই উতলা করে। এমনিতেই তো বর্ষাকালে ওদের তেমন কাজকর্ম নেই। চাষবাস যাঁরা করেন তাঁদের কাছে কিছুটা। ওর চেয়ে বড়ো যে দুই দাদা, ওর ছোটো যে ভাই, তারাই ওসব দেখে। কিন্তু মচ্ছিমারদের কাজ শীতকালেই বেশি। তবে হোসেনের কোনো কাজ করতেই ইচ্ছে করে না। একটুও নয়। আব্বাজান কত গালমন্দ করে। করলে কী হয়! বৃষ্টি পড়লেই হয়। সে অসময়ের বৃষ্টিই হোক আর সময়ের বৃষ্টিই হোক। গত জন্মে সে বোদয় জলের মাছ বা পোকা ছেলো। জলই তার জীবন। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মন পদ্ম বা শাপলার পাতা হয়ে যায়। বুক পেতে সে বৃষ্টিতে গ্রহণ করে। তিরতির করে কাঁপতে থাকে।

হোসেনের এমনিই একা একা জলে ভেসে ভেসে নিজের সঙ্গে নিজে কথা কইতে ইচ্ছে করে। জলের সঙ্গে, জলফড়িংএর সঙ্গে, পানকৌড়ির সঙ্গে, মাথার অনেকই উপর দিয়ে উড়ে-যাওয়া হাওয়াতে আঁশটে-গন্ধ-ছড়ানো বিষণ্ণ, একলা, লম্বা-গলা কাঁক-পাখির সঙ্গে।

কখনও বা হোসেন মিঞা পিরসাহেবের দরগাতে গিয়ে সুন-সান্নাটা দুপুরে একা-একা ঘুরে বেড়ায়। নানা জংলি গাছ সেখানে। নানারকম শেয়াল আছে একপাল। সাপ আছে নানা জাতের। এই দ্বীপে বড়ো কেউই একটা আসে না। এক শবেবরাতের সময়ে, ফতোয়া-দোয়াজদম-এর সময়ে, ঈদুজ্জোহার সময়ে আসে মানুষে। পিরসাহেবকে "ঈদী" দিয়ে যায়। প্রদীপ জ্বালে! পিরসাহেব নইলে সারা বছরই একা। ধোবির পাটের শ্যাওড়া গাছের পানকৌড়িটার মতো।

হোসেন তাঁর সঙ্গে বসে বসে গল্প করে। কত কিছু জানেন পিরসাহেব। সেই সব শোনে হোসেন আর কত অচেনা-অজানা দেশ-বিদেশ চলে যায় মনে মানে। পিরসাহেবের কাছে উর্দুর পাঠ নেয়। কোরান শরিফ পড়ে।

তবে এসবও ভালো লাগে না হোসেনের। টাকা-পয়সা, হিসাবপত্তর, খাটা-খাটনি, ধম্মো-কম্মো এসবের কিছুই লয়। কিছুই ভালো লাগে না ওর! শুধু এমনি করেই সারাজীবন ভেসে বেড়াতে ইচ্ছে করে। জলের সঙ্গে, জলের মাছের সঙ্গে, জলের কামটের সঙ্গে; কুমিরের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, বসন্তে।

এ-অঞ্চলে হিঁদুই বেশি, তাই আরবি মাসগুলির নাম জানলেও তেমন ব্যবহার নেই মুসলমানদের মধ্যেও। তবে বাড়িতে আব্বাজান আম্মীজান এবং ফুফা খালারা যখনই আসেন যান, তখন আরবি মাস উল্লেখ করেই কথা বলেন। মহাররম্, সফর, রজব, শাবান, রমজান, জিলক্বাদ ইত্যাদি ইত্যাদি।

"আর্ট-কেলচার করা" ধনুবাবুর ব্যাটা ফনুবাবু একদিন বলেছিলেন ওকে, হোসেন, তোর নামে একজন বিখ্যাত মাঝি আছে মানিকবাবুর উপন্যাসে।

উপন্যাসটা ক্কি চিজ? আর মানিকবাবুটোই বা কে? পেদো-পাড়ার মুদি, মানকে কি?

দুস্স শালা।

ফনুবাবু বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন হোসেনকে।

"কেলচার" বুঝতি না পারায় ফনুবাবু বেজায় চইট্যে গিয়ে মুখ খারাপ কইর‍্যে গাল দেইচিলেন হোসেনকে।

বইলেচিলেন, তোর কিস্সু হবেনি।

বইলেচিলেন, উপন্যাস মানে, নবেল-নাটকের নামও শুনিসনি? ফুলেল তেল, সুরমা, জরির ফিতে, তরল আলতা! কাচপোকার টিপ! ও সরি, তোরা তো আবার মোচলমান। তোদের মেয়েরা তো আলতা ব্যাভার করে না। করে নাকি? খড়ম পরে? নারে?

তুমার মতন কতার খিচুড়ি বাঁদতে আর কার‍্যে দেকি লাই। কতিচিলে তাই বলো না। সেই নোবেলের হোসেন মিঞাটি কে? সে দেখতি কেমন?

বিতিচি গেরামের হোসেন ওসব মেয়েছেলের পেসঙ্গ এইড়ে গিয়ে জিগিস কইরলো।

আরে সি আচে মানিকবাবুর নবেলে। নবেলের নাম "পদ্মা লদীর মাজি"। আর মাজির নাম তোর নামে। তাইলে আর বলতিচিটা কি? হোসেন মিঞা। সাদা দাড়ি! সে মাজি আবার মাজে-মদ্দিই হাইরে যায়, চইলে যায় হোই সাগরের মদ্দিখানের এক দ্বীপে। তোর নামটিও তো সেই মিঞারই নামে, কামখানা একটু জুতসই কর। তবে না বুঝি!

পদ্মানদীটা আবার কোনদিকে? শুমাল এ, না জুনুব-এ, না মাগরীব-এ?

লাও! আরে শালা! পদ্মানদী হতিচে বাংলাদেশে। এপার ওপার দেকা যায় না। তোর ওইসব শুমাল-জুনুব আরবি-ফারসি আমার কাচে তড়পাস লা তো!

আমাদের মাতলা, গোসাবা, বিদ্যে, হেড়োভাঙার মতোই কি সি নদী?

হোসেন মিঞা শুদোলো।

ছেলেমানুষ! কীই-বা জানে! কোথায়ই বা গেচে!

দুস শালা! কিসের সঙ্গে ইসে!

হবেও বা!

হোসেন মিঞা বইলল, মনে মনে।

ননুবাবু-ফনুবাবুদের চার পুরুষের পয়সা। তাই সকলকেই ভালোবেসে উনারা শালা-বাঞ্চোত বলেন। তা, বলতি পারেন। বইলবার হক আচে উনাদের। ও হল গিয়ে ভালোবাসার শালা-বাঞ্চোত। কেউই মনে করে না কিছু। মানুষ উনারা ভালোই। বিপদে-আপদে সক্কলের জন্যিই করেন। শুধু যে নিজের ভেড়ির মানুষের জন্যিই তা লয়। ওই বাদা অঞ্চলের প্রত্যেকটি মানুষের জন্যিই। কত ছেলে যে এদেরই জন্যি কলকেতায় এই বাবুদের বাড়িতে থেকে কালেজে "নেকাপড়া" শিখে "মানুষ" হইয়ে গেরাম ত্যাগ কইরেচে বরাবরের মতো তার গোনা-গুন্তি লাই। এদের সুকীর্তির নেকা-জোকা লাই। না, উনারা মানুষ ভালো।

তবে হাড়-খচ্চর হরিতে সামন্তরা। হাড়-খচ্চর। সাপুইদের অতবড়ো ভেড়িটা সিরিফ মেইরে দে নিজেদের বলে চাইলে দিলে! নিঃসন্তান গজেন সাপুইয়ের উইল ছেলো যে তার অবত্তমানে

তার ভেড়িগুলো সব ভারত সেবাশ্রম সঙ্গ পাবে। নদে সামন্ত ছেলো ম্যানেজার। ওমা! বুড়ো যেই চোখ মুদ্‌লো, সঙ্গে সঙ্গে অমনি পুরো ব্যবসাটোই কবজা করে নিলে গা! উইল ছিঁড়ে ফেলে দিলে। লজ্জা-ফজ্জাও লাই। এই কি নেকা-পড়া জানা নোকের নক্কন! আর আজ সেই মেরে-লেওয়া পরের ধনেরই গরম কী! বাস্‌রে বাস্। ধরাকে সরা জ্ঞান করতিচে ইকেবারে। সামন্তরা যখন যেমন খুশি একি-তাকি পুটিয়ে দিচ্চে। বলচে, "ফোটা" "ফোটা" অমনি মোসাহেব, কুকুর-বেড়ালের অধম চাকরগুলো হামলে পড়ে বইলতিচে, "ফোট"! "ফোট"! আজ সকালে ইচ্চে হইল্যো তো একে "তোল্লাই" দেতিচে আর কাল বিকেলেই ইচ্চে হইল্যো তো তাকেই "ফেল্লাই" দেতিচে। সামন্তরা চাকর বড়ো ভালোবাসে। যে যত বড়ো পা-চাটা চাকর, যে যত বড়ো মেরুদণ্ডহীন পোক সে সামন্তদের কাছে ততই বেশি পেয়ারের। যে যত বড়ো শয়তান, ফেরেববাজ, মিথ্যেবাদী চাকর, সামন্তদের কাচে তারই তত বেশি দাম। তবে মাজে মাজে তারাই বুইজতে পারে যে "জাজমেন্টোতে" ভুল হয়্যা গেচে। আর যেই না বোজা, অমনি "ফেল্লাই"। তবে এটা বুজতিই, মানে, কোন চাকর কোন চরিত্তিরের সেটা পেরায় সময়ই বড়োই নেট কইর্য়ে ফেলেন তেনারা।

হোসেন ভাবে, যাক গে মরুক গে! তেনাদের পাঁটা শালারা ল্যাজে কাটবেন না মাতায় কাটবেন সে তাঁরাই জানেন!

অপু একটা কথা বলে পেরায়ই।

"লজ্জা মান ভয়, তিন থাকতি লয়।"

হোসেন মনে মনে বলে, তা সামন্তদের গায়ের চামড়াও মনিষ্যির লয়; দিশি বড়োলোকদের গায়ের চামড়া বোধহয় এমনই হয়। কে জানে! গন্ডারের। রাজ্যসুদ্ধু মানুষেই জানে যে, সামন্তদের সব ভেড়িই গজেন সাপুইএর সম্পত্তি "মারা", অথচ তাতে তেনাদের কোনো তাপ-উত্তাপই লাই। পয়সা আর ক্ষেমতা এসে বাস্তুসাপের মতো বাস করে তারই মনে কিচুদিন পরেই এমনি পেত্যয় জন্মে যায় যে, যেন সি সবই তার যোগ্যতা দিয়েই সে পেইছিল। মানুষ নিজেকে ভোলাতে, নিজের পাপ ভুইলতে বড্ডই ভালোবাসে।

ইদেশটা তো সাপেদেরই দেশ! ইক্মনের কোনো মানুষেরই তো মেরুদণ্ড লাই। সাপেদের মদ্দিও সবই আবার হেলে। ফণা ধরতি, মাথা উঁচু করি বাঁইচতে পর্যন্ত জানে না। ছিঃ ছিঃ। আর যার কাছেই পয়সা আর ক্ষেমতা তার চারপাশেই কোমরে দড়ি-বাঁধা বাঁদরদের তো টিপ্পি পইড়্যে যায়। কত্তা বলেন : নাচ রে, বাঁদর নাচ। অমনি বাঁদর কাঁধে লাঠি, পায়ে ঘুঙুর পরে ঘুরে ঘুরে নাচে। কত্তা বলেন, রে বাঁদর! ডিগবাজি খা। বাঁদর মহানন্দে ডিগবাজি খায়। কত্তা বলেন, বাঁদর দুঃকু-দুঃকু মুক কর তো বাপ। বাঁদর অমনি দুঃকু-দুঃকু মুক করে গালে হাত দিয়ে বসে। কত্তা কাউকি ধরি আনতি বললে, কত্তার বাঁদরেরা বেঁইধি আনে। কত্তারা ফিশফিশ কইরে কাউকে ভালো বললি, বাঁদরেরা অষ্ট পহর ঘুরিঘুরি হাততালি দিতি থাকে। তার নামে পুজো চড়ায়। থামতেই চায় না।

কত্তার ইচ্ছেতে চাকরগুলো ভূতকেও ভগমান বানায়। খচ্চরকে আরবি ঘোড়া।

বাঁদরেরও কত্তরকম। ধলা বাঁদর, কালো বাঁদর, বুড়ো বাঁদর, জোয়ান বাঁদর, মোট্টা বাঁদর, রোগা বাঁদর, লম্বা বাঁদর, বেঁটে বাঁদর।

কত্তা বলেন, রে বাঁদর! আমার জুতো পালিশ কর। অমনি বাঁদর জুতো পালিশ করে। কত্তা বলেন, বাঁদর আমার থুথু চাট, তোর হপ্তা বাড়িয়ে দেবো, বুকে শ্লেষ্মা বসলে কী ভেদ-পাইকানা হলে তোকে কেনিং নিয়ে গিয়ে ভালো ডাক্তার দেকাব, লেডিকিনি খাওয়াব। অমনি বাঁদর থুথু চাটে, হামলে পইড়ো সামন্তদের পায়ের উপ্পরে মুখ লামিয়ে।

হোসেন মিঞার দেকে দেকে ঘেন্না হইয়ে গেছে পয়সার উপরে আর পয়সার কিরিয়া-কাণ্ডর উপরেও। পয়সার জন্যে যদি "ইডুকিটেড আর্ট-কেল্‌চার" মানুষে এই করে, নিজেদের—কী

মালিক, কী কম্মচারী এতোখানি নিচুতে নাইম্যে আনতি পারে বাঁদরেরই মতো; তবে সে পয়সার মালিক হবারও পেয়োজন লাই হোসেনের। আর সি পয়সার জন্যি কারও খিদমতগারি করারও পেয়োজন লাই। ভেইগ্যে পইড়বে একদিন হোসেন মিঞা, সেই পদ্মানদীর মাঝির হোসেন মিঞারই মতো, সোঁদরবনের দিকে। থেইকি যাবে কোনো দ্বীপের মাঝে সবুজ-সবুজ, হরজাই-রঙা সবুজের ছোপ-নাগা চাপ-চাপ জঙ্গলের মদ্দি, জোয়ার ভাঁটা-খেলা জঙ্গলের মদ্দি; খোলা, নোনা-হাওয়ার মদ্দি, যে-হাওয়া উদোম উতালি-পাথালি করা সুমুদ্দুর থেইক্যে ছুট্যি আসে। সিখানে একবার যেতি পারলি আর আসবে না ফিরি ইদিক পানে কক্খনো।

অনেকদিন হল আব্বাজান হোসেনকে সামন্তদের ভেড়িতে ভেড়াতে চায়।

ওর মদ্দি হোসেন লাই।

তার ঢোঙা ভাসায়ে দিল হোসেন পিরসাহেবের দরগা যেখানে, সেই মদনটাকি পাকির দ্বীপের দিকে।

পকিটার নাম আসলে মদনটাকি লয়! আসল নাম, শামুকখোল। হোসেন ছেলেবেলাতে বইলতো, মদনটাকি। কেন যে বইলতো, তা জানে না। বলতি বলতি শামুকখোল কী করি যে মদনটাকি হইয়ে গেচে তা বুঝতি পারে না হোসেন।

সেই মদনটাকির দ্বীপে একজন বাউলে আসে। নাম তার সারেং মিঞা। খয়েরি আর সাদা চেক-চেক লুঙি তার পরনে। বাঘের মতো তার হাত-পায়ের গোছ। শুধু-গা। কাঁধ থেকি গামছা ঝোলে একখানা। বারো মাস। তার ডিঙি নৌকার পাটাতনের নিচে বে-পাশি বন্দুক নুকানো থাকে। জানে হোসেন। আর থাকে কুড়োল, গাছ-কাটা; মধু-পাড়া হাড়ি, মৌচাকে ধুঁয়ো দেবার জন্যি ধুনো, মাছ-ধরা খ্যাপলা জাল। লোকটার মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, কাঁচা-পাকা দাড়ি। বাঁ গালে একটা কালো জড়ুল। লোকটার চোখ দুটো দেখবার মতো। চোখ দুটাতে তাকালি মনি হয় যেন সুমুদ্দুরের ছায়া পইড়েচে তাতে। এই মেঘ এই জল, এই নীল; এই সবুজ। আবার পরমুহুত্তেই যেন সাদা-রঙা নোনা-জলের পাকি উড়্যে যেতিচি ডানা ছইড়ে দে তার ভিতরে ভিতরে।

লোকটা কথা কম বলে। কিন্তুক অন্যকে ভাবনা ধরায়ে দেয়। আগে নাকি সে এঞ্জিন-বোটের সারেং চেলো। সেই থেকিই সারেং মিঞা নাকি আগে কেনিং-গোসাবা মোটর-লঞ্চ সার্ভিস কোম্পানীর গোপেন বাগচিমশায়ের মোটর-লঞ্চ চালাত। লঞ্চের ছাদে "সুকান" ধরি বসি থাকত ওই চক্ষু দুখান দূরে মেলি দে; সোজা।

সেই চক্ষু দুখান জল-জঙ্গল মেঘ-তারা-চাঁদ সব ফুঁড়ে দে চলি যেত কোন অন্য গ্রহে নক্ক তরে!

ইকবার সি কইরেচেলো কী, এক ভরা-বাদরের দিনে মালিকের অজানতেই ছোট্ট একখান লঞ্চ নে কেনিংএর জেটি থেক্যে বেইর‍্যে গেসলো বনবিবির ডাক শুইনতে পেইয়ে। বনবিবি নাকি তাকে স্বপনে দেখা দিতেন। আর সেইবারেই বোট ঝড়এ ডুইব্যে যায়। ছোটোবালির কাচেই সুমুদ্দুরের মুখে সারেং মিঞা কুনোক্রমে সাঁতরে উইট্যে বেঁইচি যায়।

বাগচিমশায়ের বোটেরও সিকানেই সলিল-সমাধি হয়।

সারেং মিঞার জানটাও গেচিলো পেরায়। তবে, যেতি যেতি থেকি যায় কোনোক্কেরেমে। বাঘের মুখ ঠেঙে বেঁইচে, কুমিরের মুখ ঠেঙে সাঁতরে পাইলে, কামটের দাঁত ছাইড়ে নে আল্লার দোয়ায় ফিরি আসে সারেং মিঞা তিন মাস বাদ। পৌষ মাসে!

তবে শোনা কতা; গোপেন বাগচিমশায় নাকি তেমনিই মানুষ ছিলেন। ভগমানে বিশ্বাসী, দিলদার মানুষ; সোঁদরবনের পোকা।

সারেং মিঞার দুচোখে নাকি কিছুক্ষণ তাইক্যে থেক্যে বাগচিবাবু নাকি বইলেছিলেন, অন্যের মুকে গল্প শুইনেচে হোসেন মিঞা, "বনবিবি" স্বয়ং তোরে ডেইকেচেলেন রে সারেং? আমাকেও ডাকে। বহুবছরই হলো ডাকে। তবে আমার যে অনেকই বন্ধন। ঘর-সংসার, ছেলে-মেয়ে, এত

বড়ো ব্যবসা, বোট বানাবার মস্ত কারখানা তিলজলাতে। আমি আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পইড়্যে গেছিরে এ জনমের মতো। তোর কোনো পিছুটান লাই। যা, তুই চইলে যা। তোর বিরুদ্ধে যে কেস করেছি, তাও তুলে নেব। একখান বোট গেছে তো গেছে। লাক টাকা গেচে তো গেচে। রেফ্যুজি হয়ে এসেচিলাম একবস্ত্রে পুববাংলার পাবনা জেলা থেকি। অনেক দিয়েছেন ভগমান। কোনোই দুঃখ লাই। যা চলে যা সারেং। তোকে মুক্তি দিলাম। তোর খুদার নাম নিয়ে চলে যা তুই বনবিবির বনে।

এত কথা ভাবতে ভাবতেই দ্বীপের মুখে পৌঁছ গেল হোসেন মিঞা। গাব গাছের কাছে ডোঙার ল্যাজ টেনে ডাঙাতে উঠিয়ে রেকে সে গুটি-গুটি হেঁইটে চলল পিরের দরগার কাচে।

অনেকগুলো গো-বক বসেচেল ঢিপ্পি মেরে। তারা নইড়ে-চইড়ে উইটে উড়ে বসল ইদিক-উদিক।

মৌমাছিরা চাক বেঁইধেছে গোলা-কাঁটালের বড়ো বড়ো গাছে। ঘন বন ইদিকে। জঙ্গলের গাছ লাই কিছু। সবই ঘর-গেরস্থির গাছগাছালি; পাখপাখালি। খেতিবাড়ি হত ইসব জায়গাতে একসময়ে। একন পির-বাবা দকল নেওয়াতে সবাই হাত উইট্যে নেচে। তবু হোসেন শুনতিচে যে, সরকার নাকি জবরদখল নিবেন এই দ্বীপের। নিয়ে, পিসিকালচার না কি বলে, তাই করবেক।

ফনুবাবু বলতেছেলেন।

মাসি-কালচার, পিসিকালচারও নিশ্চয় অন্য ইক ধরনের আর্ট-কেলচার হবেক।

হোসেন ভাবে।

সামন্তদের সঙ্গে সরকারেরও খুবই দহরম-মহরম। না, না, ভ্যাবল সরকার লয়; পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তেলা মাথায় তেল তো চিরদিনই পইড়েচে। মিনিস্টর, আমলা, এমনকী দিল্লির উজিরে-আজম-এর সঙ্গেও নাকি সামন্তদের দোস্তি আচে। পয়সাতে পয়সা আনে। ক্ষেমতাতে ক্ষেমতা আনে। একটা বাঁদর অনেক বাঁদর আনে। এই পিরথিবীর এই নিয়ম।

হোসেন মিঞা মনে মনে বড়োই ঘেন্না করে এই সামন্তদের। তাদের হাঁটা-চলা, ওঠা-বসা, চাল-চালিয়াতি, খাওয়া-দাওয়া; তাদের ইয়ার-দোস্ত সবকিছুকেই।

কিন্তু হোসেন কি আর কইরতে পারে! যাকে বা যাদের দিল থেকে পেয়ার না করতি পারে, যাদের "লিয়াকত"কে "সাহী" বলে না মানতে পারে তাদের জন্যে পেয়ার ইজ্জত তো দূরস্থান, তাদের উপরে এক ধরনের "ভড়াস"ই জন্মে যায় আস্তে আস্তে নিজের অজানিতে। যেমন সামন্তদের উপরে হোসেনের জন্মেছে।

দূর থেকেই দেখতে পায় হোসেন মিঞা যে, সারেং মিঞা বসি আচে পির-সাহেবের কাছে। "মাজার"এর পাশে। ডিঙ্গি নিশ্চয়ই উল্টোদিকে বেঁইদেচে, নইলে দেকাই যেত।

বহুদিন পরে দেখা হবে সারেং মিঞার সঙ্গে। শেষ দেখা হয়েচেলো গত চৈত্রে। সোঁদরবনের দিকে রওয়ানা হতেচিল সে। একন তাকে দেখামাত্তরই উত্তেজিত বোধ করছে হোসেন। বুকের মদ্দি ম্যাদা মেরে থাকা রক্ত ধড়াস-ধড়াস করে উথাল-পাথাল করতিচে বুককে। মনে হতিচে কিছু একটা ঘইটবেক লিশ্চয়ই আজ।

এই সারেং মিঞাই একদিন বইলেচেলো হোসেনকে যে, ইনসান "মোত্তাকাব্বের" অর্থাৎ অহংকারী হালে, তাকে এড়িয়ে চলবে। "ঘামণ্ড" বা গব্ব যার মধ্যে এইসে গেচে, তার পতন অনিবার্য।

এত কতা সামন্তদের সম্বন্ধে হোসেনের মনি যে হতিচে তার কারণও আচে। কারণটা এমন কিছু লয় যে, সে ব্যাখ্যা করি বলতি পারে। কিন্তু কারণ অবশ্যই আচে।

সে কোনদিনই সামন্তদের ভেড়িতে চাকরি করেনি, এটা ঠিক। কোনরকম মদতই নিতে চায়নি তাদের কাছে। তবে একবার তাদের ভেড়ির ঝাঁকি পরিষ্কার করার জন্যে অনেকের সঙ্গে সে-ও দিন-দশেক দিনমজুরি কইরেচেল। তখনই দেইকেচেল সামন্তদের খুবই কাছ থেকি।

হোসেনকে যা ব্যথা দিয়েছে, তাজ্জুব করেছে; তা সামন্তদের বেওয়াকুফি। বাঁদরের মতো স্বার্থপরায়ণ কতগুলো "না-কাবিলে-এহ্‌তে-রাম" মানুষের হাতের খেলনা হয়ে রয়েছে নদে সামন্ত আর ফদে সামন্ত। তাদের "গালত ইলম" এরই জন্যে। তাদের মোসাহেবরাই তাদের চোখ, তাদের নাক; তাদের কান। তাদের নিজস্বতা পুরোপুরিই হারিয়ে ফেলেছে তারা পয়সা আর ক্ষমতার "তামার" শিকার হয়ে। প্রতিদিন মাছ কত বিক্রি হল আর কত টাকা ঢুকল ঘরে, তারই হিসেব করে খুশিতে ডগমগ থাকে তারা। মাঝে মাঝে ভেড়ির পর ভেড়ির জলের দিকে চেয়ে থাকে উদাস চোখে। ভাবে, জলের তলায় কত মাছ খেলে বেড়াচ্চে। সেও তো টাকাই। ড্যাঙায় তুললেই টাকা। জীবন্ত টাকা।

সারেং মিঞাই বইলেচেল একদিন হোসেনকে, "কোই ইনসান কি গোলামি মাত করনা। আল্লাহ হর চিজ কা মালিক হ্যায়। আল্লাহ তামাম সিকত্‌কা মালিক হ্যায়।"

মানে, কোন মানুষেরই দাসত্ব কোরো না কখনওই। গোলামীই যদি করতে হয় তো শুধু আল্লাহরই গোলামি করবে। কারণ, আল্লাহ্‌ই সমস্ত গুণের মালিক, আল্লাহই প্রতিটি জিনিসের মালিক। আর সব সময়েই মনে রাখবে যে, "কায়েনাত মেঁ এক নেয়াম হ্যায়।" বিশ্বভুবন একই শৃঙ্খলা বর্তমান বা বিদ্যমান আছে। কোনো মানুষের সাইধ্য কি যে তা ভাঙে। সে, বা তারা যত বড়ো ক্ষেমতাধরই হোক না কেন!

পিরসাহেবের ড্যারায় পৌছে হোসেন সালাম করে বলল, আসসালামো আলায়কুম।

সারেং মিঞা ফিশফিশ করি বলল, ওয়া আলায়কুম আস-সালাম।

আচেন ভালো তো মিঞাসাহেব?

হাঁ। আল্লার ফজল-এ ভালোই আচি।

বহুদিন তো দেকা নাই। আপনার কত গল্পই যে পিরসাহেবের কাচে শুনি। আমারে নিয়ে যাবেন কি এবার আপনার সঙ্গে সারেং মিঞা?

হোসেন মিঞা একথা বলতেই পিরসাহেব সারেং মিঞার চোখের দিকে তাকালেন।

আশ্চর্য এক হাসি ফুটি উইটলো ওর মুকে।

কী হইয়েচে?

হোসেন শুধোল।

পিরসাহেব গলা খাঁকরে বললেন, না, এই একটু আগেই সারেং মিঞা বইলতেচেলেন যে এক্কেবারে একা নির্জন পেরকিতির মদ্দি মাসের পর মাস, বছরের পর বছর থাকতি থাকতি মাঝে মদ্দি পাগল-পাগল নাগে। আল্লাহ সবসময়ই সঙ্গে থাকেন যদিও। তবু মিঞা নিজে তো মানুষ! সময়ে বিয়ে করলে তার লড়কা এতদিনে জওয়ান হয়ে যেত, পেরায় তোমারই মতো বয়সি হত। একজন সঙ্গীর তার দরকার। সময়ে কী বা অসময়ে কী, সারেং মিঞা তো বিয়েই করল না। এবং...

এবং কি?

এবং এও বইলতেচেলো সারেং মিঞা যে, আজই সেই সঙ্গী আইসবে। সে সঙ্গীকে সঙ্গে করে নে যাবার জন্যেই এবারে হোড়োডাঙা হয়ে, গোসাবা হয়ে, নওবাঁকির খাল পেরিয়ে, মাতলা বেয়ে, নালা দিয়ে, বাদা বেয়ে এখানে এসে পৌচেচে সারেং।

হোসেন মিঞা চুপ করে চেয়ে রইল সারেং মিঞার দুচোখের দিকে।

কিন্তু সারেং মিঞা নির্বাক। কোনো বাক্যি নেই মুকে। সেই দুটি চোখ। দু চোখে একবার সকাল, একবার রাত, একবার মেঘ, একবার রোদ্দুর। সামুদ্রিক সাদা পাকি উড়তিচে ঝাঁকে ঝাঁকে সেই দুটি চোখের মদ্দি। তাদের গায়ে নোনা গন্ধ। সেই পাকিদের ডানার উজ্জ্বল সাদা পর্দা সরি যেতেই এবারে কালো ছায়া নেইমে এল। পানকৌড়ি উড়চে। চোখের মণির ভেতরে বাদা-বিলে পানকৌড়ি। কালো।

বাড়িতে কি বলে আসব ইকবার?

হোসেন মিঞা হাসল। তাও আধফোটা হাসি। ঠোঁট দুটো ফাঁক হল না। শব্দও হল না কুনো।

হোসেন বলল, জামা-কাপড় নিতি হবে তো কিচু। অন্তত আরেকটা লুঙ্গি। গামছা একটা?

সারেং মিঞা তার মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে আইসতা আইসতা বলল, যে আদম সংসার ছাড়ে সে চিরদিন এক কাপড়েই ছেইড়েচে। লুঙ্গি গামছা গুচিয়ে নিতে যারা ঘরে গেচে তাদের পতে বেরুনো আর হয়নি কোনোদিনই।

বলেই বলল, তুমি তো ছেলেমানুষ হে হোসেন মিঞা। তুমি আমার সঙ্গে যাবে কেন? গেলে যে ফিরতে পারবেই তেমন কোনো স্থিরতা কিন্তু লাই। এ কথা পোস্কার করে তোমাকে বইলে দেওয়া দরকার।

হোসেন বলল, সেই ছেলেবেলা থেইকেই আমি বুইজতে পারি যে, আমি পথেরই, সংসারের লাই। সঙ্গে আল্লাহ থাকলিই হল। আর আপনে।

আপনে বলো নি বলো তুমি। আমরা বন্দু। তারা, চাঁদ, সূর্য, সমুদ্রর বন্দু আল্লাহ্‌র সেবক।

একটু থেমি সারেং মিঞা পিরসাহেবকে বইলল, তবে যাই পিরসাহেব? ইজাজত দিন।

হোসেনকে বলল সারেং মিঞা, ঘাড় ঘুরিয়ে; আরেকবার ভেবে দ্যাকো। পরে আমাকে দুষো না। আমার সঙ্গে গেলে, মানে আমি যিখানে যাব, সিখান থেকে একা ফেরত আসতি পারারও কোনো সম্ভাবনা লাই। মনে থাকে যেন। ফেরত যে আসবেই তারও কোনো ওয়াদা দিতে পারি না।

তারপর কী মনে করে বলল, আচ্ছা, যাও তুমি। তোমার রিস্তাদারদের সঙ্গে একবার দেখা কইরেই এসো। আব্বাজানের সঙ্গেও। লুঙ্গি-গামছা, জামা-চিরুনি নিতে চাও তো তাও লিয়ে নিয়ো। এই রাতটা তোমাকে দিলম। সংসার তোমাকে রাকে, না তুমি আমার সঙ্গে যাও, তা আল্লাহ্‌ই ঠিক করবেন। তুমি আমার সঙ্গেই যাবে। ইন্‌শাআল্লা। যাও।

খুদাহ হাফিজ।

৩

হেসেন মিঞা যখন বাড়ি ফিরল, তখন পশ্চিমে সূর্য হেলেছে। আব্বাজান দাওয়াতে বসে হুঁকো খাচ্ছেলেন। মামুজানএর হঠাৎ মৃত্যুটা তাঁকে বড়োই বেজেচে।

আম্মী!

কে রে? হোসেন? আমি চমকে গেচিলাম। এ কী! তোর চোখ মুখ এরকম হয়েছে কেন? মোতাহার বলছিল যে, গোরস্তানেই তোকে ইরকম দেখাচ্চেল, কোতায় গেছিলি?

পিরসাহেবর কাছে।

কেন?

এমনি।

হোসেনের আম্মী নুরজেহানের হোসেনকে নিয়ে চিরদিনই দুর্ভাবনা ছেল। এই ছেলেটা বড়ো হল কী হয় কে জানে! সংসারের পক্কে এ একেবারেই বেমানান। বড়ো দুই ছেলে তো শেয়ানা

হয়েচে। পাশেই আলাদা আলাদা বাড়ি করে বিবি-বাচ্চা মোরগা-আণ্ডা নিয়ে থাকে। আর হোসেনের ছোটো যে ভাই, সকলেরই ছোটো; সেই মোতাহারকেও বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছে কুড়ি বছর বয়সেই। দুলহীনএর নাম সিতারা। দূরছির্‌পাড়ার রমজান আলি হেকিমের মেয়ে। হুরী-পরী।

হোসেনের বয়স পঁচিশ হল। এখনও দলিল-দস্তাবেজ, দাগ, খতেনএর নম্বর, চাষবাসের হিসেব, কী মাছ ধরার কায়দাও রপ্ত করতে পারল না। নিজের মনে ঘোরে ফেরে, গান গায়। আর যত বখা আদমির সঙ্গে দোস্তি। অপু আর নিতে। মোদো-মাতাল। ওদের অন্য দোষও আছে। এই গেরাম-গঞ্জর বড়োলোকের ব্যাটা সব। মনসুর মিঞা তো আর বড়োলোক নয়! চলে যায়, এই আর কী!

হোসেনকে খরচের খাতাতেই ধইরে রেখেছে মনসুর মিঞা। মোতাহারের চোখে মুখে বুদ্ধি। বিষয়ী খুবই সে! কত সারে, কত বীজে কোন ফসল কীভাবে তুলবে? কত বিঘা ভেড়িতে কত মাছের চারা কোন সময়ে ছেড়ে, কোন সময়ে ধরবে? গোরু-বলদের লক্ষণ চিনে, তাদের কেনা-বেচা। ওয়ালেদায়েনের দেখাশুনো করা, তাঁদের এহ্‌তেরাম করা; সবকিছুই সে করে। লায়েক হয়েছে সেই, যদিও বয়সে ছোটো। হোসেনের উপরে, তার খামখেয়ালিপনা, তার "জুনুন", মানে, পাগলামি এবং সাংসারিক-জাগতিক কোনো ব্যাপারেই মন নেই বলে, মনসুর মিঞা অত্যন্তই অসন্তুষ্ট।

সেই অসন্তুষ্টি দিনে দিনে বাড়চেই।

এ কতা আম্মীজানও জানে। জানে বলেই, হোসেনকে বেশি করে ভালোবাসে। আগলে আগলে রাকে।

হোসেনও জানে এ কথা।

মোতাহার এখন থেকেই বলতে আরম্ভ করেছে যে, অযোগ্য ছেলেই মা-বাবার আদর বেশি পায়।

আম্মীজান একই সঙ্গে আরও অনেক অনুযোগের কথা বলতে শুরু করে। কোনো কারণে, তার মেজাজও খুবই খারাপ চেলো।

হোসেন আর কথা বাড়ায় না। সারাদিনে খায়নি কিচু। পুকুরে ডুব দিয়ে আসবে বলে লুঙি-গামছা নিয়ে এগোয়। মানুজান এই দাওয়াতে এই সময়ে গতকালও বসে হুঁকো খেইতেচেল। আজ সে লাই। এই হচ্ছে আল্লার দুনিয়া।

হাঁসগুলো প্যাঁক প্যাঁক কইরতে কইরতে তখন হেলতে-দুলতে বাড়িতে ফিরচিল। ছোটো বোন আয়েষা হাঁসেদের, তাদের ঘরের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্চিল। সূর্য মগ্‌রীবে ডুবে যাচ্ছে। হিঁদু বাড়িতে তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বলেছে। শাঁখ বাজছে। মাদার গাছের ডাল থেকে একজোড়া বড়ো ঘুঘু উড়ে গেল। নিমগাচে ফুল এসেচে। হাওয়ায় দোল খাচ্চে পাতাগুলো। হোসেন পুকুরের জলে নেমে কান অবধি ডুবিয়ে দিল নিজেকে। বসন্ত-বৌরি ডাকচে উমের মিঞাদের বাড়ির কনক চাঁপা গাছটো থেকি।

একটু পরেই অন্ধকার নেমি আসবে। কালকে সকালে মাশরিক্‌এর আকাশ লাল করে যে সুরাজ উটবে, যে দিনকে পথ দেখিয়ে লিয়ে আসবে, সে অন্য এক দিন। হিঁদুর বামুনদের মতো হোসেনেরও পুনর্জ্জন্ম হবে।

হোসেন ভাবচেল, ঘর ছেইড়ে গেলে, আম্মীজানের সরল, পবিত্র, চিন্তিত মুখটির কথাই মনে পড়বে বারবার। আর কারো জন্যি কুনো দুঃক নেই হোসেনের। আম্মীজানকে নিজের রোজগারে একটি শাড়িও কুনোদিন কিনে দিতে পারেনি যে, এই তার একমাত্র দুঃক।

ছোটো বোন আয়েষাও তাকে ভালোবাসে না।

ভালোবাসা কারো কাছ থেকিই পায়নি। ভালোবাসার জন্যে কোনো কাঙালপনাও নেই তার। ছিলও না কোনোদিন। কিন্তু আকাশ বাতাস জল বিল চাঁদ সূর্য তারা, অন্দকার, আলো এসবের মদ্দিই একধরনের আশ্চর্য ভালোবাসার স্বাদ পায় হোসেন। এই ভালোবাসাটা ঠিক যে কী, তা সে বোজে না। কিন্তু তার স্বাদ বড়োই গভীর। সেই ভালোবাসাতে মজেই তো ঘর ছেড়ে সে বাইরে ছুইটেচে। কাল, ফজিরের আজানএর সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেইড়ে যাবে। মাশরিকএর আকাশ যখন লাল হয়ে উটবে, ও তখন উঁচকপালি মদনটাকির দ্বীপে।

৪

অন্ধকার থাকতি বেইরে ওরা যকন ডিঙি বেঁইদেচে বাসন্তীর ঘাটে, তকন হটাৎ দেকা হয়ি গেল চার দাঁড়ি এক হাল্এ বাওয়া এককানি ফাস-কেলাস চাপা বজরার সঙ্গে।

হঠাৎই ছই-এর নিচ থেকে বেরুল সামন্তদের বড়ো তরফের একমাত্র ছেলে নেমাই সামন্ত। ধবধবে পাজামা আর ছিল্কের পাঞ্জবি পরনে। মাতায় জবজবএ করে গন্দ তেল মেইকেচে। গলায় সোনার হার ঝুলতিচে। হাতে সোনার হাতঘড়ি। দামি চিগরেটের পেকেট। ঝিং-চ্যাক সোনালি লাইটার।

নেমাই নিজে একটা ছাগল। কিন্তুক পয়সা আচে। তাই কোন্ভেন্ট ইশকুলএর ইঞ্জিরি-জানা মেমসাহেব ভাবের মেয়ে বিয়ে করে নিজেও পাকা সাহেব হইয়ে উইটেচে। মানে বুজুক আর নাই বুজুক, সব্বোসময়ে হাতে থাকে ধরি এককানি ইঞ্জিরি নবেল। ইঞ্জিরি ছাইনবোড পড়তেই যার দাঁত ভেইঙে যেত এই সেদিনও সিই এখন ছায়েব হইয়েচে। টাকা আর খ্যামতা থাকলি দুনিয়াতে সকলকেই ডন্টু-কেয়ার করা যায়। যা ইচ্ছে তাই হওয়া যায়। ঠ্যাকায় কোন শালা! সুধু হাতি মানুষের মাতা কাটা যায়।

বাবু, বেরুতে না বেরুতেই বাবুদের দুটো বাঁদরও বেইরে এল ছইয়ের নিচে থেইকে। যেন দুটো এঁড়ে বাকুলএ এসে উঠল খোঁয়াড় থেইকে।

সামন্তবাবুদের বড়োই বদব্বেস হইয়ে গেচে। বাঁদরদের ছেইড়ে, এঁড়েদের ছেইড়ে কুতাও এক পাও নড়তি পারেন না তাঁরা। মোসায়েবির বড়োই ভক্ত হইয়ে পইড়েচেন।

একটা বাঁদর বেঁটে ও মোটা। চেহারাতেই মালুম দেয় যে, ইটি হচ্ছেন গিয়ে যাকে বলে, পালের গোদা। যত বদবুদ্ধির গোড়া। নীচ, ইতরজনের চাঁই। ইদিকে মুখ দেখলি মনি হয়, যেন ভাজা মাচটিও উলটি খেইতে জানেন না। মোটা বাঁদরের সঙ্গে একটি রোগা বাঁদর লম্বা। ফ্যাকাশে। চোর-চোর চেহারা।

পেরকিতো বাঁদরদের তবু কিছু আত্মসম্মান থাকে। এই দুপেয়েগুলোর সি সব বালাইও লাই। চেহারাতেই শুধু মানুষ। সি সবসময়ই মালিকের সামনে হাতজোড় করি বসি থাকে। আর মালিকের পেতিটি বাক্যির পর "হাঁ স্যার! হাঁ স্যার! স্যার! স্যার!" কইরে যায় সমানে। ভেড়িতেও দেইকেচে এদের হোসেন মিঞা। এরা সব ঘাঘু মাল হতিচেন। বাবুদের মোসাহেব। ছেলে বেইরেচে, তাই দেচেন তার সঙ্গে ফিট করে।

হঠাৎ নেমাই সামন্ত হোসেনকে চিনতে পেরে বলে উঠল, কে ওটা? আরে এ মনসুর মিঞার পো লয়? ইকানে যে! সকলিরই ইড়ভিঞ্চারের সর হল দিকি!

হোসেন মুখ তুলে চাইলো বটে বাবুর দিকে। তবে কতা বলল না। কী-ই বা বলবে! সি কুনো বাবুরই চাকর লয়। ভাবল, "ইড়ভিঞ্চার" কি সুদু বাবুদেরই একচেটে?

নেমাই সামন্ত হাসল। বাবুদের ধন্যি-করা হাসি। টিপেকাল।

মোটা বাঁদর বলল, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। তাই তো দেক্‌তিচি।

খুবই গুমোর দেকচি যে গো! আমি কত্তা হইয়ে কতা কইলাম যেইচে। আর এত জবাবে কতাই কয় না দিকি!

রোগা বাঁদর বলল, তাই তো! তাই তো! দিমাক হইয়েচে। বিস্তর দিমাক। কিন্তু কিসের দিমাক?

বলেই, গলা তুলে বলল, এই যে! মনসুর মিঞার পো! তুমার নাম হোসেন লয়? কথা বইলতেচ না কেনে? দেইকতিচো না, ছোটোবাবু তুমাকে চিঁইনেচেন?

আমিও চিঁইনিচি তেনারে। কিন্তুক কতাটা বলার কি আচে? কী বইলব?

পেন্নাম কর হারামজাদা। বেশি প্যাট-প্যাট করবিনি।

বাবু, জিভ তালুতে ঠেইকিয়ে টাক কইরে একটা শব্দ কইরে বললেন, আঃ। মুখ খারাপ কথা কেন? অ্যাঁ?

হোসেন ভাবলো, আসল হারামজাদা যারা তারা ককখনো মুখ খারাব করে না। তারা হাইসতে হাইসতে চইলে যায়। তারপর পেচন থেকি অন্দকারে ছুরি মারে।

এবারে সারেং মিঞা কতা বলল, মাথা উঁচু করি, ঘাড় সোজা করি বইলল, যারে তারে পেন্নাম করি না আমরা। খুদাহ ছাড়া কাউকেই সালাম করি না। অন্য করোই খিদমতগারি করি না।

বাবাঃ! এ কে রে? বড়ো গরম দেকি।

ঘেবড়ে গিয়ে বড়োতরফের ছোটোবাবু বইলল।

যাকে তাকে! যাকে তাকে! যাকে তাকে?

মোটা-বেঁটে বাঁদর বলল।

রোগা বাঁদর চিঁ-চিঁ করে বলে উঠলো, তাই তো। তাই তো। টিক্ টিক্ টিক্। যাকে তাকে? কী আস্পদ্দা!

নিমাই সামন্ত বলল, এ ছোকরা দেখি মানুষের মম্ম বোঝে না। আমার কি দায় পইড়েচেল রে ওর সঙ্গি কতা বলতি? চেনা-চেনা ঠেইকেচেল, তাই ভাবনু, এক গেরামের মানুষ, কোন দরকার-টরকার যদি থাকে তো!

সারেং মিঞা বলল, আমাদের আপনাদের ঠেঙ্গে কুনোই দরকার লাই বাবু। কিচুমাত্র চাওয়ারও লাই। আপনারা যে বাঁদরের চাষ কইরতিচেন এঁড়ের চাষ কইরতিচেন, মাছের চাষের সঙ্গি, সেই বাঁদরদের দুধে-ভাতে রাখলিই আপনাদের মান বাড়বে। গুমোর বাড়বে। সুদুমুদু আমাদের জন্যি কিচু কইরতে যাবেনই বা কেন? চাওয়ার যেমন লাই আপনাদের কাছে কিচু আপনাদের দেওয়ারও কিচু লাই।

তারপর বলল, বাবুদের যাওয়াটা হচ্চে কুতা?

সারেং মিঞার কতা-বাতরা নেতাই সামন্তর কানে বিশেষ ভালো ঠেকল নি। মনে মনে ভাইবলেন ভেড়ির লেবারদের খচ্চর নেতার মতো কতা কয় মনি হয়। উনিয়নের লিডার নয়, তারাও তো মাইনে-করা চাকর বাবুদের! মানুষটার অতীত নিয়ে এট্টু খোঁজ লাগাতে হবে।

এই! একটু ইড়ভিঞ্চার করতি। সোঁদরবনের বাঘেদের ছবি তুলব।

সারেং মিঞার প্রশ্নের উত্তরে বাবু বইললেন।

তা বাগচিবাবুদের লঞ্চি করিই যান না। আপনারা বড়োনোক। তেনাদের সঙ্গে জানাশুনো থাইকবে লিশ্চয়।

না। আমার এমন আস্তে আস্তে যেতিই ভালো নাগে।

তা সোঁদরবনের ভেতরে ভেতরে গেলি তো বাঘে খাবে আপনাদের।

বাঁদরেরা বলল, বাঘ? বাঘের ঘাড়ে কটা মাতা? সামন্ত কোম্পানির বড়ো শরিকের একমাইত্র পুইত্রকে খেয়ে কি শেষে হজম করতি পাইরবে? বদহজম হইয়ে মরবে যে। সি যে বাঘই হোক না কেন।

বাঘ!

মোটা বাঁদর বলল।

হাঃ। বাঘ।

রোগা বাঁদর বলল।

হিঃ।

আমার কাছে কুড়ি হাজারি ডিবি বিএল বন্দুক আচে। ইস্‌প্যানিশ।

বাবু বইললেন।

পেরথমত বিনা পারমিটে বন্দুক নিয়ে যেতিই দেবে না। দ্বিতীয়ত বাঘ তো আর বন্দুকের দাম জানে না। আর বন্দুক থাকলিই তো হয় না বাবু, চোট করতিও জানা চাই। বন্দুক নিয়ে যেতিই দেবে না আপনাকে। পারমিট আছে কি? শিকারের?

বড়ো বাঁদর বলল, বাবু জানেন না? বন্দুক চালাতে? কী জানেন না বাবু? তোরা কী ভেইবেচিস আমাদের বাবুকে?

ছোটো বাঁদরও বলল, বাবুও জানেন না এমনকী বস্তু আচে পিরথিবীতে? কী থাকতে পারে? অ্যাঁ? গান-বাজনা, কেলা-দুলো; শিকার, কী?

দেকাই যাক।

এবারে বাবু বইললেন।

তালে দেকুন। খুদাহ হাফিজ্!

বলল, সারেং মিঞা।

বলেই, সি ঘাট থেকি নৌকো খুলে নে' বাবুদের নৌকো থেকি অনেক দূরে নে গিয়ে ভিড়ল।

হোসেন শুদোল, নৌকো খুইলে চইলে এলি কেন সারেং?

ওরা মানুষ ভালো লয় হে হোসেন মিঞা।

কী কইরে বুঝলে?

খারাপ মানুষ নিকটে এলেই আমার নিশ্বাসের কষ্ট হয়। কোনো একটা ব্যাপার ঘইটে যায় ভেতরে ভেতরে আমার। তরঙ্গ ওটে হয়তো হাওয়াতে। বুকের মধ্যি চাপ, কষ্ট বোধ করি আমি। যেসব মানুষ চেহারাতিই মানুষের মতো দেখতি অথচ মানুষের স্বভাব যাদের লয়, তাদের ঠেঙ্গ দূরে থাকাই ভালো। বাবুটো মানুষ খারাপ লয়। তবে বোকা। এক্কেবারেই বোকা। পয়সার গরমে জন্মান্ধ বাবুটাকে তাও সহ্য করা যায়। কিন্তু একেবারেই অসহ্য ওই বদ, ইতর; খল বাঁদর দুটো। মানুষের রাজ্য ক্রমে ক্রমে বাঁদর ছেয়ে ফেইললে গা!

হোসেন বলল, এ কী পুলিটিকাল পার্টিগুলানের বাড়বাড়ন্তের জন্যিই হল।

হো হো করে হেসে উঠল সারেং মিঞা।

বইলল, আমাকে বইলেচ বইলেচ, অন্য কাউকে বইলো না মিঞা। তোমাকে যা-তা বলবে। এমন গাধার মতো কতা কক্‌কোনো বইলো না। বোকা মানুষ আমি দুচোখে দেখতে পারি না। তবে অবশ্য তারা পাজি মানুষের চেয়ে ভালো।

এট্টুখন চুপ মেইরে থেইক্যে সারেং মিঞা বইলল, তবে কী জানো, এই বাবুর মতো মানুষ আর তার চাকরেরা কোনোদিনও আল্লার দোয়া পাবে না। এদের দোজখ্‌এ পচতে হবে। এ দুনিয়াই যে

একমাত্র দুনিয়া লয়, জিন্নতও আছে, জহান্নমও আছে, এ কথা বোধহয় এরা জানে না! আল্লার কাচে হিন্দু মুসলমান কেরেস্তান নেই। ভালো মানুষ আর খারাপ মানুষ। ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষ আর অবিশ্বাসী মানুষ এই দুই ভাগ। যে বড়োলোক সৎ-অসৎএর বিচার করে না, যে-মালিক যোগ্যতার বিচার করে না, নিজের মোসাহেবি করার জন্যে বাঁদরদের কাচে টানে আর মানুষদের দূরে ঠেলে, তারা নিজেদের কাচের স্বর্গেই একদিন ছাদ-চাপা পড়ে মরে। নিজেরা মরবার আগেই সবকটা বাঁদরই ছেড়ি চলি যাবে এমন মালিককে। আখ্‌রতেরদিনে সবই বুঝতে পাবে। কিন্তু বড়ো দেরি হয়ে যাবে তকন। জান যকন বেরুবে, তকন মুকে পানি দেওয়ার একজনও রইবে না কাচে।

হোসেন বইলল, ছাড়ো মিঞা, ওদের কথা ছাড়ো। অন্য কতা বলো। আল্লার দুনিয়াতে "যেইসি কর্‌নি, ওইসি ভরুনী"। ওরা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারচে, আমি তুমি ঠেকাব কী করে। ইত্তেফাকান একদিন সবই বুইজবে! সবই পরিষ্কার হবে তাদের চোকের সামনি। তবে হয়তো অনেকই দেরি হইয়ে যাবে তকন।

হোসেন পাটাতনের উপর গামছা পেতে ইশার নামাজ পড়ে নিয়েছিল। ভাত আর ডাল আর একটু আলুর তরকারি দিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিল ওরা। সারেং মিঞা নামাজ পড়ে না। কেন পড়ে না, তা জিজ্ঞেস করলে বলে, তোমরা তো অনেকবারই পড়ো দিনে রাতে, আমি পড়ি হরওয়াক্ত।

নামাজ না পড়লি আল্লা গুস্‌সা হবেন না?

না। আমার উপর হবেন না।

সারেং মিঞা যখন কোনো কতা বলে তখন তার দুটি চোখকে আত্মবিশ্বাস উজলা করে তোলে। তার চোখে চেয়ে তার কথার উত্তরে কোনো কথাই বলা যায় না। সারেং মিঞা সাধারণ মানুষ যে লয়, তা বোঝে হোসেন! সাধারণ মানুষ হলি তার আকর্ষণে এমন করি ঘর ছেড়ে বেরোনোও সম্ভব হত না হোসেনের পক্ষে।

খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়ে পড়ল পাটাতনের একদিকে সারেং মিঞা। অন্যদিকে হোসেন। কৃষ্ণপক্ষ সবে শুরু হয়েছে। চাঁদ ওটে। তবে দেরিতে। রোজই একটু একটু করে দেরি বাড়বে। তাপ্পর অমাবস্যাতে পৌঁছে আর সে রাতে উটবেই না।

ফরসা হবার আগেই ফজিরের নামাজ পড়ে একটু মুড়ি আর গুড় দিয়ে নাস্তা করে ওরা বেরিয়ে পড়ল। গোণ-বেগোণ দেখে দাঁড় টেনে টেনে ককনও বা পাল তুলে দিয়ে হাওয়ার তোড়ে ডিঙি ভাসিয়ে এইগে যাবে। বেলা এগারোটা নাগাদ সূর্যর দিকে তাকিয়ে বেলা বুঝবে ওরা, নদীপারের কোনো বড়ো গাছের ছায়াতে নৌকো নোঙর করে রান্নার বন্দোবস্ত করবে।

সারেং মিঞা বলচেল সোঁদরবনের ভিতরে পৌঁছে নানারকম মাছ, কাঁকড়া, কাছিম ধরে খাবে। যতক্ষণ বাইরে বাইরে আচে, জেলে-নৌকোর কাচ থেকে মাছ পেলে মুঠিভর মাছ কিনে নেবে। এরপর একবেলা খিচুড়ি। অন্যবেলা উপোস, নয়তো একটু মুড়ি-চিঁড়ে।

নৌকোতে এক বস্তা মোটা লাল চাল নিয়েচে সারেং মিঞা। নুন, তেল, হলুদ, লংকা, প্যাঁজ, রসুন। ডাল নিয়েছে মশুর আর মটর। আলু নিয়েছে। আলু-প্যাঁজই সব। "খাদ্য-খাদকের ইকিনে বড়োই অভাব।"

বন্দুকটা তুমি পার করবে কি কইরে সারেংচাচা?

দেইকবে। দেইকবে। পারমিট ছাড়া নৌকো নিয়েও তো কাউকে ভেতরে যেতি দেয় না। চেকপোস্ট আছে। পিটেল বোট আছে। তবে আমরা এমন এমন নালায় আর খালে আর ট্যাকে, বালিতে পাশ খালে, শিষ খালে বা সুঁতি খালে থাকব যে, ফরেস্ট ডিপার্টের বাবাও ধরতি পারবে না। আমাকে সকলেই চেনে। আমি যে পুরোনো পাপী। তাছাড়া...

এট্টু থেমে সারেং বলল, আমাদের ধরবে কি কইরে? আমরা যে আল্লার খিদমতগার। এমন রাত্তের আঁধারে ঢুইকে যাব ভেতরে, যে বুঝতেই পারবে না কেউ। তাপ্পর এট্টু এগিয়ে ঢুকে পড়বো শিব খালে। সেই সব খালে পিটেল বোট যাবেই না। আর যদি ডিপার্টের লোক ছোটো বোট নে ঢুকবার চেষ্টা করে তবে নির্ঘাত মরবে বাঘের পেটে। বাঘেরাই আমাদের পাহারাদার কুকুর হবে।

আমাদের বাঘে খাবে না? খাবে না, কেন?

আরে বনবিবি যাদের সহায়, সহায় বাবা দক্ষিণ রায়, তাদের বাঘে খাবে কি? দেখবে দোস্ত, দেকবে, সেইসব লীলাখেলা। জয় বনবিবির জয়! বড়খাঁ গাজির জয়!

সোঁদরবনের ভিতরে একন আমরা একাই থাইকব নাকি?

একন একা লয়। একনও তো নৌকো ঢুকচেই। পারমিট নিয়েই ঢুকচে। এ শিকার করার পারমিট লয়। মাছ ধরার, কাঠ কাটার, মধু পাড়ার। সজনেখালি থেকে পাশ নিতে হয় ওদের। বর্ষা নামতে এখনও ঢের দিন বাকি। এই গরমের সময়েই তো সোঁদরবন একেবারে গমগম করে নৌকোতে আর মাঝিতে। বড়ো বড়ো গয়নার নৌকো করে কাঠ কাটতে আসে মেদিনীপুর এবং অন্যান্য জিলার মানুষে। গোলপাতার নৌকো। শীতেও অবশ্য আসে। আর বড়ো মিঞারা তখন জিভ দিয়ে গোঁফ চাটে। এই এক অন্য জগৎ হোসেন। কোলকেতার এত কাচে সোঁদরবন অথচ কলকেতার মানুষে কিচুই জানে না এই বনবাদ্য সম্বন্ধে।

কি কাট কাইটে সারেং চাচা?

কী নয়, তাই বলো।

সুঁদরি গাছ আচে সুন্দরবনে, তাই লয়?

আচে। তবে বেশি লাই। আসল সুন্দরবন তো পইড়েচে বাংলাদেশে। খুলনে আর বাকরগঞ্জ সাবডিভিশানে। সিখানেই সুঁদরি বেশি।

ইদিকি কি গাছ আচে?

কত্ত গাচ। কত্তরকম গাচ। চেনাব তোমাকে। সব চিনিয়ে দেব। গরান, হেঁতাল, সাদাবানি, ক্যাওড়া, গোলপাতা, বাইন, আরও কত্ত। কত পাতা, কত লতা, কত মাছ, কত স্যালামান্ডার, কত সাপ, কত কীড়ে-মাকড়ে।

আচ্ছা সারেং মিঞা, তুমি কতায় কথায় এমন সব উর্দু শব্দ ব্যবহার করো, যার মানে বুঝি না আমি। কই? আমরা বিতিচি গেরামের কোনো মুসলমানই তো অমন করি না। এমনকি ঘুটিয়ারি শরীফেও গিয়ে দেকিচি, সেকানেও করে না। হাড়োয়া, মসলন্দপুরে, কোতাও লয়।

উর্দুটা দেইখলে কোতায়? স্যালামান্ডার তো ইংরিজি কতা।

তাই? মানে কি সেই ইঞ্জিরি কতার?

ছোটো ছোটো মাচের মতো। উভচর প্রাণী। ভাট যখন দেয় তখন প্যাচ্‌প্যাচে কাদার মধ্যে চলে। আর যখন জোয়ার আসে, জলে পড়ে হাইর‍্যে যায়।

তাই?

হোসেন মিঞার চোখ দুটি বড়ো বড়ো হয়ে ওঠে ঔৎসুক্যে।

তবে হ্যাঁ। তবে কীড়ে-মাকড়ে শব্দটা উর্দুই! আরে মিঞা, আমি যে বিহারেই কাটিয়ে দিয়েচি জীবনের তিন ভাগের দু ভাগ। নামেই আমি বাঙালি।

হোসেন বলে, আমরা তো বিলে-বাদাতেই ডোঙা চালাই। তাও তালের ডোঙা। তুমি বড়ো নদীতে ডিঙি নৌকো চালাতে শিকলে কি কইরে? পাল টাঙাতে, গুণ টানতে, এই ভীষণ স্রোতের মধ্যে হাল ধইরতে?

আরে আমি যে পাটনাতে ছিলম। কত বড়ো গঙ্গা সিখানে। কোম্পনির মস্ত স্টিমার এপার-ওপার করাত যাত্রীদের। মস্ত চর ঘুরে। আর আমি পারাপার কইরতাম আমার ডিঙি

নৌকোতে। বর্ষার সিই গঙ্গার রূপই আলদা! উত্তরের বিহার আর দক্ষিণের বিহারের মধ্যে ওই নদী পড়ে। একন অবশ্য নদীর উপরে ব্রিজ হইয়ে গেচে।

কী করতে তুমি সিখানে?

হোসেন উৎসুক গলায় শুধাল।

স্টিমার-ঘাটায় ধুলিয়ানের বাচ্চা বাবু ছেল। টকটকে সাহেবের মতো রং গায়ের। তাঁর দু-দুটো স্টিমারও ছেল সিকানে। তাঁরই কাছে কাছ কইরতাম। স্টিমারেও কাজ কইরেচি। বাষ্পে চলে সি স্টিমার। ইয়া পেল্লায় কয়লার উনুন। তার উপরে আরো পেল্লায় কেতলির মতো বয়লার-এ জল গরম হয়। আর সেই বয়লার থেকে বাষ্প বেরোয়! সেই বাষ্পই ঘোরায় স্টিমারের মইসতো মইসতো কাটের চাকা সেই চাকাই তো জল কাটে।

কাটের চাকাতে জল কাটে?

নালে আর বলতিচি কি? পুরোনো জীবন ছেইড়ে দে' নতুন জীবনে এলেই না নতুন নতুন জিনিস শিকতি পারবে।

বলেই এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সারেং বলল, তুমি কনও সার্কাসের কেলা দেইকেচ হোসেন ভাই?

হ্যাঁ। দেইকিচি।

তবে তো দেকেইচোই। ট্রাপিজের খেলাতে দেকেচ ওই উঁচুতে কেমন করে একটি দোলনা ছেড়ে দিয়ে এক লাপ দে অন্য দোলনাতে চইলে আসে খেলোয়াড়েরা? কিংবা একজনের হাত ছেড়ে অন্যজনের দুহাতে নিজের শরীরের সব ভার সঁইপে দেয়? দ্যাকোনি?

দেকিচি।

অমনি করেই একরকম জীবন ছেড়ি অন্যরকম জীবনে চলি আসতি হয় রে ভাই। তবেই না মজা!

যদি পইড়ো যাই? হাত ধরতি না পারি! তবে আর কি বাঁইচব?

হো হো করে হেসে ওঠে সারেং মিঞা। বলে, মিঞাভাই, যিখানে মরার ভয় লাই, সবকিছু হারাবার ভয়ই লাই, সিখানে লতুন জীবনে ঢুইকে মজাটা কি? আরে মওত তো আছেই! দুনিয়ার নেয়ামতে মানুষের ইন্তেকাল তো হবেই। কিন্তু জিন্দেগিটা এমন করেই বিতানো উচিত হর ইনসানএর যাতে ইনসানিয়াত জবরদস্ত হয়। নইলে, বেঁইচে থেকে লাভ কি বলো হোসেন? আদমী কথাটাই এসেছে "আদম" থেকি। আদমের জীবন থেকি নিজের জীবন যদি এট্টু অন্যরকমই করতি না পারলে তবে ইনসানএর জীবন নিয়ে জন্মে লাভ কি?

গঙ্গা লদী তোমার ভালো লাগত সারেং ভাই?

লাগত না? সব লদীই ভালো। আল্লার দোয়ার এই পৃথিবীতে কত কী কিম্‌তি চিজ্‌ই না আচে। গঙ্গার রূপ, হিন্দুরা বলে "গঙ্গামাই"; বিবিন্ন ঋতুতে বিবিন্ন জায়গাতেই আলাদা আলাদা। ওই গঙ্গা আমাদের ডায়মন্ড-হাবড়াতে একরকম, পটনাতে একরকম, বানারস-এ একরকম আবার হরদোয়ারএ একেবারেই অন্যরকম। গ্রীষ্মে তার রূপ বিবাগি। পিরের মতো তার রাহান-সাহান। আহা! নদী যেন রমজানের রোজা রেকিচে গো! কী শুখা-ভুখা কিন্তু উজলা রূপ তকন তার। আবার গ্রীষ্মের পর বর্ষা যেই এল অমনি যেন ইফতার খোলা হল, রোজা খুলল নদী। কী সে জওয়ানি, জওয়ানির কী সে খুশবু। কত শত খুশবু গন্ধ সে আওরাতএর যিসম্‌-এ। ইত্তর-ই-গিলএর সঙ্গে রাত-কী রাণী, রাত-কী রাণীর সঙ্গে ফিরদৌস, ফিরদৌস-এর সঙ্গে হিম্বা। আঃ ভাবলেও বুঁদ হইয়ে যাই।

তারপর বর্ষার পরে শরৎ। হিঁদুদের পুজোর আগেই তার কী নূপ! যেন নিকাহরে পরের সপ্তাহের দুল্‌হীন।

ডিঙি-নৌকো ভাসনো হয়েচেল ভাঁটিতে। ওরা সমুদ্রমুকী চলেছে। এখনও অনেক নদীনালা বেয়ে তবে সমুদ্রের কাছে পৌচোতে হবে। সমুদ্রের সঙ্গী ওদের কোনো কাম পেয়োজন লাই। সমুদ্রেরও কোনো কাম লাই ওদের সঙ্গী। তবে সমুদ্র দেকেনি ককনও হোসেন। ইচ্ছা আচে, ইকবার দেকার তবে, সারেং মিঞাকে সে কিচুই বলে না। লোকটা বড়ো মতলবি। মানে, নিজের মতলবে-চলা মানুষ। সেই মতলব-এর সঙ্গে কোনো ফান্দাফিকির বা কু-ধান্দা থাকে না। মানুষটার চরিত্রটাই হতিচে অমনিই। যখন যা মতলব হয়; তখন তাই করে।

কথা যখন বলে, নিজেই বলে। তাকে বেশি কথা জিজ্ঞেস করতি গেলেই গুম মেইরে যায়। তখন বড়ো ভয় করে। অদ্ভুত মানুষ একটো।

রোদের তাপ বেইড়েচে। দাঁড় টেনে টেনে এই তিন দিনেই হাতে পায়ের পেশি সব শক্ত হয়ে গেছে হোসেনের। প্রথম দিন গায়ে হাতে পায়ে কোমরে বড়ো ব্যথা হইয়েচেল। এতো আর বিবির বিলএ লগি মেইরে তালের ডোঙা চালানো লয় যে, একবার লগি মারলি আর নিস্তরঙ্গ জলে ভুসভুস করে ডোঙার মাথাটা চলি গেল অনেক দূরে জলের উপর। এ যে ঘোরা নদী হে! অথই জল। জলে স্রোতও বড়ো কম লয়।

দূরে দেকা যাচ্ছে একটি গেরাম মতো। বড়ো বড়ো গাছে ঝুপড়ি হইয়ে আছে দুদিক। এই নদীর বাদা অঞ্চলের দুটি পাশই বড়ো রুখু। গাচগাচালি নাই-ই বলতি গেলে। চাষবাসও তেমনি হয় বলি তো মনে হয় না। দেখি, মনে হয়, মাটিতে লবণ আচে। নদীর পাশ যদি ন্যাড়া থাকে, জমিতে ফসল না থাকে কোনোরকম, তাইলে মন বড়ো খারাপ লাগে। এইকেনে যে আদৌ গাচগাচালি আছে সেইটিই অবশ্য চিত্তির!

ডিঙি আস্তে আস্তে যেতিচে। জলের মদ্দি ছপ-ছপ ছপ-ছপ করে আওয়াজ উঠচে। ককনও দুজনেই দাঁড় বায়। ককনও একজনে দাঁড় বায়, অন্যজন হাল ধরি বসি থাকে।

কী গাচ হে উটা ককখনো তো দেকিনি আগে।

হোসেন শুদোল।

ইকানে যি সব গাচ দেখবে তা অন্য কোথাওই কককোনো আগে দ্যাকোনি। এ হল নোনা জলের নোনা মাটির গাছ। সোঁদরবনে জোয়ারের সময়ে জল পনেরো থেকে কুড়ি ফিট উঁচা হয়ে ওটে। জঙ্গলের ভিতরে ভিতরে জল চলি যায়। নদীর পাশের গাছ, লতা, ঝোপঝাড়ের আদ্দেকটা ডুবি যায়। কারো কারো বা ডোবে তিনের দুই ভাগ। তখন মনে হয়, পুরো সোঁদরবনই বুজি একটো ভাসানো বাগান। আহা। তার কী নুপ গো।

জানোয়ারেরাও কি ডুইবে যায় নাকি?

সারেং মিঞা হেসে ওঠে হোসেনের প্রশ্নর ভঙ্গিতে।

লোকটা যখন হাসে, তখন ভারী সুন্দর দেকায় তাকে। মুখের মদ্দি ঠোঁট আর চিবুকটি ভারী সোন্দর। দাঁতগুলানও। লোকটা যে কত বড়ো সুপুরুষ তা হাসলেই শুধু বোঝা যায়!

কই, দোস্ত কিচু বইলচ না যে!

জানোয়ারেরা ডুবে যায় না। জঙ্গলের মদ্দি মদ্দি উঁচু ডাঙা জমি থাকে। তাদের বলে ট্যাক। অন্য নামেও ডাকে, জায়গা-ভেদে, মানুষের আবাস-ভেদে। জোয়ারের সময়ে জানোয়ারেরা ওই সব ট্যাকে গিয়ে জোটে। তাছাড়া এমনও এনেক ডাঙা আছে, যিখানে জোয়ারের জল মোটে পৌছোয়ই না। আল্লার দুনিয়ার ইনসান আর জানোয়ার যখনই পয়দা হয় তখনই তাদের রিষক্এর ইন্তেজামও ঠিক হয়েই থাকে। রিযক কা মালিক তো আল্লাই।

ডিঙিটা এবার গাছগুলির কাছাকাছি চইল্যে এল।

হোসেন বিস্ময়ে স্বগতোক্তি করল, আরে এমন গাচ তো দেকিনি আগে!

হাঁ দোস্ত। কোলকাতায় হিঁদুদের মড়া পোড়াবার শ্মশান আছে একটা। নাম ক্যাওড়াতলা। নাম শুইনচো ককনও?

না। আমি শুনিনি।

স্টিমার কোম্পানিতে আমাদের মেট ছিল লক্ষমন পাঁড়ে। ব্রাহ্মণ। ভারী ভালো মানুষ ছেল। দিনরাত পুজো-পাট করত। দেখা হলেই বলত, জয় রামজি কি। আমি উত্তরে বলতাম ওয়াস্সালাম ওয়ালেকুম। পাঁড়েজি খুব হাসত।

সেই পাঁড়েজি, রামখেলাওন, পাঁড়ে, একবার কালীঘাটে পুজো দেবে বলে খুব ধইরল! আর নিজে শুদ্ধাচারী কট্টর ব্রাহ্মণ হলি কী হয়, ধরল এই মোচলমানের পো, আমাকেই!

বলল, তুমি মিঞা তো তামাম দেশে ঘুইরেচ। আমাকে চলো সঙ্গে নে কইলকেতা। কালীঘাটে পুজো দে আসি।

আমি ভাইবলাম কলকাতার নখুদা মসজিদে আমিও নামাজ অদা করিনি বহুদিন। নামাজ অদা করে, রয়্যাল হোটেলে বিরিয়ানি খেয়ে, একটু সুরমা, ঈত্তর কিনে ফিরব।

তখন আমি পাটনা ছেড়ে দিয়েচি। বাচ্চা বাবুর কাজ করি সকরিকলি ঘাটে। পাঁড়েজিও সিকানেই চেল। দার্জিলিংএর ট্রেন, উত্তর বাংলার আসামের ট্রেন, বিহারের সুমাল এলাকার সব জায়গা, মানে গঙ্গা কি উসপার; মুঙ্গের, দ্বারভাঙা, মুজাফ্ফরপুর ইত্যাদি ইত্যাদি পেত্যেক জায়গা থেকিই ইদিকে আসতি হলি সকরিকলিঘাটে নয়তো পাটনাতে গঙ্গা পেরুতে হত।

পাটনাতে থাকবে তো ঈত্বর, সুরমা, তিলের রেউড়ি, বাখরখানি রোটির কম্মী ছিল না কোনো। কিন্তু ওই সকরিগলিতে আসার পরই জীবন একটু সান্নাটা হল। ধু-ধু বালির মধ্যে ড্যারা। নয়তো স্টিমারে থাকা। তবে স্যে এক জব্বর জীবন। বিলকুল দুসরা কিসিমকি জিন্দেগি।

শীতকালে দূরে দূরে বেশ থেকে রং-বেরঙের বত্তক আসত নদীতে। আর তখন শিকারে আসতেন কইলকাতা থেকে বড়ো বড়ো রহিস সব বাবুরা। পাটনা থেকেও আসতেন।

আমাদের নস্করবাবুদের, সামন্তবাবুদের মতো রহিস?

হোসেন শুদোল।

আরে! বাঘের সঙ্গে চুহার তুলনা। এরা কী আর তাঁরা কী। তোমাদির গোটা পঞ্চাশ নস্কর সামন্তদের ওঁরা একেকজন চাকর রাকতি পারেন।

তাপ্পর?

তাপ্পর খানাপিনা-ফালানা-ঢামকানা বড়া ঝুম চলতো বেশ কয়েকদিন। বাচ্চা বাবু আমার হিফাজতে দিয়ে দিতেন শিকারিদের! অন্য সব কাজ থেকে ছুটি হয়ে যেত সি ক-দিন। মজাসে খেতাম-দেতাম, শিকার খেলাতাম। কুমিরও দেকা যেত মাঝে-মাঝে। নদীরে চরে রোদ পোয়াত।

মাঝে-মধ্যি কলকাতার রহিস ব্যারিস্টার মিত্তিরসাহেব আইসতেন। বহত বড়া-দিলএর মানুষ। তার উপর যেমন এত্‌লাখ তেমনই তমদ্দুন। তা, সাহেবের নওজওয়ান লেড়কা তো একবার এক বিরাট কুমিরকে দিল গুলি করে। তাপ্পর নওজোয়ানি উত্তেজনায় অধৈর্য হয়ে দৌড়ে নেমে গেলো নৌকো থেকি বালির চড়ায়। আমি তো নৌকোর গলুইতে মিষ্টি মিষ্টি রোদে পিঠ দিয়ে বসে হুঁকো খাচ্চিলাম আরামসে। ভারী ভালো তামাক আনাতাম পাটনা থেকে। আমার এক দোস্ত পাটিয়ে দিতো।

কুমিরটা গুলি খেয়ে এঁকেবেঁকে জলে নেমে যাবার কওশিস করচেল। এমন সময়েই শুনি এক দিল-তোড় চিৎকার। এক্কেবারে ইয়াকাইকাক! চমকে চেয়ে দেখি, কুমিরের ল্যাজএর বাড়ি খেয়ে ব্যারিস্টার সাহেবের লেড়কা তো দশ ফিট উপরে ছিট্‌কে উইটেচেন হাত-পা চারদিক ছিটিয়ে। দেখি, ছিটকে পড়েছে তাঁর বন্দুকও। দূরে। আর উনি উপর থেকে এসে নীচে ধপ্পাস করে পড়লেন চরের উপরের বালিতে। দু-হাত দূরেই জল। এদিকে কুমির জোর কদমে এগিয়ে যাচ্ছে তাঁর দিকে,

মতলবখানা, চোট খেয়েছি খেয়েছি, দুশমনকে মুখে করেই লামব জলে। টেনে নে যাব জলের নিচে। তাপ্পর...

গুলিটা লেগেওছিল বে-জায়গাতে। বেজায়গাতে গুলি লাগলে কুমির কখনওই মরে না। তাকে বা-কায়দা, বা-ইযযাত গুলি ঠুকতে হবে। কুমিরের শরীরের গড়ন সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকতি হবে। এমনি এমনি শিকারি হওয়া যায় না।

তাপ্পর? তুমি কি কইরলে সারেং চাচা?

হোসেন উৎসুক গলাতে শুদোল।

কী কইরব! দৌড়োলাম লাপ মেরি নৌকো থেকি নেমে এক নিশ্বেসে। প্রথমে বন্দুকটার দিকে দৌড়ে গেলম। বন্দুকটা তুলে নে দু লাপে কুমিরটার কাচে পৌচোলাম। কুমির আর শিকারির মধ্যে ফাঁক তখন চার কদমের। বন্দুকটা প্রায় কুমিরের ঘাড় আর গলার নরম জায়গাতে ঠেকিয়ে এক হ্যাঁচকা টান দিলাম টেনে ট্রিগার। ট্রিগার টেনেই আর এক হ্যাঁচকা টানে তো শিকারিকে কুমিরের মুকের সামনে থেকিও সরালাম।

গুলি খেয়েও কুমির থামল না। বিরাট কুমির! সে তার রক্তে শীতের গঙ্গার জল লাল করে নেইমে গেল নদীতে।

তাপ্পর? পেইলে না কুমিরটাকে আর?

সেই কুমির পরের দিনের সকালে জেয়ারে ফিরি এইল ভাসতি ভাসতি। সকরিগলিতে।

কুমীর পেয়ে তো শিকারি আর তার বাবা ব্যারিস্টারসাহেবের খুশি ধরে না। আমাকে বা-কায়দা বা-ইযযাত বহতই পেয়ার-দুল্‌হার করে এক হাজার টাকা দিয়েচিলেন। সেই যুগের হাজার টাকা। আর একটি বন্দুকও। ইনাম। উনিই লাইসেন্স করে দেচিলেন। লইসেন্স বিহারেরেই ছেল। ইকস্‌পায়ার করি গেচে সে কবে। এখন বে-পাশি বন্দুক। সেই থেকিই আমি বন্দুকবাজ। শিকারি। টুকটাক শিকার করি। তবে শিকার করতি আমার ককনওই ভালো লাগেনি।

কেন?

কে জানে কেন? বন্দুকটা সঙ্গে থাকলি ভরসা পাই, এই পযযন্ত। যা ভয়ংকর রাজ্যি এই সোঁদরবন! ওদের নৌকোর গতি এবার কমে এল। কারণ, গল্পে এতই মশগুল হয়ে গেইচেল হোসেন জল থেকি দাঁড় তুলে নেচিল। সারেং মিঞা এবারে হালে বসি ডাঙার দিকে মুক কইরল নৌকোর।

হোসেন বলল, কোথা থেকি কোথায় এলে মিঞা? হাল বুঝি ছেইড়ে দেচিলে?

সারেং হেসে বলল, কুতায় আবার আইসব। ইকানেই তো এলম। এই গাছতলাতেই তো নোঙর কইরব। রাইধব-বাইড়ব। খাব। তাপ্পর বিকেলে ভাটি দিলে নৌকো ভাসাব। এখন উজোনে যেতি কষ্ট হচ্ছি বেজায়। রোদও তো চড়া হল খুব।

হোসেন বইলল, তারপর বলো, পাঁড়েজীকে কালীঘাটে ফেইল্যে তুমি তো ফের সকরিগলিতেই চইলে এলে? পাঁড়েজির কি হল? আর ক্যাওড়াতলার?

সারেং মিঞা হাসল।

বলল, ঠিক বইলেচ।

তা বেচ্চারা পাঁড়েজি তো কালীঘাটে পুজো দিতে এইসে কলেরা হয়ে কালীঘাটেই মারা গেল। কোনো হোটেলে চিংড়িমাছ খেয়েছিল লুকিয়ে। এদিকে চিরদিনের নিরামিষাশী। তার পেটে কি সয়? তাও আবার পাপ-খাওয়া! গরমের দিন চেল। তার এক আত্মীয় চেল ভবানীপুরে। বহুদুর গ্রামতুতো আত্মীয়। তবু তাকেই খপর দিয়ে এলম। তাকি পোড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়েচিল ক্যাওড়াতলাতে।

তার সঙ্গে ই গাচটির সম্পক্কটা কি? কিচুই তো বুঝতে পাইরলাম না।

হোসেন বলল, অধৈর্য গলাতে।

আরে দোস্ত। এই গাছটাও তো ক্যাওড়া গাছই! না কি? তার মানে, এক সময়ে এই কলকেতা শহরটাও সোঁদরবনের মদ্দিই চেল। নইলে শ্মশানের নাম ক্যাওড়াতলা হবে কেন? দখিনে কেওড়াতলা আর উত্তরে নিমতলা। ইটা আমার থিয়োরি।

হোসেন কিছু বলল না। সারেঙের কথার সত্যি মিত্যে যাচাই করার জ্ঞান তার বা তার জানাশোনা অন্য কারোরই ছিল না। "থিয়োরি" ব্যাপারটা কি তাই বা কে জানে? একসঙ্গে কতই বা জানা যায়। তাই চুপ করেই রইল।

এগুলো কি? মাটি ফুঁইড়্যে উঁচু উঁচু হইয়ে আছে? আওরঙজেবের তরোয়ালের মতো? চাচা?

হোসেন শুদোল সারেং মিঞাকে।

সারেং হেসি ফেইলল হোসেনের কতা শুইন্যে।

বলল, আরে দোস্ত, এগুলোকে বলে শুলো। শিকড় আসলে। মাটি ফুঁড়ে এমন তরোয়ালের মতো উট্টে এরা হাওয়া থেকি অক্সিজেন নেয়। অক্সিজেন বোজো তো?

না। সিটা আবার কি?

আরে, ওই হাওয়ার মধ্যির প্রাণ। অক্সিজেন না হলি আমরা বাঁচি না। খুবই জরুরি জিনিস বুয়েচো?

ইদিকে ই গাচ তো আর দিকতিচি না। কোনো গাচই তো আর লাই। ওই ক্যাওড়া না কী নাম বললে যার?

না, নেই। ওই দ্যাকো, নদীর পাশে কত বড়ো ফাটল। ওই ফাটল দে জল ঢোকি জোয়ারের সময়ে। আবার ভাটার সময়ে বেইরে যায়। এই গাচের এই শূলোরা জোয়ারের সময় জলে ডুইবে যায়। গাছের গুঁড়িও ডুইবে যায়। এইকানে নোনা জল ঢোকে বইলেই কাটা গাচ গজিয়েচে।

কী আশ্চর্যি!

হোসেন বলল।

আশ্চর্যির তো এই শুরু হোসেন ভাই! আম্মীজানের বা বিবির আঁচলের নিচে শুয়ি থাকলি কি মরদের চলে? আল্লা এতবড়ো দুনিয়া দেচেন আমাদের। ঘুরে বেড়াতে হবে বইকী। দেশ বেড়ানোর মতো আর কি শিক্ষা আচে? তবে হ্যাঁ। চোখটিও থাকা চাই। দেখতি জানা চাই, শুনতে জানা চাই; আর চাই দিল। শুধু দিল থাকলিই হবে না, সেই দিল পুরোপুরি ভরে থাকা চাই ইযযাত, এহতেরাম আর মোহাব্বতে। তবে না হবে! তুমারও হবে। হবে। হবে। হবে। ইন্‌শাআল্লা।

সারেং মিঞা ক্যাওড়া গাছের ছায়াতে নৌকো লাগিয়ে গাছের ডালে নৌকোর দড়ি বাঁধল। দেখল, আরো দু-তিনটি নৌকো বাঁধা আছে সিকানে।

সারেং বলল, আপনারা কতদূরের যাত্রী?

আমরা যেতিচি চামটাতে কাট কাটতি।

কোন চামটা? বড়ো না ছোটো?

বড়।

এত দেরি করে? সকলে তো গরম পড়তি পড়তিই যায়।

তা যায়। আমাদের দেরি হয়ি গেল। তবে যা সব শুনতেচি তাতে এবার না বেইরোলেই বোদয় চেল ভালো।

কেন? কি শুইনলেন আবার?

ও বচরে বড়ো চামটায় নাকি এমনই উপদ্রব বাঘের যে, সব জেলে-মউলে-কাটুরেরাই পাট গুটায়ে নে যে যার গেরামের দিকে পাইলেচেন।

তবে? এসব শুনিও আপনারা যেতিচেন কেন?

হায়! খাব কি? ঘরে যে কিছুই লাই। যে-কাজ জানি, যে-কাজ এত বছর ধরি পুরুষের পর পুরুষ কইরে আসতিচি তা না কইরে আর করি কি? অন্য কাজ দেতিচেই বা কে? নেতারা তো শুধু ভোটের আগে এইসি পেয়ারের বাক্যি শুনোন তাপ্পরই ভোঁ-ভাঁ। বর্ষা এইলে তো সবই গেল। তখন ঘরেই বইসে বইসে খেতি নাগব। এখনও না বেইরোলে তো বালবাচ্চা নে উপোস যেতি হবে।

তোমার নাম কিগো মাজি? অন্য নৌকোর মাঝিকে শুদোল সারেং মিঞা।

কলিমুদ্দি। আমরা ই অঞ্চলে লতুল।

তোমরাও কি মচ্ছিমার? মানে জেলে? তা আগে কোতা যেইতে? মানে, কোন অঞ্চলি?

সপ্তমুখী।

অ। আর তোমার নাম কি মিঞা?

আমার নাম কালু মিঞা।

আপনার নামটা কি?

আবার আপনি এঁজ্ঞে কেন? তুমি করেই বলা ভালো।

ওই ছেলেটি নাম কি?

ওর নাম হোসেন।

আর তোমার নাম?

আমার নাম সারেং।

সকলে হেসে উঠল। বলল, সারেং হইয়ে ডিঙি চালাতিচ। ইটা কেমন হইল?

ওই। যার যেমন তকদির।

সারেং বলল।

তাই? তাড়াতাড়ি ভাত বইস্যে তাও সারেং। হাওয়া কেরমোশোই জোর হতিচি। এরপর রসুই পাকানো মুশকিল হবে।

হুঁ।

সারেং বলল।

৫

উজোন-ভাটি গোণ-বেগোণ বুঝে শুনে, রয়ে-সয়ে চলেচে সারেং আর হোসেন মিঞা। কলিমুদ্দি আর কলু মিঞাদের ডিঙিও চলেছে একই সঙ্গে। আকাশে এট্টু এট্টু মেঘ কইরেচে। এই মেঘ, এই রোদ্দুর। নদীর দু-পাশের জঙ্গল কের্‌মে কেরমেই ঘন হতিচে। গাছেরও নেকাজোকা লাই। পাল টাঙায়ে দেচে সারেং মিঞা। হালে বসিচে হোসেন। হুঁকো টানতিচে হুড়ুক ভুড়ুক করি সে। তামাকের মিটে গন্ধ ভাইস্যে যাতিচে হোসেনের নাকির সামনে দে।

থাকি-থাকিই হোসেন শুদোয়, সারেং মিঞাকে ইটা কি গাচ—উটা কি গাচ?

হুঁকোর টান থাইমে সারেং গাছের নাম বলে। তাদের "হিসটরি-জিয়োগ্রাফিও"। এই "হিসটরি-জিয়োগ্রাফি" কতাটাও নতুন শেখা হোসেনের। বাংলাদেশের সেই রিস্তাদারের কাছ থেকে; মামুজান। কত্ত যে গাচ!

নারকেল পাতার মতো দেখতে অথচ ছোটো ছোটো গোলপানা গাচ। ঘন। তার মদ্দি বাঘ শুয়ি থাকলি বোজার জোটি লাই। আর আচে হ্যাঁতাল। তার লালচে হলুদ-রঙা ঝোপের আড়ালও বাঘের সঙ্গ। বাইন, সাদাবানি, সুন্দরী, ক্যাওড়া, বাইন, কাকড়াগাছ, হেঁতাল, গর্জন, বলাসুন্দরী, গিলেলতা, গোলপাতা—আরো কত শত গাছ। যেন বটানিকালি গার্ডিনেই এইস্যে পড়িচে সে। চোখ বড়ো বড়ো করি দেখতিচে চারধারে হোসেন মিঞা। খুউব ইক্‌সাইটেড। ই কতাটা শিকেচে হোসেন মিয়ার কাছ থেকি।

শক্ত, বলিষ্ঠ, পেশল ডান হাতখানি শিমুলের ডালের মতো বাঁদিকে ডানদিকে ছড়ায়ে দে পা-জোড় করি বসি লুঙি আর হাতকাটা গেঞ্জি পরা সুপুরুষ তেজস্বী সারেং মিঞা সোঁদরবনের একটো একটো গাচে চেনায় হোসেনকে।

বলে, ভালো করি শিকে লাও বটে দোস্ত। এও ইক পাটশালা, ইসকুল, কলেজ যাই বলো। পেরকিতির পাটশাল। বনের বিদ্যাও বড়ো বিদ্যা। এই ইম্‌তেহান পাশ করলি ছার্টিফিকেট মেলে না বটেক কিন্তুক এই সোঁদরবনকে ভালো কইরি না চিনে নেলে যে এ বনির মধ্যি আসি সেঁদোয় তার পক্ষি ফেরা বড়োই কঠিন হইয়ে পড়ে। নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যিই এ বিদ্যা শিক্ষের দরকার। এর মায়া বড়ো ভীষণ। এ সুন্দরী জাদু জানে। এর জাদুতে যারা মইজেছে, তারাই জানে এই কথার সারমম্ম।

সারেং মিঞা ঘোর-লাগা মানুষের মতো বলে, মায়াদ্বীপও আচে সমুন্দরের মাঝে। সত্যিকারের নাম হল। বুইয়েচো। লোথিয়ান সায়েবের নামে আচে লোথিয়ান দ্বীপ। ভাঙাডুনি দ্বীপ। এক পাশ পশ্চিমবাংলা অন্য পাশ বাংলাদেশ। আর হুইদিকে পড়তিচে বাংলাদেশের খুলনে আর বাখরগঞ্জো সাব-ডিভিশন। অনেকেই দেইকেচি কিন্তু তবু সাদ মেটেনি। দিনও তো শেষ হয়ি এল।

হোসেন, সারেং মিঞার বাড়ানো হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে বলে ওঠে, জীবনের তো বাকি আচে একনও অনেক মিঞা। একনও দরজা-জানলা বন্ধ করো কেন?

কী বোজো?

যে সময় এইগ্যে আসতিচে। ওয়াক্ত হল!

তা করি না। তবে এই নোনা হাওয়ার গন্দ বুজি আমি। সমুদ্রের গায়ের গন্দ ঠাহর কইরতে পাই, আর কতদূর দৌড় আমার। তাছাড়া কতটা কি জানো দোস্ত? একটা বয়সি পৌচে পেত্যেক বুদ্ধিমান মানুষই বুইজতে পেরি যায় যে, একই জীবনে, একই নৌকোর হালে বাসি, অথবা দুখানি পায়ে, কী মোটরের চারখানা চাকা নে মানুষ এই বিপুল দুনিয়ার কতটুকুই বা দেখতি পারে? ক'টি জায়গাতিই বা যেতি পারে? একটা বয়সির পর তাই থম মেরি বসি যেতি হয়। নিজের অভিজ্ঞতা আর স্মৃতির নকশিকাঁথা মুড়ি দে বসি বসি ভাবতি হয়। কী কী দেখা হইল এই জীবনে সি সব কতা। সেই বুনোট জালের মধ্যে কল্পনার রসও মিলিয়ে দিতে হয় রঙেরই মতো দৌড়ে বেড়ানো সব্বোসময় উজোন-ভাটিতে ভেসি বেড়ানো আর মানুষের সারা জীবনের অভিজ্ঞতা যে একই বাক্যি লয়, সি কথা। পরানের মধ্যে বোজার মতো শক্তি যখন আসে তকন মানুষ ইকেবারে শান্ত হইয়ে যায় গো। ক্লান্ত হইয়ে পড়ে। ছটফটানি কইমে যায় তার বুকের ভিত্‌রে। সে যে মানুষ, সে যে পাখি লয়, বাঘ লয়, কুমির লয়; সি যে লদী লয়, আকাশও লয়, বাতাস লয়, কি কথাটার বুকের ভেতরে যে সুনসান সত্যটি আছে, যা চিরদিনের সত্য, তাকে তকন সেই মানুষে তার সাম্নাটা বুকের ইক্কেরে মদ্দিখানটিতে অনুভব করতি পারে।

হোসেন মিঞা, হুঁকোটা সারেং মিঞার হাতে ফেরত দে' বলে, তুমি যে কী বলো, আমি বুজি না কিছু সারেং মিঞা। অত ভারী ভারী কতা হজম হয় না আমার। একটু জোলো কইরে, হালকা কইরে বলো।

সারেং মিঞা হাসে, হোসেনের কথা শুইনে।

তাপর দুজনে চুপচাপ। এ ওর কথা ভাবে; সে, তার কথা। জলের মদ্দি গানের শব্দ হয়। নিরবধিকাল ধরি জল চলে। রোদে পড়ে চকচক করে জল। আলো প্রতিসারিত হয় বনের পাতা-লতায়, পাশ-খালের নরম পলিতে, সুঁতি খালে। ভারী ভালো লাগে হোসেনের।

সারেং মিঞা স্বগতোক্তির মতো বলে। হাসে আর বলে, হবে হবে। সময়ে সবই হবে গো। সব হবে। ভাবী জীবনের লোভেই না দোস্ত, জলপিপির জলার, তোমার গেরামের পাশের বাদার ডিঙি-বাওয়া হালকা জীবনের হাত ছাইড়্যে আমার সঙ্গে ভেসি পড়লে! ভারী জিনিসের এক্তিয়ারে এসি পৌঁচোতে, ভারী জীবনের দরিয়াতে নাও বাইতে সময় লাগেই। খুদাতাল্লার ইচ্ছা তেমনই! তবে, কতা কি জানো দোস্ত? এ পতে বাধা অনেক। বাধাটা সাপের বা কুমিরের বা মানুষখেকো বাঘের বা তুফানেরও লয়।

কোন্ বাধার কথা কতিচ তা তো বুঝি না মিঞা।

বুইজবে দোস্ত বুইজবে। সময় হইলেই বুইজবে। এ বাধা অন্য বাধা। খুদার নাম করি তো আজান পড়া হয় সব মসজিদেই, সব মোল্লাই তো খুদাহর খিদমতগার। ফজির থেকে ইশার নমাজ তো আমরা সবাই পড়ি-ও কিন্তু খুদাতাল্লাকে সত্যি সত্যি আমরা কজন জানি বলো? কজন জাইনতে পাই। এ পতে বাধা অনেক। অনেকই শক্রুতা। জানবার জন্যিই তো এতো হন্যি হয়ে খোঁজাখুঁজি। না কি বলো? তবে কতাতে বলে না?

"মুদ্দয়ী লাখ বুঢ়া চাহে তো কেয়া হোতা হ্যায়
যো মঞ্জুরে খুদাহ হোতা হ্যায় ওহি হোতা হ্যায়।"

মানে কি হল?

আরে মানেটা হতিচে, খুদাহ্র প্রতি যার ঠিকঠাক বিশ্বাস আচে, যে মানুষ আল্লাকে নিজের কইলজেতে ঠিকঠাক আসন করে দিতে পেইরেছে সেই জানে যে, তার জীবনের পথে, তার নিশানাতে পৌঁছোতে লক্ষ বাধা আসবে, লক্ষ শক্রু শক্রুতা করবে, কিন্তু লক্ষ শক্রুও যদি তার খারাপ চায়, তার ক্ষতি কামনা করে; তাতেও কিচুই যাবে আসবে না, যা খুদাহ চাইবেন, যতটুকু খুদাহ মঞ্জুর করবেন, তা হবেই। আর শুধু তাই-ই হবে। এই বিশ্বাস যার কলজেতে আছে তাকে রুকে রাখবে এমন জোস, এমন তাকত পৃথিবীর কোনো শক্রুরই নেই।

হোসেন স্তব্ধ হয়ে গেল সারেং মিঞার কতা শুনে।

সারেং মিঞার মধ্যে যেন কোনো পিরের বাস। এমনিতে সে মানুষটাকে দেখা যায় না, বোঝা যায় না। ককনও ককনও, ক্কচিৎ সেই নুকিয়ে-থাকা মানুষ বা ফকির বা খুদাহ্র অবতার যেন ভেতর থেকি বাইরে বেইরে আসেন। সেই তিলেক সময়ের সারেং মিঞাকে দেখলি, তার জ্বলজ্বলে দুটি চোকে চোক রাখলি, তার সমস্ত মুখমণ্ডলময় যে এক কুদরতি রওশনি ফুটে ওটে ফজিরের আসমানের পবিত্র আলোর মতো, তকনই বোঝা যায় যে, এই ইনসান বা পিরকে বাইজ্জত বাকায়দা খাতির না করলি খুদাহ্র কাছে বড়ো গুণাহ হবে।

ওই সময়টুকু পেরিয়ে গেলেই আবার সারেং মিঞা সাদামাটা জান্‌চিন সারেং মিঞা।

হাওয়াতে একন বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব নেগেছে। সামনে কোথাও বৃষ্টি হয়েছে বোধহয়।

হোসেন ছইয়ের ভিতর থেকে তার নীল-রঙা হাফশার্টটা নিয়ে আসে। দুধারের জঙ্গল এবারে কেরমোশোই গভীর হতিচে। বড়ো নদী ছেইড়ি একটা খালের মধ্যে ঢুইক্যে পইড়্চে একে একে নৌকোগুলো। সামনের নৌকোর কলিমুদ্দি আর কালু মিঞারা টুক-টাক কথা বইল্‌তেচে। তামাক খেতিচে। তাদের গলার স্বর আর তামাকের গন্ধ ভাইসে আসতিচে আলতো হয়ে ফিনফিনে হাওয়ায়। খাল ক্রমশ সরু হতিচে।

এবারে একটি শিষ-খালএ ঢুকেচে ওরা, এই সরু খালদের শিষ-খাল বা সুঁতিখাল বলে। কলিমুদ্দিরা বলাবলি করচেল। এখন ভরা-জোয়ার। মেলা মাছ ঢুকিতেচে জলের সঙ্গি। মাছরাঙা আর বকেরা ঝাঁপঝাঁপি করতিচে।

দুপাশের জঙ্গল, মনি হয় ইবারে দুটি হাত দে গলা টিইপ্যে ধইরবে ওদের। এমনই ভাব। আলোও ক্রমশ পড়ি আসতিচে। এমন সময় খালে একটা বাঁক নিতিই হোসেন মিঞা দেইকতি পেল খালের দু পাড়ে শুকনো ডালের সঙ্গে ফালি ফালি নোংরা ন্যাকড়া বাঁধা। কোনো ডালটা বা নুইয়ে পইড়েচে। কোনাটা বা বেঁইকে গেচে। তবে বেশি লয়; তিন চারটে ডাল অমন।

কলিমুদ্দিদের নৌকোতে এক বাঙাল মাঝি চেল। সে বইলে উটল, ঝামটি রে! ঝামটি খাইচে!

কলিমুদ্দি নৌকোতে দাঁড়িয়ে উটে, এক হাতে ছই ধরে, পেছন পানে মুখ ঘুরিয়ে বইলল, ইকানে নোঙর করা তো যাবেনি সারেং ভাই। কি বইলতেচেন?

মুখে কোনো কথা না বলি সারেং মিঞা মাথাটা দুদিকে ঘোরাল দুবার। এপাশ ওপাশ করি। কেনিং শহরের মাদ্রাজি বড়ার আর দোসার দোকানদারের মতো।

সবকটি নৌকো ছায়াচ্ছন্ন খালটি পেরিয়ে চলল ছাপাছপ দাঁড় ফেলি সারি ধরে পাল টাঙানো থাকা সত্ত্বেও।

ঝামটিটা কি জিনিস গো মিঞা? আর ইকান থেকি পাইলে যাবার এত তাড়াই বা কিসের?

হোসেন অবাক হয়ে শুদোল।

বড়োমিঞা! বড়োমিঞার নিশান।

বড়োমিঞা মানে, বাঘ। সোঁদরবনের মদ্দি বাঘকে কেউ নাম ধরি ডাকে না। যেখানে যেখানেই ঝামটি পোঁতা আচে দেকচো দোস্ত, জানবে সি সব জায়গা থেকিই বাঘে মানুষ নিয়েচে।

একই দিনে? একই খাল থেকি?

হ্যাঁ। একই খাল থেকি। তবে, না, একই দিনে নয়, দেখলে না ঝামটিতে বাঁধা ন্যাকড়াগুলো! ওর মদ্দি একটি দিন সাতেকের পুরোনো হবে। অন্যগুলির একটি প্রায় এক মাস আগের। অন্যটি, সম্ভবত গত বছরের। যে জেলে, বাউলে বা মউলেদের নৌকো থেকে বাঘে মানুষ নেয় তারা ওই ঝামটি পুঁতে চিহ্ন দিয়ে অন্যদের সাবধান কইরে দে যায় যে, এই খালে মানুষখেকো বাঘে মানুষ নিয়েচে। একানে যেন কেউ নোঙর না করে।

নৌকো থেকেও মানুষ নেয় বাঘে?

সবসময় যে নৌকো থেকেই নেয় তার কুনো মানে নেই। জেলে মউলে কাঠুরেদের মধ্যে কারোই তো নৌকোয় বসে থাকলি চলে না। নৌকো বেঁধে দে কেউ গাছ কাটতি যায়; কেউ যায় মধু পাড়তি। নৌকোতেও অবশ্য থাকে কেউ কেউ।

কেউ কেউ খালেই মাছ ধরে। কেউ বা নৌকোতে বা নৌকোর সঙ্গে বাঁধা ডিঙি নৌকোতে রান্না করে। মশলা বাটে।

যেখানে বনের মদ্দি মদ্দি মিষ্টি জল আচে, কেউ বা সেই মিষ্টি জল আনতি বনের ভেতরে চলি যায়। রাতের বেলা হারিকেন ফিতে কইমে রেখে নৌকোর পাটাতনের উপরেই শুয়ে থাকে তারা সকলে পাশাপাশি। পালা করে পাহারায় থাকে। মুকে কতা বলে না কোনো। সুন্দরবনের বাঘ পিরথিবীর আশ্চর্যি। মানুষের গলা শুনতে পেলি তারা দূরে না গিয়ে, কাচে আসে।

বাঘেদের ভয় পাওয়ানোর জন্যে কিছু থাকে না ওদের কাছে?

হোসেন শুদোল।

থাকে। অস্তরের মদ্দি লাঠি, শড়কি আর বুকের দুর্জয় সাহস। দু একটি নৌকোতে আমার মতো বে-পাশি বন্দুক-টন্দুকও থাকে না যে তাও লয়। মহাজনদের কাছে পাশি বন্দুকও থাকে।

বন্দুক যাদের কাচে থাকে, তারা তা চুরি করে হরিণ মারার জন্যেই ব্যবহার করে। বাঘ মারার সখ, নেহাত জানের দায় না পড়লি কম মানুষেরই থাকে। সুন্দরবনের বাঘ এমনই জানোয়ার যে বন্দুক ব্যবহার করার সুযোগও তো বড়ো একটা দেয় না। পাশি বা বে-পাশি বন্দুক থাকে কম নৌকোতেই। তবে পট্‌কা থাকেই।

কী পটকা? পটকা কেন?

আছাড়ি পটকা। রেঞ্জ অফিস থেকি দেয়। প্রত্যেক রেঞ্জ অফিস থেকিই। যে দিক দিয়েই বনে ঢোকো না কেন।

কেন দেয়?

দেয়, বাঘকে ভয় পাওয়াবার জন্যি। অথচ তার ফল হয় ঠিক উলটো। এরা সাক্ষাৎ যম। পটকার আওয়াজ শুনেই বরং বুইজে নেয় মানুষ কোতায় আচে। আওয়াজ শুনে, কাচে আসে, মানুষ ধরার জন্যি।

আসন্ন সন্ধ্যার ছায়াচ্ছন্ন বনে দুধারে ঝামটি-পোঁতা খাল পেরোতে পেরোতে হোসেনে একবার আম্মীজানের মুখটা মনে পড়ে। অন্য একজনের মুখও। হিঁদুবাড়ির ডুরে শাড়ি পরা মেয়ে অলির মুখটি। মনে পড়ে, আসন্ন সন্ধ্যার আগের তার গ্রামের রূপটি। মাত্র দু-রাত দুদিনে এক অন্য জগতে পৌঁছে গেল এসে। ভাবলেও অবাক লাগে। সেই নিরাপদ জীবনের শান্ত পরিমণ্ডলের কথা, জলপিপির জলার সকাল বিকেল, চেনা-গন্ধ, চেনা-স্বাদ, চেনা-ঘর, চেনা-বিছানা, পাশবালিশ, গল তাকিয়া।

হোসেনের মনটা ভয়ে কেঁপে কেঁপে ওটে। নিজেকে দোষ দেয়, কেন এমন হঠকারিতা করল? কেন এল সারেং মিঞার সঙ্গে!

সারেং মিঞা যেন হোসেনের মনের কথা বুজতি পাইরল। জলের উপরে-পড়া সন্দের আকাশের রঙের মতো এক আশ্চর্য হাসি ছড়িয়ে গেল তার মুখে।

সারেং মিঞা বলল, আসল যে মরদ, তার জায়গা তো ইকানেই। ঘরে, আরামে, সহজে সংসার যারা করে তারা তো করেই! খুদাহ কিন্তু সামান্য কিছু মানুষকে বেছে নেন তাঁর জিম্মাহ্‌দারির জন্যে। তেজারাত-যারাআত করার মতো আদমের তো অভাব নেই দুনিয়াতে কিন্তু জোস্ত আর জেসারাত-এর চিঙ্গারি তো কম মরদের মধ্যেই থাকে।

হাতে হাতিয়ার নিয়ে জঙ্গ্‌এ সামিল হলেই যে কেউ বীর হয় এমনই নয় হে দোস্ত। চেয়ি দেকো ইকবার ই সব সাধারণ মানুষদের দিকে, যারা নিজেদের বিবি আর বাল-বাচ্চাদের মুখে দুমুঠো ভাত তুলি দেবার জন্যি নিজেদের জানের পরোয়া না করে, এমনি করেই মাচ ধরতি, কাঠ কাঠতি, মধু পাড়তি পেতিবছর কী দুর্জয় সাহস বুকে লিয়ে লুঙি-গামছা আর একটু চাল ডাল নুন তেল আর মিঠা-পানি সম্বল করি এই দোজখএ আসে ফিরে ফিরে। ইদের মদ্দি অনেকেই ঘরে আর ফিরবে না জেনিও। এরাই তো হচ্চে আসল যোদ্দা। অসলি ইনসান। এদের পাসিনার আর খুনের মদ্দি দিয়েই ইনসানিয়াতএর ইম্‌তেহান চলছে হরওয়াক্ত। খুদাহই জানেন এদের চেয়ে বড়ো সেবক তাঁর আর কত জন আছেন। রুজির মালিক আল্লাহ—রিযক কা মালিক আল্লাহ হি হ্যায়। কিন্তু ঘরে বসে থাকলি তো আল্লাহ তোমার রুজি জুটিয়ে দিবেন না। দ্যাকো হোসেন, তোমাদের মতো সুখী, ছক-বাঁধা বাদা-বিলের জীবনের মানুষদের এদের দেকে অনেক কিছুই শেকা উচিত। রাবব সবকা হায় কিন্তু আল্লার সাধনা কত ভিন্নরকম হতে পারে তা নিজের চোকেই দেকে নাও। গাঁয়ে ফিরে অন্যদের বোলো।

হোসেন বলল, সারেং মিঞা, আমার ভয় যে কইরেচে তা ঠিকই। কিন্তু আমি ভাবতিচি তুমি এমনি কইর‍্যে কেন এই বিপদের মদ্দি ঘোরো? তোমার পেরোজনটা কি চেল? সুকে থাকতি ভূতের কিল কেউ খায়?

সারেং মিঞা হাসল।

বলল, ওই। ওই তো হল গিয়ে কতা দোস্ত। কার যে কিসে সুক তা কে বলতি পারে? এখানে বাঘ অসহায় মানুষের পেছনে পেছনে ঘোরে। বাঘ হচ্ছে জুরম, অপরাধী; আর খুদাহ্‌রই ইচ্ছানুযায়ী আমি হয়তো বাঘের পেচনে পেচনে ঘুরি, সেই মুজ্‌রিলোকে সাজা দেওয়ার জন্যি। খুদাহ্‌র হুকুমতএর কথা কে বলতি পারে বলো?

নৌকোগুলো ওই খালটা পেরিয়ে একটি কম চওড়া নদীতে পড়তেই সামনের নৌকো থেকে কলিমুদ্দি মিঞা চেঁচিয়ে বইলল, ইকানেই থেইক্যে যাই মিঞা। আপনি কি বইলতেচেন?

হোসেনের হাসি পেল। ভাবল, এই তো আলাপ হল দুপুরে, এরই মদ্দি এরা সারেং মিঞাকে গার্জেন বাইনে ফেলল দিকি! তা, মনুষ্যিটির মদ্দি কিচুমিচু একটু আচে বইকি। যে দ্যাকে, সেই নেতা বলে মেইনে নেয় নিজ থেকে অথচ ত্যানার নিজের নেতাগিরির 'এমবিশোন' মোটে লাই।

সারেং মিঞা মাথা নেইড়ে বলল, রাতে ঝড়জল আসতি পারে হে। ইকানেও নোঙর করাটা ঠিক হবে না কলিমুদ্দি মিঞা। রাঁধাবাড়াও তো আছে, না, কি? আট্টু এইগ্যে গেলেই নাসরাতে খাল। সেই খালেই থাকাটা ঠিক হবেক।

আপনে যা বইলবেন।

এবার কালু মিঞা বলল।

হোসেন মনে মনে বলল, লে হালুয়া। এরা যেন সব সারেং মিঞার ভরসাতেই গেরাম ছেইড়ে বেইরেচেল। চিত্তির। নাকি চিনত আগে থেকেই? ভাব দেকাল চেনে না?

রাতে খিচুড়ি রেঁইধেচিল হোসেন। "লাইপে" এই পেরথম। সি কথা সারেং মিঞাকে বইলতেই সি বলল : লাইপে পেরথম আরো অনেক কিছুই করার বাকি আছে দোস্ত তোমার। খিচুড়ি রেঁইধেই শুরু হল।

তবে দেইক্যে দেচিল মিঞা। কিসের পর কী করতি হবে, চাল-ডাল কি করি ভাজতি হবে। সারেং বলল, একন এট্টু ফুটুনি হোক। পরে তো ভাত আর নুন।

নিজের রাঁধা খিচুড়ি নিজে খেয়ে নিজের পিঠেই নিজে চাপড়ানি দিতে ইচ্ছে গেলো হোসেনের। একন হবে না। রাতে শুয়ে শুয়ে চাপড়াবে।

একন সব নৌকোতেই খাওয়া-দাওয়ার পাটই চুইক্যে গেছে। আশ্চর্য শান্তি একন চারধারে। কে একজন একটা বদনা সরাতে গিয়ে নৌকোর গলুইয়ে লেইগ্যে যেইতেই এমন এক পেচন্ড শব্দ উটলো যে অবিশ্বাস্য। সেই শব্দই আবার জলে জলে দৌড়ে চইলে গেল বহুদূর। এখন আবার নিস্তব্ধ। এমন নিস্তব্ধতা আগে কোনোদিনও জানেনি হোসেন। নৌকোর পাটাতনের গায়ে জলচলার শব্দ উটতিচে। একন ভাঁটা দিচে। সড়সড় খড়খড় করে পাতা পুতা খড়কুটো ভেসে যেতিচে সমুদ্দুরের দিকে। আকাশময় তারা। তারার নীলচে-সবজে আলো জলে পড়ি জলের বুকে নীলচে-সবজে আভা ফুইটিয়েচে। অন্ধকারের মদ্দি দূরের বাঁক থেকি কী একটা পাকি ডেকে উইঠচে বার বার। কী পাকি, কে জানে। বুক ছমছম করে উইটল হোসেনের। সারেং মিঞার দিকে চাইল পাশ ফিরে। সারেং মিঞা ফিশফিশে গলায় বলল, বইলব। এ পাকি রাতে ডাকে না। কিচু দেকে, ভয় পেয়ি থাকবে।

পাটাতনের নীচ থেকে লুকিয়ে রাখা বন্দুকটা বের করল সারেং মিঞা। ক্যানভাসের কেসটা খুইল্যে ফেলি টোটা পুইরল দুটো।

তারপর নিজের পাশ শুইয়ে রাকল।

হোসেন বলল, যদি ফুইট্যে যায় হটাৎ? বাঘ এলি তারপরই পুরলি হত না?

বাঘের নাম উচ্চারণ করেই ঘেবড়ে গিয়ে বলল, বড়োমিঞা, বড়োমিঞা।

সারেং মিঞা হাসল, শব্দ না করে।

বলল, ইকানের বড়োমিঞা আসে যমএর মতো। কুনো সাড়া না দিয়ে। তার চেহারা দেকা যায় না, শব্দ শোনা যায় না। যম যারে নেয়, সেই কেবল দেখতি পায়। তাও মাত্র এক ঝলক।

এই বনে কতদিন থাইকতে হবে আমাদিগের?

হোসেন শুধাল। ভয়ে তার বাক্যি রোধ হয়ে এসেচেল।

যতদিন এরা সকলে থাকে।

সি কতদিন?

যতদিন বর্ষা না নামে।

অতদিন?

হুঁ। অতদিন। তুমি ফিরে যেইতে চাও তো কোনো ফিরতি-নৌকোতে তোমাকে উইটে দেবোক্‌ন। দু একদিনের মদ্দি ভেইবে বইল্যো আমারে। চইল্যে যাওয়াই বোদয় ভালো। শখ করতি এইসে শেষে পৈতৃক জানডা দিবে কিসের জইন্যে? আমার সঙ্গে বুইজে শুইন্যে আসা উচিত চেল তোমার দোস্ত। আমি যে মানুষটা গোলমেলে তা তো সকলেই জানে!

তাপ্পর? বর্ষা নামার পর?

হোসেন ফিরে যাওয়ার প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে পালটা প্রশ্ন করল।

তাপ্পর আমাদের আসল জায়গাতে যেতি হবেক। মানে, বর্ষা নামার পর।

সি জায়গা কোতা মিঞা?

এই বনেই। এই বনেরই মধ্যে কুনোখানে।

সিকানে কি কইরবে?

নিজেরে আবিষ্কার করব। এই পিরথিবীতে কেনই বা এলম, কী করতে এলম, কেনই বা ফিরে যাব; ই সব শুধোব নিজেকে। নিজের সঙ্গে নিজে কথা না-বলি কথা বইলব।

ঘোর বর্ষায় এই বনে থাইকবে?

অপার বিস্ময়ে বলল হোসেন মিঞা।

মুখে শব্দ না করি মাথা নেড়ে জানাল সারেং যে, হ্যাঁ। তাই থাকবে।

কিন্তু কেন?

শেষ অব্দি যদি নাই দেইকতি চাও তবে একুনি পালাও। পরের ছেলেকে মেইরে কি গুনাহ করব? তোমার দ্বারা হইবেক না মিঞা, তুমি ফিরত চইলে যাও।

না, না, না।

হোসেন বলল।

ক-দিনেই ওর বড়ো ভয় ধরে গেছে। গায়ে জ্বর। কিন্তু বড়ো নেশাও ধরে গেছে। এ এক আশ্চর্য জীবন, আশ্চর্য জগৎ; এমন কোনো জগৎও যে ছেল এত কাচেই সে সম্বন্ধে তার কোনো ধারণাও ছেল না। একে যখন হাতের মুঠোয় পাবার সম্ভাবনা একবার ঘটেচে তখন সে সুযোগ হাতছাড়া করবে না হোসেন। কে জানে! এই সারেং মিঞা কে? কোন জাহান্নাম বা জিন্নত এ নিয়ে যাবে এ হোসেনকে? কিন্তু যেখানেই যাক, এই অনিশ্চয়তা, এই ভয়, এই আতঙ্ক অথচ বেঁচে থাকার জন্যে এই তীব্র সংগ্রাম, এই অভাবনীয় নীরব প্রচারহীন যুদ্ধর নেশা তাকে যেন পেয়ে বসেছে। কী বহুমূল্যে যে দুমুঠো ভাত, একটু নুন আর একটু মিষ্টি জল কেনা হয় ওর দেশেরই এক নিভৃত প্রান্তে তা জলপিপির জলার ধারে বাস করা সুখী মানুষেরা আদৌ জানে না। এই মানুষদের জীবিকার ভয়াবহতার কতা কলকাতা, দিল্লি, বম্বের মানুষেরা দুঃস্বপ্নেও ভাবতি পারে না। এই জীবন নিজের চোকে দেখার সুযোগ যখন ঘটেই গেচে তকন সেই সুযোগ ফসকাতে দিতে পারে না হোসেন।

জান গেলে যাবে।

ভাবতিচোটা কি?

সারেং মিঞা বলল।

ভাবতিচি, ভাইগো তোমার সঙ্গ ধইর‍্যে ইকানে এইচিলাম।

সামনের প্রথম নৌকোটি থেকে, একজন মাঝি ভুড়কে ভুড়ুক শব্দ করে তামাক খাচ্ছিল। আর সকলেই চুপচাপ। অন্ধকার নামলেই চুপচাপ। কত কী ভাবে সকলে। কেউ হাই তুলল। পটাস শব্দ কইর‍্যে পোকা কী মশা মারল কেউ। আর সঙ্গে সঙ্গে খুবই নিচু কিন্তু সুরেলা গলায় কালু মিঞার নৌকো থেইক্যে অল্পবয়সি ছেইলেটা মেয়েলি গলায় চেনা গান ধইরল :

"সুন্দর জরিনা রে,
তোমারে না দেখলি মোর অঙ্গ যায় জ্বলে....."

সঙ্গি সঙ্গি আরেকজন বলল, মইরতে হয়তো নৌকো ঠেঙ্গে নেমে বনের গভীরে যা। রাতের বেলা গান গেইয়ে বড়োমিঞারে ডেইক্যে আনিস না। গান থামা, গান থামা।

এ মানুষটার গলার স্বরটি একটু খোনা খোনা। দিনের আলোয় দেখতি হবে কাল, মনুষ্যিটা কে?

এবারে আরেকজন ভরাট গলায় বলে উঠল, ওরে ও মুনসের। তোর মুখে যে একনও দুধের গন্ধ। বিয়ার জইন্যে একুনি কান্নাকাটি উটোলি বাপ?

দু তিন জন একসঙ্গে হেসে উঠল সে কথা শুনে।

তাও চাপা গলায়। হোসেন ভাবছিল, কোন ভয়ের রাজ্যে এসি উপস্থিত হল সে।

কালুমিঞা না কলিমুদ্দি মিঞা কে যেন বললে, বুজতি পারল না হোসেন, কিন্তু যেই বলুক, সে বলল, নে এবারে সবাই শুইয়ে পড়বে। একনো অনেকদিনের পত। তাছাড়া চামটার এলাকাতে পৌঁছে তো আর যিখানি সিখানি নোঙর করে রাতও কাটানো যাবে না। বনবিধি আর বাসা দক্ষিণ রায়ের পুজো না দে' সে সব ঠাঁয়ে থাকা তো মোট্টেই সম্ভব লয়। অতএব চামটার খালে যিখানে সব লৌকো জমা হইয়েচে, রেঞ্জার সায়েবের পিটেল-বোট যিখানে বাঁধা আচে, সিখানে গিয়ে পৌঁছোতেই হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

বিড়ির আগুন মুখে করে একজন বলল, চামটাতে বড়োমিঞার শেষ ঘটনাটা কি তোমরা শুইনেচো গো? শুনলি গায়ে কাঁটা দিবেখন, চোখ কপালি উটবে আচ্ছা আচ্ছা মরদের।

কলিমুদ্দি মিঞা ধমকে বললে, শুয়ে পড় দিকিনি তোরা। পৌঁচতে তো হবেই সেই দোজখ্‌এ। ক'দিন কি তর সয় না? কত গায়ে-কাঁটা দেওয়া গল্পই না অপেক্ষা কইর‍্যে আচে আমাদের জন্যি। তোদের তাড়া দেকে অবাক লাগে আমার। কে থেইক্যে যাবি আর কে ফিরবি তার লাই ঠিক!

হোসেনের চোখ এমনিতেই জুড়ে আসছিল। তারপর গ্রীষ্মরাতের ফুরফুরে হাওয়া। নৌকোর খোলের গায়ে জল চলার সড়সড় শব্দ। লোমহর্ষক আগামী দিনের, তার পরের দিনের, তারও পরের অনাগত দিনগুলির ভাবনা ওকে উত্তেজিত, ভীত, ত্রস্ত করে তারপরে ক্লান্ত করে ঘুমের দেশে পাঠিয়ে দিল।

হোসেন ঘুমিয়ে পড়ল অজানিতে।

সবাই যখন ঘুমোল তখন উঠে বসে হুঁকোতে নতুন করে তামাক সাজলো সারেং মিঞা। যখন অন্য সকলের ঘুম তখনই সারেং মিঞার জেগে থাকা। কথাটা আক্ষরিক অর্থেও যেমন সত্যি তেমন অন্যার্থেও সত্যি।

যখন প্রতি নৌকোতে ঘুম, বনে ঘুম, নদীতে ঘুম, আকাশে ঘুম, বাতাসে ঘুম, পাতাতে ঘুম, শিকড়ে ঘুম, তখন ছইয়ে হেলান দিয়ে বসে সামনে বন্দুক রেখে অন্ধকার বন আর তারার ছায়া-কাঁপা জলের উপর চোক ফেলি বসি রইল সারেং মিঞা। কারণ, সারেং মিঞার মতো কিছু মানুষের এই পিরথিবীতে আসাটাই জেগে থাকার জন্যি।

৬

চোখ খুলতেই হোসেন অবাক হল। অথচ বেশ কদিন কেটে গেচে। বুঝতেই পারচিল না কোথায় আছে সে কোথায় এসেচে।

পুবে সুয্যি তকনও ওটেনি কিন্তু আলো ফুটেচে। একটা মস্ত গাচ তাদের নৌকোকে পুরো ছায়া করে আচে। গাচটার নাম জানে না হোসেন। জেনে নেবে পরে, সারেং মিঞার কাছ থেকি।

অন্যান্য নৌকোতে মানুষ কেউ জেগেছে, কেউ জাগেনি। কিন্তু দেখল যে অন্যান্য নৌকোতে অনেকেই নেই। হয়তো প্রাতঃকৃত্য সারতে গেচে। যদিও সে ছইয়ের মদ্দেই শুয়েচে তবু দেখতি পেল তার নাকের ঠিক উপরে একটি বাঁদর বসি আচে লম্বা ল্যাজটা ঝুলিয়ে দে। আরও কটি বাঁদর নড়েচড়ে সেই গাচের মদ্দেই ঘুরে বেড়াচ্চে।

হোসেন উঠে বসে পাটো গুটিয়ে রাখল। তারপর টোঙের বাইরে এসে পাটাতনের উপরে টানটান হয়ি দাঁড়াল। নিমের ভালো কাটা ছেল, ছোটো ছোটো টুকরো করে সারেং মিঞার নৌকোতে। তারই একটি নিয়ে দাঁতন করতে লাগল। দাঁতন করতে করতেই দেখতি পেল, সারেং মিঞা বদনা হাতে হেঁটে আইসচে জঙ্গলের গভীর থেকি। বাঁদরের কিচিমিচি ছাড়া ভারী শান্তি চারদিকে। এ এক অন্য জগৎ। একেবারেই অন্য। এমন মাটি, জল, আকাশ, গাছগাছালি, পোকা-মাকড়, লতাপাতা, পাখপাখালি এ সব এর আগে হোসেন অন্য কোথাওই দেখেনি। একানের মানুষজন, মানে এখানে যারা আসে তারাও একেবারেই অন্যরকম। "বিবির বিল" বা "জলপিপির জলার" চারপাশে যে সব মানুষ থাকে তাদের কারো সঙ্গেই এদের মিল নেই কোনো। চেহারাতে, মানসিকতাতে, জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিতে। অদ্ভুত সব মানুষ।

সারেং মিঞা বলছিল 'বিধবাপল্লী' আছে সোঁদরবনের বাদা অঞ্চলে। এবারেও যারা এসেছে নানারকম ধান্দা, দুমুঠো অন্ন-প্রত্যাশী হয়ে তারাও সকলে যে নিজের নিজের গ্রামে ফিরে যাবেই এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। অথচ এই মানুষগুলো যে খুব বীর, তারা যে বীরত্বসূচক কিছু করচে তা তাদের হাবে-ভাবে কথা-বার্তাতে বোঝার উপায় লাই। যেমন বোঝা যায়, পাহাড়চুড়ো জয় করতে যাওয়া কী দেশের হয়ে বিদেশে খেলতে যাওয়া বা বিদেশি পুরস্কার পাওয়া কোনো মানুষের চোখ মুখ দেকি, বা কথাবার্তা শুনি।

অন্য একটি নৌকো থেকে সারেং মিঞাকে কে যেন হাঁক দিল। বলল, মিঞা তুমি যখন সঙ্গেই আচ তখন বাউলের কাজটা তুমিই কইর‍্যে দাও না কেন!

পা ধুয়ে নৌকোতে উঠতে উঠতে সারেং মিঞা হেঁকে বলল, আমাকে বাউলে করলে তোমাদের বিপদ ঠেকি থাকবে না। কবে ঘি খেয়েছি এখনও যেন আঙুল পিছলে যাচ্চে সে জন্যি! চলো চামটা। সেখানি বাউলের অভাব হবেনি। গোল পাতা-কাটা নৌকো, মেছো-নৌকো, মধু-পাড়া নৌকো, জেলে নৌকোর তো টিপি লেগেছে গো সিখানি। গণ্ডায় গণ্ডায় বাউলেও পেয়ে যাবেখন।

একটি যুবক, হোসেনেরই বয়সি হবে, লাল-কালো চেক-চেক লুঙি পরনে, হাসতি হাসতি বলল, আমরা যাত্রা-মন্ত্র পইড়্যেই তো এইয়েচি চাচা, কিন্তু হইল্যে কী হয়! বাউলে মন্ত্র পড়ে না দিলি কি সোঁদরবনে সেঁদোনো যায়!

ছেলেটি যেন আগে থেকেই সারেং মিঞাকে চেনে মনে হল।

হোসেন অবাক হয়ে ভাবছিল, ছেলেটিকে আগে চোখে পড়েনি কেন? নীলরঙা, বগল-ছেঁড়া একটি হাফহাতা শার্ট আর পরনে ওই লুঙি। বেশ ছেলেটি। ফরসা গায়ের রং। হাসিখুশি।

সারেং মিঞা বইলল, কী মন্ত্র পইড়্যে এসেচ শুনি যাত্রার?

ওই।

ওই কি?

ওই আমাদের গাঁয়ের মদনচাচা যেমন পড়ে।

কোন গাঁ তোমাদের?

খিতিপুর।

কোন মদন?

মদন হাজরা।

মন্ত্রটা তো বলবে!

বলতিচি—

"বদরের পারে দিয়ে ফুল
বেয়ে ওঠো নদীর কূল
মুখে বল হরি হরি।
গুরু আছেন কাণ্ডারি॥
লাও ভাই বদরের নাম।
গাজি আছে লেখাপান॥
দরিয়ার পাঁচ পির।
গাজি বদর বদর॥"

এই মন্ত্র বলে দু হাতের কোলে জল তুলে ছিটিয়ে দেছিলাম ডিঙির গলুইতে, নিজের মাথাতে আর সাঙাতের মাথায়। বাস্। মন্ত্র পড়িই লগি তুলো দু হাতে ডাঙায় দাঁড়ানো আম্মীকে পেরনাম করে লগি পুঁইতে দিলাম। ছাইড়লাম ডিঙি।

বেশ কইরেচ।

সারেং মিঞা বলল।

তারপর কালু মিঞা আর কলিমুদ্দির দিকে চেয়ে গলা তুলে বলল, শোনো মিঞাভায়েরা। একন থেকি আধঘন্টার মদ্দি বেইরে পড়তি না পারলি বেলাবেলি চামটা পৌঁচোতে পারবেনি। আর না পারলি, কি যে হবে, তা তো অনুমানই করতি পারো।

লিশ্চয়! লিশ্চয়!

বলে উইটল তারা! ভয়ের সুর লাগল গলাতে যেন।

অন্য একজনে বইলল, এত আগেই যকন শিষখালে ঝামটি পোঁতা দেখা গেল তকন এ বচরে তেনাদের দৌরাত্ম্য যে কী পেকার বেড়েচে তা তো জানা কতাই। কাল রাতেও আমরা সাবদান থাকিনি। লন্ঠনের ফিতে কইম্যে দে, লগি সঙ্গে ঝুইল্যে রেইকেচিলাম শুধু। কাল রাতের ঘুমই কালঘুম হতি পারত।

সারেং মিঞা হেইস্যে বলল, খুদাহ ছিলেন। তাঁর চেয়ে বড়ো পাহারাদার আর কে আচেন?

তিনি তো থাকেনই। আমরাই দেইকতে পাই না বলিই তো যত গোলমাল। তেনার উপরে ভরসা কইর‍্যেই তো আসা।

ই সব কতা-বাতরার মদ্দিই এক বহর নৌকো বেয়ে এল ওদের বহরের দিকে।

কুথা থেকে আসতিচেন গো?

নৌকো দেখেই বোজা গেল জেলে-নৌকো। বড়োছোটো জাল গোটানো আছে ছইয়ের মাতাতে। দুটি নৌকোর পাশে হাপর বাঁধা। মাছ ধরে জ্যান্ত মাছ এই হাপরের মধ্যে ছাড়া রাখে। মাছ মরে না বলে, চালানি নৌকোয় চালান দিতে সুবিধে হয়।

ওই বহরের আগে আগে প্রথম নৌকো, তার ছইয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল লম্বা তাগড়া এক বুড়ো। বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারাখানি। হাতে হুঁকো। পরনে ধুতি আর হাতাওয়ালা গেঞ্জি। কাঁচা-পাকা চুল মাথাময়।

সেই মানুষটি বলল, আর দেরি কইর‍্যেন না মিঞা ভায়েরা। ই বছর খপর বড়ো খারাপ। ইখানিই এই অবস্থা তো চামটাতে কী হবে কে জানে! কাল রাতে শিষখালের মুখ থিক্যে আমাদের বহরের একজন জেলেকে নিয়েচে বড়মিঞায়। মুখ হাত ধুতে নেইমেচিল। এতজন মানুষ ও এত গুলান ডিঙি ও বড়ো-নৌকোর মদ্দি থেকেই তাকে নে গেল দিনমানে।

আহা! ওই শিষখালে তো ঝামটি পোঁতা ছেলই! তাও দেইকলেন না আপনেরা কত্তা?

কলিমুদ্দি উত্তেজিত হয়ে বইল্যে উইটল।

আরে না মিঞাভাই। শিষখাল তো পেচনে ফেইল্যে এইস্যে ছিলামই আমরা। আজ পেত্যুষে নতুন ঝামটি বেঁইধে এলাম অন্য শিষখালে। চলেন চলেন। ডিঙি খুইল্যে ন্যান সবাই। আর দেরি লয়।

জেলেদের নৌকোর বহর এগিয়ে যেতি যেতিই সেই হুঁকোহাতে বললেন, আমরা আসতিচি নানা গেরাম থিক্যে। সব গেরামের মানুষ ইকানে। চামটাতে দেখা হলি পর সব গেরামের নাম বলা যাবেকন।

বলেই, সারেং মিঞাকে দেখতে পেয়েই মাথা নিচু করে হুঁকো-ধরা হাতেই দু হাত জড়ো করে পেরনাম করে বইলল, আরে সারেং চাচা যে। আপনি। কী সৌভাগ্য আমাদের। কী সৌভাগ্য। আপনি এইলি পর তবেই এক সঙ্গে চামটাতে ঢোকা যাবে। আমার বহর নে আমি বড়ো চামটা খাল ধইরে এগোতিচি। খালের মুকে অপেক্কা কইরব। আপনি তো সাক্ষাৎ ভগমান। মানে, খুদাহ। আপনি সঙ্গে থাকলি তো বাবা দক্ষিণ রায়, বনবিবি, বড়ো খাঁ গাজি পেত্যেকেই রইলেন। চিন্তার কিচুই লাই।

বলেই বলল, ক্ষমা চাইচি সারেংচাচা। আপনারে দেকতি পাইনি মোট্টে।

সারেং হেসে বলল, বড়ো বাজে কথা কইতেচ তুমি যোগেন। আমি কেউই লই। মিথ্যিমিথ্যি বাজে মানুষের উপরে নির্ভর যদি কইর‍্যে থাকো তো বিপদ অলিবার্য। যাঁর উপরে নির্ভর করার, শুধু তাঁর উপরেই কোরো। তোমাদের দাঁড়ানোর দরকার কি? বড়ো চামটা খাল দিয়ে দোয়ানিয়াতে পড়ে এইগ্যে যেয়ো। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার জন্যে সাবধানে পরিষ্কার জায়গা দেকি নোঙর কোরো। আমিও ওকানে গিয়েই খাওয়াদাওয়া করব।

হোসেন বুজতি পারল যে, কলিমুদ্দি বা কালু মিঞারা সারেং মিঞাকে চেনে না। তবে যোগেনবাবুর কথা শুইন্যে তেনাদের চোখগুলি সব তাবড় তাবড় হইয়ে গেল। সারেং মিঞা অস্বস্তিতে পড়ে গিয়ে বইলল, দড়ি খোল হোসেন। চলতি চলতিই মুড়ি কেয়ে নোবোকন।

হোসেন ফিশফিশ করে শুধোল সারেংকে, ইনি কে?

এ হচ্চি যোগেন দাস, সচ্ছল জেলে। মানুষটি ভালো।

কেন? ভালো কেন বইলতিচ?

এ জন্যি বলতিচি যে যোগেনের পয়সা আচে কিন্তু পয়সার জন্যি গুড়ের হাঁড়িতে-পড়া মাছির মতো ভনভন করে না।

কথাটা এট্টু বুঝিয়ে বলার চেল।

বুঝলি না! জীবিকা একটা পেত্যেক মনিষ্যিরই পেয়োজন। মানে, যারা ঘর-সংসার কইরেচে, বা কইরতে চায়—মানে, যারা আমার মতো বাউণ্ডুলে মুসাফির লয়। কিন্তুক নিজের পেট নিজের পরিবারের পেট ও জীবজন্তু থেকে সব্বোপেকার মনিষ্যিই, জেলে-মউলে, সকলেই চাইল্যে নেয়। তাতে বাহাদুরী কি? কেউ কেউ নিজের জন্যে বিস্তর পয়সা কামায়। টাকার টিপ্যি গইড়ো তোলে। তাতেও বা বাহাদুরি কি! বাহাদুরি হল তাদের যারা নিজেরা নিজেদের চওড়া কাঁধে অন্য অনেক মনিষ্যির বোঝ চাপিয়ে নে চলে। নিজের ভালোর সঙ্গি সঙ্গি তার ধারে কাছের সকলেরই ভালোকরে। নিজের ভালোর সঙ্গি সকলের ভালো এক কইরে দ্যাকে। আমাদের এ যোগেন হতিচে গিয়ে সিরকম মনিষ্যি।

সারেং মিঞার কথামতো ডিঙি খুইলে নে, বইঠা বেয়ে বেয়ে এগোল হোসেন। ওদের নৌকোর বহরে সাজসাজ রব পড়ে গেল। যারা ডাঙাতে নেমেচেল তাদের নাম ধরে হাঁকাহাঁকি হতি লাগল।

কলিমুদ্দি বলল, আপনি এইগ্যে যান মিঞা। ছোটো ডিঙি আপনের। আমরা এই আসতিচি।

সজনেখালির একপাশ দিয়ে চলে গেছে গোসাবা নদী। অন্য পাশ দিয়ে পঞ্চমুখান খাল। পঞ্চমুখান খালও এসে গোসাবা নদীতেই পড়েছে। তার একটু পরেই ডানদিকে বেরিয়ে গেছে বড়ো চামটা খাল। তার একটু পরে ছোটো চামটা খাল বড়ো চামটা খাল বেয়ে গিয়ে দোয়ানিয়া খাল হয়ে চামটা ব্লকের গভীরে গিয়ে পৌঁছোনো যায়। বড়ো ধুতরা খাল ভোলাখালি খাল, চন্দ্র দোয়ানিয়া খাল, লোধি দোয়ানিয়া খাল রয়েচে চামটা ব্লকের মদ্দি। চামটার পূব দিক দিয়ে চলে গেচে গোনা নদী। গোনার পাশেই গোনা ব্লক। গোনার পর বাঘমারা ব্লক। চামটা, গোনা আর বাঘমারা ব্লককে ঘিরে রয়েছে গোসাবা, হেড়োভাঙা আর গোনা নদী। এই তিন নদীই গিয়ে পড়েছে বঙ্গোপসাগরে।

এখন ভারী চমৎকার লাগছে হোসেনের। বন ক্রমশই ঘন হচ্চে। বড়ো নদী ছেড়ে খাল-এ ঢুকেচে তো গতকালই কিন্তু একন খালের দুপাশের দৃশ্য বদলে গেছে। এঁকিবেঁকি যাওয়া খালের পাশে পাশে ডান দিকে বাঁ দিকে বেরিয়ে গেছে অগণ্য পাশ-খাল। পাশ-খালের মদ্দি থেকি বেরিয়ে গেছে শিষ-খাল। শিষ-খালের মদ্দি জোরে জল ঢুইকতিচে জোয়ারের। তার সঙ্গি ঢুকচে নানারকম মাচ। মাচরাঙারা ছোঁ মেরে মেরে মাচ ধরচে আর তাদের চিৎকারে সরগরম হয়ে উঠচে গ্রীষ্ম সকালের নিস্তব্দ বন। নিস্তরঙ্গ জলে তরঙ্গ উঠচে ছোটো ছোটো।

প্রকাণ্ড বড়ো, প্রায় প্রাগৈতিহাসিক; একটি কুমির ডাঙাতে উটে বইসেছিল বোধহয় ভাটির সময়ে। এখন এঁকেবেঁকে স্যাঁতসেতে পলিমাটির মধ্যে ন্যাতপ্যাত করে চারপায়ে আর ন্যাজে ভর দিয়ে খাড়া পাড় থেকে জলে নামচে।

দেকেই গাটা যেন ঘিনঘিন করে উটল হোসেনের। ভয়ও লাগল। কোনোদিন কুমির দেকেনি ও আগে। কিন্তু এত বড়ো কুমির। প্রায় তিনমানুষ লম্বা হবে। তার পেটের মদ্দি দশজন মানুষ একসঙ্গি ঢুকে শুয়ে থাকতে পারে। এত মোটা ও বড়ো সে পেট।

সারেং মিঞাকে শুদোল হোসেন, কলকাতার ব্যারিস্টারসাহেবের ছেলেকে যে কুমির গঙ্গা নদীতে ন্যাজের বাড়ি মেইরেছিল সে কি এত্ত বড়ো?

সারেং মিঞা ওর দিকে গামছা করে মুড়ি আর গুড় এগিয়ে দিতে দিতে হেসে বলল, এত বড়ো কুমির ন্যাজের বাড়ি মারলে বাঘেরও কোমর ভেঙে যাবে তায় মানুষ তো কোন ছার। নাঃ, সে কুমির এর তিনভাগের একভাগ ছিল।

কী বিচ্চিরি দেখতি গো!

সারেং মিঞা হাসল, এক হাতে মুড়ি ধরে অন্য হাতে হাল ধরে। বিড়বিড় করে বলল, খুদার দুনিয়াতে সব প্রাণীই সুন্দর। সুন্দর করি তাকাতি হবে তাদিগের দিকে।

বইঠার এক এক ধাক্কাতি ঝাঁকি মেরি মেরি ডিঙি ঝলকে ঝলকে এইগ্যে চলতিচে। রোদ তখনও কড়া হয়নি। ইট্টু-আট্টু জল ছিটকি গায়ে লাগলি ছ্যাঁত কইর‍্যে ঠান্ডা ছ্যাঁকা দেয়।

হোসেন দুদিকে চাইতে চাইতে ভাবচেল শুকনো ডাঙার মাঝে যে জঙ্গল তার রূপ আলাদা আর সুন্দরবনের রূপ আলাদা। অন্য যি কুনো লদী বেয়ে লৌকো চাইল্যে গেলে, দুপাশে, লাগাতার না হলেও, দূরে কাছে গ্রাম নজরে পড়তই। লোকালয়, গঞ্জ, উলটোদিক থেকে নানা নৌকোর আনাগোনা, গোরু ছাগলের পোষা পশুপাখির ডাক, মন্দিরের ঘণ্টা, মসজিদ-এর আজান, শিশু এবং মায়ের কণ্ঠ, ঘাটে ঘাটে নানারঙা শাড়ি-পড়া মেয়েদের জল নেওয়ার দৃশ্য, নদী পারের জনপদ; আরও কত কিচু।

কিন্তু না, ইকানে কিচুই লাই। শুধু বন আর বন। নিস্তব্ধ। মনি হয় প্রাণহীন। সেই জন্যেই এই নিভৃত, নিস্তব্ধ, নির্জন, জনমানবহীন বন মনিষ্যিকে ভয় পাইয়ে দেয়। আবার তার মদ্দি যে গভীর সৌন্দর্য আচে—অপার্থিব : তার আকর্ষণও কিচু কিচু মানুষকে পাগল কইরে তোলে।

সব বনই মনিষ্যিকে, প্রকৃতিপ্রেমিক, আধ্যাত্মিক মনিষ্যিকে পেচণ্ড ভাবে আর্কষণ করে সি কথা হোসেন মিঞা তার "চম্পারণে"র হানিফ চাচা আর "দানুয়া-ভুলুয়া" জঙ্গলের মাধো সিংকে বেশ কিছুদিন কাচ থেকে দেকেচে বলেই জানে। ভাগলপুরের "ভইষা-লোটনে"র জঙ্গলের এরফান মিঞাকেও জানে। ইদের সকলির সঙ্গিই আলাপ হয়েচেল হোসেনের নওয়াদাতে একবার, মুশহারা শুনতে গিয়ে। ওই ইকবারই গেচিল। ইত্তেফাকান পৌঁছে গেচিল ক্যানিং-এর জিগরি-দোস্ত আমানুল্লার সঙ্গে। সি এক অভিজ্ঞতা। গ্রান্ড-ট্যাঙ্ক রোড দিয়ে সর্দারজীদের ট্রাকে করে যাওয়া, ধাবাতে খাওয়া; তারপর বরুহির মোড় থেকে ঝুমরি তিলাইয়া হয়ে শিবসাগরের দিকে এগিয়ে বাঁ দিকে মোড় নিয়ে রজৌলির ঘাট। সে কী ঘাট! আর কী গহন বন সিখানে! সি ঘাট থেকি নেইমেই সিংগার। আর সিংগার পেরুলেই নওয়াদা।

কিন্তু হলে কী হয়! সি সব বনও গহন, ভীষণ, বড়ো বড়ো সাদা-কালো লালচে পাথরের চাঙড় বের করা মাথা উঁচু পাহাড়। কিন্তু সি সব বন এই সোঁদরবনের মতো নয়। এই বনের যেন হাজারো চোক, অতচ জিভ লাই। শব্দ লাই, আলোড়ন লাই কুনো। দুপাশ থেকি অজগরের চোকের মতো ঠান্ডা চাউনিতে চেয়ে আচে যেন!

নওয়াদা কথাটার মানে, সত্যি কিনা জানে না, ওর ফুফার ছেলে হাসমত বলে চিল, নতুন ওয়াদা করেচিল কেউ, কথা দিয়েচিল কেউ, কিচু, কাউকে; তার থেকেই নওয়াদা।

হবে হয়তো। হতি নাও পারে। কিন্তু এত কথা মনি আসতিচে হোসেনের আজ এই সুন্দরবনের মদ্দি ঢুইক্যে পড়ি ই জন্যেই যে, আজ অবধি যা কিছুই ও দেখেচে, মানে যিসব বনাঞ্চল, তার সঙ্গি এই বনের কুনো তুলনাই চলে না। ভালো মন্দের তর্কে আদৌ না গিয়েই বলা যায় যে, ই আলাদা, ই অনন্য। সুন্দরবনের কোনো জুড়ি লাই, পরিপূরক লাই। কী সৌন্দর্যে, কী শান্তিতে, কী নির্জনতায়; কী ভয়াবহতায়।

পেতিবচরই বনবিবি, বাবা দক্ষিণরায়, কালুরায়, বড়খাঁ গাজি আরও যে কত দেবদেবীর পুজো করে তাঁদের আশীব্বাদ মাতায় নিয়ে এই পেবল ভয়ংকর বনে ঢোকে কলিমুদ্দি, কালু শেখ এবং অগণ্য নাম জানা ও অজানা হিন্দুমোচলমান দুরুদুরু বুকে তার লেকা জোকা লাই। ফরেস্ট ডিপার্টের বাবুরা যাই বলেন না কেন প্রতিবছর এই সুন্দরবনে বাঘ সাপ কুমির কামটের বলি যে কত মনিষ্যি হয় তার কুনো হিসেবই রাকা হয়নি কোনোদিন। আজও হয় না।

সারেং মিঞা বারবারই বলে ই কতা।

বড়ো আশ্চর্য লাগে হোসেনের, একজনও মেয়েচেলে দেকে লাই সুন্দরবনে। এমন কুনো বনই দেকেনি ও, বা শোনেনি তেমন বনের কতা, দেকেনি নদী, খাল, যিকানে মেয়েচেলে আসা ইকেবারেই বারণ। না, এই বনে শুধু পুরুষদেরই ঢোকার অধিকার আচে। শুদুই পুরুষদের। সি জন্যি এই বন আরও অন্যরকম।

যিখানে মানুষখেকো বাঘেদের দৌরাত্ম্য, দেশের অন্যান্য বনে, সিখানেও মেয়েদের কুটো কুড়োতে ঘাস কাটতে, জল আনতে, ফসল তুলতে, কাপড় কাচতে বনের মন্দির জঙ্গলে, ঘাস-বনে নদীতে, খেতে, ঝরনাতে যেতি হয়ই। কাউকে কাউকে কক্কনও কক্কনও যে বাঘের হাতে মরতি হয় না, এমনও লয়। তবু সুন্দরবনের এমন ভয়াল, করাল, রাহুগ্রস্ত, ভৌতিক অনুভূতিতে ছাওয়া সাংগাতিক বন বোধহয় পৃথিবীর আর কোতাওই লাই। এবং এত ভয়মিশেল ভালোবাসার মতো বনও লয়।

মুড়ি-খাওয়া শেষ হলে, হাতের গুড় ধুতে হোসেন লগি পাশে রেখে ঝুঁকে পড়ে দু হাত জলে ডুবিয়ে দিল।

সারেং মিঞা বলল, করো কি? করো কি? এবারে করেচো করেচো, ভবিষ্যতি আর কক্কনও এমন কাজ করবেনি। সুন্দরবনের ডাঙায় বাঘ, সাপ, শূলো তো আচেই। এর জলেও কুমির, হাঙর আর কামটের কিলিবিলি। কত মাঝি, কত জেলে, এট্টা ডুব মারার জন্যি জলে নেমেচে অথবা পা-ধোওয়ার জন্যি নৌকো থেকেই জলে পা নামিয়েচে আর সঙ্গি সঙ্গি কামটে পা কেইটে নিই গেচে। কুমিরে ধরলি মনিষ্যিকে হিড়হিড়িয়ে টেনেই নে যায়! কিন্তুক কামটে তা করে না! তার কামড় বড়ো বড়ো হাসপাতালের ছার্জনদের ছুরি দে' কাটার মতো। যকন কাটা হয়, তকন বোজাই যায় না। এমনই নিপুণ তারা আর এমনই নিপুণ তাদির মনিষ্যির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেইটি নেওয়ার খ্যামতা।

চামটার খালে পড়ার পর থেকিই লক্ষ করচে হোসেন যে, অনেক নৌকো ও ডিঙি চলেছে সারে সারে একই দিকে। রাতে ওরা কোতায় নোঙর করেচেল, কে জানে! হয়তো কোনো পাশ-খালে বা শিষ-খালে। তবে এ কদিনেই হোসেন বুঝি গেচে যে শিষ-খালে ওসব জায়গতি কেউই বড়ো একটা নোঙর করে না। এমনকি পাশ-খালে করলেও খালের মাঝ বরাবরই করে। অসম্ভব না হলে, অনেকগুলো নৌকো একসঙ্গি নোঙর করি থাকে। পাশাপাশি।

একন যেন জলের উপরে বেশ মেলা-মেলা ভাব হইয়েচে একটা। যেন হোসেনদের কোনো "তেওহার" বা হিন্দুদের কোনো "পুজো"। মুহুররম্ বা মকরসংক্রান্তি বা গাজনের মেলাতে যেন সারে সারে বিভিন্ন মাপের ছোটোবড়ো লৌকো চলেচে।

তাদের কারো মাথায় পাল। কারো বা গুটোনো। কত রঙের যে পাল। কারো গাঢ় লাল, পার্টির কোনো দাদার দেওয়া; কারো গেরুয়া, কারো গোলাপি। তবে গুণ টেনে চলছে না কোনো নৌকোই যদিও এই খালে জোয়ারের উলটোমুখে যেতে হচ্ছি সকলকেই। গুণ টানচে না কারণ দুপাশেই জঙ্গল। যে গুণ টানতি নামবে, কাঁদ বেঁকিয়ে লৌকো টেনে আগে আগে প্যাতপ্যাতে পলিমাটিতে হেঁটে যাবে সেই তো খাদ্য হবে বড়োমিঞার। গুণ টানতি দেকেছিল ক্যানিং ছেড়ে আসার পরেই মাতলার ডান দিকে, আবাদের পাশে পাশে যে খালটা আছে সিকানে। দেকি মনে হয়, সি খাল মনিষ্যিরই বানানো।

সারেং মিঞা মুড়ি-গুড় খেয়ে জম্পেশ করে হুঁকোটি ধরাল। ছিলিম বসিয়ে ভুড়ুক-ভুড়ুক করে টানতি লাগল। বাঁ হাতে হাল ধরি আচে। ডান হাতে হুঁকো। বইঠা বাইচে হোসেন।

কীরে মিঞাসাব? জোর লাগতিচে বুঝি খুব? আর এট্টু এগুলেই আমরা দুগ্যাদোয়ানির খালে গিয়ে পড়ব। সব দোয়ানি খালেই দু দিক দিয়েই জোয়ারের জল ঢোকে। সেখানে বইঠা বাইতে অত কষ্ট হবে না।

হোসেনের বইঠার ছপাত-ছপাত শব্দ আর সারেং মিঞার হুঁকোর তামুক খাওয়ার, হুড়ুকগুড়ুক শব্দই যেন ইকমাত্র শব্দ এই পিরথিবীতে। লদীর মদ্দি জলজ শব্দের যেন এক অস্ফুট উল্লাস কিন্তু শ্রবণ-গ্রাহ্য কোনো শব্দ লাই। আয়নার উপরে জল গইড়ে গেলে যেমন শব্দ হয় না অথচ হয়ও তেমনি করেই জল বাড়চে লদীর।

তবে, শব্দ কী আর লাই? লদীর পেটের তলে যিখানে দুমুখো জোয়ারের জল এসি মিশচে সিখানে তো কলরোল হতিচেই। তাছাড়া, দুই পারে যখন জোয়ারের জল যেয়ে ঘা দিতিচে তকন সারেং মিঞার হুঁকোরই মতো আলতো হাতে-তোলা তবলার নরম বোলের মতো অস্ফুট-বোল উটতিচে লতায়-পাতায়, শেকড়-বাকড়ে; পাতায়-পাতায়। সেই অস্ফুট শব্দের সঙ্গি রোদের রং ছিটকোতিচে গোলপাতায়, গরানে, গেঁয়োতে, দূরের বনমদ্দ্যের সুঁদরিতে। সে-রং মাছের রক্ত ধোওয়া জলের মতো ফিকে-লাল হয়ে লেইগ্যে থাকতিচি ক্যাওড়ার বড়ো বড়ো গুঁড়িতে আর শুলোতে।

হুঁকো খাওয়া হইয়ে গেলে সারেং মিঞা বইলল, এবারে তুই হালে এইস্যে বোস আর এ বইঠাটা আস্তে আস্তে চালা। তোর বইঠা আমাকে দে। জলপিপির জলার শৌখিন ডোঙা-চালানো তোর অব্যেস, তোর কী দু-তিনদিনে অত সয়। তাও ফোস্কা পইড়েচে নির্ঘাত! কই? দেখি?

না, না ঠিক আচে চাচা।

লজ্জায় হাত দেকাল না হোসেন। আসলে, ফোস্কা তো পইড়্যে চেলই!

তা তুমি আবার চাচা ডাক ধইরল্যে কেন?

সবাই ডাইকতিচে। বিতিচি গেরামের গত্তের পোকা আমি, আমি কি জাইনতাম তুমি কে বট হে! তাছাড়া তুমিও তো আমাকে 'তুই' করে ডাকতিচ। তোমারে চাচাই বইলব। নইলে অভক্তি-অভক্তি লাগে।

ওর কথার ধরনে হেসে ফেলল সারেং মিঞা।

বলল, তুই দেকি বাগচিবাবুর 'নটবর সারেং'এর মতো কতা কইতেচিস। "অভক্তি অভক্তি লাগে"টা আবার কোন "ভক্তি ভরি" বাংলা ভাষা?

নটবর সারেং কি বলে?

নটবর বলত, তার বাড়ি অবশ্য চেল ক্যানিং বোট কোম্পনির মালিক বাগচিবাবুর দেশে, উত্তর বাংলাদেশের সেই পাবনা জেলায়। নটবর "বাকি"কে বলত "বাঁকি"। কতায় কতায় বিস্ময় প্রকাশ করতি হলেই বলত, "চিন্তা করেন একবার!" বয়সে তার চেয়ে অন্য কেউ ছোটো হলে বলত, "কইস কিরে তুই?" সেই নটবর, সুন্দরবনের খাবার-দাবার মোটে পাওয়া যায় না, নুন, তেল চাল, ডাল মুড়ি-চিঁড়ে, মায় পানীয় জল পয্যন্ত বয়ি আনতি হয় ইকানে, সেই দুঃকে সকলকেই বলত বুঝতিচেন কিনা বাবুগণ "ইকানে খাদ্য-খাদকের বড়োই অভাব।"

হোসেন হো হো করে হেসে উঠল নটবর সারেংএর কথা শুনে। সারেং মিঞা নিজেও হাসল।

প্রত্যেক মানুষেরই কিছু কিছু হাসি-স্মৃতি থাকে যা কখনও পুরোনো হয় না। এবং মনে হলেই মন ভালো লাগে, হাসি আসে। ভাগ্যিস সকলেরই তেমন কিছু হাসি-স্মৃতি থাকে।

পেচনে হটাৎ জোর ছপাছপ বইঠা বাওয়ায় শব্দে চমকে উটে নিজের হাতের বইঠা থামিয়ে পেচনে চাইল হোসেন। দেকে, সকালের সেই চেলেটি লাল কালো চেক-চেক লুঙ্গি-পরা, বগল ছেঁড়া নীল হাফশার্ট, সেই জোরে এগিয়ে আসতিছে।

সারেং মিঞা বলল, অত তাড়া কি বাপ!

চেলেটি হেসে ফেইলল।

বলল, যায় জন্যি চুরি করি সেই বলে চোর। আপনেই না সকলকে তাড়া লাগালেন।

বলেই বলল, এবারে সঙ্গে ইটি কে চাচা? কলিমুদ্দি চাচা তো বইলতেচেল যে আপনাকে এ অঞ্চলের দিকতিচে বহু যুগ। কিন্তু এ কে?

হোসেন বলল, আমার নাম হোসেন মহম্মদ। তোমার নাম কি?

আমার নাম এরফান মন্ডল। তোমার বাড়ি কোথায়?

গরান গ্রাম। আর তোমার?

বিতিচি।

সেটা আবার কোতা?

সারেং মিঞা হেসে বইলল, ও তো তোদের সোঁদরবনের বাদার মানুষ লয়। ও হল গিয়ে "সুকের পেরাণ, গড়ের মাঠের" নোক। জলপিপির জলা বা "বিবির বিল" এর নাম শুইনেচিস ককনো?

না তো!

তা তো না শোনারই কতা! তোদের তো ওদিকে কোনো দরকারই পড়ে না। তোরা তো আসিস নামখানা দিয়ে।

এরফান কথার মাঝে কথা কেটে বলল, তা চাচা, হোসেনকে আমার ডিঙিতে নে'নি? গল্প করতে করতে যাব।

তা ভালো। কিন্তু আমার ডিঙি থেকে এক দাঁড়ি উঠায়ে নেলে একটা অন্য দাঁড়ি তো দিবি আমারে? না কি? তা কলিমুদ্দি, কালু এরা সব গেল কোতা! তোর নৌকো থেকে কোতা তাদের ফেইল্যে দিলি?

তেনারা সব বুড়ো খুঁজি খুঁজি যে যেমন পেইরেচেন অন্য নৌকোতে গিয়ে উটেচেন। কাল থেক্যি তো যার যার, তার তার।

মনে "হিজ-হিজ হুজ-হুজ" বলতিচিস। মাল-জান সামাল-সামাল।

হোসেন হেসে উঠে বলল, কী বলতিচ? আগে মাল পরে জান?

সারেং মিঞা বলল, জি। ঠিক তাই বলতিচি। জান-প্রাণএর দাম সুন্দরবনে কিছুমাত্রই লাই। জান-প্রাণ এই আচে, কী এই লাই! তবে মালের দাম আছে বইক। চাল ডাল নুন তেল, শড়কি, দা, লাঠি, বেপাশি বন্দুক, টাটকা-টোটা, মুঙ্গেরী গাদা-বন্দুকের বারুদ, চকমকির পাথর, গুলির ক্যাপ এই সবই প্রাণের চেয়ে অনেকই দামি।

আর টাকা-পয়সা? তার দাম লাই?

মোট্টেই লাই। ইকেনে টাকা তো কাগজই। কে কী দিবে সেই কাগজের বদলে?

তারপর এরফান মন্ডল কথা ঘুরায়ে নে শুদোল, তোমার বে-থা হল হোসেন?

পেবল আপত্তির সঙ্গে যেন ঘোর অন্যায় কুনো কথা শুইনেচে এবং তার তীব্র প্রতিবাদ করচে এমন ভাবে দু পাশে মাথা নেড়ে উটল হোসেন। বলল, কী যে বইলতিচ! না। না। না। কককনো না। জীবলেও করি লাই ও, জীবলেও লয়।

ই আবার কী কতা গো! কককনো না। জীবলেও করি লাই! পেত্যেকের বেলাতেই জীবনের কুনো না কুনো সময়ে, ইকসময়েও তো 'কককনো না' 'হ্যাঁ' হয়ে যায়ই। চিরদিন 'না' থাকা জিনিস আর কটি আছে খুদাহ্‌র দুনিয়াতে?

না, না। আমি উসবের মন্দেই লাই। তাই তো সারেং চাচার সাঙাত হইয়ে তোমাদের সোঁদরবনে চইলে ইলম গো।

কাজটা ভালো কইরেচে কী মন্দ, তা বলতে পারচিনি। কলিমুদ্দি চাচার কাছে যা শুইনেচি, তাতে তো সারেং চাচার আসার কতাটা সব মনুষ্যিরই জানা কিন্তু মিঞা ফেরার কতাটি তো জানা নাই কারোরই।

মানে?

মানে হল, বাউলে, জেলে, মউলে গোলপাতা কাটা নৌকো, কাঠুরের নৌকো সকলেই ফিরে যায় বর্ষার মুখে মুখেই। মুখে মুখেই বা বলি কেন, বর্ষা নামার আগে আগেই। আর সি যাওয়া কী যাওয়া। চোকের জলে ভেসে ভেসে যাওয়া।

গরিবের যদিও চোকের জল ফেলার সময় লাই, চোখ তবু অজানিতেই ভিজে ওটে গো।

কেউ বাপকে ফেইলি যায়, কেউ ছেইলেকে, কেউ শালাকে, কেউ ভগ্নীপতিকে, কেউ ছেলেবেলার খেলার সাথিকে। যাকে ফেলে গেল, তার কোনো চিহ্ন পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে পারে না কেউই। মানুষখেকো বাঘ তো অনেক জঙ্গলেই আচে কিন্তু এমন বনের তুলনা লাই।

বুকের আধখানা ফেলেই যাক, নিচের অঙ্গপ্রত্যঙ্গই ফেলে যাক তবু একসময়ের এই ভয়াল সুন্দরবনকে পেচনে ফেলে ফিরে যায়ই সকলে ইকসময়। যখন সবাই ফেরে সেই সময়েই নাকি তোমার সারেং চাচা তোমরার মতো কালো-করে আসা মেঘের আকাশের দিকে ছাইক্লোনএর গন্দ-মাকা সমুদ্দের দিকি তার ডিঙি বেয়ি চইলে যায়। একা। ইকেবারে একা। অন্য কারো টারানজিস্টারে যখন শাসানি দেয় আবহাওয়াবাবু "সমুদ্দে মাচধরা পেচন্ড বিপজ্জনক। জেলেদের সাবধান করা হতিচে। তিন নাম্বার পতাকা উড়তিচে। ঠিক তকুনি সারেং চাচা একা ডিঙি বেইয়ে কালো মেঘের মদ্দি, কালো জলের মদ্দি, তার লাল লুঙি-পরা আর লম্বা সাদা দাড়ি-ওড়ানো চেহারা নিয়ে ক্রমশ দূরে চলে যেতি থাকে। দূর সমুদ্দের হাড়ুম-গাড়ুম শব্দ শুইনে ঘর-ফিরতি আমাদের যখন নাড়ি ছেড়ে যায়, যে-ডাক বাঘের ডাকের চেয়েও ভয়ংকর, তখন সারেং চাচা হাসতে হাসতে মিলিয়ে যায় গর্জন-তোলা শাসানো ফোঁপানো নদীর বাঁকে। পেতি বছর।

তা, ফেরে ককন চাচা?

হোসেন শুধোল।

সে চাচাই জানে। কখনও কখনও দুতিন বছর ফেরেও না। কোথায় থাকে এই মরণ-বনে? কী খায়, কোন দ্বীপে সে যায়? কী সে খোঁজে? তা কেউই জানেও না, চাচা কাউকে বলেও না। এই কারণেই তো ফরেস্টের পিটেল-বোটের বাবু থেকে আমরা পেত্যেকেই চাচাকে আল্লারসুলের কাচের লোক বলেই জানি। চাচার কাছে এট্টু থাকতি পারলি বড়ো আনন্দ পাই।

তোমর তো বয়স বেশি না। তুমি চাচাকে জানো কতদিন?

তা পনেরো বছর হইয়ে গেল বইকী। দশ বছর বয়স থেইক্যে আসতিচি।

অত ছোইট্যবেলা থেকি?

কী করি? বাবাকে বাঘে নিল গোনা ব্লকে। তখন আমর পাঁচ বছর বয়স। বিধবা মা। দুই বুন। তকনই দিদির বিয়ের বয়স হইয়ে গেচিল। তাই দশ বছর বয়স থেকে আসতিচি। দিদির বিয়া দিয়া দিইচি। গোসাবাতে থাকে দিদি। এই বছরেই ছোটো বুইনটার শাদি দে দেব এমন কতা-বাতরা পাকা হইয়ে আচে। আমার এক পুইত্র এক কন্যে। গত পনেরো বচর আসতিচি এই বহরের সঙ্গে, পেতি বছর এই বহরের সঙ্গেই ফিইরেও যেতেচি চাচার দয়ায়। এইবারেও ফিইর‍্যে যাব। না ফিরলি চইলবে না। বুনটা আমার কত আশা নিয়ে বইস্যে থাকবে। খুব ভালো দুলহান পেইচি গো। ক্ষেত জমি-সাইকেল, ইক্কেরে বড়োলোকের ঝিংচ্যাক ব্যাটা। বুনটার কপালটা সত্যিই খুব ভালো।

বাঃ বাঃ বলে উঠল হোসেন। যেন, সে এরফানের জ্যাঠাই!

সারেং মিঞা তাড়া দিয়ে বলল, গল্পে গল্পে যে তোদের হাত থেইম্যে এইল রে! চামটা কি রেতের বেলায় পৌঁচোবি?

এরফান বলল, আমরা তো ভাবতিচি চাচা, দুকুরে কুনো পাশ-খালে কিছু কাঁকড়া ধইর‍্যে নে তাপ্পর রাতটা ইকানেই কাইট্যে আবার বেরুব। চামটার খালে লিশ্চয় অনেক নৌকো জমেচে।

কাঁকড়াগুলো ভালো দামে বিককিরি হইয়ে যাবে। আর বিককিরি না হলি, চাল ডাল নুন তেল শুকনো লংকা প্যাঁজ রসুন কালোজিরো মশলাপাতি, ই সব তো পাবই কাঁকড়ার বদলে।

থাকলি, সাবধানে থাকিস। পাশ-খালের ইক্কিবারে মদ্দিখানে নৌকো আর ডিঙিগুলোন নে পাশাপাশি নোঙর করি থাকিস।

পরক্ষণেই সারেং মিঞা বলল, যাচ্চি না যকন তকন তুই বইঠে ঢিলে দে। তোদের বহর তোকে ধইরে নেবেখন।

তা নেবে।

তারপরই কী ভেবে বলল, আচ্ছা, চন্নু তবে সারেং চাচা। আসসালাম ওয়ালেকুম। হোসেন ভাই, আসসালাম ওয়ালেকুম।

সারেং মিঞা আর হোসেন প্রায় সমস্বরে বলল, ওয়ালেকুম আসসালাম।

এবার ওরা আবারও দোকা। ওদের নৌকোর চারধারে গোল-গোল কালো-কালো কী সব জোলো জন্তু যেন খুব জোরে হুড়ুস ফুড়ুস শব্দ করে জল ছিটকোতে ছিটকোতে জলের উপর উতোর-চাপান দিতিচে। দেখতে তালের মতো। তবে হলদেটে ভাব লাই। শুধুই কালো। আর তালের চেয়ে বিশ-পঁচিশ গুণ বড়ো। পুরোপুরি গোল নয়। পেটটা কম কালো, পিঠটা পুরোই কালো।

ভয় পেয়ি গেল হোসেন। ডিঙিটা এক ধাক্কায় উলটিয়ে দেবে না তো? ওর চোক মুকের অবস্থা দেখে সারেং মিঞার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

শুকনো গলাতে হোসেন শুধোল, চাচা, কী এগুলো? দেকিনি কক্কনও।

তা টিক। তোদের বিলে তো এসব থাকে না। এগুলোর নাম শুশুক। এরা বড়ো বড়ো নদীতে তাকে। মাছ ধরে খায়। বড়োই মজার পেরাণী। হুড়গুম দুরগুম করি জলের মদ্দি ধুম-ধাড়াক্কা লাইগ্যে দে সুন্দরবনের এই স্তব্ধ নিঃশব্দ একঘেয়েমি মাজে মাজে কাইট্যে দেয় এরা। এরা যকন কাচে থাকবে তকন নিশ্চিন্ত হতি পারো যে ধার কাচে কুমির লাই। কুমির এদের একবার ধরতি পারলি হল। ইকিবারে চাটনি কইরে খায়।

ধরতি পারে না কেন?

আরে বড়ো হুশিয়ার জানোয়ার এরা! তাছাড়া ডাঙার মধ্যে চলা আর জলের মধ্যে চলায় তো তফাতও আচে। জলে রোগা-প্যাংটা মানুষও কত ভারী হয়ে যায় জানিসনি? অত বড়ো বড়ো কুমিরেরা ছুইটে পারে শুশুকদের সঙ্গি?

জলের মদ্দি আর কি কি আচে, চাচা?

আরও কত কী আচে। বড়ো বড়ো জলের সাপ আচে। চিত্র-বিচিত্র। উদ দেকেচিস। উদবেড়াল? ই দিকের জলে বড়ো একটা দেকা যায় না। হাঙর, কামট আর কুমিরের জইন্যে কি তাদের বেঁচে থাকার জো-টি আচে? তবে হ্যাঁ উদবেড়ালের খেলা দেইখতে পেতাম বিহারের গঙ্গাতে। শীতের দিনে দু পাশের বালির উঁচু পাড়ের গর্তি সেঁদিয়ে সে গোঁফজোড়া লাইচ্যে লাইচ্যে ইতি-উতি চাইত, আর গতিক সুবিদে লয় দেকলিই উপর থে সোজা "ডেরাইভ" মারতে জলে। ঝপাং কইরে। তাপ্পর একটু দূরে আবার সাঁইতরে যেয়ে ডাঙার উইটত। কতায় বলে না; ভেজা বেড়াল। এই উদবেড়ালেরাও ভিজলে একরকম আর শুকনো থাকলি অন্য রকম। বাঘেরই মাসি তো। সব বেড়ালই। বড়ো বড়ো ডোরাকাটাও ভিজে গেলে মনি হয় যেন মায়ে তাড়ানো বাপে খ্যাদানো লোম-ওটা, কুকুরটা ক্যানিং শহরের জঞ্জাল-ঘাটার এঁটো খেতে এইয়েচে।

আর কী আচে চাচা জলে?

আর কী কী আছে তার সব কি আমি নিজেই জানি? কতটুকুই বা জানি? জিন আছে। হুরী-পুরী। মানুষকে মারার বন্দোবস্তর ইকানে কোনো ত্রুটি লাই। ইকানে যে জান-বাঁচয়ে ফিরে যাওয়াটাই

এক দুর্ঘটনা। বুয়েচো হোসেন। খুদাহতাল্লার বোধহয় ইচ্ছাই ছিল না যে এই বেহেশতএর লা-জওয়াব বনে আমাদের মতো বদবু জানোয়ারের পা আদৌ পড়ে।

বলিই বইলল, তুমি ভাবতিচ, সব জেইন্যে শুইন্যে আমি তোমাকে ইকানে এইনেচি কী করতি। কী? ভাবতিচ না?

ভাবতিচি। আবার ভাবতিচ্চিও না।

মানেটা কী হল এই হেঁয়ালির?

মানেটা হল, তুমি আমারে দুনিয়া দেকাবে বইল্যে লিয়ে এইচো। আমি তো ছিলম গর্তের পোক। তুমি আমাকে সেই গর্ত থেইক্যে তুইল্যে এই এতবড়ো উদার ভয়াল, চিত্র-বিচিত্র, রহস্যময় জন্নত আর দোজখ এর বুলান্দ-দরওয়াজার সামনি এইনে দাঁড় কইর‍্যে দিলে চাচা। তুমারে লাখ লাখ সালাম। পরবরদিগারের দোয়া না থাকলি কী আমার জীবনে এমন অঘটন ঘটে! তুমার সঙ্গে না এইল্যে পর আমি তো বিতিচি গেরামের নেপো, নিতে, অপু, নৈমুদ্দিন মোতাহারদের সইঙ্গে ফালতু ফালতু বাকি জীবনটা কাইট্যে দিতাম। নস্করবাবুদের রোয়াব দেইখতাম। আর ওই মামুলি পরিবেশে "ইনসানও" হব ইমন খোয়াবও দিখতাম। তুমি চাচা আমারে লয়া জিন্দগি দান কইরেচ। হিঁদুদের বেরম্বনদের যকন পইতে হয় তখন নাকি তাদিগের পুনজন্ম হয়। শুনিচি। তুমি আমার চে' ভালো জানবে। পৈতে হলে, তাদের সংস্কৃত ভাষাতে তারা নিজেদের বলে 'দ্বিজ'। মতলব কিনা, দুইবার পয়দা হল। সেইরকমই চাচা, আজ এই নীল আকাশের শামিয়ানার নীচে এই নীলচে-সবুজ জলের অদেখা নদী এই হাজারো সবুজের ঘেব দেওয়া জঙ্গলের মদ্দি ডিঙি বাইতে বাইতে, এই শুশুকদের খিদমতগারির মদ্দি আমি মোচলমান হইয়েও 'দ্বিজ' হল্যাম। "আখবতের" দিনে তো সব মোচলমানকেই জবাবদিহি করার জন্যি গোরস্তান ছেইড়্যে উঠতি হয় কিন্তু আমার জিন্দগি থাকতি থাকতিই, আমার জওয়ানি থাকতি থাকতিই সারেং চাচা তুমি আমাকে অন্য এক "আখরত"এর দিনের সামনে এনে দাঁড় কইর‍্যে দিলে।

হাজার সালামত তোমাকে। লাখো সালামত।

সারেং মিঞা চুপ করে বইসেছিল। এতবড়ো বক্তিমে শুনতে সে অব্যস্ত ছিল না। দ্বিতীযত বিতিচি গেরামের এ ছোঁড়া যে এমন বক্তিমেবাজ সি খপরও তো তার অজানাই ছেল। তবে জানা উচিত ছেল। এখনকার পশ্চিমবঙ্গের ছি পি এম পাটির দোয়ায় পেটের ভাত পোঁদের লুঙি থাক আর নাই থাক বক্তিমের কোনো অভাব লাই। সকলেই বক্তা সিখানে। সকলিই বলে, শোনে না কেউই।

হুঁকোটা হাতে তুইল্যে নে নতুন ছিলিম লাইগ্যে দেশলাই জ্বালল সারেং মিঞা।

বলল, তুমি যা বইললে ব্যাটা, তুমি যা বইললে দোস্ত, তুমি যা বইললে বিরাদর, তুমি যা বইললে হকুমদার, তুমি যা বইললে ইনসান ইর জন্যি আমারই শর ঝুঁকাতে দিল করছে তোমার পায়ে। পরবরদিগার ভাবনা দিয়েচেন সব ইনসানকে। নাক দিয়েচেন, চোক দিয়েচেন, জিভ দিয়েচেন, মগজ দিয়েচেন, কিন্তু বেশির ভাগ ইনসানকেই সেইসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যাভার দেননি। তুমি আজ যিসব কথা বললে ব্যাটা, সিসব লব্জ, সিসব পায়েরভি খুদাহতাল্লার রহমৎ ছাড়া ইকিবারে অসম্ভবই চেল। বিলকুলই অসম্ভব। আর সি জন্যিই আমার এমন শর্মিন্দা। আমি জানি, আমি কে। আমি কতটুকু। তাও জানি। আর জানি বলেই ত, অমার এত নজ্জা। সবসময়ে শর ঝুঁকিয়েই থাকি।

সারেং চাচা, তুমি জানো না তুমি কে। ভাবছ বটে যে, জানো। আমি যা বললাম, তুমি তাই।

হো হো করে হেসে উঠল সারেং মিঞা।

বলল, জানো হোসেন, আমার সেই ফওত হয়ে-যাওয়া হিঁদু ব্রাহ্মণ দোস্ত লক্ষমন পাঁড়ে, যে

কালীঘাটে পুজো চড়াতে এসে কালীঘাটের শ্মশানেই ছাই হল, সে এই চেনাচেনির বাবদে আমাকে একটা কতা বলত। প্রায়ই বলত। তার কতা প্রায়ই মনে পড়ে।

সে তো হিঁদু।

হোসেন বলল, অবাক হয়ে।

তাতে কি? সেও তো ইনসান। আমারই মতো। আর সব ধর্মই তো একই। সব ধার্মিকই তো বিরাদর।

তা সে কী বলত? তাই বলো। তোমার লক্ষমন পাঁড়ে?

পাঁড়েজি বলত, ওদের হিঁদু ধর্মে ওদের শাস্ত্রে নাকি একটা কতা আচে "আত্মানং বিদ্ধি।"

কোন শাস্ত্র?

এই রে! তা কি আমি জানি। ওদের অনেক শাস্ত্র আছে বেদ, গীতা উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, রামচরিত মানস। তবে কোন শাস্ত্রে এ কথা বলেছে তা বলতি পারব না।

কতাটার মানে কি? আত্মানং বিদ্ধি?

মানে, নিজেকে জানো। তুমি যেমন বললে যে, আমি নিজেকে জেনেচি। নিজেকেই যদি জেনে ফেলতি পারতাম তবে আর জানার বাকি কি থাকত দোস্ত! কত্তদিন থেকে ভেবেচি "গীতা" পড়ব কিন্তু পড়া হয়নি। আমার পড়া হয়নি, কিন্তু আমার দোস্ত লক্ষ্মণ পাঁড়ের কিন্তু "কোরাণ শরিফ" মুখস্ত চিল। সমস্ত রুকু, আয়াত, বয়েত। মস্ত পণ্ডিত মানুষ ছিল পাঁড়েজি।

হোসেন বুজতি পারল যে, সারেং মিঞার একটু 'সেন্টু' হইয়েচে নইলে এমন যাত্রার কায়দাতে কতা তো সে ককনও বলেনি এতদিন। 'সেন্টু' হইয়েচে বইলেই, এট্টু চুপ মেইর্যে গেল হোসেন।

সকালের বাতাসে সারেং মিঞার সাদা দাড়ি উইড়তেচেল। বাঁ দিকের পাশখালের দিকে মেলা সাদা বকও উইড়তেচেল। সজনেখালির পর পাকি-টাকি আর বিশেষ চোকে পড়েনি। ইকানে পাকিদের কিসের মেলা বইসল কে জানি! ইলিকশান-এর মিটিং কি? কতগুলো বড়ো বড়ো কালো পাকি, কাদাখোঁচাদের মতন; অদ্ভুত ডাক ডাইকতে ডাইকতে উইড়ে গেল বাঁ দিক থেকি ডানদিকে ওদের মাতার ওপর দে।

কি পাকি এগুলো চাচা?

এগুলানরে কয়, কালু। মানে ইঞ্জিরি নাম।

কালু! কক্কনো দেইকিনিকো আগে।

সবাই কি সব দেইক্যে ফেলেছে বাজান? জীবনে সবকিছুই একদিন পরথম দেখতি হয়। তোমার জীবন ও পঁচিশ বছরের মাত্র, কত কী দেকার বাকি আচে একনও। কত সুন্দর সব জিনিস, কত ভয়ংকর সব জিনিস, জানতে বাকি আছে কত রহস্য! হতে বাকি আছে কত সুন্দর অসুন্দর অভিজ্ঞতা। তাড়া কিসের দোস্ত?

এরফান মিঞা যে শুধু বিয়েই করেচে হোসেনেরই বয়সে তাই নয়, তার যে দুই ছেলেমেয়েও হইয়ে গেচে এই কথাটাই হোসেনকে ভাইব্যে তুলল। অথচ বিতিচি গেরাম তার আব্বা-আম্মী যে ছোটো ভাইটাকে বিয়ে দিই দিচে, তারাও যে ঘোর সংসারী হইচে সি কতাটাই একেবারও মনে ছেলনি হোসেনের। "সংসারী" যাদের হবার, তারা ঠিকই হয়, টাইমেও। কিন্তুক কেন যে হয়; মানে "সংসারী", এই কথাটিই ভেইব্যে পায় না হোসেন।

চাচা, তুমি বিয়ে-থা কইরলে না কেন গো?

হঠাৎ সারেং মিঞাকে শুধোল হোসেন।

সারেং মিঞা বইঠা থামিয়ে এক মুহূর্তে দূরের রোদ চিকচিক করা নদীর বাঁকে চেয়ে রইল। চোখের মণি যেন ক্যামেরা লেন্স। তা-তে সমস্ত নদী, বন, পাকি, ছায়া সব ছবি হয়ে ফুটে উটল।

কিন্তু মুখে কোনো কথা কইল না মিঞা।

হোসেন বলল, ভয় পেইয়েচিলে কি? সাহসে কুলোলনি? আমারই মতো?

সারেং মিঞা দুদিকে মাথা নাড়ল।

তবে? রহস্যের মদ্দি যেতে চাইলে না। সকলেই তো বলে বিয়ে হল গিয়ে "দিল্লিকা লাড্ডু"। যো খায়া উ পস্তায়া, যো নেহি খায়া উওভি পস্তায়া।"

না রে হোসেন, সি জন্যিও লয়।

তবে? কি জন্যি?

সকলেই যা করে, সারেং মিঞা তা কোনোদিনও করেনি। সকলেই তো করে বিয়ে। বিয়ে করে, ছেলেমেয়ে হয়, ঘর সংসার করে। তাদের খাওয়াতি পরাতি গিয়ে অধিকাংশ মানুষই নাকানিচুবুনি খায়।

নাকানিচুবুনি খাওয়ার চিন্তাতেই কি নিকাহ করলেনি তুমি? তাহলে, পরের বোঝ মাথায় নিয়ে কাইট্যে গেলে কি করি সারাজীবন? কারো বোজাই যদি না বইতে তবে না হয় কথা চেল। এই যে মনিষ্যি তোমায় ভালোবাসে, মান্যিগন্যি করে তাদের জন্যি কি তোমার কম চিন্তে ভাবনা?

জিভ আর টাগরা দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করল সারেং মিঞা, ট্যাক করে। অধৈর্যসূচক। এবং সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা নাড়াল দুদিকে। আপত্তিসূচক।

হোসেন কথা না বলে, সারেং মিঞা মুখের পানে চেয়ে রইল।

সারেং মিঞা আবার বৈঠা বাইতে শুরু করার হোসেন বলল, তুমি একটু ছিলিম টেইনে নাও চাচা, আমি বইঠে বাইচি।

পারবি? তোর হাতে তো ঘা হয়ি যাবে।

ঘা হবে, ঘা শুকুবে, ব্যথা হবে, ব্যথা মরবে, এমনি করেই তো নতুন জুতো, নতুন বইঠে, নতুন কত কিছুই সইয়ে লিতি হয়। সি ভয় করলি চইলবে কেন! ওঠো তুমি সারেং মিঞা। ফোস্কা শুইক্যেও গেচে।

সারেং মিঞা বইঠা ছেড়ে উঠে হালের কাছে গিয়ে বসে পা দিয়ে হাল ধরে দু-হাতে হুঁকো ধরি খেতি লাগল।

সারেং মিঞা হুঁকোতে বেশ কয়েক টান লাগানোর পর অধৈর্য গলাতে হোসেন বলল, কই? বললে না তো!

সারেং মিঞা একরাশ ধুঁয়ো ছাড়ল। তামাকের চিটচিটে গন্ধে নদীর গন্ধ মেশান দিল। সারেং বলল, মনিষ্যি হইয়ে ইকানে এলি ক্যান? ই কতাটি কক্কনো ভেইবেচিস?

কোতায় এলাম বইলচ? সোঁদরবনে?

আরে না, না। সোঁদরবনে লয়, পিরথিবীতে। এই দুনিয়াতে।

প্রথমটা হোসেন থতোমতো খেয়ে গেল একটু। পরক্ষণেই বলল, ইটা আবার কী প্রশ্ন? তোমাকে শুদোলাম তোমার নাম কি? তুমি জবাবে বইললে, পেট খারাপ হয়নি। অজীব তো! সব মনিষ্যিই যিজন্যে আসে সিজন্যেই এইসিচি।

সব মনিষ্যি কি জইন্যে আসে? পেটের ধান্দা করতি, টাকা রোজগার করতি, বিয়ে করতি, ছেলেমেয়ে পায়দা করতি, মেয়ের বিয়ে দিতি, বুড়ো হইয়ে নাতি-নাতনি কোলে কইরে রোদে পিঠ দে দাঁইড়ে পরনিন্দা পরচর্চা করতি? এই জন্যিই কি মনুষ্যি দুনিয়াতে আসে?

হোসেন মিঞা চুপ করে রইল।

সারেং মিঞার মুখ হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বলল, মনে পড়ে গেল, হঠাৎই; মওকে-পর। বলল, একটা শের আচে, আমাকে পাটনার সুরমাওয়ালা মুনাব্বর বলেচিল বহু বছর আগে। তখন আমি জওয়ান।—

"আদম নহি হ্যায়, সুরত-এ আদম বহুত হ্যায় হিঁয়া।"

মানেটা কি হল? তা বলবে তো!

মানে হল, মনিষ্যি লাই, তবে মনিষ্যির চেহারার জীব ইকানে বিস্তর। মনিষ্যির চেহারা লিয়ে জন্মালেই তো কেউ আর মনিষ্যি হইয়ে যায় না হোসেন। চাইরদিকে যত মানুষ আমরা দেইকতে পাই, তাদের মদ্দি নিরানব্বই ভাগই মেশিন। পিসটনের মতো। জাঁতা কলের মতো। জীবন পিষে যাচ্ছে সকাল থেকে সন্দে। কী পিষছে? কেন পিষছে? কোথা থেকে এইসেচে? কোথায় যাবেক সি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র চিন্তা-ভাবনা নাই তাদের। যন্ত্রে আর সেসব মনুষ্যিতে তফাতও নেই কোনো। মানুষ হতিচে খুদাহ্‌র সবচেইয়ে কিমতি, সবচেয়ে পেয়ার-দুলহার এর জীব। তাকে কত্ত অকলদার করে পাইটেচেন পরবরদিগার ইকানে। সেই যদি অন্ধের মতোই চলল, অন্ধের মতোই শুধু ফজিরের আর জামার, মগরীব আর ইশার নমাজ পড়ে নিজের আর নিজের বিবি আর আণ্ডা-বাচ্চার খিদমতগারি করেই জিন্দগির কাবার কইরে দিয়ে চইলে গেল তো মনিষ্যি হয়ে জন্মাবার দরকারটাই বা কি চেল?

হোসেন হেসে ফেলল, সারেং মিঞার কথাতে।

একটু উষ্মার সঙ্গেই ও বলল, আজীব কথা বলচ তুমি চাচা। আদম-এর সকল নিয়ে দুনিয়াতে এসেছে বলেই কি সে তার আব্বা-আম্মীর খাল-খরিয়াৎ পুচবে না? বিবিজান-এর আরাম-সুবিস্তা দিকবে না? বাল-বাচ্চার আণ্ডা-রোটির বন্দোবস্ত করবে না? সে তো তাইলে আমার মতো বে-কামকা মর্দ হয়ে, গালিই কুড়িয়ে বেড়াবে সারাজীবন?

হাঃ হাঃ হাঃ করে হাসল সারেং মিঞা।

বলল, তুই বেকামকা আদমি বলেই তো তোকে রেখেছি সঙ্গী হিসেবে। জানি না, তোর দৌড় কতটুকু। কতদূর যেতে পারবি তুই। তবে এক বিশেষ পথে চলবার এলেমটুকু তুই অর্জন করেছিস। বাকিটা খুদাতাল্লার দোয়া।

হোসেন, সারেং মিঞার কথার মানে পুরো বুজতে না পেরি বইঠে বাইতে বাইতে সামনের জলের দিকে চেয়ি রইল। সামনেই নদী বাঁক নেচে প্রায় সমকৌণিক বাঁক। জলের মদ্দি লক্ষ সূর্য ঝকমকাতিচে।

সারেং মিঞা স্বগতোক্তির মতো বলল। দোষ তো তোর অনেকই। আমার দোষ আর ভুলও তো পাহাড়-প্রমাণ। ছেইল্যে বয়েস থেকি আজ অবধি যা করলাম, যত মরদ-আওরাত-এর আঁসু বওয়ালাম তার তো কোনো লেকাজোকা লাই। তবে কথাটা কী জানো হোসেন, যিনি দুনিয়ার সব দোষ-গুণের বিচারক তাঁর বড়োই দয়া। পাটনার সুরমওয়ালা মুনাব্বর আরও একটি শের বলত, ভারী দিলচসপি শের। বলত :

> "গলতিয়াঁ করতা হুঁ জী ভর, ইস লিয়ে
> বকশিশোঁপর তেরে, মুঝকো নাজ হ্যায়।"

মানে কি হল? যেমন হিন্দুদের সংস্কৃত অং-বং। তেমন আমাদের এই উর্দুফারসি। ফোঁস ফোঁস করে শুধু।

সারেং মিঞা হেসে বলল, এই তিন ভাষারই জুড়ি নেই রে বেয়াকুফ। তুই মুক্‌্য তাই ই-কথা কইচিস। ইংরেজরা চলি যাবার পর যদি এই তিনভাষার ঠিকমতো চর্চা হত হিন্দুস্থানে পাকিস্তানে তাহলে দুই দেশিই কতদূর এইগ্যে যেত এতদিনে। ইংরেজদের নকলনবিশ হয়েই তো ই অবস্তা হল আমাদের।

আঃ চাচা, শের-এর মানেটা তো বলবে। মৌলবি সাহেবদের কাছ থেকে চিরদিন দূরে দূরে থেইক্যেও দেকচি কপালে দেদার দুঃকু। জলে কামট-কুমির, ডাঙায় সাপ বাঘ আর নৌকোতে তোমার মতো মৌলবি।

তওবা! তওবা!

হোসেন বলল।

সারেং মিঞা হেসে ফেলল ওর কথাতে। বলল শোন—

"খুদাই তুমার দোয়ার উপর, ক্ষমার উপরে যে আমার অগাধ ভরসা।
তাই না জিন্দগি ভর শুধু ভুলই করে এলম!
শুধু ভুলই করে এলম।"

৭

দুপুরে বড়ো চামটা আর দুগ্যাদোয়ানি খালের মুখেই নৌকো ডিঙি সব বেঁধে খাওয়াদাওয়া সেরে নেচিল হোসেনরা। কলিমুদ্দি, কালু মিঞা আর এরফানরাও। চালে ডালে ফুটিয়ে খেয়েই আবার ডিঙি ছেড়ে দিল। তারপর কাঁকড়া ধরবে বলে ওরা পাশের একটি বড়ো শিষখালে ঢুইক্যে গেল। হোসেনরা এগিয়ে গেল।

সন্ধের মুখে মুখে বড়ো চামটার খালের মদ্দি ঢুকি যিখানে সারে সারে নৌকো সব মাঝনদীতে নোঙর করা ছিল, তাদেরই পাশে গিয়ে তারাও নোঙর কইরল। সন্দির মুকে মুকে পৌচোতি, দু-একজন চিনতে পারলেও অধিকাংশই সারেং মিঞাকে চিনতে পারল না। তাছাড়া এত নৌকো আসতিচে কে কার খোঁজ রাখে।

হোসেন দেখল, রিঞ্জারবাবুর লঞ্চও তারই মধ্যে নোঙর কইর্যে আচে। পেকাণ্ড উঁচু সাদা ফুটফুটে রং। যেন, বিরাট এক রাজহাঁসটি।

এখন শুক্লপক্ষ। আজ হয়তো নবমী দশমী হবে। সূর্য পশ্চিমের বনে ডুবতি না ডুবতিই একেবারে নিঃশব্দে, কিন্তু রই রই করে চাঁদ উঠল। ডাঙার জঙ্গলে চাঁদের এক রূপ আর জলের জঙ্গলে অন্য। জলে মদ্দি হাজার হাজার চাঁদ ঝকমকাতি লাগল। মায়াঞ্জন লেগি গেল যেন একেবারে হোসেনের চোকে। এমন জলজ সৌন্দর্যে, এমন গা-ছমছম-করা জিন-পরীদের দেশে ককনও আসেনি সে আগে।

"বিবির বিল" বা "জলপিপির জলা"তেও চাঁদের সৌন্দর্যের কোনো তুলনা হয় না। সিকানে কত রাতে একা একা পূর্ণিমার চাঁদ ভাসি বিলে তার ডোঙা বেয়ে সৌন্দর্যে বুঁদ হইয়ে ফিরেচে হোসেন। কত আশ্চর্যি সব শব্দ, গন্দ, সেই সব পূর্ণিমার রাতে! বড়ো মাছের ঘাই মেরে যাওয়া। চাঁদের আলোতে ঝকঝক-করা রুপোলি আয়নার কাচকে দু টুকরো করে কেটে উপুরে উপুরে কালো ছিপছিপে সাপ সটান সাঁতরে গিয়ে সেই আলোর আয়নাকে নড়ায় কীভাবে তা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেচে ও। ডোমকুর, কামপাখি, জলপিপি, পানকৌড়ি, সল্লি হাঁস এবং ডুব-ডুবারা রাতের বেলা ঘন হয়ে বসি কী সব স্বগতোক্তি করে। সি সবও শুইনেচে হোসেন। মরা গাছের কালো ডালে সব জীবন্ত সাদা বকেরা ফুলের মতো ফুইট্যে থেইককেচে সারা রাত আর মরা পেয়ারা গাছের সাদা ডালে চাঁদের আলোতে উদ্ভাসিত রুপোলি আকাশের পটভূমিতে পানকৌড়িরা কেমন গলা উঁচিয়ে অন্য দিগন্তের প্রহরীর মতো বসি রাতভর বইসে থেকিচে তাও সে দেইককেচে। আলেয়া দেকেচে বাদার ওপরে ওপরে। সি সব অবশ্য আঁধার রাতে। আলোয়াই, না মনসুর-চাচার বিধবা মেয়ে সালমা? যার সঙ্গে সালমার মাঝবয়সি ল্যাংড়া ফুকার পিরিত ছিল,

সেই কি? সেই মালসাতে আগুন জ্বেলে আসত নাকি সে যাতে আলেয়া ভেবে, মানুষে কাছে না আসে ভয়ে। আসত, সালমা কৃষ্ণপক্ষের রাতে শরীরের খিদে মেটাতে।

সে খিদেটা কেমন তা পঁচিশ বছরের হোসেন জানে কিন্তু খেয়ে ককনও দেকেনি। তার মনের খিদে নিয়েই সে বেশি ব্যতিব্যস্ত ছেল এবং আচে।

হুরী-পরীরা "বিবির বিল"এ পূর্ণিমার রাতে নাকি চান করতি নামত। সব পোশাক-আশাক বিলের পারে খুইলে রেকি তারা জলকেলি করত তাদের সোনারপারা অঙ্গ নেইড়ে নেইড়ে, বিলের মদ্দি তরঙ্গ তুলে তুলে। সেই দৃশ্য এক বার চুরি করে দেখে গজানন হাজরা চিরদিনের মতো অন্দ হয়ে গেচিল। দু চোখই অন্দ।

সে কথা ভালোমতো জেনিও হোসেন কত রাত চুপ করি বিলের মধ্যি ডোঙা লাগায়ে ঝাঁঝির মদ্দি মড়ার মতো চুপ কইর‍্যে বসি থেকিচে। অন্ধ হয়ে গেলেও তার দুঃক ছেলে না কোনো। যদি দেকতি পেত জিন-পরীদের চান করা পূর্ণিমার রাতে।

কিন্তু পায়নি।

সি সব ভয়, সি সব গা-ছমছমানি, এই চামটার খালের দমবন্ধ ভয়াবহতার সঙ্গে আদৌ তুলনীয় লয়।

কত লৌকো, ডিঙি, ছিপই যে না নেগেছে! বড়ো বড়ো মহাজনি লৌকো, কাঠুরেদের গোলপাতা-কাটিয়েদের। কোনো ডিঙিতে কেউ গান ধইরেচে নিজের মনে। কোনো নৌকোর জালিবোটে রান্না হতিচে। গাবুক-গুবুক কইর‍্যে মশলা বাটতিচে কেউ। কষে লংকা-প্যাজ-রসুন দে ক্যাঁকড়ার ঝোল বানাবে মনি হয়। বড়ো নৌকোর পাটাতনে কত কিছুর মিটিং বইসেচে। কেউ গলুইয়ের কাচে বসে পা দিয়ে পাক দিয়ে দিয়ে লাইলনের সুতো দ্যে জাল বুইনতেচে।

রিঙ্গার সাহেব তাঁর বোটের দোতলার ডেকের পরে ইজিচেয়ার পেতি বইস্যে আছেন সাদা লুঙি আর এট্টা হাত কাটা সাদা গেঞ্জি পইর‍্যে। হোসেনদের ডিঙি নৌকোতে বইসে অনেক উঁচু দোতলা বোটের রিঙ্গার সাহেবকে ভগমান বলি মনে হতিচে; তাঁর বাবুর্চি তাঁর জন্যি "খানা" বানাতিচে। গড়গড়ার আলবোলার নলি রইয়েচে তাঁর হাতে। গুড়ুক হুড়ুক করি টান মাইরতিচেন আর সি তামাকের গন্দে চামটার খাল ম-ম করি উইটতেচে।

হোসেন নাক তুইল্যে গন্ধ নেতিচেল। তামাকের। চাঁদের রাত বলি সাদা ধোঁয়া ঠিক ঠাহর হচ্ছিল না। কিন্তু গন্ধ জব্বর।

সারেং বলল, কী তামাক এটা জানিস?

কী তামাক?

এ হল ত্রিপুরা তামাক। এই রেঙ্গারবাবুর বাড়ি আগরতলা। সিখান থিকে "খাম্বীরা' তামাক আনান বাবু। বাবু ভারী শৌখিন। বাদার এক বউ, ক্যানিং টাউনে এক বউ আর আগরতলায় আরেক বউ।

এত বউ! তা বউ খেয়ি থাকলিই পারে! তামাক লাগে কী কাজে?

তা আমি বলি কেমন কইর‍্যে।

তা, খাম্বীরা তামাকটা কী জিনিস বটেক?

হাঃ। খাম্বীরা তামাক!

তুমি কি আগরতলাতেও গেছ নাকি? সিটা কোন দেশ?

আরে মুক্যু। সিটা ত্রিপুরা রাজ্য। ইংরেজ সায়েবরা উচ্চারণ করত "টিপারা" বলে।

ত্রিপুরা, টিপারা কেন?

তা আমি কী করে জাইনব।

তা বলো সারেং, খাম্বীরা তামাকের কতাই বলো।

জটাবংশী, জষ্টিমধু,পামেলা, একাঙ্গী, জয়িত্রি, জায়ফল, লবঙ্গ, এলাচ, দারচিনি, চুয়া, চিনিরাব, সবরী কলা এই সবের মিশেল দেতি হয় তামাকের সঙ্গি। তবে হয় খাম্বীরা তামাক।

ফিরিস্তি শুনে হোসেন হাঁ হয়ে গেল। সারেং বলল, কী খাবি?

না খেলিও হয়।

তা কেন! সোঁদরবনে এইস্যি একবেলাও না-খেয়ে কেউই থাকে না। কে বলতে পারি এই খাওয়াই শেষ খাওয়া কিনা।

মুড়ি খেলিই হয়।

কেন, চালে ডালে খিচুড়ি চাপায়ে দিতেচি। আলু প্যাঁজ সেদ্ধ। হইয়ে যাবে একুনি। তুই চাপা, আমি বইলে দেবকন। রান্না করা আবার কী এমন কাজ। তা ভালো রান্না করা খুব কঠিন কাজ। কাজের মতো কাজ। তা আমাদের তেমন রান্নাতে দরকার নাই তো। যেনতেন পেকারেন ক্ষুন্নিবারণ হইল্যেই হল। ই সব যত বাদ দিতি পারবি, যত কর্ম করতি পারবি, ততই দেখবি, হালকা হতিচিস। থাক থাক, খিদের মুখে ইসব ভারি বাইক্য তোর হজম হবে না। নে, চাপা।

খিচুড়িটার বেশ গন্ধ ছেড়েছে। পাশের নৌকোতে কে যেন মুগের ডালে রসুন কালোজিরে আর শুকনো লংকা ফোড়ন দিল। আঃ! এ যেন "খাম্বীরা" তামাকের গন্ধকেও হার মানাল।

ঠিক সেই সময়েই ঝপাং করে একটা আওয়াজ হল; ডালে ফোড়ন দেওয়া নৌকোর পরেই যে গোলপাতার মহাজনি নৌকো চেল তার সঙ্গের ছোটো ডিঙি থেকি এল আওয়াজটা। মশলা বাটচিল কেউ। ঝপাং শব্দের সঙ্গি সঙ্গি মশলা বাটার আওয়াজও থেকে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে শোরগোল চিৎকার।

নে গেল রে! গোবিন্দকে নে গেল হারামিটা! মামারে!

কে গোবিন্দ, কে হারামি, হোসেন কিছুই বুজতে পারল না।

দেখল, ফুটফুটে চাঁদের আলোতে ভাসা মাতলার খালের মধ্যে একটা পেকাণ্ড ফুটবলের মতো কালো গোল কী জিনিস লক্ষ লক্ষ রুপোর সাপে কিলবিল করা নদীর মধ্যে সাপগুলোকে কেটে টুকরো করতি করতি একটা মানুষের কাঁধ আর ঘাড়ের মদ্দিখানে কামড়ে ধইর্যে সাঁতরে যাচ্চে উত্তরের পারের দিকে। বাঘটা কোনদিক দিয়ে সাঁতরি এল খাল-মাঝে কেমন করি এতজোড়া চোকের কোনো চোকে ধরা না দে আর কোন দুঃসাহসে মহাজনি নৌকোর সঙ্গি বাঁধা ডিঙিতে বসি মশলা-বাটা মানুষকে মুখে তুলি নেয়ি চলি গেল এতজন মনুষ্যির সামনে দে সি কতা তা ভাবাই যাচ্চে না।

মহাজনি নৌকোর পাটাতনে বসি কম করি দশজন মানুষ গল্প করচেল। হরিণ মেরেচিল নুকিয়ে। তার মাংস আর ঝোল খাবে তারই অপেক্কাতে ছিল। অথচ বাঘ ভুরুক্কেপ করল না।

চার-পাঁচখান নৌকো নোঙর তুলে বাঘের পিছা করল চিৎকার করতি করতি। যেন চিৎকারে ভয় পেয়ি বাঘ গোবিন্দকে ছেড়ি দিবে।

রেঞ্জার ডেক-এ দাঁড়িয়ে তাঁর দোনলা বন্দুক চারবার গুলি পুটোলেন।

সারেং মিঞা বিড়বিড় করল।

বলল, শব্দে কি আর সোঁদরবনের বাঘ ভয় পায়? শব্দে তারা কাচে আসে।

তুমি কিচু করো সারেং চাচা। তোমার বন্দুকটা.......

আমার বন্দুকটা বে-পাশি! তাছাড়া গোবিন্দ একন সব করাকরির বাইরে চলে গেচে।

কী করে বুঝলে?

জানি, তাই। বাঘ যখন ড্যাঙাতে পৌঁচে ওকে নামাবে তখনই গলগল করে রক্ত বেরুবে। শ্বাসনালি, ফুসফুস অথবা হৃদয় তার ফুটো হয়ে গেচে। যদি এই গোলমালের কারণে ওকে বয়ে নিয়ে যেতে না পারে খাওয়ার জন্যে, তবে পারে উঠেই ওকে মাটিতে নামিই শেয়ালে যেমন করি

কইমাছ চিবিয়ে মাঠের আলে ফেলি যায় কইমাছের মতো; তেমন কইরে গোবিন্দর মাতায় এক কামড় দিয়ে কইমাছের মাতারই মতো ফেলি যাবে।

ইস্‌স। বইলচ কি চাচা।

বাঘ ততক্ষণে পারের কাছাকাছি পৌঁচেচে। এত গোলমাল, বন্দুকের আওয়াজ, প্রায় দেড়শো মানুষে চিৎকার এত সবের কোনো প্রভাবই পড়ল না বাঘের উপরে।

হোসেন খিচুড়ি সেদ্ধ হল কিনা দেখতে যেতেই ওর মদ্দি, ওর শিরদাঁড়া বেয়ি ভীষণ এক ঘৃণা শিরশির করি নেমি গেল। ঘৃণাটা ওর নিজেরই প্রতি। একটি মানুষ মরতি বসেছে যদিও, তবু একনও প্রাণ আচে, সি কতা জেনেও ও খিচুড়ির ভাবনা ভাইবতে নেগেছে।

সারেং বলল, এই বেলা দু-তিন চামচ ঘি ফেলে দে খিচুড়িতে। স্বাদ ভালো হবে'কন।

হঠাৎই তা গুরু তার পূজ্য, তার ফেরেস্তা, সারেং মিঞার ওপরেও তার ভক্তি চটে গেল।

হোসেন কতা বলতি পারল না। থুথু আটকে গেল ওর গলাতে। ঠিক সি সময়েই রিঞ্জার সাহেব পরপর আরও দুটি গুলি করলেন। উনি বাঘের উদ্দেশেও গুলি করতে পারছিলেন না পাছে মনুষ্যিটির গায়ে লাগে। তাই শূন্যে শব্দ।

হোসেনের চোকে জল এসি গেচিল। ও ভাবচিল শূন্যে শব্দই সার। শুধু সোঁদরবনেই নয়। কত বদমাইশ, ইতর, সুদখোর, অত্যাচারী মানুষকে কত শালার সামন্তদের ও নিজে হাতেই মারতে চেয়েছিল। মারতে তো পারেইনি, নিজেকে হাস্যাস্পদই করেছে। শূন্যে চোট করেছে কল্পনার বন্দুকে। ছ্যাঃ।

একটা সময়ে তাড়া করে যাওয়া নৌকোগুলি ফিইরে এল। গোবিন্দর নিস্পন্দ লাশ সঙ্গে নিয়ে। তার হাতে তখনও হলুদ লেগে চেল। সারেং মিঞা যা বইলেচেল ঠিক তাই। গোবিন্দর মাতাটাকেই মাছের মতো চিবিয়ে ওকানেই গোবিন্দর লাশ ফেলি রেকি গেচিল বাঘ।

একসঙ্গে অনেকেই কতা বলচেল। বলচিল, কজন গোবিন্দকে নিয়ে ফিরে যাবে ওর গ্রামে। বিয়ে করেছে তিনমাস। বিধবা মা আচে। গ্রামে দাহ করবে।

সারেং মিঞা গলা তুলে ধমক দিল।

বলল, বাঁচাতে পারলি নি। বাঘকে মারতি পারলি নি। আর ফোলা-পচা লাশ নে গিয়ে মা আর পোয়াতি বউকে দেখাবি। সাব্বাশ তোরা। পুরুষ-মানুষই বটে। কাল আলো ফোটার সঙ্গি সঙ্গি গোবিন্দকে জ্বালাবি তোরা ওই ক্যাওড়া গাছের তলে।

ততক্ষণে গোবিন্দর জায়গাতে অন্য একজন হরিণের মাংসের জন্যে মশলা পিশতে লেগেছিল। পেটের জন্যিই তো সব! এত কষ্টে, এত ঝুঁকি নে সোঁদরবনে আসা! যে গেচে সে তো গেচেই। নিয়তি নেচে তাকে। তা বলি যারা রইয়্যে গেল তারা কি হরিণের মাংস খাবে না?

হোসেন ধরা গলায় সারেং মিঞাকে শুধোল, তুমি চিনতে নাকি গোবিন্দকে?

চিনতাম? ওকে ন্যাংটো দেকিচি আমি। ওর বাপ আমার সাঙাত চেল। ওর বে-র সময়েই গেইচেনু ওদের গেরামে। ভোজ খেইয়ে এইসেচিলাম।

তুমি যাবে না ওর গ্রামে?

নাঃ। আর কী হবে! কী আছে ওই গ্রামে! জীবিকার সন্ধান এসি একটা মনুষ্যি মইর‍্যা গেল তা এ নিয়ে এত থ্যাটারেরই বা কি আচে? কইলকেতা শহরে যারা আপিসে কাজ করে, তাদের মদ্দি বচরে কতজন বাস-ট্রাম-মিনিবাস-ট্রাক চাপা পড়ি মরে অফিস যেতি আসতি সি খবর কেউ নেয় কি? সোঁদবনের বাঘে কেইয়েচে বলেই কেঁইদে বেড়াতি হবে আর ভবানীপুরের যোগব্রত ঘোষ, এ. জি. বেঙ্গলের কর্মচারী, আপার ডিবিসান ক্লার্ক, পি.জি হাসপাতালের সামনে মিনিবাস চাপা পড়ে মারা গেলি কাঁদতে হবেনি ইটা কি কতা। মৃত্যু; মৃত্যুই। রুজি-রোজগারের জন্যি সকলকেই মৃত্যুর জন্যি তৈরি থাকতি হয়। এ নিয়ে কাব্যি যারা করে সে শালারা মনুষ্যিই লয়। এই তোকে

বলে দিলম। নে, এবার খিচুড়ি হাঁড়ির ঢাকনাটা খুলে ঘি ঢাল আর এট্টু। বাঃ। গন্ধটা তো বেড়ে হয়েচে রে!

৮

ছইয়ের মদ্দি শুইয়ে থাকার অন্ধকার অন্ধকার ঠেকতেচেল। তার উপরে সারেং চাচা আবার লুঙিখান ধুয়ে ছইয়ের উপরেই মেইলে দেচিল। তকনও হারিকেনটা জ্বলতিচে। ফিতে অবশ্য খুবই নামানো আচে।

চোখ খুইলোও ভাবল হোসেন। ভোর একনো হয়নি বোদয়। তারপরই, বাইরের নানা আওয়াজ বুজল যে, সকলেই উইটে পইড়েচে। ও একাই শুয়ে আচে।

তবে কাল রাতে কেলান্তিও চেল কম লয়। দুটি হাতেই নতুন করি ফোস্কা পইড়্যেছে। একটু গ্যাঁদাপাতা থাকলি বেশ হত। গ্যাঁদাপাতার রস ছেঁচি দেলে ঘাটা তাড়াতাড়ি শুকুত। কিন্তু ই রাজ্যে গ্যাঁদাপাতা লাই। তবে অন্য পাতা থাকতি পারে অবশ্যই। সারেং মিঞাকে জিগোতি নজ্জা কইরচে।

বাইরে আসতেই দেকল, কাল রাতে গোনা-গুণতিহীন নৌকো চেল। এখন প্রায় লাই-ই। রিঙ্গার সাহেবও বোট খুলি নে সজনেখালির দিকে চইলে যাবার তোড়জোর করতিচেন। গোবিন্দর লাশ সঙ্গে নে যাবেন ডিপার্ট আপিসে। সিখান থিকে পুলিশ লাশ-কাটা ঘরে নে যাবে। কত ফ্যাচাং। মইর্যেও শান্তি লাই। সিখান থেকি কইলকাতায় খবর দিবেন। কইলকেতা থেকে বড়ো শিকারিদের ইকানে আসার জন্যি ডি. এফ. ও সাহেব কনসার্ভিটর সাহেবকে বইলবেন। মানে "রিকোয়েস্টো" কইরবেন।

জেলে, মউলে, কাঠুরে, সকলেই নাকি বইলেচে যে, চামটাতে ই বছর যেমন উপদ্রব তেমন উপদ্রব আর ককেকোনো নাকি হয়নি আগে! বহর সব আসি পৌছাতি পৌছাতিই চারজন ফওত। কাণ্ড দ্যাকো ইকবার। এর একটা হেস্তনেস্ত না করলি, তারা সব চামটা ছেইড়্যে চাইল্যে যাবে। পয়সা দিয়ে মধু পাড়ার, কাঠ-কাটার, মাছ ধরার পাশ কইর্যেচে আর সি পইসা কি তাদের মাটে মারা যাবে?

তাচাড়া খাবেটা কি তারা? সারা বচর তো এমনিতেই খেতি পায় না। না জোত, না জমি, না চাকরি, না অন্য কোনো ভাবে বাঁচার উপায়। বছরের মদ্দি তিন-চার মাসের সাশ্রয়; তাও কি হবার লয়?

রিঙ্গার সাহেব সারেং মিঞাকে ডেইক্যে পাইটেচিলেন বোটে। হোসেন যখন ঘুম ভেইঙে উটল তকন চাচা বোটে। পাশের নৌকো থেকি শুনল, কাল রাতে যে সারেং একানে চেল, তা রিঙ্গার সাহেব জানতেনই না। রিঙ্গার সাহেব তাকে ভালো ভালো বিলিতি টোটা দেলেন সরকারি রসদ থেইক্যে। ইংরিজি ইলি-কিনক কোম্পানির। আমেরিকান রেমিংটন কোম্পানির প্লাস্টিক শেল-এর নানারকম বল আর এল জি। আর "বলই" বা কত্তরকম। "রোটাক্স", "লেথাল" "স্ফেরিক্যাল" ইত্যাদি ইত্যাদি। ভারি সুন্দর দেকতি গুলিগুলোন। বিভিন্ন রঙের। জলে ভিজে গেলেও নাকি ক্ষেতি নাই কোনোই, বইললেন সারেং মিঞাকে, রিঙ্গার সাহেব। কইলকেতা থেকি বড়ো শিকারিরা না-আসা পর্যন্ত তুমি ফরেস্ট ডিপার্টের মানটা কোনোক্রমে বাঁচাও সারেং। তুমি যা করতি পারবে, কইলকাতার শিকারিরা তা পারবে না।

সারেং মিঞা পত্যুত্তরে বইলল, কিন্তুক বাউলে তো ইকানে অনেক আচে সায়েব। তাদের বন্দুকও আচে। আমি এখন বুড়া হইচি আর শিকার-টিকার সত্যিই করি না। আমি তো বাউলেও নই, শিকারিও নই, তাচাড়া শিকার তো সত্যিই করতি মোট্টে ভালো লাগে না আমার। আমাকে এ ভার কেন দেন সাহেব?

তুমি কী, আমি জানি সারেং। তুমি কী, তা জানি বলিই তোমার বে-পাশি বন্দুকের কতা ফরেস্ট ডিপার্টের সক্কলে জানলিও কেউ কিচুই বলে না তুমাকে। তুমি আমাদের বিপদে যদি একটু মদত না দাও তাহলি তুমার তো এমন মুসাফিরের মতো সোঁদরবনের যত্র-তত্র ঘুরে বেড়ানো আর চইলবে না।

আমি তো কারো কোনো ক্ষতি করি না বাবু। না ডিপার্টের, না বনের প্রাণীদের। আমার উপরে ডিপার্টের রাগটা কিসের?

এবারে বেশ রেগে গিয়েই বললেন রিঙ্গার সাহেব, তুমি কিচুই যদি না করো তবে বছরের মধ্যে ন মাস, ককনও ককনও বছরের পর বছর এই ভয়ানক বনে, সমুদ্দুরে, নানা দ্বীপের মদ্দি যি-সব জায়গাতে আমাদেরও কারোই পা পড়েনি দশ-বিশ বছর সি সবখানে, শিষখালে তুমি কি করো? তুমি কি কুনো গুপ্তধনের খোঁজ পেইয়েচ নাকি হোসেন? কোনো ডাকাত-টাকাতের? বা রাজা প্রতাপদিত্যের কোষাগারের?

হোসেন চাচা হেসে বইলেচেন, তা বলতি পারেন আপনি বটে সাহেব। গুপ্তধনের খোঁজ পেইয়েচি। তবে, তা সোনাদানা লয়। সি ইকেবারে এক অন্য গুপ্তধন। সি গুপ্তধন এক জীবনে খরচ করি ফেইলব যে, এমন সাধ্য আমার কি? রাজা-রাজড়াদেরও লাই আর আমি তো কোন্ ছার?

তবে কী করতি আসো তুমি সারেং মিঞা? তুমি কি বাংলাদেশের গুপ্তচর?

হাঃ।

বলে হেইসেছিল সারেং মিঞা।

তারপর আরও জোরে হেইসেচেল।

বলেচেল, গুপ্তচর অবশ্যই! তবে সেও বলতি গেলে এ গুপ্তধনেরই মতো। যার গুপ্তধনের দেখ-ভাল করি তার হইয়েই গুপ্তচরগিরিও করি। সব দেশ; আমাদের চিনা জানা সব ধন; যে আমাদের চিনা-জানা কারো দখলের মদ্দি নাও থাকতি পারি এমনটা কি আপনের ভাবনার মদ্দি লাই? যে জ্ঞানে দেশ চলে, ফরেস্ট ডিপার্ট চলে, ইপার-বাংলা উপার-বাংলা চলে, তারও বাইরে অনেক দেশ আছে, তাদের ধারণার আর জ্ঞানের বাইরেও অনেক ধন আচে; মান আচে। সি-সবের ধারণাও যে সবার পক্ষে করা সম্ভব লয় সাহেব। ই-সব আলোচনা বাদ থাকুক। তবে কথা দেতিচি যে, আপনি বা আপনাদের কইলকেতার শিকারিরা সব না-আসা পযযন্ত আমার দ্বারা যতটুকুন হয়ত তা আমি কইরব। আপনার খপর না-পাওয়া পযযন্ত এই চামটা ছেইড়্যে কোথাওই যাব না আমি। কথা দেলম আপনারে।

তোমাকে কিছু টাকা দিয়ে যাব?

কথাটা বলেই রিঙ্গার বুঝলেন যে, ভুল হল। ইকানে টাকা তো কাগজই।

পরক্ষণেই নিজেকে শুধরে বললেন, কিচু আলু-প্যাঁজ আচে বোটে, কুমড়োও আচে আধখানা মশলাপাতি, নুন, নংকা। খাবার জল চাই কি? মোরগা নেবে, সারেং? এক জোড়া পইড়্যেও আছে পা-বাঁধা।

সারেং বইলল, নাঃ। কী হবে।

তবে কি লাই? কী দিতে পারি তোমাকে আমি?

এট্টু খাম্বীরা তামাক যদি দি যেতিন!

খাম্বীরা!

খুবই অবাক হলেন রিঙ্গারবাবু। বললেন, তুমি এই তামাকের নাম শুনলে কুণ্ডেকে? আমি যে খাম্বীরাই কাচ্ছি তাই বা কে বুলল তুমায়?

বলল; বাতাস, বলল; সুবাস।

রিঙ্গার সায়েব হেইসে বললেন, বলেচ খ... তুমি তো পোয়েট লোক দেকচি।

সারেং হেসি বলল, দুটো জিনিস কক্কনো লুকুনো যায় না সায়েব।

কি কি?

সুবাস আর পিরিতি। তারা যে আচে, তা বোজা যাবেই। কাল রাতের নদীর বাতাসে গেঁয়ো, গরান, ক্যাওড়া, ওড়ার ফুলের গন্ধ ইক্কিবারি মেলান করি দে আপনের তামাকের গন্ধ ভাইসতে চেল বাতাসে। আমিও যে ত্রিপুরা রাইজ্যে ছিলম স্যার পাঁচ বচর।

কী করতে সারেং মিঞা তুমি সেখানে? আশ্চর্য! তুমি সিখানে ছিলে আগে কখনও শুনিনি তো।

ত্রিপুরার মহারাজের অনেক শিকারির আমিও একজন ছিলাম। ধরমনগর আর কংতরাইএর জঙ্গলে কত শিকার করেচি তকন।

বল কি?

খুব খুশি হলেন রিঙ্গারবাবু। নিজের দেশের কথা শুনি, সে পাহাড়, জঙ্গলের দেশে যে-মানুষ একসময়ে ছিল, তাকে বাংলোর এই সুদূর ভয়াবহ জলজ রাজ্যে দেখতি পেয়ি যেন নিজের দেশের মাটিরই গন্ধ পেলেন।

হেসি বললেন, এইনে দেচ্চি। বেশি পাবে না কিন্তু। আমার ইস্ত্রী নিজে হাতে বানিয়ে পাঠান আমার জন্যে।

খাম্বীরা তামাক দে বোট-এর নোঙর তুলি চলি গিলেন রিঙ্গার সাহেব। চলি যাবার সময়ে সারেং মিঞা তার নৌকোতে দাঁইড়ে বলল, খুদাহ হাফিজ।

সারেং ভাবচেল, সাহেব তাঁর ত্রিপুরী স্ত্রীকে খুবই ভালোবাসেন। ভালোবাসেন হয়তো সোঁদরবনের এবং কলকেতার স্ত্রীকেও। নিজের নিজের সীমিত অভিজ্ঞতায় অধিকাংশ মানুষই বুঝতে চায় না যে, একজন পুরুষের প্রেম-কাম-উষ্ণতা শুধুমাত্র একজন নারীকে দিয়ে ফুরিয়ে নাও যেতে পারে। সব পুরুষই খাঁচার পোষা পাখি লয়। হয়তো সব নারীও লয়। এত বড়ো পৃথিবী, এত পুরুষ, এত নারী, বিচিত্র তাদের চেহারা, বিচিত্র তাদের স্বভাব, তাদের ভালোবাসার, অবহেলার বা ঘৃণার ধরনধারণ, তা নিয়ে মারামারি করে জীবন নষ্ট করার পেয়োজনটাই বা কি? খুদাহর রাজ্যে, বনবিবির বাবা দক্ষিণরায়ের রাজ্যে, কোনো কিচুরই তো ঘাটতি পড়ে লাই। কম তো কোতাওই কিচু পড়েনি। আর জীবন যখন মোটে একটোই, আপাতত ই কতাটা যদি মেনে নেওয়াই যায়; তবে সি মাত্র একটো জীবন কাইজা মারামারি কইরে লষ্ট করারই বা দরকার কী।

মনে মনে, চলে যাওয়া বোটের দিকে চেয়ে বলেচেন সারেং মিঞা, আহা সুকে থাকেন সায়েব আপনে। সুকে থাকেন আপনার তিন-বিবিগণ। বুঝলেন কিনা সায়েব, এই সুখে-থাকাটাই হল গিয়ে আসল কতা। যে যেমন করে পারে, অন্যকে বেশি দুঃক-টুঃক না দিয়ে নিজেও সুকে তাকুক। সুকে তাকুক সক্কলেই।

সারেং মিঞা জবুথবু মেরে-যাওয়া হোসেনকে বইলল, নে, দুটি গুড়মুড়ি মুইক্যে ফেলি দে এবারে বেইর‍্যে পড়ি আমরা। আগে পিচে-বেশ কিছুটা গিয়ে, পাশ-খাল শিষ-খাল সব ভালো কইর‍্যে একটু নিরীক্ষণ কইরে আসা যাক, যে-বাঘটা কাল রাতে গোবিন্দরে নেচিল সিটা থাকে কুথায়? কোন দিকে? না, রয়ে গেচে কাচাকাচিই ঘাপটি মেরে?

হোসেনদের ডিঙ্গির পাশেই যে ডিঙিটা চেল সেটি জেলেদের নৌকো। ডান-পাশের ডিঙ্গিটা মউলেদের। মধু-পাড়ার ডিঙি। ওদের দু নৌকোতেই একজন করে বাউলে আচে। শিকারী বাউলে নয়। দেয়াসী মন্ত্রজ্ঞ। তারা বনবিবি, বাবা দক্ষিণ রায়, বড়খাঁ গাজি, কালু রায় বা অন্য কারো মন্ত্র পড়ে দে পুজো সেরে দিলে, বনের মদ্দি তবেই নাইমবে অন্যরা।

সেই দুই বাউলের একজনের নাম মদু। অন্যজনের নাম মুনসের। মদু মউলেদের নৌকোতে চেল আর মুনসের জেলেদের। মদু আর মুনসের দুজনেই বইলল, তুমি গুড়-মুড়ি কেয়ে নিয়ে আগে চল চাচা। তুমি যিখানে লৌকো ভিড়িয়ে পুজো দেতি বইলবে, সিকানেই দিব।

ওদের নৌকোর মোরগ দুটোই আলো ফুটতি না ফুটতিই ক'কর-ক-অ-অ-অ করে ঘুম ভাঙিয়েচেল হোসেনের। হোসেন ভেবেচেল, এই খাদ্য-খাদকের অভাবের দেশে সঙ্গে নে এইয়েচে বোদয়, জবাই করে কাবে বলে। ঝুড়ি-চাপা দেওয়া কবুতর আচে দেকল অন্য নৌকোটিতে।

মুড়ি-গুড় চিবিয়ে জল কেয়ে তা ছাড়া হল নৌকো। আগে-পিছে। প্রথম নৌকোতে মউলেরা। আর মদু বাউলে। মদ্দি হোসেনেরা। আর একেবারে পেচনে জেলেরা আর মুনসের বাউলে।

সারেং মিঞা বইলেচেন, চৈত্রের প্রথমে সুন্দরবন ফলে-ফুলে একেবারে সেজে ওটে। বর্ষার রূপও বড়ো চিত্তচমৎকারী। তবে সি সময় বড়ো বড়ো লঞ্চওয়ালাও ইদিক মোট্টে মাড়ায় না। আর ডিঙির নৌকোর কতা তো কোন ছার। পেরকিতির একদিকি রুদ্দনুপ তেমনই আবার ছিন্ধ নুপ। বর্ষার পেটে কিল দে, সাপ বাঘ কুমিরের পায়ি হাত দে, যদি কেউ থেকি যেতি পারে ইকবার তবে তার ইনাম যা মিলবে তা অভাবনীয়। ভরা বর্ষাতে সোঁদরবনের বুকের কোরকে বসি বর্ষা কাইটে গেচে এমন মানুষ মেলা পাবে না খুঁজে।

চৈত্রের প্রথমে ক্যাওড়া, ওড়া, গেঁয়ো, গরান সব গাচই ফুলে ফুলে ভরে ওটে। ফুলপটিতলার লাল, নীল, হলুদ-রঙা ফুল। মৌমাচির ঝাঁক আর প্রজাপতির ঝাঁক তখন দলে দলে উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে মদু খেয়ে খেয়ে ফিনফিনে লাল হলুদ পাখনাতে চৈত্র রোদ ছিটকোতে ছিটকোতে ঘুরের বেড়ায়।

সারেং মিঞা বলে, কিন্তু বুঝলে সাঙাত, বর্ষাব নূপের সত্যিই তুলনা হয় না। নদী খাল শিষখালের নূপের কতা তো ছেইড়েই দিলম, তকন বনেরই বা নূপ কী!

ডাইনে দু-তিনটে বাঁক নিয়েই মউলেদের নৌকো থেকে মদু বাউলে বলল, দ্যাক দ্যাক, গরান ফুলে মধু কেয়ে ওই মৌমাচি উড়ল। লাগ, লাগা, ডিঙি লাগা যাদব।

ওদের ডিঙির সঙ্গে অন্য দুটি ডিঙি লাগল।

ওখানে মন্ত্রজ্ঞ বা পুরোহিতকে বলে "দেয়াসী"। মদু আসলে দেয়াসী।

সে ড্যাঙাতে নেমিই বলল, দ্যাক, দ্যাক কী ভাগ্যি তোদের যাদব! দ্যাক। ট্যাকের উপরে বাবা দক্ষিণ রায়ের থান পযযন্ত রইয়েচে। কী চমৎকার থান রে! কারা কবে পেতিষ্টে করে গেইচিল তোদেরই প্রাণ বাঁচাবার জইন্যে। এখনও বাবা রইয়ে গেচেন। গায়ের সোনার বর্ণ যেমনটি তেমনই আছে। ঝড়-জলেও কিচ্ছুটি হয়নি। উপরের ছাউনিটিও পেরায় যেমনটি তেমনটি আছে। আয়, আয়, কাচে আয়।

হোসেন দেকল, হিঁদুদের এক দেবতা। বড়ো সুন্দর তার চেহারা। দুগ্গা মায়ির পুইত্র কার্তিক ঠাকুরের চেহারার চেয়িও ভালো টেকল যেন চোকি। কাঁচা হলুদের মতো গায়ের রং, থাকথাক কুচকুচে কালো বাবরি চুল তেনার! তার উপর অবার মুকুট-পরা। কানে কুণ্ডল, কপালে রক্তুতিলক, বড়ো বড়ো টানা টানা দুটি চোখ, হিঁদুরা যাকে বলে 'পদ্মপলাশলোচন'। টিকোলো নাক। গোঁফ জোড়া দুই কান অবদি ছইড়্যে গেচে। গায়ে তার রাজার যুদ্ধের পোশাক। হাতে মাটি আর ছিমেন্ট মিশিয়ে তৈরি করা একটি মুঙ্গেরি একনলি গাদা-বন্দুকের মতো দেখতে বন্দুক। কালো এবং লাল রং-করা। পিঠে ঢাল ও তূণীর। বাঘের পিঠে চড়ে আছেন বাবা। তাঁর পাশে প্রায় ওঁরই মতো দেকতি, তবে এট্টু ছোটো। এক দেবতা।

ইনি কে? চাচা?

হোসেন উত্তেজিত হয়ে শুধোল।

ইনিই হইলেন গিয়ে বাবা দক্ষিণ রায়। বড়োমিঞাদের দেবতা। সঙ্গি তাঁর সহোদর, কালু রায়।

বলেই বলল, বাবা দক্ষিণ রায়ের পুজো তো তোমাদের বাদা অঞ্চলেও হবার কতা। দেকোনি কি হোসেন?

না তো! আমাদের মুলুকে এঁরা কেউ নেই। বনবিবিও নয়। ইকেনে এঁকে কারা পেতিষ্টে করল?

কইরেচে এই জঙ্গলে আসা মানুষেরাই। কত মানুষের পরিশ্রমে এ সম্ভব হয়েচে বলো তো দেখি। একন থেকি হোসেন; তোরে তুই-ই বলব। তুমি-টুমি বলা আমার অভ্যাস লাই।

আগেই তো বলতি পারতে। অনেকবার তো বইলেচ।

দ্যাখ মাটির দেওয়াল বানাতি হয়েছে এই মাল বা ট্যাকের উপরে। খড়ের নৌকো ইকানে এনে, তা থেকি খড় লামিয়ে সেই খড় দে চাল ছাওয়া হইয়েচে। বেশিদিন হয়ওনি ওঁর পেতিষ্টে। দেখছিস না, খড়গুলো সব লতুনই রইয়েচে। সুন্দরবনের এক বর্ষার দাপট সইতে হলে ছুঁড়িও বুঝি বুড়ি হয়ে যায়।

বলতে বলতেই, উলটো দিক থেকে একটি জেলে নৌকো আইস্তা আইস্তা বেইয়ে এল। সে নৌকার আরোহীরা হোসেনদের সবাইকে দেখে কী যেন বলতে গিয়েও থেইমে গেল।

ততক্ষণ মদু বাউলে বাবার সামনে হাঁটু গেড়ে বইসে মন্ত্র পইড়তে নেগে গেছে!

"চন্দ্রবদন চন্দ্রকায়।
শার্দূলবাহ দক্কিন রায়।
ঢাল-তরোয়াল টাঙ্গি হস্তে।
দক্কিণরায় নমোহস্তুতে।"

বলেই,মোরগ আর মুরগি দুটোকে আর কবুতর-জোড়কে নে বিড়বিড় করে নীচুগ্রামে কী সব মন্ত্র-টন্ত্র পইড়ে, ছেড়ে দিল জঙ্গলে। তারা তো কঁক-কঁক করে নিমেষের মদ্দি জঙ্গলে মিইল্যে গেল।

হোসেন বলল, চাচা, কাল যে বনির মদ্দি মুরগি দেখলাম সেগুলো জংলি মুরগি লয় কি?

জঙ্গলে যে বাস করে সি তো জংলিই বটেক। তবে এদের আদিবাস সোঁদরবন নয়। মুরগি এখানে কোনকালে চেল কি চেল না তা ফরেস্ট ডিপার্টের নেকাপড়া জানা বাবুরাই বইলতে পারবেন। তবে এই সোঁদরবনে আগে গন্ডার চেল। বহুদিন আগের কথা বইলচি। শুয়োরও নাকি চেল গোনা-গুনতিহীন। বাবুদের কাচেই শোনা।

এদের, মানে এই মুরগি আর কবুতরদের অনেকই সময় লাগবে এই বনে মানিয়ে লিতে। মানিয়ে লেওয়ার আগেই সাপ আর বনবেড়ালের খাদ্য-খাদক হইয়ে যাবে হয়তো।

কথাটা বলিই হেসে ফেইলল সারেং মিঞা। নটবরকে ভোলার কোনো উপায়ই লাই। সারেং মিঞা নিজের মনেই বইলল।

মদু দেয়াসী হাঁক ছেইড়ি বলল, যারে! যারে! অরে ও মদনা, পাঁচু, হরিপদ, আর ভয় লাই রে! বলতি বলতিই, বাবা দক্ষিণ রায়ের পায়ে একটু সিঁদুর লাইগ্যে দিল।

বলল, বনে কেউ থুথু ফেলবিনি আর পেচ্ছাপ করবিনি যেন শালারা! করলিই আর বাবার দয়া, থাকবেনি। তকন তোমাদের বাঁচাবার ভার তোমাদেরই নিজের। মনে তাকে যেন। "হিজ-হিজ হুজ-হুজ" দায়িত্ব।

সারেং মিঞা নৌকো থেইক্যে নাবেনি। তার মুখ দেইক্যে মনে হতিচিল যে, তার মনের মদ্দি কিসের যেন ধন্দ জেগিচে একটা। সিটা কি? তা হোসেন জিজ্ঞেস কইরবে ভেবিয়ো, কইরল না। কিচু বলবার হলি, চাচা নিজেই বলবেখন। চাচার মুখ দেকি মনে হল, চাচা যেন কোনো কতা চেইপ্যে যাতিচে।

সারেং গলা নাইম্যে হোসেনকে বইলল, আমাদের ক্যানিংএর যতীন মাইতি আচেন না। তিনি

হলেন গে মহাপন্ডিত লোক। আমাকে একদিন বইলচিলেন যে হিঁদুদের কবি কৃষ্ণরাম এক কাইব্য রচনা কইর‍্যেচিলেন তাঁর নাম "রায়মঙ্গল"। এই রায়মঙ্গল নামে সোঁদরবনের একটি বিক্যাত নদীও আচে। বিশাল। তার দু-পাশের জঙ্গল মানুষখেকো বাঘের জন্যে কুখ্যাত। সি নদী বঙ্গোপসাগরে যে পড়িচে।

এই "রায়মঙ্গল" কাব্য নেকার সময়েই কৃষ্ণরাম নাকি হিঁদুদের এক বহু পুরোনো কাইব্য "চন্ডীমঙ্গল"-এর অনুকরণ করে নেকেন। কিন্তু যতীনবাবু বরাবারই বলেন যে, ই কতাটি ঠিক নয়। "রায়মঙ্গল"-এ অনেকই অংশ আছে যা "চন্ডীমঙ্গলে"র অনুকরণ আদৌ নয়, তা পড়লিই পষ্টই বোঝা যায়। "রায়মঙ্গল" কাব্য রচনার আরম্ভতেই কবি কৃষ্ণরাম রায়মঙ্গল রচনার কারণ দেকাতি গিয়ে বইলেচেন :

"রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন।
বাঘপৃষ্ঠে আরোহণ এক মহাজন॥
করে ধনুঃশর চারু সেই মহাকায়।
পরিচয় দিল মোরে দক্ষিণের রায়॥
পাঁচালি প্রবন্ধে করো মঙ্গল আমার।
আঠারো ভাটির মধ্যে হইব প্রচার॥
তোমার কবিতা যার মনে নাহি লাগে।
সবংশে তাহারে তবে সংহারিবে বাঘে।"

আঠারো-ভাটি হয়তো আগে সুন্দরবনের একাংশের নাম চেল।

হোসেন, সারেং মিঞার পাণ্ডিত্যে সত্যি মুগ্ধ হয়ে যাচ্চিল প্রতি মুহূর্তে। একটা ডিগ্রিহীন, ইঞ্জিরি-না-জানা মানুষের শরীলে কতরকম জ্ঞানই যে রয়েচে। এমন আধার বলেই তো খুদাহ এঁকে বেচে নেচেন। কত মন্ত্র, কত পুঁথি; মানুষটার নক দর্পণে। কত্ত রকম গুণ। অতচ ব্যবহার একেবারে মাটির মানুষটি। 'ঘামণ্ড' বস্তুটিই অজানা তার কাচে।

আর নেই মন্ত্র? চাচা? তুমি এত কিছু মনে রাকলি কি করে? আশ্চর্য বটে!

হোসেন বইলল।

সারেং মিঞা হেসি উঠল হো হো করে। শিশুর মতো।

বলল, ওরে সবজান্তা আমি যে মৌলবি! আবার হাসল, হা হা করে। যখন ছ্যানাটি ছিলম তখনই মাদ্রাসা থেইক্যে তাইড়্যে দেল। ইমনই মেধাবী ছিলম। ইস্কুলকালিজের তো মুখটি পর্যন্ত দেখি লাই। কুরান-শরিফ পুরো কোনোকালেই মুখস্থ লাই কিন্তু তবুও আমি চৎ-মুচলমান। খুদাহ্ই আমার সব। আসলে যা পচন্দ লা হয়, তা আমার কিচুতেই মুখস্ত হতি চায় না। আর পছন্দ যা হয়, তা দুইবার পইড়ল্যেই বা শুনলিই মুকস্ত হইয়ে যায়।

আরও বল চাচা?

শোন, তবে, কবি কৃষ্ণরাম-এর রামমঙ্গল থেকেই বলি :

"কড়জোড়ে মহাকায়, বন্দিলাম দক্ষিণরায়,
ঠাকুরের চরণকমল।
সঙ্গে লীলাবতী রাণী, পঞ্চপাত্র সাথে আনি,
ভরো ঘটে ভকতবৎসল॥
সোনার বরণ তনু, অশ্বিনীনাগর হনু,
নিশাদিনি অমনি বিজয়।
বিশাল নয়নজোড়, শ্রবণ অবধি ওর,
চাহনি চমকে রিপুচয়॥

পূজা করে একমনে, কাটে কাঠ গিয়া বনে,
বাহুল্যা বাহুল্য কত ঠাঞী
পাইলে নাহিক খায়, বাঘের বিমুখ হয়,
তোমার কৃপায় ভয় নাঞি।"

আবার এই কথাও আচে ওই রায়মঙ্গল কাইব্যেই বাবা দক্ষিণরায়ের সম্মন্দে যে, আমাদের ফকিরদের সঙ্গে একবার জোর লেগে গেছিল বাবার।

কী রকম?

শোনই না! তুই বড়ো ফরফর করিস। বড়োলোক সওদাগরেরা সবাই একবার সমুদ্র যাইত্রার সময়ি ওই আঠারো ভাটির অরণ্যে দক্ষিণরায়ের মূর্তি অথবা "বারা" পুজো করলেন। পুজো দে যাত্রা কইরবেন এই বাসনা।

বারাটি কি জিনিস হইল গে চাচা?

"বারা"হল ঘটের মতো। হিঁদুদের কালীঘাটের পোটোদের ঘট দেইকেচিস তো? সেই রকম আর কী! তার গায়ে নানা মুখ, চিত্রবিচিত্র, নানারকম রঙিন লতাপাতার ছবি সুন্দর করে আঁকা তাকে। মূর্তি তো সব জায়গাতে থাকে না। "বারা"ই পুজো হয় বেশি জায়গাতে। যিখানে যিখানের জল অনেকদূর অবদি ঢোকে সিখানে বাবা দক্ষিণরায়ের এই "বারা" গাছ থেকে ঝুলোন থাকে। যাতে জলে না ভেজি, বা ভেসি না যায়।

তা হিন্দুদের দেবতা দক্ষিণরায়ের এতসব বর্ণনা করলেন কবি কৃষ্ণরাম আর বড়খাঁ গাজির কোনো বর্ণনাই নেই? তিনিও তো সোঁদরবনের ব্যাঘ্রদেবতা।

লিশ্চয় আচে। থাকবে না কেন! তুই তো কতাই কইতে দিবি না। টি.ভি.র কর্মচারীদের মতন দেকতিচি। যার কতা শোনাবে বলি পোরোগাম করে তাকেই কতা কইতে দেয় না। নিজেরাই গ্যাজর গ্যাজর করে! কে কুতা থেকি যে গোটা কয় রামছাগল ধরি এইনেচে মোদের কইলকাতা দূরদর্শন তা তারাই জাইনবে। তুইও দেকি তাদেরই মতন হলি। এক্কেরে সবজান্তা ইডিয়ট একটো।

শোন ইবার—

"ইন্দ্র যেন স্বর্গ মাঝ, বড়খাঁর গাজির সাজ
দেখিয়া জুড়ায় দুটি আঁখি
গীরিদা হেলান গা, মউর পুচ্ছের বা
খাবাসে তুলিয়া দিয়া পান
মাথায় চিকন কালা, হাতে ছিনিমিনি মালা
গাজি পড়ে বসিয়া কোরাণ।"

তা যাই হোক, শুধু বাবা দক্ষিণরায়ের পুজো হল আর বড়খাঁ গাজি সাহেবের তিনিও ব্যাঘ্রদেবতা, পুজো হল না দেখে মুসলমান ফকিরেরা মহাখাপ্পা হয়ে গিয়ে বাবার উদ্দেশে গালাগালি করে বলেছিলেন :

"শোনতে হো দক্ষিণরায়? এইসা দাগাবাজি
বাঁধুকে লে আনেসে তবে হাম গাজি।"

এইটুক না বলি, ফকিরেরা তাদের সব চ্যালাদের হুকুম করলেন—

"উনকি মূর্তি সব ইতিবাড়ি তোড়"। উনকি মানে, বাবা দক্ষিণরায়ের।

তারপরই তো লেগে গেল ধুন্ধুমার কাণ্ড। অনেক জল গড়ানোর পর বাবাকে টাইট করার জন্যে বড়খাঁ গাজি রাজা দক্ষিণরায়কে অখিরকা বাত শুনিয়ে দিলেন :

"আভভি নেহি জানতে হে বড়েখাঁ গাজি পির
খোদায় মাদার দিয়া দুনিয়াকো জাহির॥

পয়দা যতেক কিছু হয় হররোজ
তেরা আধা মেরা আধা এই বাত সোজ।।"

"সোজ" মানে শোচ আর কী। বাঙালি দেবতার উর্দু তো! আমাদেরই মতো। তার চেয়ে আর ভালো কী হবে!

এই কথা শুনি দক্ষিণরায় অবাক হয়ি বইললেন :

"কোথাকার কেবা তুমি কিসের আমল।
গাঁয় নায় মানে যেন আপনি মোড়ল।"

তাপ্পর?

চোখ বড়ো বড়ো করে হোসেন শুদোল।

খুব মজা লাগছিল ওর। বাঘেদের দেবতাদের নিয়েও সাতকাহন রইয়েচে দেকচে। অন্যান্যরাও সব দাঁড়িয়ে-বসে শুনছিল সারেং মিঞার কথা।

তারাও সমস্বরের বলল, তাপ্পর?

তারপর আর কি? বাবা দক্ষিণরায়ের বাঘ সৈন্যদের সঙ্গে বড়খাঁ গাজি পির-এর সৈন্যদের মধ্যে তো রে মার! রে ঘাঁক। রে ঘ্যাঁক। য়ে ঘাঁক। কইয়্যে সে পেচণ্ড মহাযুইদ্দ নেঁইগ্যে গেল।

তাপ্পর?

তাপ্পর আর কি? কেউই হার মানে না। দুজনেই সমান বীর। পিরথিবী পেরায় রসাতলি যায়।

হিন্দুদের বিদাতা চুপ করি না থাকতি পেরি বেহেস্ত-এ দেবতাদের মিটিং বসালেন। তারপর বিদাতা স্বয়ং আধা-হিন্দু আধা-মুসলমানের রূপ ধইরে সোঁদরবনে নেইমে এলিন যুযুধানদের শান্ত করতে। আবির্ভাব হল স্বয়ং বিদাতার। আর তাঁর কী বা রূপ! আহা!

কেমন রূপ তাঁর?

হোসেন শুদোল।

"অর্ধেক মাথায় কালা　　　　এক ভাগে চুড়া টানা
বনমালা ছিলিমিলি হাথে।
ধবল অর্ধেক কায়　　　　অর্ধনীল মেঘ প্রায়
কোরান-পুরাণ দুই হাতে।"

হায়! হায়! বইলচ কিগো চাচা?

তাপ্পর?

তাপ্পর আবার কি? রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়া মরে। ইতো চিরদিনের নিয়ম। পেচুর বাঘ মারা পইড়ল। এবং তারপরই শান্তি। বাবা দক্ষিণ রায় এবং বড়খাঁ গাজি পির দুজনেই জানলেন যে, যার যার শত্রুপক্ক এলেমদার বটেক। তাপ্পর? তাপ্পর "টুরুস"হবার পরে বাঘেদের রাজ্যে ট্যাঁড়া পইড়ল :

"এখন দক্ষিণ রায়　　　　সব ভাটির অধিকার*
হিজুলিতে কালুরায়ের থানা
সবত্রে সাহেব পির　　　　সবে নোঙাইবে শির
কেহ তারে না করিবে মানা।।

যে ডিঙিটা উলটোদিক থেকে বেয়ে এল তাদেরও সকলেই এতক্ষণ চাচার কথা শুনছিল হাঁ করে। সারেং মিঞার কতা শেষ হলি পরই মদু বাউলেকে তারা বলল, কাজটা ভালো কইরলে না গো বাউলে।

কী কাজ! কেন?

---

* মানে আঠারো ভাটির সব ভাটা।

অত মানুষের সামনে মদু একটু অপ্রস্তুত ও অপমানিত হয়েই মুখ তুলে শুদোল।

সেই মাঝি বইলল, তুমি ষিকানি মৌলেদের নামালি সিকানের এই বাবা দক্ষিণ রায় নিজেই মড়া। তিনি আবার আমাদের বাঁচাবেন কি কইরে?

ছিঃ! ছিঃ! ঠাকুর-দেবতাদের সম্বন্ধে এ কীরকম কতা। তাও আবার এমন সাংঘাতিক সব দেব-দেবতা। কেন? মরা কেন? মরা হতি যাবেন কোন দুক্কে? আনজান এমন একটি বাইক্য কয়ে দেলে? তা ছাড়া তুমি জাইনলেই বা কী করে হে?

আমি যে গতবছর পুটকিন গাঁয়ের যে মানুষেরা এই মুরতি পেতিষ্টে কইরেচেল তাদের সঙ্গেই ছিলম। মুরতির পেতিষ্টে ঠিকমত হয়ই নি। বড়ো অনেক পাপ ঘইটেচেল ইকানে।

পাপ? কী পাপ?

হ্যাঁ। পাপ। মূর্তি পেতিষ্টের আগে গোসাবা থেইক্যে জবরদস্তি করে তুলে আনা একজনের বউকে এই বাবার চালারই মদ্দি বেইজ্জত কইরেচেল।

কে? তাছাড়া সোঁদরবনে মেয়েচেলের কথা এই পেরথম শুনলাম।

না শুনে তাকলি শোনো।

পাপটা কইরেচেলটা কে? সিটা বলো!

সামন্তবাবুদের মুহুরি।

কোন সামন্ত?

আরে "জলপিপির জলা"র সামন্ত। চেনো না যেন! মুনিষ খাটলে কত বচর তাদের কাচে! আবার ন্যাকামি!

এই! মুখ সামলি কত বলবি। আমি কে জানিস?

আমি তোর বাপ কে, তাও জানি। তোর মায়ে জানে আর আমি জানি। বেশি চ্যাঁচাসনি মদু। হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দোব। মধু বাউড়ি আবার বাউলে হইয়েচে। মানুষ মারবার খ্যাঁচাকল।

কে যেন ঘুরায় ভদ্রতার বিলের দিকে হাওয়া বওয়াইল। নোকটা ভালো। পিরথিবীতে একনও অনেক ভালো নোক আচে। নইলে.....

মুহুরির নামটা যেন কী?

কী যেন নাম, নানু না কানু গাঙ্গুলি।

বামুনের ছেলের এই কাজ?

ঘোর কলি যে! ইসব তো বামুনেরই কাজ। তবে ফলটাও ইকেবারেই হাতি-নাতি পেইয়্যে গেচে। নামখানা ফিরতি ফিরতি একজনেরে বাঘে নেচে, দুজনেরে কুমিরে। আর মেয়েটারেও নিয়ে গেচে ছিপ নৌকো করি আসি বাংলাদেশি ডাকাইত। রায়মঙ্গল ধরি এইস্যেচেল তারা।

অন্য একজন শুধোল, তা, সামন্তদের কিরিয়া-কাণ্ড এখন চালাতিচে কে?

আরে যে হয় চালাতিচে। আমরা আদার ব্যাপারি হইয়ে জাহাজের খপরে দরকার কি?

তবে?

তবে কি?

পাশের নৌকোর সেই মুখ-ফোঁড় লোকটা বলল, কাল যে গোবিন্দরে বাঘে নেল রাতে সি আর তার নৌকোর সঙ্গিরা তো ইকানেই পুজো দে চামটার খালের ওইকানে নোঙর কইর্যেচেল ওই দ্যাকো, একনও সিঁদুরের দাগ স্পষ্ট আচে। একদিন আগের দাগ, যাবে কি করে?

তাইলে কি হবে একন?

চিন্তিত গলাতে মউলেরা বলল।

কী হবে তা কি করি বলব। তবে ইকানে পুজো দে ড্যাঙাতে নামলে হিতে বিপরীত হবে।

সেই সবজান্তা লোকটা বলল।

মদুর নৌকোর মউলেরা গলা ভারী করে বলল, কী গো দেয়াসী! দুদিন ধইর্যে ইকেনে ঢুইক্যে মিঠা জল, চাল ডাল নুনের শ্রাদ্ধ করতিচি আমরা। আর রোজগার তো হলোনি এক পয়সাও!

ইবারে সকলে একই সঙ্গে সারেংএর দিকে ফিরে বলল, কী কইরব আমরা? ও চাচা?

সারেং বইলল, যদিও আমার কাজ লয়। তবু রিঞ্জার সাহেবের কতা দিইচি। আমি থাকতি পারতাম কারণ মৌচাক বেশি দূরে লয়। আমিও দেইকেচি যে গরান ফুলের মধু কেয়ে মৌমাছি উড়ল। তা তোমরা নামবে কজন হে?

তিনজনা।

তিনজনা? একই দিকে যাবি তো?

এজ্ঞে না চাচা। আমরা তিনজনি তিনদিকে যাব।

তাও তো বটে। তা নইলে চলবে কি করে? একই মৌচাকে মারামারি করে মইরবি নাকি?

তবে!

কিন্তু একই সঙ্গে তিনজনকে পাহারা দিই কি করে!

সঙ্গে সঙ্গে মুনসেরবাউলে বইলে উইটল, চাচা, তিন বাঁক গিয়ে বাঁয়ে একটি শিষখাল আচে। তারই কাচে মস্ত মস্ত মৌচাক। সিকানে যেইয়ে নতুন করি পুজো কইরে দেব। বনবিবির ঠাঁই সিকানে। সেই শিষখাল আবার দোয়ানিয়া খাল। দু দিক দে' জোয়ারের জল ঢুকতিচে একন। পারশে মাছের ঢিপি পইড়্যে গেচে এক্কেরে। সিকানে কি যেতি "পারমিশন" মিলবে তোমার কাছ ঠেঙে চাচা?

মদু বাউলে চুপ মেরে গেছিল। তার মা তুলে কথা বলেছে সেই মুখ-ফোঁড় ছোঁড়া। মাজে মাজে তার দিকে তাকাচ্চে আর কান লাল করি বসি আচে।

হোসেন ভাইবতেচেল, কত মনুষ্যিরই তো কত গোপন কতা আচে? গোপন কতা কার নাই ই সংসারে? কিন্তুক যি মনুষ্যি অন্যের হাঁড়ি হাটে ভাঙার ভয় দেকায় তারও কি আর গোপন কতার হাঁড়ি লাই? হাটে ভাঙলে কার হাঁড়ি থেকি কী বেরোয়, তা কেই বা বলতি পারে! কেন যে নিজেও মনুষ্যি হয়ে অন্য মনুষ্যির বুকে এত ব্যতা দেয় তা কে জানে! ভাবলেও মন খারাপ লাগি।

ভারী সুন্দর জায়গাটা। জোয়ারের জলে এখন সমস্ত বনকেই মনে হতিচে যেন একটো ভাসমান উদ্যান। যেন, জলের মদ্দি ঘন-সবুজ হলুদ-লাল-পাটকিলে-কালো পাতা-লতা শাখা-পেশাখা নে' একটি বেবাক জঙ্গল ফুলেরই মতো ফুইট্যে আচে। বড়ো বড়ো ক্যাওড়া গাছগুলোর শূলো থাকে, মাটি ফুঁড়ে তারা সোজা এক হাত দেড়-হাত আকাশের দিকে উইটে থাকে ডাঙার জঙ্গলের টানটান শিমূলের মতো। কিন্তু কোনো শাকাপেশাকা লাই তাতে। ভাটির সময়ে নাকি অক্সিজেন নেয় এমনি করি ক্যাওড়া গাছেরা। জোয়ারের সময়ে সবগুলোই চইলে যায় জলের তলাতি। অদৃশ্য হয়ে যায়। সোঁদরবনে ক্যাওড়া গাছগুলোই সবচি বড়ো গাচ। তাদের অনেকই ডালপালা। বড়ো বড়ো শাকা থেকে পেশাকা বেরিয়ে গেচে। কোথাও বা শাকাপেশাকা মাটির কাচে নেমে এসিচে। জোয়ারের সময়ে কাণ্ডও ডুবে যায় অনেককানি। বড়োই আশ্চর্য দেকায় তকন।

বনবিবির পুজো করে হিন্দু-মুসলমান সকলেই। মউল, মালঙ্গী, নৌজীবী শিকারি সকলিই বনের মদ্দি মঙ্গলে-মঙ্গলে থাকতি পাইরবে এই আশায় বনবিবির পুজো করে।

জোয়ারের সময়েও যে "খাল" বা ট্যাঁক" ডোবে না, বাঘে যিখানে জোয়ারের সময়ে থাকে, মা-বাঘ যেখানে বাচ্চাদের লালনপালন করে তেমনই এক ট্যাঁকে বনবিবি মূর্তি দেখা গেল।

নৌকো তীরে ভিড়তেই মুনসের জোড়-হাতে মন্ত্র বলল :

"মা বনবিবি, তোমার বালক এল বনে,
থাকে যেন মনে।
শত্রু দুশমন চাপা দিয়ে রাখো গোড়ের কোণে।
দোহাই মা বরকদের, দোহাই মা বরকদের।"

চাচা বলল, বনবিবি। এই বনদেবীর বনবিবির চেহারা মুসলমান মেয়েদের মতো। অবশ্য হিন্দু মেয়ের মতো চেহারাও হয় অনেক জায়গাতে। যেন, বড়ো খানদান-এর কোনো মুসলমান কিশোরী। মাথায় টুপি, তাতে বুনো লতাপাতা আঁকা, বিনুনি করা চুল, মাথায় টিকলি, গলায় নানারকম হার, তারও উপরে বনফুলের মালা। কারা যেন পরিয়ে দিয়ে গেইছে দিন তিন-চার আগে। ভাবগতিক দেইখ্যে মনি হল, মুনসেরও বুজি মালা গোঁথি পরাবে এককানা। বিবির পরনে পিরান বা ঘাগরা-পাজামা, পায়ে জুতো মোজা, তার উপরে পাতলা ওড়না। মুরগির উপরে, হাতে আশা - বাড়ি বা একটি দণ্ড নিয়ে বসে আচেন। ওড়নাটিও একেবারে নতুন।

মুনসের বলল, গোসাবার নদের শেখ, মস্ত বড়োলোক, তার বহর নিয়ি এসে এই দেবীকে এখানে পেতিষ্টে করে গেছেন পাঁচ বছর হতি চলল।

মুরগি দুটো বের কর রে।

কে যেন বইলল।

পাটাতনের নীচে মুরগি রাখা ছিল দু পায়ে দড়ি বেঁধে। মুরগি বের করে একটি ছোটো ছুরি বের করে মুনসের মুরগি দুটো জবাই করল।

তারপর বিড়বিড় করে বলল :

"বিবির রূপের কথা না যায় কথন
রূপে তার কেঁদখালি হয়েছে রৌশন।"

সারেং চাচা বললেন, একবার বনবিবির সঙ্গে বাবা দক্ষিণ রায়েরও জোর বিরোধ বেধেছিল, বুইজলি। শিষে, বনবিবির তাড়া খেইয়ে দক্ষিণ রায় দৌড়ে বড়খাঁ গাজির কাছে গে' হাজির। গাজিই মদ্দস্থতা করে দুজনের ঝগড়া মিইট্যে দিলেন।

তখন বনবিবি, বাবা দক্ষিণ রায়কে কড়ার করে প্রতিজ্ঞা করালেন :

"আঠারো ভাটির মাঝে আমি সবার মা।
মা বলি ডাকিলে কারো বিপদ থাকে না।
বিপদে পড়ি যেবা মা বলি ডাকিবে।
কভু তারে হিংসা না করিবে।"

সবই বাঘে-বাঘে কতা-বারতা, বুঝলি না। মা বনবিবিই বল, বাবা দক্ষিণ রায়ই বল, আর বড়খাঁ গাজিই বল, সবই তো ব্যাঘ্র-দিবতা।

বনবিবির নামে অনেক গল্পই প্রচলিত আছে। তার মদ্দি দুটিই পেদান। তারই একটি বলি শোন।

অনেক জায়গাতেই দেখতি পাবি বনবিবির মূত্তির পাশি একটি ছোট্ট চেলে।

বলো, চাচা।

হোসেন বলল।

ধোনা আর মোনা দু ভাই চেল। দুজনেই মউলে। মধু পেইড়ে খেত। একবার হইচে কি, সুন্দরবনে মধু পাড়তি যাবার সময়ি, তাদের গ্রাম সম্পর্ক ভাইপো হয়, একটি ছোটো ছেলে, তার নাম দুখে, তাকেও তারা সঙ্গে নেল। দুখেরা পেচণ্ড গরিব। তার কোনো চারা লাই তাই ছোটো ছেলে হইয়েও ওই অতত্ত বিপজ্জনক কাজেও সি যিতে রাজি হইয়ে গেল।

তারপর? তারপর হইল কী ধোনা সোঁদরবনে পৌঁছে ডাঙায় নামার আগে বাবা দক্ষিণ রায়কে পুজো করতেই ভুলে গেল। সে কথা জানতে পেরে ধনের অদিপতি বেজায় রেইগে যেয়ে ধোনাকে স্বপ্নে দেকা দে' আত্মপরিচয় দিয়ে তাঁর কটিন আদেশটি জানালেন :

"দণ্ড রক্ষ মুনি ছিল ভাটির প্রধান,
দক্ষিণ রায় নাম তার, আমি তাহার সন্তান।"

শোনা ধোনো! তুমি আমাকে পুজো না দিয়ে বনে ঢুকেচো। এতবড় গর্হিত অপরাদের খেসারত হিসেবে আমাকে তোমার নরমাংস দিতেই হবে। যদি না দাও, তাহলে আমার বন থেকে এক ফোঁটাও মধু পাবে না।

আদেশ শুনে তো ঘুম চইটকে গেল ধোনার। ইদিকে করেই বা কী! কতা তো সত্যিই যে পুজো দেয়নি! কিন্তুক নিজের আর নিজের সহোদরের সাধের গায়ের চামড়া আর মাংস কার আর সাধ করে বাঘকে দিতে ইচ্ছে করে। অতএব তারা ওই ভীষণ বন-মধ্যে বেচারা দুখেকেই রেইক্যে দে' ডিঙি বেইয়ে পাইল্যে গেল বন থেকি।

যে বনে, বাঘা-বাঘা শিকারির, বন্দুক রাইফেল হাতে নেও ভয়ে দাঁতকপাটি নেইগ্যে যায়, সি বনের মদ্দি রাত নেমি আসতি লাগল। ছোটো ছেলে দুখে, একা! অন্ধকার যতই হতি নাগল, ততই বিচারা দুখে কাঁইদতে নাগল ভীষণ ভয়ে। জনমানবহীন, ভয়াবহ সি বন, নানারকম হিংস্র পশুতে, বাঘে, কুমিরে, সাপে ভরা। তার মধ্যে সি একা থাকবি কী করি? দুঃখে, ভয়ে, ধোনা-মোনার নিষ্ঠুরতায়, সে পাগলের মতো হইয়ে গেল। ঠিক সেই সময়েই দুখে দেখল, বিকট বিরাট এক বাঘ ঠিক তাকেই খাবার জন্যে তেইড়ে আসতিচে।

"বিষম দুরন্ত বাঘ, আসে গাল মেলে
দুখে দেখে, মা বলিয়া গিরে ভূমিতলে।
এইরূপে মা বলে ডাকে তিনবার
হেট ছেরে বৈসে কান্দে জারে জার।
দুখের কান্দনে হেলে বিবির আসন।
অন্তরে ধিয়ানে বিবি জানিল তখন।"

দুখের বুকফাটা "মা" ডাকে বনবিবির আসন টইলে উঠল। তিনি ধ্যানযোগে সব জানতে পেইরিই ভাই শা-জঙ্গলিকে সঙ্গে করে ছুট্টে এইলেন সি বনে। এবং দুখেকে কোলে তুলি নিলেন। কোলে তুলে নেতিই সেই দুর্দান্ত বাঘকে চোকে দেকতি পেলেন। দেকেই তাঁর বুজতে আর বাকি রইল না, যে-বাঘ দুখেকে খেইতে এইসিচে, সেই দক্ষিণ রায় স্বয়ং। বুজতি পেরিই, তিনি শা-জঙ্গলিকে আদেশ করলেন বাঘের নূপ-ধরা দক্ষিণ রায়কে শায়েস্তা করতে।

শা-জঙ্গলি সঙ্গি সঙ্গি বাঘের মাতায় মুগুরের এক বাড়ি না বসাতিই তো সি বাঘ ছুটতি নাগল! বাঘ ছোটে তো শা-জঙ্গলিও সি বাঘের পেচনে পেচনে দৌড়ুতে দৌড়ুতে মুগুরের বাড়ি মারতি লাগলেন দমাদম কইরে বাঘের মাতায়। শেষকালি অবস্থা অতি সঙিন যে, ই কতা বুজতি পেরি বাবা দক্ষিণ রায় পেরাণ বাঁচাতে দৌড়ুতে দৌড়ুতে বড়খাঁ গাজির কাচে যেয়ি হাজির হলেন।

গাজি তকন জাঁকজমকভরে তাঁর দরবারে বসেচিলেন। গাজি স্বয়ং বিধাতাও এক হাতে কোরাণ আর অন্য হাতে পুরাণ নিয়ে এইসি যেমন তাঁর আর দক্ষিণ রায়ের মধ্যের যুদ্ধে মদ্দস্ততা কইরেচিলেন তেমনি দক্ষিণ রায়ের আর বনবিবির বিবাদেরও তিনিই মদ্দস্ততা কইরে দিলেন।

কিন্তু ওই যে, আগিই বইললাম, "আঠারো ভাঁটির আমি সবার মা, মা বলি ডাকিলে কাহার বিপদ থাকে না" ইত্যাদি কড়ার কইর‍্যে নিলেন দক্ষিণ রায়কে দিয়ে তকনই বনবিবি।

গল্প শেষ হলি মুনসের বলল, নামি এবারে আমরা, ডাঙায়? চাচা?

নামো নামো।

তা বলি, থু থু ফেলোনি আর পেচ্ছাপ কর‍োনি যেন বনে। তা'লে কিন্তু আমার দোষ নাই। বিবি চইটবেন খুব।

গরান আর গেঁয়ো ফুলে মদু খেয়ি মৌমাচি যেই উড়ল, অমনি দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ি সি মৌমাচির পেচন পেচন উদ্দমুখে হয়ে চলতে নাগল ওরা।

তিনজনে তিন মৌমাচিকে অনুসরণ করি চইলতে নাগল।

মৌমাচির মদু আহরণ করে নে' গে' জমাবে তাদের মৌচাকে। আর মৌচাক থাকে জঙ্গলের গভীরে। বড়ো বড়ো গাচের উঁচু ডালে। সেই মৌচাক আবিষ্কার করার পর তার নীচে ধোঁয়া করবে ওরা। সেই ধোঁয়া গিয়ে মৌচাকে পৌঁছোতেই পিনপিন করে মৌমাচিরা চাক ছেড়ে বেরোতি থাকবে আর তকন ভীমরুলের কামড় অগ্রাহ্য করি ওরা গাচে উটি চাক ভেঙি মদু বের করে হাঁড়িতে ভরবে। কখনও বা চাক-সুদ্দুই নিয়ে আসবে নৌকোতে। নিজের চোকে না দেখলি বিশ্বেস হবেনি কারোই।

যকন অমনি করে মৌচাকের খোঁজে উদ্দমুখ হয়ে মউলেরা জঙ্গলের গভীরে ঢুকি যায় তকন অতি সহজেই ধূর্ত, ভয়ংকর বাঘের শিকার হয় ওরা সোঁদরবনে। জীবন বাঘের হাতি বিপন্ন করি, জীবন ভীমরুলের কামড়ে বিপন্ন করি, যে-মদুটুকু আনে তারও আসল মুনাফা লোটে 'ফোড়ে'রা। নয়তো, ফরেস্ট-ডিপার্ট। ফরেস্ট ডিপার্টও আরেক ব্যাগ্রদেবতা সুন্দরবনের। বাবা দক্কিণ রায়, বনবিবি, বড়খাঁ গাজিরই মতন।

এই মানুষগুলোকে এত কাছ থেকে না জানলি হোসেন জানতিও পারত নি "জীবন-সরংগ্রাম" কতাটার মানেটা ঠিক কি?

গরিব মানুষও যে কতখানি গরিব হতি পারি সি সম্বন্ধি কোনোই ধারণা চেল নি হোসেনের। বিতিচি গেরামের ওরাও তো গরিবই! কিন্তু ওরা যেমন করে থাকে, চারবেলা খেয়ে দেয়ে, গাই-বলদ, বকরা-বকরি, মোরগা-মুরগি, ধানজমি, বিবির-বিলের মাছ নে, সি আলস্যির, পরম সুখের জীবনের সঙ্গি ইদের জীবনের তুলনা করার কথা ভাবা পযযন্ত যায় না।

সারেং মিঞা বইলল, কী ভাইবচ, হে সাঙাত।

হোসেন চুপ মেরি থাকে।

সারেং মিঞা বলে, শুধু বনকেই ভালোবেস্যি আসি না গো ইকানে। এই মানুষগুলোর দুঃখের কাচে, ইদের সাহসের কাচে, ইদের ভালোত্বের কাচেও বিকিয়ে দেচিগো আমি নিজেকে। পেরকিতি তো সুন্দরই! পেরকিতির সৌন্দর্য কার' চোখি না পড়ে! কিন্তু আমার কেন যেন মনে হয় সাঙাত, আমরা, এই মনুষ্যিরাই সমস্ত পেরকিতিকে আরও সুন্দর অথবা ভয়াবহ করি তুলি।

হোসেন চুপ করি সারেং মিঞার কথার মানিটা বোজার চেষ্টা করচেল।

সারেং বইলল, সোঁদরবনের খালে-খালে এই যে খালি-গা, খেটো-ধুতি বা লুঙি-পরা মানুষগুলোন পেতিবচরই আসে, ইদের যে এই বনবিবি, দক্কিণ রায় আর বড়খাঁ গাজি ছাড়া আর কেউই নাই। পেতিবছর তাই এরা যখন আসে, আমিও আসি। ওদের পাশে পাশেই থাকি। ওদের সেবা করি সব্বপহর, তাই আমার নামাজ না পড়লিও চলে হোসেন। নামাজি তো কোটি কোটিই আচে এ পিরথিবীতে। কিন্তু আমার মতো এই শব্দহীন, ফজিরের আর জাম্মার, মগরীব-এর আর ইশার নামাজ আর কুনো মুসলমানে পড়ে না রে হোসেন। খুদাহ সবই দেকতি পান। তাই তো আমাকে ক্ষমা করি এসিচেন, ক্ষমা করি দেন। তাই তো বলি রে হাসেন মিঞা

"গলতিয়াঁ করতা হুঁ জী ভর ইস লিয়ে,
বকশিশোঁপর তেরে, মুঝকো নাজ হ্যায়।"

সারা জীবনই তো ভুল কইরেই আসতিচি, দোষ করে আসতিচি; তোমার দয়া, তোমার দোয়ার উপরে যে আমার পূর্ণ বিশ্বাস আচে খুদাহ।

খুব জোরে একটা মাছরাঙা এসে ছোঁ মারল জলে, জেলে নৌকোতে ওরা খ্যাপলা জাল ঠিক করছিল যকন। মুকে একটি পারশে মাচ নে উড়ে গিয়ে বসল তেরঙা-মাচরাঙা একটি ক্যাওড়া গাচের খোঁদলে। বসি, মনোযোগ দে' মাচ খেতি লাগল।

কিন্তু তার এই জল-ঝাঁপানোতে রুপোলি জল ছিটকে উটে রোদের সোনাতে রুপোর ভালোর আর জরি লাইগ্যে দেল। মাচরাঙার শব্দ শুনি আরো একটি মাচরাঙা কোথা থেকি যেন উড়ি এল। বোদয়, ওর জোড়াটাই।

সারেং মিঞা আইসতে আইসতে পাটাতনের তলা থেকি বন্দুকটা বের করি ভালো করি গামচা দে' মুচি নেল। অনেক যত্ন করে ছেঁড়া লুঙি জইড়্যে রেইক্যেচেল সিটাকে। লোনা জল তো! মরচে পড়তি টাইম লাগে না এট্টুও।

বন্দুক বের করা হলি পর টোটা নিল তিনটি।

মোটে তিনটি কেন? অনেক তো আচে।

হোসেন শুদোল।

সারেং হাইসল।

বলল, সোঁদরবনের বাঘ এক টোটা ফুটোবারই সময় দেয় না তা আর বেশি টোটা নে করবটা কি?

তুমি একন কোতা যাবে? বাঘ মারতি? বনের মদ্দি ঢুইকবে? আম্মো যাব।

আবার হাসল হোসেন মিঞা।

বলল, তোমারে মাইরতি যাতি হবে না ইকানের বাঘকে, সেই তোমাকি খেতি আইসবেকন মুখ ব্যাদান করি। কিন্তক যাকে ধইরবে সি আগের মুহূত্ত অবধি জানতি পযযন্ত পাবে না। আমি "গাছাল" দেব। যতক্ষণ না ইদের মাছ ধরা হয়।

আর মউলেদের কি হবে?

ওরা তিনজনে গেচে তিনদিকে। ওদের আমি একা দেইকব কি কইর্যে। ওদের দেকবেন বনবিবি।

সব দেবতারা দেকার পরও তো এত মানুষ বাঘের পেটে যাইচে পেতিবচর! তাতে আর এত পুজো-পেরনাম-সালাম কেন?

হোসেন বলল।

সারেং মিঞা হাসল।

হঠাৎই ভারী রাগ হয়ে গেল হোসেন মিঞার সারেং মিঞার উপরে। এত মানুষের মিত্যুর কতা হতিচে আর উনি হাসেন কোন্ আক্কেলে?

হাসো কেন সারেং চাচা?

এই।

এই কি?

এই! জেলেরা মাচ খেতিচে, মাছরাঙা মাচ খেতিচে, বাঘরোল মাচ খেতিচে, তা বাঘে কি খায় বলো দিকিনি? সবই তো খাদ্যখাদক সমূহ কিনা। বাঘে তাই খেতিচে মানুষ। বাঘের স্বাভাবিক খাইদ্য বহুদিন থেকেই নাই সোঁদরবনে। তা বাঘ আর কি করে? সে মানুষই খায়। খাদ্য-খাদকের সমূহটা বিচার করি দেকলি, এতি দোষের তো কিচু নাই।

তা আমরা নিজেরা মানুষ, তাই মানুষ খেইলি আমাদের রাগ-দুঃক হবারই কতা। আমি যাব? তোমার সঙ্গি?

না না। তুই থাক ইকানে। জেলেদের সঙ্গি। মাছ কী করি ধইরতে হয়, তা শেকো। নইলে খাবেটা কী এর পরে? এই বনেতে থাকতি হইল্যে সবই এট্টু এট্টু জানতি হবেক। তাচাড়া, আমি এই কাচেই থাইকব।

হোসেন লক্ষ্য করল, সারেং মিঞা শিষখালের পাশ বেয়ি ড্যাঙায় উইট্যে বেশি কথা না বাড়িয়ে সটান একটা মোটা ক্যাওড়ার কাণ্ড ধরি চড়ি পইড়ল। কিছুটা গিয়ে, তেডালা দেকি নে আরাম করি

বসল সিখানে। পেচনটা কইরল পাশ থেকি, এ দিকি। শিষখালটা রইল তার ডানদিকে আর সামনিটা রইল বনির দিকি। বন্দুকটাকে আড়াআড়ি করি শুইয়ে তীক্ষ্ণ চোকে চারদিক নজর করতি লাগল সারেং মিঞা।

ঠিক এমনি সময়ে পুত-পুত-পুত-পুত করে কী একটা পাখি ডেইকি উটল খালের ডানপাশ থেকি।

জেলে নৌকোর হেমন্ত বলল, থামা তোর পুতপুতানি। এইস্যে অবধি একটা মাচের-পো ধরা হলনি আর পুতপুতোচ্চেন তিনি!

অন্যেরা হেসে উঠল হেমন্তের কতায়। ছোঁড়াটা বেশ রগুড়ে আচে।

হোসেন খুব অবাক হল মানুষগুলোনকে দেখি। মৃত্যুর সঙ্গে বাঘবন্দি খেলতিচে পেতিক্ষণ অথচ ওদের হাসির শেষ নাই।

মদু বইসেচেল নৌকোতে। সে যায়নিকো। তার মনও খারাপ। সেই মুখ-ফোঁড়া ছোঁড়া কী না কী বইলে গেল। রাতে আবারও দেখা হবে সকলির সঙ্গি সকলির। গপ্প হবি, গান, তামাক খাওয়া, পরনিন্দা পরচর্চা, পাশাপাশি, কাচাকাচি; তখন হয়তো বেমালুম ভুলে যাবে সকলের কতা।

যতই দেখচে ততই অবাক হতিচে হোসেন মানুষগুলানকে দেকে। মদুকে শুদোল হোসেন, ওটা কি পাকি গো মদুদা?

কোনটা?

আরে ওই যে ডাকল একটু আগেই পুত-পুত-পুত কইরে।

মদু অন্যমনস্কভাবে বলল, জোয়ারি পাকি।

জোয়ারি পাকি? ভারি মজার ডাক তো! পুত-পুত-পুত করে ডাকে।

মদু এবারে হোসেনের দিকে চেয়ে বলল, বিড়ি চাই?

খাই আমি বিড়ি তবে সঙ্গে আইনতে ভুইল্যে গেচি।

বা বা! এমন কতা তো জীবনেও শুনিনি। পারলে লোকে সোঁদরবনে, সঙ্গে ইকটো ইকসট্রা জীবন পযযন্ত নে' আসে, আর তুমি বিড়ি পযযন্ত আনলে নি কী রকম! কেমন ভুল এ, অ্যাঁ?

ভুইল্যে গেচি। আগে তো আসিনি কক্কনো।

পরথমবার এইস্যেই সারেং মিঞার সাগরিদ হলি কেন? সি তুমাকে কোতায় কার হাতে সঁপে দে' কোন মুহূততে কোতা যে নিরুদ্দেশ হইয়ে যাবে তার টিক কি?

চাচার বিষয়ে শুনেছি তো তেমনই সকলের কাচ ঠেঙেই। তা কি করব! এইসে যকন পইড়েইচি; যা হবে, তা হবে।

ন্যাও। ধরাও।

বলে, মদু এট্টা বিড়ি দিল ধুতির খুঁট থেকে খুইল্যে তাপ্পর নিজের বিড়িটা ধরিয়ে হোসেনের বিড়িটাও ধইরে দিল।

নিজের বিড়িতে লম্বা একটা সুকটান লাইগ বলল, এই জুয়ারি পাখির হিসটিরি আচে। বুয়েচ।

হিসটিরি?

শুদোল হোসেন। আরেক গাল ধোঁয়া ছেইড়ে।

বলল, কী রকম, শুনি?

বহুদিন আগের কতা। শোনা কতা তো বটে! একজন মেয়ে নাকি তার ছেলিকে নদীর কোলে শুইয়ে কী সব কাজটাজ কইরতেচেল। তকন নদীতে ভাটা। কাজ করতি করতি আর খ্যাল করেনি, ককন জোয়ার এসিচে আর ককন যে জোয়ার ছেইল্যেকে ভাইস্যে নে গেচে! যকন জানল তকন তো অনেকই দেরি হইয়ে গেচে। তাপ্পর থেকিই সে মেয়ে নদীর পারে পারে ডেকে ফেরে। ছেলের শোকে সে পাকি হয়ে গেচে।

বলে, ভাটায় রাকলাম পুত। জোয়ারে নিয়ে গেল পুত। পুতপুত পুত...দে আমাকে ফিইর‍্যে আমার পুত...পুত...পুত।...

হোসেন চুপ মেরি থাকল। কতা কইল না কুনো।

দেয়াসী মদু বলল, মাচ ধরাটা, মদু পাড়াটা, কাট কাটাটা শিকেই নাও। মনে করো, নৌকাডুবি হইয়ে গেল। যদি বা কুমির আর কামটের মুখ থেকে বেঁইচে ড্যাঙায় ঠেঁইল্যি উইটলেও বা, যদি বা বাঘের খাইদ্য নাও হলি, একা একা নিজের প্যাটের খাইদ্য জোটাবি কোত্তিকে?

কি কি মাচ পাও তুমরা ইসব নদী, নালা, খালে, শিষ-খালে?

বাবা! সি কত মাছ!

হঠাৎই জেলেদের একজন চেঁচিয়ে উঠল। এই! জোয়ারে মাচের পাহাড় ছুটতিচে। ফ্যাল ফ্যাল, জাল ফ্যাল।

অন্যজন গালাগালি করে উটল, বন্নু টানা জালটা এ পান্ত থেকে ও পান্ত অবধি লাগা। খ্যাপলা জালের কাজ না কি? দুসস।

বইললে না, কি কি মাচ পাও তোমরা ই সব খালে?

হোসেন আবার শুদোল মদুকে।

মদু ওই চিৎকারে এট্টু অন্যমনস্ক হয়ে গেচিল।

মদু বলল, মাচের আসল বাহার তো বর্ষায় কিন্তু তকন যদি মাচ ধরতি এলি ভারী ভয়! যকন তকন ছাইক্লোন এসি আচড়ি পড়তি পারে। আর তকন এই শিষখালের চেহারা দেইকেও ভিমড়ি নেইগ্যে যাবে তোমার।

বড়ো বড়ো সাপ, আর কুমিরের মোচ্ছব নেইগ্যে যাবে তকন। তাছাড়া মাতলা, গোনা, হেড়োভাঙা, বিদ্যা, রায়মঙ্গল, গোসাবা ইসব নদীর তকন যা চেহারা! বাপরে! তবে এসি যদি একবার পৌঁচোতি পারো তবে আর দেকতি হবেনি। রেখা, রুচো, দাঁতনে, ভাঙন, কাল-ভোমরা, পান-খাওয়া, পারশে, তপসে, কুচো চিংড়ি, নানানিবিমুনি মাচ। ভেটকি, কাকলাস মাচ। ট্যাংরা, বড়ো ও ছোটো খয়রা, কানমাগুর। মেনি মাচ। ভাটি দিলেই কাদার উপরে তিড়িং বিড়িং করে লাপায় যেগুলো।

কুচো চিংড়ি দে ক্যাওড়া ফলের টক রাঁধে তখন বাদার মানুষেরা। হ্যাঁতালের মাতা কেটে বড়াও ভেজে খায় ওরা। দারুণ খেতে। তাপ্পর খয়রা মাছ ভাজা, ভেটকির কাঁটা-চচ্চড়ি, ট্যাংরার ঝোল, বড়ো চিংড়ির নারকোল দিয়ে মালাইকারি। তাপ্পর আচে কচ্ছপের মাংস। কাউঠ্যা। কচকচে করে কামড়ে খাওয়ার পিঠ, কষে প্যাঁজ রসুন নংকা দে রান্না করি খাও এক এক থালা ভাত। কচ্ছপের ডিম। আর কাঁকড়া? কাঁকড়া কী কাঁকড়া! কতরকম যে কাঁকড়া, কতরকম যে তাদের রং। পেল্লায় পেল্লায় কাঁকড়াও আছে তাদের মদ্যে! কী মিষ্টি শাঁস। প্যাঁজ-রসুন-নংকা দে রাঁধলি মাংসের চেয়িও উপাদেয়।

পিড়িটা শেষ করি আরেকটা বিড়ি ধইর‍্যে মুকটি খুব সিরিয়াস করে মদু বলল, আমি অবশ্য ব্যাঙও খাই। বোলোনি আবার কাউকে। আরে ব্যাঙের সঙ্গে আর কিচুর তুলনা! ছ্যাঃ।

ছিঃ ছিঃ। ব্যাঙ কেউ খায় নাকি? শুনেচি ও চীনেরা খায়। এত্ত মাচ! মাচ খেলিই পারো।

আরে সে তো ইকানে যদিন থাকি। তদ্দিন তো পেট পুরেই খাই। কিন্তু যকন বাদায় ফিরি? তকন?

তকন কি? তকন কি মাছ কিনি খাবার সামর্থ্য থাকি আমার?

বাদাতে আবার মাচের দাম কি?

ভাবতিচ তাই হোসেন মিঞা। যাদের শুদু ভাতি একটু নুনই জোটে না, তাদের আবার ওসব বিলেসিতে!

তা, কি ব্যাঙ খাও?

আবার হাসি ফিরে এল মদুর মুখে। বলল, কী ব্যাঙ মানেটা কি? কী ব্যাঙ চাও? কালো ব্যাঙ, রুপো ব্যাঙ, সোনা ব্যাঙ, হলুদরেকা ব্যাঙ, পাতাসি ব্যাঙ, সবুজ ব্যাঙ, আরো কত ব্যাঙ! ব্যাঙই আমার ব্যাঙ! ব্যাঙই আমার ব্যাংক। মারি আর খাই। সঙ্গি থালা-থালা বাদার চালের ভাত।

বেশ লাগচে হোসেনের, মদুকে! আসলে একানের পেত্যেকটি মানুষই আলাদা-আলাদা। যদিও দূর থেকি দেকলি মনে হয়, একইরকম। হয় লুঙি, নয় ধুতি, কাঁধে-গামছা; খালি-গা অধিকাংশেরই। সবাই কালো। যারা ফর্সা তারাও রোদে জলে পুড়ে ভিজে তামাটে। শহরের ইট-চাপা ঘাসের মতো ফ্যাকাশে ফরসা লয় ইকানের কোনো মরদ। মেয়েরাও ইকানে আসেই না। তাই তাদির কতা বাদ থাক।

মদু স্বগতোক্তির মতো বলল, বর্ষাতে এইসো মিঞা ইকবার। আহা! কী রূপ গো তকন এই সোঁদরবনের। যেমন সুন্দর, তেমনই ভয়ংকর। এই জন্যিই বোদয় পেতিবছর সারেং চাচা হঠাৎ গায়ে হইয়ে যায় গরমের পরে পরেই! আশ্চর্য মনিষ্যি বটেক। বনবিবি, বড়খাঁ গাজিরই সমতুল পেরায়। কোনো মনুষ্যিকেই দেকিনি এমন। অথবা মানুষটা হয়তো মানুষই লয়। মানুষ লয় তো কি?

ওই।

ওই মানেটা কি?

ওই, বাবা দক্কিণ রায় বা বড়খাঁ গাজিরই মতো কুনো দেবতা বা পির হবিন হয়তো।

বাঘে মাচ খায় না?

কতার গতিক ঘুইর‍্যে দে হোসেন শুদোল।

ঠিক সি সময়েই মউলেরা যেদিকে মদু পাড়তে যেচিল সি দিক থেকি গুম গুম করে শব্দ ভেসি এল।

ভারী অবাক হল হোসেন। বন্দুক নিয়ে সারেং মিঞা বসি রইল ক্যাওড়া গাছের তেডালাতে। শিষখালের বাঁ দিকে আর ডানদিকের বনের গভীর থেকি "গুড়ুম" শব্দ ভেসি এল! ইটা কী ঘটনা ঘইটল?

হোসেন ঘাড় ঘুইরে চেয়ি দেকল ক্যাওড়াগাছের তেডালাতে। দেকল, সারেং মিঞাও কান খাড়া করি ডানদিক পানেই চেয়ে আচে।

কী ব্যাপার? ঘাবড়ে গিয়ে শুদোল হোসেন, মদুকে।

ব্যাপার আর কী। বড়োমিঞার সঙ্গি দেকা হইয়েচে ওদের কারো বা, বড়োমিঞা নে গেচে কাউকে উটায়ি।

নে গেচে?

কতাটা শুনিই যেন হাত-পা ঠান্ডা হয়ি এল হোসেনের। গত রাতের গোবিন্দের কতা মনি পড়ল। শেয়ালে-খাওয়া কইমাছ।

গলাতে থুথু আইটকে গেচিল। গিলে ফেইল্যে সি বলল, আওয়াজটা কিসের?

আওয়াজটা আচাড়ি-পটকার।

মদু বলল, নিরুত্তাপ গলায়।

বন্দুকের লয়?

বন্দুক ওরা পাবে কোতা থেকি?

আচাড়ি-পটকাই বা পেল কোতা থেইকি?

কেন? ফরেস্ট-ডিপার্ট দিয়েচে। সেই ইংরেজ আমল থেইকিই তো দিই আসতিচে। শোনোনি কি তুমি?

না ত! কিন্তুক দেয় কেন?

আর কেন? সোঁদরবনের বাঘ আচাড়ি-পটকার শব্দে ভয় পেয়ি পাইল্যে যাবি বলে। হাঃ। বনবিবির বাহনেরা পাইল্যে যাবে কি? ধারে কাচে অন্য বড়ো মিঞা থাকলি পরে সি শালারাও সিরিফ আওয়াজ শুনন্যেই চইল্যে আইসবে। মানুষ ধরার ধান্দায়। সোঁদরবনের বড়ো মিঞাদের মতো বড়ো মিঞা পিরথিবীর কুনো কোণে লাই হে। বড়ো বড়ো শিকারিদের মনে লেইগেচি!

তবে আচাড়ি-পটকা দেয় কেন ওদের? এ তো ভালো করতি যেইয়ে মন্দ করা গো!

গরিবের জীবনের দামটা কি? আচাড়ি-পটকা দেয় তেনাদের বিবেকের চুলকুনি মারার জন্যি। সাদা চামড়ার ইংরেজরা না হোক দেশকি চুষতি এইসেচেল। গত পঁয়তাল্লিশ বচরেও কি এই চোষা-বিদ্যে ভোলা গেল না!

হোসেন চুপ করি থাইকল।

মদু বইলল, মাঝি-মদ্দি কী মনে হয় জানো, চাচার সাঙাত?

কি?

যদি বেশ কিচু বন্দুক জোগাড় হত তবে শালার ফরেস্ট ডিপার্ট, পুলিশ ডিপার্টের গুষ্টি নাশ কইরে ছেইড়্যে দিতম। বাঘ-কুমিরের দাপটের কতা তো শুনেচ কিচু কিচু, কিন্তুক জল-পুলিশের কতা কি শুইনেচ? ফরেস্ট-ডিপার্টের কিচু গুহ্য-কতা?

হোসেন বইলল, কারো গুহ্য-কতাতেই আমার পেয়োজন লাই। ওইদিকে কি হল আমি তাই শুধু ভাইবতেচি। ওই যে! আর একটা শব্দ শুনতি পেইলে কি? কী হল?

হবেটা আবার কী? হারাদনের দশটি ছেলির একটি কী দুটি গেল। এ নিয়ে অত ভাববার আচেটা কি? আর সব খাদ্য-খাদকই বেজায় মাগ্‌গি। ইকানি শুধু মানুষেরই কুনো দাম লাই। "লে-লে-বাবু দশ পয়সা"তে বিকোচ্ছে। যতক্কন তুমি নিজে না যাচ্চ বাঘের পেটে তদ্দিন মউজ উড়াও। পেটভরি ক্যাঁকড়ার ভালো কী পারশে মাছের ঝোল দি ভাত খেইয়ে নাও। "অদ্যাই শেষ রজনী" যাত্রার পোস্টার দেইকেচ? হাঃ হাঃ। আমাদের জীবনও তেমনই! আমাদের মদ্দি আমরা কেউই জানি না যে, কার "অদ্যাই শেষ রজনী।"

সারেং মিঞা হেঁইক্যে বলল, গাছে বসেই; ও মুনসের, কী করবি? তুই শালা গেইলি না কেন ওদের সঙ্গি?

আমি? আমি কেন? মন্ত্র তো পইড়্যেই দিলম।

ঠিকমতো মন্ত্রই যদি পড়লি তবে ও বিচারাদের বড়ো মিঞার সঙ্গে দেকা হইল্যে কেন?

তার আমি কী জানি! কেউ মুইত্যে দেচিল বোদয়। নইলে থুতু ফেইলেচেল।

গতিক কি বুঝিস?

সুবিধের লয়। নিদেনপক্কে ওদের মদ্দি একটো ফিরবে না। গড়বর-সরবর না হলি আচাড়ি-পটক ফুইটল্য কেন?

টিক সেই সময়িই বনের ডানদিক থেকি খুব জোরে বাঁদর ডাকতি লাগল।

সারেং মিঞা সঙ্গি সঙ্গি পড়ি কী মরি করি ক্যাওড়া গাছ থেকি নেইমি এল।

ওদিকে ততক্কনে ভাঁটি নিতেও আরম্ভ কইরেচে। স্যাঁতস্যাতে কালো পলি মাটিতে গোড়ালি অবধি ডুবিয়ে নিজের ডিঙিতে উইটল সারেং মিঞা।

বইলল, আমাকে পার করি দে ই খালটা হোসেন। আয়! ডিঙি খোল। যেতি হবে।

হঠাৎ হোসেন বলল, আম্মো যাবো তুমার সঙ্গি।

তুই! তুই কি জানিস রে সোঁদরবনের? তুই যাবি কি মরতে?

চাচা! তুমি মরলি আম্মো মরব। মরার ভয় কইরল্যে কি আর তোমার শাগরেদ হই? সাঙাত তুমিই না নাম দেচ।

এক মুহূর্ত্তির জন্যি তাকালো সারেং মিঞা হোসেনের মুকির দিকে। পরক্ষণেই বললো, চল তবে মুনসের। চল যাই।

আমি গিয়ে কী কইরব চাচা? আমারও কি একগাচা বন্দুক আচে?

মুনসের বাউলে সারা মুখ খোঁচা-খোঁচা গোঁফ নিয়ে ধূর্ত, ভীতু ছুঁচোর মতো বলল।

কিছু মনুষ্যির চেহারা দেইক্যিই হোসেন বলতি পারে যে, শালারা মনুষ্যি লয়, জানোয়ার। মুনসেরও তেমনি পদের!

রাগে লাল হয়ে উটল সারেং মিঞার দু চোখ। বলল, ডরপোক। আল্লা রসুল তোকে দোজখেও ঠাঁই দেবেন না।

তারপর এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সারেং শুধোল মদুকে, যাবি নাকি মদু?

চলো। ডিঙিতে বসি বসি পায়ে বাত ধইর‍্যে গেল। যাব চাচা।

মদু বলল।

খালি হাতে যাবি? একেবারে নাঙ্গা হাতে?

শড়কি আছে।

মদু বলল।

ওকেও কিচু একটো দে। মানে, হোসেনকে।

দিতিচি।

কী দিবি?

দা আচে। দাই দিতিচি।

একজন জেলে, মাচ ধরা বন্দ রেকে তার নৌকা থেকি একটি দা এনি দিল হোসেনকে।

সারেং মিঞার দল রওনা হয়ি যাবে, ঠিক এমন সময়িই জেলেরা সমস্বরে বলল, আমরা কার ভরসায় থাইকব চাচা? তুমি চইলে গেলে? ইদিকে তো দেকি অনেকই মাচ হইয়েচে।

সারেং মিঞা এক মুহূর্ত ভেবি বলল, পারশে আর ভাঙন মাচে ভইর‍্যে গেচে নৌকো। তোরা জাল তুইল্যে নে মাঝখালে চইল্যে যা। আমার ডিঙিটা কেউ বেয়ি নে' যা। আমার ফিরতি ফিরতি ভাঁটা পুরোও হইয়ে যেতি পারে! "কূ" দিলে সব ডিঙি নিয়ে পারে আসবি। ওই শালা মুনসের বাউলেকে আজ ভাতও দিবি না খেইতি।

একসঙ্গে এত কথা বলতে শোনেনি হোসেন সারেং মিঞাকে এর আগে। রাগে, বাঘেরই মতো গরর-গরর করতিচেল মিঞা। একন অবশ্য একেবারেই চুপ মেইরে গেচে।

সারেং আগে আগে যাতিচে। বন্দুকের দু নলেই টোটা ভইর‍্যে নেচে। বন্দুকটা কাঁদে শুইয়ে নেচে মিঞা। বড়ো বড়ো পা ফেলি এইগ্যি যেতিচে। কিন্তু ভাটি দিতে শুরু করা বনের মধ্যে প্যাতপ্যাতে কাদায় আচাড় না খেইয়ে চলাও এক ভীষণ ব্যাপার। তার উপর চারধারেই ক্যাওড়া গাছের শুলো সোজা-সটান মাথা উঁইচ্যে আচে। একবার পা-ফসকালেই একেবারে ভীষ্মর শরশয্যা কইর‍্যে দেবে। তাড়াতাড়ি কিন্তু খুব সাবদানেও এগুত্তিচে সারেং মিঞা। মাঝে মাঝে উবু হইয়ে বইস্যি দেইকি নিতিচে চারপাশ। গোলপাতার ঝাড়গুলো এমনই যে, দেকা যায় না কিচুই তার নীচে। অথচ তার যে-কোনোটারই নীচে বাঘ লুইক্যে থাকতি পারে।

এতসব কী গাছ? কোনটা কী গাছ?

হোসেন ফিশফিশ কইর‍্যে শুদোল মদুকে।

মদুও ফিশফিশ করল, ক্যাওড়া তো জানোই! ওই দ্যাকো, হেঁতালের ঝোপ। কী ঘন দেইকেচো। এটা গেঁয়ো। এই যে গরান। পশুড়, ধোঁদল, টক-সুদুঁরী। সুঁদুরি তো আচেই! যার নামে বন! তবে কম দেখা যায় ইকন সি গাচ। আর এট্টু এইগ্যে যেয়ি বলল ফিশফিশ কইর‍্যি। এই টক-সুদুরির বন খুব ছোটো ছোটো কিন্তু ঘন। এরই মদ্দি দিয়ে, অসম্ভব না হলি বাঘ হরিণকে তাড়া কইরি নে যায়। কিছুক্কণের মদ্দিই হরিণের শিং যায় আটকে, তকন বাঘ তাকে সহজিই কায়দা করি ফায়দা উটোয়। ওই যে হেঁতাল দেকিচো, তার কতাই বলচিলাম। বর্ষাকালে হেঁতালের মাতা কেটে বড়া ভেজে...

চুপ করবি তুই মদু! তোর মাথা কেটে বড়া ভেজে খাবে একুনি বড়ো মিঞা। বে-জায়গাতি যত্ত আজিবাজি কতা!

রেগে গিয়ে, কিন্তু গলা নামিয়েই বলল, সারেং মিঞা।

পিশপিশ করেই তো বলচি।

পিশপিশ মিশমিশ কুনো কতাই লয়।

মদু বলল, দুস শালা। খেলি, খাবে। আমার মাথার পটকা ফেইট্যে যেয়ে পিত্তি গলে গেছে সি কবেই! পাঠশালে পড়ার সমইয়ি। একবার খেয়েই দেখুক না বাঘে। ওই মাথা-ভাজা খেয়েই মরণের পেরাণ যাবে।

চুপ কর। চুপ কর।

সারেং মিঞার "চুপ কর" আওয়াজটি মিলোতে না মিলোতেই সামনে কী যেন একটা শব্দ শোনা গেল। ওরা তিনজনেই যে যেমন পারল আড়াল নিয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়াল। মদু শড়কিটা বাগিয়ে ধরল। সারেং মিঞা বন্দুক সামনে ধরি থাইকল। হোসেন দেইকল, মিঞার ডানহাতের তর্জনী তার বন্দুকের টিরিগার গার্ডে।

আওয়াজটা ক্রমশ এগিয়ে আসচে। দা নিয়ে, সিও তৈরি হল।

বেলা পেরায় এগারোটা একন। রোদ, বনের ভেতরে ভেতরে সব জায়গাতেই ছইড়ে গেচে। বনের আনাচ-কানাচেরও অন্ধকার ঘুচেচে। তবে একনও এমন অনেক জায়গাও আচে যিকানে আলো পৌচোয়নি। হয়তো কোনোদিনও পৌচোয় না। কিচু জায়গাতি আলো-আঁধারি। হাওয়াতে হেঁতাল আর গোলপাতার পাতা কাঁপচে। রোদ পিচলোচ্চে তাতে। পিচলে গিয়ে, চিটকে উটে, বনময় ছড়িয়ে গিয়ে তিরতির করে কাঁপচে। বিলের একরূপ সৌন্দর্য! আর সোঁদরবনের অন্যরূপ!

ভাইবচেল, হোসেন।

পরক্ষণেই দেকে, দুজন মউলে অন্যজনকে কাঁদে করে নে' আইসচে। সেই অন্যজনের অবস্থা "সিরিয়াস"। তবে, বাঘের কামড়ে লয়, ভিমরুলের কামড়ে। মনে পইড়্যে গেল হোসেনের, নস্করবাবু বইলেচিলেন একদিন, ইঞ্জিরিতে ইমনি অবস্তাকে নাকি বলে, "অ্যান্টি-বেলাইস্যাক্স।" কোতায় বাঘ, কোতায় ভিমরুল! কিন্তুক পরে জেইনেচেল যে ভিমরুলের কামড়েও মনুষ্যি মরে।

সে জনের দুটি চোকই বন্দ হয়ি গেচে। মুক ফুলি বাঘের মতো হইয়েচে। সারা গায়ে ছুঁচ-ফুটোনোরও জায়গা লাই। যারা তাকে বয়ে আনতিচে তাদের অবস্তাও মোটেই সুবিদের লয়। তবু মন্দের ভালো। বড়োমিঞায় ধরেনি, এই ঢের।

মদু ফিশফিশ করে বলল, বনবিবির বাহন চেল বাঘ আর মুরগি। মুরগি যে কেন তা কে জানে। মুরগির বদলে মৌমাচি বইসে পুজো করতে বইলব ইবারে। কী অবস্তা!

বলতে বলতেই ও আর হোসেন গিয়ে ওদের দুজনকে সাহায্য কইরল তৃতীয় জনকে বয়ে আনতি। জ্ঞান ছিল না তার।

সারেং মিঞা বইলল, তোরা এইগ্যে যা। আমি পেচনে পেচনে আসতিচি, পেচন আইগলে।

"পেচন আগলানো" ব্যাপারটা যে কি, তা ভালো করে বুঝতি পারল না হোসেন। পরে কক্কনও জিগেস করি নেবে।

আচড়ি-পটকা পুটোল কোন হতভাগা? বড়োমিঞা এসি হাজির হয়নি এই ঢের।

সারেং মিঞা কৈপিয়ত চাইল এদের কাচ ঠেঙে।

ওদের মদ্দি একজন, তারই নাম বোদয় যাদব, বলল, নাঃ। যা অবস্তা হল। তার উপর নিতেটো যা ভারী। ওর কেলে-বদনে মাংস লাই কিন্তু হাড়ের ওজন সাংঘাতিক। ভাইবলাম, শিষখালটা কাচেই হবে সিকানে আপনেরা এত মানুষ আচেন, খবরটা পেলি এট্টু সুরাহা হবে আমাদের।

খুউব সুরাহা কইরতে গেচিলেন। ওই আচাড়ি-পটকা ফেইল্যে দে কোঁচড় থেকি। রাইপেল বন্দুকের চোট-এর শব্দ শুইন্যে পযযন্ত চইল্যে আসে সোঁদরবনের বাঘ শিকার আর মানুষের খোঁজে। আর আচাড়ি-পটকা! কী বইলব তুদের, মাঝে মদ্দি আমার ইচ্চে হয় যে, কোনোদিন ফরেস্টের সায়েবদের কাউকে নে এসি বনের মদ্দি সেঁদিয়ে গিয়ে আচাড়ি-পটকা ফুটিয়ে নিজে ক্যাওড়ার তেডালে গাছাল দে নিচের মজাটা দেকি! যত্ত সব মানুষ-মারা কল।

তারপরেই বলল, চ, চ, পা চালায়ে চল। শুইনেচিলাম, গোলপাতা কাটা মহানদী নৌকোতে হেকিম আছেন একজন। তার কাচে নে যা এরে সোজা। কী নাম বললি? নিতে না কী যেন। আরে, কত মনুষ্যি হার্টফেইল কইর‍্যে মইরেই যায় ভিমরুলের কামড়ে।

এই হোসেন। দৌড়োবি না যেন কক্কনো। দৌড়েচ কী মরেচ ইকানে। ই কতা মনে রেকো। সব্বোসময়ে।

হোসেন মউলেদের জিগেস করল, ইস এত কষ্ট হল তোমাদের আর মৌচাকই ভাঙা হল না। মদুও পেলে না!

পাব না, কি? কাল আবার আসব সক্কালেই, এট্টু ভালো হয়ি নি। যা, চাক না! গোটা পাঁচ-ছয় আচে। অতবড়ো চাক দেকিনি আগে। আজই পেইড়ে আনতম কিন্তু এই শালা নিতেরই জন্যি! বাবুর গামচাতে আতর নাগ্যানো চেল।

অ্যাঁ? আতর?

সারেং মিঞা আশ্চর্যি হয়ে শুদোল।

হ্যাঁ গো মিঞা! আতর বলি ব্যাপার! কে মাইক্যেচেল, কেমন করি; কোন মন্ত্র পড়ে দেচিল তা কেন বলতি পারে। চাকগুলোন সব খুঁজে বের করার পর নীচে ধুঁয়ো দে নিজেরা গা ঢাকা দেব কি, তার আগেই রইরই করে হাজার হাজার ভিমরুল এসি হামলে পইড়ল গো! মাটিতে গড়াগড়ি খেতি লাগলম তবুও কি ছাড় আচে! নিতের তো ধুতিই খুইল্যে বেইর‍্যে গেল। সি জন্যিই শালাকে সব্বাঙ্গে কাইমড়েচে। বাবুর অঙ্গ-পেত্যঙ্গ ফুইল্যে ঢোল। এই নূপ নিয়ে গোসাবাতে যিনি আতর মাইক্যেচিলেন তাঁকে একবার দেখায়ে যদি আসতি পারতাম তো বেশ হত।

হোসেন হেসে উঠল। সারেং মিঞাও কিন্তু নিতের দিকে চেয়ে, কষ্টও হচ্ছিল। বেচারা বাঁচবে কি না, তাই বা কে জানে! আচ্ছা দেশ বটেক। ইকানে সকলেই যেন সংহার-মূর্তি ধইর‍্যে আচেন। বড়োমিঞা থেকে ভিমরুল!

দূর থেইক্যি ওদের সকলকি পাশখালের দিকি আসতি দেকিই ডিঙিগুলোর মাঝনদী থেকি পারের দিকি আসতি লাগল। বেলা তখন দ্বিপ্পহর। সূর্যর তাপও হইয়েচে খুউব।

৯

চামটার খালি ঢোকার পর থেকি পাঁচদিন হয়ি গেচে। হোসেনের মনে হইতিচে যেন চিরদিনই ও সোঁদরবনে আসাযাওয়া কইরচে। দুঃক একটাই যে, সারেং মিঞাকে একা পাচ্চে না ও বেশিক্ষণ। একন যে থাকতি পারচে না মোটিই, এই ব্যাপারটা যেন স্যারেং মিঞা নিজেও বুঝতি পারতিচে। তার চটফটানি দেকি মনে হয় তার মন বইলচে বেলা পড়ি এল অতচ আসল কাজের কাজ সব পড়িই রইল। যত্ত অকাজ নিয়েই দিন কাইটচে।

হোসেনের মন পইড়ে গেল পেদো-পাড়ার মানকে মুদির কতা। মুদি একদিন যেমন বইলেচেল। মানকে মুদিকে চেলেবেলা থেকেই দেকে আসচে পা-জোড়া কইরে বসি কাউকে দুশো গ্রাম আটা, কাউকে পঞ্চাশ গ্রাম ধনে, কাউকে লেড়োবিস্কুট, কাউকে কাপড় কাচার সোডা, সন্দব লবণ, লবঙ্গ বা গরমমশলা বের করি মেপি মেপি দিতে। মাসকাবারি খদ্দেরদের জিনিস দিয়ে আবার খাতাতে সব নিকে রাকছে। চল্লিশপুরের মোটা গুন্ডা দুবার মানকে মুদিকে প্যাঁদানিও দেচিল উত্তরপ্রদেশের মুগডালের সঙ্গে কাঁকর, কাশ্মীরের কিশমিশ-এর সঙ্গে রাবারের ড্যালা মিশিয়ে বিক্রি করার জন্যে।

কী যত্তির সঙ্গি যে মুদি প্রতিটি পয়সা গুনে গুনে নিত তা দেকার মতো চেল। প্রতিটি টাকা বা প্রতি মুটো খুচরো নেবার সময়ি তার চোক লোভে আর আনন্দে চকচক করি উইটত আর পয়সা যকন দিত ফেরত তার মুখটা এমন কালোপানা হয়ে যেত!

শ্রাবণ মাসের এক সন্দেতে মানকে মুদির দোকানে সওদা করতি এসি পেরচণ্ড ঝড়-জলের মদ্দি পড়ি যায় হোসেন। মুদির দোকান চেল বিলের ধারেই। সেদিন মুদির দোকানে আইটকে পইড়েচিল রাত অব্দি। দোকান বন্দ করার আগে পযযন্ত দোকানেই চেল। তাপ্পর মুদি তার বাড়িতে নে গিয়ে তাকে খিচুড়ি খাইয়ে; ঝড়-বৃষ্টি ধরলি, তবে টর্চ আর ছাতা দে রাত বারোটার সময়ে বিলের ঘাটে পৌচে দেচিল। ডোঙা ছেঁচে জল বার করতিও সাহায্য কইরেচিল অত রাতে।

হোসেন বইলেছিল, তুমি অনেকই করলে দাদা।

মানকে মুদি বইলেচিল, এইটুকুই তো থাকবে বাপ! সারাটা দিন যা কন্নু তার কিছুমাত্তরই তো থাইকবে না।

হোসেন বাক্যিটার মানে ঠিক বোজেনি তখন। বুজেচেল অনেক পরে। আইস্তা আইস্তা।

বাড়িতে, নাভির নিচে ধতির খুঁট নাইমে মস্ত ক্যাঁটাল কাটের পিঁড়িতে, ইয়াব্বড়ো-বড়ো কাঁসার থালাতে যখন হোসেনকে নিয়ে খিচুড়ি বইসেচেল মানকে মুদি, তকন তাকে দেইকে মনি হতিচেল, সি যেন ইক্কেরেই অন্য ইক মনিষ্যি। মুদির দোকানে যে মনুষ্যিটা বসি থাকে সারাটা দিন তার একটুও যেন মিল নাই এ মনুষ্যিটার সঙ্গি। সত্যিই, যতই বয়স বাড়তিচে, দিন যেতিচে; ততই হোসেন মানকে মুদি বা সারেং মিঞার মতো মুনিষ্যিদের দেইকে বুইঝতে পাইরচে যে, জীবিকার সঙ্গি মানুষের জীবনের কোনোই সম্পর্ক নাই। যে কসাই, যে সুদখোর, সে-ও মহৎ মনুষ্যি হতি

পারে। আবার মন্দিরের পুরোহিত বা মসজিদের মোল্লাও অত্যন্ত নীচ চরিত্রের মনুষ্যি হতি পারে। মানকে মুদির কতাতে একটা ব্যাপার বুইঝতে শিকেচেল হোসেন যে, অধিকাংশ মনুষ্যিই মনুষ্যির জীবন লিয়ে ইকানে যদিও আসেক সারাটা জীবনই তারা শুদু তাদের জীবিকারই মদ্দি আইটকে থাকে। বিতিচি গেরামের মানকে মুদির কতাতে "অর্থ সংগ্রহেই জীবনপাত করি, পরমার্থ নিয়ে ভাবার ফুরসুতই পাই না।"

"পরমার্থ" কাকে বলে, "জীবন" বলতে কী বোজায় তা জানে না হোসেন তবে ইসব শব্দ ও বাক্যিগুলোন তার বুকের মদ্দি উতালপাতাল করত বলিই তো তার এমন করে পাইল্যে আসা! তা না হলি, পাইল্যে আইসবেই বা কেন?

সারেং মিঞাকে কাচ থেকি যতই দেকচে ততই যেন ও বুজতে পাইরচে যে, রোজকার নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের বাইরেও পেত্যেক মনুষ্যিরই অন্য একটা জীবন আচে। হয়তো সব মানুষেরই উচিত-কর্ম সেই জীবনকে জানা, তাকে আবিষ্কার করা। উচিত-অনচিত বোদএর সঙ্গি ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের কুনো ভেদাভেদ লাই। কুনো সম্পর্কই লাই। কিচু মনুষ্যির, অতি অল্পসংখ্যক হলিও কিচু মনুষ্যির মনের মদ্দি এই ঔচিত্য-বোধটা থাকেই। যাদের থাকে, তারা দৈনন্দিনতার গণ্ডির মদ্দি খাঁচার পাকির মতোই ছটফট করতি থাকে। পাকা ঝাপটায়, ঠোঁট দি খাঁচার লোহার পাত কাটার চেষ্টা করে অনবরত। মুক্তির সন্দান তারা পেল কি না পেল, নীল আকাশে তারা উড়তি পারুক আর নাই পারুক, তাদির এই চেষ্টার মদ্দি দিয়েই, তারা যে অধিকাংশের মতো লয়; এই সত্যটো পরিষ্কার হইয়ে যেতি থাকে অন্যদের কাচে। মানে, যাদির তা বোজার মতো খ্যামতা আচে।

মানকেদা সেই রাতে হোসেনের চোকও খইল্যে দেচিল। কী যেন একটা অভাববোধ তাকিও সেই রাত থেইকেই পেয়ি বইসেচেল।

একন রাত নেমে এইসেচে। চামটার খালেই তারা আচে। তবে ভাগ ভাগ হয়ি গেচে। এখন যিকানে আচে, সিটা গোবিন্দকে যিখানে বাঘে নেচিল তার সবি দুই বাঁক ঘুরি। জায়গাটাতি ঘোর বন। অন্দকার হবার পরপরই গা-ছমছম করে। সন্দের এক পহরের মদ্দিই খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে শুয়ি পইড়েচে।

সারেং মিঞা ছইয়ে হেলান দে' বসি হুঁকো খাচ্চিল। একনও 'খাম্বীরা' তামাক আচে কিচুটা। একনও এপাশের ওপাশের নৌকো থেকি হুটপাট কতাবাতরা, তামাক খাওয়ার শব্দ, গান এবং রান্নাবান্নার শব্দও ভেসি আসচে। অনেক দেরি করি ফিইরেচে অনেকে কাঠ কেইটি বা মাচ ধইবে বা মধু পেইড়ে। দূরেও গেচিল অনেকে।

জেলেরাই ফেরে সব চেয়ি দেরি করে। কাঠুরে ও মউলেরা রোদের তেজ কমতি না কমতিই ফিরে আসে। কারণ, তাদের যেতি হয় বনের গভীরে। ভাগ্য মন্দ হলি তবুও দিবা-দ্বিপ্রহরেই বাঘে নিয়ে যায় তাদের। জেলেদেরও নেয়।

এক ছোঁড়া মাউথ-অর্গান বলি ছোট্ট কী একটা বাদ্যি এনেচে। ঝ্যা-ঝ্যা, প্যাঁ-প্যাঁ করে সি বাজনা বাইজে সকলেরই অশান্তি করচে। বাজানো যদি পুরোপুরি শিখে নেত তবে এত খারাপ নাও লাগতি পারত। কিন্তু একনও বাজানো শিকচে সে। তবে ছেলেমানুষ বছর বারো বয়স। তাই তাকি কেউ কিচু বলে না। মায়ের কাচে ফিরবে কি না ফিরবে, তা কে জানে!

সেই যে হোসেনের সমবয়সি ছেলেটির সঙ্গে আলাপ হয়েচেল, দ্বিতীয় না তৃতীয় দিনে চামটার খালে ঢোকার আগে, লাল-কালো চেক-চেক লুঙি আর বগল-ছেঁড়া নীল হাফশার্ট পরা, তাদের সঙ্গি আজ সকালে আবারও দেকা হয়ে যেচিল। আগামী কাল থেকি কলিমুদ্দি আর কালুমিঞারা সারেং মিঞাদের সঙ্গি একই জায়গাতি থাকবে রাতে। ভেবেই ভালো নাগচে হোসেনের। তার সমবয়সি একজন অন্তত কাচে থাকবে।

নিজেদের পেয়োজনে নৌকো-ডিঙি সব ভাগ ভাগ হয়ে যাওয়াতি বিপদও বাড়চে। এই পাঁচদিনে আরো একজন মানুষ গেচে বাঘের পেটে। তাকে নিয়েচে চন্দ্রোদোয়ানিয়া খালের এক পাশখাল থেকি দুপুরবেলা। কাঠ কাটতে নেমেচেল বেচারি ডাঙাতে। দুটি মেয়ে বিয়ের বাকি। সি জন্যিই এইসেচেল মাচ ধরতি।

আরও একজনকে নিত, ছোটো -ধুতরা খাল যিখানে গোসাবা নদীতে গিয়ে পইড়েচে তারই কিচু আগে পশ্চিমের দিকের এক শিবখাল থেকি। মাচ ধরচেল তারা তিনজনে মিলি। তবে তার ঘাড়ে লাপাবার আগে তার এক সঙ্গী শড়কি ছুঁড়ি দেওয়াতি ঘাবড়ে গিয়ে বাঘ পেইচে যায়।

মদু বাউলে বলচেল, হোসেনকে; সুন্দরবনের বাঘ যকন কাঠুরেকে নেয়, তখন তারা বড়ো কায়দা করি এগোয়। ধূর্তচূড়ামণি তারা। কাঠুরেরা তো চারধারে নজর রেকিই বনির কুড়ুল মারচে। দুজনে দুজনের সামনে নজর রাকচে। কিন্তক বাঘ যদি মনি করে যে সে আইসবে তবে হাজার জোড়া চোকও তারে দেকতি নারে। বাঘ এমন ভাবে দূর থেকি ঘাপটি মেরে এট্টু এট্টু করি তাদের দিকে এইগ্যে যাবে যাতে দুজন কাঠুরের একজনেরও চোখের সামনের দিকের দৃষ্টির মদ্দি এসি না পড়ে! দৃষ্টির মদ্দি সি যদি থাকেও তবুও বাঘ ঠাহর হয় না। কত যে সামান্য এবং ছোটো জিনিসের আড়ালে প্রকাণ্ড শরীরটাকে লুইক্যে ফেলতি পারে বাঘ, তা যারা নিজেরা নিজ চোখে বারবার বনের বাঘ দেকিচেন, শুধু তাঁরাই জানেন।

কাঠুরের কুড়ুল যেই পড়ল, গাছে শব্দ হল কটাস করে; বাঘ তকুনি এক পা সামনি এগুলো যাতে তার পায়ের নিচোর পাতাপুতা বা কাঠ থেকে ভেঙি যাবার শব্দ না কানি যায় কাঠুরের বা কাঠুরেদের। পেয়োজন হলি মোটি একশো হাত জমি জঙ্গলের বা ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে পেরিয়ে যেতি বাঘ দু-তিন ঘণ্টাও অপেক্কা করে। তার বেশিও করতি পারে। তার উদ্দেশ্য যতক্কন না সফল হবে ততক্কনই চইলবে তার সাদনা। খুদাহ পিথিবী সব শয়তানের সব ধৈর্য দিয়ে পাইটেচেন এই জানোয়ারকে। পিরথিবীতে শিকারি যদি কেউ থেকে থাকে, তবে সি এই বাঘ। এত বুদ্দি, এত ধৈর্য, এত সাহস আর কোনো প্রাণীর মদ্দি দেননি খুদাহ।

শিকারিরা আসতিচেন মোটর-বোটি করি। তাঁরা কলকেতা থেকি রওনাই শুধু হইয়েচেন তাই লয়, ক্যানিং থেকে সারা রাত মোটরলঞ্চ চালিয়ে এসি কাল সকালিই পৌচে যাবেন চামটার খালে। ফরেস্ট ডিপার্টের ছোটো পিটেল-বোটে কইরে রিঞ্জার সায়েব, ফরেস্টার সায়েবকে দিয়ে সারেং মিঞাকে খবরটো পাইটেচেন গতকাল। আগামীকাল যেন দু নম্বর আর সাত নম্বর ব্লকের মদ্দির ছোটো-ধুতুরা খাল-এ গিয়ে একবার হাজিরা দেয় চাচা। রিঞ্জার সায়েব এই অর্ডার কইরিচেন।

সারেং মিঞা বইল্যে দেচে যে, ওকানে অনেকই বাউলে আচে। সায়েবরা যেন তাদের নিয়েই বাঘের মোকাবিলা করেন। সারেং বুড়ো হইয়ে গেচে। তাচাড়া শিকার করার ইচ্চেও আর নেই তার আদৌ।

বলেচে বটে, তবু যাবে সারেং মিঞা একবার রিঞ্জার সায়েবের খাস্বীরা তামাকের ঋণ শোদ করতি।

ভোর হতি না হতিই ডিঙি খুলে দে ছোটো-ধুতুরা খালের দিকে চলল সারেং মিঞা সাত তাড়াতাড়ি।

হোসেন ডিঙি বাইচে। এখন আর কুনোই অসুবিধে হয় না। একেবারে সড়গড় হইয়ে গেচে হোসেনের।

সকাল আটটা নাগাদ বহু দূর থেকি জলের উপরি ব্যাণ্ডবাজির মতন লাপাতি লাপাতি দৌড়ে আসা মোটর-বোটে আওয়াজ শোনা গেল। একটু পরই দেকা গেল বিরাট গলুই দিয়ে জলের বুক চিরে দুপাশে ঢেউ তুলে সাদা ধবধবে বোট আসতিচে। তার ডেক-এ নানারকম পোশাক পইরে

দিশি অথচ সায়েব শহুরে শিকারিরা বইসে আছেন। কারো হাতে দু-হাজারি 'দূরবিন', কারো হাতে দশহাজারি বন্দুক; কারো হাতে পনেরো-হাজারি ক্যামেরা, কারো হাতে কুড়িহাজারি রাইপেল।

লঞ্চের ঢেউয়ের তোড়ের মদ্দি ডিঙি সামলানোই দায়। সেই তোড়ে, জলের উপরে লাপালাপি করতিচে ডিঙি নৌকো।

শক্ত হাতে হাল ধরি রেকে সারেং মিঞা বলল; আদাব।

আদাব। কেমন আছো সারেং মিঞা?

লঞ্চের ইঞ্জিন নিউট্রাল কইরে দে শুদোল বোটের সারেং নীলমণি সক্কলের আগে।

তুমি কেমন আচ গো নীলমণি?

সারেং মিঞা হেসে শুদোল।

ওই। চইলে যাচ্চে।

খাইদ্য-খাদকের অভাব কি তেমনই চলতিচে একনও?

ওই কতাতি হেসি ফেইলল নীলমণি। মোটর-বোটের সারেং।

সারেং মিঞা, ফিশ-ফিশ করি হোসেনকে বইলল, এই নীলমণিই প্রথমি এই "খাদ্য-খাদক" কতাটা খাবার-দাবার অর্থে চালু কইরে দেয় এই অঞ্চলে। তাপ্পরই কথাটা ধইরে গেচে। তকন নীলমণি চেল ইঞ্জিনম্যান। বাগচিবাবুর ক্যানিংগোসাবা মোটর লঞ্চ কোম্পানির সারেং এই সারেং মিঞার অ্যাসিস্ট্যান্ট।

নীলমণি বলল, আমরা আর তিনটে বাঁক এইগ্যে নোঙর কততিচি। এসো তুমি চাচা। অন্যেরাও আসবেকন। রিঞ্জার সায়েবও পৌচে গেচেন হয়তো এতক্কণে।

ঠিক আচে। এগোও তুমি নীলমণি।

বলেই হাঁকল, এই। জল থেকি বইটা তুলি নে হোসেন।

জল শান্ত হলি পর তারপরই আবার লামাবি।

কাল পিটেল-বোটে করে আসা ফরেস্টার বাবু বইলতেচেলেন যে, বাঘ যিখানে শেষ মানুষ নিইয়েচে সেই ব্লকে ক্যাওড়া গাছে মাচা বেঁধে নাকি "গাছাল" দেবেন ঠিক কইরেচেন শিকারিরা।

শিকারিদের বেশভূষা, বন্দুক-টুপি-চশমা সব যেমন, তা দেখে হার্টফেলই করি না মারা যায় এই সোঁদরবনের অশিক্ষিত, আনকেলচার বাঘেরা।

সারেং মিঞা বইলল, হোসেনকে।

হোসেন বইলল, যা বইলেচ চাচা। কে কাকে দ্যাকে তার টিক নাই।

চাচা বইলল, চিন্তার কিচুই লাই। ওই শিকারিদের মধ্যেই কাউকে বড়োমিঞায় উঠোয় নে যাবে। আর কি কতাটা ইকবার পেচার হয়ি গেলি ই বছরে সব জেলে মউলে-কাটুরেরাই পাইলে যাবে। হিত কইরতে বিপরীত!

বলো কি চাচা?

তবে আর বলি কি? এরা সোঁদরবনের শিকারিই লয়! সোঁদরবনে উসব চালিয়াতি চইলবে না। লুঙি-ধুতি কোমরে গুঁইজে নে, বনবিবি, বড়খাঁ গাজির পুজো দে' বন্দুকগাচ দুহাতে ধইর‍্যে খালি পায়ে বাঘের খোঁচ দেকি দেকি এগুতি হবে ইকানে। দশ চোখ, দশ কান, দশ নাক চারদিকে বিস্তার কইরে। শিকারিরা জুতো-সুদ্দু ডাঙায় নামলেই তো জুতো সুদ্দু পাই গেঁইতি যাবে বনে-বাদাড়ে। তারপর দু-একটা ভারী শরীরের শিকারি পইড়বে কেওয়ার শুলোর উপরি। পিট-কোমর সব এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হইয়ে যাবে চাঁদবদনদের!

তাইলে কি হবে চাচা?

চিন্তার গলায় বলল হোসেন।

কী আবার হবে? যা বাঘের আর শিকারিদের কিসমত-এ লেখা আচে, তাই হবে। বাঘও তো শিকারি না, কি? দুই শিকারির মদ্দি যে শিকারি জিতবে, সেই বাঁচবে। অন্য পক্ক মরবে।

নীলমণি যে-জায়গাতে পৌচোতে বইলেচেল সিকানে পৌচে ওরা দেকল যে সিকানে রীতিমতো মেলা নেগে গেচে।

ডিঙিতে-নৌকোতে গমগম করছে পুরো এলাকা। রিঞ্জার সায়েব আগেই পৌচে গেচেন এবং বাউলেদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্চেন।

সারেং মিঞার ডিঙি ডাঙায় লাইগলে দাঁইড়ে উটে আদাব করল সারেং মিঞা রিঞ্জার সায়েবকে।

রিঞ্জার সায়েব বলল, তুমার উপর ভার দে' গেলাম তবু মানুয মেরি দিল বাঘে, তুমি থাকতিও! কী, সারেং?

সারেং বলল, এতবড়ো এলাকা সায়েব। রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজত্ব থাকতেই বাঘেদের ঠেকাতে পারেননি উনি, আর আমি তো কোন ছাড়!

রিঞ্জার সায়েব তো তদারকি করি চইলে গেলেন।

১০

ঘটনাটা ঘইটল পরদিন সকালে।

শিকারিদের বোট রাতে ডাঙার পাশে নোঙর করা চেল।

ই পেযযন্ত কোনো মোটরবোটে উটে একজনও মানুষে নেয়নি বাঘে সোঁদরবনে।

নেয়নি যে কেন, তা বলা মুশকিল। হয়তো বাঘেদের ভয়; হয়তো সংস্কার! তা নইলে, নিতে কোনই অসুবিধেই ছেলনি।

কুমিরও যদি ডিঙি বা নৌকোর তলায় পিঠ লাইগ্যে দে' ভেসি উটতো উপরে তাইলে কি নৌকাডুবি হতনি? কিন্তুক ডিঙির চেয়িও যে-কুমির সাইজে বড়ো সেও তো কোনোদিনও নৌকো উলটো দিতি সাহস পায়নি!

এও হয়তো ভয় ও সংস্কার। মানুষ যে সবচেয়ি খারাপ চরিত্তিরের, সবচাইতে ডিঞ্জারাস জানোয়ার ওই খুদাহ্‌র দুনিয়ায়, ই খপর তো তারাও রাকে কি না!

যাইহোক, সক্কালবেলা চা-জলখাবার খেয়ি চারজন শিকারি দুজন কাটুরেকে নে' তাদের মাতায় পশুর কাটের তক্তা চাপায়ে দড়ি-টড়ি লিয়ে মাচা বাঁইধবেন বলি জঙ্গলে ঢুইক্যেচেলেন।

গতকালই বিকেলে নেইম্যে দেইকেচিলেন যে, খালের কাছে ডাঙার উপরে পায়ের অগণ্য খোঁচ। যেন শোভাযাত্রা করেই বাঘগণ গেচে সে পথ দে'। পথের দুপাশের গাচে গাচে বাঘের পায়ের নখ ধার দেওয়ার গভীর চিহ্ন। পেচনের পায়ে ভর দে' দাঁইড়্যে উটো বড়ো বড়ো গাচের গুঁড়িতে বাঘ নখ ঘযে-ঘযে নখ পরিষ্কার তো করে বটেই; নখে ধারও দেয় অমনি করেই! শিকারিরা চইলেচেন বন্দুক রাইপেল নে', সার্রি বেঁদে অতি সন্তপ্পনে চারিদিক ইতি-উতি দেখতি দেখতি। অকুস্তলে পৌচি মাচা বাঁইধবার ইন্তেজাম কইরবেন নিজেদের তদারকিতে। তাপ্পর বিকেল বিকেল এইসি সেই মাচাতিই বইসবেন।

দুই জায়গাতে দুটি মাচা বাঁধা হবেক এমনই কতা চেল।

বনের ভেত্তরে কিচুটা যেতেই আচম্বিতে ভয়-ডরহীন এক বাঘ, গেঁয়োর জঙ্গলের মদ্দি থেইকি ইকেবারেই অতর্কিতে বাঁ ধার থেইকি কোণাকুণি যেন উইড়্যে এসিই এক শিকারির বাঁ কাঁদ আর ঘাড় কাইমড়ে তাকে নে মাটিতে পইড়েচেল। সেই শিকারির হাত থেকি তো বিশ-হাজারি রাইপেল ছিটকে পইড়ল সঙ্গি সঙ্গি কাদার মদ্দি। অন্য দুজনের একজন কাণ্ড দেইকি্য স্ট্যাচু হয়ি যেয়ে দাঁইড়্যে রইলেন! বাকরোদ হইয়ে গেল তাঁর। আর অন্যজন বন্দুক উইট্যে গুলি করতে চেইচিলেন বটেক কিন্তু পাচে বন্ধুরই গায়ে সে গুলি লেইগ্যি যায়, সেই ভয়ি করতি পারেননি। হাঁ করি চেয়ি রইলেন তিনি সিদিকে। ইতিমধ্যি একজন দুঃসাহসী কাটুরে কইরেচে কী, এক নাপে বাঘের দিকে এইগ্যে যেয়ে তার মাতা থেকি্য পশুর কাঠের ভারী তক্তার বোঝ ঝেইড়্যে ফেইলেচে বাঘেরই গায়ের উপর। বাঘ তকনও শিকারের টুঁটিতে পেরথম কামড় আলগা দেয়নি সেই সময়েই তার উপরে তক্তা পড়াতে সে বিজায় চইট্যে উট্যে শিকারিকে ছেইড়ে দে কাটুরেকে ধইরতি গেল। কিন্তুক সেই ঝানু মিঞার পো তক্তা ঝেড়ি ফেলার সঙ্গি সঙ্গিই তরতরিয়ে একটো সাদাবানি গাচের মগডালে উইট্যে পইড়ল বাঁদরের মতো। ততক্ষণে অন্য শিকারি ঘুইরে দাঁইড়্যে চোট কইর‍্যে দেচে বাঘের উপর তার বন্দুক দে। তবে 'চোট' ভালো জায়গাতি হলনি। গুলি নাগল যেয়ে বাঘের উপর পেটিতে। তাতে তো বাঘ সাক্ষাৎ যমরাজ হইয়ে উইট্যে গুলি-মারা শিকারিকেও পেইড়্যে ফেইলল। ততক্ষণ যে শিকারি বাকরোদ হইয়ে স্ট্যাচু হইয়ে গেচিলেন, তিনি গতিক মোট্রে সুবিধের লয় বুইজে লিয়েই ঘুইর‍্যে দাঁইড়্যেই লঞ্চ বলে ভোঁ দৌড়।

দুই শিকারিকেই ধরাশায়ী দেকে সোঁদরবনের পোক হইয়েও অন্য কাটুরে ভয়ানক ভুলটা কইর‍্যে বইসল। সেও শহুরে শিকারির পেচনে পেচনে দৌড় নাগাল। বাঘ তকন দু নম্বর শিকারির বুকের উপরে বইস্যে ঘাড় ঘুইর‍্যে ইকবার দেইক্যে নিল দৌড়ে-যাওয়া শিকারি আর কাটুরেকে। কাটুরে যদি মাথার ভারী তক্তা মাটিতে ফেইল্যে দিত তবেও হয়তো কিচুটা যেতি পারত। সে হাল্কা হয়ি দৌড়োতি পারত। তক্তা ফেলার শব্দেও বাঘ এট্টু থমকি যেতি পারত, থমকালি! কিন্তু তার কোনো কিচুই না কইর‍্যে সে অনভিজ্ঞের মতো দৌড় লাগাল।

সাদা উঁচু, সাদা মোটর-লঞ্চ থেকি মোটা তক্তার "সিঁড়ি" নামানো চেল ডাঙ্গাতে। বাঘ দুজনকেই তাড়া কইর‍্যে যেয়ে প্রথমে ধরল শিকারিকে। তার সাধের খাকি জামা-প্যান্টালুন ফালাফালা করি নখ দে ছিঁইড়্যে ফেইল্যে কানি কইর‍্যে ফেইলল মুহূর্তের মদ্দি। তাপ্পর তার ঘাড়ে, বেড়াল যেমনটি ইঁদুর ধরে তেমনি করি কামড়ে ধইর‍্যে রইল কিছুক্ষণ। তাপ্পরই তিন-চার থাপ্পড় লাগাল মাতায় ঘাড়ে। "থপ" শব্দ কইর‍্যে শিকারির মাথার খুলি ফেইট্যে গেল।

ততক্ষণে কাঠুরে লঞ্চে পেরায় পৌচে গেচে। আর মাত্র হাত দশেক। নীলমণি সারেং লঞ্চের মাতায় "সুকান" ধইর‍্যে বইস্যে চেল। সে প্রাণপণ গলা ফাইট্যে দে চেঁচাতি নাগল, উইট্যে পড়! উইট্যে পড়! রে প্রাণনাথ, তোর পোঁদে বাঘ।

আর মাইত্র দশ হাত চেল মোটর লঞ্চের সিঁড়ি থেকি। প্রাণনাথ যার নাম, সেই কাঠুরে পেরায় উইট্যে এইসিচেল লঞ্চে। ততক্ষণে তার যকন বুদ্দি শুইলল তকন সি দাঁইড়্যে পড়ো মাথার তক্তা খপাত কইর‍্যে মাটিতে ফেইল্যে যে' বোটের সিঁড়ির দিকে দৌড়েচে। মোটে আর দু হাত বাকি। বোটের ইঞ্জিনম্যান, বাবুর্চি, মাল্লা, খিদমদগার, নীলমণি সারেং ও শিকারিবাবুদের দু জন মোসাহেব দু হাতে তালি বাজায়ে বাজায়ে বাঘকে আইটকাবার চেষ্টা করতেচেলেন। প্রাণনাথের ডান পা যকন সিঁড়িতে তকন বাঘ বড়ো এক নাপ মেইর‍্যে এসি তাকি ধইর‍্যে ফেইলল। ঘাড় কামড়ি তাকে মাটিতে ফেইলেই, পরক্ষণেই ছেইড়্যে দিল। আবার তার পরক্ষণেই অতজন সামনে প্রাণনাথের মুণ্ডুটাতে কামড় বইস্যে দে তাকে ফেইল্যে রেকে পেচণ্ড হুংকার দে' সক্কলের হাত-পা ঠান্ডা কইর‍্যে

আবার বড়ো বড়ো লাপ দে' জঙ্গলে ফিইর‍্যে গেল। তকন সেও রক্তে মাকামাকি হয়ি গেচে। পেটের রক্তে শরীর ভেসি যেতিচে।

নীলমণি সারেং, অনেক বচরের সারেং, সুন্দরবনে তার অভিজ্ঞতাও কিচু কম লয়। মাতার চুল পেকি সাদা তবু সে প্রাণনাতের মাতাটার দিকে চেইয়ে দু হাত মুখ ঢেক্যি ফেইলল।

বাড়িতে পরথম-পোয়াত্তি বউ প্রাণনাথের! তার একার মাথা তো সি লয়। সে যে, বাদার কোণের বাবলা আর হিজলের ছায়ায় দাঁইড়্যে থাকা কুঁড়েঘরের একটি পরিবারের মাতা!

১১

এমনি কইর‍্যেই দিন যাতিচে। ঘটনার পর ঘটনা। তাপ্পর আরও ঘটনা।

আইজকে দুক্কুরবেলা একটি পাশখালে নোঙর কইর‍্যে আচে হোসেনরা। আসলে এরফানেরা আচে, তাই। মাছ ধরচে সুঁতি-খালের মদ্দি। রোদ চকচক করতিচে। জলে। জোয়ারের জল ঢোকার একটানা শব্দ হতিচে জোর। ডিঙির খোলের গায়ে, পাতা-পুতা কাটকুটো সড়সড় শব্দ কইর‍্যে চলি যাতিচে। পাখি ডাকতিচে। মাচরাঙা। চমকি চমকি। কালু হঠাৎ ডাক দে' মাতার মদ্দি ছুরি চাইল্যে দিতেচে।

এরফান বইলতেচেল, এই পাকিগুলো শীতকালে এলিই বেশি দেকা যায়। এরফানেরা শীতকালেও আসে। পেতিবছরই। বইতেচেল, আঃ তখনকার সুন্দরবনের যা নূপ! নীল জল, সবুজ জঙ্গল, নীল আকাশ। সুনসান।

সুন্দরবনের 'নূপ' বোধহয় সবসময়েই ভালো। শুদু বর্ষাকাল ছাড়া। সারেং মিঞা বলে আবার অন্য কতা। রূপের মদ্দি এট্টু ভয় না-থাকলি কী যে 'নূপ' খোইল্যে!

আরো ভয়!

আর কত ভয়ের পেয়োজন 'নূপ' খোলাতে সারেং মিঞার? পাগল একেই বলে!

হোসেন ভাবে

এরফান বলল, এইসো দিকি, ধরো, জালের ইপাশটা। বিল-এ মাচ ধরা, পুকুরে মাচ ধরা আর স্রোতের নদীতে, জোঁয়ার-ভাটা গোন-বেগোনের নদীতে মাচ ধরা অন্য ব্যিপার।

নতুন জিনিস শিখচে হোসেন। শুধু ইকটা কেন, পেতিমুহূর্তেই নতুন জিনিস শিখতিচে। ভালো লাগতিচে খুব।

ওরা সুঁতিখাল বা শিষখালের যেকানটাতে দাঁইড়্যে মাছ ধইরবার কসরত কইরচেল তার এট্টু দূরেই পাশ-খালে ডিঙি বেঁইধে সারেং মিঞা তামাক খেইতেচে রোদে বসি। এতক্ষণ টঙের মদ্দি শুইয়েচেল। এট্টু ঠান্ডা নেইগেচে মিঞার।

সকালের দিকে ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব থাকতিচে। সারেং মিঞাকে দেকা যাতিচে না তবে তার তামাকের ধুঁয়ো দেকা যাতিচে। সাদা, পেঁজা-তুলোর মতো ধুঁয়ো ভোরের বাতাসে ভেইস্যি আসতিচে শিবখালের দিকে, গরান আর ক্যাওড়া গাছের ভিড়ের মদ্দি দে। ভারী শান্তি। এই নিজ্জন বনে। এই শান্তি বুকের মদ্দি যে এতরকম অশান্তি নুইক্যে আচে তা কে বলবে!

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই মাছের জাল বাঁইধতি বাঁইধতি হোসেনের মনে হল, কী করতিচে। সি ইকানে। সি তো মাচ ধরতি বা মধু পাড়তি বা কাট কাটতিও আইসে নি ইকানে। তবে ঠিক কী করতি যে এইসেচেল তাও সঠিক জানা নেই ওর। সারেং মিঞার সঙ্গি এইসেচেল এক নতুন দুনিয়াতে পরবেশ কইরবে ই আশায়। এই সোঁদরবনে বাঘ, কুমির, গোসাপ, সাপ, কামট, হরিণ, বাঁদর, এর আশ্চর্য জোয়ার-ভাটা, এর গাচগাচালি, পাক-পাকালি ইসবই ইকেবাহে যে লতুল তাতে সন্দেহ লাই কুনো। কিন্তু এই লতুল যে সি লতুল লয়। ও যে বেবাক অন্য ইক লতুল দিশে জন্যি তৈরি হইয়ে এইসেচেল মনি মনি। সেই দিশটা যে কোতা তা তো সারেং মিঞার হাবে-ভাবে ঠাহরই হলনি ইকন পয্যন্ত। কে জানে! কী আচে সারেং মিঞার মনে! কী করে! কোতায় নে যায় তাকি শেষ পয্যন্ত।

তবে একটা ব্যাপারে ও মনে মনে এট্টু দুঃকু পেইয়েচে। এই এরফানকে সারেং মিঞা যেন একটু বেশি স্নেহের চোখে দেকতিচে। হোসেনই তো তার সাঙাত, কিন্তু এরফানরা ফিইর‍্যে আসার পর থেইকেই, এ কদিন সারেং মিঞার এরফানের পেতি ব্যাভারটা কেমন যেন মাখোমাখো টেকতিচে। কী ব্যাপার! কে জানে।

সারেং মিঞাও ভাবতেচেল, কী করতিচে সি ইকানে? কেন আসে? কুতায় যাইব্যে বইল্যে আসে আর কুতায় বার বার তার ডিঙি ঠেইক্যে যায় সত্যি-চড়ায়, মিথ্যে-চড়ায়, গোন-বেগোনে, দোয়ানিয়া খালে; তা ভেবিই পায় না সে। অন্য দশজনের মতো তার যদি কুনো সুগোল গন্তব্য থাকত, মানে যে গন্তব্য আর ফেরাতে এক বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়; তবে তো ভাবনা ছেল না কুনোই। কিন্তু সে যে সারেং মিঞা। সে যে অন্য কেউই লয়। তার চলার পথ, তার গন্তব্য সবই যে অন্যদের থেকি আলাদা।

তবু, কী করতিচে সি ইকানে?

সারেং মিঞা, টঙের গায়ে হেলান দে গলুইয়ের দিকে ডান পায়ের উপরে বাঁ পা-টা চাইপ্যে দে বইসেচেল। এবারে পা বদলে, বাঁ পায়ের উপরে ডান পাটি চাপাল।

এই দুটি পা অনেকই হেঁটেছে এই দুনিয়ার পথে পথে। অনেকেই সাঁতার কেইটেচে জীবনভর। অনেক বিলে, অনেক গাঙে, অনেক নদীতে। দুটি পায়ের মদ্দি কোন পা-টি যে বেশি কেলান্ত তা ও বুজে পায় না।

তবে ডান পায়ের আঙুলগুলি আজকাল ফুলতিচে, ডান হাঁটুটাও বেগড়বাই কইরতিচে। শরীল নোটিস দিতেচে "বেলা পড়্যি এইল্যে, ঘরকে যাও। মিঞা, ঘরকে যাও।"

কিন্তু...

সারেং মিঞা এরফান-এর কথাই ভাবচেল। তারই সঙ্গে, এমন সব কথা কয়েচে, যা সারেং নিজেও কখনও নিজমুখে উচ্চারণ পয্যন্ত করেনি। স্বপ্নে দেকেচে। দেকেচে অবশ্যই! জীবনে একবারই শুদু, একবারই একজন মনুষ্যির মেইয়ে তাকে প্রায় সারেং-এর দু ডানা কেইট্যে দে অন্য দশজন পুরুষেরই মতো সংসারের পাঁকে আইটকে ফেইলেচেল। তার নাম ছেল নাজনিন। শেষ পয্যন্ত অবিশ্যি তার বাঁধন কেইট্যে পাইল্যে আসতিই পেইরেচেল সারেং মিঞা। কারণ, সারেং মিঞা জাইনত যে, বিবি যদি বুঝদার না হয়, না মমতা থাকে তার মিঞার পেতি, মিঞাকে যদি সি নিজের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য আর যাবতীয় খোয়াব হাসিল করার উট হিসেবেই ব্যাবহার করি যায় আজীবন, তবে সেই নিকাহ মরদের পক্ষে কয়েদখানা। দু পায়ে ভারী বেড়ি নিয়ে সেই মরদের পক্ষে শর উঁচা করে ইনসান-এর মতো বাঁচাই অসম্ভব। তার উপরে সারেং মিঞার মতো ইনসান। যার ইনসানিয়াত বোঝে এমন আদমই কম আছে খুদাহ্‌র দুনিয়াতে।

তাছাড়া, শাদির পর কোন বিবি যে কেমন নিকলাবে তা শুদু কিসমতই বলতে পারে! শাদি করা আর কিমতি মোড়কে কোনো উপহার গ্রহণ করা যেন একই জিনিস। মোড়কে-মোড়া উপহারের মোড়ক খুলবার পর যে কী চিজ বেরুবে ভেতর থেকে, তা একমাত্র খুদাতাল্লাই জানেন। যাই হোক, ওই জুয়া খেলার মদ্দে যায়নি সারেং মিঞা। নিজের জান বাঁচিয়ে ভেগে এইসেচে সাদারণ হয়ে যাওয়া অভিশাপ থেকি, সারাজীবন নিজের মাপের চেয়ে ছোটো হয়ে বেঁচে থাকার গুণাহ থেকি বেঁচে গেচে। নিজের জিন্দগিকে নিজের নিজস্ব কইরে রেখেচে। কলুর বলদ করেনি যে নিজেক; এইটা ভেবেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

কিন্তু সেই মুখটি, নাজনিন-এর সেই মুখটি এখনও মাজে মাজেই তার মনের মদ্দি ভেসে ওঠে, এমন একলা হয়ে-যাওয়া নদীর উপরের রোদ-ঝলমল সকালে বা হঠাৎ ঘুম ভেঙি-যাওয়া অগণ্য তারা-ভরা ঘোর অন্ধকার মাজরাতে। "দিলকি আয়িনেমে হ্যায় তসবির ইয়ার, যব গরদান ঝুঁকায়ি, দেখলি।"

নাজনিন তার বন্ধুই ছিল। আর বন্ধুর ছবি তো হৃদয়ের আয়নাতে থাকেই! যেই ঘাড় একটু ঝুঁকোয়, অমনি সেই ছবি ফুটে ওটে।

"নাজনিন" কথাটার মানে, শুনেচিল সারেং, নাজনিন-এরই কাচে। আহ্লাদি। সেই আহ্লাদির মুখছবিটি জলচবিরই মতো। সেটি আচে সারেং মিঞার স্মৃতিতে। আর কী আশ্চয্যি! এই এরফান ছেলেটার মুখ যেন হুবহু নাজনিন-এরই মুখ।

কবে হারিয়ে গেচে নাজনিন, সারেং মিঞার জীবন থেকি! কখনও তাকে লতুন করে খুঁজতে বেরুবার পেয়োজনও বোধ করেনি। তার জীবন, পুরুষের জীবন, নারী-বিবর্জিত জীবন। পুরুষদের নিয়েই তার সবকিচু। কাম-কাজ, খেলা, খোদা-ভজন সমস্ত কিচুই। কোনো নারীর স্থান লাই তার জীবনে। থাকবেও না কোনোদিনই। আর সেই জন্যিই কিচুদিন হল বড়ো উতলা হয়েচে সারেং এরফানকে দেকে; তার প্রিয় নারীর ইয়াদগার হিসেবে।

কলিমুদ্দি বুড়ো, 'হরচি' আর 'টিপালি' নিয়ে তার নৌকোর "টঙ"-এ পেছন ঠেইক্যে দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে জাল বুইনতেচেল। সে চেল শিবখালের ইকেবারে মুকেই। একটা পশুর গাচের সঙ্গি তার ডিঙি বেঁইধ্যি। সেও যেন কী ভাবতেচেল। এই সোঁদরবনের মতো এমন জায়গাও নাই ভাবাভাবির মতো। চারদিকের পরিবেশ থেকি, জল থেকি, আকাশ থেকি, বিচিত্র গাছগাছালি থেকি, জলের জোয়া-ভাটা থেকি, কালু পাখির হঠাৎ চিৎকার থেকি, হঠাৎ-আসা "পিঠেম" বাতাস থেকি, ভাবনা যেন উট্টে এসি মাতার মদ্দি সেঁদিয়ে যায়। অতীতের ভাবনা, ভবিষ্যতের ভাবনা, সুখ দুঃকের ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা-ব্যর্থতার সব ভাবনা 'হরচি' আর 'টিপালি'র মদ্দি মদ্দি জাল-বোনা সুতোরই মতো যেন জড়াজড়ি কইর্যে আইটকে যায়। তকন বত্তমানকে আর অতীত ভবিষ্যৎ থেকি আলাদা করার কোনো জো-টি থাকে না আর!

দুই বুড়ো একে অইন্যকে দেকতি পেতিচে না। অথচ এরফান আর হোসেন, তার যিখানে মাচ ধইরতিচে, সিকান থেকি ওদের দুজনকেই দেখতি পেতিচে।

বেলা বাড়তিচে। মাচরাঙারা ঘন ঘন ছোঁ দিতিচে জলে। জলে ও ডাঙায় দু জায়গাতিই বেঁচে থাকা স্যালামান্ডার, এই টুকুনটুকুন; জলের তলায়, হোসেনের উরুতে, সুড়সুড়ি দে' পিচলে পাইল্যে যেতিচে। সেই ভাটি দিবে অমনি তারা প্যাচপ্যাচে কাদার উপর এঁকিবেঁকি যাবে। তখন দেকলি, গা-ঘিনঘিন করি ওট্টে।

মাছ বেশ অনেকই হল। নৌকোর সঙ্গে হাঁপর আছে। তাইতে জ্যান্ত মাচ রেইক্যে দেবে। একন ছোটো একটি জালের মুখ বন্দ করি খোঁটার সঙ্গে বেঁধে রেকে দেচে। মাঝে মদ্দি ধড়ফড় কইর্যে উটতিচে রূপোলি-কালচে মেশাল দেওয়া মাচগুলোন। জল নড়ি উটতিচে। রোদ চমকি যেতিচে

চলকি-ওটা জলে। তাপ্পর তিরতির করি কাঁপতিচে দুপাশের ঝুঁইক্যে পড়া গাচগাচালির কাণ্ড, শাখাপেশাখায় আর পাতায় পাতায়।

হঠাৎ এরফান জোরে চেঁইচ্যে উটল, পাড়ে ওটো! পাড়ে ওটো! হে হোসেন! কুমির! কুমির!

কুমির দেখতি পায়নি হোসেন। কিন্তু শিষখালের জলের মদ্দি একটো লম্বা ছায়া দেখতি পেইয়েচেল হটাৎ। তড়াক করি ইক লাপ মেইরি পারে উইটেচে। সঙ্গি সঙ্গি এরফানও। আর পেরায় তারই সঙ্গি সঙ্গি যে-খোঁটার সঙ্গি জলে-ভরা মাচগুলোন বাঁধা চেল সেই খোঁটাটা চটাং শব্দ কইর‍্যে জলে পইড়্যে গেল। আর পরক্ষণেই মাচের জালের সঙ্গি বাঁধা থাকতিই সিটা ভেইস্যে চইলল পাশখালের দিকে। কুমির জাল-সুদ্দু মাচ তার মুখে পুইর‍্যে নে ভেইসি চলল পাশখালের দিকে। বিরাট কুমির। কোন দুঃসাহসে যে সে এই এতটুকুন শিষখালে ঢুইক্যে পইড়েচেল তা কে জানে। সঙ্গে শড়কি বা বন্দুক থাকলি শিক্ষা দেওয়া যেত তারে।

কুমিরটা মাচ, জালের খোঁটাটা পয্যন্ত নে যেতি এরফান আ হোসেন দুজনেই একসঙ্গি হেসি উটল। তাদের হাসি শুনি কলিমুদ্দি মিঞা নৌকোর পাটাতনে উটি দাঁড়ায়ে ওদের দিকে চেইয়ে শুদোল, তোদের হলটা কিরে?

ওরা চেঁচিয়ে বলল, কুমির! কুমির!

কলিমুদ্দি মিঞাও চেঁচিয়ে বলল, বাঘ! বাঘ!

ওরা বলল, বাঘ নয় কুমির। সব মাচ নে গেল।

কলিমুদ্দি ধমকে বলল, বাঘ। বাঘ এই এরফান, তোর ডাইনে, পেচনে বাঘ। জলে ঝাঁইপে পড়ি সাঁতরি আয় দুজনে। তাততাড়ি।

কলিমুদ্দির কতা শেষ হতি না হতি, এরফান আর হোসেন মুক ঘুরায়ে দেকতি না-দেকতি জোয়ারের কাদা-জলে ভেজা লাল-কালো ডোরাকাটা বাঘ উইড়ি এসি এরফানের বাঁ কাঁদে লাফিয়ে পইড়্যে তার কাঁদ আর ঘাড় কামড়ে ধইর‍্যে তাকে নে জঙ্গলের দিকি হাঁটা দেল।

হোসেন স্তব্ধ হয়ে দাঁইড়ে রইল। কলিমুদ্দি মিঞা জোরে হাঁক দিল : ডিঙি খুইল্যে জলদি আসেন সারেং মিঞা। বন্দুকগাচ ধরি আসেন। এরফান ছোঁড়ারে বাঘে নে গেল!

সারেং মিঞার শিষখালের মুকে পৌচোতি পৌচোতি পাঁচ-সাত মিনিট লাগল। ডিঙিটা দৌড়ে গিয়ে বাঁধল হোসেন একটি ক্যাওড়ার ডালে। তাড়াতাড়ি বন্দুকটা বের করি নেল সারেং মিঞা। চারটা টোটা ঠেইসে নিল লুঙির কষিতে।

কলিমুদ্দি মিঞা শড়কি নে এসি দাঁড়াল। বলল, ফিরি যেইয়ে এরফানের মায়েরে কি বইলব চাচা? লাশ পেলিও পেতি পারি। পেরান তো আর ফিরত হবেনি!

হোসেন বলল, আম্মো যাব চাচা।

ওর বাক্যি রোধ হয়ি গেচিল। অচেনা মানুষ হলিও কতা চেল। ই-যে তার নতুন সাঙাত। ভারী হাসি-খুশি জ্যান্ত ছেলে। একটু আগে এরফানই তাকে বাঁইচ্যেচেল কুমিরের হাত থেকে। আর এরফান বাঘটাকে দেখতিও পেল না!

ওরা তিনজন এসি প্রথমে দাঁড়াল, যি জায়গাতি সি জায়গাটাতি বাঘে এরফানকে মাটিতে ফেইলেচেল। সিখান থেকি বাঘের খোঁচ দেকি দেকি লাপ মেইর‍্যে মেইর‍্যে আগে আগে চাইলতে লাগল সারেং চাচা। লাপ মেইর‍্যে মেইরে যেতিচে বটে কিন্তু পায়ি একটুও শব্দ উটতিচি না। ঝোপঝাড়, কাঠকুটো, বাঁইচ্যে বাঁইচ্যে এগুতিচেল সে। আর তার পেচন পেচন শড়কি বাইগ্যে ধরে কলিমুদ্দি মিঞা। আর তার পেচনে খালি হাতে, হোসেন।

এট্টু এগিয়ে যেতেই দেকা গেল, এরফানের লাল-কালো লুঙিখান ছিঁড়েখুঁড়ে ক্যাওড়ার শুলোতে আইটকে আচে। রক্ত-মাখা। আরও একটু পর, হ্যাঁতালের ঝোপের গায়ে সেই বগল-ছেঁড়া নীল শার্ট। তার বুকপকেটে পঁচিশ পয়সার একটি বলপেন গোঁজা। হলুদরঙা। যিকানে

শার্টটা পইড়্যে আচে সিকানে অনেক রক্তও পইড়্যে চেল। নীল শার্টটা লাল রক্তে ভিজে বেগনি দেকাচ্চে। কাঁধের কাচে কালো জমি নাল হইয়ে চেল। যিকানে বাঘ কামড় দেচিল সিখানে মস্ত দুটো ফুটো।

হোসেনের মনে পড়ি গেল এরফানের ইতিহাস। তার বাবাকে বাঘে নেচেল গোনা ব্লকে। তখন তার বয়স পাঁচ। বিধবা মা। দুই বোন। মানে, এক দিদি এক বোন। সংসারের ভার পড়ি গেল তকনই তার ঘাড়ে। দশ বছর বয়স থেকি তাই এই সোঁদরবনে আসচে এরফান। দিদির শাদি সেই দেচে। এ বছরেই ছোটো বোনের শাদি দেবে। শাদির কতা-বাতরাও সব পাকা। সেই থেকিই আসতিচে পেতি বচ্চর। পনেরো বছর কেটি গেচে। প্রতিবারই কলিমুদ্দি মিঞার বহরের সঙ্গিই আসতিচে। এরফান বইলেচেল, তার নিজেরও এক ছোটো ছেলে, এক কন্যে। এত বছর তো নির্বিঘ্নেই ফিরে গেচে। এবারেও তাকে নির্বিঘ্নেই ফিরতি হবে। "ছোটো বুনটা কত আশা নিয়ে বইস্যে থাকবে আমারই মুখ চেয়ি। ফিরতিই হবে। খুব ভালো দুলহা পেইয়েচি। খেত-জমি, সাইকেল; ইক্কেরে বড়োলোকের ঝিং-চ্যাক ব্যাটা। বুনটার কপালটা সত্যিই ভালো।"

মানুষ কী ভাবে, আর খোদায় কী করেন! যা কিছু হয়, সবই তেনারই ইচ্চেতে।

হোসেন সিকানে দাঁড়ায়ে ভাইবতেচেল যে, এরফানের এত বিশ্বাস চেল নিজের উপরে, নিজের ভাইগ্যর উপরে, খোদার উপরে আর সি এরফানই এত কটা বচর নির্বিঘ্নে গেরামে ফিরি যেয়ি শেষমেষ যে বচর তার ফিরে যাওয়াটা সবচেয়ি বেশি জরুরি চেল, সি বচরই বড়োমিঞার খাইদ্য হল!

এরফান একটা ত্রিপদী প্রায়ই আওড়াত। এতবার আওড়াত দিনে রাতে যে, শুনি শুনি মুকস্থ হয়ি গেচিল হোসেনের।

ইটা কী ব্যাপার?

শুদুলে, এরফান বইলতো, ই হচ্চে গে' আমার মন্ত্রপড়া তাবিজ। বুয়েচ। হেকিমে দেচে। মহম্মদপুরের মুরশেদে হেকিম। বইলেচে এই তাবিজ সঙ্গি থাকলি কুনো বিপদ হবেনি।

সত্যি?

হোসেন আশ্চর্য হয়ি জিজ্ঞেস কইরত।

তকন এরফান হাসতি হাসতি বইলত, সত্যি লয় তো কী মিত্যা কতিচি! তারপর বইলত, আসলি, এই ত্রিপদী হতিচে মোহাম্মদ খাত-এর নেকা "বোনবিবি জহুরানামা"তে আচে। সি কিতাব আচে আমার মায়ের কাচে। চেলেবেলা থেকি মার মুকি শুনি শুনি আমার পুরো কিতাবটিই ইকেবারে মুকস্থ হয়ি গেচে।

হোসেন বইলত, বলো, বলো; আরেকবার বলো তো এরফান।

এরফান সুর করে আওড়াত :

"শুনে ভাঙ্গড়ের রাত,
বোন বিবি নেকজাত,
হইয়া যে খোসালিত মন॥
জঙ্গলিকে সাথে লিয়া,
চলেন বিদায় হইয়া,
দখল করিতে বাদাবন।
পহেলা জুড়িতে এসে
আসন করিয়া বৈসে,
করিবারে নামাজ আদায়।।

জঙ্গলি আজান হাঁকে,
যেমন আছমান ডাকে,
রায়মণি শুনিবারে পায়।
আসনে বসিয়া ছিল,
ডরেতে গিরিয়া গেল,
কহে এয়ছা হাঁকে কোন বীর।।
রায় সনাতন বলে,
সেভাবি যাহ না চলে,
জেনে আইস কোন ফকির।
সনাতন দেখে ডরে,
নিকটে যাইতে নারে,
ভেগে আইসে কহে রায়মণিরে॥
এক মন্দ এক মেয়ে,
বৈসে দোহে উর্ধ্ব মুয়ে,
হাত তুলে আল্লা আল্লা করে।
শুনিয়া দক্ষিণ রায়।
আগ হেন জ্বলে যায়
পাত্রমিত্র সবাকে ডাকিয়া॥
কহে মোর ভাটি বনে,
যবন আইল কেনে,
মেরে তারে দেহ তাড়াইয়া॥"

সারেং মিঞার কাছ থেকি হোসেন বনবিবি ও দক্ষিণ রায়ের বিরোদের কতা শুইনেচেল। তাই বুইজেতে পারত সি ঝগড়ারই "ডেসক্রিপ্ট" হতিচে ইটা। ইর সঙ্গি মরণ-বাঁচনের কুনো সম্বন্দই লাই, তাবিজ-পরা তন্ত্র-টন্ত্রও লয় ই, ইটা এরফানের পছন্দ চেল তাই সুর করি, পেরায় গান গাওয়ার মতো করি বারবারই বইলত এই ত্রিপদী।

এই ভাটি বন, সোঁদরবনের আঠারো ভাটিরই ইক ভাটি হবেক।

স্তব্দ, হতবাক হয়ি দাঁড়ায়ি হোসেন আরো কত কী ভাইবতেচেল। বনের ঘড়ি থেইমি গেচিল যেন।

এরফান কত কী যে জানত! কত কী বলত! সব কতা, জ্ঞানগম্যি, হাসিগান সবই ইকসঙ্গি তালগোল পাকায়ি বাঘের মুকির মদ্দি সেঁদিয়ে গেল। এই সবই চেল, এট্টু আগে। আর এই লাই! সকলির জ্ঞানগম্যি, হাসি-গানই এমনি কইরেই উপে যায়, যদি না কেউ তা বইয়ে লিকে রাকে, কবিয়াল বা পালাকারদের মতো, যেমন মোহম্মদ খাত তার জহুরানামাতে নিকেচেন্নেন।

এরফান এই সোঁদরবনের কোতা কোতা সব পেরাচীন দুগগ-টুগগ আচে সি সব তো জাইনত। যেমন, সারেং মিঞাও জানে। মাতলা নদ ও বিদ্যেধরী নদীর "ক্রসিং"এ রাজা পতাপাদিত্য রায় একটি দুগগ বাইনেচেলেন, মাতলা দুগগ। সোঁদরবন ইলাকার মদ্দিও পতাপাদিত্য রাজা নাকি "আড়াইবাঁকি দুগগ", "সাগর দুগগ", ইসব দুগগ বানায়েচেলেন। সি সব কতকাল আগের কতা। এই বনবিবি, দক্ষিণ রায় আর বড়খাঁ গাজির আর শাহ জংলির জঙ্গল আর লোনা জল, সি সব কবেই মইজে গেচে। বনের মতো লাঠিবাজ জমিদার আর সুমুদ্দুর থেকি আসা ফি-বচরের চাইক্লোন আর কেউ লয়। এট্টু ফাঁকা পেইয়েচে তো বাস, নেল জবরদখল কইর্‌ল্যে!

সারেং মিঞা সবসময়ে বলে, এই সোঁদরবনের ইতিহাস কজনে জানে! এই মুহুত্তে আমরা যি ড্যাঙাতে দাঁইড়ে আচি, যি খাল দে ডিঙি বেইয়ে যেতিচে তার নীচোতে যে কোনো হিঁদু রাজা বা মোগল বা পোর্তুগিজের বানানো দুগগের খণ্ডহার লাই, সি কতা জোর করি কে বলতি পারে?

হঠাৎ খুব জোরে জোরে ডাকতে ডাকতে একজোড়া কার্লু পাকি খালের উপর দে কোণাকুণি উইড়্যে চলি গেল। তাদের পাখসাটএর শব্দে এরফানের মিত্যুতে নিস্তব্ধ বন যেন হঠাৎ জেইগি উইটল। গা ছমছম করি উইটল হোসেনের। মনে মনে নিজেই নিজেকে বইলল, লা হে লা, ই বড়ো ভয়ংকর জায়গা বটেক। ই সোঁদরবন!

এবারে বন্দুকটা শরীরের সামনে আড়াআড়ি ধরি লুঙিটা কষে বেঁধে এগুতিচে খুব সাবধানে সারেং মিঞা, বাঘের খোঁচ দেইকি দেইকি ' ওরা পেচন পেচন চইলল রুদ্দশ্বাসে। হোসেন দেকল, বাঘের খোঁচ, সামনে যেয়েই একটি হ্যাঁতাল ঝোপের মদ্দি ঢুইক্যে গ্যাচে।

সারেং মিঞা উবু হয়ে বসি তার ফাঁক দে' দেখার চেষ্টা কইরল। সে উবু হইয়ে বসতিই ওরা দুজনেও উবু হইয়ে বইসল।

হঠাৎই যেন সারেং-এর শরীলটা শক্ত হইয়ে গেল। বন্দুকটা ঘুরায়ে নে সামনে কইরল। তখন হোসেনও দেখতি পেল যে ভয়ংকর এক বাঘ বইস্যি আচে এরফানের রক্ত-মাখা উলঙ্গ শরীরের উপর। বাঘের মুখ, দাঁড়ি-গোঁফ, সব রক্তে মাখা! বাঘের পেটটা এরফানের পেটের উপর। শুয়ে-থাকা, এরফানের মাথাটা আর বাঘের মুকটা তাদেরই দিকে।

বাঘটা যকন ছাইক্লোনের মতো এসি এরফানকে নে গেল, তকন তাকে ভালো কইর‍্যে দেকা পয্যন্ত যায়নি। দেইকল একন। সি বাঘ দেইকি তো হোসেনের পেটের মদ্দি ব্যথা শুরু হইয়ে গেল। গলা শুইক্যে কাট। দুই পায়ে জোর লাই। ছেইড়ে-আসা মায়ের নাম করি গলা ছেইড়্যি কাঁদতি ইচ্ছে করল হোসেনের কিন্তু গলা দে কোনো আওয়াজই বেরুতিচে না।

বাঘের শরীলও তাদের দেকা মাত্রই শক্ত হইয়ে গ্যাচে। তার ল্যাজটা পেছনে ডান্ডার মতো শক্ত হইয়ে উঠতিচে নামতিচে। হ্যাঁতালের ঝোপের মদ্দি হটাৎই সে হোসেনদের বুদ্ধু বাইন্যে এক লাপে সইর‍্যে যেয়ে লুকোতি পারত। কিন্তু তা না করি, সি দুই ভাঁটার মতো স্থির চোকে চেয়ে রইল ওদের দিকে। সারেং মিঞা চোট করবে বলি বন্দুক তুলি ধইরেচে যকন, ঠিক অমনি সময়েই কলিমুদ্দি মিঞার ডান-পা কাদায় হড়কে গেল আর সে গিয়ে হুমড়ি খেইয়ে পড়ল তো পড় সারেং মিঞারই পিঠে। আর সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের চোট হইয়ে গেল। কী হল বোঝার আগেই বাঘ এক লাপে অদৃশ্য হইয়ে গেল ডান দিকে।

আশ্চয্যি!

পিশপিশ করি বলল কলিমুদ্দি মিঞা।

সোঁদরবনের বাঘকে এমন করতি দেখি লাই আগে কক্কনো। সি শালা সোজা লাইপ্যে এইসে আমাদের উপরে পড়ি তিন থাপ্পড়ে তিনজনেরই ধড় থেকে মাথা আলগা কইর‍্যে দিত। কত শিকারিই তো দেকলাম। নাঃ, বাঘ নিশ্চয়ই "ফ্যাকটো" বুইজ্যে গেচে যে, এ যে-সে শিকারি লয়; এ সারেং মিঞা। খোদার খিদমতগার।

চুপ কইর‍্যে থাকো মিঞা।

দাঁইড়ে উঠতে উঠতে সারেং ধমকে বলল কলিমুদ্দিকে তার পরই গলা নাইব্যে ফিশফিশ করল, আমার ঘাড়ে হুমড়ি খেইয়ে পড়বার আর টাইম পেইলে না? কী লোক হে তুমি? মিঞা?

চোট কি হয়েইচে? নেগেচে বাঘের গায়ে?

সারেং মিঞার ধমকের উত্তর না দিয়ে কলিমুদ্দি মিঞা শুদোল।

নাঃ। গুলি অনেকই উপর দিয়ে চইলে গ্যাচে। একন তুমি ফিইরি যাও দিকি! শড়কিটা হোসেনরে দে, তুমি ডিঙিতে ফিইর‍্যে যাও!

কলিমুদ্দি ভয় পেইয়ে গেল ভীষণ, বলল, ফেরার পথি খালি হাতে আমারে যদি বাঘে ধরে! অনেকটা এইস্যে গেচি তো! গভীর বন। সোঁদরবন। তাচাড়া এরফানকে গোর তো দিতি হবেক।

সে যকনকার কথা, তকনই ভাবা যাবেক।

সারেং বলল।

তারপর একটু ভেবি বইলল, তাইলে তুমি এই ক্যাওড়া গাচে উইঠ্যে পড়। উঁচু ডালে উইঠ্যে ভালো জায়গা দেকি বসো যেইয়ে। এরফান-এর লাশ পাহারা দাও। বাঘ এখন আমার মোকাবিলা না কইর‍্যে এই লাশের কাচে আইসবে বলি আমার মনি হতিচে না। এ, যে-সে বাঘ লয়। মনি আচি কি তোমার মিঞা সি বাঘের চেহারা, যে গোবিন্দকে নেচিল? ও, তুমি তো ছিলেই না সি রাতে! তবে, যারা দেইকেচিল তাদের মুখে যা শুইনেছিলম তাতে মনি হতিচে যে, এ বাঘ, সি বাঘই!

আর শোনো মিঞা, বাঘ যদি ইকানে আসে তবে আমার নাম ধইর‍্যে জোরে হাঁক দিবে। যাতে আমি বুইজতে পাই।

বলেই বলল, যাও, শিগগির উইঠ্যে পড়ো গাচে। আর দেরি কোরোনি।

কলিমুদ্দি গাচে উইঠ্যে গেলে সারেং মিঞা বলল, চল হোসেন আমরা এগুই।

হোসেনের হাত-পা থরথর করি কাঁপতিচেল! হাত থেকে শড়কি পইড়্যে যায়-যায়। সারেং মিঞা ওকে দেকি বাঁ হাত দিয়ে চটাস করি এক চড় বইস্যে দিল হোসেনের ডান গালে।

হোসেন প্রায় চিৎকার করি কেঁইদে উইটতেচেল।

সারেং মিঞা বলল, ডরপোক। বেহুদা! তুই না আদম। তুই না খোদার হাতের তৈরি সবসে বড়িয়া জান। তুই না ইনসান! একটা জানোয়ার, যার খোদা বলে ডাইকবার কেউ লাই, যে খাওয়া আর ঘুমুনো আর বছরে একবার জোড়-লাগা ছাড়া আর কিছু জানে না, তুই আদম হয়ি তারে ভয় পাবি?

বলেই, মাইরল আরেক থাপ্পড়।

হোসেন বুক শক্ত করি এগোল সারেং মিঞার পেচুপেচু।

একটা জোয়ারি পাখি শিষখাল-এর অন্য পার থেকি ডেইকি উটল হঠাৎ, পুত - পুত - পুত - পুত-পুত।

তারপরই বাঁদর ডাকতি লাগল পশ্চিমদিকের সুন্দরী আর সাদবানি গাচেদের জঙ্গল থেকি। আসলে তারা চেল ক্যাওড়া গাচের ওপরে। কিন্তু সে গাচগুলোর সামনে বড়ো বড়ো সুন্দরী গাচ থাকাতে ভালো ঠাহর হতিচিল না।

সারেং মিঞা এক মুহূর্ত দাঁইড়ে পড়্যে সে দিকে চেয়ি কী ভাবল এটটু। তাপ্পর উত্তর দিকে এগিয়ে গেল কিচুটা। বাঘের খোঁচ-এর হদিস না কইরেই।

ব্যাপারটা বুজল না হোসেন। বাঘকে কবজি করতি হলি তো বাঘের খোঁচ দেইকেই এগুতি হবে! তা না, বাঘের খোঁচ ছেড়ি উত্তর দিকি হাঁটা দিল কেন চাচা!

বড়ো ভয় করতি লাগল হোসেনের। যদিও তখনও ডান গালটো জ্বইলতেচেল চড়ের দাপটে।

এরফান তাকে শিখিয়ে দেচিল একটা মন্ত্র কাল রাতেই। সেই মন্ত্রটা মনে মনে আওড়াবে একবার ঠিক করল।

সারেং মিঞা একটা মস্ত ক্যাওড়ার গুঁড়িতে পিঠ দিয়ে দাঁইড়ে বইলল, ভালো করি আমার পেচনে নজর চালা! আমি একটা বিড়ি খেইয়ে লি।

হোসেনের রাগ হইয়ে গেল। নগ্ন, রক্তাক্ত, অর্ধভুক্ত এরফান-এর মুর্দা পড়ে আচে হ্যাঁতাল ঝোপের নীচে, আর সারেং মিঞার একন বিড়ি খাবার সময় হল!

জম্পেশ করে বিড়িটা ধইর‍্যে নিজের ফতুয়ার পকিটে দিশলাইটো রেইক্যে দে সারেং বলল, তাড়াহুড়ো করলি সুন্দরবনের বাঘের পেটিই যেতি হবে। আজ যখন বন্দুক হাতে নে বহু বচর এই

মাল-এ উইটে এসিচি তকন হয় বাঘ মইরবে, নয় আমি! আধা-খ্যাঁচড়া কাজ করা আমার পচন্দ লয়!

বলে, বিড়িতে সুখটান দিতে লাগল।

বিড়িটা খাওয়া হইয়ে গেলি, এবার আবার পুব-মুখো এগুতি লাগল সারেং মিঞা। হোসেনের মনি হল, এ যাত্রা তার বাঁচার আর কোনো সম্ভাবনাই লাই। সারেং মিঞার হাবভাব পুরোপুরি মাতালের মতো। বাঘ কোনদিকে গেল, তার খোঁচ কোতা পইড়ল সেদিকে খ্যাল নাই, নিজের খ্যালে সে পশ্চিম, উত্তর, পুব যে দিকে খুশি পা চালাতিচে।

এবারে হোসেন, এরফানেরই কাছ ঠেঙ্গে শেখা সেই মন্ত্রটি মনি মনি বইলতে লাগল—

"বনদেবী মা! তুমার ভরসায় এইলাম মাগো,
যেন বাঘে ছোঁয় না, জঙ্গল দেবী মা।
তুমার কোইল্যে বইলাম মাগো,
যেন কালে কাটে না।"

এই মন্ত্র কার কাচ থেকি এরফান শিকেচেল তা ও জানে না। এ মন্ত্রে কাজই যদি হবে তবে এরফান নিজেই বাঘের পেইটে যাবে কেন? তবু শড়কি ধরি হোসেন মনে মনে এই মন্ত্র জপ করে, আর সারেং মিঞার পেচন পেচন চইলতে থাকে। একটু পরই সারেং মিঞা খোঁচ খুঁজি পেল। বড়ো বড়ো পা ফেইলি বাঘ হেঁইটে গেচে। সারেং মিঞা বাঘেরই মতো বাঘের খোঁচ দেকি দেকি এঁইকেবেঁইকে নানা গাচগাচালির ছায়ায় ছায়ায় ঝোপঝাড়ের এপাশ-ওপাশ দে সাবধানে চইলতে লাগল।

এই বনের ভেতরটা ভারী পরিষ্কার। ইকানে জোয়ারের জল বেশির ভাগ জায়গাতেই পৌচোয় বলি মনি হয়। ঢেউ যেন সবে ঝাঁট দে পরিষ্কার কইরে রেক্কে গেচে জঙ্গল। ছবির মতো চারধার।

হঠাৎ নাকে পেচণ্ড দুর্গন্ধি এল হোসেনের। নিশ্চয় বাঘের গায়ের গন্ধ। থমকি দাঁড়াল ও। কিন্তু সারেং মিঞার নাক কি বন্ধ? চাচার নাকে কি সে গন্ধ পৌচোয়নি? হোসেন দু কদম এইগ্যে যেয়ে চাচার পিঠে বাঁ হাতের আঙুল ছোঁয়াল।

চাচা চমকি উইট্যে পেছনে তাকাতেই নিজের নাকে হাত দে তাকে বোজাল গন্ধের কতা, হোসেন।

সারেং মিঞা বিরক্তির চোকে সামনের একটি বড়ো গাচের দিকে আঙুল তুলি দেকাল। হোসেন অবাক হয়ি দেকল, গাচটাতে বোধহয় কয়েক শো বাদুড় মাথানীচে পা-উপরে কইর্যে ঝুইল্যে আচে। বাদুড়েরই দুগন্ধকে বাঘের গায়ের গন্ধ ঠাউরেচেল ও। ওদের নিজেদের গেরামে বাদুড় যে লাই তা লয়, তবে একসঙ্গি এত বাদুড়! ভাবা পয্যন্ত যায় না। লজ্জা পেইয়ে গেল হোসেন।

চলেচে তো চলেচেই! বনের মদ্দি খোঁচ দেইক্যে দেইক্যে যেতি যেতি দুপুর হইয়ে গেল। মাতার উপরে সুর্য। গাচপালার ঠিক নীচে নীচে ছায়া। ছায়ারা তকন সবচে ছোটো। এতবড়ো বন কিন্তু সি তুলনায় পাকি নেই বললিই চলে। দিন-দুপুরেই শ্মশানের মতো নিজ্জন। নদী বা খাল কাছে থাকলি কেবল তারই শব্দ পাওয়া যায়। এই দুকুর বেলা মনে হতিচে চারদিকই একরকম। ক্যাওড়া, গরান, গেঁয়ো, হ্যাঁতাল, মাঝে-মদ্দি টক-সুন্দরী; পশুর। সামনে বা পাশে তাকালি মনি হয় এই মাত্র যিকান দে পেইর্যে এল, সি-জায়গাই ফকির পিরের মন্ত্রবলে সামনে এইগ্যে এসিচে। দু পাশে তাকালিও তাই মনি হয়।

হটাৎ সামনে দেকল ভারী সুন্দর একদল হরিণ। দলে প্রায় পঁচিশ-তিরিশটি চেল। হঠাৎ নাক উঁচিয়ে হোসেনদের গন্ধ পাওয়ামাত্র কী জোরে যে ছুট্টে গেল তারা, তা বলবার লয়।

মন বইলল, যেন মায়াহরিণী!

সারেং মিঞা বইলতেচেল, সমুদ্রর কাচে একটি দ্বীপ আচে তার নাম মায়া দ্বীপ। কে জানে! কক্‌নো তারে নে যাবে কিনা চাচা সিখানে! আরও কত বড়ো নদী, দ্বীপ। ভাঙ্গাদুনি দ্বীপ, ড্যালহাউসি দ্বীপ, বুলচেরী দ্বীপ। কত যে নদী! রায়মঙ্গল, হেড়োভাঙা, গোসাবা, ভাঙাদুনি, মাতলা, ঠাকুরানি। কিন্তুক আজকে বাঘের হাত থেকি যদি বাঁচে তবেই না সিসব দেকা হবে! এ জন্মে কি আর হবে? কে জানে! বারেবারেই শুধু এরফান-এর ফরসা, ল্যাংটো, সুন্দর কিন্তু রক্তমাখা শরীরটার ছবি চোখের উপরি ভেসে উইটতেচেল।

এদিকে খোঁচ দেইকে দেইকে যেতি যেতি সারেং চাচা একটা খালের মুখে এইসি দাঁড়াল।

হোসেন ফিশফিশ করে শুদোল, বাঘে কি জল খেইয়েচে ইকানে?

সারেং বলল, বড়োমিঞায় খাল পেইরে ও-পারের জঙ্গলে চলি গেচে।

কথাটি বইলেই, কী মনে কইর‍্যে সারেং খালের এ পারেই কিছুটা চলল ডানদিকে। পারে পারে। এই খালটি গিয়ে এই দ্বীপেরই অন্য প্রান্তে পইড়েচে। ডানদিকে শেষ অব্দি গিয়ে আবার খোঁচ যিখানে, সিখানে ফিইর‍্যে এল।

একটু ভাবল, কী যেন।

খালটা তিরিশ হাত মতো চওড়া হবে। সারেং বলল, চল, খাল পেরোতি হবে। লুঙি-গেঞ্জি খুইল্যে ফ্যাল। সারেং মিঞা লুঙি খোলার উপক্রম করতেচেল এমন সময়ে কী ভেইব্যে খালের বাঁ পাশে চলতি লাগল খাল-পার ধরি। জোয়ার শেষ হইয়ে গে তখন ভাটি দিতি আরম্ভ কইরেচে। ভাটাও শেষ হইয়ে গে জোয়ার শুরু হবে দু এক ঘণ্টার মদ্দি।

চইলতে চইলতে হঠাৎই সারেং মিঞা দাইড়ে পড়ি বলল, দ্যাক হোসেন, কত বড়ো ধূর্ত বাঘ। শালা, দোজখ-এর জানোয়ার!

বইলতে বইলতেই ঘুইরে দাঁড়াল পারের দিকে। বাঘটা সারেং মিঞাকে বোকা বানানোর জইন্যে ডানদিকে নেমি খাল পার হয়ি যেয়ে আবার বাঁদিকে যেয়ে খাল পার হইয়ে এই জঙ্গলে এইসেই ঢুকিচে।

সারেং মিঞা বলল, চল চল। খোঁচ দেইকি দেইকি এগুতেই দেখা গেল, বাঘ পশ্চিমে ঘুরে যে শিষখালে এরফানকে ধইরেচেল সেই শিষখালেরই দিকে গেচে।

সারেং মিঞার কপালে চিন্তার রেখা দেকা দিল। নিজের মনিই বলল, কলিমুদ্দি মিঞা আমাদের দেরি দেইকি গাচ থেকি নেমি যদি হাঁটাও দে থাকে তবে ডিঙিটা নদীর মাজকানে রেইক্যে থাকলি হয়।

হোসেন ভাবল, রাখলিই বা কি? শুধু বইঠা দিয়ে বাঘের সঙ্গে কী লড়াই করবে। বন্দুক থাকলি অন্য কথা চেল। সোঁদরবনের বাঘ যদি মনস্থ করে কাউকে নেবে তবে তার পক্ষে বাঁচা ইকেবারেই অসম্ভব। যতই বাপ-মা, বনবিবি, বড়খাঁ গাজির নাম কইর‍্যে সি কেইন্দে ভাসাক না কেন! তার উপর সি একা যদি থাকে তবে তো সোনায় সোহাগা। নিশ্চিত নখ-দাঁতের মৃত্যু যখন সামনি এসি দাঁড়ায়, তকন দৌড়ে পাইল্যে, নৌকো মাজ-নদীতে রেকে, বইঠা দিয়ে আপ্রাণ বাড়ি মেরে, নৌকো ঠেঙে জলে পইড়্যে কুমির-কামট-এর ভয় অগ্রাহ্যি করে আপ্রাণ সাঁতরিয়ে গেলিও যমের হাত থেকি রক্ষা লাই। মানুষ যে কত অসহায় এই সোঁদররনে, তা ইকানে না এলি, না থাকলি; কারো পক্কেই বোজা সম্ভব লয়। সত্যিই সম্ভব লয়।

সোঁদরবনে যদি কেউ দৌড়োয় তবে বাঘ তাকে ধইরবেই ধইরবে। তার বাঁচন লাই। তাই সারেং মিঞা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খোঁচ দেইকি চলতে লাগল। তবে সুবিধে এইটুকুই যে, এই বনের মাটিতে টাটকা খোঁচ খুঁইজে পেতি কোনোই মুশকিলই লাই। তেমনই আবার জোয়ারে, সব চিহ্নই ধুইয়ে নে যায়। জোয়ার এসি গেইলেই পুরোলো স্লেট ইকেবারে সাফ-সুফ।

সারেং মিঞা তাড়াতাড়ি চললিও ডাইনে-বাঁয়ে সমানে নজর রাখতেচিল। বাঘ বলি কতা! সোজা গেচে বলিই যে সোজাই গেচে, তার পেত্যয় কি? যকন-তকন দিক পরিবর্তন কইর‍্যে পাশ থেকিও আক্রমণ করতি পারে।

যে-খাল পেইর‍্যে গিয়ে বাঘ আবার ফিরে এচিল সেই খাল-পাড়ে পৌঁচোবার আগে অনেকই ঘুরে ঘুরে এবং খুবই আস্তে আস্তে বাঘকে অনুসরণ কইরেচেল ওরা। কিন্তু খালপার থেকি বাঘ প্রায় কোনাকুনি সোজা শিষখাল-এর দিকে এইগেচে বলি একন তার পেচু করতি সময় বেশি লাগলনি। যখন হোসেনরা শিষখালের কাচে প্রায় পৌঁচে গেচে ঠিক তকনই গতি ইকেবারে কইম্যে দেল সারেং মিঞা। বন্দুক ইকেবারে তৈরি কইর‍্যে নে চলল। হোসেনকে ইশারায় শড়কি তৈরি রাখতি বলল।

যিকানে কলিমুদ্দিকে ওরা গাচে চইড়ে দে গেচিল সিকানে যেয়ি দেকল, মিঞা লাই। মিঞা যে লাফ দে' নেমে শিষখালের দিকে গেছে তার চিন্নও পরিষ্কার রইয়েচে কাদাতে।

ঠিক এমন সময়ি হটাৎ একটা আওয়াজ এল শিষখাল থেকি। মনি হল, কে যেন বইঠা দিয়ে নৌকোর খোলে জোরে মাইরল।

সারেং মিঞা কী বুজল কি জানে? হোসেন কিছুই বুইজলো না। সারেং মিঞা খালের পানে দৌড় লাগাল সুন্দরবনের সব নিয়ম কাদায় ছুঁইড়্যে দে। চাচার পাচু পাচু খালপারে পৌঁচে হোসেন দ্যাকে যে, কলিমুদ্দি মিঞা তার ডিঙির মদ্দি আধ-শোয়া হইয়ে বইস্যে আচে। চোকের দৃষ্টি ফেলে। মুকে বাক্যি লাই। যেন বোবা হইয়ে গিচে।

কলিমুদ্দি! ও মিঞা! বাঘ কোনদিক পানে গেল?

কলিমুদ্দি প্রথমে শুনতেই পেল না।

হোসেন ডাকল, চাচা, এরফান কই?

এরফান-এর কথাতে যেন কলিমুদ্দির সম্বিৎ ফিরে এইল। আঙুল দে দেকাল শিষখালের ওই পারে।

হোসেন চেইয়ে দেইকল জল হাঁচোড়-পাঁচোড় কইর‍্যে ওই পারে বাঘ সম্ভবত এরফানকে মুকে ধরি বনে উট্যে গেচে। এই সবে গেচে। হয়তো সারেং মিঞাদের আসার শব্দ শুইন্যেই তার খাবার মুকে ধরি ওই পারে যাওয়া মনস্থ কইরেচেল।

ডিঙ্গি নে এইসো মিঞা। ডিঙি নে এইসো।

সারেং মিঞা চেঁচিয়ে বইলল।

কলিমুদ্দি মিঞা ঘোর ভেঙে, দু হাতে পইটা বেইয়ে ডিঙি ভেড়াল পারে। তারপর খপাখপ করি পইটা ফেইলি ও-পারে পৌঁচে দেল ওদের। তারপর বলল, আমারে একা রেইক্যে যেওনি সারেং সায়েব। বাঘটা খাল পার হবার আগে এরফানকে নাইম্যে রেকে, আমার দিকে আইসবার জন্যি জলে নেইম্যে এসিচেল। কী ভেবি, মন পরিবর্তন কইর‍্যে আবার এরফানকে মুখে তুইল্যে নে খাল পেইর‍্যে গেল।

কতা কোয়ো না কোনো।

বিরক্ত মুখে সারেং মিঞা বললে।

এরফানকে ধইরেচে সেই সকালবেলা। ঘড়ি তো নেই ইকানে কারোই, এক সারেং চাচার ছাড়া। তখন রোদের বেলা সাতটা আটটা হবে। আর একন কম কইর‍্যে বেলা তিনটে বাইজতেচে। অথচ খিদে তিষ্টা বলতি কিচুই লাই। কী কইর‍্যে যে এতগুলোন ঘণ্টা পেইর‍্যে গেল তা বুইজতে পয্যন্ত পারলনি। ওরা। সারেং মিঞা হোসেন আর কলিমুদ্দি দুজনকেই এ পাশের এক মস্ত ক্যাওড়া গাচে উটতে বলল, ইসারাতে। হোসেন আপত্তি কইরেচেল। সারেং মাথা নাড়ল দু দিকে। শড়কি-খান গাচের গায়ি হেলান দে রেইক্যে উটে পইড়ল গাচে। হোসেন অনেক উপরে উটে একটা খোঁড়ল

পেল। তার মদ্দি বইসতে যাবে অমনি ফস শব্দ করি ফণা ধইরল কালকেউটে। কিচুই করার লাই। স্টেচু হইয়্যে গেল হোসেন। সাপটা পাখির ডিম খাবার জন্যি খোঁড়লে ঢুইকেচেল। যাই হোক, বরাত ভালো যে, সে অন্যদিক দিয়ে সড়সড়িয়ে নেমি গেল এবং না কিছু বলল কলিমুদ্দিকে; না সারেং মিঞাকে।

কে জানে! হয়তো বনবিবির সাপ!

হোসেনরা ঠিকমতো গাছে উইটেচে দেইক্যে নে সারেং মিঞা বাঘের খোঁচ দেকি এগুল।

খোঁড়লে বসা হল না হোসেনের। তার পাশে একটা দোডালা দেইকে নে বসল। সাবধানে, আস্তে, খুউব আস্তে; মাতা এপাশ থেকে ওপাশ ঘোরাতি নাগল হোসেন। এতক্কন সারেং মিঞাকে দেইক্যে শিখে নেচে সে।

ঘাড়টা পুরোটা ঘুরানো হয়নি ঠিক সেই সময়ে তার পায়ের তলায় কী যেন চেয়ে দেকে, কলিমুদ্দি মিঞা চিমটি কাইটতিচে তার পায়ে। হোসেন নিচোয় চাইলেই আঙুল দে' মগরীব-এর দিকে দেকাল মিঞা। চেয়ে দেকে সব্বোনাশ। বাঘটো যেখানে বসি এরফানকে খেতিচে, সিটা উঁচু ট্যাকমতো জায়গা, (কেউ বলে ট্যাঁক, কেউ বলে মাল) ঠিক সেদিক পানেই চলতিচে সারেং মিঞা। বাঘ একনো তাকে দেইকতি পায়নি, শুনতেও পায়নি; বোদয় খুবই খিদে নেইগে থাকবে তার। কিন্তু কতাটা হতিচে, সারেং মিঞা কি বাঘকে দেইকেচে?

হঠাৎ বাঘ ঘুইরে দাঁড়াল। জায়গাটা বেশ পরিষ্কার। বৈশাখের বিকেলের রোদ এইসে পইড়েচে পুরো ট্যাকটাতে। আলো আর ছায়াতে পুরো ট্যাকটোকেই মনে হতিচে একটো ডোরাকাটা বাঘ। কালো কাদা আচে ট্যাকের নিচে, যেখান অবধি জোয়ারের জল পৌচোয়, সেই কালো জায়গাগুলোনকে মনে হতিচে বড়ো বাঘের গায়ের কাদার দাগ।

বাঘটা ঘুইর্যে দাঁইড়ে জোরে একবার হুংকারও দিল। সে যে কী বাদ্যি কী বইলবে হোসেন। দু বর্গমাইল এলাকায় যত পাকি চেল, এত পাকি যে চেল তা বোঝা পয্যন্ত যায়নি আদৌ; সব হঠাৎ একসঙ্গি ডেইক্যি উটলো। হরিণ ডাকল টাঁউ টাঁউ কইর্যে। বাঁদর চেল উলটোপাশের জঙ্গলে, খালের পাশে। তারাও সব একসঙ্গি কিচিমিচির কইর্যে উটল। ডাক শুইন্যে হোসেনের হাত পা ছেইড়্যে যাওয়ার জোগাড় হচ্চিল। হয়তো সত্যি-সত্যি পইড়েই যেত গাচ থেকি। যদি না কলিমুদ্দি মিঞা তার পায়ের পাতা জোরসে ধইর্যে না থাকত।

বাঘের হুংকারের সঙ্গে সঙ্গে অত দূর থেকিও সারেং মিঞার হুংকারও ভেইস্যে এল। চোপ শালা! আমি বড়খাঁ গাজি। বনবিবির ব্যাটা আমি। আমি তোর যম। বড়ো খাঁই তোর! নে, শালা খা!

বইলেই, বাঘের দিকে আরো দু'পা এইগ্যে যেয়ে বন্দুক সোজা কইর্যে ধরে দিল চোট কইর্যে। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন বড়খাঁ গাজির থাপ্পড় খেইয়েই অতবড়ো বাঘটা মুখ হাঁ করে ভুঁয়ে পইড়ে গেল। তাপ্পর ইক্কেরে কাট। নড়ে না, চড়ে না! যেন কতকালের মড়া!

সারেং মিঞা একটা শুকনো মাটির ঢ্যালা তুইল্যে নে ছুঁইড়্যে দেল বাঘের দিকে। বাঘ তবুও নট নড়ন-চড়ন নট কিচ্চু।

সেই না দেকি কলিমুদ্দি আর হোসেন ও পড়ি কী মরি কইর্যে ক্যাওড়ার ডাল থেইকি নেইমে নিজেদের জান খাতরা কইর্যে, শুলো বাঁচায়ে, কাঁকড়া বাঁচায়ে, সাপ-খোপ বাঁচায়ে উইড়ে পৌচে গেল অকুস্তলে। গিয়ে, সারেং মিঞাকে জড়িয়ে ধইরল দুজনেই। আনন্দে লাপাতে লাগল।

সারেং বইলল, ছাড়, ছাড়।

তবু ওরা ছাড়ে না।

তখন সারেং ওদের ধমক দে বলল, বাঘটা মরেচে কিনা ভালো করে দেখতি দে। অনেক সময়ে মটকা মেইর্যে থাকে। কেঁদো তো থাকেই।

হোসেন হাসতে হাসতেই বলল, বলো কি চাচা? মটকা মেইর‍্যে থাকে?

তাইলি আর বইলতেচি কি? আরো ঢ্যালা দে মার।

বলেই নিজে বন্দুক ঘুরিয়ে আবার ওই দিকে মুখ কইরে দাঁড়াল।

হোসেন বলল, অত সন্দেহে কী দরকার! দাও না ঠুইক্যে আরেকখানা চোট।

কলিমুদ্দিও বলল, হ্যাঁ। তাই ভালো। সব সন্দেহের নিরসন হইয়ে যাক।

সারেং বলল, এক একটি চোট, এক একটি বাঘ। এসব রেঞ্জার সায়েবের গুলি। তাই তো এমন মার! তাছাড়া মাচ খেতি খেতি অথবা না খেতি পেইয়ে মুখে যকন চড়া পইড়বে তোদের, তকন হরিণও খেতি পারবি একটা দুটো।

সি ভালো। সি কতা খুবই ভালো। আমি জীবনে হরিণ খাইনি চাচা।

সারেং বলল, জীবনে তো অনেক কিচুই করোনি বাজান। অনেক কিচুই করতে হবেক এখনও। কিন্তুক এরফানটা যে পইড়্যে রইল ওই কূলতলিতে তার জন্যে তোদের কুনো দুঃক লাই? তোরা বাঘ মারার আনন্দে আটখান হইয়ে লাপাতিচিস!

ই কতাটা বলার সঙ্গি সঙ্গিই এক গভীর নিস্তব্ধতা নেইম্যে এল সিকানে। মৃত বাঘ, মৃত এরফান আর মানুষের মৃত বিবেক পাশাপাশি শুয়ি রইল সেই ফুলতলির কাদার উপরে।

কিচুক্ষণ মাতা নীচু করি রইল ওরা তিনজনেই।

সারেং বলল, আজ বাঘ ইকানেই পড়ি থাক। কাল ভোর ভোর আমি নে গেইল্যই হবে সকলি মিল্যে।

শুকুন পইড়্যে যাবে না?

না। উপর থিকে কি যাচ্ছে দেকা বাঘকে?

আমরা তো গাচে বসি দেকতে পেইচিলাম।

তোরা পাশ থেকে দেইকেচিস। শুকুন ওড়ে সোজা উপরে। তা ছাড়া সুন্দরবনে শুকুন নাই বলতে গেলি। আবাদ যিখানি হয়, সিখানি আচে অনেক। ইদিকে খুবই কম।

ইটা কি সেই বাঘ যে গোবিন্দকে নেচিল?

মনি তো হয়। যারা একে আগেও দেইকেচে তাদের দেকালিই তারা চিনতে পাইরবে।

তাপ্পর ওরা এরফানের রক্তাক্ত মৃতদেহ তিনজনে বয়ে নিয়ে চলল শিষখালের দিকে। বিকেল হইয়্যে গেচে। ওদের বহরের অন্য নৌকোরা সব এ পথিই ফিরবে। সারেং আর কলিমুদ্দির শূন্য নৌকো দেইক্যে ওরা এমনিতেই থেইম্যি পড়ি তত্ত্বতালাশ কইরবে।

ছায়ারা দীর্ঘ হল। বনের মদ্দি কেমন একটা ছমছমে ভাব। এখন সূর্য পশ্চিমে ঘুরেছে। অন্য পাড়ে একটি জায়গাতে কেবলই ক্যাওড়ার গাচ। জোয়ার পেরায় পুরো হয়। জল ভেইঙে ভেইঙে আন্দাজি যেতি হচ্চে ওদের। ওদের সঙ্গীরা কেউ পৌছে না এসি থাকলি সাঁতরে যেতি হবেক এরফানকে সঙ্গে নে।

কলিমুদ্দি বইলল, এক কাজ করি সারেং সাহেব। তোমরা ইকানেই থাকো। আমি গিয়ে দেকি, কেউ এল কি না।

এলে কি হবে?

এলে ওদের বলব ডিঙি নে যতখানি পারে এইগ্যে এসি আমাদের নে যাবে। জোয়ারের জলে জলে যতখানি ভেতরে আসা যায়, আসতি ক্ষেতি কি?

তারপর?

তাপ্পর মানে?

এরফানকে কি নদীতেই গোর দেওয়া হবেক? না হলে? সিটা স্থির করো। আর মাটিতে দেতি হলে তো পরের ভাটার অব্দি অপেক্ষা করতি হবে। নইলে এখুনি দেতি হয় ওই ট্যাকে, যিখানি

জোয়ারের জল পৌঁচোয় না। কিন্তু সিখানি মাটি তো অত নরম লয়। কবর খুঁইড়বে কি দে? গরমের দিন। লাশ পইচে যাবে যে!

কলিমুদ্দি বলল, অনেক সময়ে আমরা তো জলেই গোর দি। জলের বিবিবাবারাও খুশি হন তাতে, কামট কুমিরেরও পেট ভরে। এই লাশ নে-যাওয়া যায় না গেরামে। তাইলে তা নিয়ে আর কীই-বা করা যায়। অধিকাংশ সময়ে তো লাশ কেন লাশের কোনো অংশই পাওয়া যায় না। বাঘের মুখ থেকি কে আনবে ছিনিয়ে তা নিজের জান কবুল করে?

সারেং মিঞা বইলল, তোমরা গাচে ওঠো। আমি দেইকি আসতিচি।

আবার গাচে কেন? বাঘ তো মুখ হাঁ করে বড়খাঁ গাজির নাম করতিচে। মালা নে ছিনিমিনি খেলতিচে।

বাঘ কি এই জঙ্গলে ওই একটোই? কোনো গ্যারান্টি আচে যে আরও বাঘ নাই, বা গুলি শব্দে খাল পার হইয়ে এপাশ-ওপাশের ব্লক থেকি চইলে আইসবে না। আসি এরফানকে তুইল্যে নে যাতি পারে। তুমাদেরকে লিবার চেষ্টাও কইরতে পারে। যা বলি তাই করো। উইট্যে পড়ো গাচে।

সারেং চলে গেল। সটান, ঋজু চেহারা তার, দাড়িটা যেন আসমানের সঙ্গি কতা কয়। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে, অথচ বাঘের মতো লয় সেই জ্বলজ্বলানি। মনি হয়, এক জোড়া সইন্ধেতারা। ঠান্ডা, স্নিগ্ধ। কিন্তুক সাপের চোখের মতো ঠান্ডা লয়। ই চোখ শান্তি দেয়, ভয় দেকায় না।

সারেং মিঞা জঙ্গলের মদ্দি অদৃশ্য হতি-না-হতি কোতা থেকি যেন একটি মস্ত শিঙ্গাল হরিণ দৌড়োতি দৌড়োতি এইস্যে ট্যাকের উপরে দাঁইড়ে পড়ল। তারপর ছবির মতো স্থির হয়ে দাঁইড়্যে রইল। পশ্চিমের বিদায়ী সূর্য এসি তার গায়ে পইড়েচে। হলুদের উপর কালো বুটিগুলো ঝলমল কইরতিচে! যেন বসরাই গালচে কোনো, কোনো আলিজার মনপসন্দ কারিগর বহু যত্ন করি বহুদিন ধইরে বাইনেচে ফরমাশ পেয়ে। তার চারধারে ক্যাওড়ার শুলো। শুলোগুলোর ছায়ারাও এখন লম্বা হয়ে শুইয়ে পড়িচে। চারধারে ছায়া-আলো, আলো-ছায়া; সাদা-কালো, কালো-সাদা। তার মদ্দিখানে সেই শিঙ্গাল দাঁইড়্যে আচে, মাতার উপরে শিঙের ডালপালা ছইড়্যে দে। হোসেনের মনি হল, বাঘেরই মতো এও খুদাহর আরেক কেরামতি। আরেক কুদরতি। ভাবতে ভাবতেই নীলমণি সারেং-এর খাদ্য-খাদকের কতা মনে পইড়্যে গেল।

পরক্ষণেই মনে পইড়ল এরফানের কতাও। শুয়ে আচে এরফান। বিধবা মায়ের একমাত্র পুইত্র। সংসারে রুজির মালিক। তার ছোটো বুন তার ফেরার পথ চেয়ি বইস্যে আচে। কত স্বপ্ন তার। তার মিঞার খেত, জমি, সাইকেল, দু-বেলা ভরপেট খেতি পাওয়ার নিশ্চিন্তির স্বপ্ন। সে কী যে-সি স্বপ্ন!

এই সুন্দরবনে না এলি হোসেন কিচুতেই এই সব দুঃখকষ্টের কথা জানতিও পেত না। অন্যের দুঃকের কতা জানলি পর নিজের দুঃকটা যে দুঃক লয়, যাকে নিজের দুঃক বলি জানে তাই যে অন্যর চোকে কতবড়ো সুক, ই-কতা ভোরের আলোর মতো পোস্কার হইয়ে যায়। কোনো সন্দ-ধন্দ থাকে না আর মনি। সারেং মিঞা ঠিকই বলে। মানুষ তার সব দুঃক নিজেই যেচি-সেধি আনে। নিজের পেয়োজন কমায়ে ফেলার মতো সুক আর কিছুই লাই। যার বেশি কিচু পেয়োজন লাই তার দুঃকও লাই। যার লোভ লাই তারও দুঃক লাই। এরফানরা যেভাবে বেঁচে থাইকে তাপপরও যদি সবসময় হাসতি পারে, রসিকতা কইরতে পারে তবে আরও সুখের পেয়োজনটাই বা কি?

কিন্তু এই অল্প সুখের জীবনও বড়খাঁ গাজি ছিনিয়ে নিলেন!

একটু পরেই মানুষের গলা শোনা গেল। কলিমুদ্দির বহর ফিইরচে। উত্তেজিত গলাতে কতাবার্তা বইলচে ওরা। বহুদূর থেইকিও চেনা মানুষের গলা চিনতি পাতিচে কলিমুদ্দি। এটা সুলেমান, ইটা যতীন, ই শালা হারুণ, পাঁচটো শব্দর মদ্দি তিনটে করি শালা না বললি ও ভাত হজম হয় না। ওই দ্যাকো নাসিরুদ্দিনের গলা, পেট-পাতলা লোক। পেইটে যে কতা রাইকতে পারে না

তাই লয়, রোজ আবার পাতলা হাগে। জলের উপরে উপরে কথা পাতাসী ব্যাঙের মতো লাইপে লাইপে আসতিচে।

হোসেন ভাবতেচেল, এই যে হটাৎ-খুশি কলিমুদ্দি মিঞা এরও কোনো গভীর দুঃকু আচে। দুঃকুটা হল গিয়ে এই যে, সি এরফান-এর মৃত্যুটা মেইনে নিতে পারতিচে না। আবার সুকও আচে। সুকটা এই যে, বাঘের হাতে তার নিজের পরানডা যায়নি। আসলে, সব মানুষেরই সুক-দুঃকু নিজের স্বার্থ জইড়েই আচে। তার বেতিককরম হতি পারাটাই "মনুষ্যত্ব"। সারেং মিঞা বলে। সিটা যে ঠিক কী তা আইস্তা আইস্তা বুঝতে পারতিচে হোসেন। তবে বুইঝতি আর ঢের ঢের সময় লাইগবে।

আজ সারাদিনে নামাজ পড়া হলনি। সেই ফজিরে নামাজ পইড়েছিল। একনো আলো আচে। গাচ থে নেইমি মগরীব-এর নামাজটা কি পইড়ে নেব?

যদি বাঘ আসে? যদি মড়া-বাঘ হঠাৎ জেগে উইট্যে পড়ে?

থাক তাহলি।

হোসেন রোজ নামাজ পড়ে না। মাঝে মাঝে পড়ে। কিন্তু তার মতো বিশ্বাসী মানুষ খুব কমই আচে। ও জানে যে, কমই আচে। না হলি এতো মনুষ্যি থাকতি সারেং মিঞার মতো ফকির-পিরেরও বাড়া মনুষ্যি তাকে সাঙাত বানাত নি। খুদাহ্‌র উপর বিশ্বাস যদি পুরোই থাকবে কলিমুদ্দি মিঞার, তবে বাঘের ভয়ে নামাজ পড়া বন্ধ থাকবে কেন? সারেং মিঞা প্রায়ই বলে, বিশ্বাস এমনই এক চিজ; পেয়ারেরই মতো, তাতে ঝুটা মিললে তাতে কিস্মত থাকে না এককণাও! হিঁদুরা একটা কথা বলে, "এক গামলা দুধে এক ফোঁটা চোনা।" অনেকটা সেই রকম।

আইস্তা আইস্তা হোসেন এই বাঘের আর বড়খাঁ গাজির জগতেরই মতো বিশ্বাস জগতেও পরবেশ করতিচে সারেং মিঞার হাত ধইর‍্যে। এই দুই জগতের মদ্দি কেমন যেন এক মিলও আচে। মিলটা ঠিক কোতা তা বলতি বা বুঝতিও পারে না।

সকলি এলি পর এই শাব্যস্ত হলে যে, এরফানকে বয়ে নে যেয়ি পাশ-খালের পাশের পোস্কার ট্যাকে গোর দেওয়া হবে। আর বাঘ এখন থাক পড়ি। কাল সকালেই ভাটার সময়ে বাঘ তুলে নে যেয়ে সবাইকে খপর দেতি হবে। বাঘ, কলিমুদ্দি নে যাবে সজনেখালির ফরেস্ট অফিসে। পেরাইজ-ফেরাইজ যা পাবার পাবে। সারেং, ডিঙি বেইয়ে যাবে উলটোদিকে। আর ভিড়ের মদ্দি লয়। সুন্দরবনে পৌছোতি হলি ভিড়ের সঙ্গি মোলাকাত হবেই। না হইয়ে উপায় লাই। তবে এই মনুষ্যিও সব নদীরই মতো। কত বাঁক, কত পেকার; কোথাও চড়া, কোথাও ভাঙন। কিন্তু সোঁদরবনের খাঁড়ির মুখের ছোটো বালি বড়োবালি ছাড়া অমন বালি বা খটখটে শুকনো ডাঙা জমি নদী পারে কমই দেখা যায়। চড়া বা ভাঙনও তেমন চোখে পড়ে না। দিনে এতবার জোয়ার ভাঁটা খেলে যে তাদের হিপাজতেই সব চর আর ভাঙন জমা পইড়্যে গেচে।

সারেং এলি' ওরা নামল। তকন আলো বিশেষ লাই। বাঘ যিখানে থাকার সিখানেই পইড়্যে রইল বাঘকে গুলি করার পর থেকি ওদের সকলের ফিরে যাওয়া পযযন্ত সবসুদ্ধু ঘণ্টাখানেক সময় কেটেচে। আগে বাঘের সঙ্গে এরফান চেল, এখন বাঘ একলা। রাতে হয়তো বনবিবি, বাবা দক্ষিণ রায়, কালু রায় বা বড়খাঁ গাজি কেউ এসি বাঘের মাতায় হাত বুলিয়ে যাবেন। বলবেন, বড়ে ব্যথা পেলি রে বাপ!

এই বাপ কার সৈন্য কে জানে!

১২

রাতেরবেলা সুন্দরবন সত্যিই রহস্যময়ী হইয়ে ওঠে। এমন গা ছমছম, ভয়-ভয় ভাব, এমন নির্জনতার কতা অন্য কোনো বনে ভাবাই যায় না।

সব বনেই দিনে ও রাতে নানা শব্দ হয়। সুন্দরবনে পাকি খুব কম। এই আসল সুন্দরবনে। অন্য জানোয়ারও কম। মানে শব্দ করে চরে-বোড়ানো বড়ো-ছোট জানোয়ার। অন্য বনে পাতা খসে পড়লেও, নীরব রাতে শিশির ঝরলেও তার শব্দ হয় নীচের ঘন ঝোপঝাড়ে। সুন্দরবনের নীচেও আগাছা আচে কিন্তু জোয়ারভাঁটার জন্যি সাফসুতরো থাকে। যেন নিকোনো।

শুনেচে, রাতেরবেলা বাঘ দূবের বন থেকে ডাকলিও তার অনুরণনে এক মাইল দূবের বন গমগম কইর্য়ে ওটে। বাঘের একটো হুংকাব শুইন্যে নিয়েচে হোসেন। দুবার শুনবার কুনোই ইচ্চে লাই।

এখন খাওয়া-দাওয়া হইয়ে গেচে সকলেবই। এরফান যে অন্ধকার রাতেব তারা-ভরা আকাশের নীচে শুইয়ে আচে কববে তার কতা কেউ আলোচনা পযযন্ত করতিচে না। কেউ তামাক খাতিচে, কেউ বাঁশি বাজাতেচে। সেই অ্যাকর্ডিয়ান-ছোঁড়া প্যাঁ-প্যাঁ করতি ধইরেচেল, তাকে কে যেন ধমক দে থামাযে দেচে। একটা মানুষ, তাদের সাথি যে মইর্য়ে গেল, তারে যে এই বনেই ফেইল্যে সঙ্গীরা কালই এই এলাকা ছেড়ি চইলে যাবে ই কতাটা ভাবতিও খারাপ লাইগতিচে হোসেনের।

এরাই আসল মরদ। মেয়েমানুষের মতো কান্নাকাটি, পেচুটানে ওরা বিশ্বাস করে না। সাপ-বাঘ-কুমির-কামটেব সঙ্গে যুদ্ধ কইর্য়েই এরা বহু যুগ হল বেঁইচি আচে। তবু মৃত্যুর ভয়ে বাড়িতে বইস্যে থাকেনি। পেতিবছর আবার এসিচে। মা, চেলেকে বিদায় দেচে দোরে দাঁড়ায়ে; স্ত্রী, স্বামীকে; ফিরবে না যে, তা জেইন্যেও। পেটের জ্বালা বড়ো জ্বালা। খিদে যে কত মারাত্মক হতি পারে তা একানি এইসেই পেরথম বুঝতি পারল হোসেন। ই কতাটা বারবারই বুজতিচে। খিদের দাঁত, সাপ-বাঘ, কামট-কুমিরের দাঁতের চেয়েও অনেক ভয়ংকর, অনেকই বেশি ধারালো। এই মানুষগুলোনের প্রত্যেকে তা জানে। আর জানে বলিই আসে। আসতে হয় বাধ্য হয়ি, পেতিবছর।

সকলেই যে ভয়ে ভয়ে আইস্যে এমন লয় কিন্তুক। অনেকেরই কাছে এই বিপদ, এই যে-কোনো মুহূর্তে পেরাণ চইলে যাবার আশংকা এই সবই আকর্ষণ। বিপদের মদ্দি থেইকি থেইকি ওদের এমনই অব্যেস হইয়ে গেচে যে, বিপদ না থাকলি ওদের ভাত হজম হয় না।

এখন গভীর রাত। সকলেই ঘুমায়ে আচে। তবে পেতি নৌকোতেই একজন করে সজাগ থেকি পাহারা দেয় পালাবদল কইর্য়ে। এই সুন্দরবনের লিয়ম। ইকানে ঘুম মানেই মৃত্যুর দোরের খিল খুইল্যে দেওয়া।

ফিতে-কমানো লণ্ঠন জ্বলতিচে কুনো কুনো ডিঙিতে। যারা কেরোসিনের খরচ জোগাতি পারে, তারাই পারে, সারারাত বাতি জেইলি রাখতি। যারা পারে না, তারা বনবিবি আর বড়খাঁ গাজির ভরসাতে রাত কাইট্যে দেয়।

হোসেনদের নৌকোটা বাঁধা আছে পাশখালের একটা মোটা গাচের গুঁড়িতে। কী গাচ, চেনে না হোসেন। লম্বা কাছি টিইল্যে দে ডিঙিটাকে পার থেকে হাত বিশেক ভিতরে জলের মদ্দি বেয়ে এইসেচে। সকলেই তেমনই কইরেচে। বাঘ, মাঝ-নদীতে সাঁতরে, এইসি মানুষ নে যায় নৌকো থেকি। কিন্তু মাঝ-নদীতে তো ছোটো ডিঙি নোঙর করতি পারে না, মাজ-খালেও পারে না। তাদের তো নোঙরই থাকে না। তাই তাদের লম্বা পারের খুব কাছে নোঙর করে না। তারাও পারের থেকে একটু ভিতরে নোঙর ঠিকমতো করা হল কী হল না।

হঠাৎ হোসেন দেকলো টোঙের ভিতরেই শুয়ে যে, লাল একজোড়া চোক জলের উপর থেকে তার দিকে একদৃষ্টে চেইয়ে আচে। লাল মানে ঠিক লাল লয়, কাঠকয়লার আগুন নিবে এইল্যে যেমন দেকতি হয়, অঙ্গার; ঠিক সেই রকম। নড়ে না, চড়ে না, স্থির হইয়ে হোসেনরে দেখতিচে। লণ্টনের আলোটা তার চোখে পইড়্যেই চোখ দুটোতে অমন রঙ ধইরেচে।

উট্যে বসল হোসেন। তারপর টঙএর ভেতর থেকি বেইর‍্যে এসি নৌকোর পইটাতে বসি ভালো করি নিরীক্ষণ করতি গেল। আর অমনি চিৎকার কইরে উটল সারেং মিঞা। খবরদার! নেইমে পাটাতনে বোস।

সারেং মিঞার চিৎকারও হল্য আর তারই সঙ্গি সঙ্গি নৌকোর পইটার পিটে কী যেন ভারী একটা জিনিস আছড়ে পইড়ল। নৌকো টলমল করে উইটল। লণ্টনটা আট্টু হলি লাগি থেইক্যে খুইল্যে যেয়ে জলে পড়তিচেল।

সারেং চাচার চিৎকারে সব নৌকোতে তার গুঞ্জরণ উঠল। কী হল্য চাচা?

আরে কুমির। বড়োটা। আর এ ছোঁড়া গেচে পইটাতে বসি কুমিরকে ভালো করি দেখতি।

কেউ কেউ হেসে উইটল।

পাশের নৌকো থেকে কে যেন বলল, আজ ভালো কইর‍্যে মামাকে দেইক্যেও সাধ মেইটেনি গো?

সারেং মিঞা বলল, ককনও নৌকোর বইটাতে, কানাতে, অমন করে বসবি না। ন্যাজের এক বাড়িতে তোরে জলে ফেইল্যে মুকি কইরে নে যাবে জলের গভীরে।

কুমির কোতা থাকে চাচা?

কেন? জলে।

না। জলে ও অবিশ্যিই! কিন্তু তাদের বাড়ি-ঘর-ডেরা বলে কি কিছু নেই? বাঘ যেমন "খাল"-এ বা "ট্যাঁক"-এ থাকে!

আচে। খালের বা নদীর দু-পাশের যে-কোনো পাশে খোঁড়লের মতো করে তাতে তারা থাকে। কাদার মদ্দি। ছানাপোনা নিয়েও থাকে। হয়তো তাপ লাগে ডিম ফুটতে, সে জন্যিও। বনবিড়ালে ও বাঘে এবং অনেক সময় বড়ো সাপেও তাদের ডিম খেইয়ে যায়।

তুমি কি কখনো খেইয়েচ?

কি?

কুমিরের ডিম?

খেইয়েছিলম ইকবার ওই যখন সারেং-গিরি কইরতাম। ওই নীলমণিই দেইকেচেল ইঞ্জিন ঘর থেকি। বোট থামায়ে, নিয়ে এইসেচিল দুটি ডিম। ইয়া বড়ো বড়ো। ডিম যখন তুলতিচে তখন কুমির চেল কাচাকাচিই ঝোপের আড়ালে। সি তো এইক্যোঁ বেঁইক্যে তাড়া কইরে এইসেচেল নীলমণিকে। কিন্তুক এক লাপ্যে সে বোটে।

কী খেইয়েচিলে? ঝোল?

না, না ঝোল লয়। ঝোল খাব কি করে? অতবড় ডিম তো দুহাতে ধরি নেইতে হতো। মামলেট ভেইজেচেল নীলমণি। কইযে প্যাঁজ রসুন, শুকনো লংকা দে। বোটসুদ্ধ সকলি মিল্য খেয়েও শেষ করতি পারি না।

দুটো কুমির হতি পারত ডিম ফুইটে তা থেইক্যে?

তা হতি পারত। তবে বইলেচি তো! সবই খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক। খুদাহ্‌র দুনিয়াতে কোনো কিছুরই কমতি লাই। আজ যে বাঘে এরফানকে খেল, না খেলি তো এরফানেরও আরও ছেলেমেয়ে হতি পারত। তাতে কি মনুষ্যর সংখ্যা কিছু কইমবে? সব হিসেবেই হরে-দরে সমান হইয়ে যায়। তার হাতে দাঁড়িপাল্লা। তিনিই জান দেন; তিনিই নেন। উ সব হিসাব-কিতাব বড়ো গোলমেলে। অত সহজ নয় বুইজ্যে ফেলা।

তারপর বললো, নে, এবার ঘুমো দেকি। কাল বাঘটাকে এইনে দেই আমার ছুটি। আমি বেইর্যে পইড়ব আমার পথে।

সে পথ কোথায় নে যাবে তোমারে চাচা?

সে পথই জানে! মানে, জল।

তুমি একা একা থাকো কি করে এই ভীষণ বনে আর জলে?

যে মনুষ্যি একা থাকতি না পারে সে মনুষ্যির মনুষ্যজন্মই বেথা। আখ্‌রতের দিনে তাকে আবার ফিরৎ পাইট্যে দিবেন খুদাহ্! ইতে কুনোই সন্দেহ লাই। একাই যদি না থাকতি পাইরব তো মনুষ্য হইয়ে জন্মাইচি কী কইরতে। দলে তো থাকে জন্তু-জানোয়ারে। শুয়োর, বকর, মোরগা, হরিণ, বাঁদর, মাচ সবাই। সেই সব দলের ইকজন কইর্যে 'গোদা' থাকে। "পালের গোদা"। সি, দলের হাততালি আর বাহবা আর মোসাহেবি পেইয়ে পেইয়ে ভাবে, আমি কী হনু! ল্যাজ মোটা হইয়ে যায় তার। কিন্তু সি হতভাগা জানে না পয্যন্ত যি তার মনুষ্যি হইয়ে উইটতে ইকনো ঢের বাকি। তার জন্ম থেইকি মৃত্যু ইস্তক মিথ্যেই হাঁটাহাঁটি; চেল্লাচেল্লি। এই সব গোদারাই মনুষ্যের মতো মনুষ্যিদের ইকানে শান্তিতে থাকতি দেয় না।

হোসেন চুপ কইর্যে রইল। সারেং মিঞার সব কথাই যে সি বোজে এমন লয়। দিন কয় হল দেকতিচে, সব কতার সঙ্গি সায়ও দিতি পারে না। একা একা, কী খাবে, কী কইরবে মানুষটা; ভেবি পায় না। সঙ্গের চাল ডাল নুন আর কদ্দিন! মিষ্টি জলও তো শেষ হয়ি যাবে। তাপ্পর?

কথাটা মাতায় আসতিই বইলল, তুমি খাও কি?

মানে?

মানে, তুমি যে একা-একা নিরুদ্দেশে চইল্যে যাও, তা তুমি খাওটা কি? খাদ্য-খাদক তো সবই শেষ হইয়ে যাবে কদিন পরই।

হাঃ। সারেং মিঞা হাইসল। বলল, খুদাহর দুনিয়াতে খাদ্য-খাদকের অভাব আছে নাকি কুনো! জাহাজডুবি হল্যি, মনুষ্যিরা কোনো জনবসতিহীন দ্বীপে গিয়ে উইটলে সিকানে তারা খায় কি? কীড়ে-মাক্‌ড়ে, মাছ, সাপ, গিরগিটি, স্যালামান্ডার, কামট, কুমির, হরিণ, বাঁদর, কিছু ধইরে খেলিই হয়। পাতা-পুতা, বনের রকমারি ফল। হ্যাঁ, সঙ্গি এট্টা জিনিস থাকলি ভালো হয়, তা হতিচে দেশলাই। আগুনটা মস্ত দরকার। সবটাইতে বেশি দরকার। তা নৌকাডুবি হলি তো আর দেশলাই সঙ্গে নে পৌঁছোয় না তারা বসতিহীন দ্বীপে। তাও তো তারা বেঁইচি থাক্য, না কি? শরীলের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়। বুয়েচ বাজান!

আর মিষ্টি জল?

সেও আচে। অনেক আচে। খুঁইজে বের করতি হয়। বালির মদ্দিও মিষ্টি জল আচে। কিচুর জন্যিই কিছু ঠেইক্যি থাকে না। আসল হল গে মনের জোর। যা চাইতেচ তা পাবার ইচ্চে। একা না

থাকলি, নিজেকে আবিষ্কার কইরবে মনুষ্যি কী করি। আমরা হলাম যেয়ে এক-একা দ্বীপ। চারদিকে বেনোজল। নোনা জল। এই দ্বীপের মদ্দি সবই আচে। মিষ্টি জল, খাদ্য-খাদক। কিছুরই কমতি লাই। কিন্তু মনুষ্যির অঙ্গ-পেতঙ্গের মদ্দি সব কটিরই পেয়োজন আচে অবিশ্যি, কিন্তু সবচেইয়ে বেশি যার পেয়োজন সেই জিনিসটার ব্যাপারই কেউ জানে না।

সেটা কি?

সারেং মিঞা বালিশে-শোয়ানো তার মাথাতে আঙুল দে বলল, এই। এই মগজ। যারা তা ব্যাভার করে তা তাদের নিজেদের সুখ-সুবিধে, খাদ্য-খাদক বা অন্যকে মাইরবার হাতিয়ার তৈরি করতিই তাকে কাজে লাগায়। নিজেকে আবিষ্কার করার জন্যি মগজকে কাজে লাগায় কই? নিজের শরীরের রহস্যের কতা কতিচি না; কতিচি নিজের মনুষ্যত্বর রহস্যের কতা।

হোসেন চুপ কইর্যে থাকে। সারেং মিঞার কিচু কথা বোজে, কিচু বোজে না।

এমন সময়ে ফটাফট শব্দ আসে শিষখালের দিক থেইকে। এই শব্দের কথা আজই সকালে মাছ ধরতি ধরতি এরফান তাকে বইলেচেল। একটা গোসাপ দেইকেচেল সকালে, শিষখালের পাশের ঝোপে। এরফান বইলেচেল, দ্যাখো হোসেন, এ ব্যাটা মনমরা হইয়ে চলি যাতিচে। এই খালে জোর জোয়ারের জল ঢুকিতিচি। মাচে ভইর্যে যাবে ইকেবারে। এই খাল, মনি হয়, এই ব্যাটারই জমিদারি। নেমে এইসি পেট ভরি মাচ খায়, তাপ্পর আবার শিষখালের আশেপাশের ঝোপে-ঝাড়ে গিয়ে শুইয়ে থাকে। শীতকালে রোদে শুয়ি রোদ পোহায়। কুমিরের মতো। ভারী সুন্দর দেখতি গোসাপকে। কী সুন্দর চকচকে চামড়া। মস্ত বড়ও হয়।

হোসেন ভাইবতেচেল, কী কইল্যে প্যায়দা হওয়ার পর ইন্তেকাল অবধি এরা কাটিয়ে দেয় জীবন! শুধু এরাই বা কেন? সব জন্তুজানোয়ার এবং সত্যিই অধিকাংশ মনুষ্যিই! জন্মাবধি খাওয়া-খাওয়া কইর্যে মরে। খাদ্য-খাদকের ধান্দাতেই জিন্দগি বরবাদ কইর্যে চইল্যে যায় তারা। খুদাহর কী বিচিত্র লীলা। ওদের না হয় মগজ লাই মনুষ্যির মতো। কিন্তু মনুষ্যিরাও কেন এমন করে সিটা বুঝা ভারী মুশকিল। হয়তো সারেং চাচা ঠিকই বলে।

গোসাপটা আবারও ফটফট শব্দ করল।

তারপরই রাতের নিস্তব্ধতা খানখান কইল্যে দে জোয়ারি পাখি ডাইকতে থাকল পুত-পুত-পুত-পুত কইর্যে।

কে জানে, কবে নদী আর জোয়ার তার পুতকে ফিরায়ে দিবে!

১৩

ভোরের আলো ফুটতি না ফুটতি সকলে মুকে সামান্য কিছু ফেইল্যে দিয়েই চলল বাঘ আনতি।

কাল সন্ধের মুকে যি সব ডিঙি বা নৌকোর সইঙ্গে ই-বহরের কোনো নৌকো বা ডিঙির দেকা হয়েচেল, তারাও খবরটা পেইয়েচেল। তাই আরও অনেক ডিঙি ও নৌকো এসে ভিড়ল। এই বাঘই গোবিন্দকে নেওয়া বাঘ হলি, কিছুদিনের জন্যি সকলেই একটু নিশ্চিন্ত হয়ি যার যার কাজ করতি পারে।

ডাঙায় উইট্যে সকলের আগে আগে চইলল কলিমুদ্দি মিঞা।

সারেং মিঞা ইকবার বইলেচেল যে, সে যাবেনি। তার কাজ তো ফুইর‍্যেই গেচে। বাঘ আনতে আবার শিকারির দরকার কি? কিন্তুক সকলেই আপত্তি কইরেচেল। অন্য বছরের এক ছোঁড়া "বক্স-ক্যামেরা" নে আসিচে কোডাক কোম্পানির। সি বইলল, শিকারির সঙ্গি বাঘের ফোটো খিঁচবে সে। সারেং মিঞা শুইন্যে হেসি বাঁচে না। বলে, জিন্দগির আখরি ওয়াক্ত এ পৌচে একন "বাক্স-বন্দি" হবার কুনো ইচ্ছাই লাই গো আমার।

এই নে খুব হাসাহাসি হল্য কিছুক্ষণ। তা যাই হোক, সকলেই যেতিচে। সারেং মিঞা পেচনে পেচনে।

আধা পত গেচে ওরা, এমন সময়ে সামনে যারা চেল তাদের মদ্দি একজন এইসি শুদোল, বাঘ ঠিক কোন জায়গাতে চেল? এই হোসেন, তুই চল তো। কলিমুদ্দি মিঞা এমন তামাক টেইনেচে, কে জানে ছিলম-এ কী ভরা চেল, বাঘ খুঁইজ্যে পেতিচে না।

হোসেন হেইস্যে উঠল সি কতাতে।

বইলল, বাঘ কি শরষে দানা? যে খুঁইজ্যে পেতিচে না?

বলে, তার সঙ্গি দৌড়ল।

বনের মদ্দি যেন উৎসব লেগেচে। হাসির হররা উইটচে থেকি থেকি। কেউ হাতে হুঁকো নে চলতিচে। কেউ বিড়ি ফুঁকতিচে।

হোসেন যেয়ে পৌছে দেইকল কলিমুদ্দি মিঞা দাড়ি চুলকোতিচে।

হোসেন হেসে বইলল, কী মিঞাজান! বাঘকে গায়েব কইর‍্যে দেলে নাকি?

কিন্তু মিঞাজান নীরব।

বলল, দ্যাকো তো হোসেন। বাঘ ঠিক ওই গাচতলাতিই মুখ হাঁ করি পইড়্যে চেল না?

হোসেনের নিশ্বাস বন্ধ হইয়ে গেল।

ধড়ফড়ানো বুকের মদ্দি থেকে একটো আওয়াজ বেরুল। বলল, চলো ত!

তবে?

তবে? ডাক, ডাক, সারেং চাচাকে ডাক।

সারেং মিঞার কাচে যখন খবর পৌচোল তখন সে বিশ্বাস কইরতে পারেনি প্রথমে। তারপর বড়ো বড়ো পা ফেলি সিখানি পৌছি উবু হয়ে বইস্যে হেঁকে বইলল সকলকে, তুমরা পেত্যেকে একুনি ফিরি যাও যার যার ডিঙিতে। অন্যরা যেয়ে যার যার কাজ করো। বাঘ বেঁইচে আচে!

ইটা কি কতা বইললে চাচা?

কলিমুদ্দি অবিশ্বাসের গলাতে বলল।

হোসেনের মুখটা হাঁ হইয়ে গেল। তার বাক্যি সইরচেল না মোটে।

হঠাৎ সারেং বলল, হোসেন, তুই ওই গর্জন গাচটাতি চইড়্যে বইস্যে থাক। আমি বন্দুক-গাচ দৌড়ে নে আসি গে।

কলিমুদ্দি বলল, বন্দুক-গাচও সঙ্গে নে আসোনি?

মরা-বাঘ আনতি বন্দুক কোন কাজি লাগত? সামাল তুমরা সকলে। খুব সাইবধানে হল্লাগুল্লা না কইর‍্যে চইল্যে যাও। গুলি খাওয়া বাঘ কোতায় ওত পাতি বসি আচি তা কে জানে! তার উপর তার শিকার পযযন্ত আমরা নে এইসেচি।

হোসেন গাচে উইট্যে পড়ল লুঙি মালকোঁচা মেইর‍্যে। আর সকলে হতবাক, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে নীরবে ফিরে চলল। কারো মুকে কোনো বাক্যি নেই। সব কতা ফুইর‍্যে গেচে। সকলেরই একন চিন্তা, মানে মানে যে যার ডিঙিতে গিয়ে উইটতে পারলি হয় কোনোমতে প্রাণ বাঁচায়ে।

সারেং মিঞার মাথা হেঁটে হইয়ে গ্যাচে। ভাগ্যে সঙ্গে হোসেন আর কলিমুদ্দি চেল সাক্ষী। নইলে সে ইকেবারেই বে-ইজ্জত হইয়ে যেইত। সারেং মিঞা ভাবতেচেল কী হতি পারে! এমন

ঘটনার কতা তো কককনো শোনেনি। কত বাউলে, শিকারিকেও তো চেনে, কতদিন হয়ি গেল আসতিচে এই সোঁদরবনে কিন্তুক এমন ভোজবাজি, বহুরূপীর খেল-এর কথা তো কেউই বলেনি!

হোসেন একা একা বসি আছে গর্জন গাচের উপরি। আবার সোঁদরবন, সেই সোঁদরবন। ডানহাতি জঙ্গল থেকে খুব জোরে জোরে বাঁদর ডাকতিচে। হরিণ ডেইক্যে উইটল এ জঙ্গল থেইক্যে। হোসেন কোন্ দিকে যে তারা আচে, তা ঠাহর করতি পাইরল না ঠিক। টাঁউ-টাঁউ-টাঁউ করি ডাকতেচেল। বোধহয় শিঙালের ডাক এ। ঠিক অমনি সময়ে সেই বড়ো শিঙালটা, কাল যাকি দেইকেচেল সি আসি কাইলকেরই মতো শিঙের বাহার মেলি ঠিক একই জাগাতে দাঁইড়ে রইল। কাল বিকেলে আর আজ সকালে। এই কী সেই দোজখ-এর হরিণ? হিঁদুদের মায়ামৃগ? খুদাহ্ই জানে!

অনেকক্ষণ পর দেইকতে পেল সারেং মিঞা বন্দুক হাতে ধরি আসতিচে। খুব সাবধানে এক এক পা ফেইলতিচে। কুতা গেল যে মরা বাঘ। এ কী কারবার!

চাচা গাচতলিতে পা ফেইল্যে এইসে পৌঁছোলে পর নামল হোসেন। সারেং চাচা কাঁধের উপর একটা কুড়াল ফেইল্যে নে এইসিচে। কুড়ালটা হোসেনের দিকে এইগ্যে দে বইলল, ইটা রাক। মরার আগে মেরে মরবি। ভালো করে যদি মাতাতি এক কোপ বসাতি পারিস তো মামার দফারফা হইয়ে যাবেক।

কিন্তু সে গেল কোতা চাচা? নাকি সব ভুল! সব হেঁয়ালি!

কাল এরফানকে যে কবর দেওয়া হল? সিটাও কি হেঁয়ালি? বাস্‌স। আর একটিও কতা লয়. ইসারাতে যা বইলব তাই কইরবি।

এমন সময়ি ওরা দেইকল যে হাতে সড়কি নে একটি অল্পবয়সি ছেইল্যে, এই হোসেনদের বয়সিই হবে, একা একা ইদিকে আসতিচে। সারেং মিঞা বিরক্ত মুখে সেদিকে চেয়ি থাকল। কাছে এলি পর বোঝা গেল, এ সেই বক্স-ক্যামেরাম্যান যি সারেং মিঞাকে বাক্সবন্দি কইরতে চেইয়েচেল। তার ক্যামেরাটিও ঝুইলতেচে গলাতে।

সারেং বইলল, তোমার দায়িত্বটা লিবেটা কে?

ছেলেটি হাইসল, বুলল, বনবিবি লিবে। আবার কে?

তোমার নাম কি?

মতি দাস।

আবার ক্যামেরা কেন?

বাঃ। ভূত-দানো যদি সে না হয় তবে তাকি তো মরতি হবেই সারেং মিঞার বন্দুকে।

তুমি শিকার কইরেচ ককনো আগে?

না সারেং মিঞা। শিকার করিনি, তবে, বাঘের কুমিরের শিকার হতি-হতি বেঁইচে গেচি অনেকবার।

সারেং মিঞা হেসি ফেইললো।

মনে মনে বলল রসিক আচে ছোঁড়া। সাহসও আছে অবশ্যই। অতগুলোন জোয়ান-মদ্দ-প্রৌঢ়-বুড়ো সুড়সুড় কইর‍্যে চইল্যে গেল এই কাণ্ডর কতা শুইন্যে আর এ ছোঁড়া একা একা শড়কি হাতে ফিরি এল। বাঘের হাতে যিখানি-সিখানি খাদ্য হতি পাতে, সি কথা জেইনেও।

আসলে এই বয়সটাই মারাত্মক। এই বয়সের ছোঁড়ারাই সারা দুনিয়াতেই যা করার তা করে। এর চেয়ে ছোটোরাও করে। যতই বয়স বাড়ে মানুষের ততই সে ভিতু হতি থাকে। কেউ সংসারের

চক্রে জইড়্যে পড়ে। কেউ টাকার চক্করে। যার যত বেশি টাকা তার মরতি তত ভয়। ইসব সারেং মিঞার পেত্যক্ক অভিজ্ঞতাই বলে।

এবার কোনো কথা লয়।

এই বলি সারেং মিঞা কাল বাঘ যিখানে শুইয়েচেল সিখানে গিয়ে দাঁইড়াল। রক্তে মাটি ভিজে আচে। এরফানের রক্তের দাগ আর বাঘের রক্তের দাগ আলাদা আলাদা। বাঘ যে উইট্যে দাঁইড়েচে তার খেঁচা দেকা গেল। এবং বাঘের রক্তে ভেজা মাটিতেই একটো সাদা চৌকো মতো জিনিস পইড়্যে আছে দেখে সারেং মিঞা উবু হইয়ে বসি সিটা পরীক্কা কইরতে লাগল।

ইটা কি? এত্ত বড়ো ছক্কা? লুডো খেলার?

কতাটা মন্দ বলেনি মতি। জিনিসটা লুডো খেলার ছক্কার মতোই দেখতি বটে! তবে, মদ্দি কালো বা লাল ফুটকি ফুটকি দাগ লাই। আর সাইজে তার চেয়িও কুড়ি-পঁচিশ গুণ বড়ো।

জিনিসটা হাতে তুইল্যে নে' নেড়েচেড়ি দেকে সারেং মিঞার চোক কপালি উইট্যে গেল।

নিজের মনেই বইলল, অবিশ্বাস্য! অবিশ্বাস্য!

কি?

হোসেন আর মতি একসঙ্গি বইলল।

বাঘের মাথার হাড়।

সারেং মিঞা বইলল, সামনে মুক কইর্যে চেল চোট কইরবার সময়ে। বাঘকে কখনো সামনাসামনি মারতি লাই। বড়ো শিকারিরা তাই বলেন। কিন্তু তখন আমার কুনো উপায় ছেলোনি। ভেইবেছিলাম যদি এরফান তখনো বেঁচি থাকে, যদিও বেঁইচে থাকার কোনোই সম্ভাবনা ছেলনি; তবু দেরি করার বা বাঘকে ঘুরতে দেয়ার সময় ছেলনি। কপালে বুলেট লেইগ্যেচেল। তাতেই বাঘ অজ্ঞান হইয়ে পইড়্যে যেইচেল। কিন্তু অতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পইড়ে যে থাকবে তা তো চিন্তাই করা যায় না। জ্ঞান আসতি, মাতায় অতবড় ছ্যাঁদা নিয়েও সে বাঘ উইট্যে হেঁইটে গেল! কী জানোয়ার বল তো দেকিনি।

শুনিচি, ওদের চামড়ার ফুটো ঢেইক্যে যায়, তাই রক্ত পড়াও বন্ধ হইয়ে যায়।

মতি বইলল্যে।

তা আমি জানি। রক্ত পড়া না হয় বন্ধ হল কিন্তু বুদ্দি পড়াও কি বন্ধ হবে? মাতার অতবড়ো ফুটো যে সব বুদ্দিও তো বেইরে যাবার কতা।

ওই অবস্থাতেও হেইসো ফেলল সারেং মিঞা।

হোসেনও হাসল।

বাঘটা পেরথমে টলতে টলতে যেইচে। যেন দশ হাঁড়ি খেজুর-তাড়ি খেইচে।

পায়ে খোঁচ দেখি বলল, সারেং।

বেশ অনেকক্ষণ পরে তার পা সমান পইড়্যেচে।

এবারে সাবধানে খোঁচ দেইকি দেইকি এগোল ওরা। আগে সারেং মিঞা পেচনে তার কথামতো ওরা দুজনে। পাশাপাশি।

চলতি চলতি দেইকল হোসেন, আশ্চর্য। বাঘটা এরফান আর ও যেকানে সকালে মাচ ধইরতেচেল আর যেকান থেকে এরফানকে নে গেচিল ঠিক সেইখান দেই শিষখালটা পেইরেচে। খাল পেইরে যেয়ে সে ওদিকের জঙ্গলে পৌচেচে। ওপারে কিছুটা যেয়েই দেখতি পেল এট্টা গোসাপ ধইরে খেইয়েচে সে। বাঘটা কোন্ সময়ে যে সে খালটা পেইরে গেচে তা টিক ঠাহর করতি পারল না সারেং মিঞা। গোসাপটাকে প্রায় পুরোই খেইয়ে ফেইলেচে সে। সিকানে মাটিতে একটু ঝাপটা-ঝাপটির চিহ্নও রইয়েচে।

সিকান থেইকি খোঁচ দেইক্যে দেইক্যে এগিয়ে চলল সারেং মিঞা। তার পেচন পেচন ছায়ার মতো ওরা দুজন।

বাঘটা গিয়ে "মাল" এর উপরে একবার শুইয়ে পইড়েচেল। সম্ভবত, সকালে ওরা শিষখালের অপর পারের জঙ্গলে যকন বাঘ আনতি আসে তকন বাঘ এইকানেই শুইয়েচেল। ভাগ্যে কারেও ধরেনি পেছন থেকি এইস্যে। কথাটা ভেইবেই রোম খাড়া হয়ে উটল ওদের। কী শয়তান, কী শয়তান!

কোনো ঝোপের আড়োলে ঘাপটি মেইর্যে বইসে বাঘ কি তাদের একন আসতি দেইকেচে?

মনে হল তাই। তকনও সিকানে বাঘের লোম পইড়্যেচেল।

সারেং মিঞা মাটিতে হাত দে দেকল।

এমন সময়ে ওদের নাকে বিচ্চিরি দুর্গন্ধ লাগল। বাঘ পেচ্চাপ কইরেচে একটা পশুর গাচের গুঁড়িতে। সিকানে তকনও পেচ্চাপের দাগ চেল। ভিজে চেল কাণ্ডর সি জায়গাটা। সারেং মিঞা হাতের পাতা ছুঁইয়ে দেখল, গরম তকনো জায়গাটা। ওদের দিকে মুক ফিরিয়ে ইশারাতে আঙুল ছোঁয়ালো ঠোঁটে। তারপর আবার এগোল।

বাঘের খোঁচ দেইকে এগোতি এগোতি আবার কালকের মতোই অবস্তা হল্য। চলেচে তো চলেইচে। মাইল দু-তিন সমানে চলেচে বাঘ। ওরা যে তার পেচু নিয়েচে সি কতা বাঘ বুঝতে পেইরেচে। কাল সারেং মিঞার বন্দুকের গুলি খেইয়ে, গুলি যে মোটেই সুখাদ্যর মদ্দি গণ্য লয়, সি কতা সি ভালোমতোই বুইজেচে!

চারদিক নিস্তব্দ। সুনসান। মৃতবৎস মায়ের মতো সূর্যটা ঠান্ডা রোদে ভরে দিয়েছে জল-জঙ্গল। অমঙ্গল হবে। একটা জোয়ারি পাকি ডাকতিচে পুত-পুত-পুত-পুত-পুত। কোথাও আর কোনো শব্দ লাই। বাঘও চলেচে, ওরাও চলেচে। সময়ের কোনো মা-বাপ লাই। সোঁদরবনের গভীরে গুলি খাওয়া বাঘকে পিছা যারা কইরেচেন তাঁরাই জানেন যে, সময়—অমন যে বলবান সময়, সেই সময়ও সেই সময়ে মরি থাকে। সে যে আচে, সি কতা বোজা পয্যন্ত যায় না। কোতাও দাঁড়াবার জো-টি লাই। বাঘ চইলেচে তারাও চইলেচে। যমের পিচে যম; তার পিচে যমের যম।

দেকতি দেকতি বেলা দ্বিপ্রহর হল। এই সময়ে বন সবচেয়ে বেশি সুনসান। সান্নাটা। ছায়ারা সবচেয়ে ছোটো। চারদিকের বনকে দেকায় যেন একই রকম—বনের মদ্দি চলতি চলতি কোতা দিয়ে এইসেচে, কোতায় যেতিচে তার কোনোই হিসাব থাকে না। সোঁদরবনের গাচগাচালিরও তেমন কোনো বৈচিত্র্য লাই। ক্যাওড়া, ক্যাওড়ার শুলো, গরান, গেঁয়ো, মাঝে মাঝে হ্যাঁতালের ঝোঁপ, দু-একটি সুন্দরী, টক-সুন্দরীর ঝাড়, গর্জন, পশুর ইত্যাদি। হোসেনের মনে হতিচেল তারা যেন শিষখাল পেইর্যে আসার পর থেকি একই জায়গাতি এতক্কন ঘুরতিচে।

যেমনই এমন মনে হওয়া অমনি সারেং মিঞা দাঁইড়ে পড়ে খুবই চিন্তিত গলায় বইলল ফিশফিশ করে, সাবধান! সাবাধান! বাঘ দণ্ডি কাটাতিচে হোসেন। খুব সাবধান!

সোঁদরবনের বাঘের মতো ধূর্ত বাঘ দুনিয়ায় লাই। পেছু-নেওয়া শিকারিকে খতম করার জন্যি তারা চক্র করে ঘুরতি থাকে। কেরেমে কেরেমে সেই চক্র বা দণ্ডি ছোট কইর্যে নে আসে। পায়ের খোঁচ দেইক্যে, একইরকম বনের মদ্দি ক্রমান্বয়ে চইলতে থাকা শিকারিকে বুদ্ধু বাইন্যে, দণ্ডি ছোট কইর্যে আনতি আনতি একসময়ে বাঘ শিকারির পেচনে চলে যায় আর পেচন থেকি কোনাকুনি তার ঘাড়ে লাইপ্যে পড়ে।

একটা বড়ো ক্যাওড়া গাচের তলাতি পৌঁছোতিই তার কাণ্ডের গায়ে হেলান দে দাঁইড়্যে পড়ে খুব সাবধানে সারেং পেছন দিকে দৃষ্টি চালাল।

চোখের ছুরির ফলা দে ফালা ফালা কইর্যে দেইকল, কিচু দেখতি পায় কিনা! বাঘ যে কত ছলাকলাই জানে! কত সামান্য আড়ালে যে অতবড় শরীলটাকে লুইক্যে ফেলি যে বেপাত্তা হইয়ে যায়, তা কহতব্য লয়। এরফানই বইলেচেল ওকে।

সারেং ফিশফিশ কইর‍্যে বইলল, তোরা দুজন শিগগিরি উইট্যে যা। দুজনে দু দিকে দেকবি আর কোথাও সন্দেহের কিছু দেখলিই আমাকে বলবি। যা, উট্যে যা এই ক্যাওড়া গাচে। জলদি।

তখন ওদের দুজনের অবস্থাও সঙ্গীন। সারেং-এর বলার অপেক্কাতেই যেন চেল। বলতি না বলতি দুজনেই তরতর করি উইট্যে পড়ে। তবে আজ কুড়ালটাকে সঙ্গে নে' ওঠে হোসেন। মতিও শড়কিটাকে হাতছাড়া করেনি।

ওরা গাচে উঠলে পরও সারেং তবু কিছুক্ষণ গাচের গুঁড়ির কাচে দাঁইড়্যে থাকে ওদের পাহারা দে'। ঠিক সেই সময়ি পেচন থেকি, যেদিকে সারেং মিঞার চোখ, সেদিক থেকি হরিণ ডাকতি থাকে খুব জোরে জোরে। সারেং মিঞা বড়ো বড়ো পা ফেলি এইগ্যে যায় সে দিকপানে তাপ্পর একটা গর্জন গাচের সঙ্গে সেঁইটে দাঁইড়্যে পড়ে।

কোথাও আর কোনো শব্দ লাই। হঠাৎ পিঠেম বাতাস দিতে শুরু কইরল। আর জোয়ারি পাকি ডেইকে উঠল পুত-পুত-পুত-পুত-পুত। এতক্কন যেন পলিতে পোঁতা চেল। হঠাৎ জোয়ারি পাকি খুব ভয় পেয়ি ডাকতি ডাকতি উইড়্যে যায়। আর ঠিক সেই সময়িই বাঘটা একটা হ্যাঁতাল ঝোপের মদ্দি থেইকে বেইর‍্যে এসে ক্যাওড়া গাছের উপরে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বইস্যে-থাকা হোসেনদের দেখতি পেয়ে দু-পা এগিয়ে এইস্যে খুব মনোযোগের সঙ্গি তাদের দেখতি থাকে। তারপর ফাঁকা জায়গাতি বেইরে এইস্যে গাচের দিকে এইগ্যে আসতে থাকে।

মতি চেঁচিয়ে বলে, বাঘ! বাঘ! সারেং মিঞা, বাঘ!

হোসেন বলে, চাচা, বাঘ!

কিন্তু সারেং-এর কী হইয়েচে, কে জানে! সে যেমনটি দাঁইড়্যে চেল, তেমনটিই দাঁইড়্যে রইল। অথচ বাঘ তার বন্দুকের পাল্লার মদ্দি। বাঘ গুটি গুটি গাচের দিক এগোচ্চে মুখ উপুরে তুইল্যে। হয়তো সে ভেইবেচেল কাল দুজন শিকারি চেল, আজও দুজনই এইসেচে! আর তাদের কারো হাতেই যে বন্দুক নেই তা সে দেইকে নিয়েচে। বন্দুক সে খুব ভালোই চেনে!

তাড়াতাড়িতে হোসেনরা বেশি উঁচুতে উইটতে পারেনি। মতি ও হোসেনের দু-পা ড্যাং ড্যাং করি ঝুইলতেচেল। তারা দুজনে চেঁচায়ে ওটে, বাঘ। চাচা। ও মিঞা। বাঘ। মারো মারো। গাচে উইট্যে ধইরবে আমাদের।

তবু চাচা শব্দ করে না। চাচা জানে যে, বাঘ গাচে উঠতে পারে না। কেঁদো হলে পারত।

এখন সারেং বাঘের ঠিক পেচনে। বাঘ আরো কয়েক পা এইগ্যে এসে ক্যাওড়া গাচের নিচে পেচনের দু পায়ে খাড়া হয়ে দাঁইড়্যে পড়ে সামনের দু থাবা দে' মতিকে পেড়ে ফেলবার চেষ্টা কইরল। ততক্কণ মোতি পা তুল্যে নে তার শড়কিটা বাঘের দিকে জোরে ছুঁইড়্যে দেচে। কিন্তু তা বাঘের গায়ে না লেগি, মাটিতেই পইড়্যে গেঁতে গেল। তকন বাঁ হাতে ডাল আঁকড়ে হোসেনও তার কুড়াল ছুঁড়ল। কুড়ালটা লাগত বাঘের মুকে। কিন্তু তার কান ঘেঁষে যেয়ে তা মাটিতে গেঁথে গেল। মাতাটা কাদাতে গেঁইথে গেল আর হাতলটা দুলতে থাকল। ঠিক সেই সময়েই সারেং দু-তিন পা এইগে এসে বাঘের ঘাড় লক্ষ্য কইরে বন্দুকের চোট কইরল। পেকাণ্ড এক লাপ মেইর‍্যে বাঘ উপরের দিকে উইট্যে এসে প্রায় মতিকে ধরতি-ধরতিও ধরতি না পেরে চিৎপটাং হুয়ে মাটিতে পইড়্যে গেল। মাটিত্যেই মুখ ঘুইরে সারেং মিঞার সামনাসামনি হল।

সারেং মিঞা বাজখাই গলা কইরে বইলল, তোর বড়ো খাঁই হইয়েচেল শালা! বড়ো খাঁই। কাল মইর‍্যে বেঁইচেচিলি, কিন্তুক আজ? এই বলতি বলতিই বাঘের দিকে দৌড়ে এল সে বন্দুক সামনে করি। বাঘের ঘাড়ের গুলি তার মেরুদণ্ড ছিনিমিনি কইরে দেচিল কিন্তু তবু বাঘ পেছনের দু পায়ে দাঁইড়্যে উঠে সারেংকে থাবা মারতি চায়। বাঘ দাঁইড়্যে উটতিই ইকেবারে চিতোনো-বুক লক্ষ্য করি

সারেং মিঞা আরেকটা গুলি কইর্য়েই এক লাপে বাম পাশে সইর্য়ে গেল। বাঘ লাপ দিল যদিও কিন্তু ওই গর্জন গাচের আধাআধি দূরত্বে যেয়েই কাদায় পইড়্যে গেল।

সারেং মিঞাকে যেন জিন-এ ভর কইরেচে। সে, লুঙির কষি খুলি আরো দুটি টোটা নে' আবার বন্দুকে ভইরে নে' বাঘের পাশ দিয়ে যেয়ে তার কানে চোট কইর্য়ে দিল একটা। আবার দৌড়ে ওপাশে যেয়ে বাঁ কানে আরেকটা। বাঘের মুখটা কাদার মদ্দি নেমে গেল। সামান্য সময় থরথর কইর্য়ে কেঁইপে উট্যে বাঘ নিশ্চল হইয়ে গেল।

গাচ থেকি মতি চিৎকার কইরে উটল, মিঞা, বন্দুকটা নে বাঘের গায়ে পা ঠেকায়ে ইকবার দাঁড়াও দেকি। এবার আমি ফোটোটা তুলি।

বলেই, সি তার গলায় ঝোলানো বাক্স ক্যামেরা তাক কইরল।

সারেং মিঞা তারে ধমকে বইলল, না, না। একদম লয়। বনবিবির বাহনরে আমি মাইরব সি ক্ষেমতা আমার কুতায় রে? ক্ষেমতা তো এই বিলিতি বন্দুকের। আমি কে এইলাম?

তারপরই বলে, নে। নে। চল। শীগগির যাই। নাম গাচ থেকি। কুড়াল আর শড়কি যা চালাচ্চিলি তাতে তো বাঘ ফওত এমনিতেই হইয়ে যেত।

লজ্জা পেয়ে হোসেন বলল, বড্ড ভয় ধইরেচেল চাচা!

মতি হাসতি হাসতি বলে, ভয় বলি ভয়!

১৪

কে যেন জেইগে থাকি সারারাত।

আজ কৃষ্ণা দ্বিতীয়া। পনেরো দিন হইয়ে গেচে হোসেন এইসেচে এই সোঁদরবনে কিন্তু ওর মনে হতিচে যেন ও এখানকারই একজন। শুধু এখানকার একজনই নয়, এই কলিমুদ্দি, এরফান, কালু মিঞা, অছিমুদ্দি, নীলমণি সারেং, যোগেন দাস এবং আরও কত অগণ্য হিঁদু মোচলমান মনুষ্যিরই একজন। সারেং মিঞার ভাষায় বলতি গেলে "যূতবদ্দ জানোয়ার"দেরই একজন।

বাঘটা শুয়ে আচে। মানে, তার খুলে-নেওয়া চামড়াটা। কলিমুদ্দি মিঞার ডিঙ্গিতে। পাটাতনের নীচে। বিস্তর লুন তার চামড়ার ভিতরের কাঁচা দিকটাতে ছিইট্যে দেওয়া হইচে কালই। দশটা ডিঙির লুনের র‍্যাশান থেকি। লইলে নাকি চামড়া খারাপ হইয়ে যাবেক।

মুকে মুকে ওই সাংঘাতিক বাঘের কতা আজ সাঁঝেই ডিঙি থেকি নৌকোয়, নৌকো থেকি গোলপাতা-কাটা বড়ো বড়ো মহাজনি নৌকোতে ছইড়্যে গেচে। কাল সকালি কত যে মানুষ এইসে পইড়বে তাদের নিজ নিজ নৌকোতে তার কোনো গোনা-গুনতিই লাই। হোসেনের গেরামের কাচের "জলপিপির জলা"র পাশে, পিরের জঙ্গুলে-দ্বীপে যেমন মদনটাকি পাকি টিইপ্যি মেরে বইস্যে থাইক্যে তেমনই ডিঙিগুলোন টিইপ্পি মেইর্য়ে বইস্যে থাইকবে কাল সকাল হতি না হতি এই জলের সবকানে।

কলিমুদ্দি আর কালুমিঞারাই নে যাবে বাঘের চামড়া আর মাতাটা সজনেখালির ফরেস্ট আপিসে। হাততালি আর মালার কুনোই লোভ লাই এ জীবনে আর সারেং মিঞার। আর কুনোই

"চাওয়া" লাই তার এই জিন্দগিতে। "চাওয়া-পাওয়া" "খাইদ্য-খাদক" সবকিচুরই পেয়োজন শেষ হইয়ে গেচে।

চাওয়া যে লাই; তা লয়। একটা চাওয়া, আখিরের চাওয়া এখনও বাকি আচে। যে চাওয়ার কতা সারেং মিঞা ঘুরে ফিরেই বলে। কিন্তু সিটা ঠিক কোন পেকারের চাওয়া, সিটার কথা হোসেন আন্দাজই করতি পারে শুধু; বুজতি পারে না।

বাঘের গোঁফ আর চর্বি হাতে-হাতেই লোপাট হইয়ে গেচে। কলিমুদ্দি নেচে বাঘের বুকের হাড়। নিজের বুকে মাদুলি কইর‍্যে পইড়্যে থাইকবে সি আজীবন। মানে, জীবন ইকানে যদ্দিন থাকে। তালে নাকি বাঘ কুনো ক্ষেতি করতি পারবে না।

বাঘের চর্বিতে বাত সারে তাই বুড়োরা কাড়াকাড়ি করে নেচে চর্বি। গোঁফহীন বাঘের মুখটাকে কেমন চোর চোর দেকাতেচে। সব মৃত্যুই তো এমনিতেই যথেষ্ট দুঃকের! আর বাঘের মতো জানোয়ারের পক্কে গোঁফগুলোন লোপাট হইয়ে যাওয়ায়, সেই দুঃকে অপমানও নেইগেচে।

অন্ধকার রাত। ঘোর অন্ধকার। অগুনতি তারা জলের উপরে তাদিগের মুক দেকতিচে। সামান্য হাওয়া বইতিচে একটো। তাইতে ভরা জোয়ারের জলের উপর তারাদের নীল-সবুজ ছায়া কাঁইপ্যে কাঁইপ্যে উটতিচে। গোসাপের শব্দ হতিচে আজ রাতেও। ফটা-ফট ফটা-ফট। কে জানে! ইটা কি, যে সাপটাকি কাল বাঘে ধইর‍্যে খেইল তারই জোড়াটা?

হরিণ ডাকতিচে মাঝে-মদ্দি। কিন্তু আর কোনোই আওয়াজ লাই; খালের উইপারে একজোড়া হট্রিটি পাকি হট্রিটি-হুট হট্রিটি-হুট করি লাপায়ে লাপায়ে ডাকতিচে। কে জানে, কোন ভয়ালকে দেইকেচে তারা!

জলির তলার মদ্দি অনাদিকাল থেকি, এই আদর্শ ভয়ংকর বনের মদ্দি, যুগ যুগ ধইর‍্যে শিষখালে শিষখালে পুঁইত্যে রাখা, মলিন হইয়ে যাওয়া, ছিঁইড়্যে যাওয়া, অগণ্য ঝামটি পতপতানির মদ্দি এই সুনসান রাতে দীর্ঘশ্বাস ফিশফিশ করে। কত শত এরফানের, কত শত এরফানের অল্পবয়সি বিবির, তাদের বাল-বাচ্চার, তাদের বিধবা আম্মীদের দীর্ঘশ্বাস ছড়ায়ে আচে এই অমাবস্যার অন্ধকারে। খুদাহ্‌ই জানেন।

অন্ধকারে ধানিঘাসের বনের মদ্দি হরিণের দল এইস্যি দাঁড়ায়। হাওয়ায় সে বনে আলোড়ন ওট্যে। হরিণের দল বুজি বাঘের গন্দ পেইয়ে শিষখালের মদ্দি কুমির-কামটে তাড়া-করা পার্শে মাছের ঝাঁকেরই মতো ছিনিমিনি হইয়ে টুকরো হইয়ে ভেঙি যেতি যেতি দলছুট হতিচে।

হাঃ হাঃ হাঃ কইরে বনের মদ্দি যেন কোন ভয়াল হেইস্যে উইটেই থেমি যেতিচে পরক্কনেই দয়াল হইয়ে। রাজা পোতাপাদিত্যের কুনো পোর্তুগিজ জলদস্যুর প্রেতাত্মা? কে বইলবে?

ইসব এরফানই তারে বইলেচেল।

এও হইলেচেল যে, মাঝে মাঝে মেয়েচেলের পেচণ্ড ভয়-পাওয়া চিৎকারও ভেইস্যি এইস্যি রাতের নিস্তব্দতা খান খান করি দেয়। তকন কুনো কুনো মাঝি, পাশ ফিইর‍্যি শুয়ি, টোঙের মদ্দি চক্ষু মুইদ্যে বনবিবির মইন্ত্র আউড়াতি শুরু করে ঘুমেরই মদ্দি।

একন জোয়ারের সময়। কলরোলে জল চলতিচে নিজের সঙ্গি নিজে কতা ক'তি ক'তি। কুলকুল শব্দ হতিচে নৌকোর খোলে। এই আওয়াজই মাঝিদের ঘুমপাড়ানি গান। আবার ভাঁটির সময়ে সরসর খড়খড় হইরো কাঠ-কুটো পাতা-পুতো-ফুল, ডিঙির খোলে ঘষটানি দেতি দেতি সমুদ্দুরের দিকে ভেইসি যেতি ধইরবে।

তকন আবার অইন্য গান।

রাতে আজ রান্না কইরেচেল সারেং মিঞাই। মসুর ডালের খিচুড়ি আর আলু ভাজা। সঙ্গে কাঁচা প্যাঁজ আর শুকনো লংকা ভাজাও চেল। বড়ো ভালো খেইচেল হোসেন। সারেং-এর রান্নার হাতই আলাদা।

খাওয়া-দাওয়ার পর অন্য সব ডিঙিতে একনও পুটুর-পাটর কতা চালাচালি হতিচে আর সেই মদনপুরের চিংড়ি-ছোঁড়া তার সেই মাউথঅর্গান না কী যেন আজও জোরে এবং বেসুরে বাজাতিচে। কেউ আজ তারে মানা করে লাই। আজ সক্কলের মনিই আনন্দ। এই বাঘটা যদি সেই বাঘ হয়, তবে বেশ কিছুদিনের জন্যি হয়তো নিশ্চিন্তি।

তবে বয়স্ক অভিজ্ঞ মানুষেরা কতিচে, আনন্দ আর কদিনের! ফরেস্টডিপার্ট যাই বলুক না কেন, সোঁদরবনের সব বাঘই মানুষখেকো!

একটা ছোট্ট ঘুম দে উইট্যা পইড়েচে সারেং মিঞা। ঘুটঘুট্যে অন্ধকারের মদ্দি তারার চাঁদোয়ার নীচে বসি তামাক খেতিচে।

আকাশভরা তারা, জল আর সারেং মিঞা সব যেন একাকার হইয়ে গেচে।

খাম্বীরা তামাক শেষ হইয়ে গেচে। এখন সি তার নিজের তামাকই খেতিচে।

টিকের আগুনটা টেমির আগুনেরই মতো অন্ধকারে কুমিরের চোকেরই মতো লালচে দেকাতিচে।

দুবার গলাটা খাঁকড়ে নে' সারেং মিঞা বইলল, কী কইরবি তুই হোসেন?

কী ঠিক করলি?

কিসের কি?

কেমন লাগতিচে তোর এই জীবন? এই লোকজন? অনেকগুলোন দিন তো কাটায়ে দেলি দেখতি দেখতি। এবার আমারও যাবার সময় হইয়ে এল। আমার সঙ্গি যাবার টাইম তোর হয়নি এখনো। হলি, আমি নিজেই এইসি তোরে নে' যাব।

সঙ্গি নে' যাবে বলি ঘর ছেইড়ো এনু আর একন বলতিচ, নে যাবেনি। বাঃ। তা কেন! আমাকে নে চলো। তুমি কুন দিকে যেতিছ চাচা? কিসের খোঁজি যেতিচ?

হোসেন বলল। আগে তো কতবারই বইলেচি। আমি নিজের দিকে যেতেচি। বাইরে থেকি ভেতরপানে। অন্ধকার থেকি আলোয়।

কি খুঁজতে যেতিচ তুমি চাচা?

আমি আমাকেই খুঁজতে যেইতেচি।

আবারও সেই হেঁয়ালি তোমার।

জীবনটাই হেঁয়ালি রে হোসেন। সত্যিই বলতিচি। বড়ো নদীর উপরে শীতের ভোরের কুয়াশার মতোন এই জীবন। চেনা যায় না কিছুই। দেকা যায় না। সাদা রঙ নীল হইয়ে যায় আর নীল, সবুজ। সব জানা জিনিসই অজানা হইয়ে যায়, চেনা জিনিস অচেনা।

জীবনও এক হেঁয়ালি।

তুমি কি পাইরবে চাচা একা একা ওই কুয়াশা কাটাতি? এই হেঁয়ালির শেষ দেকতি?

আমি নিজেই তো হেঁয়ালি রে। হেঁয়ালি দিয়েই হেঁয়ালি কাটতি পাইরব হয়তো ইকদিন। কে বলতি পারে? ইনশাল্লা!

তুমার মাথাতি কোনো গোলমাল হয়নি তো চাচা? ওই এত মনুষ্যি আচে, সকলিই তো যে যার কাজ নে' ইকানি এসিচে, তা তুমিই একা একা। অদ্ভুত একষেঁড়ে মানুষ।

আমি যে সকলের মতো লই রে হোসেন মিঞা। আমি যে আমারই মতো। শুধু আমারই মতো। যাদেরই করার মতন কিছু থাকে এ জীবনে তারা সকলেই যে একাই! ওই একা হয়ি যাওয়াটাই আল্লার অভিশাপ, আবার ইটাই আশীর্বাদ।

তালে তুমি বরং ভালো কইর্যে ঘুইম্যে লাও কটা দিন। আমিই রেঁইধ্যে বেইড়ে তুমাকে খাওয়াব, পা টিপি দেব। তামাক সেজি দেব। তুমি ঘুমোও। দিন-পর-দিন কেবলই ঘুইম্যে থাকো। কোনো রাতেই তো তুমি ভালো করি ঘুমোও না। এত কম ঘুমালি কি চলে চাচা?

কুনো মনুষ্যিরই বেশি ঘুমুনোটা উচিত কম্ম লয় রে বাজান। এত ঘুমই যদি ঘুমুতে হবেক তো মনুষ্যি হইয়ে জন্মানো কেন?

তাইলে চলো ফিইর‍্যে তোমাকে গোসাবার হাসপাতালে ভর্তি কইর‍্যে দি।

তাতে কি হবে? হাসপাতালে?

তোমার মাতাটা এট্টু বিশ্রাম পেইয়ে যাবে। এই যি, সারাটা ক্ষণ তুমি ভাবতিচ, আর ভাবতিচ, উলটো-পুলটো সিদ্ধান্ত নিতিচ, এমন করলি তো পাগলই হই যেবে তুমি।

সারেং মিঞা তামাক খেতি খেতি হাসল।

সিটা তামাকেরই ভুরুত না হাসির ভুরুত তা স্পষ্ট বোঝা গেলোনি অন্ধকারে।

তারপর বলল, জনাব, মনুষ্যি হইয়ে জন্মানো মানেই পাগল হইয়েই জন্মানো। তুমি ভাইবতেচ, হাসপাতালের শয্যাতি শুয়ে থাকলিই ভাবনাচিন্তা সব সইঙ্গে-সইঙ্গেই থেইম্যি যাবে? মনুষ্যির মগজ হতিচে কারখানার ফারনেসের মতন। যেই একবার পরিণত হইয়ে উটল, অমনি আগুন জ্বলতি শুরু কইরল তার মস্তিষ্কে। একদিনের জন্যি, একঘণ্টার জন্যিও সি আগুন নিবোনো যাবে না কুনোমতেই। সি আগুন যেদিন নিবল তো মনুষ্যিও চোখ মুইদল। মনুষ্যি হইয়ে এই দুনিয়ায় আইসবে আর চিন্তা-ভাবনার হাত থেকি বেঁইচে যাবে; সিটা কি কুনো কথা হল বাজান?

হোসেন বলল, চাচা, এই মনুষ্যিগুলোনের দুঃখ দেইক্যে, ইদের সাহস দেইক্যে আমারও খুব ইচ্চে হতিচে যে, আমি এদেরই একজন হইয়ে যাই। উদের দুঃকের বোঝ ওটাই।

বাঃ বাঃ। ইতো ফাসকিলাস কতা। তবে ই কতাটাও মনি রেইক্যো যে এদির শুধু দুঃকই নেই; আনন্দও কিচু আচে। আর সি কারণেই এরা মানুষ হিসেবে এত বড়ো। কারু কাচে না কেইন্দে নিজেদের দুঃক্কুর বোঝ যে নিজেরাই উইট্যে আইসতিচে যুগ যুগ ধইর‍্যে এইটিই ইদের মনুষ্যত্বের সবচেয়ে বড়ো দিক হোসেন। এই দুঃকের মদ্দি মস্ত গর্ব রইয়েচে; মস্ত সুখও। লইলে কি এত বচর ধইর‍্যে এত দুঃক ওরা বইতি পারত!

আমার কেবলই ইচ্চে করতিচে, কালকের ঘটনার পর, মানে এরফানের ইন্তেকালের পরই যে, আমিও খুব সাহসের কাজ করি এট্টা তুমারই মতো চাচা। তুমি যেমন করি বাঘটারে মাইরলে, সারা সোঁদরবনের জেলে-মউলে-বাউলেরা যে জন্যি আজ তুমার নামে জয়ধ্বনি দিতিচে তার চেয়েও বেশি কুনো সাহসের কাজ কইর‍্যে দেকিয়ে দি সক্কলকে যে, আম্মো পারি। সবাই যেন বলে, সারেং মিঞার সাঙাতও ফালতু লয় হে!

উস্তাদকা চেলা
সিপাহিকো ঘোড়া
কুচ নেহিতো
থোড়া থোড়া।

এই কথা শুনি হঠাৎ সারেং মিঞা তামাক খাওয়া বন্দ রেইকে বইলল, আমি যে কাজ কইরলাম সিটা কুনো সাহসের কাজই লয়। সোঁদরবনে একশো বাউলে আচে, যারা এমন বাঘ আকছার মেইর‍্যে আসতিচে যুগযুগান্তর ধরি। তুমি যদি আমার ঠেঙেও বড়ো সাহসের কাজ কইর্তি চাও তো তুমাকে এট্টা কাজের কতা বলি। কিন্তু তোমার সাহস কি হবেক? হোসেন মিঞা?

একবার বইল্যেই দেকো না!

হোসেন বলল।

তুমি কলিমুদ্দি মিঞার দলে ঢুইক্যে এরফানের জায়গাটা লিয়ে লাও।

হোসেন একটুখানি ভেইবে নিল। বলল, তাপ্পর?

তাপ্পর, ওদের বহরের সঙ্গে এরফঅনের গাঁয়েই ফিইর‍্যি বাও।

আরও একটু ভেবে নিয়ে হোসেন আবারও বলল, তাপ্পর?

তাপ্পর এরফানের বিবিরে নিকাহ্ করো। সঙ্গে সঙ্গেই লয়। এরফানের শোক বিচারিকে ভুইল্যে যেতি দিতে হবেক। তবে গরিবের শোক করার ওয়াক্ত কুথায়? তাছাড়া, আল্লাই শোক দেন, আল্লাই ভুইল্যে দেন। এরফানের বুনের শাদি দাও। তারপর এরফানের বিবিরে তুমার বিবি কইরে নে তার বাচ্চা দুটোরে আব্বার দুলহার পেয়ার দাও। তার বিবিরে মরদের পেয়ার দাও। খুদাতাল্লার দোয়ায় তার আর তুমারও বাচ্চা হোক একটো দুটো।

আমার মা, আমার বাবা, আমার বুন দাদা ভায়েরা?

হোসেন উদ্বিগ্ন হয়ে বইলল।

খুদাহ্র দুনিয়াতে সকলেই সকলের ভাই বুন হোসেন। এই রিস্তাই হতিচে আসল রিস্তা। বিধবা-পল্লীর বিধবারা যে চিরটাকাল বেওয়াই থেক্যি যাবে যুগ-যুগান্ত ধরি, ই ভাবনাটাই আমাকে বড়োই দুক্কু দেয়। তুমি যদি ই কাজটা কইর‍্যে দেকাতি পারো তবে ই মনুষ্যিগুলানের সবচি বড়ো উপগার হতি পারে। তুমি পথ যদি ইকবার দেইক্যে দেতি পারো, তবে এরফানের মতো হাজার জওয়ান মইরবার সময়ে শান্তিতে মইরতি পারবেক।

তারপরে একটু চুপ করে থেকি বলল, শোনো হোসেন! আমি কলিমুদ্দির ঠেঙে সব খপর নেচি। এরফান আর তোর বয়স প্রায় একই। এরফান-এর বিবির নাম ফতিমা। ভারী সুন্দরী কন্যে। শান্ত স্বভাবের। ঘর-গৃহস্তির কাজেও খুবই ভালো। সি তুমারে অনেক পেয়ার দিবে। তারে তুমি এই সাহায্যটুকু যদি দেতি পারো তো জাইনবে একশোটা মানুষখেকো বাঘ মারার সমান হইবে সি কাজ।

একটু থেমি বলল সারেং মিঞা, তুমি কি মনে কইরলে বাঘটা আমি ব্যারিস্টার সায়েবের খয়রাতি-করা বিলিতি বন্দুক দে মেইরেচি বইলেই আমি বেশি সাহসী? যে মনুষ্যিরা খালি-হাতে, খালি-গায়ে দিনে-রাতে এমন গোনা-গুনতিহীন বাঘের, কুমিরের, সুদখোরের, মহাজনের, ফরেস্ট-ডিপার্টের মোকাবিলা রোজ করতিচে কাঠ কাইটতে যেইয়ে, মধু পাড়তি যেইয়ে, মাছ ধরতি যেইয়ে, তাদের সাহস আমার চেয়ে কিচু কম? ভুল। মইস্তো বড়ো ভুল।

সারেং মিঞা হঠাৎ চুপ কইরে গেল।

হোসেনও চুপ কইর‍্যে ভাবতেচেল।

সারেং আবার বলল, এই দেশে যারা বরফ-ঢাকা পাহাড়ে উটতিচে, যারা ফুটবল খেলার মাঠে গোল দিতিচে, যারা যুদ্ধে দুশমনকে টিট করতিচে শুধু তাদেরই ফোটোক ছাপা হয় আখবারে। দেশ-সুদ্ধু লোকে 'আহা! আহাঃ' করে, শুধু তাদেরই মালা পরায়। আর যে হারামজাদা নেতাগুলোন পেতিদিন মিথ্যের বেসাতি কইর‍্যে, লোক ঠকায়ে, নিজের পকেট ভারী কইরতেচে, তাদেরই ছবি নাকি রোজই দেকানো হয় টি.ভিতে। রেডিয়োতে সেই কামিনাদেরই গলার আওয়াজ মানুষখেকো বাঘের আওয়াজেরই মতো গমগম করে। ফরেস্ট-ডিপার্টের আমলাদের ফোটোকও ছাপা হয়। যারা ই মনুষ্যিদের কাচ থেকি চিরদিন ভয় দেখায়ে মাচ, মধু, কচ্ছপের ডিম, হরিণের মাংস, কেইড়্যে খেয়ি এল তাদেরই বড়ো-সায়েবেরা ইঞ্জিরিতে সোঁদরবনের সব বাঘ এখন নেতাদেরই মতন ভদ্র-সভ্য হইয়ে উটেচে। বাঘে আর মানুষ নেয় না সেকানে। কোন টি.ভি.-ওয়ালা রেডিয়ো-ওয়ালার দল আইসবে ইকানে আসল ঘটনা জাইনতে? তাদের আসতিই দেয়া হবে না।

আর যে মনুষ্যিরা খালি গায়ে, ধুতি-লুঙি কোমরে জড়ায়ে কাঁধে একখান গামছা ফেইল্যে নে, শুধু দুবেলা দুমুঠো খেতি পাবে এই পেত্যাশাতে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, বচরের পর বচর নিজেদের জীবন পেতিমুহূর্তে তুচ্ছ কইর‍্যে এই সোঁদরবনের গভীরে পেরান দিতিচে তাদের কথা কেউই বলে না, নেকে তো নাই! হয়তো জানেও না।

তারা তো বীর লয়! তুই তাদেরই একজন হইয়ে উটতি যদি পারতিস তো জানতি জিন্দগিতে হওয়ার মতো কিছু এট্টা হলি। ইনসানিয়াতের চেয়ে বড়ো কিসিম আর কী থাকতি পারে। সহজ-সুখী জীবনে সুখ থাকতি পারে কিন্তু সেই ভাতে হিম্মত-এর গন্ধ লাই হে বাজান। ঘামের গন্দ পেরায় পেরায় ভাতেই কম-বেশি থেকেই যায় হয়তো কিন্তু রক্তের গন্দ সব ভাতে থাকে না। তা খুব কম ভাতেই থাকে।

হোসেন চুপ করে রইল।

সারেং মিঞা বলল, যে গেরামে সি একজন আদম প্যয়দা হল, যে ঘরে সি বড়ো হইয়ে উটল, সে আব্বা-আম্মীর কোলে সে দুলহার-পেয়ার পেইল, সি তো পরোপুরি তার বিনা-চিষ্টাতেই পাওয়া। রাজা পোতাপাদিত্য, মগ, পোর্তুগিজ, ইংরেজ, এরা যে সোঁদরবনে রাজত্ব কইর‍্যে গেইলেন তা কি নিজের বাড়ির বাকুলে বইস্যে কইরলেন? না, নিজের মাগের কোলে শুয়ে? যে মর্দ, সারা দুনিয়াই যে তার খেলার মাঠ! দুনিয়ার সব ফসলেই তার অধিকার। দুনিয়ার সব আওরত-এর উপরেই তার দাবি। তোর গেরামের ন্যাকা-খোকা না হইয়ে থেকি মরদের বাচ্চা হইয়ে ইদের ইকজন হইয়ে যা হোসেন। যেমন হতি চেইতেছিস। খুদাহ তোরে দোয়া দিবেন। পরবরদিগারের দোয়াও থাইকবে তোর উপর।

তারপর একটু চুপ করে গিয়ে, দু-টান তামাক খেইয়ে নে আবার বলল, আজ তোর সারেং চাচারে কতায় পেইয়েচে রে। ভাত তো সব মনুষ্যিই খায়, নিজের সংসার তো সব উজবুকেই চাইল্যে নেয়, যে মানুষ অন্য দশজনের বোঝাও উটোতে পারে সেই না ইনসান-এর মতো ইনসান! সেই তো খিদমতগার খুদাবন্দ-এর।

হোসেন তবুও চুপ কইর‍্যে রইল।

সারেং বলল, কি হল? ফয়সালা কি কইরলে তাই বলো।

থাইকব।

হোসেন বলল।

শব্দটা তার মুখ থেকি ছিটকে বেইরোল।

আয় বাজান। আমার কাছে আয়!

বলেই, হোসেনকে তার বুকে টেনে নিয়ে সারেং মিঞা তার চুল এলোমেলো করে দিয়ে, তারে পেয়ার কইর‍্যে দিল।

তারপর বইলল, কাল আমি কলিমুদ্দিকে সকালেই ডেইক্যে বইলব। তুইও যাবি ওর সঙ্গি বাঘ নে ফরেস্ট আপিসে হোসেন। খাঁচার পাখিকে আমি দাঁড়ে বইস্যে নে' এতদিন সইঙ্গে সইঙ্গে রেইক্যে দানা দেছিলাম। কাল থেকে তুই নিজের দাবিতেই বেঁইচে থাকবি। খাঁচার পাকিকে বনের পাকি কইর‍্যে দিলম আমি।

এরপর সারেং মিঞা নিভে যাওয়া হুঁকোটাকে নতুন কইর‍্যে ধরায়ে নেল।

তামাকের ভুরুত-ভুরুত শব্দের সঙ্গি সঙ্গি, হোসেনের মনি হল সারেং মিঞার গলা থেকি অন্য কারো স্বর যেন ভেইসি আসতিচে।

দু টান মেইর‍্যে সারেং বলল, তোকে একটা কুড়াল আর একটা শড়কি দে যাব আমি। শড়কিটার ভান্ডাটাকে ছোটো কইর‍্যে নিতে হবেক। আর শুনে রাক, জেনে রাক কোরানের বাক্যির মতন, হাতেও শড়কি ছুঁইড়্যে ফেইলবি না সোঁদরবনে কক্‌কনো সেদিন যেমন কলিমুদ্দি কইরেচেল। শক্ত করি ধইরে থাকবি শেষ মুহূর্ত পয্যন্ত। বাঘ তোকেই নিতে আসুক, কী অন্যকেই, তার ঘাড়ের মদ্দি বা বুকের মদ্দি বা মুখের মদ্দি ফলাটারে পুরো ঢুইক্যে দেই সারা শরীলটার ওজন দে' তার উপর উইট্যে দাঁড়াবি। শড়কি পুরো ঢুইক্যে যাবার পর এক লাপে সে জাগা ছেইড়ে সইর‍্যে যাবি। কী,

গাচে উট্যে পড়বি। সড়কিতে-গাঁথা বাঘ নিজেই সইরে যাবে। তবে খুব সাবধানে নামবি গাচ থেকি। পেয়োজন হলি সারারাতও গাচে থেইক্যে যাবি।

হোসেন বলল, হুঁ।

লেঃ। টঙির মদ্দি ঢুইক্যে শুইয়ে বড়ো এবার। আমার মস্ত চিন্তা গেল একটা। ওরা যে কত খুশি হবে, তা নিজেই দেইকবি।

১৫

পরদিন আলো ফোটার সঙ্গি সঙ্গি কলিমুদ্দিকে ডেইকো সারেং মিঞা খপরটা দিল।

হই-হই পইড়্যে গেল সব ডিঙিতে। সব নৌকোয়। যি-সব ডিঙি ও নৌকো বাঘ দেকতি আসতিচেল, তাদের কাচেও খপরটা পৌঁচে গেল। হোসেন যেন বাঘের চেয়িও বড়ো খপর! এমনই ভাব সকলের।

সবাই হোসেনের দিকে আঙুল তুইল্যে বইলতে লাইগল, এই সেই!

কলিমুদ্দি তার নাম দে দিল নতুন—হোসে-ফান! তা নামের মানে কিচু হল্য না হল্য তা নে মাতা ঘামাতি যায় কে?

তারপর তারে কাইচে টেনে কানে কানে বইলল, কলিমুদ্দি : এরফানের বিবি ফতিমা এরফানের চেয়েও ঢের বেশি ফরসা আর হুরীর মতোই সুন্দরী। তুই আমার বহরের লতুন ব্যাটা হইয়ে এলি। লতুল সৈন্য। লতুল লড়াই। খুদাহ্‌র দোয়ায় তোর ভালোই হবেক। সব দিক দে খুশি হবি তুই। তবে, সময়কে সময় দিতে হবে।

রেঞ্জ-অফিস থেকি ফিরতি-ফিরতি বিকেল শেষ হইয়্যে গেল। চেষ্টা কইরেচেল জোয়ারে যেয়ে ভাটিতে ফেরার, তবু, পতও তো কম লয়। ওরা নৌকো বা ডিঙি নে যায়নি। আট-দাঁড়িতে বাওয়া ছিপ নৌকো নে গেচিল একখান। তবুও সারাদিন লেইগ্যে গেল। যেছিল অবশ্য আলো ফোটার পর-পরই।

রেঞ্জার সাহেব আরো আটটি টোটা দেচেন সারেং মিঞাকে। আর দেচেন কিছুটা "খাম্বীরা" তামাক। খবর পাঠানো হইয়েচে কইলকেতায় যে, চামটার কুখ্যাত মানুষখেকোর ইন্তেকাল হইয়েচে।

মেঘ কইরে এইসেচে আজ। অসময়ের মেঘ। ঝামটি পোঁতা নেই এমন এক শিষ-খালের মুকে ওরা এবং আরও তিনচারটো বহর রাতের মতো ডিঙি বাঁধল। নৌকোগুলোন নোঙর করি ভালো করি টেইনে দেকে নিতে হয় বারবার কইরে, পাচে নোঙর জোয়ারে হেঁটি চইল্যে যায়। নোঙর করার পরেও অবশ্য নদী পারের কোনো মোটা গাচের সঙ্গে দড়ি দে' বেঁধে রাখতি হয় নৌকো। "ডবল-সেফটি"। কলিমুদ্দি বলে।

আজ সারেং মিঞাকে রান্না করতি দেয়নি অন্যেরা। কাঁকড়ার ঝোল রেঁইধেচিল কলিমুদ্দিরা ঠেঁইসি লংকা-প্যাঁজ-রসুন দে। খাওয়া হইয়ে গেচে, একন সকলেই শোবার তাল করতিচে। কাল

থেকি একটু নিশ্চিন্তে যার যার কাজে লাগতি পারবে আবার। আবার নতুন করি পুজো হবে বনবিবির, বাবা দক্ষিণ রায়ের; বড়খাঁ গাজির। কবুতর ছেইড়ো দিবে বনে, মুরগি জবাই হবে। দেয়াসীরা আবার মন্ত্র পড়বে নতুন করে তাদের বিশ্বাসে ভর কইরে।

কিন্তু আবারও সম্পূর্ণই নিজ নিজ নসিব আর খুদাহ্‌র দোয়ার উপর ভরসা কইর়্যেই গরান ফুলের মধু খেইয়ে যেই মৌমাচি উড়বে অমনি আবারও কোঁচড় ভইরে ফরেস্ট ডিপার্টের আছাড়ি-পটকা নে মউলেরা অদৃশ্য বাঘের হাঁ-করা মুখের দিকে পায়ে পায়ে এইগ্যে যাবে। অমোঘ প্রতিকারহীন মৃত্যুর দিকে। ভাতের স্বাদ বড়ো মিষ্টি। বিবির ডাগর চোখ আর দুটি ডাল-ভাতের পেত্যাশা, কচিকাঁচাগুলোনের রিনরিনে গলার স্বর কানে আর চোখে ভাসবে তখন ওদের। চিরন্তন পুরুষ মানুষের মতন তার বিবি-বাচ্চার ভালোর জন্যে নিশ্চিত-মৃত্যু উপেক্ষা করেও তারা পায়ে পায়ে এগোবে মৌচাকের দিকে।

আবারও যম তাদের পিচু নেবে। পিচু নেবে ইন্তেকালের ছায়া।

কাঠুরেও আবার করাত বা কুড়ুল নিয়ে নামবে ডাঙায়। তার বা তাদের করাত-চালানোর বা কুড়ুল-ফেলার শব্দের তালে তালে ডোরাকাটা করাল-মৃত্যু পা ফেলে ফেলে নিঃশব্দে এগিয়ে আসবে ওদের পেচন দিক দিয়ে চুপি-সাড়ে। যাতে, কাচে এইসি কোণাকুণি ঝাঁপিয়ে পড়তি পারে ঘাড়ে।

জেলেরা, এরফান-এরই মতন, আবারও শিষখালে মাচ-ধরবে। চকিত চমকে রোদ ঝকমক জলের মধ্যে চমকে ওঠা মাচরাঙা, হিরে-ছিটিয়ে দ্রুত-পাখায়, দ্রুত-বলা কতায় সকালের জলজ প্রকৃতিকে মুখর কইর়্যে দেবে। নিস্তব্ধ দুপুরে আবারও জোয়ারি পাকি ডাইকবে পুত-পুত-পুত-পুত করে। কোমর-ঝোঁকানো উবুহওয়া একজনকে দেকতি পেলিই বাঘ আবারও ঝাঁপিয়ে পড়বে তার উপরে।

ফরেস্ট-ডিপার্টের পিটেল-বোট আসবে আবারও। ঋতুভেদে মধুটা, মাছটা, কাঁকড়াটা, কাছিমের ডিমটা যা পাবে তাই নিয়ে যাবে। লোক-দেখানো ধমক-ধামক দেবে নিজেদের বিবেক এবং নিজেদের ক্ষমতার জানান দিয়ে। তারপর বিড়িটা, তামাকটাও নিয়ে পুট-পুট-পুট-পুট আওয়াজ করে সাদা পিটেল-বোটে করে জলে ঢেউ তুলে চলে যাবে আরও বহুযুগ ধরে এদেশীয় সরকারি কার্যকলাপের পরম পরাকাষ্ঠা দেকিয়ে।

এমনি করেই কাটবে, একটি, একটি, একটি করে এদের সাংঘাতিক মৃত্যুর করাল ছায়ায় কালো-করা দিন। তবুও এরা হাসবে, গান গাইবে, বাঁশি বাজাবে, স্বপ্ন দেখবে ভবিষ্যতের, তামাক খেতি খেতি। মিষ্টি ভাতের গন্ধে তাদের দু-নাক ভরি যাবে। তাদের গ্রামের রান্নাঘরে, হাঁড়িতে-ফোটা ভাতের মধ্যের এক-একটি ঘরের সুখছবি, অন্ধকার আকাশে তারার মতন ফুটে উঠবে বলিরেখাময় কপালের রোদে-জলে পোড়া প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের মুখে।

একটি একটি করে।

কৃষ্ণা-দ্বিতীয়ার আকাশের তারার মতন।

স্বপ্নটাই জীবন না জীবনটাই স্বপ্ন, ঠাহর করতে পারা যাবে না আর।

স্বপ্ন আর দুঃস্বপ্নের মধ্যে ফাঁক থাকবে না কুনো।

সারেং মিঞা তামাক খাচ্চিল। তার "খাম্বীরা" তামাকের সুগন্ধ অন্ধকার নদীর উপরে ভেসে যাচ্ছিল জল আর ওই জোয়ার-ভাটার বনের মিশ্র গন্দের সঙ্গে। কুমির শব্দ করচিল। পাশ-খালে। বড়ো ভেটকি মাছে মাঝে মাঝে ঘাই মেরে জল চলকে গুবুত-গাবুত আওয়াজ করে অন্ধকার সুন্দরবনের রাতের অপার্থিব নিস্তব্ধতা ভেনে ভেনে দেতিচেল।

এরা সবাই ঘুমোলেই সারেং মিঞা ডিঙি খুলে নে' পাইলে যাবে আজ।

হোসেন তার জিনিসপত্র নে' খাওয়া-দাওয়ার আগেই কলিমুদ্দিদের বহরে গিয়ে উইটেচে! যোগেন দাস যে এসে এইকানেই ভিড়েচে এবং বাকি দিনগুলোন সঙ্গে সঙ্গেই থাকবে একথা জেনে ভালো লাগচিল সারেং-এর। যোগেন নিজেও ভালো শিকারি এবং ওর কাছেও বে-পাশি বন্দুক আছে। তবে মুঙ্গেরি গাদা-বন্দুক। একনলা। ইদিকার মানুষের বিশ্বাস একনলা বন্দুকেই নাকি ভালো নিরিখ হয়।

শিকারি ও বন্দুক সারেং মিঞা অনেকই দেকেচে। সে জানে যে, কতাটা ভুল।

পুবের আকাশে কালো মেঘ জমেছে। এমন রাতেও সেই কালো আকাশের কোণে কালোতর মেঘকে বোঝা যাচ্চে। পুব-দিগন্তে তারারা মরে গেচে কিচুক্কন আগে। জোলো হাওয়া বইচিল এতক্কন।

কিচুক্কন হল পিঠেম বাতাসও ছেড়েচে একটা। ভালোই হয়েচে। সেই হাওয়ায় ভর করি মাঝরাতের ভাটির টানে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাবে সারেং মিঞা। ছোটো-বালি, বড়ো-বালি, ভাঙাডুনি, লোথিয়ান, মায়া দ্বীপ। আরও কত শর্ষে-দানার মতো দ্বীপ আছে, বড়ো ম্যাপে সে সবের কোনো হিসেব থাকে না। কত মগ দস্যুরা, পোর্তুগিজ, ইংরেজ, দিশি রাজাদের বহর সিখানে নোঙর করেচে বচরের পর বচর। মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে এই সব দ্বীপে অত্যাচার করচে তারা, পরে চালান দিয়েচে ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণের বন্দরে। পশ্চিম দেশে।

কত ভাঙা দেউল আছে, প্রাসাদ, তোষাখানা, কুবেরের ধন এই সোঁদরবনের বনের আর বাদার অন্দরে, গভীরে তার হিসেব কেউ নেয়নি আজও। বড়ো বড়ো কালকেউটে আর শঙ্খচূড়ের পাহারাতে। ভাঙা মসজিদ আছে, যেখানে খুদাহ্ থাকেন নিরিবিলিতে। খুদাহ্ অবশ্য সব জায়গাতেই থাকেন। এমন কোন জায়গা আছে দুনিয়াতে যেখানে খুদাহ্ থাকেন না? থাকেন সর্বত্রই। তবে তাঁকে দেখে নেওয়ার চোখ চাই। অনুভব করার মন চাই।

নাঃ। অনেকই দিন গৃহী মানুষদের সঙ্গে,—বিবি-বাল-বাচ্চার অথবা বিবি-বাল-বাচ্চা একদিন হবে, এই স্বপ্ন বুকে করে বেঁচে-থাকা; ফুটন্ত-মিষ্টি-ভাতের গন্ধের স্বপ্নে, মশুর-ডালে শুকনো লংকা কালোজিরে ফোড়ন দেওয়ার গন্ধের স্বপ্নে; বিবির সোহাগের স্বপ্নে বুঁদ হয়ে থেকে দুর্জয় সাহস আর দুর্মর স্বপ্নদেখা মানুষদের মধ্যে কাটানো হল।

এবার সে যাবে। সারেং মিঞা যাবে এবার।

মস্ত একটা কুমির আছে বড়োবালির মোহানাতে। তার বয়স সারেং মিঞার বয়সেরই মতো হবে। তবে, তাকে যদি কোনো শিকারি গুলি করে না মারে অথবা কোনো দুর্দান্ত বাঘের সঙ্গে শিকার অথবা জলের দাবি নিয়ে বেঁধে-যাওয়া হটাৎ-হটাৎ যুদ্ধে সে ফওত্ যদি না হয়ে যায় তবে সারেং মিঞার ইন্তেকাল-এর অনেক দিন পর অব্দিও সে বেঁচে থাকবে।

সেই কুমিরটার সঙ্গে অনেক কথা হয় সারেং মিঞার। মেঘ করে আসে যখন, বৃষ্টির আগে আগে, সেই কুমির যখন জলের ঠিক নিচে ভেসে ওঠে, তার কালো, দীর্ঘ শরীরের আভাস যকন জলের উপরে পড়া মেঘের কালো ছায়ার সঙ্গে মিলে যায় নড়েচড়ে তখন সারেং মিঞা তার সঙ্গে আবারও কথা বলবে। প্রতি বচরই বলে কথা। না-বলে।

কিন্তু কুমির বা বাঘ অথবা মানুষদের মধ্যে বোকা বা শুধুই টাকা-চাওয়া সামাজিক মানুষদের, কীড়ে-মাকড়ের মতো অগণ্য মানুষের "পালের গোদা" হতে-চাওয়া মানুষের সঙ্গে কথা বেশি বলা যায় না। তাদের সমস্ত জীবনই একটি বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ। এক জ্বলন্ত আগুনের বৃত্তের মধ্যে ওদের সকলেরই বাস। মুক্তির উপায় নেই ওদের কারোই। শুদ্ধির উপায়ও নেই। বৃত্তের বাইরে বেরুবার উপায় নেই। হয়তো তেমন কোনো ইচ্ছাও নেই বেরুবার তাদের, কারণ তারা জানেই না যে তারা বৃত্তবাসী।

কুমির কিংবা বাঁদর কিংবা স্যালামান্ডার মাছ এদের কারো সঙ্গেই বেশি কথা বলার নেই সারেঙের। কেমন আছো? ভালো আছি। কী খেলে? কী পরলে? কোন পুরস্কার পেলে? দিশি না বিদিশি?

কী করে পুরস্কার পেলে তা শুধোনো যায় না কুমির কিংবা পাঁকাল মাছ কিংবা স্যালামান্ডার কিংবা মানুষকেও।

লজ্জাবোধ ওগুলোর নেই কিন্তু খামোকা রেগে যাবে।

কী দরকার! ওরা থাক না ওদেরই মতন!

যারা জানোয়ার নয়, তারা লজ্জা পেয়ে হেসে ফেলে। বাঘ ঘাঁক করে। কুমির শিঁ-শিঁ করে আওয়াজ করে, মাছ ল্যাজের ঝাপটাতে জল চলকে দিয়ে পকাৎ আওয়াজ করে বলে যায়। কিন্তু লজ্জাহীন অথচ ন্যায্য মূল্যে না-কেনা দম্ভে, দাম্ভিক মানুষ রেগে গিয়ে চোখ বড়ো বড়ো করে বলে, তার মানে? কী বলতি চাও হে তুমি সারেং মিঞা?

সারেং মিঞা কিছুই বলতি চায় না। বলেও না। মনে মনে হাসে, অনুকম্পায়।

মনে মনে এদের সবাইকে সে জলের নিস্তরঙ্গ আয়নায় তাদের মুখ দেখতি বলে। তাদের সৎ হতি বলে। খুদাহ্‌র কথা, আখরত্‌-এর দিনের কতা মনে রাখতি বলে আর দোজখ্‌-এর দরজা দিয়ে যখন ঢুকবে, আর ভেতরে ঢোকার পরে যখন দেকবে দোজখ্‌-এর অন্দরী-বাহিরি সব দরজাই বন্ধ, তখন খুদাহ্‌র কথা মনে হবে তোমাদের। মনে হবে কুমিরের, বাঘের এবং মানুষের তো বটেই শুধুই নখে-দাঁতে পেট ভরানো ছাড়া, শুধুই ক্ষুন্নিবৃত্তি ছাড়া, বিবি-বাচ্চারা খিদমতগারি করা ছাড়া, ফন্দি-ফিকির, চেষ্টা-চরিত্তির করে নিজেকে উচ্চাসনে বসানোর হীন চেষ্টা ছাড়াও প্রত্যেকের জীবনে করবার মতো অনেকই জিনিস থাকে। মানুষদের তো বটেই। অনেকই জিনিস।

মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে কোটি কোটি মানুষ সোঁদরবনের ভাটি-দেওয়া কাদায় থিকথিক অগণ্য উভচর স্যালামান্ডারেরই মতো থিক থিক করচে খুদাহ্‌র এই দুনিয়াতে। কিন্তু কেন তারা মানুষ হইয়ে এইসেচেল, একানে মানুষের করণীয় কর্তব্য কি? এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তাদের কারোই নেই। তারা, মানে কুমির কী বাঘ নয়, সেই মানুষেরা, পেরকিতই "উভচর"। অতি অল্প সময়ের জন্যে হলেও এখনও সততার বেলাভূমিতে তাদের বাস, কিন্তু তাদের অধিকাংশ সময়টুকুই অসততার ভাটি-দেওয়া পলিতে পাঁকমাখা ঘিনঘিনে অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকা।

না। ওদের কারো প্রতিই কোনোরকম রাগ বা ঘৃণা বা অন্য কোনো রকম অনুভূতিই নেই সারেং মিঞার। তবে হ্যাঁ, অনুকম্পা আছে। তারা জানে না মানুষের জীবনের মানে।

খুদাহ্‌ যেন তাদের ক্ষমা করে দেন!

তামাক শেষ হল। পিঠেম বাতাসও জোর হল। পুরি মেঘ ভিনদিশি মেয়ের ভিনদিশি উড়াল চুলের গন্ধ বয়ে নে ভেসি আসতিচে রিমিঝিমি।

কখনও কখনও এমন হঠাৎ হঠাৎ আধো-অন্ধকার, গাঢ়-অন্ধকার বা চাঁদের রাতে সারেং মিঞার মনের মধ্যেও একটু রিকিঝিকি যে হয় না তা নয়। হাসে সে, নিজের মনে। পুরো বুড়ো হয়নি এখনও। ভাবে।

পিঠেম হাওয়াটা আরও জোর হল। পাটাতনের উপরে লুঙিটা খুলে রেখে দিয়ে জলটুকু সাঁতরে যেয়ে গর্জন গাছে বাঁধা ডিঙির রশিটা খুলে রাশ ধরেই সাঁতরে এল সারেং মিঞা ডিঙিতে। নোনাজলে ভেজা উলঙ্গ শরীরে পুর্বী-হাওয়া নরম হাত বোলাতে লাগলো। এক দারুণ অনুভূতি হল সারেং মিঞার। সে যেন আদম। ইভের আদম। এক মুহূর্তের জন্যে মনটা অন্যরকম। হয়ে গেল। পুরুষের জীবনের সব অভিজ্ঞতার শরিকই হয়েচেল সে একসময়ে। সে জানে, নারীর পরশের সুখ। বিশেষ করে, উদোম শরীরে, উদোম নারীর পরশের সুখ।

সারেং বলল, নিজেকে। আর দেরি নয়!

এই ভিড়ের, কিছুক্ষণ পরেই হওয়া ভোরের বাঁধন কাটিয়ে নিজের দিকে, ভেতরের দিকে নিজেকে খুঁজতে যাওয়া বড়ো কঠিন হে। মনে মনে বলছিল সারেং মিঞা। পদে-পদে বাধা। এই সুনসান রাতে, দুনিয়ার সব মানুষ যখন ঘুমুচ্ছে, অভ্যাসের ঘুম, শরীরের পরিশ্রমজনিত ক্লান্তির ঘুম, রতি-ক্লান্তির ঘুমে, অগ্নিবলয়ের মদ্দি, বৃত্তের মদ্দির বড়ো সহজ সুখের ঘুম, তকনই ভেইসে পড়ো। পাইল্যো চলো, সারেং। চলো। চলো। চলো।

তুমি যে সারেং মিঞা।

নৌকো খুলে দিল সারেং মিঞা সমুদ্রের মোহানার দিকে মুক করি।

এখন যেন মনে হচ্ছে সারেং-এর যে, গোপেন বাগচিবাবুর ব্যক্তিগত মোটর লঞ্চ 'লীলা'র উপরের কেবিনে লঞ্চের 'সুকান' ধরি বসি আছে। ইঞ্জিনম্যান নটবর সেকেন্ড গিয়ারে দিয়ে রেইকেচে ইঞ্জিন। বেশি শব্দ লাই। থাকলিও, শব্দটা ঘোর রাতের নিস্তব্ধতার মধ্যি ঝড়ের শব্দর মধ্যি যেমন পাকির আর্ত চিৎকার চাপা পড়ি যায়, তেমনই চাপা পড়ি গেচে। শুধু শব্দরেই ভার নেই; নিস্তব্ধতারও আচে। সোঁদরবনে যাঁরা গেচেন, থেকেচেন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, তাঁরাই জানেন এই কতা। এই কতার ভয়াবহতা।

জলের উপরে আবার তারাদের ছায়া পড়চে। মেঘ যেন ঘোমটা। কোনো বিবিজানের কালো বোরখার ঘোমটা সরে সরে যেতিচে যেন। দুপাশের জঙ্গলের অন্ধকার ছায়ারা অন্ধকারতর হয়ে অন্ধকার জলের দুপাশে সার সার প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আচে। পশ্চিমাকাশের জ্বলজ্বলে তারাটি এখনও জ্বলজ্বল করছে। তার কি নাম, কে জানে?

এই নামের অভিশাপও আরেক অভিশাপ। জেনেছে সারেং মিঞা। মানুষ, পশু, পাখি, গাছ এমনকী আকাশের তারা, সকলেই এই অভিশাপে অভিশপ্ত।

সারেং মিঞা ভেসে চলেচে আইস্তা আইস্তা অন্য এক দেশে। যেখানে কারোই নাম লাই, নামের মোহ লাই, নামের জন্যে কামড়াকামড়ি, খেয়োখেয়ি লাই। শুদ্ধতা, শুভবোধ, ন্যায়, ভব্যতা, চক্ষুলজ্জা সব যেকানে নামের আকাঙ্ক্ষার তীব্রতার মত্তহস্তীর পদদলনে পিষ্ট হয়ে গেচে, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেচে বন্ধুতা, ভালোবাসা; সেই দেশ সারেং মিঞার দেশ নয়।

পিঠেম হাওয়াটা আরো জোর হতিচে। হবেই। পরবরদিগারের দেখা পেইয়েচে যে এবারে। পালটা তুলেই দিল এবারে সারেং মিঞা। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠেই তর তর করে এগিয়ে চলল সারেংএর ডিঙি।

হালে শক্ত করে হাত রেখে বসে রইল সারেং।

বাচ্চাবাবুর কাছে সকড়িগলি ঘাটে চাকরি করবার সময়ে শুক্লাজির সঙ্গে পাটনাতে গিয়ে একটি সিনেমা দেইকেচেল। সেই সিনেমার একটি গানের কথা মনে পইড়ে গেল এই সময়ে। কেন, কে জানে!

"সজনরে, ঝুট মতো বোলো
খুদাকি পাস যানা হ্যায়,
না হাতি হ্যায় না ঘোড়া হ্যায়
উঁহাতো পায়দলহি যানা হ্যায়
সজনরে ঝুট মত বোলো...

ভারী ভালো লেগেচেল গানটা।

আলো ফুটতে দেরি আছে এখনও অনেক। কিন্তুক ফুটবে। অন্ধকারের আলোকে নইলে চলে না, আলোর অন্ধকার নইলেও।

নতুন পৃথিবীর নওজোয়ান নয়া-নবি বিজ্ঞানীরা বড়ো বেশি বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেচেন। তাঁরা তাঁদের মায়ের, এই প্রকৃতির, এই পৃথিবীর শরীর মনের কোনো রহস্যকেই আর রহস্য রাখতে চান না। এই মূর্খরা বড়ো বেশি জেনে ফেলেচেন, বড়ো বেশি জানতে চাইচেন। আর যতই জানচেন ততই তাঁদের স্পর্ধা আর গর্বের সব সীমাও ছাড়িয়ে যাচ্চে।

সারেং মিঞা অশিক্ষিত মাঝি। সে কী করে বোজাবে এদের যে রহস্যই জীবন। স্বপ্নই জীবন। যা কিছুই দুর্জ্ঞেয় তাই জীবনের সার। জীবনের সবকিচুই জেনি ফেললি কোন্ অজানাকে জানার দুর্মর আশা নিয়ে আর বেঁচি থাইকবে তারা!

ধীরে দোস্তরা ধীরে। তোমাদের বিজ্ঞানের জয়যাত্রার রাশ একটু হালকা যদি না করো তবে খুদাহ্ বদলা নেবেন তোমাদের উপরেই। দুনিয়ার মেয়াদ কমিয়ে দেবেন। নিজেদের মূর্খামির পাপে নিজেরাই চাপা পইড়ে মরবে, ভেইসি যাবে, ভূমিকম্পে, বন্যায়, পুড়ে মইরবে খরায়; জমে যাবে শৈত্য প্রবাহে। তোমরা ভেবেছটা কি হে মিঞা? তোমরা কে বটো হে! যারা নিজের মাকে ন্যাংটো করে তার শরীরের রহস্য জানতে চায়, তাদের খুদাহ্ কখনও ক্ষমা করতে পারেন?

তওবা। তওবা।

ডিঙি ভেসে চলেছে। সামনে থেকে ভাঁটির জল তাড়া দিচ্ছে ছলাৎ ছলাৎ করে। চলো মিঞা, চলো।

পেচন থেকে পিঠেম বাতাস হাঁক দিচ্ছে, চলো মিঞা, চলো।

এরা সকলেই মিঞার চেনা-জানা। এরাই বন্ধু!

এই আকাশ, এই বাতাস, এই বাতাস, এই নদী, এই জল, এই বন-বনান্তর; দূরের-দিগন্তে মেশা মোহনা, শান্ত, দুধালি বালির চল, একলা পাখির স্বর; এই সব নিয়েই চলে যায় সারেং মিঞার। এই সবই জীবন, ইন্তেকালও হয়তো।

নিজেকে বুঝতে, নিজেকে জানতে, কেন এসেছিল এখানে? কেন মানুষ হয়ে এসেছিল? কোথায় তার আসলে যাবার ছিল? কোন ভুল চড়াতে এসে ঠেকে গেছে তার জীবনের নৌকো? এইসব জানতে এসেছে সে।

নাঃ। এবারে আর ফিরে যাবে না। শহর, বনের, কল-কারখানার, এমনকি সোঁদরবনেরও সব মানুষই যার যার পেটের ধান্দায়, সুখের ধান্দায়, আরো সুখ, আরো টাকার ধান্দায় নিজেদের লোভের আগুনের মধ্যে আধপোড়া করুক, সবজান্তা হোক।

তাদের কারোকেই প্রয়োজন নেই সারেং-এর।

এবং আরও আনন্দের কথা এই যে, তাদেরও কারোর প্রয়োজন নেই সারেংকে।

পিঠেম বাতাস আরো জোর হয়েছে। পালে পতপত করছে সে বাতাস। সারেং মিঞা মুক্তির আওয়াজ শুনতে পেল যেন সেই পতপতানিতে।

সমুদ্রমেখলা

উৎসর্গ

রুদ্রাণী এবং কৌস্তুভ চ্যাটার্জিকে

.

প্রচ্ছদ

প্রবীরকুমার সামন্ত

মুখবন্ধ

আমাদের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সৌন্দর্যই আলাদা। দেশ বিদেশের অনেক সামুদ্রিক শহরে যাওয়ার সুযোগ আমার ঘটেছে, যেমন দেশের মধ্যে গোয়া, কোভালম, পুরী, গোপালপুর এবং বিদেশের অন্যান্য তটভূমি ছাড়াও প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াইয়ান দ্বীপপুঞ্জের ওয়াইকিকি এবং ভারত মহাসাগরের সেশ্যেলস দ্বীপপুঞ্জে। কিন্তু আন্দামান তার স্বকীয়তাতে স্বতন্ত্র।

এই উপন্যাসের পটভূমিতে নিজে পায়ে গিয়ে দাঁড়ানো সত্ত্বেও ওই দ্বীপপুঞ্জকে ভাল করে জানার জন্যে অনেকই পড়াশুনো করতে হয়েছে। দুঃখের বিষয় এই যে যতটুকু জ্ঞান সঞ্চিত হয়েছে তার শতকরা পাঁচভাগও উপন্যাস লিখতে কাজে লাগেনি। উপন্যাস প্রবন্ধ নয় এবং সব পাঠকের এসব ব্যাপারে জিগীষা সমান নয়। উপন্যাসের রস এবং টান যাতে বিঘ্নিত না হয় সেদিকেই সর্বদা নজর রাখতে হয়েছে।

অবশ্য এত কিছুর পরেও "সমুদ্রমেখলা" যদি আপনাদের ভাল না লাগে তবে বলতে হবে সেটা অধমেরই অক্ষমতা।

এই উপন্যাস লেখা সম্ভব হতো না যদি এশিয়াটিক সোসাইটির পাঠাগারিক শ্রীমতী মিতালী চ্যাটার্জি, কলকাতা চিড়িয়াখানার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর শ্রী সুশান্ত ভট্টাচার্য, অনুজপ্রতিম শ্রী বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রী ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় নানা বই-এর জোগান দিয়ে আমাকে সাহায্য না করতেন।

এঁদের সকলকেই আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিনীত, ইতি
বুদ্ধদেব গুহ

পোস্ট বক্স নং ১০২৭৬
কলকাতা-৭০০ ০১৯

এই উপন্যাসের সব চরিত্রই কাল্পনিক। কোনও জীবিত বা মৃত
চরিত্রের সঙ্গে কোনও মিল লক্ষিত হলে তা সম্পূর্ণই
দুর্ঘটনাপ্রসূত বলেই জানতে হবে।

১

বঙ্গোপসাগরের সুনীল জলরাশির মধ্যের চারদিকে হাজার মাইল নীলিমার সীমানা ঘেরা এই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। তারই মধ্যে একটি ছোট্ট দ্বীপ। ঘন জঙ্গলাবৃত এবং প্রায় এক লক্ষ নারকোল গাছ সম্বলিত। দ্বীপের নাম "দ্যা হর্নেটস নেস্ট": সেই দ্বীপে একা থাকেন আহুক বোস। রবিনসন ক্রুসোর যেমন ফ্রাইডে ছিল আহুক-এরও তেমনি আছে ভীরাপ্পান। জুতো-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই করে। হিন্দি আর ইংরেজির কিছু শব্দ বলতে পারে। তবে পুরো বাক্য নয়। যারা কাজের মানুষ তারা বেশি কথার মানুষ কোনও কালেই হয় না। বেশির ভাগ সময়েই মনোসিলেবল-এই কথা বলে ভীরাপ্পান।

তার মা থাকেন রসস আইল্যান্ডে। যখনই আহুক পোর্ট ব্লেয়ারে আসেন, সে তার জলি বোট—ঐর মতন বোটটিকে আহুকের আউটবোর্ড ইঞ্জিন লাগানো বড়ো বোট-এর পেছনে বেঁধে নিয়ে চলে আসে পোর্ট ব্লেয়ার পর্যন্ত। তারপর নিজের বোট নিয়ে চলে যায় রস আইল্যান্ডে। অবশ্য তার বোটেও আউটবোর্ড এঞ্জিন আছে। তবে কমজোরি। আহুককে পোর্ট ব্লেয়ারে আসতে হয় গড়ে মাসে দুবার। খাবার দাবার জিনিসপত্র কিনতে। চিঠিপত্র যদি ক্বচিৎ আসে তা নিতে। ডিজেল কিনতে। তাঁর ঠিকানা বলতেও বে আইল্যান্ড হোটেল, পোর্ট ব্লেয়ার, আন্দামান আইল্যান্ডস। দক্ষিণ ভারতীয় ম্যানেজার বন্ধুস্থানীয়। সব কিছুই যত্ন করে রেখে দেন। তাঁরই প্রযত্নে সব আসে। হেড অফিসের কাগজপত্রও।

ভীরাপ্পানের বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে। অবিবাহিত। এবং অত্যন্তই নারীবিদ্বেষী। আহুক এবং ভীরাপ্পানের সামাজিক, আর্থিক, মানসিক এবং শিক্ষাগত তল আদৌ সমান নয় বলে এর এই নারী-বিদ্বেষের কারণ বিশদভাবে জিজ্ঞেস করেননি ওকে কখনওই আহুক। যদি করতেনও ভাষার দৈন্যের কারণে হয়তো বুঝিয়ে বলতেও পারত না ভীরাপ্পান। নিজে থেকে ভীরাপ্পানও কোনোদিন বলেনি। কোনও কারণ নিশ্চয়ই থেকে থাকবে। কিছু জিনিস, তা গুণই হোক, কী দোষ, প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব করেই রাখতে দেওয়া উচিত।

এইটুকু স্বাধীনতা প্রত্যেক নারী ও পুরুষেরই ন্যায্য প্রাপ্য বলে মানেন আহুক।

পাপ্পলাগুড্ডি ভীরাপ্পানও আহুক সম্বন্ধে সামান্যই জানে। যেমন আহুকও সামান্যই জানেন ভীরাপ্পান সম্বন্ধে। দুজনের মধ্যেই মালিক কর্মচারী সম্পর্কের বাইরের এই যে কিছু রহস্য আছে, কিছু অজানা তথ্য, না বলা-কথা, এতে আহুক খুবই স্বস্তি পান। হয়তো ভীরাপ্পানও পায়। নিজস্ব দোষ গুণেরই মতন প্রত্যেক মানুষেরই কিছু রহস্যও, নিজস্ব করে রাখা অবশ্যই উচিত বলে আহুক মানেন। ওঁদের দুজনের কেউই অন্য জন সম্বন্ধে অত্যাধিক কৌতূহল পোষণ করেন না। যেটুকু না জানলে চলে না, সেটুকুই জেনে নেন, নিয়েছেন। তাতেই খুশি দুজনেই।

রবিনসন ক্রুসো এবং ফ্রাইডে।

তবে আহুক পোর্ট ব্লেয়ারে না গেলেও ভীরাপ্পান প্রতি শনিবার ভোরে চলে যায় রস আইল্যান্ডে আবার চলে আসে রবিবার বিকেলে। তার বৃদ্ধা অশক্ত মাকে নিয়ে অবশ্যই চার্চ-এ যায় সে। নারীবিদ্বেষী হলেও এমন মাতৃভক্ত মানুষ বেশি দেখা যায় না।

ভীরাপ্পান আগামীকাল বিকেলে ফিরে আসবে "দ্যা হর্নেটস নেস্ট"-এ। মায়ের কাছে দুপুরের খাওয়া সেরে রওনা হবে রস আইল্যান্ড থেকে। আকাশের অবস্থা খারাপ থাকলে বা আবহাওয়া দপ্তর পতাকা ওড়ালে ওর সেদিন আর আসা হয় না।

এখানে জীবনে কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই। ওদের সম্পর্কটাও প্রভু-ভৃত্যের নয়। মালিক-কর্মচারীর হলেও সম্পর্কটা সমান সমান। পশ্চিমি দেশের এইরকম সম্পর্কেরই মতন। আহুকের তরুণী মালকিন চুমকির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটাও অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত এবং পারস্পরিক সম্মানের উপরে বাঁধানো। বাঁধন কিছু যদি বা থাকেও, অদৃশ্য বাঁধন, তাও ফসক-গেরো। দু পক্ষের এক পক্ষ টান মারলেই যাতে খুলে যায়, তেমন করেই বাঁধা।

একটু পরেই সন্ধে হয়ে যাবে। সেই যে বড়ো টুনা মাছটা, আহুককে ঘুরিয়ে মারছে আজ তিন মাস হল, তার জন্যে আজও প্রথম বিকেলেই তাঁর ক্যাটাম্যারনটি ভাসিয়ে মাঝসমুদ্রে এসে পৌঁছে হুইল-লাগানো বড়ো ছিপটার ফেলে বসে আছেন। এই বোট-এর এঞ্জিনটা মাঝে মাঝেই রক্ষিতাদের মতন বেইমানি করে। মাঝসমুদ্রে এই বেইমানি যে কোনও দিনই প্রাণহানির কারণ হতে পারে। যুবক বয়সে পাঁচ-দশ মাইল সাঁতরে যাওয়া কিছুই ছিল না তাঁর কাছে কিন্তু যৌবন, এমনকী আহুক বোস-এর যৌবনও চিরস্থায়ী নয়। তখন যা যা পারতেন বা করতেন অবহেলে এখন আর তা পারেন না। পারেন না বলে এবং এই অমোঘ নিয়তিকে মেনে নিতেও পারেন না বলে, সৃষ্টিকর্তার প্রতি ওর এক দুর্মর অভিমান আছে। যৌবন যদি চিরদিন নাই থাকল তবে সে দান আদৌ দিলেন কেন তিনি? এখন না আছে, মনের প্রেম, না শরীরের প্রেম, না যৌবনের দম্ভ। মাঝে মাঝেই এই জীবনকে দুর্বিষহ বলে মনে হয়। নিজের শর্তে না বাঁচলে বেঁচে কি লাভ? তাই আজকাল আত্মহত্যার ইচ্ছাটা কেবলই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

গোলাপি-রঙা নাইলন-এর লাইন আছে বহু লম্বা। বঁড়শি একবার গিললে চব্বিশ ঘণ্টা লাগুক কী আটচল্লিশ ঘন্টা লাগুক সেই টুনাকে তিনি তুলবেন ঠিকই। ফাতনাটাও মস্ত বড়ো। এক অ্যামেরিকান সাহেব, তাঁর মালকিনের অতিথি হয়ে গত বছর এসেছিলেন এখানে, তিনি উপহার দিয়ে গেছেন। গাঢ়-লাল রঙা ফাতনা। সাহেবরা বলে Float। মাঝে মাঝে কোনও কুতূহলী বড়ো হাঙর ফাতনাসুদ্ধ লাইন কেটে নিয়ে যায়। তারপর কোন ই. এন. টি. ডাক্তারের কাছে যে যায়, তা অবশ্য তাঁর জানা নেই।

বহু বছর সাহেবদের দেশে থাকা সত্ত্বেও এখন সাহেবদের সব কিছুকেই আহুক ত্যাগ করেছেন। ভাষাটাও ভুলতে পারলে সুখী হতেন। কিন্তু সাঁতার বা সাইকেল বা সঙ্গম শেখার মতনই ভাষাও একবার শিখে ফেললে সেই লিপ্ততা ইলিশ মাছের গায়ের গন্ধরই মতন লেগে থাকে স্মৃতির আঙুলে। ছাড়তে চায় না সহজে।

মাছটা ভারি সেয়ানা। আর মস্ত বড়োও। এত বড়ো মাছ, ভীরাপ্পান বলছিল, ও তল্লাটে কেউ নাকি দেখেইনি। একবার ভীরাপ্পানের নিজের ক্যাটাম্যারনের কাছাকাছি তাকে বাগে পেয়ে, এখানের জারোয়া বা ওঙ্গে উপজাতিরা যেমন করে হারপুন দিয়ে মাছ মারে, তেমনই করে ভীরাপ্পান তার হারপুন ছুড়েছিল। দড়ি বাঁধা ছিল হারপুন-এর সঙ্গে। মাছটা ভীরাপ্পানকে ক্যাটাম্যারন থেকে উপড়ে নিয়ে টেনে সমুদ্রের জলের গভীরে চলে গেছিল নীল তিমি "মবি ডিক"-এর মতন। দড়ি পায়ে জড়িয়ে গিয়ে, জলের নিচে দম বন্ধ হয়ে মারাই যেত ভীরাপ্পান যদি না ভীরাপ্পানের মান্য সমুদ্রের দেবতা অশাভিমারু তাকে সময় মতন বাঁচাতেন। কোনওক্রমে সাঁতরে জলের উপরে উঠে এসে তার ক্যাটাম্যারনের কাছে ডুবতে ডুবতে, জল খেতে খেতে, সাঁতের পৌঁছেছিল ও। ভাগ্যিস সমুদ্রে এই দিকটাতে হাঙর খুব বেশি আসে না। তাছাড়া, ভীরাপ্পান জলের পোকা। তামিলনাদে তার দেশ বটে কিন্তু সে বড়োই হয়েছে ওড়িশার গঞ্জাম জেলার সমুদ্রপারের তেলুগু জেলেদের

এক ছোট্ট গ্রামে। ওর গায়ে সমুদ্রের গন্ধ। এখন যেমন আহুক-এর গায়েও হয়ে গেছে। ওর চোখ দুটো জবাফুলের মতন লাল। সারা শরীরেই ওই রকমের জেল্লা—ফসফরাস-এর জেল্লার মতো। আহুক-এর শরীরও ধীরে ধীরে সেরকম হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে বিপদ দেখেন তিনি। শরীরকে খাইয়ে দাইয়ে, মশারি-টশারি গুঁজে দিয়ে, পাশবালিশ এগিয়ে দিয়ে, ঘুম পাড়িয়েই এসেছিলেন উনি। 'হর্নেটস নেস্ট'-এর এই সামুদ্রিক প্রকৃতি এই অবেলাতে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে শরীরের। মাঝরাতে খিদে পাচ্ছে তাঁর। কী যে দেন খেতে। শরীর তো ব্রাজিলের পিরানহা মাছ নয় যে, নিজের প্রজাতিকে নিজে খেয়ে সুখী হবে। বড়োই বিপদে পড়েছেন। শরীরের কাঁকড়াগুলো সমুদ্রতটের লাল কাঁকড়াদের মতো যৌবনের ঢেউ সরে যেতেই বালির মধ্যের অগণ্য গর্তে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেছিল। এখন যৌবনের ঢেউ সরে যাবার পরে তারা এই সামুদ্রিক এবং প্রাকৃতিক অভিঘাতে আবারও বেরিয়ে পড়েছে। ইতিউতি দৌড়ে বেড়াচ্ছে। যৌবন চলে গেছে ভরা কটালের মতো দুইপার ভাসিয়ে নিয়ে কিন্তু তার যন্ত্রণাকে প্রাণ দিয়েছে এই প্রকৃতি। বড়োই বিপদ তাঁর।

এখন গাছপালা, এই দ্বীপ এবং সমুদ্রই তাঁর জীবন। তাঁর মরণও হবে একদিন।

ভীরাপ্পনও স্থির বিশ্বাসে, ভারী গলাতে বলে সেকথা প্রায়ই। যদিও সে যুবকই।

ফাতনাটা ঢেউয়ে দোলে। বিকেলের সমুদ্র কত কথা যে বলে না-বলে, ফাতনাটার সঙ্গে, আহুকের সঙ্গে। যারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমুদ্রের উপরে এমনি করে কাজে বা অকাজে বসে না থেকেছেন তাঁদের পক্ষে এই নিরুক্ত সামুদ্রিক নীল-সবুজ কথার স্বরূপ জানা সম্ভব নয়।

টুনা মাছটাও কথা বলে আহুকের সঙ্গে। দূরে ভেসে উঠে ঝলকে-ঝলকে পলকে পলকে দেখে আহুককে। এসব কথার খোঁজ সব মানুষে রাখে না। যা পাখি জানে, সমুদ্র জানে, মাছ জানে, তার সবই কি মানুষে জানতে পারে?

সব মানুষেই?

মাঝে মাঝে ছোটো মাছ এসে ঠোকর দেয় ফাতনাতে। বুড়বুড়ি ওঠে না পুকুরে মতন সমুদ্রের সতত বহমান জলে। ফাতনার দিকে দীর্ঘক্ষণ চেয়ে থাকতে থাকতে রং না-পালটানো জলের নিচের নানা-রঙা প্রবালের প্রাসাদ পাহারা-দেওয়া গভীর গম্ভীর সুপুরুষ সমুদ্রের দিকে চেয়ে, সি-গালদের আর টার্নদের বিষণ্ণ স্বগতোক্তি আর ক্বচিৎ হোয়াইট-বেলিড (WHITE-BELLIED) সি-ইগলদের তীক্ষ্ণ ডাকে চমকে উঠে ধ্যান ভেঙে যায় আহুক-এর। পরক্ষণেই আবার নিজের ভাবনাতে বুঁদ হয়ে যান।

মাছ যাঁরা কখনও ধরেছেন তাঁরাই শুধুমাত্র জানেন যে, সেই নেশার সব মজাই এই সীমাহীন ধৈর্যেরই মধ্যে। প্রকৃতি, তা সে গ্রাম-প্রকৃতিই হোক, নদী-খাল বিলের প্রকৃতিই হোক, কী সামুদ্রিক রহস্যময় প্রকৃতি, সব প্রকৃতিই ভালো বাওয়ার্চির রাঁধা বিরিয়ানির "হান্ডি নিকালনা"রই মতন ধীরে ধীরে, পরতে পরতে নিজেকে উন্মোচিত করে, ফড়িং-এর ওড়ার মধ্যে, কাচপোকার বুঁবু-বুঁইই ধ্বনির মধ্যে, ঘুঘুর আর বুলবুলির ডাকের মধ্যে, শীতের মধ্যাহ্নের মন্থর হাওয়ায় দূরের নদীর গেরুয়া চরে বসে-থাকা, স্বগতোক্তি করা সোনালি চখা-চখির শিহরতলা শিস-এর মধ্য দিয়ে অথবা দিগন্তলীন আকাশের নিচের দিগন্তনীল সমুদ্রর গভীর সম্মোহনী জলজ শান্তির অমোঘতার মধ্য দিয়ে। এ জগতে থেকেও অন্য জগতে চলে যেতে হয় তখন। যাঁরা জানেন, তাঁরাই জানেন। এই জলজ মৎস্যগন্ধী অভিজ্ঞতার কথা অনভিজ্ঞ অন্যকে কখনও বলে বোঝানো যায় না।

ভীরাপ্পান বলে, সমুদ্রের গভীরে নাকি অনেকেই দেবতার বাস। আহুক শোনেন। এমনিতে ভীরাপ্পান মিতবাক। ক্বচিৎ নিজের মনে বলে চলে সেইসব দেব-দেবীর কথা। মুত্তেলামার, টৌটম্মার কথা। তবে সমুদ্রের দেবতা নাকি অশাভিমারু; যিনি ওই খুনে টুনা মাছটার হাতের নির্ঘাত মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছিলেন ওকে। সমুদ্র শীতকালে যখন শান্ত থাকে তখন ক্যাটাম্যারন নিয়ে সমুদ্রের অনেক গভীরে চলে গেলে নাকি দেখা যায় স্বচ্ছ জলের নিচে একটা লাল পাহাড়। সেই পাহাড়ের

গায়ে অশান্তিমারুর থান। গায়ে যুগ-যুগান্তের শ্যাওলার পরত জমে জমে কালো হয়ে গেছে সে পাহাড়। কত রকমের ফাংগি, অ্যালগি, প্ল্যাংকটন। তাকে ছোঁয়, ছুঁয়েই আবার ভেসে যায়। আর যেখনে যেখানে প্রবাল আছে সেখানে জলের নানা রং। সবজে, কালচে, লালচে, কমলাভ। মনে হয় স্বপ্নেরই দেশ বুঝি। সেখানে জলের তলার সেই পাহাড়ের গায়ে রাজপ্রাসাদ। তাতে রাজকন্যা থাকে। সেই শ্যাওলা-ধরা নীলচে পাহাড়ের চারপাশে লক্ষ লক্ষ স্যামন আর সার্ডিন আর সুরমেই মাছের ঝাঁক ঘুরে বেড়ায়। টুনারাও। তাদের পাখনা নেড়ে নেড়ে নীল জলকে আরও নীল করে দেয় তারা। নীল জলের উপর দিয়ে শীতের হলুদ রোদ এসে তেরছা হয়ে পড়ে ওদের গায়ে। বহুবর্ণ দেখায় তখন মাছের ঝাঁকেদের। সূর্যর অনাবিল আলোর দাক্ষিণ্যে প্রবালের রং ঠিকরে যায় ওদের রুপোলি গায়ে।

কখনও-সখনও টাইগার-শার্ক নিঃশব্দে প্রচণ্ড বেগে এসে স্যামন সার্ডিন আর সুরমেইদের ঝাঁককে তাড়া করে। আর সঙ্গে সঙ্গে বিছোনো রুপোর চাদরের মতন মাছের ঝাঁকের টুকরো টুকরো হয়ে দলছুট হয়ে গিয়ে চারদিকে বিভিন্নমুখী দলে ছড়িয়ে যায় জলের নিচে আলোর ঝলকানি তুলে। জলের নিচে উলটোপালটা গন্তব্য ছোটো মাছ দৌড়োয়, বড়ো মাছ দৌড়োয়, আলো দৌড়োয় আর পেছনে পেছনে ছায়াও দৌড়োয় নিজের নিজের স্পন্দিত সত্তাকে তাড়া করে। আর তাদের গায়ের বিচ্ছুরিত আলো-ছায়া জলজ, সবুজ অন্ধকারে, খসে-যাওয়া তারা ঔজ্জ্বল্যেরই মতন প্রতিসরিত হয় চতুর্দিকে।

বেশ লাগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলের উপরে দুলতে দুলতে বসে ভাবতে। হাওয়াতে যেন মাছের গন্ধ ভাসে। জলেও ভাসে। বঙ্গোপসাগরের এই অঞ্চলের হাওয়াতে গা চিটচিট করে না তেমন। কেন করে না আহুক জানেন না। এ তো আর দিঘা, পুরী, গোপালপুর, গোয়া বা কোভালাম নয়, এই দ্বীপপুঞ্জের চতুর্দিকে হাজার মাইল সমুদ্র। ভাবলেই দারুণ লাগে। দ্বীপ তো একেই বলে। এসব কি আর বালিগঞ্জের লেক-এর মধ্যের পানকৌড়িদের প্রাতঃকৃত্য সারার দ্বীপ। উপমহাদেশের গায়ে গা-ঠেকানো সমুদ্র আর চারদিকে সীমাহীন জলরাশির বিস্তার এই অঞ্চলের দ্বীপবাসীদের মনে এক ধরনের অসহায়তার জন্ম দেয়। প্রকৃতিই যে এখন অমোঘ, মানুষ যে এখনও প্রকৃতির খেয়ালখুশির দাস, সে কথা অন্তর অনুভব করে। ব্যারেন আইল্যান্ড আগ্নেয়গিরির দ্বীপ। কয়েক বছর আগেই সে অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়েছিল। কখন যে মেঘের গুরুগুরুর মতো ভূগর্ভের গুরুগুরু রবে মাদল বেজে উঠবে তারপরে উৎক্ষিপ্ত হবে তরল আকর, আগুন আর ধুঁয়োর সঙ্গে, তা কেই-বা বলতে পারে!

নানারকম অনিশ্চয়তা আছে এখানে। অমোঘ, পূর্ব-নির্ধারিত। মানুষের-নিয়ন্ত্রিত জীবন তাই ঘৃণাভরে পায়ে ঠেলে আহুক বোস জীবনের শেষ বেলাতে এই "দ্যা হর্নেটস নেস্ট"-এ এসে বাসা বেঁধেছেন।

জমি, বাড়ি, নারী বড়ো পিছু টানে। সেই আবর্ত থেকে নিজেকে যে বিযুক্ত করতে পেরেছেন একথা মনে করেই নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ান মনে মনে।

সামুদ্রিক মাছ এখানে অনেকই রকম। সবরকমের নাম কি আর আহুক জানেন? হাঙরও আছে নানারকম। যেসব মাছ খায় এখানের মানুষে তার মধ্যে সুরমেই কোরাই, ম্যাকারেল, সিলভার-বেলিজ, মানে রুপোলি পেট-এর মাছ, অ্যাকোরিজ, সার্ডিনস, সিয়ার ইত্যাদি আছে। সার্ডিনের মধ্যে দু রকম দেখেছেন। জানেন না, হয়তো আরও নানারকম আছে। হারেমগুলা, আর ডুসুমেরিয়া অ্যাকুয়া। এছাড়াও আছে রেজ, বারাকুডা, মুলেট। জেলিফিশ। নানারকম অক্টোপাস। শামুক, মুসেলস। কাঁকড়া, চিংড়ি। আর কত নাম মনে করবেন।

মিষ্টি জল আছে দ্বীপেরই ভিতরে ভিতরে। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা আসার পর তাঁরা অনেক জায়গাতে পুকুরও কেটেছেন। মিষ্টি জলের মাছ খোঁজ করে জোগাড় করতে হয়, কালেভদ্রে অতিথি এলে। তখন ভীরাপ্পানকে জেলেদের দ্বীপে পাঠান। রুই, কাতলা, মৃগেল, ল্যাটা, শিঙি

মাগুর, কই ইত্যাদি মাছ পাওয়া যায়। তবে এই নির্জন দ্বীপে সামুদ্রিক মাছই তাদের প্রধান খাদ্য। ভীরাপ্পান শুঁটকি খায়। যেদিন সে শুঁটকি রাঁধে সেদিন সামুদ্রিক হাওয়াতেও শুঁটকির গন্ধ ভাসে। একদিন খেয়ে দেখেছিলেন। বেজায় ভালো। একেবারে লাল। কিন্তু আশ্চর্য। খাবার সময়ে কিন্তু তেমন গন্ধ পাননি। সব খাদ্য-পানীয়তেই রুচি তৈরি করতে হয়। তাঁর মনে আছে, শিশুকালে তার এক উকিল মেসোর বাড়িতে এক মাড়োয়ারি মক্কেলের পাঠানো দইবড়া খেয়ে বমি করে ফেলেছিলেন। কোনও কিছুতেই নাক সিঁটকোন না সারা পৃথিবী-ঘোরা আহুক। কোনো কিছুতেই তীব্র আসক্তি যেমন নেই, অনীহাও নেই। যাকে ইংরেজিতে বলে To ride with the tide, তাই তাঁর জীবনে মূলমন্ত্র। অবশ্য এত সব জেনেবুঝেও লাভ তো বিশেষ হয়নি। হলে কি ষাট পেরিয়ে এসে একা এই দ্বীপের বাসিন্দা হন?

তবে লাভ-ক্ষতির বিচার তো সকলের কাছে সমান নয়। পৃথিবীতে বড়ো বেশি মানুষ হয়ে গেছে, বড়ো বেশি কথা, আওয়াজ, গাড়ি-ঘোড়া, ট্রেন-প্লেন সেখানে, বড়ো লোভ, বড়ো বেশি কম্যুনিকেশান। ফোন, ফ্যাক্স, মোবাইল, ই-মেইল, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট। মানুষের বেশি টাকা রোজগার করার সুবিধে ছাড়া আর কোনও মহৎ উপকার এতে হবে কি না জানেন না আহুক। তাছাড়া এই উদ্‌বৃত্ত সময় নিয়ে মানুষ কী করছে তাও ভেবে দেখার সময় এসেছে।

আহুক মানুষটি বিজ্ঞান-বিরোধী। আজকাল এমন মানুষকেই অন্যে পাগল বলে। ছাগলও বলে, কারণ তিনি ঈশ্বর-বিশ্বাসীও।

আহুক কি বুড়ো হচ্ছেন? ষাট বছরে আজকাল কেউই বুড়ো হয় না। কিন্তু বুড়ো না হলে এমন এমন এমন ভয়-ভক্তি জাগছে কেন মনে?

দূরে মাছটা ডানদিক থেকে বাঁদিকে গেল। পাজি আছে। একদিন এসপার-ওসপার হবে। এই টুনা মাছেরাও ম্যাকারেল পরিবারেরই। কিন্তু শিরদাঁড়াটা অন্যরকম। শিরদাঁড়াই তো আসল। মাছ কিংবা মানুষের। শিরদাঁড়াই তো, মেরুদণ্ডই তো মানুষে মানুষে, মাছে মাছে পৃথকীকরণের একমাত্র উপায়।

এই মাছটা প্রায় চার মিটার মতন লম্বা। যদিও এদের প্রজাতি পাঁচ মিটার অবধি লম্বা হয়। এদের নাম ব্লু-ফিন টুনা। ওজনও হবে সাত কুইন্ট্যালের উপরে। সে যে পরিমাণ জল সরায় চলার সময়ে দু পাশে, ঘাই মারলে যে জলস্তম্ভের সৃষ্টি হয়, তা দেখেই ভীরাপ্পানের এবং আহুকের অনুমান এসব। অনেক অন্ধকার রাতে তারা-ভরা আকাশের নিচে আহুকের বাংলোর উঁচু বারান্দাতে ইজিচেয়ারে বসে আহুক ভীরপ্পানের সঙ্গে মাছটাকে নিয়ে আলোচনা করেন।

কে জানে। মাছটাও হয়তো ওদের নিয়ে অন্য কোনও মাছের সঙ্গে আলোচনা করে। জীবনে যে মাছটিকে ধরা যায়নি, যে ঈপ্সিত পুরুষ বা নারীকে পাওয়া হয়নি, তার কথাই মনে হয় শয়নে-স্বপনে-জাগরণে। এই এক আশ্চর্য স্বভাব মানুষের। পুরুষের। এবং নারীরও।

ওই টুনা মাছটার পিঠটা নীলচে-কালো আর পেটটা সাদা। সামনের ডানাগুলো ধোঁয়াটে কালো আর পেছনেরগুলো হালকা রঙের। আর পিঠের উপরের ডানা এবং জননেন্দ্রিয়র কাছের গোঁফগুলোর রং হালকা-হলুদ। ধারগুলো কালো।

ছ-বছর হতে চলল আহুক-এর এই দ্বীপে নির্জন বাসের। কিন্তু খারাপ লাগে না একটুও। সূর্যের আলো, হাওয়া, জল ঝড়, সমুদ্র, সমুদ্রতটে দ্বীপের মধ্যের আদিম জঙ্গল এই সবে যেন নেশা ধরে গেছে পুরোপুরি। সারা পৃথিবী ঘুরে অয়ন সম্পূর্ণ করে শেষভাগে যেন বড়ো মনোমত ঠাঁই-এ এসে থিতু হয়েছেন। আজকাল মাসে একবার পোর্ট ব্লেয়ার গেলেও যেন হাঁফ ধরে যায়। বড়ো অকারণে কথা বলে শিক্ষিত অশিক্ষিত সব মানুষেই। তাছাড়া, আদেখলা ট্যুওরিস্টদের ভিড় লেগেই থাকে। খালি গায়ে,শর্টস-পরা ঘাড় অবধি কাঁচাপাকা চুল আর কাঁচাপাকা দাড়িওয়ালা তাঁর দিকে তাঁরা এমন করে চেয়ে থাকেন যেন কোনো জেলের কয়েদ ভেঙে সদ্য-বেরুনো কোনও খুনি আসামিই

তিনি। আয়নাও নেই একটিও এই দ্বীপে। আয়নাকে যে-পুরুষ চিরতরে তাঁর জীবন থেকে বিসর্জন দিতে পেরেছেন তিনিই সার্থক পুরুষ। আয়নার প্রয়োজন মেয়েদের। বিধাতা যাঁদের পাখির মতন, প্রজাপতির মতন, রুপোলি মাছের মতনই সুন্দর করে গড়েছেন, গড়েছেন ফুলের মতন করে।

মাছটা আরেকবার হঠাৎই অন্যমনস্ক, চিন্তাশীল আহুক-এর পেছন দিয়ে এসে অনেকটা সমানে দিয়ে আড়াআড়ি পার হল, তাঁর ভাসমান শান্ত সমুদ্রের ঢেউয়ের মৃদু দোদুল্যমান বোটটাকে। জলের নিচে সেই মাছটির দীর্ঘ ও সুন্দর কালো ছায়া দেখে বুঝলেন আহুক। জলের উপরিতল থেকে মাত্র হাতখানেক নিচ দিয়ে যাচ্ছে সে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার নীলচে-কালো দীর্ঘ শরীর। নীল জলের নিচে তাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

ভাবছিলেন আহুক, যার ছায়াই এত সুন্দর তার কায়া না জানি কী সুন্দর!

কি হে? ভাবছটা কি? তুমি ভেবেছটা কি?

আহুক বললেন তাকে, মনে মনে।

তুমি কি ভাবছ?

মাছটাও যেন তার ফাতনা নাড়িয়ে আহুককে বলল।

কী ভাবব, তাই ভাবছি।

আমাকে ধরে তোমার কি লাভ? দুজনে মিলে আমাকে খেতে পারবে? ক-বছর লাগবে? শুঁটকি করে রাখবে বুঝি?

তোমার মতন সুন্দরকে কেউ অমন অপমান করতে পারে।

তবে?

তবে কি?

তোমাকে ধরার জন্যেই ধরব। যেহেতু তুমি ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকতে চাও। তাছাড়া কথাটা কি জানো?

আহুক বলল।

কী?

কথাটা হচ্ছে এই যে, তুমি আমার নিস্তরঙ্গ শেষ জীবনে একমাত্র চ্যালেঞ্জ। প্রতিযোগিতা ছাড়া কোনও পুরুষই কি বাঁচে? বাঁচার মতন বাঁচে? সারা জীবন মানুষের সমাজে অগণ্য শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে রমরম করে বেঁচে এসেছি। যখন সারা জীবনের প্রাপ্তি বসে বসে সুদখোর কৃপণ বুড়োর মতন ভোগ করার সময় এল, তখনই তো পালিয়ে এলাম সব ছেড়েছুড়ে।

কেন? তুমি কি পাগল?

মাছটি বলল।

অনেকেই তো তাই বলে। টিটিঙ্গিও বলত।

টিটিঙ্গি কে?

আমার বউ।

সে কোথায়? আনোনি তাকে? থাকো তো একটা ঝাঁকড়া-মাথা দুর্গন্ধ নারকোল তেল মাখা দৈত্যের মতন দেখতে পুরুষের সঙ্গে। বউ থাকতে কেউ....

বউ মরে গেছে আমার।

তুমি তো ভাগ্যবান। সবাই তো বলে, যে পুরুষের বা মাছের বউ মরে সে ভাগ্যবান।

সকলের কি সকলকে ভালো লাগে? তাছাড়া, কোনও পুরুষ অথবা নারী বা মাছই কি অন্য একজন নারী ও পুরুষকে একশোভাগ সুখী করতে পারে?

কোটি কোটি স্বামী-স্ত্রী তাহলে ঘর করছে কী করে? আনন্দে?

ঘর করছে কেউ পঞ্চাশ ভাগ সুখে, কেউ ষাট ভাগ, সত্তর ভাগ, কেউবা নব্বই ভাগ সুখে। কেউবা দশ ভাগ সুখেও করছে। আর কেউ বা অসুখে। তাছাড়া, আনন্দে কেউই করছে না। করছে নিছক অভ্যেসে। অভ্যেসটাকেই আনন্দ মনে করে মূর্খের স্বর্গে বাস করছে।

তারপর একটু চুপ করে আহুক বললেন, আসলে ব্যাপারটা কি জানো?

কী?

সুখী মানুষদের মধ্যে অধিকাংশই মূর্খ। আসলে, সুখ যে কাকে বলে, তাই তারা সাহস করে জানতে চায়নি। বেশি জানলেই বিপদ, বেশি জানলেই বড়ো দুঃখ। সুখী হতে হলে সাধারণ হতে হয়, পোকাদের মতন, কুকুর-বেড়ালের মতন, এই তোমার মাছেদের মতন। মানুষদের বড়োই কষ্ট। মানুষ হয়ে জন্মালেই কষ্ট। বাঁচাবে কে আমাদের? তাছাড়া, আরও একটা ব্যাপার ছিল।

কি?

মানে, আমার দোষ ছিল।

কী দোষ।

আমাকে আরও অনেক মেয়ে ভালোবাসত।

তাতে কী?

টিটিঙ্গি মনে করত সেই আমার একমাত্র মালিক।

তার দোষ কি? তুমিও কি মনে করতে না যে তুমিই তার একমাত্র মালিক?

না। করতাম না। বিশ্বাস করো, করতাম না।

তারপরেই আহুক বলল, তুমি ছেলে না মেয়ে টুনা?

জলে খিলখিল আওয়াজ তুলে হাসল মাছটা। বলল, আমি মেয়ে। সুন্দর নই, সুন্দরী।

তোমাকে টুনি বলে ডাকব তাহলে আমি।

ডেকো। নামে কি আসে যায়। তোমাকে টেনে নিয়ে যেদিন সমুদ্রের তলায় চলে যাব নানারঙা প্রবালের মধ্যে, রং-বেরঙের ফুলের মধ্যে, সেদিনও তোমাকেও জড়িয়ে ধরব মানুষের মেয়েদের মতন। চুমুও খেয়ে দিতে পারি একটা। রাগ করবে না কি?

না। চুমু খেলে কেউ কি রাগ করে? আশ্চর্য মাছ তো তুমি! থুড়ি, মানুষ। তারপর?

তারপর কি? তুমি তো জলের তলায় দমবন্ধ হয়ে মরেই যাবে।

তারপর?

তারপর তোমাকে হাঙরে খাবে, নয়তো ছোটো মাছে খাবে ঠুকরে ঠুকরে। সে বড়ো বীভৎস মৃত্যু।

তুমি আমাকে খাবে না?

না। আমি তো মানুষের মেয়ে নই যে পুরুষ মানুষকে খাব। ভাবছি তোমাকে চুমুও খাব না।

খাবে না?

না। তোমাকে মৃত্যুই চুমু খাবে।

তারপরই বলল, পুরুষ মানুষ, তুমি আমার শান্তি নষ্ট করছ কেন গত তিন মাস ধরে?

তুমি বুঝবে না।

কেন বুঝব না?

তুমি বুঝবে না। একজন পুরুষ মানুষ সবচেয়ে বেশি করে বাঁচে বিপদের মধ্যে। পুরুষের মতন পুরুষ।

তারপর বলল, কে জানে। আসলে, আমার অশান্তিকে দূর করার জন্যেই তোমার শান্তি নষ্ট করছি হয়তো।

তুমি বলছ, পুরুষ মানুষ বাঁচার মতো বাঁচে শুধু বিপদেরই মধ্যে। কিন্তু কোনও পুরুষের যদি সত্যি কোনো বিপদ না থাকে?

তখন বিপদ তৈরি করে নিতে হয়। বিপদ ঠিক নয়, বলব, চ্যালেঞ্জ। কারো বিরুদ্ধে দ্বৈরথ।

বুঝেছি। তুমি যেমন আমার বিপদ হয়ে এসেছ অথবা আমি তোমার বিপদ হয়ে। থুড়ি, চ্যালেঞ্জ।

তবে, তুমি মেয়ে না হলেই আমি খুশি হতাম।

কেন?

মেয়েদের সঙ্গে পুরুষের তো লড়াই-এর সম্পর্ক নয়।

তো? কিসের সম্পর্ক?

আদরের, ভালোবাসার।

তোমার বউ টিটিঙ্গি না ফিটিঙ্গি তোমাকে ছেড়ে গেল কেন?

টিটিঙ্গি তো মরে গেল। বেচারি। ছেড়ে গেছিল আমার প্রেমিকা, চিচিঙ্গা।

কেন?

সে ভালোবাসার মানেই জানত না। ও ছিল দু নম্বরি। জালি। আশ্চর্য! ভালোবাসার মানে কিন্তু খুব কম মেয়েরাই জানে। মাছেদের মেয়েরাও কি জানে?

টুনি হাসল যেন। জলের নিচে কুলকুচি করার মতন শব্দ হল।

কি? উত্তর দিচ্ছ না আবার হাসছ?

আহ্বক বলল।

টুনি বলল, পুরুষ মাছেদেরই জিজ্ঞেস কোরো। আমি কি করে বলব?

তুমি আমাকে ডুবিয়ে মেরে খুশি হবে?

কারোকে মেরে কেউই কি খুশি হয় কখনও?

তবে মারবে কেন?

তুমি আমাকে মারতে চাও যে। আমাদের দুজনের মধ্যে একজনকে তো মরতে হবেই।

কেন? মরতে হবেই কেন?

মৃত্যুকে মহান করার জন্যে।

আহ্বক চুপ করে রইল। উত্তর দিল না। বা দিতে পারল না গভীর জলের মাছের এই গভীর কথার।

বেলা পড়ে আসছে। জলের রং সবুজ থেকে নীল, নীল থেকে কালো হয়ে উঠছে। যদিও এখন শুক্লপক্ষ কিন্তু তবুও রাত নেমে গেলে হর্নেটস নেস্ট-এর নড়বড়ে জেটিতে উঠতে অসুবিধা হয়। আহ্বক এর বয়স হয়েছে বলে নয়, ভীরাপ্পানেরও হয়। জেটি তো নামেই। মেরামত হয়নি বহুদিন। তাছাড়া সবসময়েই ঢেউ থাকে তো। 'হর্নেটস নেস্ট'-এ নানান অসুবিধা। নইলে জলদস্যুরাও কি এমন নাম দেয় দ্বীপের?

তারপর দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ।

আহ্বক বললেন, তুমি একদিনও কামড় দাও না কেন আমার টোপ-এ?

তুমি যে টোপ দাও তা তো আমি খাই না। আমি মাছই খাই না। ওই টোপ দেবার বুদ্ধি তোমাকে কে দিয়েছে? ওই ঝাঁকড়া চুলো? আমি তিমি-হাঙরের মতো প্ল্যাংকটন খেয়ে বাঁচি। তুমি মানুষের মধ্যে যেমন অন্যরকম, আমিও মাছেদের মধ্যে অন্যরকম।

মাছ ছাড়াও তো অনেক কিছু দিয়ে দেখেছি। বঁড়শিতে গেঁথে। তাও তো তমি খাওনি। তুমি কি নিখাকি মাছ?

আমি কী খাই আর কী খাই না তাই যদি না জানো তবে কি করে আশা করো যে তোমার বঁড়শিতে আমি চুমু খাব? হাঃ।

একটা হাওয়া উঠল। পেছনের আকাশের অবস্থা যে কখন আস্তে আস্তে খারাপ হয়ে এসেছিল তা লক্ষ্য করেননি আহুক। শক্তিশালী আউটবোর্ড এঞ্জিনটা স্টার্ট করলেন। কিন্তু স্টার্ট হল না। মাছ ধরতে যখন আসেন তখন বড়ো বোট নিয়ে আসেন না। তাঁর তরুণী সুন্দরী মালকিনের প্রতি তিনি যথেষ্টই বিবেচক।

রোদ মরে যেতেই হাওয়াটা হঠাৎই ঠান্ডা হয়ে গেল। এবং খুব জোরে বইতে লাগল এলোমেলো। কালো, অথই জলে বড়ো বড়ো ঢেউ উঠতে লাগল। নৌকোর হালটা ঘুরিয়ে দিলেন আহুক। নইলে পাশ থেকে ঢেউ লেগে থেমে থাকা বোটটা হঠাৎ উলটেও যেতে পারে। প্রায়ই ভাবেন, একটা ক্যাটাম্যারন বানাবেন সাইড-কার লাগানো মোটরবাইকের মতো, কিন্তু হয়ে ওঠেনি। ক্যাটাম্যারনে উলটে যাওয়ার ভয় থাকে না। তাছাড়া, এ তো আর নদী বা খাল-বিল নয় যে বিপদ দেখে নোঙর করবেন। এখানে থামা নেই। শুধুই চলা। হয় চলো, নয় পঙ্গু, অসহায় স্থবিরের মতন জলে ডুবে মরো। কোনও মধ্যপন্থা নেই।

আবারও স্টার্ট করার জন্যে স্টার্টারের দড়ি ধরে টানলেন আহুক। কিন্তু এঞ্জিন তবু নীরব।

মাছটাকে যেন হঠাৎই খুব কাছেই একবার দেখতে পেলেন উনি। মেয়ে মাছ। টুনা নয়, টুনি।

সে বলল, চললাম, আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে। তুমিই আমার প্রাণ আবার তুমিই আমার যম। তাই তো এত ভালোবাসি।

কাকে?

তোমাকে।

তারপরই টুনি বলল, স্টার্ট করো এবারে। স্টার্ট হবে।

তুমি কী করে জানলে?

আমি জানি যে। তুমি কি জানো, এইসব দ্বীপপুঞ্জের মানুষেরা, এই সব সমুদ্রের মাছেরা কত দেবতার দয়াতে বাঁচে?

না তো। সমুদ্রের দেবতার নাম কী ওদের?

জুরুইন। জুরুইন বড়ো সর্বনাশা দেবতা। যার বাস জলে। আর ওদের ঝড়ের দেবতা পুলুগা, উলুগারই আরেক নাম বলতো পারো। তোমাকে আরেকবার কাছ থেকে বড়ো দেখতে ইচ্ছে করছিল তাই জুরুইনকে বলে তোমার এঞ্জিনকে মেরে রেখেছিলাম আমি। তোমাকে দেখা হল, এবার যাও। আহা, যাওয়া নেই এসো। আবার এসো।

দেখলে কেমন?

কি?

কি নয়, বলো কাকে?

কাকে?

আমাকে।

ভালোই। পুরুষ পুরুষ। পুরুষ মেয়েলি হলে ভালো লাগে না।

টুনি অন্ধকার জলে একটি দীর্ঘ অন্ধকারতর অপস্রিয়মান, হিল্লোলিত ছায়া হয়ে মিলিয়ে যেতেই আহুক-এর বোটের এঞ্জিন কথা বলে উঠল।

হালটা ঘুরিয়ে 'দ্যা হর্নেটস নেস্ট'-এর দিকে চললেন আহুক।

কম্পাস একটা থাকে সবসময়েই বুকে ঝোলানো। যখনই সমুদ্রে নামেন। তবে প্রয়োজন হয় না। উনি জানেন যে, যেদিন প্রয়োজন হবে সেদিন ওটা কাজে লাগবে না। এমনই হয়। উনি অনেক ঘাটের জল-খাওয়া মানুষ বলেই জানেন।

আজ সামনে রাত এবং দুর্যোগ। সামান্য আলোর আভাস এখনও আছে যদিও। বাঁ হাতে হালটা ধরে ডান হাতে কম্পাসটা দেখে নিলেন আহুক একবার।

আধো-অন্ধকারে খড়ের সাদা টুপি মাথায় দেওয়া, দৃঢ়, সুন্দর গড়নের বাদামি পুরুষ মানুষটি সাদা বোটটি চালিয়ে গুট গুট গুট গুট শব্দ করে পেছনের জলে ঢেউ তুলতে তুলতে এগিয়ে যেতে লাগলেন। মানুষটার উর্ধ্বাঙ্গে কোনও বসন নেই। কখনওই থাকে না। তবে চুল আছে। কাঁচা-পাকা। বুক ভরা। আর মাথার পেছন দিকে। এবং SALT AND PEPPER দাড়ি-গোঁফ। নাপিতও নেই, আয়নাও নেই, এখানে।

মেয়ে মাছটা জলের উপরে একবার নাক তুলে সেই বয়স্ক কিন্তু সুন্দর পুরুষের ঘামে-ভেজা-বগলতলির গন্ধ নিল দু-নাক ভরে। তারপর নিঃশব্দে হেসে, গভীর জলে চলে গেল তার সাদা পেট আর নীলচে-কালো পিছল পিঠে অতল জলের স্পর্শ এবং বিপরীত স্রোত অনুভব করতে করতে।

আহুক মনে মনে বললেন, মাছটা ভারি ভালো।

মাছটা এখন অনেকই নিচে চলে গেছে, যেখানে রোদ কখনওই পৌঁছোয় না। জল এখানে ভারি ঠান্ডা। তার এখন তো শীতকাল। যদিও শীত যাকে বলে, তা এখানে কখনওই আসে না। ছাই আর বিস্কিট-রঙা প্রবাল সেই গভীরে। নানা-রঙা লতা-গুল্ম, গাছপালা, জলজ শ্যাওলা, ছত্রাক আর নানারকম ভাসমান প্রাণ। ঠান্ডা জলে মানুষের মেয়েরা সন্ধেবেলা যেমন গা ধোয় তেমন করে সাঁতার কেটে কেটে তলপেট, বুকে, মুখে সমুদ্রের ফেনা ঘষে ঘষে মেয়েমাছটি, যার নাম দিয়েছে আহুক বোস টুনি, চান করতে লাগল। চান করতে করতে, সুন্দর হতে হতে মানুষের মেয়েরাও যেমন বলে, তেমন করে মনে মনে বলল, পুরুষ মানুষটা খুব ভালো। ওর সে চিচিঙ্গাটা নিশ্চয়ই বোকা অথবা পাজি ছিল। কেন যে ছেড়ে গেল! তার পুরুষ মাছটা যেমন ছিল, তেমনই।

টুনা মাছটা ভাবছিল, মানুষে আর মাছে কত মিল! বুদ্ধিতে যেমন, বোকামিতেও যেমন, পেজোমিতেও তেমন।

২

"অপরূপ সুন্দরী" বলতে বাংলাতে চলিতার্থে যা বোঝায় রংকিনী তা নয়। তবে তার গায়ের রঙটি ফলসা আর বেগনির মাঝামাঝি। তার গলার স্বরটি মৌটুসী পাখির মতনই মিষ্টি। ভারতের মতন এই ট্রপিকাল উপমহাদেশ যেহেতু অধিকাংশ মানুষের গায়ের রঙই কালো, কুৎসিত মানুষও ফরসা হলেই এখানে সুন্দর বলে গণ্য হয়। আবার যেহেতু অধিকাংশ মানুষই রোগা, সুতরাং মোটা মানুষকেও সুন্দর বলে মনে হয়। এটা অবশ্য পুরুষদের বেলাতেই বেশি ঘটে।

আশ্চর্য সব ধ্যান-ধারণা আমাদের।

রংকিনী ভাবে।

না, ও জানে যে, ও চলিতার্থে সুন্দরী নয় তবে সে অবশ্যই ব্যক্তিত্বময়ী, মেধাবী, দৃঢ়চেতা। সৌন্দর্যর উপাদান চোখ নাক চিবুক যতটা নয়, বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব তার চেয়ে অনেকই বেশি। নারীর এইসব গুণের মধ্যে যে সব ব্যতিক্রমী পুরুষ সৌন্দর্য দেখতে পান রংকিনী তাঁদের চোখে অবশ্যই সুন্দরী।

শিশুকাল থেকেই সে স্বাধীনচেতা। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরে তার আর্থিক স্বাধীনতা এবং অঢেল স্বোপার্জিত অর্থ তার সেই পুরোনো স্বাধীনতাবোধকে আরও দৃপ্ত করেছে। তার উদ্দেশ্যহীন, অসংযমী, বাস্তবজ্ঞানরহিত কিন্তু অবশ্যই সৃষ্টিশীল বাবা তাঁর নিজের সবরকম অপূর্ণতার,

অসফলতার কারণে তাঁর জীবদ্দশাতে রংকিনীর শ্রদ্ধা পাননি কোনওদিনও কিন্তু এক ধরনের সহমর্মিতা পেয়েছিলেন। একে সহমর্মিতা বলবে না করুণা, তা রংকিনী নিজেই ঠিক জানে না। হয়তো দয়াই। দয়া, কারণ পাওয়ার মতন কিছুমাত্রই পাননি সেই দুমুর্খ, ট্যাক্টলেস মানুষটি, বিবাহিত স্ত্রীর ভালোবাসা, সন্তানদের সম্মান, রাষ্ট্রের পুরস্কার। একজন স্বেচ্ছাচারী পুরুষের যা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সেই অর্থ অথবা অন্য অনেক কবি-সাহিত্যিক গায়কের মতন জনপ্রিয়তাও। না, কিছুই মানুষটা পাননি। আশ্চর্য। এইসবরের প্রতি মানুষটার আকর্ষণও ছিল না বিন্দুমাত্র। রংকিনী জানে যে, সত্যিই ছিল না।

ও মনে মনে বলত তার বাবাকে "অদ্ভুত লোক"।

তার বাবার মৃত্যুর পরে তাঁর অসংলগ্ন ডায়ারি, তাঁর লেখা অসংখ্য না-পাঠানো চিঠি, অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি, শেষ না-করা ছবি, বহু গানের অর্ধসমাপ্ত স্বরলিপি এইসব দেখে রংকিনীর অপরাধবোধ জেগেছে মনে বারবার। মনে হয়েছে যে, তারা দু ভাই-বোন কেউই তাদের বাবার প্রতি ন্যায় করেনি। তাঁকে একটুও বোঝেওনি। তাঁর মূল্যায়নই করেনি। যথার্থ মূল্যায়নের কথা তো ছেড়েই দিল। যেহেতু তাদের মা-ই তাদের কাছের মানুষ ছিলেন, যেহেতু তিনিই তাদের জন্যে "সব কিছু" করেছিলেন, তাই তাঁর প্রতিই তাদের মমত্ব, ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা ছিল অসীম। মাকে তারা দু ভাই বোনে SINGLE PARENT বলেই গণ্য করে এসেছে বাবাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে।

কিন্তু রংকিনীর বাবা অসমঞ্জ রায়ের মৃত্যুর পরে তাঁর প্রতিটি বই জনপ্রিয়তার শিখরে ওঠাতে তাদের পরিবারে মাসে লক্ষাধিক টাকা রয়্যালটি আসে শুধুমাত্র একটিমাত্র প্রকাশক-এর কাছ থেকেই। অন্যদের কাছ থেকেও কম আসে না।

কে জানে। সম্ভবত এই অভাবনীয় অর্থ চলে যাওয়া অসমঞ্জ রায়কে POSTHUMOUSLY খুব দামি করে তুলেছে রংকিনী কাছে। চলে যাওয়া বাবার রয়্যালটি আলোকবর্তিকা হয়ে তার বাবার নবমূল্যায়নে সাহায্য করেছে। বর্তমান পৃথিবীতে সবকিছুরই মূল্যায়ন সম্ভবত টাকা দিয়েই হয়। তবে একথাও সত্যি যে, তার বাবার লেখা একটি বইও রংকিনী আগে পড়েনি। পড়া আরম্ভ করেছে সাম্প্রতিক অতীত থেকে। এবং যতই পড়ছে ততই বড়ো অপরাধী বোধ করছে নিজেকে। বুঝেছে যে, তারা চলে-যাওয়া বাবার প্রতি তারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত অন্যায় করেছে। অথচ যে মানুষ চলে গেছে তার জন্যে করার তো আর কিছুই নেই।

জীবদ্দশাতে অসমঞ্জ রায়কে একটি অসভ্য অবাধ্য বেড়ালেরই মতন দেখেছে ওরা। বহুবারই, অলস, ভোলাভালা প্রকৃতির মানুষটিকে তাঁর পরিবেশ ও প্রতিবেশ থেকে বহু দূরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে এসেছে, মায়েরই নির্দেশে। কিন্তু বাহ্যত অভিমানহীন তিনি, আবারও একদিন হঠাৎ ফিরে এসেছেন পুরো পরিবারের চরম বিরক্তি ঘটিয়ে। নির্লজ্জর মতন হেসে বলেছেন, তোদের ছেড়ে কি বেশিদিন কোথাও থাকতে পারি আমি? বিশেষ করে রংকিকে ছেড়ে।

মা বলেছেন, ঢং দেখে বাঁচি না।

দাদা বলেছে, এলো ফিরে, ইটার্নাল বোর।

শুধু রংকিনীই কিছু বলেনি। মানুষটার পয়েন্ট অফ ভিউ বোঝার চেষ্টা করেছে। যদিও নীরবে। ওদের মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের বাবার সপক্ষে সোচ্চারে কিছু বলার সাহস ওর ছিল না। বলবার প্রয়োজনও বোধ করেনি। মা-ই অধ্যাপনা আর ছাত্রী পড়িয়ে বলতে গেলে সংসার খরচের সিংহভাগ চালাতেন। বাবা, কবিতা বা গান লিখে কখনো-সখনো সামান্য কিছু পেতেন। পেতেন ক্বচিৎ কদাচিৎ ছবি বিক্রি করেও। অথবা ক্বচিৎ গান গেয়েও। কিন্তু নিয়মিত রোজগার বলতে কিছুই ছিল না তাঁর। আজ রংকিনীর বাবা অসমঞ্জ রায় বেঁচে থাকলে তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা, অঢেল অর্থ নিয়ে অবশ্যই রীতিমতো বিব্রত হতেন। এই দুইয়ের কোনওটিরই অসমঞ্জ রায়ের প্রত্যাশা যেমন ছিল না, প্রার্থনারও নয়।

আন্দামানগামী প্লেনের জানালার পাশে বসে, চলে-যাওয়া বাবার কথা, এত সব পুরোনো কথা কেন যে মনে পড়ছিল, জানে না রংকিনী। তার জীবনযাত্রা এমনই হয়েছে যে কিছুমাত্র ভাবার সময়ই নেই। কাজের কথা ছাড়াও যে অন্য কোনও কিছুর কথা ভাবা যায় তা ও যেন ভুলেই গেছিল।

আজ সকালে ও বিছানা ছেড়েছিল শেষ রাতে। এখনও ঘুম লেগে আছে চোখে। দিল্লি কী ব্যাঙ্গালোরের বা ম্যাড্রাসের ফ্লাইট ধরতেও তো অন্ধকার থাকতেই উঠতে হয়। কিন্তু সে তো কাজে যাওয়া। তখন একেবারেই keyed-up হয়ে থাকে বিছানা ছাড়ার পর থেকেই। প্লেনে উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে, এমনকী ব্রেকফাস্ট খেতে খেতেও "প্রেজেন্টেশানের" কাগজপত্র দেখে। ব্রিফিং-এর নোটস। কিন্তু আন্দামানে তো আর কাজে যাচ্ছে না। বারো মাস, দিন-রাত, সারা দেশে এবং বিদেশেও ছুটোছুটি এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করার পরে এই ওয়েল-ডিসার্ভড হলিডেতে বেরিয়ে—পড়ে, প্লেনে ওঠার পরই সিট-বেল্ট বেঁধে নিয়েই তাই অজানিতেই ঘুমে এলিয়ে পড়েছিল। রংকিনী। টেনশানে টানটান শরীর যেন হঠাৎই ছেড়ে দিয়েছে। এলিয়ে পড়েছে, ভেঙে-পড়া এলো-খোঁপারই মতন।

ব্রেকফাস্ট যখন সার্ভ করতে আরম্ভ করল স্টুয়ার্ডেসরা তখন পাশে-বসা চুমকি ওর হাতে এক ঠ্যালা মেরে বলল, কী রে রংকি, ব্রেকফাস্ট তো খাবি। তোকে দেখে মনে হচ্ছে গত রাতে বুঝি তোর ফুলশয্যাই ছিল।

ঘুম ভেঙে, চোখ খুলে অল্প হেসে বিড়বিড় করে রংকিনী বলল, আমার তো রোজই ফুলশয্যা। রাতেই বা ক-ঘণ্টা ঘুমোই।

তারপর হাই তুলে বলল, বাবাঃ। পুরো ছুটিটা শুধুই ঘুমোব আর রিল্যাক্স করব।

চুমকি ওর সমস্যা বোঝে। সেও একাধিক বড়ো বড়ো পারিবারিক ব্যবসা অত্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে এবং সাফল্যের সঙ্গে চালায়। রংকিনীরই মতন, শুধু দেশের মধ্যেই নয়, সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াতে হয়। বললে, হয়তো অজ্ঞ মানুষেরা হাসবেন কিন্তু কথাটা সত্যি যে, কাজের জন্যে বিয়ে করার সময়টুকু তো বটেই কারোকে তেমন করে ভালোবাসার সময়টুকুও করে উঠতে পারল না। এই সমস্যা চুমকির একার নয়। আজকের দিনের অগণ্য ভারতীয় মেধাবী, স্বাধীন, স্বনির্ভর এবং সচ্ছল মেয়েদের অনেকেরই।

সাঁতার কাটবি না? স্যুইম-সুট এনেছিস তো?

চুমকি জিজ্ঞেস করল রংকিনীকে।

তা এনেছি।

তবে আর কী। তবে আন্দামানে কিন্তু সাঁতার কাটার জায়গা নেই বিশেষ। এখানে সমুদ্রতট বলতে আমরা যা বুঝি, তেমন কমই আছে। তাছাড়া জল হঠাৎই গভীর হয়ে গেছে। কোভালোম বা গোয়ার মতন নয়। পুরীর মতনও নয়।

তাই?

হ্যাঁ।

খাওয়াটা কন্ট্রোলে রাখতে হবে তাহলেই হল।

ফিগার কনশাস, গ্র্যান্ড-হোটেলের 'পিংক এলিফ্যান্ট' আর তাজ-বেঙ্গলের 'ইনকগনিটো'তে উইক এন্ডে নাচতে যাওয়া সেক্সি চুমকি বলল।

ব্রেকফাস্ট হয়ে গেলে রংকিনী আবারও ঘুম লাগাল। কত ঘুম যে জমে আছে না-নেওয়া ছুটিরই মতন! হিসেব নেই তার। এবারে ওর সঙ্গে চুমকিও ঘুম লাগাল।

এখন মেঘের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে প্লেন। নিচের বঙ্গোপসাগর দেখাই যায় না। তাছাড়া অত উঁচু থেকে সমুদ্রকে তো বোঝাই যায় না সমুদ্র বলে। বড়ো বড়ো ঢেউ ভেঙে পড়ায় যে ফেনা আর বুদ্বুদ ওঠে তা সরু সরু সাদা অস্পষ্ট সাপের মতন দেখায় নিচের কালচে জলভূমির উপরে।

চারদিকে আদিগন্ত কালো জলভূমির মধ্যে অমন হাজার হাজার সাদা সাদা কিলবিলে সাপ চোখে পড়ে। অবশ্য আকাশ যখন নির্মেঘ থাকে তখনই। প্লেন যখন অনেকখানি নিচে আসে তখনই শুধু সমুদ্রকে সমুদ্র বলে চেনা যায়।

ওরা দুজনেই গাঢ় ঘুমে ছিল। এমন সময়ে প্লেনের মধ্যে হঠাৎই একটা হুড়োহুড়ির শব্দ শুনে চোখ মেলতেই অডিয়ো-সিস্টেমে সিট-বেল্‌টে বাঁধবার নির্দেশ এল। প্লেনটা অনেকই নিচে নেমে এসেছে। সমুদ্র তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছেই জলের উপরে, তাছাড়া বিভিন্ন ভঙ্গিমাতে, বিভিন্ন গড়নের সবুজ রোমশ প্রাণীর মতন নানা ভূখণ্ডও দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। চাপ-চাপ ছোপ-ছোপ সবুজ। নিবিড় আদিম জঙ্গল, প্রাগৈতিহাসিক বনস্পতি। আরও নিচে নামলে বোঝা গেল যে ঘনসন্নিবিদ্ধ ঘাস-পাতাতে মাটি দেখাই যায় না মোটে। শুধু দু এক জায়গাতেই সিঁদুরে রঙা মাটির চোখে পড়ে, ওড়িশার পাহাড়ে পাহাড়ে, মহুলসুখাতে বন্ধ হয়ে যাওয়া OPEN CAST ম্যাঙ্গানিজ আকরে খনিগুলির সিঁদুর রঙের মতন। নইলে, শুধুই সবুজ আর সবুজ। উপর থেকে দেখা সবুজ দ্বীপগুলির নরম স্নিগ্ধতা বড়োই নয়নলোভন।

এই তাহলে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ!

মনে মনে উত্তেজিত হয়ে ভাবল রংকিনী।

ওরা দুজনেই জানালাতে ঝুঁকে পড়ে বাইরে দেখতে লাগল। প্লেনের মধ্যের ওই দুপ-দাপ হুড়োহুড়িটা, অনেক যাত্রীই নিজের নিজের সিট ছেড়ে যেদিকে সুন্দরতর দৃশ্য সেদিকের জানালার দিকে ভিড় করার প্রবণতার জন্যেই হচ্ছিল। স্টুয়ার্ডেসরা মিষ্টি কথার বকা ঝকাতেও যখন যাত্রীদের সামলাতে পারছিলেন না তখন ক্যাপটেনকে নালিশ করে দেবার ভয় দেখালেন। প্রত্যেককে সিট-বেল্‌ট পরে নিজের নিজের সিটে বসে থাকতে নির্দেশ দিলেন তাঁরা কঠিন মুখে।

ক্যাপটেনও বললেন অডিয়ো-সিস্টেমে যে, সকলে স্থির হয়ে না বসলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

এমনভাবে প্লেনটা এ-পাহাড়ে সে-পাহাড়ে মাথা টপকে, বগলতলি দিয়ে, কান ঘেঁসে একবার ডানদিক একবার বাঁদিক, একবার উঁচু, একবার নিচু হয়ে উচ্চতা হারাতে হারাতে নামতে লাগল যে সত্যিই মনে হল প্লেনের মধ্যে ওই সময়ে অমন হুড়-দাড় করলে, ভারসাম্য হারিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া আদৌ আশ্চর্য নয়।

তারপরেই, দুটো পাহাড়ের মাঝ দিয়ে গিয়ে দুটি পাহাড়ের বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে হঠাৎই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের নিভৃত স্তনসন্ধিতে উঁকি মারল জেট-ইঞ্জিনের বোয়িং প্লেনটা।

চুমকি স্বগতোক্তির মতন বলল, তুই কি সেশ্যেল্‌স দ্বীপপুঞ্জে গেছিস কখনও?

রংকিনী মাথা নাড়ল।

তারপর বলল, না। বেড়াতে আর কোন দেশেই বা গেছি। কাজে গেলে তো এক মুহূর্তও অবসর জোটে না। একবার হাজারিবাগ আর একবার রিখিয়াতে বেড়াতে গেছিলাম। ওঃ, মনে পড়েছে। একবার বান্ধবগড়ে গেছিলাম। মধ্যপ্রদেশে।

রিখিয়া? সেটা আবার কোথায়?

চুমকি বলল, ভুরু তুলে।

যশিডির কাছেই। ইরা মাসিদের বাড়ি আছে। সেখানে পাখি আছে অনেক। খুব নির্জন জায়গা। সুন্দর। যদিও একটু ন্যাড়া-ন্যাড়া।

ইরা মাসি কে?

কবি বিষ্ণু দের বড়ো মেয়ে।

ও! আমি চিনি না। আমি কজনকেই বা চিনি।

তারপর বলল, সেশ্যেল্‌স-এ বাবা একবার আমাদের নিয়ে গেছিলেন। তখন বাবা তানজানিয়ার ডার এস সালাম-এ কী যেন একটা 'টার্ন-কি প্রজেক্ট' করছিলেন।

সেশ্যেল্‌স?

হ্যাঁ রে। সে যে কী পরীর দেশ, তোকে কী বলব। 'মাহে' এয়ারপোর্টের উপরে প্লেনটা যখন নামতে থাকে নানা সবুজ দ্বীপের মধ্যে মধ্যে, তখন যেন সমুদ্রের একেক রকম রং ফুটে ওঠে। স্বপ্নেও বুঝি এত সুন্দর দেশ দেখা যায় না।

মানে?

রংকিনী বলল।

মানে, কোরাল রিফস আছে তো জলের নিচে। কোনও জায়গাতে কোরালের রং গাঢ় সবুজ, কোথাও ফিকে নীল, কোথাও গোলাপি, কোথাও কমলা। সত্যি! দেখে মনে হয়, কোনও স্বপ্নের বা রূপকথার দেশেই বুঝি এলাম।

জলের নিচে রাজপুত্র নেই?

রংকিনী বলল।

আরে, রাজপুত্র তো আছে সব জায়গাতেই। আমরা এই পোড়ারমুখিরা খুঁজে পাই না, এই যা!

বলেই বলল, কোরালের বাংলা কি রে, জানিস?

প্রবাল।

ও হ্যাঁ। তাই তো। ভুলেই গেছিলাম।

তারপর বলল, আমার বাবার একটি কবিতার বই ছিল। "প্রবাল দ্বীপে একা।" আশ্চর্য! অথচ জীবনে কখনওই প্রবাল দ্বীপ দেখার সুযোগ হয়নি তাঁর।

রংকিনী বলল, হঠাৎ উদাস হয়ে গিয়ে।

দেখেছেন। দেখেছেন। উনি নিশ্চয়ই দেখেছেন। তবে কল্পনায়। কবিরা তো আমাদের মতন রিয়্যাল, মানডেন জগতের বাসিন্দা নন। কল্পনাতে দেখাই তো আসল দেখা। ইয়ারো আনভিজিটেড। মনে নেই?

সেশ্যেল্‌স দেশটা কোথায়? রংকিনী জিজ্ঞেস করল।

এখন তো কেবল টিভির দৌলতে সকলেই ঘরে বসে ট্রাভেল চ্যানেল খুলে সেশ্যেল্‌স-এ বেড়িয়ে আসে। তবে যে যাই বলুন, নিজেরা পায়ে ভর করে সেখানে গিয়ে দাঁড়ানো আর ঘরে বসে টিভিতে সেই দেশ দেখার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত আছে। নিজে পায়ে হেঁটে কোনও জায়গাতেই না ঘুরতে পারলে ঊ্য ক্যানট হ্যাভ দ্যা "ফিল" অফ দ্যা প্লেস।

তা ঠিক। তবে জায়গাটা কোথায় তা তো বলবি।

পৃথিবীর ম্যাপে তোকে খুবই কষ্ট করে খুঁজে বের করতে হবে। ভারত মহাসাগরে মরিশাস, জাঞ্জিবার আর আফ্রিকার মধ্যে সরষে দানার চেয়েও ছোটো গোটাকয় বিন্দু দেখতে পাবি। অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখাই বোধহয় সুবিধা।

কেন? ওরকম কেন?

ওইরকমই। জানি না, পৃথিবীতে অত ছোটো দেশ আর আছে কি না। অমন দ্বীপপুঞ্জ সম্ভবত আর নেই।

তারপরই বলল, ওই দ্বীপপুঞ্জের রাজধানীর নাম ভিক্টোরিয়া। দ্বীপের নাম মাহে। ছোটো হলে কী হয়! এত সুন্দর সমুদ্রতট পৃথিবীর খুব কম দেশেই আছে। ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরাও হার মানে। একসময়ে জলদস্যুদের ঘাঁটি ছিল সেশ্যেল্‌স। এখনও ওখানকার নানা জায়গাতে, অনেক কোম্পানি ফ্লোট করে অনেকেই জলদস্যুদের পুঁতে রাখা গুপ্তধন খুঁড়ে বের করার চেষ্টা করছে।

তাই?

ইয়েস ম্যাম।

রংকিনী বলল, সত্যি। তোর সঙ্গে যে এয়ারপোর্টে দেখা হয়ে যাবে তা ভাবতেই পারিনি। তোর

তো পৃথিবীতে অদেখা দেশ খুবই কমই আছে। তা এত দেশ থাকতে তুই আন্দামানের আসা ঠিক করলি কেন?

আমি তো আন্দামানে প্রায় প্রতি বছরই আসি। ছুটি কাটাতে তো আসিনি। কখনও কখনও একাধিকবার। বিশেষ করে, গত পাঁচ বছরে। মানে, আসতে হয়ই। এটাও কাজ বলে ধরতে পারিস। আমার ঠাকুমার নারকোল গাছের বাগান ছিল এখানে। খুবই শিক্ষিতা কিন্তু বিষয়ী মহিলা ছিলেন তিনি। জলের দামে কিনেছিলেন আজ থেকে ষাট বছর আগে। একটি আস্ত দ্বীপ বুঝলি! গত বছর তো ঠাকুমা দেহ রেখেছেন। আমার বিয়ের যৌতুক হিসেবে ওই দ্বীপটি দিয়ে গেছেন আমাকে ঠাকুমা।

বিয়ের যৌতুক মানে?

মানে, আমার যবে এবং আদৌ যদি বিয়ে হয়। সেটা নাও হতে পারে। তবে সম্পত্তিটা হয়েছে।

তুই দ্বীপ-কুমারী! গোটা দ্বীপই যখন দিলেন তখন প্রবাল দ্বীপের রাজপুত্রও দিতে দোষ কি ছিল? গল্পের মতনই শোনাচ্ছে। সত্যি।

কয়েক লক্ষ নারকোল গাছই ছিল শুধু। অন্যান্য অগণ্য জংলি গাছ তো ছিলই। তা আমারই সম্পত্তি যখন তার দেখাশোনার দায় তো এখন আমারই।

তুই একটা পুরো দ্বীপের মালিক। ভাবা যায় না। পুরুষ হতাম যদি তো শুধু এইজন্যেই তোকে বিয়ে করতাম।

ছেলেবেলাতে ঠাকুমা নিজেই দেখাশুনো করতে আসতেন। আমাকেও নিয়ে আসতেন স্কুল বা কলেজ ছুটি থাকলে। তবে এবারে আমি আন্দামানে বেড়াতেও আসিনি, প্ল্যানটেশানের কাজ দেখতেও যাচ্ছি না। কারণ, একজন হোলটাইম ম্যানেজার রেখেছি। তিনি থাকতে কারোই আর কিছুই দেখার দরকার নেই।

তবে কী করতে এসেছিস এবারে?

এবারে এলাম শুধু তাঁরই সঙ্গে দেখা করতে। জাস্ট টু সে "হাই"।

বাবাঃ। এমন করে বলছিস যেন "দর্শনে" এলি কারো। কোনও দেব-দেবীরই বুঝি? আফটার অল, তিনি তো তোর কর্মচারীই, যে নামেই ডাকিস না কেন তাঁকে।

ঠিক তা নয়, তা নয় রে রংকিনী। এমন অনেক কর্মচারীও থাকেন যাঁরা মালিককেই ধন্য করেন. এমন অনেক পুরস্কার-প্রাপকও যাঁরা পুরস্কারদাতাকেই মান দেন তা গ্রহণ করে।

কোনও বয়ফ্রেন্ড? ওল্ড ফ্লেম? কে তোর সেই ম্যানেজার? রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।

তুই কলেজের রবীন্দ্রজয়ন্তীতে একবার একটা গান গেয়েছিলি না? "যতবার আলো জ্বালাতে চাই নিভে যায় বারে বারে।" ফ্লেম একবারই জ্বলল না এখনও তার আবার ওল্ড আর নিউ। ভালোই বলেছিস তুই। হেসে বলল, চুমকি।

রংকিনী বলল, বাজে কথা বলিস না।

কী বাজে কথা! আগে আমরা জানতাম না? "Sweet Seventeen yet unkissed."হায় হায়। আমি এখন সুইট থার্টিফোর অথচ ইয়েট আনকিসড। কেউ বিশ্বাস করবে? বল?

রংকিনী হেসে উঠল চুমকির কথাতে। এইরকম করেই কথা বলে ও সেই স্কুলের দিন থেকেই।

চুমকির বাবার বিশ্বজোড়া ব্যবসা। কোটিপতি মানুষের মেয়ে, নিজেও নিজের দাবিতে কোটিপতি না হলেও মিলিয়নিয়র তো অবশ্যই। কিন্তু শিশুকাল থেকেই কোনোরকম চালিয়াতিই করতে দেখেনি রংকিনী চুমকিকে। চমৎকারভাবে মানুষ করেছিলেন মাসিমা তাদের এক ছেলে

আর দুই মেয়েকে। এমন বড়ো একটা দেখেনি রংকিনী বাঙালি কোটিপতিদের মধ্যে, যদিও তার কাজের সূত্রে অনেক কোটিপতিদের সঙ্গেই মিশতে হয়েছে ও হয়।

চুমকি বলল, সত্যি। আমরা একেরেই যা তা।

রংকিনী বলল, আমি তো তোর চেয়েও এক বছরের বড়। প্রায় বুড়িই বলতে পারিস। বিয়ে-টিয়ে ছেড়ে দে, আজ পর্যন্ত একটা "অ্যাফেয়ার"ই হল না।

শারীরিক অ্যাফেয়ারে কথা বলছিস?

দুসস। সে তো কুকুরীদেরও হয় যখন তখন। মনের অ্যাফেয়ারের কথা বলছি। রিয়্যাল অ্যাফেয়ার।

এমন মুখ করে রংকিনী কথাটা বলল, যেন ধনেপাতা আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে মাখা এক প্লেট চালতাই কেউ নিয়ে গেল ওর হাতে থেকে ছিনিয়ে।

রংকিনী বলল, সত্যি। আমাদের মতন কেরিয়ার-গার্লদের বিয়েটিয়ে করা পোষায়ও না। এই তো রিমা বিয়ে করল সেদিন!

কোন রিমা?

আরে প্রেসিডেন্সির। আবার কোন রিমা? বাচ্চাও হল। বাচ্চাটাকে একেবারেই দেখতে পারত না। হাউ ক্রুয়েল অফ হার। লোকে কুকুরের বাচ্চাকেও ওর চেয়ে যত্ন করে মানুষ করে। বাচ্চা যখন ছ-মাসের তখনই তার বরের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। সে নাকি হোমো হয়ে গেছে। শ্যামল সেনগুপ্ত। আ স্টুপিড গাই। আমি অবশ্য একবারই মিট করেছি তাকে। কী করে যে রিমা অমন একটা শিংহীন হামবাগ ছাগলকে বিয়ে করল জানি না।

ইসস। বলিস কি? হাউ স্যাড।

আর স্যাড! সারা পৃথিবী জুড়েই তো এখন ছাগলদের রাজত্ব। হোমো আর লেসবিয়ানদেরও রাজত্ব। সমস্তরকম স্বাভাবিকতাকেই পশ্চিমি পৃথিবী বিসর্জন দিতে বসেছে। আমারও অন্ধের মতন অনুগমন করছি তাদের। আমার আন্দামানে আসা তো এই জন্যেই। সেই মানুষটার সঙ্গে দুটো কথা বললেই আমি সঠিক পথের নির্দেশ পাই। আই ক্যান কারেক্ট মাই বেয়ারিংস। আই মিন ইট। রিয়্যালি।

রংকিনী একটু অবাকই হল। তাকিয়ে থাকল চুমকির মুখের দিকে। এমন সময়ে ওর বিস্ময়কে বোমার মতন বিস্ফারিত করে প্লেনটা ল্যান্ড করল।

ভেরি ব্যাড ল্যান্ডিং।

চুমকি স্বগতোক্তি করল।

ব্রেকও করল ক্যাপটেন খুবই জোরে। পাখির ডানার মতন ডানা উঁচিয়ে প্লেনের ব্রেক যখন কাজ করে তখন দেখতে বেশ লাগে।

এয়ারপোর্টটি যথেষ্ট লম্বা নয় এবং সেইজন্যেই অত জোরে ব্রেক করতে হল হয়তো।

ভাবল, রংকিনী।

প্লেনটা ট্যাক্সিইং শেষ করে টারম্যাকের শেষ প্রান্তে গিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে পার্কিং বে-তে এসে যখন নিশ্চল হল, ওরা নিজেদের হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে উঠল সিট ছেড়ে।

প্লেনের বাইরে এসেই খুব ভালো লাগল রংকিনীর। ভারি শান্ত জায়গা। সমুদ্রের মধ্যে ঘন সবুজ পাহাড়ে আর জঙ্গলে ঘেরা দ্বীপ। মাঝে মাঝে সবুজ কাঁচুলি, ঘেরা লাল মাটির বুককে চিরে কালো পিচ-এর পথ চলে গেছে। শান্ত, নির্জন, অন্যরকম।

রংকিনী স্বগতোক্তি করল, বাঃ! এতদিনে আসা হল আন্দামানে।

BAY ISLAND RESORTS-এর মাঝারি সাইজের বাসটি দাঁড়িয়েছিল এয়ারপোর্টের বাইরে। লাগেজ এলে, দুজনে নিজেদের লাগেজ শনাক্ত করার পরে হোটেলের লোকই লাগেজ নিয়ে গিয়ে বাসে তুলল। তারপর ওরা দুজনে হ্যান্ডব্যাগ হাতে সেই বাসের দিকে এগোল। উপরে

সুনীল রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ। হু হু করে হাওয়া আসছে আড়ালে-থাকা সমুদ্র থেকে। অবকাশ, অবসর, নিজেকে, নিজের বড়ো ভালোবাসার শরীর এবং মনকে পুনরাবিষ্কারের ছুটি।

খুব জোরে একটি প্রশ্বাস নিল রংকিনী আকাশে মুখ তুলে।

ড্রাইভার এসে বসল ড্রাইভিং সিট-এ। বাসটা ছেড়ে দিল। মাসটা ডিসেম্বর হলে কী হয়, বেশ গরম। রোদ, এই সকালেই চড়া। তবে হু হু হাওয়া আছে। সমুদ্রপারে যেমন হয়। লক্ষ করল রংকিনী যে, এই হাওয়াটা তেমন আর্দ্র নয়। যেমন হবে ভেবেছিল।

কেন যে নয়, তা ও বলতে পারল না।

৩

"হর্নেটস নেস্ট" দ্বীপ থেকে পোর্টব্লেয়ারে যখন কাজে আসতে হয় আহুককে তখন সেদিনই ফেরা যায় না বলেই রাতটা বে-আইল্যান্ড হোটেলেই থাকেন। তার মালকিন চুমকি রায়-এর তেমনই ইনস্ট্রাকশান দেওয়া আছে এই হোটেলে। টাকা তাকে দিতে হয় না। সই করে দেন বিল। কলকাতার অফিসে বিল চলে যায়, সেখান থেকেই পেমেন্ট আসে সরাসরি।

ভোর কি হয়ে এল?

রেডিয়াম-দেওয়া হাতঘড়িটা বেডসাইড টেবল থেকে তুলে ইচ্ছে করলেই দেখতে পারতেন। কিন্তু দেখলেন না। সাম্প্রতিক অতীত থেকে সময়কে নিঃশর্ত ছুটি দিয়ে দিতে ইচ্ছে যায়। আসুক দিন, যখন তার খুশি, যদি তার ইচ্ছে হয়।

রাতের বেলাই এইরকমই মনে হয় আহুক-এর। রাতে বিছানা ছেড়ে উঠলে, জানালার পাশে বা বারান্দাতে এসে দাঁড়ালে আজকাল প্রায়ই এরকম হয়। যৌবনের দিনগুলির কথা মনে পড়ে যায়, ছেলেবেলার বই-এর উপরে সাঁটা জলছবিরই মতন। কিন্তু সেই সব ছবি অতীতকালে ছবি। স্মৃতির পাণ্ডুলিপিতে বহুবর্ণ কিন্তু প্রাণহীন প্রজাপতিরই মতন সেঁটে গেছে। আজ তারা উঠে এসে, জীবন এঁটে বসবে যে, তার কোনওই উপায় নেই। সাধ্য নেই কারোই যে, সেইসব ছবি অতীত থেকে তুলে এনে তাঁর আজকের জীবনে ফিরিয়ে আনে। অন্য কারো তো নেই-ই, আহুক-এর নিজেরও নেই।

শেষ রাতে আবারও উঠলেন তিনি পোর্ট ব্লেয়ারের এই বে-আইল্যান্ড হোটেলের সমুদ্রমুখী ঘরের বিছানা ছেড়ে। টয়লেটে গেলেন। নিশুতি রাতে ফ্লাশ-টানার শব্দে দু-একবার নিজেই চমকে উঠলেন। ভয় পেলেন যে, পাশের ঘরের মধুচাঁদা দম্পতির ঘুম বুঝি ভেঙে যাবে। হয়তো ভেঙে যাবে এই নিদ্রামগন দ্বীপের রাতের ঘুমও। লজ্জা হয়, নিজের ইনকনসিডারেশানের জন্যে, নিঝুম নিস্তব্ধ পরিবেশে এইরকম আকস্মিক জলজ শব্দ করার জন্যে। আসলে, দূর সমুদ্রে এক জনমানবহীন দ্বীপে একেবারে একা থেকে "কনসিডারেশান ফর আদারস" কথাটাই তিনি ভুলে যাচ্ছেন। জংলি স্বভাবের তিনি চিরদিনই ছিলেন। এখন নব্বই ভাগ জংলি হয়ে গেছেন স্বভাবে চরিত্রে। আরও কিছুদিন থাকলে হয়তো আন্দামান নিকোবরের ওঙ্গে, শোম্পেন এমনকী জারোয়াদেরই মতো হয়ে যাবেন।

পুরোপুরি জংলি হওয়া বড়ো সুখের। মুশকিল এই আহুকদের মতন আধা-জংলিদেরই।

জীবনের পথে বহুদূর হেঁটে আহুক বোস আজকে বুঝেছেন যে, একজন মানুষ, সে মানুষ যদি প্রকৃতই সৎ হন, যদি ভণ্ড ও খল না হন, যদি মিথ্যাচারী না হন, তবে তিনি নিজেকে যতখানি ঘৃণা করেন সেই ঘৃণা তাঁর প্রতি পৃথিবীর অন্য সকলের ঘৃণার যোগফলের চেয়েও অনেকই বেশি হয়। ব্যাপারটা বৈপরীত্যের সংজ্ঞা যদিও। কিন্তু সত্যি। একশো ভাগ সত্যি।

আশ্চর্য। তেষট্টি বছর বয়সে পৌঁছে আজ কত কী-ই না ভাবেন বোঝেন তিনি, যেসব ভাবনা পঞ্চাশে বা চল্লিশে বা তিরিশেও ভাববার কথা কল্পনাও করতে পারতেন না। একজন পাঁচটি যুগ পার হয়ে এসে, নিজের আয়ুর প্রায় সবটুকুই খরচ করার পরে যা বোঝেন, যা জানেন, তা তার পক্ষে আগে ভাবা বা বোঝা বোধহয় আদৌ সম্ভব হয় না। অথচ এমনই ঋতি এবং রীতি এই মনুষ্য জীবনের যে তাঁর চেয়ে কমবয়সি কারো হাতেই তাঁর জীবনময় অভিজ্ঞতার ছিটোফোঁটাও তুলে দিয়ে যাবেন যাবার আগে, তাও হবার নয়। হয়তো সব মানুষের চরিত্রই এই যে, অন্যের শিক্ষাতে শিক্ষিত হতে তাঁরা কেউই আদৌ চান না। যা তাঁরা শেখেন, যতটুকু শেখেন, তা নিজেরই হাত পুড়িয়ে, ভুল কুড়িয়ে। আহুক-এর তাই যেমন অন্যের কাছেও শেখা হয়নি কিছু তাঁর নিজের জীবনভর অভিজ্ঞতাও শেখানো হয়নি কারোকেই। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে একজনও শিখতে চায়ওনি।

পোর্ট ব্লেয়ারের বে-আইল্যান্ড হোটেলের এই সমুদ্রমুখী ঘরটার একদিকে সিলিং থেকে নীচ অবধি কাচের স্লাইডিং-ডোর, যেদিকে সমুদ্র। সেই কাচের দরজা খুললেই একটি সমুদ্রমুখী বারান্দা। পর্দাটা সরিয়ে, বাতানুকূল ঘরের ভিতরেই দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকালেন উনি। শেষ রাতে এখন বাইরের সমুদ্রের উপরে এলোমেলো হাওয়া, তবে গরম তেমন নেই। সন্ধের পরই ঠান্ডা হয়ে যায় যদিও তবু ওই হাওয়ার এলোমেলোমি থেকে বাঁচতেই স্লাইডিং-ডোর টেনে এয়ার কন্ডিশনার চালিয়েই শুয়েছিলেন। আইল্যান্ডটি ডানদিকে দেখা যাচ্ছিল একটি অন্ধকার পিণ্ডর মতন হোটেলের স্যুইমিং পুল-এর পাশের ঝাউবনের ফাঁক দিয়ে। আজ শুক্লা পঞ্চমী কিন্তু পূর্ণিমাতেও দূর সমুদ্রের দ্বীপকে রহস্যময় এবং কালোই দেখায় দূর থেকে।

এলোমেলোমি আর অগোছালোমিই একদিন আহুক বোস-এর জীবনের নিশান ছিল অনেকই দিন। এখন এলোমেলোমিকে উনি খুবই ভয় পান। জীবনের সব ক্ষেত্রেই পা ফেলার আগে বহুবারই ভাবেন। সাহস কমে গেছে। কমে গেছে শরীরের বল। রিপুরা একে একে ঘুমোতে যাবার তোড়জোড় করছে। এই পৃথিবী ছেড়ে যাবার আগে নিজেকে, নিজের পরিবেশ প্রতিবেশকে একটু গোছগাছ করে রেখে যেতে চান। যেন কেউই না বলতে পারে যে, মানুষটা পৃথিবীকে মলিন করে দিয়ে গেছিল। মনে পড়ে যায় যে, তাঁকে ছেড়ে যাওয়া স্ত্রী টিটিঙ্গি খুবই গোছানো ছিল। এই সংসারে কার যে কোনটা গুণ আর কোনটা দোষ তা যখন বোঝা উচিত তখন আদৌ বোঝা যায় না। বোঝা যায় অনেকইদিন পরে। যখন সে মরে যায়, কী ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু তখন ভুল শোধরাবার আর উপায় থাকে না কোনও। তখন বোঝেননি, বোঝেন এখনও। অন্যাকে বুঝতে বুঝতেই জীবন শেষ হয়ে যায়। প্রত্যেকেরই জীবন। সময়ে যদি বোঝা যেত তবে কী সুন্দরই না হত সকলেরই জীবন।

আজকে বিকেল থেকেই সমুদ্র ভারি অশান্ত। অবিরত বড়ো বড়ো ঢেউ ভাঙছে। কত যুগের অব্যক্ত প্রেম আর বিরহ, হাসি আর কান্না যেন গুমরে গুমরে ওঠে বালুবেলাতে সমুদ্রের ভেঙে-পড়া ঢেউগুলির বুকের মধ্যে থেকে। ফসফরাস হঠাৎ হঠাৎ আলতো উজ্জ্বল হাত বুলিয়ে দিয়ে যায় ভেঙে পড়ার আগের মুহূর্তের অগণ্য ঢেউয়ের মাথাতে আর গায়ে, কোনও নারীর চকিত প্রেমের অস্ফুট অভিঘাতের মতন। তারপর লোলচর্ম বুড়ির স্বগতোক্তির মতন বিজবিজ— ফিশ ফিশ করে সমুদ্র চাপা কান্না কাঁদে, তটে গড়াতে গড়াতে। মৎস্যগন্ধী হাওয়াতে তটময় দৌড়ে-বেড়ানো কাঁকড়ারা তাদের ছোটো ছোটো বাঁকা হাতে সান্ত্বনা দিতে যায় চিরদিনের একা সমুদ্রকে। কিন্তু সমুদ্র সান্ত্বনা নেয় না কারোই, যদিও সে জন্ম-একা, যদিও সে অনাদিকাল থেকেই এমনই নিরবধি নিরুচ্চারে কাঁদে।

এই বাবদেই আহুক বোস ভাবেন সমুদ্রের সঙ্গে তাঁর যেন মিল আছে কোথায়। সমুদ্র এবং তাঁর নিজের একলা বুকেও এপর্যন্ত অনেকই এঁটেছে। জীবনে অনেকই পেয়েছেন সমুদ্র এবং আহুকও।

কিন্তু কোনও প্রাপ্তিকেই তাঁদের ক্ষুদ্র মালিকানার ঘেরাটোপে শুধুমাত্র নিজেদেরই কুক্ষিগত করে রাখবার মতন নীচ মনোবৃত্তি ছিল না তাঁদের দুজনের কারোই। যা কিছুই সমুদ্র নেয়, তা আবার ফিরিয়েও দেয় অবলীলায়, সম্পূর্ণ নির্মোহভাবে। সে ফুলই হোক, কী শব।

এমন এমন রাতে, আজকাল এমন এমন এলোমেলো ভাবনা হঠাৎ-ভাঙা ঢেউয়ের মাথাতে ঝিলিক দিয়ে ওঠা ফসফরাস-এরই মতন হঠাৎ হঠাৎ তাঁর মস্তিষ্কের মধ্যে জ্বলে উঠেই নিভে যায়।

সমুদ্র মস্ত বড়, গহন গভীর। অসীম তার রহস্য। সর্বগ্রাসী জিগীষা নিয়েও মানুষ এখনও তল পায়নি এই অতল রহস্যের। মধ্যরাতে সমুদ্রের দিকে চেয়ে উনি ভাবছিলেন মানুষের ঔৎসুক্য বড়ো বেশি নোংরা। প্রকৃতির সব গোপন রহস্যই সে তার নোংরা আঙুলে ছিঁড়ে-ছেনে দেখতে চায়। মূর্খ পুরুষেরা জানে না যে, প্রকৃতির আর নারীর সব মাধুর্যই তাদের রহস্যময়তারই মধ্যে।

গতকাল দুপুরে পোর্ট ব্লেয়ারে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি অসময়ের ঝড়টা হঠাৎই এসেছিল, প্রবল বৃষ্টির সঙ্গে। ওই দুর্যোগের মধ্যে মনো-ইঞ্জিনের বোটে করে একা একা প্রায় কুড়ি knot দূরে তাঁর নিজের দ্বীপে পৌঁছোনোর চেষ্টা করা আর আত্মহত্যা করা সমার্থকই ছিল। তাঁর জীবন এখন শীতের সমুদ্রের মতন টানটান। পানাপুকুরের মতন স্থির, কোনও আলোড়ন আর উঠবে না তাতে, তবু আত্মহত্যা করার কোনও ইচ্ছে নেই তাঁর। জীবনের গতিপ্রকৃতির কথা আগে থাকতে কেই বা বলতে পারে! কার জীবনে কখন যে আলো থাকতে কী ঘটে তা জানা যায় না বলেই তো এখনও জীবন এত ইন্টারেস্টিং।

যেমন হঠাৎ দুর্বার অভিমানের মতন সে ঝড় এসেছিল দুর্বোধ্য প্রেমিকের মতন সে হঠাৎই চলে গেছে রাত নামার পর পরই। এখন মধ্যরাতের আকাশ পরিষ্কার। পোর্ট ব্লেয়ারের bay-র শেষে সমুদ্রের বিভাজক পাহাড়টির শেষ প্রান্তের নিদ্রাহীন লাইটহাউসটির আলো নিশ্চিত নিখুঁত গতি এবং যতিতে সমুদ্র এবং এই পোর্ট ব্লেয়ারকে তীব্র ঝলকানির নিঃশব্দ চাবুক মেরে যাচ্ছে বারে বারে। সেই চাবুক পড়ছে তাঁর ঘরেও। আন্দামনের পোর্ট ব্লেয়ারের সেলুলার জেল-এর ওয়াচ টাওয়ারের প্রহরীরা একসময়ে আলোর চিরুনি বুলিয়ে বুলিয়ে সেখানকার দেশপ্রেমী মুক্তিকামী কয়েদিদের সারারাত এস্ত এবং বিন্যস্ত করে রাখত। বহুদূরের বাতিঘরের আলোর চাবুক কার বা কাদের বিন্যস্ত করতে চায় কে জানে!

আরেক ঘুম দিয়ে উঠলেই ভোর হয়ে যাবে। সকাল চারটেতেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে যেতেই ভোরের হাওয়াটা যেন জোর হয়। এই সময়ে 'চিড়িয়া টাপু'তে থাকলে কত বিচিত্র সব পাখির স্বর শোনা যায়। পাখি অবশ্য তাঁর দ্বীপেও অনেকই আছে। তবে যে-পাখির খোঁজ করতে এই আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে আহুক এসেছিলেন সেই পাখির দেখা আজও পাননি। হয়তো পাবেনও না। জীবনের বেলা তো পড়ে এল। প্রত্যেক মানুষই সারা জীবন ধরে কোনও না কোনও পাখি খোঁজে। সেই পাখি হরেক রকম হয়। কেউ তার পাখিকে পায়, কেউ পায় না। কিন্তু খোঁজে সকলেই।

আবার তিনি শুয়ে পড়লেন পর্দাটা টেনে দিয়ে। বাতিঘরের এই চাবুক-মারা আলোটা সব কেমন বে-আবরু করে দিয়ে যায়, অবিন্যস্তও।

প্রথম যৌবনের অভ্যেসবশেই আহুক সম্পূর্ণ নগ্ন না হয়ে শুতে পারেন না। দূরাগত দ্বীপের সেই প্রবল শক্তিশালী আলো তার নগ্নতাকে তাঁর নিজের কাছেও উন্মোচিত করুক, তা চান না তিনি। এই রাতভর আলোর চাবুককে তিনি সহ্য করতে পারেন না। হিমালয়ান ভাল্লুকের মতন একজন রোমশ পুরুষও যে এমন প্রজাপতির মতন লাজুক হতে পারেন একথা ভাবলে তাঁর নিজেরই হাসি পেয়ে যায়। সর্ব-উন্মোচনকারী আলোকে সইতে পারেন না। কারণ, এ আলো শুধু তাঁর শরীরই নয় মনের নিভৃত ঘরেও উঁকি মারে, গোপনীয়তাকেও ছিঁড়ে-খুঁড়ে দেয়।

ভোর হবে আজও। প্রতি রাতেই শুতে যাবার আগে পরদিন ভোরের জন্যে প্রার্থনা থাকেই প্রত্যেক মানুষেরই মনে। কার জন্যে কী যে বয়ে আনবে সেই ভোর, তা কে জানে!

দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুলেন আহুক। পাশের খাটের বালিশটিকেও টেনে নিলেন পাশবালিশ করে। আজ অনেক বছর হয়ে গেল বালিশের সঙ্গেই তাঁর শোওয়া। এই বন্দোবস্তেই অভ্যস্ত হয়ে গেছেন পুরোপুরি। বালিশের উপরে মাথা দেওয়া মানুষের মুখ বড়োই অস্বস্তি ঘটায়। আরামের ব্যাঘাত ঘটায়। পুরোনো দিনে, লখনউয়ের নবাব পরিবারের স্ত্রী-পুরুষেরা সকলেই 'গল তাকিয়া' ব্যবহার করতেন। হয়তো আজও করেন। পাশ ফিরে শোবার সময়ে গালের নিচে নীলনদের উপত্যকার কাপাস তুলো দিয়ে বানানো সেই আতরগন্ধী রেশমি ওয়াড়-পরনো পাতলা বালিশ নিয়ে শুতেন তাঁরা। দু-উরুর মাঝে পাশবালিশ তো থাকতই, একটু উষ্ণতার জন্যে।

এই মুসলমান জাতটার বড়ো ভক্ত আহুক। না, হাজারিবাগের ফিরদৌসি একদিন তাঁর প্রেমিকা ছিলেন বলেই নয়। অন্য নানা কারণেও। এই জাতটা বাঁচতেও যেমন জানে, মরতেও জানে। ত্যাগের চরম যেন করতে জানে, ভোগেরও চরম। বড়ো জিন্দাদিল, মন-মউজি জাত এই মুসলমানেরা। চান করা, খাওয়া-দাওয়া, শোয়া, গান-বাজনা মনের এবং শরীরের প্রেম সব ব্যাপারেই এঁদের এক বিশেষ স্বকীয়তা আছে। এরা নকলনবিশ আদৌ নন।

কে জানে। কেমন আছে হাজারিবাগের ফিরদৌসি? তারও তো ষাট বছর বয়স হতে চলল। নাতি-নাতনি নিয়ে ভরা সংসার। চুল পেকে গেছে নিশ্চয়ই। তবে ফিরদৌসির চুল পাকলে পাকা পাটের মতন সোনালি হবে সে চুল, শনের মতো সাদা হবে না। হয়তো কিছু দাঁতও পড়ে গেছে। চোখে উঠেছে চালসে চশমা। হয়তো। তা হোক। ভালোবাসার জনকে পাকা-চুলে, ভাঙা দাঁতে দেখতে আরও বেশি ভালো লাগে। কলপ যারা লাগায়, কী পুরুষ কী স্ত্রী, সেই মানুষগুলোর মধ্যে অধিকাংশই ভণ্ড হয়। আহুক, ভণ্ডামির মতন ঘৃণা আর কিছুকেই করেন না। অথচ ভণ্ডদেরই তো রাজত্ব এখন।

চারদিকে সমুদ্রঘেরা এক নির্জন দ্বীপে থাকেন বলে সুখেই আছেন তিনি। নানারকমের সুখে। তাঁর মনের বনের মধ্যেই যে সব চেনা-অচেনা অন্য প্রাণীদের বাস তারা ছাড়া বাইরের কেউই পারে না তাঁর শান্তি নষ্ট করতে।

আবারও একসময়ে ঘুমিয়ে পড়লেন উনি নানা অসংলগ্ন ভাবনার এলোমেলোমির অলিগতিতে হারিয়ে গিয়ে। যখন জাগবেন তখন আর স্বপ্ন থাকবে না কোনও। থাকবে না কোনওরকম অহঙ্কারের বা হীনম্মন্যতার অস্পষ্টতাও। দিন বড়ো বেশি স্পষ্ট। রাতের বেলা তাঁর প্রতি-রাতের নগ্নতারই মতন। নগ্নতা বা দিন সুখের এবং নিশ্চিন্তির হয়তো হতে পারে, আরামেরও হতে পারে, কিন্তু সুন্দর কখনওই নয়। যেখানে অথবা যাতে অস্পষ্টতা নেই, রহস্য নেই, অতি সামান্য হলেও, আড়াল নেই, তাকে সুন্দর বলে কখনওই মানা যায় না। আহুক অন্তত মানেন না।

কাল সকাল কি ওঁর জন্যেও সুন্দর কিছু বয়ে নিয়ে আসবে? নতুন কিছু? প্রতি রাতেই মাঝরাতে উঠে যখন দ্বিতীয়বার ঘুমোন তখন এই ভাবনা আসে তাঁর মাথাতে।

"বিফল সুখ আশে জীবন কি যাবে? কবে আসিবে হরি, কবে পথ দেখাইবে" অতুলপ্রসাদের সেই গানখানি মনে আসে। নীপুদিদি বড়ো ভালো গাইত গানটা। নীপুদিদি এখন কোথায় কে জানে। ভরা তেইশ বছর বয়সে হাজারিবাগের রিফর্মেটরির লেক-এ ডুবে মরেছিল। গলাতে পাথর বেঁধে, লাফিয়ে পড়েছিল জলের উপরে ঝুঁকে-পড়া একটা পিপ্পল গাছের ডাল থেকে। পাশের বাড়ির নীপুদিদি খুব ভালোবাসত আহুককে। জীবনে অনেক নারীর ভালোবাসাই পেয়েছেন আহুক আজ অবধি কিন্তু সে এক অন্যরকম ভালোবাসা, ভোরের শুকতারার মতন।

সমুদ্রে যখন মাছ ধরার জন্যে একটা নৌকো নিয়ে ভেসে যান আহুক, যখন সন্ধে হয়ে আসে, নীল-সবুজ জল যখন বিষণ্ণ কালো হয়ে ওঠে, যখন সন্ধেতারাটা ওঠে সামুদ্রিক দিগন্তে, তখন কোনও কোনও সন্ধেতে নীপুদিদি তাঁর সঙ্গে কথা বলে জলের নিচ থেকে। নীপুদিদি মাত্র দু-বছরের বড়ো ছিল আহুক-এর চেয়ে।

চারদিকে সমুদ্রঘেরা আন্দামানের এইসব দ্বীপে, এই নির্মম নির্জনতায় এখনও অনেকই রহস্য বেঁচে আছে। সেইসব রহস্য কখনও কখনও ভয় পাওয়ায় মানুষকে কিন্তু অধিকাংশ সময়েই আনন্দও জোগায়। অনাবিল আনন্দ। সেই আনন্দকে এই সব দ্বীপের বিষণ্ণতারই মতন ব্যাখ্যা করে বলা যায় না।

বোঝাই যায় না, আর বলা!

৪

চুমকি আর রংকিনী পোর্ট ব্লেয়ারের একটি পাহাড়ের উপরের বে-আইল্যান্ড হোটেলের রিসেপশনের একতলা নিচের, সমুদ্রমুখী, দেওয়ালহীন বসার ঘরে একেবারে রেলিং ঘেঁষে বসেছিল। যাতে, সমুদ্রের সবচেয়ে কাছে বসা যায়। এখান থেকে ঢিল ছুড়লেই সমুদ্রে পড়ে। বাঁদিকে BAR। এই বার-এ হোটেলে যাঁরা থাকেন, তাঁরা ছাড়া বাইরে থেকেও কিছু মানুষ আসেন। তবে সভ্য-ভব্য। 'বার' শব্দটাই যেমন অনেকের মনে ভীতির উদ্রেক করে তেমন ভীতিজনক নয় এই বার। বার-এ ভিড়ও খুব কম।

দুপুরের খাওয়ার পরে সেলুলার জেল দেখে এসে, আকুয়া-স্পোর্টস কমপ্লেক্স-এ সমুদ্রের মধ্যে স্পিডবোট চালানোর পর ওই হোটেলেরই একটি টাটা-সুমো গাড়িতে চেপে ওরা হোটেলে ফিরে চানটান করে এসে এখন বারান্দাতে বসেছে। সকালে প্লেন থেকে নামার পরে ব্রেকফাস্ট করে ঘুম লাগিয়েছিল। কী ঘুমেই যে ধরেছে ওদের! অবিরত টেনশনে টানটান স্নায়ু এই ছুটিতে, এই নির্জনতায় এই অবকাশে যেন একেবারে শ্লথ হয়ে গেছে। দিলরুবার তার সব ঢিলে করে দিলে কোনো ভ্যাবাচ্যাকা কাচপোকা তাতে উড়ে এসে বসলেও তা ঝংকৃত হয় না তেমনই এখন ওদের মন ঢিলে হয়ে গেছে। সায়ার বা সালোয়ারের দড়ি ঢিলে দিলে যখন মন শুধু ঢিলেই হয় না, প্রত্যাশিত-অপ্রত্যাশিত নানা ঘটনার জন্যেও তৈরি থাকে অথচ উদ্বিগ্ন থাকে না আদৌ, ওদের মনের অবস্থাও এখন প্রায় সেরকমই।

একটু পরেই সন্ধে হয়ে যাবে। কলকাতা থেকে পোর্ট ব্লেয়ার আরও অনেকই পুবে। তাছাড়া এখানের চারিদিকেই হাজার মাইল সমুদ্র বলে তাতে দিনের আলো অনেকক্ষণ ধরে প্রতিফলিত, প্রতিসরিত হয়। তাই মনে হচ্ছে, সন্ধে নামতে নামতে কম করে সাতটা সোয়া সাতটা হয়ে যাবে।

মিনিট পনেরো আগে পশ্চিমের আকাশ কালো করে বৃষ্টি এসেছিল। হাওয়া উঠেছিল এলোমেলো। বন্দরেও এখনও ড্রেজিং হচ্ছে মনে হয়। একটা ছাদওয়ালা দুপাশ খোলা অদ্ভুত আকৃতির মোটরবোট গেরুয়া-রঙা বালি ভর্তি করে বন্দরের দিক থেকে এসে বাইরের খোলা সমুদ্রে চলে যাচ্ছে। কোথায় যে বালি ফেলছে তা হোটেলের বারান্দাতে বসে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ বাদে বাদে খালি বোটটা আবার ফিরে আসছে বন্দরের দিকে। কে জানে! সকাল থেকেই হয়তো যাতায়াত করছে বোটটা। ওরা দুপুরে দোতলার খোলা ডাইনিংরুমে বসে খাবার সময়েও লক্ষ্য করেছে। বৃষ্টি এখন থেমে গেছে কিন্তু আকাশে মেঘ আছে। সেই মেঘের আড়াল ভেদ করে এক আশ্চর্য সুন্দর কোমল আলো ফুটেছে যা বসন্তের রিক্তবনের প্রাক-সন্ধের কনে-দেখা আলোর মতো নয়। এ আলোর রঙটা ঠিক কমলা নয়, সাদাটে। কিন্তু অনেক বেশি বিধুর।

রংকিনী ভাবছিল, এই আলোর রঙের নামটি পৃথিবীর কোনও শিল্পীর প্যালেট খুঁজেই পাওয়া যাবে না। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীর আঁকা এ ছবি। সামনের পাহাড়টি, ডানদিকের রসস্ আইল্যান্ড, সামনের সমুদ্র সে যে কী এক আশ্চর্য সুন্দর বৈধব্যর বেশ পরেছে তা অবর্ণনীয়।

এমন সময় অশ্রুতপূর্ব একটা আওয়াজ করে একজোড়া বেশ বড়ো সামুদ্রিক পাখি রসস আইল্যান্ডের দিক থেকে উড়ে বাঁদিকে গেল। ঝুঁকে পড়ে, পাখি দুটিকে দেখল ওরা। পাখি দুটির পেটটুকুই শুধু দেখতে পেল। রুপোলি পেট। মস্ত বড়ো বড়ো পাখি। তবে হাঁস নয়।

কী পাখি রে? জানিস?

রংকিনী জিজ্ঞেস করল চুমকিকে।

চুমকি বলল, এসব পাখিফাকি চেনেন মিস্টার বোস। যখন আলাপ হবে তখন বিবরণ দিয়ে জিজ্ঞেস করিস, তিনি ঠিক নাম বলে দেবেন।

তারপরে হেসে, দক্ষিণ-বাংলার ভাষায় বলল, পাখির মইদ্যে আমি চিনি শুধু মদনটাকী!

সেটা কি পাখি?

কে জানে? মাতলা নদী বেয়ে একবার বোটে করে পিকনিক-এ গেছিলাম। উঁচু ডাঙাতে বসে-থাকা পাখির নাম বলেছিল সারেং।

তাই?

বলেই, অন্যমনস্ক হয়ে গেল রংকিনী। কেন যে হল, তাও নিজেই জানে না।

সেলুলার জেল-এর সিঁড়ি উঠতে উঠতে চুমকি নাম বলেছিল তার ম্যানেজারের। অদ্ভুত নাম। আহুক বোস। ডাহুক পাখির কথা শুনেছে। দেখেওছে কয়েকবার বহরমপুরের মামাবাড়ির পেছনের ডোবাতে কিন্তু আহুক শব্দটি কখনও শোনেনি। কি মানে, তা কে জানে!

আহুক।

চুমকি সে ভদ্রলোক সম্বন্ধে অনেক কিছু উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললেও একজন বৃদ্ধ ভাম সম্বন্ধে ওর কোনও ইন্টারেস্টই জন্মায়নি। বয়সটা যদি পঁয়তাল্লিশের মধ্যেও হত তাহলেও না হয় পাণ্ডববর্জিত দ্বীপে একটা মেমোরেবল অ্যাফেয়ার হলেও হয়ে যেতে পারত। অনেকই বেলা বয়ে গেছে জীবনে অনবধানেই। অনেক সুদর্শন কৃতবিদ্য যুবক তাকে চেয়ে ফিরে গেছে। মনস্থির করতে পারেনি রংকিনী। প্রাইভেট সেক্টরে যে ধরনের প্রতিযোগিতার এবং অত্যন্ত বেশি মাইনের চাকরি সে করে, তাতে কেরিয়ার আর বিয়ে একসঙ্গে সহবাস করে না। ও , এ জীবনে অন্য নদীতে ভেসে গেছে। এখন আর উজান বেয়ে ফেরা যাবে না। তাই এত এবং এতরকম যুবাকে অবহেলা করে আজ কোনও বুড়োর প্রতি কোনও কারণেই কোনও আকর্ষণ বোধ করার প্রশ্নই ওঠে না। রংকিনীর সময় বড়ো কমই বাকি আছে, হাতে। সেই সময় নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কোনও ইচ্ছা অথবা উপায়ই তার নেই।

কী সুন্দর লাগছে, না রে রংকিনী?

চুমকি স্বগতোক্তির মতো বলল।

হুঁ।

রংকিনী বলল। স্বগতোক্তিরই মতো যেন অনেকই দূর থেকে।

তারপর বলল, কী করে সন্ধে হয়, কী করে ভোর আসে তা শুধু প্লেনের জানালা দিয়েই দেখি আজকাল। পৃথিবীটা যে এত সুন্দর তা ভুলেই গেছিলাম যেন। না থাকলে কি এসব দেখা যায়? শুধু চলা আর চলা। অবিরত।

অনেক বছর আগে "রিডার্স ডাইজেস্ট"-এ একটি লেখা পড়েছিলাম, জানিস, "হাউ ইভিনিং কামস"। কার লেখা মনে নেই, কিন্তু লেখক ঠিক এই কথাটিই লিখেছিলেন। দিন কী করে আলোকিত হয় আর সেই আলো কী করে নেভে তা দেখার সময়টুকু আমাদের কারই বা আছে আজকাল। অথচ এই সবই আশ্চর্য আনন্দের আধার। সিম্পল, ইনোসেন্ট প্লেজারস। এসব দেখার চোখই হারিয়ে গেছে আমাদের।

রংকিনী বলল অনুশোচনার গলাতে, যা বলেছিস।

চুমকি একটু চুপ করে থেকে মুখ তুলে বলল, একটা গান শোনাবি রংকি। কতদিন তোর গান শুনিনি।

তারপর যেন হঠাৎই মনে পড়ে যাওয়াতে বলল, মনে আছে? স্কুলে আমরা রবীন্দ্রনাথের "কালমৃগয়া" করেছিলাম। তুই ঋষিপুত্র সেজেছিলি। কী সুন্দর দেখাচ্ছিল তোকে।

রংকিনীর মুখ, ফেলে-আসা ছেলেবেলার কথা মনে হওয়াতে এক আশ্চর্য সুন্দর হাসির আভাসে আভাসিত হল, বাইরের এই সুন্দর সামুদ্রিক সন্ধের বিধুর অনুপম আলোরই মতো।

রংকিনী বলল, মনে নেই আবার।

"বেলা যে চলে যায় ডুবিল রবি
ছায়ায় ঢেকেছে ঘন অটবী"।

আর তুই হয়েছিলি লীলা। তোকেও দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছিল।

"ও দেখবি রে ভাই, আয় রে ছুটে, মোদের বকুল গাছে/ রাশি রাশি হাসির মতো ফুল কত ফুটেছে/ কত গাছের তলায় ছড়াছড়ি গড়াগড়ি যায়/ ও ভাই সাবধানেতে আর রে হেথা দিস নে দলে পায়"

ওরা দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠল। বহুদিনের পুরোনো কথা মনে পড়ে যাওয়াতে।

রংকিনী বলল, মনে আছে চুমকি, তোর শাড়ি খুলে গেছিল স্টেজে।

খুব জোরে হেসে উঠল রংকি।

বলল, মনে আবার নেই। মিস চ্যাটার্জি যা বকেছিলেন না। কান্নার চোটে আমার মেক-আপই গলে গেছিল।

সত্যি। ছেলেবেলার দিনগুলো যে কী ভালো ছিল, তাই না?

'মেয়েবেলা' বল। বলল, রংকিনী। তসলিমা নাসরিন কয়েন করেছেন শব্দটা।

তাই?

হ্যাঁ রে।

এই সব হাসময়ী-লাস্যময়ীরা তো শুধু আধুনিক গান গাইলেই পারেন। নয় তো যাত্রাতেও চলে যেতে পারেন স্বচ্ছন্দে। বছরে কুড়ি-পঁচিশ লাখ রোজগার করবেন অনেকেই। এইসব নব্যযুগের রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইয়েরা, কী পুরুষ, কী নারী এক বছরেই যা রোজগার করছেন তা সারা জীবনেও সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন, জর্জ বিশ্বাস বা সুবিনয় রায়রা করেননি। রবীন্দ্রসঙ্গীতে এদের কাছে নিছকই টাকা রোজগারের মেশিন। নিষ্ঠা, নিবেদন, শ্রদ্ধা কিছুই নেই।

Bad money drives away good money. বুঝলি না! এখন জীবনের সব ক্ষেত্রেই ইকনমিক্স-এর সেই GRESHAM সাহেবের MAXIM-ই লাগু হয়েছে। ওই সব গাইয়েদের মধ্যে অনেকের আবার ধারণা শুধুই রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে যাঁরা আজীবন সাধনা করলেন তাঁরা না কি ঈর্ষায় কাতর হয়ে পড়েছেন নতুনদের রোজগার দেখে। বাংলাভাষাতে "অনুকম্পা" বলে যে একটা শব্দ আছে তা বোধহয় এই নয়া-জমানার সর্ববিদ্যা পারংগম গায়িকারা জানেন না।

শুধু গায়িকাই কেন? তেমন তেমন লাঠি-ঘোরানো রঘু ডাকাতের মতন গায়কও কি এসে উপস্থিত হননি রঙ্গমঞ্চে? দাড়িওয়ালা গায়ক, গোঁফওয়ালা গায়ক, দাড়িগোঁফওয়ালা গায়ক। সবাই রবীন্দ্রসঙ্গীতের অথরিটি। তাঁরা সব নতুন "টার্গেট অডিয়েন্স" খুঁজে বেড়াচ্ছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যেন অন্তরিক্ষ থেকে তাঁদেরই শরণাপন্ন হয়েছেন, অ্যাড-এজেন্সিরই মতন, তাঁর গানের জনপ্রিয়তা বাড়াবার জন্যে। আসলে 'জনগণ' বলতে রাজনীতির মানুষেরা যা বোঝেন, ওইসব গায়ক-গায়িকারা যা বোঝেন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের জন্যে তাঁর গান কোনওদিনও বাঁধেননি। এই ইললিটারেটদের ডেমোক্র্যাসিতে প্রথমদিন থেকেই অশিক্ষিতরা এবং তাদের নিরন্তর ভোগলা-দেওয়া নেতারাই সর্ব নিয়ন্তা হয়েছেন। Opimion of the masses.Opinion of the quantitative মাসেস, অ্যান্ড নট দ্যাট অফ দ্যা Qualitative ফিউ-ই ম্যাটার করে।

এইসব গায়কদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এমনই ভূতগ্রস্থ দৃঢ়মতি, এবং নিজের বিশ্বাসে এমনই অনড় যে, বলছেন, "যতদিন আমাকে ইট মেরে উঠিয়ে না-দেওয়া হচ্ছে ততদিন আমি গিটারের সঙ্গে এমন বিকৃত রবীন্দ্রসঙ্গীতই গেয়ে যাব।" তেমন তেমন গাইয়ের আবার তাবড় তাবড় রাজনৈতিক এবং সামাজিক পৃষ্ঠপোষকও জুটে গেছেন। তাঁরা UNANIMOUS RESOLUTION নিয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথের পিণ্ডি না চটকে তাঁরা আদৌ ক্ষান্ত হবে না। "বড়োলোকের শখ" হিসেবে পৃষ্ঠপোষণ মন্দ শখ বলে গণ্য নয় কিন্তু পোষণ করার আগে পিঠটাকেও বাজিয়ে নেবেন না তাঁরা? সেটা কাছিমের পিঠ? না জেলিফিশের পিঠ তা তো দেখবেন।

এইসব গায়ক হয়তো জানেনেই না যে প্রকৃতই যাঁরা রবীন্দ্রানুরাগী এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন তাঁরা ইট মারা দলে কোনওদিনও ছিলেন না। থাকবেনও না। অমন "ইট-মারা সংস্কৃতি" মানুষেরাই ওঁদের গান শুনতে আসেন এবং আসবেন। তবে, কী আর করা যাবে? যাঁরা দলে আছেন, তাঁরাই আজ লাভবান। ILLITERATE MAJORITY কে তাঁদেরই মতো কিছু অসৎ ও দুষ্ট প্রকৃতির মানুষেরাই ভাঙিয়ে খাচ্ছেন। যে কোনও TRADITION-ই গড়ে তুলতে লাগে বহুদিন কিন্তু তা ভাঙতে লাগে সামান্যক্ষণ। যাঁদের Conserve করার কিছু থাকে তারাই তো Conservative হন। অথচ এই বক্রগতি স্বার্থান্ধ মানুষদের মতেই তো রাজ্য চলছে। দেশ চলছে, স্থির পায়ে এগিয়ে চলছে পরম সাংস্কৃতিক, সাংগীতিক, এবং সাহিত্যিক সর্বনাশের দিকে। তাতেও কি সাধ মেটেনি তাঁদের? বেচারি "বুর্জোয়া" রবীন্দ্রনাথকে কি ছেড়ে দেওয়া যেত না? এতদিন পরিত্যাজ্য হয়েই তো বেশ ছিলেন। হঠাৎ তাঁকে RESSURECT করে এত হল্লাগুল্লা কিসের?

তুই ঠিকই বলেছিস। কিন্তু এটাও ঠিক যে-সব পুরুষ ও মহিলা শিল্পী শুধুই রবীন্দ্রসঙ্গীত গান, তাঁদের মধ্যেও প্রচুর আতা-ক্যালানে ও ফস্‌স্ আছেন। তাঁরা অশিক্ষিতও বটেন।

'আতা-ক্যালানে', 'ভোগলা', 'ফস্‌স্' এইসব বিচ্ছিরি শব্দ কোথা থেকে শিখলি রে তুই? তোর মুখে এসব বেমানান লাগে।

সবই শিখেছিলাম চামেলির কাছে। ভাষাতে যত নতুন শব্দ যোগ হয় ততই তো ভাষার 'যোশ' বাড়ে। হলই বা তা স্ল্যাং।

'যোশ'ও কি বাংলা?

না। কিন্তু অন্য ভাষার শব্দ নিতেই বা বাধাটা কোথায়?

রবীন্দ্রসঙ্গীত যাঁরা গাইবেন তাঁদের রবীন্দ্র প্রভাবিত হতে হবে যে, এটা মানি: রবীন্দ্রনাথের গদ্য, কবিতা, প্রবন্ধ পড়তে হবে, সেই 'পূর্ণ মানুষ' টিকে জানার আন্তরিক আগ্রহ থাকতে হবে। তা না হলে, সেই রবীন্দ্রসঙ্গীত নিছকই "স্বরলিপি পঠন" হবে নয়তো নিছক "ঢং" বা তথাকথিত "রাবীন্দ্রিক ন্যাকামি।" এই ন্যাকামির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজে কিন্তু কখনওই ছিলেন না।

আসল কথাটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে যে বা যাঁরা ভালো করে না পড়েছেন, তাঁর রুচিতে আবিষ্ট না হয়েছেন, তাঁদের জন্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত কখনওই নয়। শিক্ষার সঙ্গে, সাহিত্যমনস্কতার সঙ্গে, সুরুচির সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীত জড়িয়ে গেছে।

তোর গলা আর গায়নভঙ্গি কিন্তু এখনও চমৎকারই আছে। গান ছাড়লি কেন?

ছাড়িনি ঠিক। এখনও শরীর ভালো থাকলে এবং মনে খুশি থাকলে চানঘরে গাই। শুধু গানই নয়, অনেক স্বপ্নই এখন শুধু চানঘরে বেঁচে আছে। আমি যেদিন নিজের বাড়ি বানাব সেদিন আমার বাড়ির মোট জমির দুই-তৃতীয়াংশ থাকবে বাগান আর বাকি এক তৃতীয়াংশের এক তৃতীয়াংশ হবে চানঘর। শিসমহলের মতন। নিচ থেকে আধ মিটার ছেড়ে চারদিকের দেওয়াল তিন মিটার মোড়া থাকবে আয়না দিয়ে।

বাঃ দারুণ আইডিয়া তো। কিন্তু অমন চানঘরে একা চান করতে কি ভালো লাগবে?

বোকাই তুই এক নম্বরের। দোকা হয়ে গেলে কি আর রোমান্স থাকবে অত? খোড়-বড়ি-খাড়া খাড়া-বড়ি-খোড়। একা বলেই তো এত স্বপ্ন!

গান গাস না, তবু কী ভালোই গাইলি!

জানিস, যে রাতে গানটা শুনলাম, সারারাত পূরবী যে মূর্ছনা তুলেছে আমার কানে অস্ফুট স্বপ্নের মধ্যে।

সত্যি, ভাব ব্যাপারটাই আজকাল অধিকাংশ গায়ক-গায়িকার গলাতে দেখি না। রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা ছেড়েই দিলাম। যাঁরা সাহিত্যই পড়েন না তাঁরা রবীন্দ্রনাথের গান গাইবেন কী করে।

কখন যে বেলা পড়ে গেছে, আলো নিভে গেছে, সমুদ্রের জল কালো হয়ে গেছে। সমানের পাহাড়ের ডান প্রান্তে লাইটহাউসটার আলো জ্বলে উঠেছে। আলোটা ঘুরছে চক্রাকারে।

আজ বোধহয় শুক্লাপঞ্চমী, চাঁদ উঠেছে কিন্তু একফালি। মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। ভাঙা ঢেউয়ের মাথায় মাথায় লক্ষ লক্ষ রুপোলি আলোর সাপ নিয়ে খেলা করছে কোন অদৃশ্য অমোঘ সাপুড়ে।

এমনই হয়। স্কুলের দুই বন্ধুর যদি অনেকদিন পরে দেখা হয়, তাদের আর্থিক সামাজিক, মানসিক স্থিতি যদি প্রায় একই তল-এর হয়, তবে গল্প আর শেষ হতে চায় না।

চামেলির খবর কি রে? যোগযোগ কি আছে?

চামেলি হাওড়ার ব্যাঁটরা না কোথায় থাকত। পদবি ছিল কুন্ডু। ওর ঢালাইওয়ালা-ফিলদি-রিচ হোঁদল-কুতকুত বাবার নাম ছিল ধ্বজা কুন্ডু। ক্লাস টেনে পড়তে পড়তেই ওদের পাড়ার একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রির সঙ্গে ও বাড়ি ছেড়েছিল। মনে আছে? খুব ওরিজিনাল এবং প্রবল নিজস্বতার অধিকারী ছিল কিন্তু চামেলি। চোয়াড়ে চেহারা ছিল ছেলেটির। ইন্টারমিডিয়েট ফেল। কালো মাথাভর্তি চুল। লম্বা-চওড়া। আর ঘোরক্যাবলা।

ঘোরক্যাবলাটা আবার কি জিনিস?

ওমা। ক্যাবলার ক্লাসিফিকেশান নেই? ঘোরক্যাবলা, ঘনঘোরক্যাবলা, হোপলেসক্যাবলা, আরও কত রকম আছে।

তাই?

নামও ছিল ভ্যাবলা।

এখন শুনেছি, ব্যবসা করে খুবই বড়োলোক হয়েছে।

তা 'আতা-ক্যালানে' বলত কাকে চামেলি? আমার তো মনে পড়ছে না।

আরে 'আতা-ক্যালানে' বলত ওদের পাড়ার একগাদা-ফরসা, ঘাড়ে-পাউডার দেওয়া, রাজেশ খান্নাকে নকল-করা লক্কা পায়রা ঢালাইওয়ালা, তেলকলওয়ালা, চালকলওয়ালা, পয়সাওয়ালাদের সব ছেলেদের, যারা ওকে বিচ্ছিরি হাতের লেখা এবং ভুল বাংলাতে 'লব-লেটার' লিখত।

আবারও জোরে হেসে উঠল রংকিনী।

বলল, সত্যি। তোর মনেও থাকে কিছু চুমকি।

ওরা দুজনে গল্পে মশগুল ছিল এমন সময়ে হঠাৎ দেখল একটা প্রকাণ্ড বড়ো এবং সাদা রঙা আলো-ঝলমল জাহাজ লাইটহাউসটা যে পাহাড়ে আছে তার ওপাশ থেকে এসে নিঃশব্দে মোড় নিল। মনেই হচ্ছে না চলছে বলে, এত আস্তে আসছিল জাহাজটা। সম্ভবত জাহাজ যত বড়ো হয় ততই আস্তে চলছে বলে মনে হয়। কিন্তু সংক্ষিপ্ত হলে কি হয়, এমনই তার জোর যে চতুর্দিকের সমুদ্রজলে এবং দ্বীপে-দ্বীপে তার অনুরণন উঠল। BAR থেকে বারম্যান-এর এক অ্যাসিস্ট্যান্ট দৌড়ে এসে ড্রইং রুম-এর কাঠের রেলিং ধরে দাঁড়াল।

বলল, হর্ষবর্ধন।

ওরাও দেখছিল। এই তাহলে কলকাতা থেকে সমুদ্রর মধ্যে দিয়ে আসা যাত্রী জাহাজ হর্ষবর্ধন!

শি শুড হ্যাভ কাম ও উইক ব্যাক। দেয়ার ওজ সাম ট্রাবল অ্যাট দ্যা ক্যালকাটা পোর্ট। বারম্যান বলল।

হোয়াট ট্রাবল?

স্ট্রাইক অর বনধ, গো-স্লো অর সামথিং লাইক দ্যাট। টুমরো উ্য উইল গেট বিয়ার ফর ইয়োর শ্যান্ডি।

ওরা বিকেলে ঘর্মাক্ত হয়ে ফিরে আসার পর লেমনেডের সঙ্গে বিয়ার মিশিয়ে শ্যান্ডি করে খাবে ভেবে বারম্যানের কাছে চুমকি বিয়ারের খোঁজ করছিল। বারম্যান বলেছিল, আমাদের বিয়ার হর্ষবধনে আসছে। জাহাজ এলেই দেব।

বারম্যানের অ্যাসিস্ট্যান্ট বলছিল, কলকাতা থেকে যে সব জাহাজ আসে সব এই দিক দিয়েই আসে আর চেন্নাই থেকে যেসব জাহাজ আসে তারা বন্দরের অন্য পাশ দিয়ে আসে। হোটেল থেকে দেখা যায় না।

ধীরে ধীরে সাদা এবং আলোকিত হর্ষবধন বাঁ-দিকের বাঁকে মিলিয়ে গিয়ে পোর্ট-ব্লেয়ার পোর্ট-এর দিকে এগিয়ে গেল। নোঙর করবে বলে।

জাহাজের বা এরোপ্লেনের বাঁ দিকটাকে বলে পোর্ট-সাইড—পোর্টের বা জেটির দিকে থাকে বলে। চুমকি বলল।

আর ডানদিকটাকে বলে স্টারবোর্ড সাইড। জানি আমি।

তুই জানিস। অনেকেই জানে না। চুমকি বলল।

ক-টা বাজে রে? রংকিনী বলল।

চুমকি তার রেডিয়াম-দেওয়া হাতঘড়ি দেখে বলল, দেখেছিস। মাই গুডনেস! ক-টা বাজে বল তো?

ক-টা?

ন-টা।

বলিস কিরে। ইসস। কী করে সময় যায়।

কী করে জীবন যায়!

চল খাই গিয়ে।

বলে, দুজনে সিঁড়ি বেয়ে উপরের ডাইনিং হল-এ উঠে গেল। ডাইনিং হলটাও নামেই 'হল'। আসলে একটি খোলা বারান্দা। বৃষ্টির সঙ্গে হাওয়া থাকলে অবশ্য ভিতরে বসে খাওয়ার জন্যে এয়ার-কন্ডিশানড ঘরও আছে। তবে এখন ডিসেম্বর মাস। বর্ষার বৃষ্টি নেই বটে কিন্তু বৃষ্টি আসে, যখন-তখন। তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে দুশো পঁয়ষট্টি দিনই বৃষ্টি। রংকিনী ভাবছিল, ভরা শ্রাবণে এখানে একবার এসে শ্রাবণের রূপ উপভোগ করবে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে।

সেট-মেনু কিন্তু অনেক অলটারনেটিভ আছে। ওরা দুজনেই প্রণ-ককটেইলস নিল। সুরমেই মাছ-ভাজা। সঙ্গে টার্টার সস। তারপরে কাঁকড়ার একটি পদ। অবশেষে ফ্রুট স্যালাড উইথ চকোলেট আইসক্রিম।

চুমকি বলল, আমি তো আর দুদিন পরেই ভাগলবা। কিন্তু এইরকম ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, আফটারনুন টি আর ডিনার খেলে তোকে প্লেন থেকে ক্রেনে করে নামাতে হবে দমদম-এ পনেরো দিন পরে।

যা বলেছিস!

লাইটহাউসের তীব্র তীক্ষ্ণ আলোটা চক্রাকারে ঘুরছে। নির্ভুলভাবে বাতিঘরের আলোর রশ্মি ফিরে আসছে একই জায়গাতে নির্ধারিত সময়ের ব্যবধান। আলোটা বোধহয় ঠিক করেছে এ

দ্বীপের কোনও রহস্যকেই আর রহস্য রাখবে না। অন্ধকারে থাকবে না কোনও কিছুই। গোপনও থাকবে না। সবকিছুকেই উন্মোচিত করবে এ। ওদের দুজনের লাগোয়া শোবার ঘরেও নিশ্চয়ই সারারাত এই আলো কী যেন খুঁজবে আঁতিপাঁতি করে।

ভাবছিল, রংকিনী।

বড়ো হওয়ার পর থেকে কখনওই অন্য কারো সঙ্গে, এমনকী কোনও নারীর সঙ্গেও শোয়নি রংকিনী। একা শোওয়ার অভ্যেসেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে ও। পুরোপুরি। ভবিষ্যতে কোনওদিন যদি অন্য কারো সঙ্গে, বিশেষ করে কোনও পুরুষের সঙ্গে এক খাটে শুতে হয়, তবে বোধহয় ঘুমই আসবে না। নিজের নিভৃতি, গোপনীয়তা, নিতান্ত সব অতি-ব্যক্তিগত দুর্মর অভ্যেস কী করে বাঁধা দেয় দম্পতিরা একে অন্যের কাছে নিঃশর্তে, কে জানে তা! কী এমন থাকে দাম্পত্যে? শুধু দম্পতিরাই জানে হয়তো।

ভাবলেও অবাক লাগে ওর।

চুমকি বলল, কাল ভোরে বেরিয়ে জলিবয় আইল্যান্ড। পরশু লাঞ্চ এর পরে আবারও চিড়িয়া টাপ্পু, সকালে মিউজিয়াম, অ্যাকোরিয়াম, চিড়িয়াখানা এসব দেখে তারপর দিন "দ্যা হর্নেটস নেস্ট'-এ যাব।

কোথায়?

আমার দ্বীপে।

দ্বীপের নাম "দ্যা হর্নেটস নেস্ট"? বলিস কি?

হ্যাঁরে। কোন পাগলাসাহেব বা জলদস্যু নাম দিয়েছিল কবে তা কি করে বলব? ঠাকুমা যখন দ্বীপটি কেনেন তখন তার এ নামই ছিল।

অবাক করলি তুই!

আমাকে কিন্তু সেদিনই বেলাবেলি ফিরে আসতে হবে পরদিন সকালে প্লেন ধরার জন্যে। এই তিনদিনও তোর জন্যেই বেশি থাকতে হল আমায় এইখানে। ভাগ্যিস সকালে এসেই এস টি ডি-তে অফিসকে পেয়ে গেলাম এবং শনি-রবির সঙ্গে "বন্‌ধ"ও পেয়ে গেলাম। নইলে......।

আমি চলে গেলে তুই এখানে কি করবি একা একা?

ঘুমোব। কত ঘুম যে জমেছে কী বলব তোকে। ঘুমোব, খাব আর বই পড়ব। অনেক এনেছি সঙ্গে। কিনেছি সেই কবে কিন্তু পড়ার সময় পেলাম কোথায়? এখানে পড়ব।

ভালো।

"বন্‌ধ"-এর কথা আর বলিস না। যখন তখন পশ্চিমবঙ্গের এই 'বন্‌ধ" ডাকে তারাই হয় শুক্রবারে ডাকে, নয় সোমবারে। সকলেই বুঝে গেছে আমরা কাজ ফাঁকি দিতে পারলে আর কিছুই চাই না। শান্তিনিকেতন, দিঘা, পুরী, বকখালি, বিষ্ণুপুর, গালুডি, গাদিয়ারায় বেড়িয়ে আসার এমন সুবর্ণসুযোগ আর কি পাওয়া যায়? নিদেনপক্ষে শালি-ভায়রাভাই-এর বাড়ি নয়তো শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে কাটাবার এমন WINDFALL সুযোগ!

এখন রাজনীতি বলতে আর রাজ্যর ভালো বোঝায় না, পার্টিদের ভালোই বোঝায়। বড়ো দুঃখের কথা।

রংকিনী বলল।

সত্যি! কাজ না করলে কোনও রাজ্যেরই কোনওরকম উন্নতিই কি হয়?

ওরা খেয়েদের নিচে নেমে যাচ্ছে যখন তখন এক বয়স্কা বাঙালি মহিলা সিঁড়ির সামনের টেবল থেকে বললেন, ওমা! চুমকি না?

চুমকি দাঁড়িয়ে পড়ে কিছুক্ষণ ভালো করে দেখে বলল, ও-ও-ও। ভালো আছেন?

হ্যাঁ। ভালো আছি।

তোমার স্বামী কোথায়? সঙ্গে এই মেয়েটি কে?

ও আমার বন্ধু।

আর স্বামী? এখনও বিয়ে হয়নি? এত বয়স হয়ে গেল।

চুমকি শক্ত গলাতে সামান্য অভব্যতার সুর লাগিয়ে বলল, বিয়ে "হয়নি" বলবেন না, বলুন বিয়ে "করিনি"। আজকালকার শিক্ষিত, সচ্ছল, স্বাবলম্বী অধিকাংশ মেয়েদেরই বিয়ে "হয় না"। তারা নিজেরা ইচ্ছে করলে এবং তাদের পছন্দসই সেরকম রূপে-গুণে-যোগ্য পাত্র পেলেই তারা দয়া করে সেই পাত্রকে বিয়ে করে।

তারপর বলল, আমিও বিয়ে করিনি, আমার বন্ধুও নয়।

ভদ্রমহিলার সম্ভবত তাঁর স্বামী অথবা সঙ্গীর সঙ্গে চুমকির আলাপ করিয়ে দেবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু চুমকি সে সুযোগই দিল না।

তবু গায়ে-পড়া ভদ্রমহিলা বললেন, উঠেছ কোথায়? আমরা উঠেছি সিনক্লেয়ারস-এ। এখানে ডিনার করতে এসেছিলাম।

আমরা এই হোটেলেই উঠেছি।

চুমকি বলল।

বাবাঃ এ তো সবচেয়ে এক্সপেনসিভ হোটেল।

হ্যাঁ। আমরা কিন্তু বাবা বা স্বামীর পয়সাতে এখানে এসে উঠিনি। নিজেদের টাকাতেই....

বলেই, রংকিনীর হাত ধরে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

রংকিনী ফিশফিশ করে বলল, অমন অভদ্র ব্যবহার করলি কেন রে? ভদ্রমহিলা কে?

"ভদ্রমহিলা" কি না জানি না। উনিই হচ্ছেন রূপকড়ার মাসি। সঙ্গের ভদ্রলোক ওঁর স্বামীর ম্যানেজার ছিলেন। ওঁর সঙ্গেই এর অ্যাফেয়ার। স্বামীকে নাকি দুজনে মিলে বিষ খাইয়ে মেরেছিলেন। লোকমুখে শুনেছি।

তারপরই বলল, কেন? খারাপ কি বলেছি? যার যেমন ব্যবহার পাওয়ার যোগ্যতা তার সঙ্গে সেরকম ব্যবহারই তো করা উচিত।

তাহলেও, তুই বড়ো রুক্ষ হয়ে গেছিস চুমকি।

চুমকি বলল, হয়তো হয়েছি। জীবনই করেছে। আমি তো গরিব বাবার অরক্ষণীয়া কন্যা নই। বহুযুগ ধরে সমাজ যে অপমান এদেশের মেয়েদের করেছে আমি সে অপমানের শোধ তুলি সুযোগ পেলেই। 'শি ইজ আ হোর।' এর চেয়ে ভালো ব্যবহার পাবার যোগ্যতা তো ওঁর নেই।

৫

এখনও অন্ধকার আছে। তবে পূর্বের আকাশ এতক্ষণে চাল-ধোওয়া সাদা রঙে আভাসিত হয়ে যেত, যদি না মেঘ থাকত আকাশে।

চুমকির পরিচিত এক ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির সাদা-রঙা একটি কেবিনওয়ালা বোট-এ করে ওরা বেরিয়ে পড়েছে পোর্ট ব্লেয়ার-এর জেটি থেকে "দ্যা হর্নেটস নেস্ট" আইল্যান্ড-এর উদ্দেশে। বোটটার নাম "ওঙ্গে"।

যেহেতু সেই পাণ্ডববর্জিত দ্বীপে আহুক বোস একাই থাকেন, তাই ওরা কিছু ফল, পাঁউরুটি, মাখন, চিজ এবং স্যুপ-এর প্যাকেট নিয়েছে সঙ্গে।

চালিয়াতি বলতে চুমকির একটাই চালিয়াতি আছে, দার্জিলিং-এর চা ছাড়া খেতে পারে না। তাই চা-এর প্যাকেটও নিয়েছে একটা। কনডেনসড মিল্কও।

হু-হু করে জোলো-বাতাস লাগছিল চোখেমুখে। বোটটা বেশ দ্রুতগতিতেই চলেছে। সারেং ছাড়া আরও দুজন সাহায্যকারী আছে। চারধারে কালো জল। আলো নেই বলে কালো নয়, এমনিতেই কালো।

এইজন্যেই কি আন্দামানে যখন বন্দিদের যাবজ্জীবন করাদণ্ড দিয়ে পাঠানো হত তখন বলা হত কালাপানির দ্বীপে দ্বীপান্তরিত করা হল?

রংকিনী জিজ্ঞেস করল।

তা জানি না। কিন্তু সত্যিই এখানে সমুদ্রের জল কালো।

কেন রে?

সব জায়গায় কি আর কালো! যেখানে জল খুব গভীর সেখানেই কালো দেখায় হয়তো ।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ দ্বীপেই কিন্তু তটভূমি বলতে যা বোঝায় তা নেই। গভীর নিথর সুমদ্রের মধ্যে মধ্যে পাহাড় উঠেছে আর সেই পাহাড়গুলোই দ্বীপ। লক্ষ করেছিস, এই সব পাড়ে পাথর বিশেষ নেই কিন্তু। গভীর জঙ্গল, নানা রকমের আদিম গাছ, লতা, গুল্ম। মানুষের লাগানো নারকোল গাছ। এখানে নারকোল কিন্তু স্বাভাবিকভাবে হয়নি।

লক্ষ্য করেছিস? সব দ্বীপের মাটিই লাল। সিঁদুররঙা।

সব জায়গাতেই যে সিঁদুররঙা তা নয়। গেরুয়া লাল, ভগুয়া লাল, লামা লাল।

ঠিক বলেছিস। পাথর আছে স্যেশেল্‌স-এর দ্বীপগুলোতে। গ্রানাইটের দ্বীপ সবই। বেশিই কালো, কিছু সাদা। চাঁদনি রাতে বা অন্ধকারেও গা-ছমছম করে সেইসব দ্বীপে চাইলে, এমন সব কিম্ভূতকিমাকার প্রকাণ্ড পাথরের চাঙড় চারদিকে। কিন্তু অমন সব সুন্দর সমুদ্রতট পৃথিবীর মধ্যে খুব কম জায়গাতেই আছে। আর প্রবালের কী বাহার। এখানের জলিবয় আইল্যান্ড আছে। আর ভারত মহাসাগরের স্যেশেল্‌স দ্বীপপুঞ্জের প্রবালদের যে কত রকমের রং। ফিরোজা, লাল, নীল, সবুজ, ফিকে হলুদ। সত্যিই মনে হয় কোনো স্বপ্নের দেশেই এসেছি। আমি তো ঠিকই করে ফেলেছি, বুঝলি রংকি, যে বিয়ে যদি কখনও করি, তবে স্যেশেল্‌স-এই যাব হানিমুন করতে।

যদি।

রংকিনী বলল, ছোট্ট করে।

ইয়েস। যদি। আর তুই কোথায় যাবি? হানিমুনে?

চুমকি বলল।

যদি যায় নদীতে।

বল না। ইয়ার্কি কেন করছিস।

হানিমুনে হানি নেই, মানিব্যাগে মানি। কবে বিয়ে, কার সঙ্গে বিয়ে, তার ঠিক নেই, তার হানিমুন। ছাড় এসব কষ্টকল্পনা। পাগলের প্রলাপ যত্ত।

তারপরে বলল, আমার মনটা খারাপ হয়ে রয়েছে এবারে সিন্‌ক আইল্যান্ডস-এ যেতে পারলাম না বলে। নামটা অদ্ভুত তো! তোর "দ্যা হর্নেটস নেস্ট"-এরই মতো। "দ্যা হর্নেটস নেস্ট" নিশ্চয়ই ইংরেজ নাবিকদের দেওয়া নাম। ভয় পাবার মতো এই দ্বীপে অবশ্যই কিছু ছিল। নইলে কি মিছিমিছি এই নাম দেয় ইংরেজ জলদস্যুরা? ওরা কথাতে বলে না— "TO STIR A HORNEST'S NEST".

ঠিক।

সিন্‌ক আইল্যান্ডস-এর নাম দিয়েছিল ফরাসি নাবিকেরা। ফরাসিতে সিন্‌ক মানে হচ্ছে পাঁচ।

বানান কী?

CINQUE। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ছাব্বিশ কি.মি। ওয়াণ্ডুর থেকেও যাওয়া যায়। সিন্‌ক আইল্যান্ডসও ম্যারিন স্যাংচুয়ারি। কী সুন্দর যে সব প্রবাল আছে। প্রবাল প্রাচীর। কত রকমের মাছ,

কত রঙা শ্যাওলা, অ্যালগি, ফাংগি, প্ল্যাংকটন। যখন ভাঁটি দেয়, তখন এক দ্বীপ থেকে অন্য চারটি দ্বীপেই স্বচ্ছ জল পেরিয়ে হেঁটে যাওয়া যায়। কী যে সুন্দর, তা তুই নিজে না গেলে বিশ্বাস করবি না। তবে নিজেদের বোট ভাড়া করে গেলেই ভালো। ভাটা তো আর বেশিক্ষণ থাকে না। জল বাড়বার আগেই উঠে আসতে হল জল ছেড়ে। অবশ্য তখন সাঁতার কাটে অনেকেই, স্নরকেলিংও করে। রাবারের 'স্নরকেল' ভাড়াও পাওয়া যায়। তবে অক্সিজেন সিলিন্ডার নইলে স্কুবা-ডাইভিং করা যায় না। জলি বয় আইল্যান্ডে যেমন দেখলি লেখা আছে "Leave only your foot prints behind." সিন্‌ক আইল্যান্ডস-এও তেমনই লেখা আছে। কোনও জিনিসই ওই সব দ্বীপে ফেলে আসার নিয়ম নেই, সে স্যান্ডউইচের বাক্সই হোক কী সিগারেটের প্যাকেট কী কোকা-কোলা বা বিয়ারের টিন।

এই সুঅভ্যেস তো সব জায়গাতেই বয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। কি বলিস তুই!

তা তো বটেই। বিশেষ করে আমাদের, মানে ভারতীয়দের। যাদের অধিকাংশ অভ্যাসই 'কু'। যত সুন্দর জায়গাতেই যাক না কেন, খেয়ে, ফেলে, ছড়িয়ে জায়গাটাকে নোংরা করাই আমাদের চরিত্র। অন্য কেউ যে সেখানে আসবে আমাদের পরে সেকথা আমরা ভাবিই না। স্বার্থপরতার চরম একেবারে।

আমার কিন্তু চিড়িয়া-টাপ্পু বেশ লেগেছে। যাওয়ার পথটিই ভারি সুন্দর। কী বিশাল বিশাল মহীরুহ দু-পাশে। পুরো পথটাই পাহাড়ি। আবার মাঝে মাঝে সমুদ্র এসে পথপাশে একেকবার সুন্দর মুখ দেখিয়েই লুকিয়ে পড়ছে। উলটোদিকে আবার নদী, ব্যাকওয়াটার। আশ্চর্য প্রকৃতি কিন্তু এখানের। এমনটি অন্য কোথাওই দেখিনি।

তাই?

হ্যাঁ। তোকে বলেওছিলাম আগে।

টাপ্পু মানে কি রে? রংকিনী বলল।

টাপ্পু মানে পাহাড়। আন্দামানী ভাষায়। চিড়িয়া-টাপ্পু মানে পাখি-পাহাড় বলতে পারিস। চিত্ত দে নামের এক পাগল ভদ্রলোক অযোধ্যা পাহাড়ে অগণ্য পাখি খোদাই করছেন দলবল নিয়ে। তারও নাম দিয়েছেন পাখি-পাহাড়।

অযোধ্যা পাহাড় মানে? যে অযোধ্যাতে বাবরি মসজিদ?

চুমকি হেসে বলল, আরে না রে না। আমাদের পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়। ভারতবর্ষ দেশটা এতই বড়ো যে একই নামের জায়গা তুই সারা ভারত খুঁজলে হাজারটা করে পাবি। ইউনাইটেড স্টেটসও সেরকম। সে তো ভারতের চেয়েও বহুগুণ বড়ো।

বাবাঃ। চিড়িয়া-টাপ্পুতে কী আদিম সব রেইন ফরেস্টস! কত বিচিত্র তাদের রং। কতরকম লতা-পাতা। নিশ্ছিদ্র জঙ্গল। দিনমানেও আলো ঢোকে না ভিতরে। গা-ছমছম করে। তাই না?

কিন্তু যাই বলিস, আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে কোনও মাংসাশী শ্বাপদ নেই বলেই ভয় নেই। আর যাই বলিস আর তাই বলিস, ভয় না থাকলে রহস্যও থাকে না। থাকে কি? বল? আমার তো মনে হয় না।

ভয় নেই বলছিস কেন? সাপ তো আছে অনেকই রকম। জলে আছে, ডাঙায় আছে। কেউটে, চন্দ্রবোড়া, নানা রঙা সব চিত্রবিচিত্র সাপ। আর তাদের ধরে খাবার জন্যে গা-ঘিনঘিন করা ঘন-ঘন জিভ বের-করা ইয়া বড়ো বড়ো গোসাপ।

যাই বলিস চুমকি, তোকে আমি ঈর্ষা করেছি, আজ স্বীকার করছি, ছেলেবেলা, থুড়ি মেয়েবেলা থেকেই নানা কারণে। কিন্তু তুই যে এমন জলের রানী, দ্বীপের রানী তা জানার পর থেকে তোর প্রতি ঈর্ষাটা এক লাফে অনেকই বেড়ে গেল। ভাবা যায়।

একটা আস্ত দ্বীপের মালকিন তুই!

হলে কি হয়! কী সাংঘাতিক দ্বীপ তা তো জানিস না। এই দ্বীপে অনেক জাহাজডুবি নাবিক আর জলদস্যুদের আত্মা আছে। কত খুনখারাপি হয়েছে একসময়ে। আফ্রিকা, বার্মা, মানে এখনকার মায়ানমার এবং থাইল্যান্ডের কত মেয়েরা অত্যাচারিত হয়ে মরেছে একদিন এখানে। অনেকেই প্রেতাত্মার বাস 'দ্যা হর্নেটস নেস্ট'-এ।

ভাগ।

ভাগ কি রে? তুই ভীরাপ্পানকে জিজ্ঞেস করিস। তাকে বলব আমি তোকে সেসব গল্প করতে, কোনও অন্ধকার রাতে। যদি কেউ এখানে ক-দিন থাকে তবে নিজেই কত সব শব্দ শুনবে রাতে। অন্যকে কিছুই বলতে হবে না। আলো-ঝলমল কলকাতাতে বসে যা সহজেই গাঁজা-গুল বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়, তা এই সমুদ্র-ঘেরা নির্জন দ্বীপের আদিম অরণ্যের অন্ধকারে বসে করা যায় না।

আহা! রাতে গল্প শোনার জন্যে কে থাকবে এখানে? ফিরে তো আসব আমরা আজই দিনে দিনে।

তা কী করে বলব। যাওয়াটা তোমার হাতে অবশ্যই। ফেরাটা তো নয়। বোসসাহেব প্রায় ছ-বছর এই দ্বীপে ভীরাপ্পানের সঙ্গে একা রয়েছেন। মাঝে মাঝে মাতৃভক্ত ভীরাপ্পানও তো চলে যায় ওঁকে একেবারেই একা রেখে। মাসের মধ্যে একবার তো যায়ই। জানি না, আজও গিয়ে তাকে দেখতে পাব কি না।

তারপরে বলল, পোর্ট ব্লেয়ারের বে-আইল্যান্ড হোটেলে না থেকে "দ্যা হর্নেটস নেস্ট"-এই থেকে যা-না বাকি কটা দিন। "এক্সপিরিয়েন্স অফ আ লাইফ টাইম" হবে। সারা জীবন মনে রাখতে পারবি এই কটা দিনের অবিস্মরণীয় দুর্মর স্মৃতি। এমন সুযোগ কি রোজ আসে কারো জীবনে? বল তুই। "ইউ উইল বি দ্যা কুইন অফ অল ড্যু সার্ভে"।

ভালোই বলেছিস। রংকিনী বলল। দ্বীপের নাম "দ্যা হর্নেটস নেস্ট"। আমার অচেনা একমাত্র দ্বীপবাসীর নাম আহুক বোস, ওরফে রবিনসন ক্রুসো। তাঁর ভ্যালের নাম ভীরাপ্পান, ওরফে ফ্রাইডে। এবং বলছিস যে সে দ্বীপে অনেক প্রেতাত্মাও বাস করে বিষাক্ত সাপ আর বিকটদর্শন গোসাপদের সঙ্গে। এই নইলে বন্ধু তুই!

তারপরে বলল, তোর এই ভীরাপ্পান কি চন্দনগাছ আর হাতির যম তালিমনাড়ু আর কর্নাটকের সেই কুখ্যাত ভীরাপ্পানের কাজিন-টাজিন হয় নাকি?

হলেই বা ক্ষতি কি? এই "দ্যা হর্নেটস নেস্ট"-এর আশ্চর্য সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আদিম গাছ, ফুল, পাখি, প্রজাপতি, এর আশ্চর্য সুন্দর জনহীন তটভূমি, যেখানে দাঁড়িয়ে মনে হয় এই পৃথিবীতে নয়, অন্য কোথাওই পৌঁছে গেছি। আর তার উপরে আহুক বোস-এর মতন একজন পূর্ণ মানুষের সঙ্গ। তুই জানিস না, তুই কি হারাইতেছিস।

বলেই, হাসল চুমকি।

রংকিনীর মনে হল, ও ঠাট্টা করছে।

পূর্ণ মানুষ মানে? কি বলতে চাইছিস? বুড়ো? ঝুনো নারকেল?

ইডিয়ট। তুই কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথ এত কপচাস আর রবীন্দ্রনাথের 'পূর্ণ মানুষের' কনসেপ্ট-এর কথাই জানিস না? পৃথিবীর সব মানুষেরই ওইরকম মানুষ হয়ে ওঠারই প্রার্থনা হওয়া উচিত।

ওইরকম মানে? কী রকম?

ওইরকম মানে "পূর্ণ মানুষ" হয়ে ওঠার প্রার্থনা।

তুই দিনে দিনে বড়ো গোলমেলে হয়ে উঠছিস। যাকে বলে, কমপ্লিকেটেড। তোর মিস্টার আহুক বোস একজন পূর্ণ মানুষ?

পূর্ণ পুরুষ। তাঁর সংস্পর্শে, তাঁর সঙ্গে থেকে, তুই-ও পূর্ণা হতে পারিস, পূর্ণা হতে পারে যে কোনও নারীই।

আমি ভাই রংকিনী আছি, পূর্ণা রংকিনীই থাকতে চাই। আমার পূর্ণতা অন্য কারো দয়ানির্ভর নয়। নিজে ভগ্নাংশ হয়ে থাকলেও আপত্তি নেই কোনও।

পূর্ণা হওয়াই তো প্রত্যেক নারীরই জীবনের ব্রত হওয়া উচিত। স্বীকার করিস আর নাই করিস, ইচ্ছে কি করে না?

না। করে না। তা তুই নিজে হলি না কেন? তুইই পূর্ণা হ! কে তোকে মানুষ করেছে? তোর দ্বীপ, তোর ম্যানেজার, তোকে ঠেকাচ্চেটা কে? পরিপূর্ণা হয়ে ও এখানে 'পূর্ণ মানুষের" সঙ্গে থেকে। পরিপূর্ণ হয়ে উপচে যা। পৃথিবীর সব ART এর জন্মই তো এই উপচে যাওয়া থেকে, superfluity থেকে।

চুমকির মুখে এক রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল। বলল, "দ্যা হর্নেটিস নেস্ট" যে সকলকে গ্রহণ করে না প্রসন্ন মনে। যাদের করে না, তাদের প্রাণ বিপন্ন হয়।

নইলে, এখানে কি জলদস্যু আর জাহাজডুবি হওয়া মানুষদের অগণ্য বদ্ধ-আত্মা এমন হাঁড়ির মধ্যে শিঙি মাছের মতো খলবল করে!

রংকিনী বলল, কপট রাগের সঙ্গে।

বোকা-বোকা কথা বলিস না।

না রে! আমার ভীষণই ভূতের ভয়। আমি এই দ্বীপে সে জন্যেই একরাতও কাটাইনি।

চুমকি বলল।

আমার ভূতের ভয় নেই একটুও।

তাহলে তো ফারস্ট ক্লাস। থেকে যা। না থাকলে, উ্য উইল রিপেন্ট। সারা জীবন আপসোস করবি রংকি।

ভূতের ভয় না থাকলেও অন্য ভয় আছে আমার।

রংকিনী বলল।

কিসের ভয়? বোস সাহেবের? আহা! হি ইজ আ ফাইন জেন্টেলম্যান।

কী জানি। পুরুষদের মধ্যে জেন্টেলম্যান তো খুব বেশি দেখিনি এ পর্যন্ত। বিশ্বাস হয় না। তবে তোর বোসসাহেবকে ভয় পাওয়ার কি আছে? একজন সামান্য পুরুষই তো! তিনি পূর্ণই হন কি ভগ্নাংশ, আমার কোন ক্ষতি করতে পারেন? আই অ্যাম নট মেড অফ সাচ স্টাফ।

তিনি সামান্য আদৌ নন। তবু। ওঁকেই যদি না হয় ভয়, তাহলে তোর ভয় কাকে?

ভয় আমাকেই। আমি নিজেকে বড়োই ভয় পাই।

কী যে হেঁয়ালি করিস, তুই-ই জানিস।

আমি হেঁয়ালি করি না। আমি নিজেই হেঁয়ালি। তুইও হেঁয়ালি। হেঁয়ালি যে, তা তুই জানিস না হয়তো , এই যা। আমরা প্রত্যেক নারী ও পুরুষই একেকটি হেঁয়ালি বলেই তো এত ইন্টারেস্টিং। একথা কি তোর কখনও মনে হয়নি?

চুমকি জলের দিকে চেয়েছিল। সূর্যর আলোয় লক্ষ লক্ষ সোনালি সাপ কালো জলে কিলবিল করছিল দ্রুত ধাবমান বোটের দুপাশে। পেছনে বোট-এর প্রপেলর মথিত সাদা ফেনা সেই সোনার সাপগুলোকে ইরেজার-এর মতো মুছে দিচ্ছিল অনুক্ষণ।

চুমকি রংকিনীর প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না। সে নিজেও যে হেঁয়ালি তা যেন এতদিনে বুঝতে পারল চুমকি। এবং বুঝতে পেরে চুপ করে রইল।

ততক্ষণে মেঘ একেবারেই সরে গিয়ে ঝকঝকে রোদ উঠেছে। ওদের অলক উড়ছে হাওয়ায়, দু কানের পাশে, যদিও টুপি পরে আছে ওরা দুজনেই। চুমকি পরেছে ফেডেড জিনস। হালকা নীল

রঙা। আর উর্ধ্বাঙ্গে কমলা-রঙা গেঞ্জি। রংকিনী পরেছে জংলা কাজের ফিকে-সবুজ সালোয়ার-কামিজ। ওকে জংলা-রাগে বাঁধা ধীরা আলাপের বন্দীশ-এর মতো দেখাচ্ছে। মানুষ ভাবে, গান কি বাজনা বুঝি দেখা যায় না। যায় দেখা। ভালো লেখা বা ভালো ছবি যেমন শোনা যায়, ভালো গান-বাজনাও দেখা যায়।

আরও বেলা বাড়লে জংলা থেকে রামকেলি হয়ে যাবে জংলা কাজের সবুজ সালোয়ার কামিজ পরা রংকিনী। তারও পরে, ভরদুপুরে, রাগ পটদীপ।

আর কতক্ষণ লাগবে রে? রংকিনী জিজ্ঞেস করল।

হাতঘড়ি দেখে চুমকি বলল, ঘণ্টাখানেক তো হল। ধর, আরও ঘণ্টাখানেক। তবে আমাদের নিজেদের বোটে আসতে তিন ঘণ্টা লাগে। এই বোটটার গতি অনেক বেশি।

.কোনো দিকেই কোনো ভূখণ্ড আর চোখে পড়ে না এখন। চার দিকেরই নীল দিগন্তে আকাশ নেমে এসে চুমু খাচ্ছে সবজে-কালো সমুদ্রকে, আর সমুদ্র-আকাশ। কেমন যেন ভয় ভয় করে। মানুষ যে তার এত কিছু আবিষ্কার আর উদ্ভাবনের পরও, চাঁদে পা দেবার পরেও, মঙ্গলগ্রহের ফোটো তোলার পরেও প্রকৃতির প্রেক্ষিতে এখনও পুরোপুরি অসহায়, এই কথাটাই এমন এমন সময়ে মনে আসে।

চুমকি গলাতে একটি সুন্দর ডিজাইনের রুপোর হার পরেছিল। পোর্ট ব্লেয়ারের জেটির পথে হোটেল থেকে গাড়িতে আসবার সময়ে সকালেই লক্ষ্য করেছিল রংকিনী। তবে হারের লকেটটা দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎই নিজের গেঞ্জির মধ্যে ডান হাতের আঙুল ঢুকিয়ে লকেটটা টেনে বের করল। তখন রংকিনী দেখতে পেল যে, সেটা লকেট নয়, একটি কম্পাস।

দেখতে জানিস?

রংকিনী জিজ্ঞেস করল চুমকিকে কম্পাসটার দিকে চোখে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করে।

না কি, গয়না?

অবশ্যই জানি। এই কম্পাস তো যে কোনও বাচ্চাও দেখতে পারে। খুবই সোজা। তোকে শিখিয়ে দিচ্ছি এখুনি।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, কিন্তু যে অদৃশ্য কম্পাস দেখতে জানলে কাজের মতো কাজ হত তা তো দেখতে শিখিনি। আমিই শিখিনি তার তোকে কি করে শেখাব বল?

অদৃশ্য কম্পাসটা আবার কি জিনিস? এটা কি নকল নাকি?

না রে। আমাদের প্রত্যেকের জীবনের গন্তব্য যে কম্পাস ঠিক করে দিতে পারে, শুধরে দিতে পারে ভুল পথের পথিককে, বাতলে দিতে পারে ঠিক পথের হদিস, সেই কম্পাস। জাহাজ বা এরোপ্লেন বা মরুভূমিতে বা জঙ্গলে পথ-হারানো যান বা মানুষকে পথ দেখাতে পারে এই কম্পাসটা সহজেই কিন্তু জীবনের গন্তব্যে, চাওয়া পাওয়ায়, যে পদে পদে পথভ্রষ্ট হই আমরা, সেই পথের সঠিক হদিস যে কম্পাস দিতে পারে, তা কি আমরা কেউই দেখতে জানি?

এবার রংকিনী চুপ করে রইল। উত্তর দিল না চুমকির কথার।

বড়ো বেশি কথা বলেছে ওরা দুজনে আজ সকাল থেকে।

নৈঃশব্দের চেয়ে বড়ো শব্দ আর নেই, নীরবতার মতো বাগ্ময় সম্ভবত আর কিছুই নেই। ওরা দুজনেই যেন এই অমোঘ সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করে দু-পাশ দিয়ে দ্রুত সরে যাওয়া সমুদ্রের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

ওদের সঙ্গে বোটটি এগিয়ে চলল অসীম জলরাশির উপর দিয়ে "দ্যা হর্নেটস নেস্ট"-এর দিকে। বোটের ডিজেল এঞ্জিনের আরোহন-অবরোহন হীন এক স্কেলে বাঁধা স্বর, বোটের মুখের সঙ্গে জলের সংঘাতের ছলাত-ছলাত শব্দ, আর দু-পাশের দ্রুত সরে যাওয়া জলের সড়-সড় শব্দের একঘেয়েমিতে কেমন ঘুম ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল রংকিনীর।

৬

সকাল আটটাতে এসেছিল। এখন রাত আটটা। চুমকি চলে গেছে বিকেল চারটেতে। কাল সকালের প্লেন ধরবে কলকাতার। এরই মধ্যে রংকিনীর মনে হচ্ছে যেন কতদিন হল এই দ্বীপেই আছে।

কোথায় বে-আইল্যান্ড হোটেলের পাঁচ কোর্স-এর ডিনার আর কোথায় এই খাওয়া।

রংকিনীর মনের কথাটি বুঝতে পেরেই যেন আহুক বোস বললেন রংকিনীকে, কী করবে? নিজেই যদি নিজেকে কষ্ট দাও তো তোমাকে বাঁচাবে কে?

কেন?

আমি তো চা আর ওমলেট ছাড়া আর কিছুই রাঁধতে জানি না।

বলো কি? সংসার যখন করবে তখন কি করবে?

রুটি-মাখন খাব। সংসার আমাকে চাইলে না আমি সংসার করব! এসব আর হবে না।

আহুক-এর মুখে এসে গেছিল, তোমার বয়স কত?

পরক্ষণেই সামলে নিলেন। মহিলাদের বয়স তো জিজ্ঞেস করা যায় না।

তারপর বললেন, সংসার করার সময় তো পড়ে আছে অঢেল। হবে না বলছ কেন?

সংসার-এর কনসেপ্টটাই তো বদলে গেছে। যদি তেমন একজন সচ্চরিত্র সাধারণ ভালো মানুষ পুরুষ পেতাম যে আমার সন্তানদের মানুষ করত, বাড়িঘর দেখত, ভালো রান্না করত চাকর-আয়া ম্যানেজ করত তবে বিয়ে করতাম।

ইসস। আগে জানলে তো আমিই তোমার পাণিপ্রার্থী হতাম। আমি না হয় বাদই গেলাম কিন্তু তুমি সাধারণ, সচ্চরিত্র, ভালোমানুষ পুরুষ একজনও কি পেলে না?

পুরুষদের মধ্যে সচ্চরিত্র খুঁজতে যাওয়া আর ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় করা একই ব্যাপার।

কিন্তু চরিত্রহানি তো পুরুষ একা একা ঘটাতে পারে না। শুধু পুরুষদের দোষ দেওয়া কি ঠিক?

এই কথাতে, হেসে ফেলল রংকিনী।

যাকগে। তুমি যদি না রাঁধো তো আমার রান্না অখাদ্য-কুখাদ্যই খেতে হবে। কষ্ট হবে কিন্তু তোমার খুবই। ভীরাপ্পান এলে অবশ্য তোমাকে গরম-গরম দোসা এবং শুঁটকি মাছ খাওয়াতে পারবে।

শুঁটকি মাছ? মরে গেলেও খাব না।

তারপরে বলল, কী কষ্ট আর কী আনন্দ তার ব্যাখ্যা একেকজনের কাছে একেকরকম। আপনি নিজেও খুব ভালো করেই জানেন যে, ভালো লাগবে যে সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছিলাম বলেই শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদলে আপনার এই "হর্নেটস নেস্ট"-এ থেকে গেলাম। এখন ভীরাপ্পান আসার সময়ে যদি আমার সুটকেসটা নিয়ে আসে, তবেই বাঁচোয়া। আসবে তো? নইলে এই একটি সালোয়ার-কামিজ পরে তো থাকতে পারব না।

কিছু না পরে থাকলেই বা কি? এই দ্বীপে আকাশ আর সমুদ্র আর কিছু পাখি আর সাপ ছাড়া তোমাকে দেখার মতো আরও কেউই নেই।

কেন? আপনি?

আমি একটা অশক্ত বুড়ো। আমাকে কি তুমি মানুষ বলে গণ্য করবে নাকি! আমাকেও সাপ বা পাখির মতোই মনে কোরো। আর তা যদি মনে না করতে পারো, তবে না হয় তোমার দিকে চাইবই না। অথবা দুচোখ বেঁধে রেখো আমার।

ভীরাপ্পান যদি কাল না আসে তবে তাই হয়তো করতে হবে।

তাই কোরো। এখন চলো, বাইরে গিয়ে বসি। প্রকৃতির মধ্যে থাকবে বলেই তো এত কষ্ট করতে হবে জেনেও রয়ে গেলে "হর্নেটস নেস্ট"-এ। ঘরের মধ্যে থেকে কী করবে?

এঁটো বাসনগুলো ধুয়ে দিতে হবে না? চামচ-টামচ।

তোমার কিছুই করতে হবে না। তুমি অতিথি। ভারতীয় অতিথি। আমি তো আর সাহেব নই যে, অতিথিকে দিয়েও কাজ করাব। রোজই করি। করে নেব। যে কদিন আছ এখানে, তোমাকে কোনও কাজই করতে হবে না। তুমি শুধু আনন্দ করো।

তা কি হয় নাকি?

হয় হয়। হওয়ালেই হয়।

আহুক বোস-এর সঙ্গে রংকিনী বাংলোর বাইরে এল। নামেই বাংলো। কাঠের ছটি মোটা থাম-এর উপরে একটা চালা। প্রায় এক মানুষ উঁচু। তার উপরে একটি মাত্র ঘর। তবে তিনদিকে ঘোরানো বারান্দা আছে কাঠের রেলিং-দেওয়া। ঘরটির মাথাতে কাঠের ফ্রেম-এর উপরে করোগেটেড শিট দেওয়া। ভিতরে বাঁশের চাটাই এর ফলস সিলিং। তেল চকচকে। বড়ো বড়ো জানালা। একটা দিকের দেওয়ালে শুধুই কাচ। পা থেকে মাথা অবধি। এখানে উনি একা থাকেন তাই মনে হল প্রাইভেসির কোনও বালাই নেই। উলঙ্গ হয়ে শুয়ে থাকলেও আকাশ, আকাশের পাখি জল আর জলের পাখি আর সুমদ্রের মাছেরা ছাড়া কেউই দেখবে না।

ভীরাপ্পানের কুঁড়েটা, আহুক বললেন, পাহাড়ের অন্যদিকে। তার নির্দেশমতোই না কি তা বানানো হয়েছে। বাংলো থেকে কুঁড়ে অথবা কুঁড়ে থেকে বাংলো, দেখাই যায় না। ভীরাপ্পানও তার মনিবেরই মতো নির্জনতা এবং গোপনীয়তাবিলাসী মনে হয়। সত্যিই ভাবা যায় না যে প্রায় পৌনে দুই বর্গ মাইল এই গভীর এবং আদিম জঙ্গলময় দ্বীপে ওই দু জন একা পুরুষ এমনভাবে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর থাকতে পারেন। দুজনের শিক্ষা-দীক্ষা এবং ভাষারও ব্যবধানের কারণে দুজনের মধ্যে কথাবার্তাও বেশি হয় বলে মনে হয় না। তাতে নির্জনতা নিশ্চয়ই আরও গভীর হয়। এঁরা দুজনে এতদিনে পাগল হয়ে যাননি যে কেন, তা কে জানে!

বাইরে একটা ধুনি মতো জ্বলছে। তার দুপাশে দুটি বেতের চেয়ার। তার উপরে স্থানীয় কোনও ঘাসে-বোনা আস্তরণ। চেয়ারগুলো মনে হয় বাইরে পড়েই থাকে, রোদে-জলে-চাঁদে।

বোসো।

বললেন, আহুক।

তারপর বললেন, একেবারে চুপটি করে বোসো। "দ্যা হর্নেটস নেস্ট"-এর তোমাকে কি বলার আছে তাই শোনো চুপচাপ বসে। প্রকৃতির বুকের কোরকে একবার পৌছে গেলে মৌনী হয়ে যেতে হয়। তবেই তো প্রকৃতি মুখ খোলেন।

আজকে বোধহয় শুক্লা-অষ্টমী। চাঁদ যখনই বেরিয়ে পড়ছে মাঝে মাঝে, মেঘের আড়াল থেকে, তখনই নিচের আধো-চাঁদা তটভূমি আর তার উপরের ঢেউ ভাঙা সাদা ফেনার ছলাত-ছলাত বিজ-বিজ-বিজ শব্দ ভেসে আসছে সামুদ্রিক হাওয়াতে। দিগন্ত-বিস্তৃত সমুদ্র চারদিকেই। আশ্চর্য এক অনুভূতি। এই সমুদ্রকে পোর্ট ব্লেয়ারের বে-আইল্যান্ড হোটেলের সমুদ্রমুখি ঘরের লাগোয়া বারান্দাতে বসেও দেখা যেত কিন্তু এখানে বসে যেন রংকিনীর মনে হচ্ছে সে একজন জাহাজ -ডুবি-হওয়া নারী। এই দারুচিনি দ্বীপে কাষ্ঠ-খণ্ড ধরে কোনওক্রমে বুঝিবা ভেসে এসেছে আর তার চারদিকে তাথই তাথই করছে বারিধি।

হঠাৎই পেছনের গভীর জঙ্গল থেকে কী একটা গুড়ুম গুড়ুম শব্দ হল। কামানের গোলা কি? জলদস্যুরা কি আক্রমণ করল "দ্যা হর্নেটস নেস্টকে"?

ভয় পেয়ে চমকে উঠল রংকিনী। ও চমকে উঠতেই আহুক বোস বললেন, আন্দামানী পেঁচা ডাকল। এই পেঁচাগুলো মূল ভূখণ্ডের, মানে, ভারতের প্যাঁচাদের থেকে অনেকই বড়ো হয়। হুতুম

প্যাঁচার চেয়েও বড়ো। জানো তো। যে এখানের, মানে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের বেশিরভাগ গাছগাছালি পাখপাখালিরই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তারা ENDEMIC।

ENDEMIC শব্দের মানে?

মানে, এদের শুধু এখানেই দেখা যায়, অন্য কোথাওই দেখা যায় না।

তাই? যাক বাবা। ওই বুক কাঁপানো দুরগুম-দুরগুম-দুরগুম আওয়াজ শুনে আমি যা ভয় পেয়ে গেছিলাম। ভেবেছিলাম, জল-ডাকাত পড়ল বুঝি দ্বীপে। এখানে যারা থাকেন, মানুষেরা, তারাও কি ENDEMIC?

হ্যাঁ। তারাও মানে আদিম বাসিন্দারা। যেমন ওঙ্গে, আন্দামানী, জারোয়া বা নিকোবরের শোম্পেনদেরও অন্য কোথাওই দেখা যাবে না।

আর শ্রীযুক্ত আহুক বোসের মতো মানুষ?

বলেই, হাসল রংকিনী।

আহুকও হেসে ফেলেন।

বললেন, তাও ভালো যে, তুমি আমাকে আন্দামানী পেঁচা বা ইগুয়ানো বা নিকোবরী মেগাপড পাখিদের থেকে আলাদা করে একজন মানুষ বলে স্বীকৃতি দিলে। মানুষ পরিচয় তো আমার কবেই হারিয়ে গেছে।

মানুষ নয়তো আপনি কি?

কী জানি! হয়তো দ্বীপবাসী কোনও প্রাণী, কোনও বন-মানুষ।

তাই?

বলল, রংকিনী।

বলেই, চুপ করে গেল।

আহুকও হেসে ফেললেন।

বললেন, তাও ভালো যে, তুমি আমাকে আন্দামানী প্যাঁচা বা ইগুয়ানো বা নিকোবরী মেগাপড পাখিদের থেকে আলাদা করে একজন মানুষ বলে স্বীকৃতি দিলে। মানুষ পরিচয় তো আমার কবেই হারিয়ে গেছে।

মানুষ নয়তো আপনি কি?

কী জানি! হয়তো দ্বীপবাসী কোনও প্রাণী, কোনও বনমানুষ।

তাই?

বলল, রংকিনী।

বলেই, চুপ করে গেল।

আহুক বললেন, ডাকাতেরা এখানে এখন না এলেও ভিনদেশি জাহাজ-ট্রলার সব ঢুকে পড়ে বইকী। নানা ধান্দাতে তারা আসে। ভারতবর্ষর তো শত্রু কম নেই। তবে বেশিই আসে চুরি করে মাছ ধরতে।

আমাদের সামনে যে সমুদ্র তাই তো বঙ্গোপসাগর?

না। বঙ্গোপসাগর বাঁদিকে। "বে-আইল্যান্ড হোটেল" থেকে যে সমুদ্র দেখা যায় তা বঙ্গোপসাগর। কিন্তু আমাদের এই "দ্যা হর্নেটস নেস্ট"-এর সামনে যে সমুদ্র দেখতে পাচ্ছ তা হচ্ছে আন্দামান উপসাগর।

তাই?

তা কোন দেশের থেকে ওইসব জাহাজ বা ট্রলার আসে? শুধু আন্দামান উপসাগরেই আসে?

না, না, তারা বঙ্গোপসাগরেও আসে। বার্মা, মানে এখনকার মায়ানমার থেকেও আসে। ইরাবতী নদীও আমাদের গঙ্গারই মতো অনেক ব-দ্বীপ সৃষ্টি করে নানা নামে নানা শাখা উপশাখাতে

ভাগ হয়ে সমুদ্রে এসে পড়েছে। ম্যাপ যদি দ্যাখো, তাহলে দেখবে, গঙ্গার মুখ আর মায়ানমারের ইরাবতীর মুখের চেহারা প্রায় একই রকম। মাছ ধরা ট্রলার ও জাহাজ যে এদিকে আসে তাই নয়, তারা গঙ্গার মুখের সামনের বঙ্গোপসাগরেও চলে যায়। আরও আসে থাইল্যান্ড থেকে। উত্তর আন্দামানের কোকো দ্বীপ থেকে মায়ানমারের প্রেপারিস দ্বীপ খুবই কাছে। বাঙ্ক অফ মার্তাবন হয়ে আসে চোরা মাছ শিকারিরা। যেমন মধ্য আন্দামানেরও।

ওরা চুপ করতেই সমুদ্রের শব্দ জোর হল। চাঁদটাও মেঘমুক্ত হল। হেসে উঠল চাঁদের আলোয় ক্লোরোফিল উজ্জ্বল প্রকৃতি। আর ভেসে আসতে লাগল চারধারের ঝুঁকে-পড়া চাঁদের আলো-নিকোনো হরজাই-বন থেকে নানারকম ঝিঁঝির শব্দ, রাতচরা পাখির সংক্ষিপ্ত চকিত ডাক, বনের পাদদেশে নানা সরীসৃপের নড়াচড়ার আওয়াজ। যেন, ঘুমপাড়ানি গান শুনছে রংকিনী। ইংরেজিতে যাকে বলে SOPORIFIC, তাই এখানের পরিবেশ। ভারি শান্ত নির্লিপ্ত এখানের প্রতিবেশ টানটান। স্নায়ু আলগা হয়ে আসে। ঘুম পায়। ঘুমোনো, বই পড়া, খাওয়া, বনের মধ্যে ঘোরা, সমুদ্রে-স্নান করা, তটে শুয়ে থাকা, তারপর আবার খাওয়া, গান শোনা, আবার ঘুমোনো এবং ঘুম থেকে উঠে কারো আদর খাওয়া বা কারোকে আদর করা, এই হওয়া উচিত এখানের রুটিন। শহরের মানুষের জীবন থেকে, একদিন যেসব "সাধারণ" এবং "প্রাকৃতিক" সব আনন্দে মানুষ-মানুষী অভ্যস্ত ছিল, তার সবকিছুই এখন অন্তর্হিত হয়েছে। মানুষ আর মানুষই নেই। সারাক্ষণ খাই-খাই, চাই-চাই, আরও চাই-এর ROBOT হয়ে গেছে। অথচ ঈশ্বর সম্ভবত তাঁর সৃষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষের এমন করুণ পরিণতি হোক আদৌ তা চাননি। শহুরে মানুষ-মানুষীর জীবন থেকে পূর্বিতা এবং পূর্বাপর জ্ঞানও অবলুপ্ত হয়েছে।

চুমকি বোধহয় এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছিল যখন "অন্য কম্পাস"-এর কথা বলছিল, সুমদ্রের মধ্যে মোটরবোটে করে 'দ্যা হর্নেটস নেস্ট'-এর দিকে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে আসতে আসতে।

রংকিনী বলল অনেকক্ষণ পরে, আপনি যে মেগাপড পাখির কথা বললেন, চুমকির মুখেও শুনেছি, এখানে মেগাপড-এর নামে হোটেল এবং একটা দ্বীপও আছে। কিন্তু সেটা কি পাখি? দেখিনি তো।

দেখবে কী করে? মূল ভারতীয় ভূখণ্ডে এ পাখি নেই। MEGAPOD তো এখানেই শুধু পাওয়া যায়। "পাওয়া যায়" বলা বোধহয় ঠিক নয়, প্রায় অবলুপ্তই হয়ে গেছে। মেগাপড যে ডিম পাড়ে তা থেকে বাচ্চা ফুটে বেরোয় স্বাবলম্বী হয়ে। মহা অকালপক্ক তারা। মেগাপড পাখি কিন্তু উড়তে পারে না। বিধাতার কী বিচ্ছিরি রসিকতা বলো তো? আমরা যদি হাঁটতে না পারতাম, শুধুই উড়তে পারতাম এবং রাতে গাছের ডালে বসে ঘুমোতাম তবে আমাদের যেমন অবস্থা হত, মেগাপডদেরও তেমনই অবস্থা প্রায়।

পাখি অথচ উড়তে পারে না এ আবার হয় না কি?

হয় হয়। সব হয়। এই প্রকৃতিতে কী না হয়? তোমার মতো সুন্দরী, বিদুষী যুবতী এইসব অভাবনীয় অসুবিধা সত্ত্বেও এই জঙ্গলে-ভরা দ্বীপে সাতদিন সাত রাত থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নেবে তাও কি হয়? কিন্তু হল তো! কত কী হয়। প্রকৃতির বুকের কোরকের মধ্যে কী যে হয় আর কী যে হয় না, তা কি কেউই বলতে পারে? শেষ পর্যন্ত কদিন ক-রাত থাকবে সেটা এখনও অনিশ্চিত কিন্তু একটা রাত তো থাকছ নিশ্চিতই। এও কি আদৌ ভাবনীয় ছিল? একটি রাত যে-কোনও মানুষ বা মানুষীর জীবনকে যেমন লণ্ডভণ্ড করতে পারে তেমন সমাহিতও করতে পারে, বিন্যস্ত।

রংকিনী কথা না বলে চুপ করে আহুকের চোখে চেয়ে রইল। ধুনীর আগুনে আহুক বোস-এর দুটি চোখের উজ্জ্বল তারা নানারকম রং উড়োচ্ছিল। একবার সবুজ, একবার লাল, জঙ্গলে বড়ো বাঘের চোখে রাতে আলো পড়লে যেমন হয়। দেখেছিল, বান্ধবগড়ে।

আহুক বললেন, আন্দামান নিকোবরের মেগাপড-এর মতোই মালয়েশিয়াতে একরকম পাখি আছে, সেও প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গেছে, প্রায় কেন, হয়তো অবলুপ্তই হয়ে গেছে পুরোপুরি এতদিনে, যার নাম ডোডো। যে মানুষ পৃথিবীতে থাকে অথচ হাঁটতে পারে না তার পক্ষে বাঁচা যেমন মুশকিল, তেমনই যে পাখিরা উড়তেই পারে না শুধু হেঁটে বেড়ায়, তাদের পক্ষেও বাঁচা মুশকিল।

কোনো কোনো পাখি উড়তে পারে না? তিতির বা নানা ধরনের পাট্রিজও তো উড়তে পারে না। রংকিনী বলল।

কে বলল? তারা উড়তে অবশ্যই পারে তবে খগচর বলতে আমরা যেমন উড়ন্ত পাখি বোঝাই তেমন পাখি নয়। মাটিতেই বেশি সময় থাকে, যেমন ময়ূর, যেমন বনমুরগি। মালয়েশিয়ার ডোডোরই মতো হাওয়াইয়ান দ্বীপপুঞ্জেও একরকম বড়ো পাখি দেখা যায়, এখন তারাও প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গেছে, যাদের নাম 'নেনে'। ডোডো এবং নেনেও কিন্তু ''ENDEMIC''। সেশ্যেল্‌স দ্বীপপুঞ্জেও একরকমের RAILS দেখা যায় তারাও উড়তে পারে না।

RAILS কী?

পাখি এক রকমের।

সেশ্যেল্‌স-এর কথা চুমকিও বলছিল। আপনিও কি গেছেন?

হ্যাঁ। গেছি বইকী। সারা পৃথিবীতেই তো ঘুরে বেড়িয়েছি।

কেন? কিসের খোঁজে? গুপ্তধন?

আহুক হেসে বললেন, না, তা নয়। তবে পেলে মন্দ হত না। তাছাড়া গুপ্তধন তো সবসময়ে নিষ্প্রাণ পদার্থ নাও হতে পারে।

মানে?

অনেক প্রাণবন্ত গুপ্তধনও থাকে, যা অন্য মানুষ অথবা মানুষীকে প্রাণিত করে।

তাই? করে বুঝি?

করেই তো।

হেসে বললেন, আহুক।

তারপর বললেন, তোমাদের মতো প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া বিশেষ হয়নি, যা শিখেছি তা নানা দেশ ঘুরেই। ট্রাভেলিং ইজ দ্যা বেস্ট এডুকেশান। যদি অবশ্য চোখ-কান-নাক খুলে ট্র্যাভল করো। তুমিও যেয়ো সেশ্যেল্‌স-এর একবার। হানিমুন করতে গেলেই সবচেয়ে ভালো হয়।

আপনিও চলুন আমার সঙ্গে।

হানিমুন করতে?

হেসে, কিন্তু বোকার মতো এবং কিঞ্চিৎ ভয় পেয়েও যেন বললেন, আহুক।

আমার আপত্তি নেই। আপনার আপত্তি না থাকলেই হল। যেখানে পূর্ণচাঁদ সেখানেই তো হানিমুন।

আমি যে তোমার বাবার বয়সি। কোনও বাবার বয়সি মানুষ কি পারে মেয়ের বয়সি কারো সঙ্গে জীবনে দৌড়োতে? তাকে সুখী করতে?

জীবন মানে কি শুধুই দৌড়?

কে জানে! জীবন মানে যে কী? তা যদি জেনেই ফেলতে পারতাম তবে তো আমি লেখকই হতাম। একটি মাত্র বই লিখেই নোবেল প্রাইজ পেতাম। জীবনের মানে জানা আর হল কই? কজনই বা তা জানতে পারে?

এত দেশ যে দেখলেন, তার মধ্যে কোন দেশ সবচেয়ে ভালো লেগেছে আপনার?

নিজের দেশ। "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি"। শুধু দেশের নেতারা যদি আন্দামানী প্যাঁচা না হয়ে মানুষ হত তবে এই পঞ্চাশ

বছরে এদেশের চেহারা যে কী হতে পারত তা তোমরা ধারণাও করতে পারো না। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আমার পা পড়েছে বলেই তুলনা করতে পারি আমি।

তুলনা করে কী মনে হয়?

কী আর মনে হবে? দুচোখ জলে ভরে যায়।

বলেই, আহুক চুপ করে গেলেন।

এর পরে দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন।

খুব কাছে থাইল্যান্ডের টেনাসেরিস অঞ্চল। সারগুই দ্বীপপুঞ্জ থেকে আসে জাহাজগুলো। মগ দস্যুদের নাম শুনেছ তো? মগ বাবুর্চি? "মগের মুল্লুক" কথাটা শুনেছ? বর্মিদেরই আরেক নাম তো মগ। বাংলাদেশের চাঁটগার আর মায়ানমারের আরাকানের বাবুর্চিদের হাতের খানা যে না খেয়েছে তার জীবনই বৃথা।

ইসস। জীবনটা তাও শুধু একটা কারণেই বৃথা হলেও না হয় বুঝতাম। তাহলে তার প্রতিকারের কোনও বন্দোবস্ত করার চেষ্টাও না হয় করা যেত। কিন্তু কারও জীবন যদি এতগুলো কারণে বৃথা হয় তবে তো জাহাজডুবি হওয়ার চেয়েও খারাপ।

বলেই হেসে উঠল রংকিনী।

আহুকও হাসলেন।

আগুনটা ধিকি ধিকি জ্বলছিল। ষাটোর্ধ্ব হলেও অত্যন্ত সুগঠিত চেহারার, সুস্বাস্থ্যের আহুককে সেই আগুনের কম্পমান আলোতে বাদামি রঙা দেখাচ্ছিল। একদিন তাঁর গায়ের রং যে ফরসা ছিল খুবই আজও বোঝা যায়। "সানট্যানড" বলতে কী বোঝায় তা আহুক বোসকে দেখে জানতে হয়। সামনের দিকে চুল প্রায় নেই বললেই চলে। নাকটা চাপা। খাড়া হলে কেমন দেখাত, কে জানে। হয়তো পশ্চিম-দেশের সাহেবদের মতোই দেখাত। কিন্তু এই সামান্য চাপা নাক এক আলগা আলাদা আভিজাত্য দিয়েছে আহুক বোসকে। হাসিটি ভারি সুন্দর। ঝকঝকে দাঁত। নড়েনি। পড়েনি। রাবারের স্লিপার পরে, জিন্‌স-এর খাটো শর্টস এবং আডিডাস-এর খয়েরি রঙা গেঞ্জিতে বাঙালি বলে একেবারে মনেই হচ্ছে না তাঁকে। তাঁর তলপেটের কাছে সামান্য মেদ আছে। কিন্তু শরীরের আর কোথাওই মেদ নেই। ধিকি ধিকি আগুনের সামনে বসা চারিদিকে সমুদ্র-ঘেরা এই নির্জন দ্বীপের রবিনসন ক্রুসো আহুক বোস-এর দিকে তাকিয়ে রংকিনী ওর শরীরের মধ্যে এক অননুভূত স্পষ্ট রিকিঝিকি অনুভব করল। এই শারীরিক অনুভূতি এর আগে কখনও হয়নি ওর এই চৌত্রিশ বছরে। হঠাৎই ভীষণ ভয় করতে লাগল। আন্দামানী প্যাঁচার ডাক শুনেও অত ভয় করেনি।

রংকিনী ভাবছিল যে, ও ঠিকই বলেছিল এখানে আসবার সময়ে চুমকিকে। বলেছিল যে, রংকিনী নিজেকে যতখানি ভয় পায় ততখানি ভয় আর কারোকেই পায় না। নিজের বাঁচন, নিজের মরণ, নিজের নিয়তি সে তার নিজের দুই সুন্দর বুকের মধ্যেই জীবনকাঠি মরণকাঠিরই মতো বয়ে বেড়াচ্ছে জন্মাবধি। ও জানে, ও জানে সে কথা। শি হ্যাজ স্টারড দ্যা হর্নেটস নেস্ট। কিছু একটা অঘটন ঘটবে এখানে। চুমকি এই দ্বীপের রহস্য জানে বলেই একটি রাতও কাটায়নি এখানে আজ অবধি সেকি রংকিনীর বন্ধু? না শত্রু?

আহুক বোস রংকিনীর দিকে চেয়েছিলেন। জংলা কাজের হালকা সবুজ সালোয়ার-কামিজে আগুনের মধ্যে থেকে প্রতিসরিত আলোর প্রজাপতিরা নাচানাচি করছিল। স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলছিল নিভছিল রংকিনীর চোখের তারায়। বাঁ হাত দিয়ে তাঁর সলট অ্যান্ড পেপার দাড়িকে মুঠো করে ধরে আহুক চেয়েছিলেন রংকিনীর দিকে। রংকিনীর শারীরিক সৌন্দর্যকে এক অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য ধার দিয়েছে ওর বুদ্ধিমত্তা, রুচি এবং সম্ভবত ওর শিক্ষাও। এই প্রসাধনের চেয়ে সুন্দরতর প্রসাধন, কী পুরুষ, কী নারী কারোই ঈপ্সিত নয়। এই প্রসাধন পারি শহরের সম্ভ্রান্ততম বিউটিশিয়ানের পার্লারে

গিয়েও কিনতে পারা যায় না কোনও অর্থমূল্যেই। যার চোখ আছে দেখার, শুধু সেই এই প্রসাধন চেনে। সব জিনিস সকলের জন্যে নয়।

আহুক ভাবছিলেন, টিটিঙ্গি আর তার বিয়ের পরে পরেই যদি কোনও সন্তান জন্মাত এবং যদি আরও কয়েক বছর আগে বিয়ে করতেন তবে আজ হয়তো রংকিনীর সমবয়সি একটি মেয়ে নিঃসন্তান আহুকের থাকতে পারত। নিজের কোনও সন্তান নেই তাই অপত্যবোধ কাকে বলে তা জানার সুযোগ তাঁর হয়নি এ জীবনে। এক গভীর বোধ থেকে তিনি এ জীবনে বঞ্চিতই রয়ে গেলেন। তাই সববয়সি নারীকেই নারীর পূর্ণ মহিমাতে প্রেমিকা হিসেবেই দেখতে তিনি অভ্যস্ত।

ঘুম পায়নি? সেই কাকভোরে তো উঠেছ? সারাদিনে বিশ্রামও তো পাওনি একটুও।

আহুক জিজ্ঞেস করলেন।

বিশ্রামই বিশ্রাম। আমাকে যে কী টেনশান-এ থাকতে হয় সারাদিন তা আপনি অনুমানও করতে পারবেন না। শুধু দিনই বা কেন? রাত-দিন যে কোনও সময়েই। ভারি বিশ্রী কাজ। তবে চুমকির অত রকমের বাণিজ্যর মতো অত যাচ্ছেতাই নয়। অবশ্য ওর আয়ও সেইরকম। কিন্তু নিজের উপার্জিত টাকা নিজে হাতে যে একটুও খরচ করবে সেই সময়টুকুও পায় না বেচারি। সত্যি বলছি। এখানের প্রতিটি মুহূর্তই তাই বিশ্রাম আমার। তারিয়ে তারিয়ে অনুভব করছি।

অনুভব না উপভোগ?

ওই হল। অত ভালো বাংলা জানি না আমি।

তুমি কি আরেকবার চান করবে শোওয়ার আগে? এখানে না আছে এসি, না ফ্যান। ঘেমে-চুমে তো একাকার। হিউমিডিটিও আছে।

জলে টান পড়বে না?

কী জন্যে?

না, চান করলে।

তা পড়বে না। তবে তোলা জলে চান করবেই বা কেন এখানে এসে! সমুদ্রে চান করো।

এই রাতের বেলা?

রাত আর দিনে তফাত কি? এই দ্বীপের মালকিন তো তোমার বন্ধু। তার বকলমে আমি। আমি না হয় এই দ্বীপের চারদিকের তটভূমির মালিক করে দিলাম তোমাকেই। এমন সুযোগ পাবে কোথায়? তবে সাঁতার জানো তো ভালো?

তা জানি। কিন্তু সুইমিং-পুলে সাঁতার কাটা আর সমুদ্রে সাঁতার কাটা তো এক নয়।

তা নয়। তবে সমুদ্রে সাঁতার কাটার চেয়েও অনেকই কঠিন জীবনে সাঁতার কাটা। সেখানেই যখন পটু-সাঁতারু হয়েছ তখন সমুদ্রে ভয় কি?

তারপরই বললেন, সুইম-সুট এনেছ তো?

এনেতোছি! কিন্তু সেতো হোটেলেই রয়ে গেছে সুটকেস-এ। হোটেলের সুইমিংপুলটা ছোটো তাই আমাদের দুজনের কেউই জলে নামিনি।

সুইম-সুট না এনেছ না এনেছ বার্থডে সুটটা তো এনেছ সঙ্গে করে। এখানে তোমাকে দেখছেটা কে? তোমাকে তো আগেই বলেছি। এমন দ্বীপের মালিকানা গ্রিস শিপিং-ম্যাগনেট আরি ওনাসিস আর জ্যাকুলিন কেনেডি বা লেডি ডায়ানা আর ডোডিদেরই মানায়। আমাদের মতো পাতি আর ভিতু আর পুতপুতু মধ্যবিত্ত মানসিকতার বাঙালিরা এই সম্পদের মূল্য বুঝব কী করে! এই মালিকানার দামই বা দেব কি করে।

আমার মধ্যে যে একজন "জ্যাকুলিন" বা "লেডি ডি" নেই, তা আপনি জানলেন কী করে?

আমি কী করে জানব? আছে কি না তা তো তোমারই জানার কথা। থেকে থাকলেও থাকার লক্ষণ এখনও প্রকট হয়নি।

কথা ঘুরিয়ে রংকিনী বলল, রাতের বেলা সি-বিচ-এর সাপটাপ থাকে না?

প্রত্যেক মেয়েই গুগলি-বোলার। কোন কথা কোথায় ফেলে কোন দিকে কেমন করে ঘোরাতে হয়, তা তাদের মতো, পৃথিবী-খ্যাত পুরুষ বোলারেরাও জানে না।

আহুক বললেন, ভয় পাচ্ছ চান করার সময়ে কামড়ে দেবে বলে?

হ্যাঁ। পাচ্ছিই তো। এমন অভিজ্ঞতা তো কোনওদিনও হয়নি। পুরী কী গোপালপুর কী কোভালম এও তো সন্ধের পরে কেউই থাকে না সি-বিচ-এ।

থাকে না ঠিকই। তবে সেটা মানুষেরই ভয়ে। কাঁকড়া বা অন্য কিছুর ভয়ে নয়। মানুষের মতো ভয়াবহ জীব এই পৃথিবীতে আর তো নেই!

তা তো বটেই! বিশেষ করে পুরুষ মানুষ।

আহুক বললেন, ডালহাউসি স্কোয়ারে যত শ্বাপদ আছে তত তো ভারতের কোনো জঙ্গলেও নেই। এখানে মানুষের ভয় নেই। আমাকে পুরুষ বলে গণ্য কোরো না। আমি না হয় তোমার সঙ্গে যাবই না। তোয়ালে দিচ্ছি। চলে যাও। এখান থেকে তো তটভূমি দেখাও যায় না। যদি দেখা যেতও তবেও চাঁদের আলোতে কোনও MERMAID বা জিন বা পরী তটভূমিতে নেমেছে সমুদ্রে জলকেলি করতে মনে হত, অস্পষ্ট, রহস্যময়ী তাকে, দূর থেকে। চোখ দিয়ে ছুঁলে তাতে তো জিন বা পরীর কিংবা MERMAID-এর সতীত্ব নষ্ট হত না! তবে, এত ভয় কিসের তোমার?

হঠাৎই রংকিনী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, যাব চান করতে। একটা তোয়ালে দিন।

শুধুই তোয়ালে? তোমাকে নতুন সাবানও দেব।

কি সাবান?

চন্দন সাবান। তারপরে আতরও দেব।

কী আতর?

ফিরদৌস।

আতর কি করে মাখে তা আমি জানি না। আতর তো মাখে মুসলমানেরা।

মুসলমানেরাই তো জানে জীবন কি করে উপভোগ করতে হয়। খাওয়া-দাওয়া আদর-সোহাগ তো তাদের কাছ থেকেই শেখার ছিল সকলেরই। বোকারা শিখল না, তা কি করা যাবে!

আতর মাখতে অনেকেই জানে না। সবকিছুই শিখতে হয়। আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব। থাকো তুমি কটা দিন এখানে তোমাকে শেখাব কী করে ভালোবাসতে হয় জীবনকে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে। তুমি সম্পূর্ণ অন্য নারী হয়ে ফিরবে এখান থেকে।

আর যদি না ফিরি?

তোমার খুশি। তবে হাতে অনেকই সময় আছে সিদ্ধান্ত নেবার। তার উপরে শয়তানের ভর হলে তবেই মানুষে তাড়াহুড়ো করে। কখনও তাড়াহুড়ো কোরো না। কী কাজে, কী খেলায়। তাড়াহুড়ো করলেই স্টাম্প-আউট হবে।

কাঁকড়া নেই বিচ-এ? সত্যি তো।

তোমার খাওয়ার জন্যে কাঁকড়া আছে জালাতে। এখানে অতিথি এলে যাতে অপ্রস্তুতে না পড়তে হয় তাই কাঁকড়া রাখা থাকে। তবে সে সব বড়ো কাঁকড়া জেলেদের কাছ থেকে কেনা। জিয়োনো থাকে। সি-বিচ-এ কাঁকড়া নেই।

তারপর একটু চুপ করে থেকে আহুক বললেন, তবে ভয়ের মধ্যে একটি ভয় আছে।

কী?

একটা খুব বড়ো মেয়ে টুনা মাছ।

মাছটি যে মেয়ে, তা জানলেন কি করে?

সে যে আমার প্রেমিকা। কত গল্প হল সেদিন তার সঙ্গে। তাকে ধরার জন্যে কতদিন ধরে প্রাণপাত করছি কিন্তু ধরতে পারিনি। কিন্তু সেদিন সে নিজেই ধরা দিল।

ধরেছেন! কই? দেখি। খুব বড়ো মাছ?

খুবই বড়ো। তবে যে স্বেচ্ছায় ধরা দেয় তাকে কি ধরা যায়? না খাওয়া যায়? কোনও ভদ্রলোক পুরুষই তা করতে পারে না। মাছ তো ধরে, ধরেছে কত মানুষেই, কিন্তু মাছের সঙ্গে প্রেম করেছে এমন একজন মানুষকেও কি তুমি জানো স্বদেশে বা বিদেশে!

আপনি সত্যিই অদ্ভুত মানুষ।

অদ্ভুত কী! বলো কিম্ভূত। নইলে এই হর্নেটস নেস্ট-এ কেউ থাকে? একা একা?

এখানে নাকি অনেক প্রেতাত্মা আছে?

থাকতে পারে। অনেকেই বলে আছে। তবে আমি নিজেই বাঘা-ভূত বলে কোনও Lesser ভূত আমার সামনে সাহস করে আসেনি এ পর্যন্ত। ভীরাপ্পানের সঙ্গে নাকি একটা শাকচুন্নি আর একটা ব্রহ্মদৈত্যের দেখাও হয় মাঝে মাঝে। শাকচুন্নি থাকে একটা অর্জুন গাছে আর ব্রহ্মদৈত্যটা থাকে বহু প্রাচীন এক প্যাডক গাছে।

শাকচুন্নি আর ব্রহ্মদৈত্য তো বাঙালি ভূত।

ঠিকই। ভীরাপ্পান তেলুগু নামেই ডাকে তাদের। তবে তাদের চেহারার যা বর্ণনা দেয় তা শুনেই আমি তাদের বাঙালিকরণ করেছি।

সেটা ভালোই করেছেন।

ভীরাপ্পান মাঝে মাঝে দিনমানে গিয়ে তাদের ভেট-টেটও দিয়ে আসে।

কী ভেট? খাবার?

না না। খাবার-টাবার নয়। এত বড়ো দ্বীপ রয়েছে, চারদিকেই সমুদ্র তাদের, খাদ্য পানীয়ের অভাব নাকি?

তবে কি ভেট দেয়?

শাকচুন্নিতে দেয় লালরঙা শায়া, চুল বাঁধার লাল রিবন। কুড়ি গজ মার্কিন কাপড়ে তৈরি হয় সেই শায়া। তারপর রঞ্জক সাবান দিয়ে অনেক যত্নে লাল রং করে ভীরাপ্পন। অদ্ভুত সাইজ। লম্বাতে পেল্লাই অথচ কোমরের মাপ তোমারই মতো।

লজ্জা পেল রংকিনী।

মনে মনে বলল, আমার কোমরের মাপ আপনি জানলেন কোত্থেকে?

তারপরে বলল, সেই শাকচুন্নি কি অন্য রঙের শায়াও পরে?

আরে না। কিছুই পরে না। একদিন ভীরাপ্পানের সঙ্গে ভরসন্ধ্যায় মিষ্টি জলের পুকুরের পারে নাকি তার দেখা হয়েছিল। একেবারে উদোম। তারপরে এরকম লেংথ উইদাউট ব্রেথ অ্যান্ড ব্রেস্টস চেহারা! ভীরাপ্পান তো এমনিতেই পয়লা নম্বরি নারীবিদ্বেষী, জীবনে নারীসঙ্গ করেনি, নগ্না রমণী দেখেওনি, সেই পড়ল তো পড় উদোম শাকচুন্নির খপ্পরে। লজ্জা পেয়ে, ভয় পেয়ে, জিভ কেটে দৌড়োতে দৌড়োতে এসে সে তার সেই নগ্নিকামূর্তি দর্শনের বর্ণনা দিল তার খিচুড়ি ভাষাতে। সেই বর্ণনা যদি তুমি শুনতে! তেলুগু, তামিল, হিন্দি এবং ইংরেজি মেশানো সে কী অপাচ্য পাঁচন! পাছে তাকে নগ্নিকা আবারও দেখা দেয় সেই ভয়েই বীরাপ্পান তাকে তুষ্ট করে চলেছে।

রংকিনী হেসে উঠল খুব জোরে।

হেসে উঠেই চুপসে গেল। বহু বছরের মধ্যে এমন নির্দোষ আনন্দের ভাগীদার যে সে হয়নি তা হঠাৎই বুঝতে পেল। এমন অট্টহাসিও হাসেনি বহুদিন যে, সে কথাও। বুঝল যে, তার মধ্যে থেকে ঘুমিয়ে-থাকা অন্য একজন রংকিনী আস্তে আস্তে পাপড়ি মেলছে এক এক করে। যে রংকিনীকে ও চিনত না। জানত না কখনওই।

হাসির দমক সামলে উঠে বলল, আর ব্রহ্মদৈত্যকে কী ভেট দেয় ভীরাপ্পান?

তাকে দেয় খেটো ধুতি, কাঠের খড়ম দু-হাত লম্বা বাঁশের বাখারির তৈরি কানখুসকি আর কালো নারকোল-এর খোলের মালা।

বাঃ।

বাঃ কেন?

শুনে রোমাঞ্চ হচ্ছে আমার, তাই বাঃ।

চানের কী হল?

আজ থাক। আগে দিনমানে কাল সব দেখে-টেখে নিই। তটভূমির কোন জায়গাটি সবচেয়ে রোম্যান্টিক সে জায়গাটা আবিষ্কার করি তারপরে মন যদি লাগে, ভয় যদি কাটে, তবে না হয় রোজই রাতেও চান করা যাবে।

আমাকে সঙ্গে নেবে তো? লাইফ-গার্ড ছাড়া কিন্তু যাওয়াটা ঠিক হবে না।

নিতেই পারি। ভেবে দেখব। চানঘরে সবাই একাই যায় কিন্তু সমুদ্রস্নানে যায় সদলেই।

কথাটা যেন কোথায় পড়েছি বলে মনে হচ্ছে। কোনও বাংলা উপন্যাসে কি?

ইয়েস স্যার। 'চানঘরে গান'। পত্রোপন্যাস।

তুমি বাংলা বই পড়ো নাকি?

আমি পড়ি। কিন্তু চুমকি বলে বাঙালি সাহিত্যিকরা সবাই "আতা-ক্যালানে"।

হো হো করে হেসে উঠলেন আহুক। বললেন, গ্রেট। শি ইজ রিয়্যালি গ্রেট। একেবারে ওরিজিনাল ওর সব অভিব্যক্তি। দারুণ মেয়ে কিন্তু তোমার বন্ধু ওই চুমকি।

আপনি পড়েন?

পড়ি। তবে খুব বেছে বেছে। চুমকি খুব খারাপ বলেনি কথাটা। তবে এমন জেনারালাইজ করাটা ঠিক না। ইংরেজিতেই বা কি লেখা হচ্ছে? সাহিত্যিক বলো, গায়ক বলো, আঁকিয়ে বলো সর্বত্রই এখন আতা-ক্যালানে পায়ে-তেল-মাখানোদের যুগ। নয়তো এস্টাব্লিশমেন্টের আত্মসম্মানজ্ঞানহীন চাকর, কুকুর-মেকুরের দিন এখন।

তারপর বলল, আপনি এখানে খবরের কাগজ তো পান না, ইলেকট্রিসিটিও নেই যে টিভি দেখবেন, আপনার পাগল-পাগল লাগে না। পৃথিবীতে রোজ কত কী ঘটছে তার কিছুমাত্র খোঁজ রাখেন না, আপনার আই কিউ তো একেবারেই নেমে যাবে।

আমি তো আর কারো কাছে চাকরির জন্যে ইন্টারভ্যু দিতে যাচ্ছি না। এখন তো সব কিছুরই মূল্যায়ন টাকাতেই। যার বেশি আই কিউ সে বেশি মাইনের চাকরি পাবে। ওসব Pettifogging থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। বেশ আছি। খবরের কাগজ পড়ে হয়টা কী? কাগজওয়ালাদের বড়োলোক করা ছাড়া? মিসেস মার্গারেট থ্যাচার, ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী, তাঁর জীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে কি লিখেছিলেন জানো, খবরের কাগজ সম্বন্ধে?

কী?

"If what the press wrote was false, I could ignore it, and if it was true. I already knew it "... ...", I learned to sheild myself from newspapers by the simple expediency of not reading them."

রংকিনী হাসল শুনে। বলল, বাঃ। ওঁর জীবনীর নাম কী? আত্মজীবনী?

হ্যাঁ। নাম হচ্ছে "THE PATH TO POWER"। কলকাতায় ফিরে গিয়ে জোগাড় করে পড়ে ফেলো।

রংকিনী চুপ করে রইল।

তারপরেই হাতঘড়ি দেখে আঁতকে উঠল। বলল, ইসস! সাড়ে-এগারোটা।

আজই ওই বিচ্ছিরি জিনিসটিকে হ্যান্ডব্যাগে পুরে ফ্যালো। যত নষ্টের গোড়া। আসলে এই ঘড়িই আমাদের সব আনন্দ নষ্ট করে দিয়েছে। আমি একে একেবারেই বর্জন করেছি। ক্যালেন্ডারকেও। আমার জন্মদিন কবে তা আমি জানতে পারি না। মৃত্যুদিনও জানবে শুধু ভীরাপ্পান। অবশ্য যদি সেইসময়ে সে এখানে থাকে। ও না থাকলে জানবে সামুদ্রিক পাখিরা। যারা এসে বসবে আমার শবের উপরে। কী শান্তি বলো তো! শান্তি কি শুধু আমারই! শান্তি কত্ত মানুষের! যারা উঠতে বসতে আমার মৃত্যুকামনা করেছে তাদেরও ফুল হাতে করে আসতে হবে না মৃতদেহের কাছে। আমার আত্মাও বেঁচে যাবে মৃত্যুর পরেও সেইসব দুরাত্মার সংস্পর্শ থেকে। তোমরা সভ্য সমাজের মানুষেরা প্রতিদিন চব্বিশ ঘণ্টা যাই করো, তার খুব কমই মানুষের মতো কাজ। তোমরা তোমাদের ঘড়ির চাকর, মনিবের চাকর, অভ্যেসের চাকর, চক্ষুলজ্জার চাকর, সামাজিকতার চাকর, লোকভয়ের চাকর। সকলেরই চরণ ছুঁয়ে বেড়াচ্ছ তোমরা।

বাঃ। তবুও সমাজকে কি একেবারে বর্জন করলে চলে?

সমাজ? যে সমাজ তোমার ভালো হলে ঈর্ষায় সবুজ হয়ে যায়? যে সমাজ তোমার ক্ষতি হলে উল্লাসে মেতে ওঠে? সেই ভণ্ড সমাজের মেকি মানুষদের সঙ্গে ঘড়ি মিলিয়ে পায়ে-পা ফেলে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই একদিন দেখতে পাবে যে, আমার মতো বুড়ো হয়ে গেছ। তারপর একদিন মরেও যেতে হবে। মিছিমিছি। বুঝবে যে মিছিমিছি জন্মে মিছিমিছিই মরে গেলে। না বাঁচলে এ জীবনে নিজের জন্যে, না সত্যি সত্যিই পরের জন্যে। চুমকির ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, তোমরা এই সভ্য, সংস্কৃত, শিক্ষিত, সামাজিক সব জীবেরা প্রত্যেকেই এক একটি আতা-ক্যালানে।

রংকিনী চুপ করে ছিল। অনেকক্ষণ চুপ করেই রইল।

আহ্নকও চুপ করে রইলেন। অনেকক্ষণ।

হঠাৎই এক সময়ে উঠে পড়ে বললেন, ওঠো! এবারে শুয়ে পড়ো গিয়ে।

আপনি কোথায় শোবেন? বিছানা তো একটাই।

জানি। বিছানাতে নতুন ধোওয়া ও ইস্তিরি-করা চাদর পেতে দিয়েছি। বদলে দিয়েছি বালিশের ওয়াড়। আতর লাগিয়ে দিয়েছি বালিশে, পাশ-বালিশে। ফুল ছড়িয়ে দিয়েছি বালিশের পাশে।

কী আতর?

শবে দুলহান।

তা তো হল, আপনি শোবেন কোথায়?

বারান্দার ইজিচেয়ারে।

সে কি? রাতে যদি বৃষ্টি আসে?

যদি কেন, বৃষ্টি তো আসবেই।

তবে?

তবে কি? তোমার বিছানা থেকে শবে দুলহান-এর গন্ধ উড়ে আসবে বৃষ্টিভেজা হাওয়াতে। চেয়ারে আমি অন্য কাতে শোব তখন। কী করা যাবে? বিছানা আর খাট তো একটাই।

কিন্তু খাটটা তো মস্ত চওড়া।

তা চওড়া। বিবাহিত দম্পতিরা অনায়াসে শুতে পারেন।

আমি যে অন্য কারো সঙ্গেই শুতে পারি না।

রংকিনী অসহায়ের গলাতে বলল।

আমিও না, আহ্নক বললেন। তারপরই বললেন, কী মিল বলো তো দুজনের। সারা রাত কি কারও সঙ্গেই শুয়ে থাকা যায়? আমি তো ভাবতেই পারি না। ভাল্লুকের সঙ্গে তবু হয়তো পারি কিংবা আন্দামানী শুয়োরের সঙ্গে কিন্তু কোনও যুবতীর সঙ্গে? নেভার। কোনও সুন্দর কিছুকেই বেশিক্ষণ একটানা কাছে, অত কাছে রাখতে নেই। ফুলেরই মতো সৌন্দর্য, রহস্য, সুগন্ধ তাতে

দলে গিয়ে মলিন হয়ে যায়। এই তো ভালো। কত যে ভালো, তা এখানের এক একটি করে রাত পোয়াবে আর বুঝতে পারবে। তুমি তো ছোট্ট মেয়ে। খুকিটি। তুমি কিচ্ছু বোঝো না।

রংকিনী অবাক হয়ে ওই কিম্ভূত মানুষটির দিকে চেয়েছিল।

আহুক বললেন, এখানে অভাব শুধু একটাই জিনিসের।

কিসের?

আয়নার। আয়না নেই কোনও। তোমার যখনই নিজেকে দেখতে ইচ্ছে হবে আমার সামনে আসতে হবে তোমাকে।

সে কি? কেন?

আমার চোখই তোমার আয়না।

তারপর চেয়ারে ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এবারে শুয়ে পড়ো। কাল একেবারে ভোরে, আলো ফোটার আগে আগে বেরিয়ে পড়ব। তোমাকে পুরো দ্বীপটি ঘুরিয়ে দেখাব। "দ্যা হর্নেটস নেস্ট"। এখনও ঝড়ে-পড়া ভাঙা জাহাজের অংশ দেখতে পাবে তটের উপরে। যদি চাও তো গুপ্তধন খুঁজে দেখতে পারো। অনেকে বলে, সেশ্যেল্স দ্বীপপুঞ্জের আশ্চর্য দ্বীপেরই মতো, সেখানের বো ভাঁলো তটেরই মতো, এই "দ্যা হর্নেটস নেস্ট"-এও অনেক গুপ্তধন পোঁতা আছে। রাতের বেলা তো সব প্রেতাত্মারা নাকি সেইসব ধনই পাহারা দেয়। যক্ষ আর যক্ষিনী আছে নাকি অনেক।

ভয় দেখাবেন না আমাকে।

ভয় দেখাচ্ছি না। Mere statement of fact.

এই সেজ-বাতিটি ঘরে জ্বললে সারারাত আমি শোব বা ঘুমোব কি করে? জানালাতেও তো কোনও পর্দাটর্দা নেই। বাতি জ্বললে ঘুমোতে পারি না আমি। তাছাড়া এমন আবরু-হীন ঘরে...

তোমার কোনও ভয় নেই। শোওয়ার আগেই বাতির শিখা কমিয়ে দিয়ো। চাঁদের আলো থাকবে। এখন শুক্লপক্ষ। সারা রাতই চাঁদ থাকবে, মাঝে মাঝে মেঘে ঢাকা পড়লেও। সুন্দর সব স্বপ্ন দেখো তুমি আজ ঘুমের মধ্যে। কাল সকালে তোমাকে একটি ফুল-ফোটা গাছের নিচে নিয়ে যাব। গাছটি অস্ট্রেলিয়ান। সাদা সাদা ফুল ধরে। মূল ভূখণ্ডে ফুল ধরে মার্চ মাসে আর শেষ হয় এপ্রিলে। অথচ এখানে, দ্যাখো ডিসেম্বরে ফোটে।

কী নাম?

গ্লিনিসিডিয়া সুপার্বা।

বলেই, বললেন, তুমি কখনও পালামৌর বেতলাতে গেছ? যেখানে টাইগার প্রজেক্ট হয়েছে?

না।

বেতলার মূল বন-বাংলোর হাতাতে, বাংলোর আর বাওয়ার্চিখানার মধ্যে এই গাছ আছে একটি। গাছটি তো দেখে সকলেই, ফুলও দেখে, কিন্তু চিনে রাখে ক-জন বলো? কখনও গেলে গাছটিকে দেখে এসো।

বলেই, একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আর এদিকে এই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে যদি এ জীবনে আবারও কখনও আসো তবে এই আহুক বোস-এর খোঁজ কোরো "দ্যা হর্নেটস নেস্ট"-এ এসে। বেতলার গাছটা থাকবে অনেকই দিন তবে আমি যে থাকবই তা কে বলতে পারে! গাছ, পাহাড়, নদী, সুমদ্র, নালা, কুমির, কচ্ছপ সকলেই মানুষের চেয়ে অনেকই বেশি আয়ু নিয়ে এসেছে এই পৃথিবীতে। অথচ পরম বুদ্ধিমান মানুষ এই কথাটাই সবসময়েই কেমন ভুলে থাকে। বাঁচো, বাঁচো, বাঁচো রংকিনী। দারুণভাবে বাঁচো।

তাহলে এবারে তুমি দরজাটা বন্ধ করে নাও। বাথরুমের বাতিটা জ্বলে সারারাত। সাপখোপ আছে তো। ওটা নিভিয়ো না। তবে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ো। শোবার ঘরের বাতিটা না নেভালে

চাঁদ আর সমুদ্রকে উপভোগই করতে পারবে না। বিছানাতে শুয়ে শুয়েই দেখবে সমুদ্র তোমার দিকে অপলকে চেয়ে আছে আর চেয়ে আছে চাঁদ। চানঘরে তোয়ালে-সাবান সব আছে। গুডনাইট।

গুডনাইট। বলেই, রংকিনী বলল, দরজা বন্ধ করে দিলে রাতে আপনার যদি বাথরুমে যেতে হয়...

কোনও চিন্তা নেই। এত বড়ো দ্বীপে সে সব কোনও ব্যাপারই নয়। আমি তো জংলিই।

আমাকে পাহারা দেবেন কিন্তু।

নিশ্চয়ই। কিন্তু আমাকে কে পাহারা দেবে?

মানে?

আমার লোভকে?

লোভ? কিসের লোভ?

নাঃ কিছু না। তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোও। সব কথার পিঠে কথা বলতে নেই। সব প্রশ্নের উত্তরও চাইতে নেই। উত্তর হয় না সব প্রশ্নের। তুমি সত্যিই একটা ছোট্ট মিষ্টি মেয়ে।

আর আপনি একটি...

মুখে কিছুই বলল না রংকিনী।

মনে মনে বলল অনেক কথা। তবে সেগুলোর একটিও নিন্দাবাচক নয়।

নতুন জায়গা। তারপর বড়ো বড়ো খোলা জানালা। বারান্দাতে শুয়ে একজন সদ্য পরিচিত, সানট্যানড, অভিজ্ঞ, শক্ত-সমর্থ শরীরের পুরুষ মানুষ। যতই 'বুড়ো বুড়ো' করুন নিজেকে, বুড়ো যে মানুষটি আদৌ নন তা না বোঝার মতো বোকা রংকিনী নয়। ইংরেজি প্রবাদ বলে After forty–Naughty।

গত কালই চুমকি বলছিল, আহুক বোস অন্য ধরনের পুরুষ।

কি রকম?

রংকিনী জিজ্ঞেস করেছিল।

পুরুষ যতই বুড়ো হয় তত বেশি ছুঁকছুঁক হয়। যত বুনো ততই বিপজ্জনক। যারা স্ত্রৈণ থাকে যৌবনে, তারাই ঝৈন হয় প্রৌঢ়ত্বে।

ঝৈন কি?

রংকিনী জিগ্গেস করেছিল।

স্ত্রীতে যে আসক্ত সে যদি স্ত্রৈণ হয়, তবে ঝি-তে আসক্ত যে, সে ঝৈন হবে না কেন?

এবারে একটা বাংলা ব্যাকরণের বই লেখ তুই।

রংকিনী বলেছিল।

অস্বস্তি তো হয়ই। কিন্তু মানুষটিকে ইতিমধ্যেই খুবই ভালো লেগে গেছে রংকিনীর। এমন রোম্যান্টিকতা কোনও-বয়সি পুরুষেরই মধ্যে দেখেতোনিই, কখনও দেখবে বলেও ভাবেনি। তবু, উনি জাতে তো পুরুষ! বিশ্বাস কি?

চাঁদভাসি সমুদ্র দেখেছে রাতে সমুদ্রমুখি জানালার কাছে একা দাঁড়িয়ে। এরপর যখন আতরের তীব্র, বিজাতীয় এবং অনভ্যস্ত সুগন্ধে আমোদিত বিছানাটি ভরে গেছে নরম চাঁদের আলোতে তখন বিছানার উপরে জোড়াসনে বসে দুচোখ ভরে সমুদ্র দেখেছে। পল্যুশান যে কি? তা এখানের আকাশ বা বাতাস জানেই না। নির্মল, পবিত্র পরিবেশ, প্রতিবেশ। নানা শব্দ উঠেছে ঘন বনের গভীর থেকে রাতের বিভিন্ন প্রহরে। পাখি, পোকা, সরীসৃপের গা-ছমছম করা আওয়াজ। বর্ষাস্নাত হাওয়াবিহীন গভীর রাতের বন থেকে এক কথাতে অপ্রকাশিতব্য এক মিষ্টি-তিক্ত-কটু-কষায় গন্ধ

উঠেছে। যদিও এখন বর্ষাকল নয়, চুমকি এবং আহুক-এর কাছে শুনেছে, বর্ষা এখানের নিত্যসঙ্গী। ক্যালেন্ডারের তোয়াক্কা না করেই সে আসে যখন তখন তার খেয়াল-খুশি মতো।

কেন যে এই সাংঘাতিক নামের দ্বীপে রয়ে গেল রংকিনী কে জানে! খাটে বসে ভাবছিল ও। কি লিখে রেখেছেন তার নিয়তি তার জন্যে এই সমুদ্রমেখলা দ্বীপে? এখন সেই প্যাডক গাছের ব্রহ্মদৈত্য আর গর্জন গাছের শাকচুন্নি কী করছে, কে জানে। সেই অস্ট্রেলিয়ান ফুলের গাছটিতে কি এই রাতে নিভৃতে এখন ফুল ফুটছে? ফুল ঝরছে? সাদা সাদা? সুপার্বা গ্লিনিসিডিয়াতে?

কাল সকালে আহুক বোস এর সঙ্গে দ্বীপ পরিক্রমাতে যাবে এই ভাবনাই তাকে এক চাপা উত্তেজনাতে উত্তেজিত করে রেখেছে। কিন্তু ভীরাপ্পান যদি কালও না আসে? অন্তর্বাস কাল কাচতেই হবে। কোথায় শুকোতে দেবে ব্রা আর প্যান্টি? কী যে করে রংকিনী! নানা চিন্তা করতে করতে কত রাত অবধি জেগেও ছিল ও, জানে না। যেই মনে করেছে এমন সমুদ্র-মেখলা-পরা একটি আদিম অরণ্যসঙ্কুল ছোটো দ্বীপে সে একা এক অচেনা পুরুষের সঙ্গে রাত কাটাচ্ছে, ওর নিজেকে বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে। এ কি স্বপ্ন না দুঃস্বপ্ন? কী করে পারল ও এমন অঘটন ঘটাতে? সমাজ জানলে কী বলবে? ছিঃ! ছিঃ! সমাজ কি বিশ্বাস করবে যে...

আহুক বলছিলেন, এই দ্বীপে ইগুয়ানো আছে অনেক। কালকে দুটি শিকার করে খাওয়াবেন। কী দিয়ে শিকার করবেন তা কে জানে একটা ছবি দেখেছিল রংকিনী বহুদিন আগে এলিজাবেথ টেইলর আর রিচার্ড বার্টনের। ছবিটির নাম ছিল "দ্যা নাইট অফ দ্যা ইগুয়ানো"। আরও একটি ছবি দেখেছিল ওঁদেরই। তার নাম ছিল 'দ্যা স্যান্ডপাইপার্স'। এখানে নাকি অনেক স্যান্ডপাইপার্স পাখিও আছে। সমুদ্রতটেই সে পাখিরা থাকে। কার্লু। সি-ইগল। সেদিন বে-আইল্যান্ড হোটেলের বারান্দার মতো ড্রয়িংরুমে বসে যে বড়ো পাখি দুটোকে দেখেছিল ওরা সেগুলোর নাম না কি "হোয়াইট বেলিড সি-ইগল"? সত্যি! মানুষটা অনেকই জানেন। কিন্তু কেবলই বলেন যে আমি তো ঊ্যনিভার্সিটিতে যাইনি। কোনও ডিগ্রি পাইনি। আমি তো সর্বার্থেই অশিক্ষিত।

উনি যদি অশিক্ষিত হন তবে শিক্ষিত কাকে বলবে ভেবে পায় না ও। রংকিনীর বাবা বলতেন "THE PURPOSE OF A UNIVERSITY IS TO BRING THE HORSE NEAR THE WATER AND TO MAKE IT THIRSTY." এই তৃষা কারও কারও হয়তো বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে না গেলেও থাকে। অধিকাংশরই আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে পচে গেলেও সে তৃষা জন্মায় না।

৭

এই ভাবনাটি আগে কখনওই মনে আসেনি আহুক বোস-এর। এ এক বিধুর বিরহের বোধ। আসছে কিছুদিন হল, ফিরে ফিরেই।

মানুষটি তাঁর নামেরই মতো। অসাধারণ নন। তবে অবশ্যই অন্যরকম। অন্যরকম অবশ্যই। তা নইলে সমুদ্রঘেরা এই ছোট্ট দ্বীপে ছ বছর একা আছেন কী করে!

"দ্যা হর্নেস্ট নেস্ট" আইল্যান্ডের পুবের আকাশে আর সমুদ্রে এখন আলোর আভাস ফুটছে। কোনওদিন চাঁদকে সাক্ষী রেখেই পুবালি বাতাস পাখিদের জাগতে জাগাতে দ্বীপে আসে, বড়ো ভালোবেসে আসে, কোনওদিন বা সাক্ষীহীন। এই সুন্দর সুমদ্রমেখলা-ঘেরা দ্বীপ এবং এই নিতুই-নব সমুদ্রকে, প্রাচীন, আদিম সব প্যাডক গাছেদের ঘনসন্নিবিষ্ট বনের গভীর রহস্য, প্যারাকিটদের চাবুকের মতো ডাকে যখন ফুটন্ত আলোতে দ্রবীভূত না হয়ে আরও ঘনীভূত হয়, তখন আহুক নিজের আস্তানা ছেড়ে দ্বীপের শেষ প্রান্ত অবধি হেঁটে গিয়ে পুবে চেয়ে সূর্যকে স্বাগত জানান।

না, না সূর্যপ্রণাম-ট্রণাম করেন না তিনি। কোনওদিনও করেননি। প্রণম্য কোনও কিছুর সংস্পর্শেও আসেননি এখনও। না কোনও মানুষ, না কোনও দেব-দেবতা। তবে, তাঁর হৃদয়ে যে ভুবনেশ্বর এবং হৃদয়েশ্বর বাস করেন তাঁর কাছে সদাই মাথা নোয়ান, মনে মনে।

কোরান, সব ইসলাম ধর্মবলম্বীকে শিখিয়েছে যে, আল্লার কাছে ছাড়া আর অন্য কারো কাছেই মাথা নোয়াবে না কখনও। আহুক তাঁর নিজস্ব অদেখা কিন্তু সদানুভূত ঈশ্বর, বা হৃদয়েশ্বর বা ভুবনেশ্বর ছাড়া এজীবন কারো কাছেই মাথা নোয়াননি। আশা রাখেন তিনি যে, যতদিন প্রাণ আছে, নোয়াবেন না।

সেলুলার জেল শুধু আন্দামানেই নেই, বন্দিরা শুধু সেখানেই অত্যাচারিত হননি নির্মমভাবে, সেই জেল আছে প্রত্যেক মানুষেরই বুকের মধ্যেও। সেই জেলে সে নিজেই বন্দি, নিজেই জেলার, নিজেই ফাঁসির আসামি। এবং ঘাতক।

বিরহী মন, বিরহী দ্বীপ, বিরহী সমুদ্র বুকের মধ্যে কেন জানেন না, ভোরের পুবালি বাতাসের মতো মুঠো মুঠো দুঃখ বয়ে আনে। অথচ এ দুঃখ কোনও মানুষকেই ক্লিষ্ট করে না, বরং স্নিগ্ধ করে। এ দুঃখর শেষ একদিন নিশ্চয়ই হয় সব মানুষেরই জীবনে। শেষ হওয়ারই কথা। কারণ, এ অশেষ নয় বলে।

একটা সময়ে, সপ্তাহে অন্তত একবার নিজে গাড়ি চালিয়ে কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগরে যেতে হত আহুক-এর। ষাটের দশকে। "বিরহী" নামের একটি জনপদকে পেরিয়ে গেছে সে পথ। উষালগ্নে যাবার সময়েও সেই জনপদ ঘুমিয়ে থাকত, অনেক রাতে যখন ফিরতেন তখনও সে জনপদ ঘুমিয়ে থাকত। আশ্চর্য সুন্দর একটি বাঁক ছিল সেই পথটিতে বিরহীর কাছে। সেই বাঁকটি যেন বিরহী নামটিকে সার্থকতা দিত। যেখানে বাঁক নেই সেখানে তো বিরহ থাকে না!

আজকের ন্যাশনাল হাইওয়েতে সেই বাঁক নিশ্চয়ই নেই। নেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝুঁকে-পড়া মহীরুহ—সরু, আঁকাবাঁকা পথের দুপাশে। নেই সেই নির্জনতা।

আহুক বোস ভাবেন যে, এই নীল সমুদ্রের মধ্যে এই লাল-মাটি সবুজ-বনের দ্বীপ, সেই দ্বীপে এমনই সুন্দর সকাল প্রতিদিনই ফিরে ফিরে আসবে, যদি না মানুষের লোভ আর অহং আর হঠকারিতা, একে অন্য অনেক সুন্দর নির্জন জায়গারই মতো, ধ্বংস করে দেয়।

প্রার্থনা করেন, সবই থাকবে। এই প্যাডক গাছের বন, চিড়িয়া টাপু, ওয়ান্ডারুর থেকে শুরু হওয়া সুন্দরী ম্যাংগ্রোভ বন, জলপথের দুধারের পাহাড়ময় দ্বীপের গায়ে গায়ে বিহারের চিলবিল বা ওড়িশার গেন্ডুলি গাছেদের মতন সাদা নরম-কাঠের ধবধবে উরুর দীর্ঘাঙ্গী সব গাছে। তাদের নিম্নাঙ্গ, উর্ধ্বাঙ্গের চেয়ে লম্বা বেশি। নানা রঙা সবুজের সমারোহের মধ্যে তাদের গায়ের সাদা, ভারি এক বৈচিত্র্য আনে। জলি বয় দ্বীপের নীল মেখলা প্রবালমালা, সবই থাকবে। স্কিন্ক দ্বীপপুঞ্জের পাঁচ বোনেরা হাত ধরাধরি করে সমুদ্রের মধ্যে নীল মেখলা মেলে খেলা খেলবেই প্রতিদিনই, যখন ভাটা পড়বে। রঙিন মাছ খেলা-করা আর রঙিন প্রবাল-ঘেরা স্বচ্ছ অগভীর প্রায় নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে পায়ে হেঁটে সমুদ্র পেরিয়ে এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে তখনও শিহরিত নববিবাহিত মানুষ-মানুষী হাতে হাত রেখে হেঁটে যাবে। থাকবে, সমুদ্রের গন্ধ, সাদা-পেটের ইগল-দম্পতির চকিত তীক্ষ্ণ ডাক, দূরের মোগাপড দ্বীপে মেগাপড পাখিদের স্বপ্নও থাকবে। থাকবেন না শুধু আহুক নিজে।

সাম্প্রতিক অতীত থেকে মাঝে মাঝেই এই সুন্দরকে ছেড়ে যেতে হবে বলে বড়ো বিষণ্ণ বোধ করেন আহুক। এ নার্সিসিজম নয়। নিজেকে কোনওদিনই তেমন ভালোবাসেননি তিনি। আজও বাসেন না। হয়তো বাসতেন, যদি তাঁকে কেউ তেমন করে ভালোবাসত। একমাত্র ভালোবাসাই অন্য ভালোবাসার জন্ম দিতে পারে। আনন্দই, অন্য আনন্দের।

এই প্রকৃতিকে আহুক বোস অবশ্যই ভালোবাসেন। একমাত্র প্রকৃতিই এই আদিম এবং

চিরকালীন সুন্দরী, তাঁর ভালোবাসাকে দশগুণ করে ফিরিয়ে দিয়েছে। সেই ভালোবাসা সত্যি না হলে একা এই সমুদ্রমেখলা দ্বীপে তিনি থাকতে পারতেন না ছ-টি বছর।

সুখের সঙ্গে, আনন্দর সঙ্গে, ভোগ আর আরামকে নির্বিবাদে গুলিয়ে ফেলেছে আজকের এই "উন্নত" মানুষেরা। সর্বজ্ঞ হয়েছে তারা। কোমরে মোবাইল-ফোন ঝোলানো, হাতে কম্পিউটার - ঘড়ি পরা, বস্তুবাদী আর বৈজ্ঞানিক, "উদ্ভাবনের" গর্বে মদমত্ত, আধুনিক, উদ্ধত মানুষ তার কল্পিত কোনও অস্তিত্বহীন ধ্রুবতারার দিকে দুর্বার বেগে ছুটে চলেছে, পতঙ্গ যেমন আলোর দিকে ধেয়ে যায় চিরদিন মরারই জন্যে। মহাকাশের চিরদিনের নিশ্চিত নিরাপদ কোণ ছেড়ে কোনও গ্রহ বা তারা যেমন কক্ষচ্যুত হয়ে জ্বলে গিয়ে উল্কাপিণ্ডে পরিণত হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, তেমনই এই দুর্বিনীত মানুষেরাও নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

শেষ, সবকিছুরই আছে। ক্ষয় সবকিছুরই হয়। কিন্তু একজনের, একগ্রহের ক্ষয়-ক্ষতি-বিনাশ যদি অন্য জনের মনে, অন্য গ্রহের মাটিতে ফুলই না ফোটাতে পারেন, যদি নতুন কোনও পাখিই না ডাকল সেখানে, যদি ভয়নাশই না হল, তবে সেই ক্ষয় বা ক্ষতি তো বৃথাই। একের ভয় যদি অন্যের অভয় হয়েই না আসে, তবে তো সেই ভয় ভীষণা রাক্ষসীই!

এত সব এলোমেলা ভাবনা মনে সত্যিই আসে আজকাল আহুকের। কিন্তু এসব কথা বলেন কাকে? আর বললেই বা শুনবেটা কে? এই ভাবনাগুলো সমুদ্রপারের টার্ন আর স্যান্ডপাইপারদের মতন তাঁর মস্তিষ্কের ভিতরে ঘূর্ণি নাচন নাচতে নাচতে, সর্বনাশ, চকিত, সংক্ষিপ্ত ডাকে তাঁর মাথার মধ্যে দিন ফোটোতে ফোটোতে যখন সামুদ্রিক দিগন্তে বা ঘন সবুজ আদিম রেইন-ফরেস্টের অটল বাধার দিকে উড়ে যায়, নয়তো ভেঙে যাওয়া ঢেউয়ের মতো মনের বিবাগি বেলাভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে, তখন নিচু হয়ে বসে সেই সব বিন্যস্ত ভাবনার টুকরো-টাকরা কুড়িয়ে নিতে বড়োই অনীহা আসে। যা যায়, তা যায়ই, যা গেছে তা গেছেই। তাঁর অনেক ঠগি প্রেমিকাদের মতো। যারা, তাঁর সঙ্গে প্রেম-প্রেম খেলা খেলেছে, তাঁকে কেউই বোঝেনি। কেই বা কাকে বোঝে?

নিজের মনে আজকে আর কোনও সংশয় বা দ্বিধা নেই। নির্জনতা ও একাকিত্ব তাঁকে অনেককিছু ফিরিয়েও দিয়েছে, যা-কিছুই তিনি হারিয়ে ছিলেন। ওয়াল্ট হুইটম্যান, হেনরি ডেভিড থোরো, ন্যুট হামস্যুন, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, সকলের কাছ থেকেই তিনি নির্জনতার আর প্রকৃত আনন্দের পাঠ নিয়েছেন। সুখের আর আলসেমির পাঠ নিয়েছেন বার্ট্রান্ড রাসেল-এর কাছ থেকে।

বেশ আছেন। সুখে আছেন। কাজ বলতে যা, তা অতি সামান্যই। জীবনে আহুক অনেকই দিন, অনেকই কাজ করেছেন। কাজকে ভয় পাননি কখনওই। এখন বাণপ্রস্থের সময়। সমুদ্রের সঙ্গে কথা বলে, হাওয়ার সঙ্গে কথা বলে, গাছের সঙ্গে কথা বলে, মাছের সঙ্গে কথা বলে এবং বাচাল মানুষদের সঙ্গে কথা না-বলে দিন বেশ কেটে যায়।

দুঃখ শুধু একটিই! এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে একদিন। এবং সেদিনের খুব বেশি দেরিও নেই। সবই আছে, থাকবে। তাঁর কাঠের বাংলোয় তার শোওয়ার কাঠের মাচাখানি, তাঁর জুতো, চটি, তাঁর স্যুইম সুট, টোকা, তাঁর কলম, প্যাড, চশমা। শুধু তিনিই থাকবেন না। কত জনকেই তো বিদায় দিলেন আজ অবধি। বলে এলেন, যদি পরজন্ম থাকে তবে দেখা হবে। যদি স্বর্গ থাকে, তবেও।

যদি।

যদি নাই থাকে, নাই বা থাকল। আছে ভাবতে ক্ষতি কি?

জীবনের পরে আর কিছু নেই এই কথাকে নিশ্চিত করে জানলে, এতে বিশ্বাস করলে, কোনও কিছু থেকেই নিজেকে নিবৃত্ত করা ভারি মুশকিল হয়ে ওঠে। তাই বোধহয়, আহুক ভাবেন, "আছে" ভাবাই ভালো।

আছে। আছে। আছে। সবই আছে।

ঝিনুকের বুকের ভিতরে মুক্তোর মতন, প্রথম সঙ্গমের স্মৃতির মতন, তাঁর প্রথমা স্ত্রী টিটিঙ্গির সারল্য ও সততার মতন, তাঁর দ্বিতীয়া নারী, ঠগি চিচিঙ্গার শঠতার মতন, তার কল্পনার প্রেমিকার ফুটি-না-ফুটি প্রেমের মতন, স্বপ্নে-দেখা তার আগুন-পারা নগ্নতার মতন স্পৃশ্য বা দৃশ্যমান না হয়েও সবই আছে।

আছে, প্যাডক-এর ছায়াতে, বালুতটে, স্থলে,
আছে মৎস্যগন্ধী জলে, মাছে,
আছে, আছে, আছে
সবই আছে।

৮

ঘুমটা হঠাৎই ভেঙে গেল পরিচিত একঝাঁক পাখির তীব্র চাবুকের মতো ডাকে। তারা সারা বনে পুলক ভরে কোনও বিশেষ খবর যেন জানান দিতে দিতে তীরের মতো উড়ে গেল সেই বন-বাংলোর উপর দিয়ে।

কী খবর? কলঙ্কিনী রংকিনীর খবরই কি?

কী পাখি?

তা প্রথমে মনে পড়ল না চট করে। তারপরই মনে এল চকিতে, টিয়া! টিয়া! টিয়া! প্যারাকিট!

হয়তো ও উঠে বসে হাই তুলেছিল বা আড়মোড়া ভেঙেছিল। আহুক জানতে পেরে গেছিলেন যে রংকিনীর ঘুম ভেঙেছে। বারান্দা থেকেই গলা তুলে বললেন, গুড মর্নিং ইয়াং লেডি। শ্যাল আই ব্রিং ইয়োর টি দেয়ার অর উইল ড্যু কাম টু দ্যা ভারান্ডা?

রংকিনী বলল, ভেরি গুড মর্নিং ইনডিড।

মনে মনে বলল, এ রাতটা তো কাটল নির্বিঘ্নে।

মুখে বলল, আমিই আসছি বাইরে।

চা ভিজিয়ে দিলাম কিন্তু।

আমাকে কি কিছুই করতে দেবেন না? তারপর বাথরুমে গিয়ে খুলে-রাখা ব্রা-টা পরতে পরতে না-বলে, বলল, একটা আয়নাও নেই ছাই! তারপর চানঘরের বাতিটার সলতে নামিয়ে দিল।

নিজেই তো বললে কাল যে ওমলেট ভাজা আর চা করা ছাড়া আর কিছুই জানো না করতে। তা ব্রেকফাস্টে ওমেলটটা না হয় ভেজো। চা-টা আমিই করে দিচ্ছি। তবে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। অনেক দূরে যেতে হবে তো। উঁচু-নিচু পাকদণ্ডি। পথ, পাহাড়ে, সমুদ্রতটে। তাড়াতাড়ি করে কিছু খেয়ে নিয়েই চলো বেরিয়ে পড়ি।

আর চান?

চান তো সমুদ্রে।

কী পরে?

কিছু না-পরে। কোনও চিন্তা নেই তোমার। আজ আমি তোমাকে তেল মাখিয়ে সাবান মাখিয়ে চান করিয়ে দেব। এমন সোহাগে তোমার মা-ও তোমাকে কোনওদিন চান করাননি।

হুঁ। এটাই বাকি আছে।

মুখে বলল বটে কথাকটি রংকিনী কিন্তু তার শরীরে কথাকটি রোমাঞ্চ জাগাল।

মানুষটি সত্যিই জংলি। কী যেন বলেন আর কী যে বলেন না তার ঠিক নেই।

বলতে বলতে, পায়ে জুতো গলিয়ে বাইরে এল। বাথরুম স্লিপারও তো আনেনি সঙ্গে। শোবার সময়ে দু-বিনুনি করে শুয়েছিল।

আহুক বললেন, বাঃ। কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে। তুমি সত্যিই ছোট্ট মেয়ে এবং ভারি সুন্দর মেয়ে। এই দু-বিনুনিতে তা আরও স্পষ্ট হল।

তারপর বললেন, তোমার ক-চামচ চিনি আর কতটুকু দুধ? তুমি পাতলা লিকার পছন্দ করো? না, কড়া?

আপনি আপনার পছন্দসই করে বানিয়ে নিন তারপরে আমি আমারটা বানিয়ে নেব।

তা বললে হবে কেন ইয়াং লেডি। তুমি যে আমার অতিথি। তার উপরে আমার মালকিন-এর বান্ধবী। খাতির-যত্ন ঠিকমতো না হলে যে আমার চাকরিটাই যাবে।

আপনাকে দেখে তো মনে হয় না পৃথিবীতে কারো চাকরিরই আপনি তোয়াক্কা করেন।

অন্যের চাকরির কথা জানি না। তোমার চাকরির তোয়াক্কা অবশ্যই করি। এমন চাকরি গেলে আর কি পাব এ জীবনে আর কোথাওই।

বলেই বললেন, একী! শুধু শুধু চা খাচ্ছ কেন? নারকোল কুচি দিয়ে দু মুঠো মুড়ি দিয়ে খাও। এই যে!

মুড়ি। ও-মা আপনি মুড়ি খান? মুড়ি তো ছোটোলোকেরা খায়।

জানি। আমি তো ছোটোলোক ভারতীয়। আর তোমরা সব বড়োলোক সাহেব-মেমসাহেব। তোমরা খাও "কেলগ"-এর সিরিয়ালস। দশ কেজি মুড়ির দাম দিয়ে পাঁচশো গ্রাম সিরিয়ালস। চিঁড়ের বদলে প্যাকেটের কর্নফ্লেকস। মাঝে মাঝে আমরা সত্যিই সন্দেহ হয় ভারতবর্ষ পঞ্চাশ বছর হল স্বাধীন হয়েছে! তোমরা পাটিসাপটা খাও না, ভীষণ MESSY বলে। কেক খাও। কুচো নিমকি বা কড়াইশুঁটি বা ফুলকপির শিঙাড়া খাও না চিকেন বা মাটন প্যাটিজ বা হ্যাম-বেকন খাও। প্রোটিন-এর জন্যে তোমরা হা-ভাতে হাড়-জিরজিরে রোগা-হাগা গোরু খাও, তোমরা বাবাকে বলো "ড্যাড", মাকে বলে "মাম", "নমস্কার" না বলে বলো, হাই! বাংলা ভাষা তোমাদের কাছে হিব্রু বা ল্যাটিনের চেয়েও কঠিন। তোমরাই নব্য আধুনিক উচ্চশিক্ষিত ভারতীয়। তোমরা হিংলিশে হেক্সপার্ট কিন্তু ইংরেজিটা শিখলে না।

তারপরেই বললেন, পৃথিবীতে এখন কোন রোগটি সবচেয়ে ভয়াবহ বলো তে?

হঠাৎ এই প্রশ্ন?

আহা বলোই না!

আমার বুদ্ধি এখনও ঘুমোচ্ছে। পেটে এক কাপ চাও পড়েনি যে!

তবু বলো।

এইডস?

উহুঁ!

থ্যালাসেমিয়া?

উহুঁ!

তবে? কি?

আমেরিকার প্রভাব। সারা পৃথিবীটাকে ওই একটা দেশই শেষ করে দিল। ধনে মারল, প্রাণে মারল, সংস্কৃতিতে মারল, চরিত্রে মারল, স্বভাবে মারল, ভাষাতেও মারল।

যাকগে এমন সুন্দর সকাল বেলাটা আমেরিকাকে উৎসর্গ না করলেও চলবে। অন্য কথা বলুন।

ঠিক আছে। চা খেয়েই একটা গান শোনাতে হবে। তোমার সম্বন্ধে চুমকি আমাকে সবই বলে গেছে।

কখন?

যখন ও দ্বীপ ইন্‌স্পেকশনে গেছিল আমার সঙ্গে। তুমি তো দুপুরের খাওয়ার পরে ইজিচেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলে।

সত্যি। জেগে উঠে দারুণ ভয় লেগেছিল। দ্বীপে আমি একা।

তারপর বলল, চুমকি কী বলেছে তা আমি জানি না, তবে এখন আমার মোটেই গান গাইতে ইচ্ছে করছে না।

রাতে ভালো ঘুম হয়েছিল তো?

পাহারাদার তো খারাপ ছিল না। ভালো ঘুম না হওয়ার তো কোনওই কারণ নেই।

আর পাহারাদারের পাহারাদার? সে কিন্তু আদৌ ভালো নেই। কাল সারা রাত আমার ঘুম হয়নি।

কেন?

এমনিই।

এমনিই আবার কী কথা?

এমনিই। আর কথা নয়। নাও চা-টা খাও। তারপর আধঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে চলো বেরিয়ে পড়ি।

চা-এর চুমুক দিতে দিতে রংকিনীর মনে পড়ল যে চিড়িয়া টাপুর আদিম রেইন ফরেস্টস দেখে গা-ছমছম করাতে চুমকি বলেছিল, "যাই বলিস আর তাই বলিস, ভয় না থাকলে রহস্যও থাকে না। এখানে মাংসাশী শ্বাপদ নেই, তাই ভয়ও নেই।"

ভয় না থাকলে যে রহস্যও থাকে না সে কথা কাল রাতে খুব ভালো করেই বুঝেছে রংকিনী। মাংসাশী শ্বাপদ যে সবসময় চার পেয়েই হবে এমন কোনও মানে তো নেই। দু'পেয়েও হতে পারে!

ভাবছিল, রংকিনী।

৯

কোথায় নিয়ে চললেন আমাকে? বলি দেবেন না কি? মন্দির-টন্দির আছে উপরে?

এখানে সব জায়গাতেই মন্দির, সব জায়গাতেই মসজিদ। শুধু দেখার চোখ থাকা চাই।

ভারি উঁচু কিন্তু যাই বলুন আর তাই বলুন।

তোমার জুতোটার জন্যে আরও বেশি কষ্ট হচ্ছে। ভীরাপ্পান যদি আজ আসে তো তোমার জন্যে একজোড়া জুতো আনিয়ে নেব পোর্ট ব্লেয়ার থেকে কালকেই ভোরে।

যদি আসে মানে?

মানে, যদি আসে।

নাও আসতে পারে নাকি?

আসার কথা তো ছিল গতকালই। কথার খেলাপ তো করে না ও। নিশ্চয়ই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এই সময়ে আন্দামান আর্কিপেলোগোতে একটা ভাইরাল ফিভার এসেছে। একবার পটকালে সাতদিন মিনিমাম।

কিসের ভাইরাস?

ডাক্তারেরা যে জ্বরই ডায়োগনাইজ করতে পারেন না তারই নাম দেন ভাইরাল ফিভার। "সত্যই সেলুকাস। বিচিত্র এই দেশ।"

ডাক্তারেরা আপনার এই ব্যাখ্যার কথা কি শুনেছেন?

আমার মুখে হয়তো শোনেননি। তবে নিজেরা কি আর জানেন না? যাই বলো আর তাই বলো, আগেকার দিনই ভালো ছিল।

কবেকার দিন?

আরে যখন দেশের তাবৎ মানুষ মরত শুধু একটি মাত্রই রোগে।

কী রোগ তা?

সন্ন্যাস। যে-ই মারা যান না কেন, পরদিন খবরের কাগজে বেরোত "তিনি সন্ন্যাস রোগে মরিয়া গিয়াছেন"।

জীবদ্দশাতেই ডাক্তার, প্যাথলজিস্ট, সার্জেন, ই ই জি, ই সি জি, এক্স-রে, সি টি স্ক্যান, এম আর আই ইত্যাদি ইত্যাদি করে রোগীর আর্থিক অবস্থা সন্ন্যাসীর মতো হওয়ার আগেই সন্ন্যাস রোগ স্বয়ং এসে তাকে উদ্ধার করত। রক্ষিতার বা নিজের চেয়ে পনেরো বছরের ছোটো স্ত্রীর কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে গহরজান বাইজীর রেকর্ড শুনতে শুনতে আদরে-গোবরে মানুষ তার স্বাভাবিক পরিণতিতে পৌঁছতে পারত নিশ্চিন্তে। ডাক্তারদের বিন্দুমাত্র সাহায্য ছাড়াই। বিজ্ঞানের এই দুর্দান্ত অগ্রগতির দিনে ল্যাবরেটরির ইঁদুরের মতো তাকে তিলে তিলে জীবদ্দশাতেই মরতে হতো না।

হেসে উঠল রংকিনী খুব জোরে।

বলল, বলছেন ভালই। কিন্তু আর কত দূর?

এই তো! সামনে একটা বাঁক ঘুরলেই "দ্যা ভিউ-পয়েন্ট"-এ পৌঁছে যাব।

চুমকির মুখে শুনেছি যে জলদস্যুরা নাকি এই পাহাড়-চুড়োতে বসে দূরবীন দিয়ে মাদ্রাজ, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার এবং থাইল্যান্ড থেকে যাতায়াত করা বাণিজ্য জাহাজের উপরে নজর রাখত।

চুমকি জানল কী করে?

ওর ঠাকুমার কাছে গল্প শুনেছিল। দ্বীপটির নাম "দ্যা হর্নেটস নেস্ট" তো এই জন্যেই। এটি ছিল জলদস্যুদের আড্ডা। এর তটভূমিও আশ্চর্য সুন্দর। পাহাড়টার অবস্থান এমনই যে, কোনও দিকের হাওয়াই এসে এতে আছড়ে পড়ে না। তাছাড়া সবচেয়ে বড়ো কথা যে এই দ্বীপে একটি মিষ্টি জলের পুকুর আছে যা কখনও শুকোয় না।

স্বাভাবিক পুকুর?

তা বলতে পারব না। হয়তো জলদস্যুরাই খুঁড়েছিল। কিন্তু তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে দুশো পঁয়ষট্টি দিনই বৃষ্টি হওয়াতে এই পুকুরের জল কখনও শুকোয় না। এই দ্বীপের মধ্যে একটিই অশান্তি ঘটিয়েছি আমি। একটি ডিজেল পাম্প বসিয়েছি। তবে বাংলো থেকে অনেক দূরে। যাতে, বাংলোতে বসে শব্দ না শোনা যায়। পলিথিনের পাইপ-লাইন বসিয়েছি বাংলো অবধি। ওভারহেড ট্যাঙ্কে জল জমে। তুমি তো কাল রাতে সে জলেই চান করলে। তবে আমরা দুজন ওই জলে চান করি না।

কেন?

ভয়ে। যদি যথেষ্ট বৃষ্টি না হওয়াতে জলে টান পড়ে যায়? এই জলই তো খাই আমরা। চমৎকার স্বাদ। তাই না? হজমও খুব ভালো হয়। খাওয়ার জল আনতে ও যেতে আসতে সাত ঘণ্টা লাগবে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে। সে কি কম ঝক্কি।

তারপর বললেন, ভীরাপ্পান আবার কই আর সিঙ্গি মাছ ছেড়েছে ওই পুকুরে। রুই কাতলাও ছেড়েছে কিছু। গরমের সময়ে কই সিঙ্গি ধরে আমার জন্যে। ও শুঁটকির ভক্ত।

আর রুই মাছ ধরেন না?

না। যেদিন চুমকি অথবা তোমার বিয়ে হবে, বরের সঙ্গে হানিমুন করতে আসবে এখানে, সেদিন পাকা লাল মাছ তুলে মাছ ভাজা, মাছের তেল ভাজা, মাছের ঝাল, দই মাছ, রেজালা, কালিয়া, মুড়িঘণ্ট, মাছের মাথা দেওয়া মুগের ডাল এবং মাছের টক রাঁধা হবে। আমিই রাঁধব।

ততদিনে সব মাছ মরে যাবে। তাছাড়া, চুমকির বরের ডেডবডি কি এখানেই পড়ে থাকবে যদি সত্যি সব পদ খাওয়ান আপনি। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।

এলাম কি?

রংকিনী ঘেমে-নেয়ে বলল।

ইয়েস।

কিন্তু তুমি যে সত্যি হাঁফাচ্ছ। বসে পড়ো ঐ পাথরটাতে। দেখেছ! কত বড়ো পাথরের চাঙড়। কত জলদস্যু বসেছে এখানে, কত অপহৃতা মেয়েরা ধর্ষিতা হয়েছে। পাথরটা কিরকম মসৃণ হয়ে গেছে দেখেছে ব্যবহারে ব্যবহারে।

মানে, ধর্ষিতা মেয়েদের পশ্চাতদেশের ঘর্ষণে পাথর ক্ষয়ে গেছে বলছেন? ব্যোপদেবের গল্পই জানতাম শুধু পাথর ক্ষয়ের, এ এক নতুন গল্প শোনালেন আপনি যা হোক! কী পাথর এটা! এই সব দ্বীপে তো পাথর বিশেষ দেখিনি, মানে পোর্ট ব্লেয়ারে, রসস আইল্যান্ডে, ভাইপার আইল্যান্ডে।

আহুক হেসে বললেন, না। এগুলো স্যান্ডস্টোন। বোসো। এবারে দেখো চারদিকে তাকিয়ে সত্যিই তুমি রানী কি না।

পরের ধনে পোদ্দারী করতে চাই না আমি। এমনিতেই খুশি। সত্যি! ভাবা যায় না। পৃথিবীতে এমন জায়গাও আছে!

এমন জায়গা থাকবে না কেন। হয়তো অনেকই আছে কিন্তু সেই টঙে হাজার হাজার ট্যুওরিস্ট হাঁচোর-পাঁচোর করে চড়ে ক্যাঁচর-ম্যাচর করে সব শান্তি নষ্ট করে দেয়। এখানের সবচেয়ে বড়ো সৌন্দর্য এই নির্জনতা। নির্জনতা তোমাকে কখনও খালি হাতে ফেরায় না। কী বনে, কী জীবনে।

রংকিনী চুপ করে রইল। এবং আশ্চর্য! 'দ্যা হর্নেটস নেস্ট'-এর চুড়োতে উঠে ওর পাশে, পাথরটার উপরে বসে, আহুক বোসও যেন সমাধিস্থ হলেন।

রংকিনী আস্তে আস্তে মুখ ঘুরিয়ে চারদিক দেখতে লাগল। ওর চোখ দুটি যেন প্যানোরোমিক লেন্স হয়ে গেল। তটভূমির উপরে কোথাও নারকোল গাছ ঝুঁকে পড়েছে, কোথাও অন্য নাম-না-জানা গাছ। কোথাও জলকে ছাই-রঙা দেখাচ্ছে আর তটভূমিকে গেরুয়া, কোথাও বা তটভূমিকে ছাইরঙা আর জলকে হলদেটে, জলের নিচের প্রবালের জন্যে। এক এক জায়গাতে জলের রং একেকরকম। বনের মধ্যে অনেক জায়গাতেই প্রকাণ্ড বড়ো বড়ো সব গাছ। কতগুলোর কাণ্ডর রং সাদা। প্রত্যেক বড়ো গাছের গায়েই লতা উঠেছে জড়িয়ে-মড়িয়ে। দিনের বেলাতেই ঘনান্ধকার সেই বনের ভিতরে। তার মধ্যে বাঘ থাকার কথা। কিন্তু আশ্চর্য! নেই। বড়ো শান্তি চারিদিকে। চারদিকেই হাজার মাইল সমুদ্র। বাঁয়ে বঙ্গোপসাগর, ডানে আন্দামান উপসাগর। কোথাও এতটুকু কলুষ নেই। না জলে, না হাওয়ায়, না বনে, না তটে। দু নাক ভরে নিশ্বাস নিল রংকিনী। খোলা হাওয়াতে গায়ের ঘাম শুকিয়ে গেছে। ঘর্মাক্ত মুখে ঠান্ডা হাওয়া লাগাতে খুব আরাম লাগছে।

রংকিনী ওই বড়ো গাছগুলোর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে আহুককে জিজ্ঞেস করল, ওগুলো কি গাছ?

ওই গুলোই তো প্যাডক। এখানে বসেই সব গাছ চিনিয়ে দেব এক এক করে তোমাকে। নারকোল গাছ তো খুব বেশি নেই। অথচ চুমকির ঠাকুমা তো নারকোল বন-এর দ্বীপই কিনেছিলেন, যখন কিনেছিলেন।

তা ঠিক। তবে নারকোল থেকে কোপরা করে তা কলকাতা কি মাদ্রাজে পাঠাতে যা খরচ পড়ে তাতে লোকসানই হয়। চুমকি একেবারে অন্য লাইনে চলে গেছে। ব্যবসাটাও বোঝে।

কী? মানে, কোন লাইন?

এখানে আমরা ডায়াস্কোরিয়ার চাষ শুরু করেছি। পাহাড়ের ওই দিকের ঢাল-এ। পরে দেখাব।

ডায়োস্কোরিয়াটা কি জিনিস?

একরকমের মূল।

কী হয় তা দিয়ে?

জন্ম-নিরোধক বড়ি তৈরি হয়। চাইনিজ বেশ্যারা নাকি বহুযুগ ধরে এই মূল খায় যাতে তাদের অনভিপ্রেত গর্ভাধান না হয়।

তাই?

হ্যাঁ। এই 'দ্যা হর্নেটস নেস্ট'-এ ডায়াস্কোরিয়ার গাছ প্রচুর আছে।

তা ওষুধ বানাবেন কারা? চুমকিরাই?

না, না। কলকাতার দেজ মেডিক্যাল, মুম্বই-এর সিপলা, চেন্নাই-এর প্যারি সকলের সঙ্গেই চুমকি এগ্রিমেন্ট করছে। প্রথম শিপমেন্ট কলকাতাতে পৌঁছোবে নিরানব্বই-এর জানুয়ারিতে। সেখানে দেজকে দেওয়া হবে। তারপর ট্রান্সপোর্টে যাবে মুম্বই এবং চেন্নাই।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, আরও একটা দারুণ ব্যবসাতে নেমেছি আমরা। খরচ বলতে কিছুই নেই।

কিসের ব্যবসা?

পাখির বাসার।

অ্যাঁ?

হ্যাঁ। পাখির বাসার। এখানে অনেক রকম পাখি আছে যাদের বাসা চীনেরা আহামরি করে খায়। Edible Bird-nests। কেন? Bird-nest soups খাওনি কখনও? খেয়ে দেখবে।

চিনে রেস্তোরাঁতে?

তাজ বেঙ্গলে চেয়ো, হয়তো পাবে। ওবেরয়তেও পেতে পারো। তবে বে-আইল্যান্ড-র ম্যানেজার বলছিলেন ওবেরয় গ্রান্ড নাকি নতুন থাই রেস্তোরাঁ চালু করছে। কলকাতাতে না পেলেও মুম্বই-দিল্লির বড়ো হোটেলে পাবে অবশ্যই।

থাই খাবার আমার দারুণ লাগে। ব্যাংককে গেলেই খাই। মুম্বই-এর তাজ গ্রুপ-এ THE PRESIDENT হোটেলেও একটা ভালো থাই রেস্তোরাঁ আছে।

তারপর বললেন, চায়নাতে এইসব পাখির বাসার খুব ভালো দাম পাওয়া যায়। ওজনও কম। রপ্তানি করাও সম্ভব খুবই কম খরচে।

বাঃ। দারুণ বুদ্ধি তো চুমকির।

তোমারই তো বন্ধু। বুদ্ধি তো হবেই। জঙ্গল একটুও নষ্ট হল না। আরও অনেক পাখিও এল দ্বীপে।

তারপর বললেন, মিষ্টি জলের জন্যেও এই দ্বীপে গ্রীষ্মকালে পাখির মেলা বসে যায়। আমি ওকে আইডিয়া দিয়েছিলাম এখানে বার্ড-ওয়াচিং-এর ট্যুওরিস্টদের টোপ সঙ্গে দিতে। কিন্তু চুমকির ভীষণই আপত্তি। ও বলে, আমার দুর্দান্ত সাহসী ঠাকুমা ঠাকুরদার সঙ্গে ঝগড়া হলে ওই 'হর্নেটস নেস্ট'-এ এসে "গোসাঘর" বানিয়ে থাকতেন। তাঁর নারায়ণ আসত এখানে, রাঁধুনি, আয়া, তেলমালিশ করার মেয়েটি। ঠাকুমা নাকি বলতেন যে, এটি হয় "ভালোবাসার ঘর" হয়ে থাকবে নয়তো "গোসাঘর"। এই দ্বীপকে নষ্ট করা চলবে না।

চুমকি আরও পয়সা দিয়ে করবেটাই বা কি? খাবে কে ওর পয়সা? দশ জীবনেও তো শেষ করতে পারবে না, যা আছে।

রংকিনী বলল।

পয়সার জন্যে শিল্পপতিরা নতুন নতুন আয়ের পথ খোঁজেন না। "Lack of expansion means decay." সবসময়ে তুমি যদি তোমার সাম্রাজ্য বিস্তৃত করার চেষ্টাতে না থাকো, তবে সে

সাম্রাজ্য সংকুচিত হতে বাধ্য। সংকুচিত হতে হতে একদিন তা আর থাকেই না। বাঙালিরা এই জিনিসটা বোঝে না। কিন্তু চুমকি বোঝে। আ গ্রেট গার্ল। শি ইজ রিমার্কেবল ফর হার এজ। আমি তো বিদেশেও অনেক মহিলা আন্ত্রোপ্রানর দেখেছি। সি রিয়্যালি ইজ গ্রেট।

এই অবধি বলেই, হঠাৎ আহুক চেঁচিয়ে উঠলেন, নোড়ো না। একটুও রংকি। সিট স্টিল।

রংকিনী কিছুই না বুঝে চমকে উঠেই স্থির হয়ে গেল।

কিছু বোঝার আগেই গুড়ুম করে একটা আওয়াজ হল। আর সঙ্গে সঙ্গে এক পালটি খেয়ে পড়ল বিরাট একটা হলদে-সবুজ সাপ। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা গুলি করলেন আহুক। তাঁর কোমরে যে ওটা বেল্‌টে-এর সঙ্গে বাঁধা ছিল তা বুঝতেই পারেনি রংকিনী।

অনেকক্ষণ পরে শান্ত হল সাপটা। তার আগে লণ্ডভণ্ড করলে পুরো জায়গাটাকে, লতা পাতা ঘাস মাটি সবের উপরে যেন ঝড় বয়ে গেল। তখন যেন মনে পড়ল রংকিনীর যে আহুক তাকে চেঁচিয়ে সাবধান করার আগে একটা জোর সড়সড় আওয়াজ শুনেছিল কিন্তু কিসের আওয়াজ তা বুঝতে পারেনি।

বুকে হাত ছুঁইয়ে রংকিনী বলল; বাঃ বাঃ। আমার বুক এখনও ধড়ফড় করছে। কি সাপ ওটা? বিষ ছিল?

বিষ ছিল মানে? শঙ্খচূড়। কামড়ালে ওয়েলার ঘোড়া মরে যায়, বনের বড়ো বাঘ মরে যায়। তারপর বললেন, ভীরাপ্পানটা খুব খুশি হবে।

কেন?

এই সাপটাকে ওর ভীষণই ভয় ছিল।

চেনা সাপ নাকি আপনাদের? ভালো বন্ধু-বান্ধবী নিয়েই থাকেন দেখছি। প্রেমিকা মাছ, বন্ধু সাপ।

হ্যাঁ। তবে সাপটা বন্ধু ছিল না, শত্রু ছিল। ভীরাপ্পান বলে, এই সাপটাও আসলে একটা পেতনি। একটি অপরূপ সুন্দরী কুমারী থাই মেয়ে ধর্ষিতা হয়েছিল নাকি এই দ্বীপে আরাকানি জলদস্যুদের দ্বারা। এই পাথরেরই উপরে। এবং এখানেই সে নাকি মারা যায়। তারই আত্মা এই সাপটি।

এই সাপের তো তাহলে বয়সের গাছ-পাথর নেই। তাছাড়া ভীরাপ্পান তো আরাকানি নয়। বিশুদ্ধ বুল-শিট। গগনভেদী গুল।

হাসতে হাসতে বলল, রংকিনী।

তারপর বলল, সাপটার বয়স কত বছর? তিনশো?

কে বলতে পারে? তার চেয়ে বেশিও হতে পারে। এ গল্প তো ভীরাপ্পান বানায়নি। একজন আন্দামানীকে নিয়ে এসেছিল তিন বছর আগে, পাখির বাসা সব যাতে তার কাছ থেকে চিনে নিতে পারে, সে জন্যে। বুড়ো ছিল ওখানে দিন পনেরো আমাদের উপদেষ্টা হিসেবে। থাকত ভীরাপ্পানের সঙ্গেই আর কষে শুঁটকি খেত। সেই বুড়োই বংশপরম্পরাতে এই কাহিনি শুনেছে। রূপকথার গায়ে বয়সের মালিন্য লাগে না যে!

তাই?

ভীরাপ্পান এলে শুনো তুমি তার কাছেই।

সে আর এসেছে!

আসবে। আসবে। আর না এলেই বা কি?

বেশ লোক যা হোক আপনি।

'ভালো লোক' যে, তেমন দাবি তো করিনি কখনও। করেছি কি?

রংকিনী চুপ করে রইল।

এখন দ্যাখো গাছগুলো। তখন যে জিজ্ঞেস করছিলে।

হ্যাঁ।

আমাদের এই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে সবশুদ্ধ প্রায় দুশো প্রজাতির গাছ আছে। তার মধ্যে চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ রকমের পরিচর্যা করা হয়। তার মধ্যে আবার উনত্রিশ-ত্রিশ রকমের গাছ যা শিল্পে বা বাণিজ্য লাগে। চুমকির এই ছোট্ট "দ্যা হর্নেটস নেস্ট", এর মধ্যেই প্রায় পঞ্চাশ রকম গাছ আছে। অভাবনীয়। তাই না?

হবে। রংকিনী বলল। আমি তো আর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে চাকরি করি না, বটানিস্টও নই। অত তত্ত্ব ও তথ্য দিয়ে আমি কী করব! মোটামুটি ক-টি গাছ চিনিয়ে দিন না আমাকে।

এই মোটামুটি আর ভোটাভুটি সমার্থক। এই দুই শব্দই অর্থহীন। আশ্চর্য! আমরা ভারতীয়রাই এইরকম অপার ঔৎসুক্যহীন। একজন অশিক্ষিত ইংরেজ বা জার্মান পুলিশ বা মিলিটারির নিচুতলার অফিসারেরও তীব্র ঔৎসুক্য দেখেছি তার পরিবেশ ও প্রতিবেশের গাছগাছালি, পাখপাখালি এবং মানুষজনের সম্বন্ধে। অথচ তুমি একজন গড়পড়তা উচ্চশিক্ষিত ভারতীয়কে, (তিনি হয়তো নামী অর্থনীতিবিদ, বা দামি এঞ্জিনিয়র বা প্রগাঢ় পণ্ডিত ইতিহাসের অধ্যাপকও হতে পারেন অথবা অনেক পুরস্কার পাওয়া গুমো-ভরা সাহিত্যিক) জিজ্ঞেস করে দেখো, এটা কি গাছ? সম্ভবত জবাব পাবে, গাছ। এটা কি পাখি? জবাব পাবে, পাখি। ছোটো কোনও নদী দেখিয়ে প্রশ্ন করো (সেই নদী হয়তো তিনি গড়ে দিনে দশবার গাড়িতে বা হেঁটে পারাপার করছেন) কি নাম? জবাব পাবে, নদী। সবাই যে ওরকম তা বলছি না। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, থাকে। নিজভূমে কিন্তু অধিকাংশেই ওরকম। বুঝলে রংকিনী, ডিগ্রি আর শিক্ষা, পেশাগত যোগ্যতা আর সাধারণ জ্ঞান এসবের মধ্যে আমাদের দেশে কোনও সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া অনেক সময়েই কঠিন হয়।

হবে। তবে আপনি বড়ো জ্ঞান দেন। এখন বলুন যা জানতে চেয়েছিলাম।

এখানে চিরহরিৎ গাছ আছে অনেক। আবার পর্ণমোচীও আছে।

পর্ণমোচীটা আবার কি জিনিস? কোনও বিশেষ রকম মোচা? অথবা মুচী?

হায় ঈশ্বর! ডিসিডুয়াস বললে বুঝবে কি মেমসাহেব?

হ্যাঁ।

লজ্জার কথা। বাংলা শব্দটি জানো না, ইংরেজি বললে বোঝো।

তারপর বলুন। নো-জ্ঞান।

যে গাছেরা প্রতি বছরই পাতা খসিয়ে, মানে, মোচন করে আবারও নতুন পাতা গজিয়ে নিয়ে নিজেদের নবীকৃত করে, তাদের বলে পর্ণমোচী। এখানে নারকোল, বা সেগুন গাছ কিন্তু মূল ভূখণ্ড থেকে এনে লাগানো। স্থানীয় নয়। স্থানীয় গাছের ভিতরে চিরহরিৎ প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে আগে যে নাম দুটি করতে হয়, তা প্যাডক আর গুর্জন-এর। ওই দ্যাখো, ওইগুলো প্যাডক।

কত বয়স হবে ওগুলোর?

তা আমার প্রপিতামহর চেয়ে বেশি বই কম তো নয়। আর ওই দ্যাখো, ওইগুলো গুর্জন। এদিকে-ওদিকে ছড়ানো-ছিটানো। তবে আন্দামানে। দ্বীপপুঞ্জে চিরহরিৎ এর চেয়ে পর্ণমোচীদের রবরবাই বেশি।

কী কী পর্ণমোচী গাছ আছে এখানে?

বাদাম। ওই যে, নিচের দিকে, দেখছ? ওই যে পাখিগুলো উড়ে গেল যে গাছগুলোর উপর দিয়ে দল বেঁধে...

ওগুলো কি পাখি?

পুঁটকে পুঁটকে পাখি। কালো পিঠে সাদা বুকের। ছেলেবেলায়, থুড়ি মেয়েবেলায়, আমাদের চন্দননগরের গঙ্গাপাড়ের বাড়ির কম্পাউন্ডের মধ্যে মস্ত বড়ো নিমগাছের চারদিকে এইরকমই পাখির মস্ত মস্ত ঝাঁকেরা গ্রীষ্মের বিকেলে ঘুরে ঘুরে উড়ত আর ডাকত। মা বলতেন, দ্যাখ দ্যাখ চাতক পাখি। ওরা ডাকছে 'ফটিক জল'! 'ফটিক জল!'

বাঃ। আহুক বললেন।

তারপর বললেন যে পাখিগুলোকে দেখলে তাদের নাম ইন্ডিয়ান স্যুইফ্‌টলেট। ঘাস, শ্যাওলা পালক আর থুথু মিশিয়ে এরা তাদের বাসা বানায়। আরও একরকমের এডিবল নেস্টস বানানো পাখি দেখা যায় আন্দামানে তবে 'দ্যা হর্নেটস নেস্ট'-এ সে পাখি নেই। সেই অন্য পাখিরা বাসা বাঁধে উঁচু পাহাড়ের গুহা বা গর্তে। এই হর্নেটস নেস্ট এ যারা আছে তাদের নাম ইন্ডিয়ান স্যুইফ্‌টলেট। অগণ্যই আছে। আকাশে যখন একসঙ্গে ওড়ে বগারি পাখির মতো মনে হয় মেঘখণ্ডই দমকা হাওয়াতে ভেসে যাচ্ছে বুঝি। এরা আবার কিছু নীড় বানায় শুধুই এদের লালা দিয়ে। যেগুলোর কদরই বেশি, খাবার হিসেবে, বিশেষ করে চীনেদের কাছে।

কখন বাসা বানায় এরা?

মার্চ থেকে জুন মাস অবধি। চার মাস থাকে বাসা। যে সব গাছে এরা বাসা বাঁধে, যে যে ফুল-ফল পাতা এরা খেতে ভালোবাসে, সেই সবের দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছি আমরা। যাতে ধীরে ধীরে "দ্যা হর্নেটস নেস্ট"কে আমরা দ্যা "স্যুইফ্‌টলেটস নেস্ট" করে তুলতে পারি একদিন, এই পাখিদের কলোনি এবং অভয়ারণ্য হিসেবে।

স্যুইফ্‌ট নামের পাখির কথা তো জানি। এদের নাম তো বললেন স্যুইফ্‌টলেট।

হ্যাঁ। Star আর Starlet এর মতোই Swift আর Swifft Let। তুমিই তো বললে, এরা পুঁচকে পুঁচকে।

হেসে ফেলল রংকিনী। বলল, বুঝলাম।

তারপর বলল, এটা কি গাছ?

ওটা বাদাম। তার মানে বাদাম ভাজার বাদাম নয়। HARDWOOD। আরও Hardwood আছে। দ্যাখো, সাদা চুগলাস, টঙ্গপিন, লাল ধুপ, সমুদ্র-মওহা। আরও নানারকম হার্ডউড আছে তবে 'হর্নেটস নেস্ট'-এ নেই।

মওহা মানে? মহুয়া।

তাই হবে। এখানে উচ্চারণ বদলে গেছে হয়তো। তবে ওই গাছ আমি নিজে দেখিনি। দেখতে মহুয়ার মতো কি না তাও বলতে পারব না।

আর ওই দ্যাখো, Soft Wood। সাদা ধুপ, বাকোটা, ডিডু। শিমুলের নাম এখানে ডিডু। পপিতা। আর ওই দ্যাখো লম্বাপাত্তি। দারুণ দেখতে না পাতাগুলো? উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে এইরকম গাছ আছে, হাতিরা তাদের পাতা ভালোবেসে খায়।

এখানে ORNAMENTAL WOOD-এর গাছও আছে কিন্তু।

কাঠও আবার ORNAMENTAL হয় নাকি?

হয়। হয়। মেমসাহেব, এখানে সবই হয়।

হয়? না হওয়ান আপনি।

না, না এরা সব এমনি হয়। আমি যা হওয়াই বা হওয়াব সেসব অন্য হওয়া।

বুঝেছি। তা চিনিয়ে দিন ORNAMENTAL WOOD গুলোকে। মানে, গাছগুলোকে।

সবচেয়ে আনন্দের কথা হচ্ছে এই যে, এই দ্বীপটি ছোটো হলে কি হয় এখানে আন্দামানে যতরকম ORNAMENTAL WOOD দেখা যায় তার সবই আছে। এটা একটা দারুণ ব্যাপার, তাই নয়।

বলেই আহুক বললেন, ওই দ্যাখো উত্তরে, তাকাও ভালো করে, আমার আঙুল দ্যাখো। দেখেছ, সুন্দর রুপোলি-ছাইরঙা গাছটি। কাণ্ডের একাংশের রং। এদের নামই SILVER GREY। আমার মাছ-প্রেমিকা টুনা, টুনির মতো এর গায়ের রং। আর ওই পুবের ঢালে দ্যাখো SATIN WOOD। আমার মাছ-প্রেমিকার তলপেটের মতো পেলব, মসৃণ। আর দক্ষিণে দ্যাখো

MARBLE WOOD। আর ওই গাছটার নাম কি বলতে পারো? বলতে গেলে একেবারে তোমার মাথার উপরে যে ছাতা ধরে আছে।

বাঃ রে! আমি কি করে বলব?

এর নাম চুল।

কি? আবারও গুল!

সত্যি বলছি। এটাও ORNAMENTAL গাছ। বিশ্বাস না হলে এর BOTANICAL নাম সুদ্ধু বলে দিতে পারি।

কি?

Sageraca Eliptics।

এই অর্নামেন্টাল গাছগুলো বিক্রি করে তো আপনাদের খুব লাভ হয় তাই না? রংকিনী বলল।

বিক্রি করলে অবশ্যই হত। শুধু এগুলোই বা কেন? প্যাডক, গুর্জন এবং অন্যান্য গাছের কাঠের দামও তো কিছু কম নয়। কলকাতাতে ফিরে যাবার আগে চ্যাথাম আইল্যান্ডে গিয়ে দেখে নিয়ো সরকারি SAWMILL। তবে সেখানে গাছেদের এই সুন্দর নয়নমোহন রূপ তো দেখতে পাবে না। সব উলঙ্গ, ধর্ষিতা তারা সেখানে। চিরে ফালা-ফালা করা। ওই জন্যে আমি এখানে পাঁচ বছর আসা সত্ত্বেও একবারও যাইনি চ্যাথাম আইল্যান্ডে। গাছেদের মর্গ-এ কি যেতে ইচ্ছে করে কারও? যারা প্রকৃতিকে ভালোবাসে?

বিক্রি করেন না আপনারা?

নাঃ।

কেন?

চুমকির ঠাকুমা, দ্যা হর্নেটস নেস্ট-এর ওরিজিনাল মালকিন-এর মানা ছিল! উনি যখন এই দ্বীপ কিনেছিলেন দেড় লাখ টাকাতে, উনিশশো বত্রিশ-এ তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ছাব্বিশ। বড়োলোকের মেয়ে, বড়োলোকের বউ। যেমন বিদূষী, তেমন বিষয়বুদ্ধিসম্পন্না। তখন দেড় লাখ টাকার মূল্যও ছিল অনেক। ইনকাম ট্যাক্স ছিল না তো! মানুষ মনের সুখে ছিল।

ছিল না ইনকাম ট্যাক্স?

ছিল কোথায়? ইংরেজদের ইনকাম ট্যাক্স আইনত প্রথম আসে এদেশে উনিশশো তেত্রিশে।

তাই বুঝি? ইসস। তার আগে যদি জন্মাতাম।

আর উনি মারা গেছেন উনিশশো পঁচানব্বুই-এর কালীপুজোর দিন। অষ্টআশি বছর বয়সে। সধবা।

আহা ভাগ্যবতী মহিলা। সতীলক্ষ্মী।

কেন?

বাঃ দীপাবলির দিনে গেলেন তো ভাগ্যবতী নন! আপনি দেখি কিসসুই জানেন না।

বাবা। এদিকে মেমসাহেব আর ওদিকে দেখি...।

তারপরেই আহুক বললেন, অশ্লেষা, মঘা এসবও মানো নাকি? খনার বচনও? নীলের উপোস করো?

তা করতে হয় বইকী মায়ের জন্য।

আচ্ছা প্যারাডক্স যা হোক তোমরা, এই নব্যযুগের মেয়েরা। ভাবা যায় না। দু-নৌকোয় পা তোমাদের।

তারপর? বলুন।

রংকিনী বলল।

তা চুমকির ঠাকুমা নাকি বলে গেছিলেন যে নিজেদের প্রয়োজনে যেটুকু দরকার সেটুকু ছাড়া

একটা গাছও কাটা চলবে না। লাগানো চলবে, কিন্তু কাটা চলবে না। ফলে দ্বীপটার অবস্থা দেখছ না? সবুজে-সবুজ ফুল-ফলন্ত, জঙ্গলমে-মঙ্গল, শান্তির নীড়। শুধু ডায়াস্কোরিয়ার জন্য যতটুকু জঙ্গল সাফাই করতে হয়েছে ব্যস। "দ্যা হর্নেটস নেস্ট"-এর অবস্থা আমার দাড়িরই মতো।

মানে?

আমারও আয়না নেই, "দ্যা হর্নেটস নেস্ট"-এরও আয়না নেই। নিজের নিজের চেহারা দেখতে পেলে দুজনে হাত ধরাধরি করে ডুবে মরতাম।

দুজনে মানে?

মানে এই জংলি আমি আর এই জংলা-দ্বীপ।

তাই বলুন।

এই ডায়াস্কোরিয়ার কথা তো আগে শুনিনি। আমার এক ডাক্তার বন্ধু আছে তার সঙ্গেও ক'দিন আগেই প্লেনে দেখা, সিঙ্গাপুরে যাচ্ছিল। অনেক গল্প হল। কোন কোন প্ল্যান্ট বা হার্ব থেকে কন্ট্রাসেপশানের জন্যে পিল তৈরি হয় তা বলছিল ও কিন্তু তার মধ্যে ডায়াস্কোরিয়া বলে কিছুর নাম তো যে উল্লেখ সে করল না।

সাম্প্রতিক অতীতে হয়তো আবিষ্কৃত হয়েছে। না হলে কলকাতার দেজ মেডিক্যাল, মুম্বই-এর সিপলা বা চেন্নাই-এর প্যারি-রাই বা নিতে রাজি হবে কেন?

তা নিক। ডায়াস্কোরিয়া বানানটি কি?

DIOSCOREA। উচ্চারণ ডিয়োসকোরিয়াও হতে পারে। ডিকশনারিতে শব্দটা থাকলে উচ্চারণের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যেত।

ঠিক আছে। কলকাতা ফিরে ওকে একটা ফ্যাক্স পাঠাব বাঙ্গালোরে জানতে চেয়ে। কে জানে! এও হয়তো আপনার আরেক গুল।

১০

দুপুরে আবার ঘনঘটা করে মেঘ সাজল। হাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। বেশ গুমোট। কিন্তু এই দ্বীপে গরম নেই।

আহক কিচেনে রান্না করছিলেন। সত্যিই আশ্চর্য মানুষ। রংকিনীকে কিচেনে ঢুকতেই দিলেন না একবারও কাল থেকে। ইগুয়ানো-টিগুয়ানো যে মারেননি, ভালোই হয়েছে। ও খেতেও পারত না। বমি করেই দিত হয়তো। একবার সিঙ্গাপুরে এক ক্লায়েন্ট সবচেয়ে এক্সপেনসিভ রেস্তোরাঁতে খাওয়াতে নিয়ে গিয়ে জ্যান্ত বাঁদরের ঘিলু খাইয়েছিল। চাকা-লাগানো রুপোর একটি খাঁচাতে করে বাঁদরটাকে টেবল-এর পাশে নিয়ে এসে রুপোর হাতুড়ি দিয়ে তার মাথার খুলিটা টুক করে ফাটিয়ে তারপর তালুর একটি পাশ উঠিয়ে রুপোর চামচে করে ঘিলু তুলে একটি রেকাবি মতো রুপোর পাতে রাখল। আর তা খেতে হয়েছিল নিট কনিয়াক-এর সঙ্গে। ফ্রেঞ্চ ভি. এস. ও. পি.।

মানুষের ধারণা যে, যেসব মেয়েরা চাকরি বা ব্যবসা-বাণিজ্য করে তাদের একমাত্র বিপদ আসে বহু পুরোনো ও চিরচেনা একটিই সূত্র থেকে। কিন্তু মেয়েদের যে হাজার রকম অন্য বিপদেও পড়তে হয় তা খুব কম মানুষেই জানেন। বাঁদরটা চিঁচিঁ করছিল। এখনও মাঝে মাঝে সেই করুণ মৃত্যু-চিৎকার যেন শুনতে পায় রংকিনী। একচামচ মুখে দিয়ে গিলে ফেলেই হাসি হাসি মুখে বাথরুম গিয়ে বমি করেছিল।

খুবই ইম্পর্ট্যান্ট ক্লায়েন্ট। তাকে অসন্তুষ্ট তো করা যায় না।

আহক রান্নাঘর থেকে বললেন, গন্ধটা কেমন ছেড়েছে বলো তো? কাঁকড়ার ঠ্যাং-এর চচ্চড়িও

করব। আন্দামানি চালের ভাত দিয়ে কবজি ডুবিয়ে খাবে। কিন্তু তুমি রান্না কিছু না করতে পারো একটা বর্ষার গান তো করতে পারো।

ডিসেম্বরে বর্ষার গান?

আকাশের মেঘ বড়ো, না ক্যালেন্ডার বড়ো? গাও না!

আপনি গান জানেন?

না। তবে শুনতে খুব ভালোবাসি। যারা গান জানে তাদের ঈর্ষা করি। গীতবিতানের প্রত্যেকটি গানের বাণীই আমার মুখস্থ। কিন্তু বিধাতা গলাতে সুর দেননি। এ যে কী কষ্ট কী বলব।

আমি যা জানি তাকে গান জানা বলে না।

আগেকার দিনই ভালো ছিল।

আহুক বললেন।

কেন, একথা?

তখন প্রত্যেক কুমারী মেয়েকেই অন্তত গোটা ছয়েক গান শিখে রাখতেই হত, পাড়া প্রতিবেশী তাতে তিতি-বিরক্তি হলেও।

কেন?

বাঃ। বরপক্ষ মেয়ে দেখতে এলে, গান ওজ আ মাস্ট। বড়োলোক-গরিবলোক শিক্ষিত-অশিক্ষিত কারোই ছাড় ছিল না। মেয়ে অথচ গান গাইতে জানে না এ তো একেবারে অভাবনীয় ছিল সেই সময়ে। বড়োলোকের মেয়েরা অর্গান বাজিয়ে কাননবালা দেবীর স্টাইলে দু-বিনুনি ঝুলিয়ে ছোটোহাতা ব্লাউজ পরে গাইত "ওই মালতীলতা দোলে, পিয়াল তরুর কোলে কোলে।"

সফিস্টিকেটেড হলে গাইত রবীন্দ্রনাথের পূজার গান অথবা ব্রহ্মসঙ্গীত। নিম্নবিত্ত বা অল্প শিক্ষিত হলে, মেঝেতে মাদুর পেতে, কনে-দেখা আলোতে পাড়াতুতো বউদির সিংগল-রিড-এর, সিংগল স্কেল-এর হারমোনিয়ম-এর হিমাংশু দত্তের "ছিল চাঁদ মেঘের পারে-এ-এ-এ" অথবা নজরুল-এর "সখী জাগো, রজনী পোহায়, মলিন কামিনী ফুল, যামিনী গলায়" গাইতে হত। নইলে বিয়েই হত না।

আমাদের তো বিয়ে এমনিতেই হয়নি। থুড়ি, আমরা বিয়ে করিনি। এখন দিন পালটে গেছে স্যার। এখন মেয়েপক্ষই ছেলে দেখতে যায়। ছেলে আপনার মতো ভালো রান্না করতে পারে কি না, ওয়েস্টার্ন ছবির নায়কের মতো মুহূর্তের মধ্যে কোমর থেকে পিস্তল "পুল" করে শঙ্খচূড়রূপী থাইল্যান্ডের পেতনির স্পর্ধিত মাথা ভূলুণ্ঠিত করতে পারে কিনা, দুর্গম, বুক-হিম করা সমুদ্রমেখলা নির্জন দ্বীপে এক অচেনা যুবতীর ঘুম নির্বিঘ্নে করতে পারে কিনা, তাকে কিছুই না-পরে থাকার লজ্জা থেকে বাঁচাতে পারে কি না ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়। পাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীত জানে কি না, নাচ জানে কি না, পাত্রীর সঙ্গে কলকাতার ওবেরয় গ্র্যান্ড-এর "PINK ELEPHANT" বা তাজ বেঙ্গলের "INCOGNITO"-তে সুছন্দে ব্রেক-ডান্স বা সুন্টুনি খিচুং-পিচুং নাচ নাচতে পারে কি না, এসবেরও পরীক্ষা দিতে হয়। রবীন্দ্রসঙ্গীত জানলেও সে গান যেন পীযূষকান্তি সরকারের গানের মতো গিমিকসর্বস্ব, ঠমকময় বুকনি-বাটা গান না হয়, এত সব শর্ত পালন করতে হবে। আজকাল ছেলেদের বিয়ে হওয়া অত সোজা কথা নয়। ঘরে ঘরে অরক্ষণীয় ছেলে দেখা যায় আজকাল। THE TABLE IS TURNED SIR. পুরুষেরা অনেকদিন মেয়েদের হরেকরকম অপমান করে এসেছে। "চুলটা খোলো তো-মা, একটু হেঁটে দেখাও তো মা, দেখি, তুমি খোঁড়া কি না", কখনও কখনও পাত্রীর বুকেও হাত দিয়ে পরখ করেছে পাত্রর ট্যারা-পিসিমা বা খোনা-জ্যেঠিমা, মেয়ের বুকটা সত্যি, নাকি ন্যাকড়ার পুঁটলি বা রাবারের দলা গোঁজা। কী অপমান! কী অপমান! ওই সমস্ত অপমানেরই শোধ তোলবার সময় এসেছে এখন। হাঃ হাঃ।

খুব জোরে হেসে উঠলেন আহুক। বললেন, তা তোলো শোধ। এত সুযোগ সত্ত্বেও আজ অবধি তুমি বা চুমকি বিয়ে করার মতো এমন একটা সোজা কাজও করে উঠতে পারলে না।

তারপরে বললেন, যাক গে। গাও তো এবারে একখানি গান।

রংকিনী বলল, ইচ্ছে করছে না এখন। রাতে শোনাব। লজ্জা করছে। গায়িকা তো নই!

আমার মায়ের গানের খাতাতে এক রসিক ভদ্রলোক লিখে দিয়েছিলেন "লজ্জা নারীর ভূষণ অবশ্যই কিন্তু গানের বেলা নহে।" তবে সেসব লজ্জাশীলা নারী, সেই যুগের নারী।

বলেই, আবারও হেসে উঠলেন আহুক।

রংকিনী বলল, বাঃ। কিন্তু আজকালকার আমরা কি নির্লজ্জ?

জানো ম্যাডাম, "দ্যা হর্নেটস নেস্ট"-এ পর্ণকুটিয়ে একটিও আয়না যে কেন রাখিনি তা ভেবে সত্যিই আপসোস হচ্ছে।

কেন?

তোমাকে এই পোশাকে কেমন যে লাগছে তা তুমি নিজে তো দেখতে পারলে না। ভীরাপ্পানটা যদি আজও না আসে তবে সে মুখপোড়াও এই বিনি পয়সার অদ্ভুত দৃশ্য থেকে বঞ্চিত হবে।

রংকিনী হাসল। বলল, আয়না থাকলে, আমার অস্বস্তিটা পরিপূর্ণ হত। তাই তো এত উৎসাহ? আয়না থাকায় অসুবিধা হচ্ছিল অবশ্যই কিন্তু এখন মনে করছি, আয়না না থাকাতে বেঁচেই গেছি।

রংকিনী দ্বীপ ঘুরে ঘেমেনেয়ে ফিরে এসে চানঘরের চান করার সময়ে আন্ডারগার্মেন্টস এবং সালোয়ার-কামিজ সব আহুক-এর দেওয়া গুঁড়ো সাবান দিয়ে কেচে একটু দূরের একটি ঝাঁকড়া গাছের আড়ালের নাম না জানা ঝোপ-এর উপরে মেলে দিয়েছে, যাতে রোদ পড়ে, এমন জায়গা দেখে। এখন মেঘ সরলে বাঁচে। পুরুষদের চোখের সামনে অন্তর্বাস শুকোতে দিতে বড়ো লজ্জা করে। কে জানে কেন! এখনও এসব সংস্কারমুক্ত কেন যে হতে পারেনি। তাদের আন্ডারওয়্যার, লাল-নীল ল্যাঙোট, চেক-চেক লুঙি, বুক-কাটা গেঞ্জি এসব মেয়েদের চোখের সামনে শুকোতে দিতে পুরুষদের লজ্জা না করলে ওদেরই বা অন্তর্বাস শুকোতে দিতে লজ্জা করবে কেন?

আহুক এর একটি টাইট সাদা টেরিকট-এর শর্টস রংকিনীর বারমুডা হয়ে গেছে। ফ্রেড-পেরির একটা সবুজ-রঙা গেঞ্জিও অভাবনীয়ভাবে ফিট করে গেছে। যদিও লম্বাতে প্রায় হাঁটু ছুঁই-ছুঁই। ভাগ্যিস একজন ছিপছিপে কিন্তু ভালো ফিগারের মেয়ের বুকের মাপ স্বাস্থ্যবান পুরুষের বুকের মাপ একই হয়!

দুটি পায়ে গলিয়েছে আহুকেরই একজোড়া বাথরুম স্লিপার। সবুজ-রঙা। যদিও পেছনটা তা গোড়ালি থেকে দু ইঞ্চি বেরিয়ে আছে, পা ফেললেই ফট-ফট শব্দ হচ্ছে। তবু, আহুক প্রথমে যেরকম ঘাবড়ে দিয়েছিলেন "কিছুই না পরে" থাকতে হবে বলে, সেই আতঙ্ক যে কাটিয়ে উঠেছে এই ঢের।

সত্যি! ভাবি চমৎকার, অসাধারণ একজন মানুষ এই আহুক বোস। বয়সটা যদি একটু কম হত তবে...কী ভালোই না হত। তবে আহুক বোস খেলুড়ে পুরুষ। আজ রাতে সমুদ্রস্নানে যেতে রাজি হয়েছে রংকিনী। সেখানে বেলাভূমি, এই গা-ছম-ছম আদিগন্ত নির্জনতা, মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি-খেলা ভূতুড়ে চাঁদ আর চারধারের পাহাড় থেকে ঝুঁকে পড়া জঙ্গল এবং বড়ো বাঘের মতো অপ্রতিরোধ্য, ভালোলাগার মতো পুরুষ আহুক বোস।

এইসব উপাদান মিলে যে রংকিনীর শরীর-মনে কী রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটাবে সে সম্বন্ধে সে নিজে আদৌ নিশ্চিত নয়। একটা অননুভূত প্রচ্ছন্ন আনন্দ ভারতীয় মূল-ভূখণ্ডের রোমশ উষ্ণ গরম কাঠবিড়ালির মতো এবং এই দ্বীপের অদেখা ইগুয়ানোরই মতো এক অননুভূত ঠান্ডায় ঘিনঘিনে ভয়ও মাঝে মাঝেই তার শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে যাচ্ছে। টেনশন হচ্ছে, টেনশন। মনে মনে প্রার্থনা করছে, আজ যেন দিনটি না ফুরোয়। আর প্রার্থনা করছে, সেই ঝাঁকড়া-চুলের শুঁটকি-মাছ

খেকো নারী-বিদ্বেষী ভীরাপ্পান নামক অদেখা মানুষটি যেন সন্ধে নামার আগেই ফিরে আসে "দ্যা হর্নেটস নেস্ট"-এ, দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে।

কী হল গান-এর?

আহুক আবার বললেন, কিচেন থেকে।

তারপরেই বললেন তুমি ঝাল খাও তো?

খাই। আমরা তো বাঙাল। বদ্যি। দেখছেন না, সেনগুপ্ত?

বদ্যি তো কি হল?

আরে পূর্ববঙ্গ ছাড়া বদ্যি আর কোথাওই তো ছিল না। এখন না হয় উদ্বাস্তু হয়ে সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে গেছি আমরা।

তাই? জানতাম না তো। তবে জানতাম যে, বদ্যিরা খুব মেধাবী হন পড়াশুনোয় এবং অধিকাংশই দেখতে ভালো হন না। বিশেষ করে, মেয়েরা। তবে সুন্দর হলে তারা হয় সুচিত্রা সেন, নয় অপর্ণা সেন, নয় রংকিনী সেনগুপ্ত।

কেন লেগপুল করছেন মিছিমিছি। এখানে আয়না নেই বলে কি আমি জানি না আমি কেমন দেখতে?

তোমার বাবা কি করেন? তাঁর নাম কি?

আমার বাবা নেই।

সে কি! তুমি কি কনিষ্ঠ সন্তান।

না। আমি বড়ো।

কম বয়সেই গেছেন?

হ্যাঁ। তবে খুব অল্প বয়সে নয়।

কী করতেন তোমার বাবা?

বলবার মতো তেমন কিছু নয়। হি ওজ নট ওয়েল-অফফ ইদার। বোহেমিয়ান ছিলেন। লেগে থেকে কিছু করা তাঁর চরিত্রে ছিল না। তবে, করতেন অনেক কিছুই। লিখতেন, গান গাইতেন, ছবি আঁকতেন। এসব করে সামান্যই টাকা পেতেন। আমাদের সংসার চালাতেন মা-ই। বলতে পারেন উই আর আ সর্ট অফ আ ম্যাট্রিয়ার্কল ফ্যামিলি। বাংলাতে যেন কি বলে?

মাতৃতান্ত্রিক পরিবার।

কী করতেন? মা?

অধ্যাপনা করতেন তিনি। এখনও করেন।

তোমার বাবার নাম বললে না?

অসমঞ্জ রায়।

কী বললে? উত্তেজিত হয়ে বললেন আহুক।

তারপরই স্বগতোক্তি করলেন, ও, না না। তিনি তো সেনগুপ্ত ছিলেন না।

আমরা সেনগুপ্তই কিন্তু বাবা আমাদের জমিদারির খেতাব "রায়ই" লিখতেন। ঠাকুরদারই মতো।

কোথাকার জমিদার ছিলে তোমরা?

ছাড়ুন তো! জমিদার না জমাদার তা কে জানে! থাকলে না প্রমাণ দিতে পারতাম।

তার মানে, তার মানে...বলতে বলতে কিচেন থেকে বেরিয়ে এলেন। চোখ বড়ো বড়ো করে বললেন, আরে আমি তো তোমার বাবার একজন আর্ডেন্ট অ্যাডমায়রার। হি ওজ আ গ্রেট ম্যান। আ ভারসেটাইল জিনিয়াস।

তাই?

অবিশ্বাসের গলাতে বলল, রংকিনী।

তারপরই বলল, কাঁকড়াটা খারাপ হয়ে যাবে, সম্ভবত প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যেই।

একটুক্ষণ অবাক চোখে রংকিনীর চোখে চেয়ে থেকে আহুক আবার কিচেনে চলে গেলেন।

গিয়েই, কিচেন থেকেই আহুক আবৃত্তি করলেন :

"সামান্য যে ছোট্ট সাদা পাখি
তারও আছে মনের মানুষ কোনো,
তারও আছে ফাগুন দিনের ঘর,
আর তোমার?
তোমার শুধুই অনন্ত যৌবন,
তোমার শুধুই অনন্ত যন্ত্রণা
লক্ষ হাতে বৃথাই খুঁজে মরা।
আপন হবে, এমন নেই কো কেউ
ফোঁসফোসানি সাঙ্গ করে তটে
নেতিয়ে পড়ে সাপের মতো ঢেউ।
শোনো শোনো, নীল বারিধি শোনো
দিকদিগন্তে মেলে সুনীল কান,
সুখী যারা, তারা সবাই ছোটো,
আমার মতো মানুষ,
কিংবা পাখি।"
কবিতার নাম "সমুদ্রকে"।

বাঃ বাঃ। আপনি দেখছি ভারসেটাইল জিনিয়াস। কবিতাও লিখতে পারেন, কাঁকড়াও রান্না করতে পারেন, ডায়াস্কোরিয়ার চাষ করেন এবং পাখির নীড়ও রপ্তানি করেন, সত্যি!

কবিতাটা তোমার বাবার লেখা।

তাই? মুখস্থ করে রেখেছেন আপনি?

কী করব। যাদের মুখস্থ করার কথা ছিল তারা যখন করল না তখন...

বলেই, আবার আবৃত্তি করলেন আহুক তাঁর প্রিয় কবিতাটি। তার আগে বললেন, কবিতার নাম "আছে"।

"আছে। আছে। আছে।
সবই আছে।
ঝিনুকের বুকের ভিতরে মুক্তোর মতন,
জীবনের প্রথম সঙ্গমের সুখস্মৃতির মতন,
আমার নবতম প্রেমিকার ফুটি-না-ফুটি
ফুলগন্ধী প্রেমেরই মতন,
স্বপ্নে দেখা তার ফলসাবরন শাড়ির মতন,
অদেখা তার আগুন-পারা নগ্নতার মতন
সবই আছে।
বনে, বালুতটে, স্থলে,
আছে মৎস্যগন্ধী জলে,
মাছে,
আছে, আছে, আছে।
সবই আছে।"

বাঃ। এটি যে আপনি একেবারে "দ্যা হর্নেটস নেস্ট"-এ বসেই লিখেছেন তা বোঝা যায়। চমৎকার।

রংকিনী বলল।

এটাও তো তোমার বাবারই কবিতা। তিনি তো এই দ্বীপে কখনও আসেননি। অসমঞ্জ রায়ের মূল্যায়ন এই টাকা-সর্বস্ব কম্পিউটার-সর্বস্ব, স্বার্থ-সর্বস্ব পৃথিবী করবে কী করে! এই পৃথিবী কি মিরজা ঘালিবেরই যথার্থ মূল্যায়ন করতে পেরেছিল? তাঁর জীবদ্দশাতে? কাব্য-সাহিত্য শিল্পের বিচার কোনওদিনই তাৎক্ষণিক নয়। এসবের বিচারক মহাকাল। সময়কে সময় দিতে হবে বইকী।

রংকিনী কোনও মন্তব্য করল না।

বাবাঃ কী মেঘ করেছে। এযে একেবারে অন্ধকার করে এল। দিন না রাত বোঝারই উপায় নেই।

রংকিনী জানালা দিয়ে সমুদ্রের আর আকাশের দিকে চেয়ে বলল।

কোথায়?

বলে, আহুক কিচেন ছেড়ে পেছনের বারান্দায় বেরিয়ে দেখে বললেন, তাতে কী? 'দ্যা হর্নেটস নেস্ট'-এর রাতকেও যে রাত বলে বোঝা যায় না এখন চাঁদের আলোতে। এখানের রাতে দিনে ভেদ নেই।

কী ভয়ানক-দর্শন মেঘ রে বাবা। টর্নার্ডো বা সাইক্লোন-টাইক্লোন হবে না তো?

না। এই মেঘপুঞ্জর নাম CUMULO-NIMBUS।

মানে? মেঘের আবার নাম হয় না কি?

হয় না? কালিদাস-এর "মেঘদূত"-এ বিরহী যখন তার প্রিয়ার খোঁজ করতে মেঘপুঞ্জকে পাঠাতেন তখন কি মেঘের নাম জানতেন না? ক্যুরিয়ার-এর নাম না জেনে কেউ কি চিঠি পাঠায়?

অনেক রকমের মেঘ হয় বুঝি?

নিশ্চয়ই হয়। তবে আমি তো আবহাওয়াবিদ নই, প্লেনের পাইলটও নই, তাই আমি আর কতটুকু জানি? তবে কিছু কিছু নাম অবশ্যই জানি। যেমন NIMBUS এক ধরনের মেঘের নাম। সেই মেঘই যখন পুঞ্জিভূত হয় তখন তাদের বলে CUMULO-NIMBUS. নিচে ঘন কালো মেঘপুঞ্জ থাকে। উপরে সাদা। আবার পাতলা পাতলা পেঁজা-তুলোর মতো উর্ধ্বমুখী সাদা মেঘকে বলে CIRRUS। তাদেরই যখন আবার ছানার ডালনার কাটা-ছানার মতো ছাড়া ছাড়া দেখায় তখন তাদের বলে CIRRO-CUMULOS। CIRRO যখন সমান্তরাল গড়নে দেখা যায় তখন তাদের নাম হয়ে যায় CIRRO-STRATUS। বুঝলে তো? STRATA থেকে STRATUS। STRATUS এরও নিচের দিকে জলবাহী কালো মেঘ থাকে আর উপরে সাদা। STRATO যখন পুঞ্জীভূত হত তখন তা হয়ে যায় CUMULUS STRATO CUMULUS। খুব কালো যখন দেখায় STRATUS-কে তখন তাদের বলে ALTO-STRATUS। STRATUS থাকে সবচেয়ে নিচে, ধরো, পনেরোশো ষোলোশো ফিট। তার উপরে ছ হাজার ফিট অবধি দেখা যায় অন্যদের। হাজার থেকে প্রায় কুড়ি হাজার ফিট অব্দি দেখা যায় ALTO CUMULOS, CUMULO-NIMBUS, ALTO-STRATUS এবং CIRRO-STRATUS-দের। তারও উপরে উঠলে চল্লিশ হাজার ফিট অবধি দেখা যায় CIRRUS আর CIRRO-CUMULUS দের। চল্লিশ হাজার ফিটের উপরে, দিনের বেলা হয়তো দেখে থাকবে অনেক সময়ে জেট প্লেনের জানালা দিয়ে, বহুরঙা, রামধনুর মতো স্বপ্নময় কিন্তু সমান্তরাল মেঘপুঞ্জ—তাদের নাম IRIDISCENT CLOUDS।

বাবাঃ। আপনি কি পাইলট ছিলেন নাকি?

ছিলাম কী? এখনও আছি। তবে প্লেন কখনও চালাইনি। আমি মেঘের উড়োজাহাজ চালাই কল্পনাতে।

বাঃ। রংকিনী বলল। অ্যাডমায়ারিং চোখে।

আফ্রিকাতে যখন পেশাদার শিকারির কাজ করতাম, সুয়েড, অস্ট্রেলিয়ান, অ্যামেরিকান, কানাডিয়ান, সুইস সব শিকারিদের নিয়ে সাফারিতে যেতাম, তখন রাতের বেলা তাঁবুর ক্যাম্প ফায়ারের সামনে বসে মেঘনবিশ হয়ে উঠেছিলাম নানা বই নেড়েচেড়ে।

বৃষ্টি হত না?

নাঃ। অধিকাংশ সাফারিই তো হত জুলাই-এ।

সে কি! জুলাইয়ে বৃষ্টি হবে না তো কোন সময়ে হবে?

আহুক হেসে ফেললেন। বললেন, বিদুষী, সুন্দরী নারী, এই পৃথিবীটা মস্ত বড়ো। জুলাইতে ভারতে বর্ষার ঘনঘটা থাকে অবশ্যই কিন্তু আফ্রিকার, বিশেষ করে পুব আফ্রিকার কেনিয়া ও তানজানিয়ার সেরেঙ্গেটি, গোরোউগোরো, ওইসব অঞ্চলে জুন-জুলাই মাসই শীতকাল। আকাশ নির্মেঘ থাকে তখন। সুনীলও। রাতে কনকনে ঠান্ডা। দিনে প্লেজেন্ট।

সত্যি! আপনার সঙ্গে দিনকয়েক থাকতে পারলে কত বিষয়ে যে বিশারদ হয়ে যাব। ভাবা যায় না।

কে বলতে পারে! গুল-বাঘও হতে পারো।

বলেই বললেন, যাই। কাঁকড়ার ঠ্যাংগুলো কাঁদছে, তাদের শুশ্রূষা করি গিয়ে। খারাপ হলে তো তুমি আবার আমার মালকিন-এর কাছে বদনাম করবে আমার।

হেসে উঠল রংকিনী।

তারপর বলল, মেগাপড পাখিদের সম্বন্ধে বলতে গিয়েও তো পুরো বললেন না। ওদের সম্বন্ধে আর কী জানেন বলুন না। কলকাতাতে গিয়ে ভাইকে জ্ঞান দেব।

ও তাহলে তুমিও জ্ঞান দাও।

তারপর বললেন, মেগাপডদের কি বিশেষত্ব জানো? তারা ডিমে তা দিতে বসে না। এমন সব পাতা-পুতা, উদ্ভিদ, বালির উপরে ডিম পাড়ে যে এইসব জিনিসের উষ্ণতাতেই ইনকিউবেশন হয়ে যায়। ডিম ফোটে। আর অকালপক্ক বাচ্চারা ডিম ফুটেই স্বাবলম্বী হয়ে "হিজ-হিজ হুজ-হুজ" জিম্মাদারি নিয়ে পৃথিবী দেখতে বেরিয়ে পড়ে।

তারপর বললেন, তুমি রয়্যাল আলব্রাটস পাখির নাম শুনেছ তো? রয়্যাল আলবাট্রসের ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোনোর পরে সেইসব রাজকীয় বাচ্চারা সব ন্যাকা-খোকা ন্যাকা-খুকু হয়ে থাকে আট মাসেরও উপরে। তারপরে তারা স্বাবলম্বী হয়ে মায়ের আঁচল ছাড়ে। এই পৃথিবী যে শুধুই বিরাট তাই নয় রংকিনী, তুমি কি জানো এই পৃথিবী কী বিচিত্র, ঈশ্বরের কী আশ্চর্য সৃষ্টি। অগণ্য এই গাছগাছালি, পাখপাখালি, পোকা-মাকড়, জীবজন্তু, জলচর, স্থলচর, আবার ইগুয়ানোর মতো উভচর? এই পৃথিবী, এই ব্রহ্মাণ্ড?

এ বাবা! আপনি আবার ঈশ্বর-ফিশ্বরে বিশ্বাস করেন না কি? এ কী প্রি-হিস্টরিক মানুষ আপনি!

করি। গভীরভাবে করি। ঈশ্বরবোধ ব্যাপারটা একজন মানুষের ভিতরে আসতে অনেক গভীরতা, অনেক জন্মের পুণ্য লাগে রংকিনী। তুমি হয়তো গতজন্মে তেলাপোকা বা কাঁকড়া ছিলে। বা, ইগুয়ানো। তারপরের জন্মেই কোনও দৈব-দুর্বিপাকে মানুষ হয়ে জন্মালে তো তোমার মধ্যে ঈশ্বরবোধ জন্মাতে পারে না। ঈশ্বরবোধ এই কারণেই সকলের মধ্যে থাকে না। ধৈর্য ধরতে হবে। যখন আসার, যদি আসে, তখন ঠিকই আসবে। তবে কত জন্ম পরে, তা কে জানে।

কী জানি বাবা। এই বিজ্ঞানের যুগে কি করে একজন শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মানুষ এমন ঈশ্বর-ঈশ্বর করেন ভাবা যায় না।

অন্য কথা ভাবো। তাছাড়া, আমি বুদ্ধিজীবী নই, দুর্বুদ্ধিজীবী। তোমাকে একটা কথা বলি। নিরীশ্বরবাদী হওয়ার মধ্যে সপ্রতিভতা আছে, তা অবশ্যই ফ্যাশানেবলও বটে, বিজ্ঞান-বিশ্বাসী হতেও অসুবিধে দেখি না। কিন্তু বিজ্ঞানের সঙ্গে ঈশ্বরে কোনও বিরোধ নেই। আমি মূর্তিপুজোর কথা বলছি না। যদিও তার মধ্যে দোষেরও কিছু দেখি না। তুমি বিবেকানন্দ পড়েছ কি? পড়ে দেখো। আমি কী বলছি, তা তখন বুঝতে পারবে। আইনস্টাইন, পাকিস্তানের নোবেল প্রাইজ পাওয়া পদার্থবিদ কালাম সাহেব, ওয়াল্ট হুইটম্যান, লিও টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ, সকলেই ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন। আমি তো তাঁদের চেয়ে অনেকই নিকৃষ্ট। ঈশ্বরকে মানার মধ্যে, স্বীকার করার মধ্যে কোনও লজ্জা বা অগৌরব নেই। বরং অস্বীকার করার মধ্যেই আছে। বিজ্ঞান আজ অবধি কিছুমাত্র উদ্ভাবন করেনি, শুধু আবিষ্কারই করেছে মাত্র। অনেক কিছুই আবিষ্কার করেছে। এই অতি-মাত্রায় বিজ্ঞান-বিশ্বাসী মানুষেরাই একদিন পৃথিবীর সর্বনাশ ডেকে আনবে। ফ্যাশানেবল এবং আপাত সপ্রতিভ হওয়ার চেয়েও সত্য এবং শাশ্বতকে স্বীকার করতে অনেকই বেশি সাহসী হতে হয়। ব্যতিক্রম হওয়ার চেষ্টা করাটাই কি ভালো নয় জীবনে? সহজে সাধারণ নিয়ম হয়ে ওঠার চেয়ে?

রংকিনী চুপ করেই রইল। বাইরে চেয়ে রইল। আকাশের ঘনঘটা পরিপূর্ণ হল। ঘন কালো বেনারসি পরেছে আকাশ। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ তাতে চকিতে রুপোলি জরির পাড় বসিয়ে দিচ্ছে, আর গলাতে ওড়িশি ফিলিগ্রি কাজের রুপোর গয়না পরিয়ে দিয়েই খুলে নিচ্ছে পরমুহূর্তে। এমন সময়ে হঠাৎই পুব দিক থেকে একটা জোর হাওয়া উঠল।

আহুক বললেন, "পুব হাওয়াতে দেয় দোলা, মরিমরি।"

বলেই বললেন, জানো গানটা? জানলে গাও না রংকিনী। তোমার একজন এমন অনুরাগীকে এমন পরিবেশে এই "দ্যা হর্নেটস নেস্ট"-এ বসে গান শোনাবার সুযোগ হয়তো আর আসবে না। জীবনে কোন সুযোগটি, কোন মানুষটি, কখন যে কোন মানুষের দুয়ারে এসে করাঘাত করে তা আমরা বুঝতে পারি না বলেই সারা জীবন হাহাকার করে মরি। যা পড়ে-পাওয়া, তা পড়ে-পাওয়া বলেই তাকে হেলা করতে নেই। "যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়ে দেখো, তাই, মিলিলে মিলিতে পারে অমূল্য রতন" পড়োনি কি? গাও গাও, যদি গানটি জানো, তবে গাও। এই পুবালি হাওয়াতে এই কিউমুলাস নিম্বাস মেঘের স্তূপ এখুনি উড়ে যাবে, আজ জ্যোৎস্না রাতেই আমরা সমুদ্রে নাইব মনে হচ্ছে। এইরকমই ইচ্ছা ঈশ্বরের। গাও, প্লিজ।

রংকিনীর মধ্যে থেকে হঠাৎই কে যেন নিরুচ্চারে বলে উঠল, গাও, গাও, কিন্তু গাইবার সময়ে ও অন্য গান ধরল :

"আমার যেন দিন ভেসে গেছে চোখের জলে
তারি ছায়া পড়েছে শ্রাবণ গগন তলে॥
সেদিন রাগিনী গেছে থেমে, অতল বিরহে থেমে গেছে থেমে,
আজি পূবের হাওয়ায় হাওয়ায়, হায় হায় হায় রে
কাঁপন ভেসে চলে॥"

আহুক কিচেন থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। গায়ের গাঢ় হলুদ-রঙা রান্না করার অ্যাপ্রনের কোনাগুলি হাওয়াতে উড়ছিল। কাঁচা-পাকা দাড়ি, ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা পেছনের চুল এলোমেলো হচ্ছিল। এই গান, এই সমুদ্র, এই আকাশ, এই মেঘ, এই পাখি-দ্বীপ সবকিছুকেই যেন আহুক একই সঙ্গে এক নীরব অদৃশ্য মন্থনে তার হৃদয়ে টেনে নিতে চাইছিলেন—হাওয়ায়-খসা ফুল-পাতা, হরজাই-গাছ থেকে আচমকা খসে-যাওয়া মিশ্র গন্ধ, নানা পাখির কিচিরমিচির, স্ফুট-অস্ফুট আওয়াজ, এসবে তিনি যেন পুরোপুরি আবিষ্ট হয়ে গেছেন।

রংকিনী ভাবছিল, পেছন-ফেরা মানুষটার দিকে চেয়ে, এখানে বছরের পর বছর একা থেকেও এত ভালোলাগা-ভালোবাসা বেঁচে আছে প্রকৃতির প্রতি, পরিবেশের প্রতি মানুষটার। আশ্চর্য। পর মুহূর্তেই ভাবল, এই গভীর ভালোবাসা তাঁর বুকে না থাকলে কি এমন আনন্দে এই নিভৃত ভয়াবহ নির্জনতাতে তিনি এত দীর্ঘদিন আদৌ থাকতে পারতেন? তারপর ভাবল, কে জানে! মানুষটা হয়তো কোনও খুনটুন করেছেন। স্মাগলার-টাগলার, নয় ফেরারি আসামি। সেলুলার জেল থেকেই পালানো নয়তো? জেলখানা থেকে না হলেও হয়তো পালাতে চাইছেন কোনও মানুষের কাছ থেকে, কোনও বিশেষ কোলাহলের জীবন থেকে। অথবা কে জানে! হয়তো নিজেরই কাছ থেকে। নইলে কী করে সম্ভব হয় এমন করে থাকা? না, খবরের কাগজ, না রেডিয়ো, না টিভি, না বিজলি আলো এমন কি না সৌরশক্তি। মানুষটা হয় কোনও মেন্টাল-কেস, নয় দেবতা। ভূতও হতে পারেন। তা হওয়ার সম্ভাবনাই হয়তো বেশি। সে কথা মনে হতেই ওই কালো-করা আকাশ আর ঢেউ-লাগা সমুদ্রের দিকে চেয়ে ভীষণই ভয় করতে লাগল রংকিনীর।

আহুক বললেন, আমার ফরমায়েশি গানটা শোনালে না আমাকে?

শোনাচ্ছি, শোনাচ্ছি, বলল, রংকিনী। যেন ভূতের হাতের থাপ্পড় খাওয়া থেকে পরিত্রাণ পাবারই জন্যে।

বলেই, ধরে দিল গানটি। কিন্তু ধরল সঞ্চারী থেকে। কেন জানে না।

"ব্যথা আমার কূল মানে না, বাধা মানে না
পরান আমার ঘুম জানে না, জাগা জানে না।
মিলবে যে আজ অকূল পানে, তোমার গানে আমার গানে
ভেসে যাবে রসের বানে আজ বিভাবরী।
পূব হাওয়াতে দেয় দোলা, মরি মরি..."

আহুক একবার রংকিনীর দিকে একটা রহস্যময়, চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আবার কিচেনে ঢুকে গেলেন।

রংকিনীর ভীষণই ভয় করতে লাগল। কে জানে, কী হবে আজ রাতে! মিথ্যে বলবে না, কিছু যে হবে, হতে পারে, একথা ভেবে ভয় যেমন হচ্ছিল, একটা আনন্দময় চাপা উত্তেজনাও বোধ করছিল ও ভিতরে ভিতরে।

১১

ওরা পাকদণ্ডি পথে বাংলো থেকে নামছিল সমুদ্রতটের দিকে। এই পথ দিয়ে গতকাল ও জেটি থেকে উঠে আসেনি বা দ্বীপটি ঘুরে দেখার সময়ও এপথে যায়নি। এটি একেবারে অন্য পথ। শুধুই তটে যাবার। তটে চান করার জন্যে আর সান এবং মুন বেদিং করার জন্যে।

আহুক বলছিলেন।

ঘুরে ঘুরে নেমেছে পথটা গুর্জন গাছের ছায়ায় ছায়ায়। একটা গাছ দেখিয়ে আহুক বললেন, দ্যাখো, এটা বাকোটা গাছ। আর এটা বাদাম। আর ওটা কোকো। এসবই হার্ডউড। আর একটু নামলেই, সমুদ্রতটের থেকে বেশ কিছুটা উপরে দেখবে শুধুই সিলভার-গ্রে গাছ। কাণ্ডের অনেকখানি সিলভার গ্রে। চাঁদ উঠলে দেখবে, এই বনের শোভা। বিশেষ করে পূর্ণিমার দিনে।

পূর্ণিমা কবে?

আর ঠিক সাতদিন পরে।

তার পরদিনই সকালে আমি চলে যাব এখান থেকে।

হ্যাঁ তারপর থেকে আর চাঁদ উঠবে না "দ্যা হর্নেটস নেস্ট"-এ।

তারপর স্বগতোক্তির মতোই আহুক বললেন, এই আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ কি একবারে এসে ভালো করে দেখা যায়? আমাদের এই ছোট্ট দ্বীপটিকেই এত বছরে রাত-দিন থেকে তবুও পুরো জানলাম না। প্রকৃতির রহস্য বড়ো গভীর রহস্য। এর মধ্যেই কিন্তু আমাদের জীবনের এবং হয়তো মৃত্যুরও সব রহস্য। সবকিছুর রহস্য। প্রকৃতিই যে আমাদের ভূত-ভবিষ্যৎ। এর মধ্য থেকেই আমাদের গান, আমাদের দর্শন, আমাদের অধ্যাত্মবাদ সবকিছুই উদ্ভূত। জানো তো রংকিনী, এই দ্বীপপুঞ্জে পাঁচশোর বেশি দ্বীপ এবং দ্বীপাণু আছে তার মধ্যে মাত্র উনচল্লিশটি দ্বীপেই শুধু মানুষের বসবাস। "দ্যা হর্নেটস নেস্ট" কিন্তু উনচল্লিশটির মধ্যে পড়ে না। কোনও ম্যাপেও পাবে না একে। মাত্র দুজন বনমানুষ যদি কেনও দ্বীপে বাস করে তবে তাকে "Inhabitated" বলবে না ও কেউই। একবার চলে এসো বছরখানেকের জন্যে। তখন আঁতি-পাঁতি করে খুঁজতে পারবে এই দ্বীপকে, খুঁজতে পারবে নিজেকে।

বছরখানেকের জন্যে? আপনি কি পাগল?

কেন? ছুটি জমিয়ে বা চাকরি ছেড়ে দিয়েও চলে আসতে পারো। তুমি যদি আসবে বলে কথা দাও, তবে আমিও চুমকির চাকরি ছেড়ে দিয়ে অন্য একটি আনচার্টেড দ্বীপে গিয়ে আস্তানা গাড়ব। সেখানে ভীরাপ্পানও থাকবে না। থাকব শুধু আমি আর তুমি।

তাই? ইস। ভাবতেই কী ভালো লাগছে।

গলায় শিহর তুলে বলল রংকিনী।

তারপর বলল, আজ দুপুরে যেমন কাঁকড়া রান্না করে খাওয়ালেন তেমন কাঁকড়া খাওয়াবেন তো?

নিশ্চয়ই। আর কি শুধু কাঁকড়া? সুরমেই, ম্যাকারেল, টুনা মাছ। বাগদা আর গলদা চিংড়ি এবং অক্টোপাসও খাওয়াব। খাওয়াব ইগুয়ানো, আর ফল-খাওয়া স্বাদু বাদুড়ের রোস্ট। সামুদ্রিক সি-কুকুম্বার, সি আর্চিনস। মুসেলস খেয়েছ কি কখনও? জার্মান আর স্প্যানিশরা খুব তরিবত করে খায়। মুসেলস এখানেও পাওয়া যায়। আমি এমন রান্না করব যে, তা ফেলে আর অন্য কিছুই খেতে ইচ্ছে করবে না।

তারপর বললেন, আরে। আমিই যদি সব কিছু করব, তুমি সেই দ্বীপে কি করবে?

আপনার দেখাশোনা করব। আপনাকে আদর করব, আপনার আদর খাব। আমাদের বেশ একটা গাঁট্টা-গোঁট্টা ছেলে হবে। আপনার মতো হবে সে।

না না। সন্তান যদি হতেই হয় তবে একটি মেয়ে। তোমার মতো সুইটি-পাই।

তাই?

বলেই। হো হো করে হেসে উঠল রংকিনী।

বলল, স্বপ্নেই যখন রাঁধছি পোলাও, তখন ঘি ঢালতে কঞ্জুষিই বা করব কেন?

আহুকও খুব হাসছিলেন।

বললেন, বাবা। তুমি ড্রাংক না হয়েই মাতালের মতো কথা বলছ দেখি।

বলছি, কারণ, স্বপ্ন তো স্বপ্নই! রোজ রোজ কি স্বপ্ন দেখা যায়? না স্বপ্ন দেখা দেয় কারোকে?

তোমার থলেটা বইতে কষ্ট হচ্ছে না তো? জিনিস তো কম নেই। তোয়ালে দুটোর ওজনই কি কম?

হাতের ব্যাগের ভারে ডানদিকে নুয়ে পড়া রংকিনীকে বললেন আহুক।

না, না।

আহুকের দুহাতেও দুটি ব্যাগ। কী করে এখানে এই হাওয়ার মধ্যে আগুন জ্বালাবেন আহুক, তা আহুকই জানেন। ভাবছিল রংকিনী। আজ রাতের মেনু নাকি প্রন ককটেইল, আনারস আর ম্যাকারেল ভাজা। আহুক বলেছেন বোনলেসই করবেন। কাঁটা থাকলে একেবারেই খেতে পারে না রংকিনী, তাই। তারপর ব্যানানা-ফ্রিটারস। এবং তারও পরে রেড ওয়াইন, অনেক গল্প করতে করতে চাঁদের আলো আর ফেনায় ভেজা তটভূমিতে শুয়ে শুয়ে।

আহুক বলেছিলেন, মুনলাইট পিকনিক তো দেশে-বিদেশে অনেকই করেছ "দ্যা হর্নেটস নেস্ট"-এর এই মুনলাইট পিকনিক-এর কথা তুমি সারাজীবন মনে রাখবে।

তাই? দেখাই যাক।

তারপরেই রংকিনী বলল, আন্দামানে ওয়াইন কোথায় পেলেন? এখানে কি স্প্যানিশ বা ফ্রেঞ্চ বা অন্য কোনও ভালো ওয়াইন পাওয়া যায়?

না। বিদেশি ওয়াইন নয়। আমাদের দেশে যেসব ওয়াইন তৈরি হয়, তাই। মন্দ কি? দেশির মতো ভালো কি অন্য কোনও কিছুই? রুবি, গোলকোণ্ডা রিভিয়েরা, বসকা রেড ওয়াইন রাখি এখানে। কারণ, এখানে তো ফ্রিজ নেই। হোয়াইট ওয়াইন তো ঠান্ডা না করে খাওয়া যায় না। তাছাড়া মাছ-মাংসই তো খাই বেশি তাই রেড ওয়াইনই রাখি।

রোজ খান?

পাগল! বছরে হয়তো চার-পাঁচ দিন। ক্বচিৎ কেউ এখানে এলে যদি কারো জন্মদিন এখানে পড়ে যায় সেই জন্মদিনে। দোলপূর্ণিমা, শ্রাবণীপূর্ণিমা আর বুদ্ধপূর্ণিমার রাতে। রিলিজিয়াসলি!

কেন?

চাঁদের সঙ্গে আমার নাড়িবাঁধা। বলতে পারো, দাড়িও বাঁধা। চাঁদের আলো যেমন এই সমুদ্রমেখলার জোয়ার-ভাটা, ভরা-কটাল মরা-কটালকে নিয়ন্ত্রিত করে, তেমন তা করে আমাকেও। পূর্ণিমাতে আমার শিরা-উপশিরাতে রক্ত অনেকই বেশি দ্রুত চলাচল করে। পাগল-পাগল লাগে আমার।

আপনার জন্মদিন কবে?

জেনে কি হবে? কার্ড আসবে না এখানে। এখানে ওয়েব-সাইট, ই-মেইল, টেলিফোন কিছুই নেই। থাকার মধ্যে আছে শুধু টেলিপ্যাথি। সেদিন তুমি আমাকে, তোমাদের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, 'উইশ' করবে, সেদিন আমি সঙ্গে সঙ্গেই জানতে পাব।

বলবেন তো জন্মদিনটা কবে? না, বলবেন না?

আমি জন্মাইনি। মানে, কী বলি! আমার মা ইছামতি নদীতে জ্যৈষ্ঠর এক পূর্ণিমার রাতে নাইতে নেমেছিলেন, এমন সময়ে দেখলেন একটা হাঁড়ি ভেসে আসছে আর তার ভেতর থেকে শিশুর কান্না। মা আমাকে পেলেন। আমি মাকে। আমার মায়ের কোনও সন্তান ছিল না, জানো। তবে আমি তো কানীনই।

কানীন কাকে বলে জানি না তবে আপনার গল্প যদি সত্যিও হয় তবে বলব যে আপনার আসল মা ও বাবা অনেক পুণ্যবান পুণ্যবতী। তবে, আপনার একটি কথাও আমি বিশ্বাস করি না।

কেন? এ কী অন্যায় কথা।

কেন আবার কি? আপনি গুলবাঘ তাই।

তারপর রংকিনী বলল, এমন অদ্ভুত নাম কেন হল আপনার বলুন তো? আহুক। আপনার যদি ছেলে হয় তবে তার নাম রাখবেন ডাহুক। বেশ মিল হবে।

আর মেয়ে হলে, যদি কখনও হয়?

তার নাম রাখবেন জলপিপি।

বাঃ। দারুণ নাম।

এই নামের জন্যই আপনার একটি মেয়ে হতেই হবে। যাক এবারে আপনার নামের মানেটা বলুন।

মানে নেই। প্রপার নাউন। তুমি 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' অবশ্যই পড়োনি। তোমাদের এসব বলেই বা কি লাভ? ভোজ-রাজে-এর বংশে একজন পরাক্রমশালী সচ্চরিত্র রাজা ছিলেন। তাঁরই নাম ছিল আহুক। আহুকের স্ত্রীর নাম ছিল কাশ্যা।

কী?

কাশ্যা।

ও!

এবারে তোমার অদ্ভুত নামের মানেটা বলো। রংকিনী নামে কোনও শব্দ তো বাংলা ভাষায় নেই বলেই জানি। তবে সম্ভবত রংকিনী, রঙ্গিণীরই সমার্থক। তবে রঙ্গিণীর যা মানে তার সঙ্গে তোমার চরিত্রের তো কোনও মিল নেই।

কী স্ত্রী আর কী পুরুষ তাদের যখন নামকরণ করা হয় শৈশবাবস্থাতে, তখন তো তাদের স্বভাব-চরিত্র পরে কেমন হবে না হবে তা জানা যায় না। তাই নামের সঙ্গে মানুষ অনেক সময়েই মেলে না। যার নাম সুধীর সে অত্যন্ত চঞ্চল, যার নাম ক্যাবলা সে অত্যন্ত স্মার্ট।

তোমার নাম নিশ্চয়ই দিয়েছিলেন তোমার বাবাই।

না। আমার এবং আমার ভাইয়ের নাম দিয়েছিলেন আমার মা-ই। বলেছিলাম না যে, আমাদের পরিবারে আমার বাবার প্রায় কোনওরকম ভূমিকাই ছিল না।

তাই? বোধহয়, ভালোই হয়েছিল। তাই তিনি মুক্ত হয়ে নিজের কাজ করতে পেরেছিলেন সারা জীবন। যদিও তাঁর আয়ু ছিল না খুব বেশিদিন।

মুক্ত হবার প্রশ্ন আসে বন্ধন থাকলেই। বাবা তো কোনওদিনও কোনও বন্ধন স্বীকার করেননি। দায়িত্বও নয়। কবি বা লেখক হয়তো উনি বড়ো ছিলেন, আপনারাই জানবেন, যাঁরা ওঁর লেখা পড়েছেন, কিন্তু ব্যক্তিজীবনে অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন ছিলেন বাবা।

তাঁর দায়িত্ব-কর্তব্য আসলে আমার মতো লক্ষ লক্ষ অচেনা মানুষের প্রতি ছিল। তাই নিজের পরিবারের কথা ভাবেনইনি হয়তো। আসলে ব্যাপারটা কি জানো? সূর্যের কাছে গেলে, বা থাকলে তো সূর্যকে সূর্য বলে চেনা যায় না। তাই তোমরাও...

আহুক বললেন।

তা হবে হয়তো। রংকিনী বলল।

নামের কথাতে ফিরি। আমার নামের কোনও মানে আছে কি না তা নিয়ে আমি কখনও মাথা ঘামাইনি। আমি আমারই মতো হতে চেয়েছিলাম, নামের মতো নয়। মা-ও কোনওদিন নামের মানে ব্যাখ্যা করে বলেননি আমাকে। হয়তো রঙ্গিণী করেই গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তা যে হইনি, তাতে মা দুঃখিতই হয়েছেন হয়তো। জানি না। আমার মায়ের মধ্যে একজন সুপ্ত রঙ্গিণী ছিলেন যিনি মাঝে মাঝেই আছেন বলে জানান দিতেন।

বলেই, বাঃ বলে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রংকিনী।

এমন শেষ বিকেল এখানে রোজই আসে। আহুক বললেন। আমি রোজই সকাল হওয়া দেখি পাহাড়ে বসে আর সন্ধে হওয়া দেখি এখানে। আশ্চর্য! কোনও সকালের সঙ্গে কোনও সকালের এবং কোনও সন্ধের সঙ্গে কোনও সন্ধের একটুও মিল নেই। ভাবা যায়?

এটা কি গাছ? দু-রকম গাছ একই সঙ্গে? বাঃ।

হ্যাঁ। প্লান্ট-লাইফএ একেই বলে সিমবায়োসিস। গুর্জন গাছটার দু ডালের সঙ্গমে ফোকর হয়েছিল কখনও একটা। তাতে বছরের পর বছর গ্রীষ্ম-বর্ষাতে বাকল, ঝড়ে-ওড়া ফুল-পাতা, ধুলোবালি-খড়কুটো উড়ে এসে পড়ে পড়ে জমির সৃষ্টি হয়েছিল। তাতে ফ্ল্যামবয়ান্ট গাছের ফুলের

পরাগ বা বীজ কোনও পাখি এনে ফেলেছিল গত বর্ষার আগে। আর দ্যাখো, ফ্ল্যামবয়ান্ট গাছ গজিয়ে গেছে ফোকরে। যখন ফুল ফুটবে কী দারুণ যে দেখাবে।

কি গাছ বললেন?

ফ্ল্যামবয়ান্ট। এই গাছের বীজ আমি এখানে আসার পরই আনিয়েছিলাম সেশ্যেল্‌স দ্বীপপুঞ্জের ভিক্টোরিয়া থেকে। কৃষ্ণচূড়ার চেয়েও অনেক ঝলমলে এরা। সেশ্যেল্‌স এর Endemic গাছ। কিন্তু এখানে কী চমৎকার মানিয়ে নিয়েছে দ্যাখো। যদি আর পাঁচটা বছর থাকি এখানে, তবে পুরো হর্নেটস নেস্টকে ফ্ল্যামবয়ান্টে ভরে দেব। দেশ-বিদেশ থেকে মানুষে এডিবল হোয়াইট-নেস্ট স্যুইফ্‌টলেট পাখির, তাদের বাসা আর ফ্ল্যামবয়ান্ট গাছ দেখতে আসবে। তারপর বললেন, এই গাছকে কিন্তু ফ্ল্যামবয়ান্ট ছাড়া অন্য কোনও নামেই মানাত না। তাই না?

ঠিক তাই।

ওরা এবারের ফিকে-গেরুয়া তটে নেমে এসেছে। কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পরই তটভূমি প্রায় একটি সমকৌণিক বাঁক নিয়ে বাঁ-দিকে ঘুরে গেছে। আর সেই বাঁকের মুখে, পাহাড়ের গায়ে, স্যান্ডস্টোনের একটি চাঙড় তটমুখী একটি প্রস্তরাশ্রয়ের সৃষ্টি করেছে। সেইখানেই সব জিনিসপত্র নামিয়ে রাখতে বললেন আহুক রংকিনীকে। নিজেও নিজের দুহাতের বোঝা নামালেন।

সূর্যটা এবার পশ্চিমের দিগন্তরেখাতে নেমে জলের একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছে। নীলচে কালো জলে নেমে পড়বে এবারে কমলা রঙা একটি অতিকায় নরম বল।

আহুক বললেন, এই সব পরে তো তুমি সাঁতার কাটতে পারবে না। সব খুলে ফ্যালো। এইখান থেকে বাঁদিকের তটভূমি তোমার আর ডানদিকেরটা আমার। আমরা যে যার দিকে থাকলে কেউই কাউকে দেখতে পাব না। এবং দেখার চেষ্টাও করব না। প্রমিস। আকাশ তোমাকে দেখবে, বাতাস, নগ্নিকা তোমার সর্বাঙ্গে চুমু খাবে, সমুদ্রের ফেনা তোমার জঘনে লেস বুনে তোমার লজ্জাহরণ করবে। সূর্য ডুবে যাবার আগে তোমার গ্রীবাতে চুমু খেয়ে বলবে, গুড নাইট ইয়াং লেডি। তারপর চাঁদ, অরমিতা তোমাকে জলের মধ্যে রমণ করবে। ভাবো তো একবার! এমন অভিজ্ঞতা "দ্যা হর্নেটস নেস্ট"-এ না এলে কি হত?

বলেই বলল, ঠিক আছে তাহলে। কিন্তু সাঁতার ভালো জানো তো? নাকি ডুবে-টুবে গিয়ে আমার সর্বনাশ করবে!

জানি। জানি। কত সমুদ্রে সাঁতার কেটে এলাম।

দুর থেকে সব সমুদ্রকেই এক মনে হয়, আসলে তা নয়। প্রত্যেকেরই স্বভাব-চরিত্র আলাদা। সাঁতার কাটলে বেশি ভিতরে যেয়ো না সমুদ্রের। কখনও কখনও আন্ডারকারেন্ট থাকে। নইলে এদিকে ঢেউ প্রায় নেই বললেই চলে। চান করার জন্যে আইডিয়াল। চান করে খুবই আরাম। কাল দিনের বেলা এলে দেখবে কী স্বচ্ছ জল। নিচে নানা-রঙা মাছ সাঁতরে যাচ্ছে, নানা-গড়নের নানা-রঙের প্রবালের মধ্যে মধ্যে। কোনওরকম প্রয়োজন হলেই আমাকে ডেকো। না ডাকলে আমি ওদিকে যাব না। এই নাও তোমার তোয়ালে। ঠিক আছে?

ঠিক আছে।

এই লক্ষণ-গণ্ডি দিয়ে দিলাম। দ্যাখো। বলেই, বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে বালির উপরে একটি লম্বা দাগ কেটে দিলেন আহুক।

রংকিনী চলে গেলে, আহুক সব জিনিসপত্র গোছগাছ করে রাখলেন। ডিশ, কাপ, কাঁটা, চামচ, জলের গ্লাস, জলের বোতল, ওয়াইন গ্লাস, রেড ওয়াইনের বোতল, কাগজের ন্যাপকিন, ভিনিগারে ডোবানো নুন-লংকা-হলুদ-মাখা ম্যাকারেল, আনারস, ফালি-ফালি করে কাটা, একটা বড়ো টেবল-ক্লথ, যাতে করে খাওয়াদাওয়ার পরে সবকিছু উপরে নিয়ে যেতে হবে পরিষ্কার করে তটভূমি থেকে, যাতে তা এমন সুন্দরই থাকে। আগুন, এই প্রস্তরাশ্রয়ের মধ্যেই জ্বালাবে। কাঠ

এখানে এনে রাখাই আছে। ফুরিয়ে গেলেই ভীরাপ্পান নিয়ে এসে রাখে। জ্বালানি কাঠ। কাঠ-পোড়া ছাই ভিতরেই পড়ে থাকে। যেদিন বৃষ্টির সঙ্গে দমকা হাওয়া থাকে, সেদিন ধুয়ে যায় রান্নার জায়গাটা। আগুন জ্বালাবার বা ছাইয়ের কোনও চিহ্ন পর্যন্ত থাকে না। "অর্থ টু আর্থ, অ্যাশেস টু অ্যাশেস, ডাস্ট টু ডাস্ট" হয়ে যায়।

সব গোছগাছ করে নিয়ে আহুক শুয়ে পড়লেন চিত হয়ে। এই আসন্ন সন্ধের সামুদ্রিক শান্তির সবটুকু নিঃশেষে নিংড়ে নিতে চাইলেন নিজের বুকে। এই শান্তি, ধরা থাকবে কাল ভোর অবধি। ভোরে উঠে আবার প্রাণায়াম করবেন।

একা যখন থাকেন তখন জামাকাপড় পরেনই না। বাংলো থেকেই নগ্ন হয়ে আসেন। তোয়ালে একটা আনেন, পেতে শোবার জন্যে, চানের পরে। সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে প্রকৃতিকে গ্রহণ করলে প্রকৃতি নিঃশেষে কিছুমাত্র বাকি না রেখে নিজেকে ধরা দেন। তবে আজ রংকিনী আছে বলেই নগ্ন হবেন না। প্রাণীর মধ্যে মানুষের বেলাই বিধাতা উলটোটা করলেন কেন কে জানে। নগ্ন হলে, নারীর সৌন্দর্য এক ভিন্ন মাত্রা পায়। আর পুরুষকে কুৎসিত দেখায়। অন্তত তাঁর চোখে। নারীরা কোন চোখে পুরুষের নগ্নতা দেখেন তা তাঁরাই বলতে পারবেন। সমস্ত প্রাণী, পাখি, পোকাদের, এমনকী মাছেদের মধ্যেও পুরুষেরাই সুন্দর। শুধু মানুষের বেলাই উলটো। ভারি খারাপ লাগে ভাবলে।

সূর্যটা ডুবে গেছে কিন্তু সমুদ্রপারে এইরকম কলুষহীন আবহাওয়াতে কম করে আরও পনেরো মিনিট আলো থাকবে। জলের উপরে এবং পাশে আলো অনেকক্ষণ বেশি বেঁচে থাকে।

সূর্যটা ডোবার সঙ্গে সঙ্গেই পুবাকাশে চাঁদ উঠল। আর মিনিট দশেক পরে আশ্চর্য সুন্দর এক বিভাতে ভরে যাবে এই সমুদ্রমেখলা তটভূমি ও পাহাড়। তখনই তিনি জলে নামবেন। মিনিট পনেরো সাঁতার কেটে এসে রান্নার জোগাড়যন্ত্র করবেন।

ভাবছিলেন আহুক, কাল সকালেই তো এসেছে রংকিনী অথচ মনে হচ্ছে যেন কত বছর সে আছে "দ্যা হর্নেটস নেস্ট"-এ। এ কথা হয়তো রংকিনীরও মনে হচ্ছে। প্রকৃতির এই জাদু। শহরে যে সখ্য, যে নৈকট্য হতে দশ বছর সময় লাগে তাই এখানে দশ মিনিটে হয়। কেন যে হয়, তা জানেন না আহুক। কিন্তু হয় যে, তা জানেন।

তিনি চান করে যখন তীরের দিকে সাঁতরে আসছেন সেই সময় হঠাৎই যেন রংকিনী চিৎকার করে উঠল মনে হল। এক মুহূর্ত কান খাড়া করে শুনেই তড়িৎ গতিতে নিজের দিক পরিবর্তন করে ফ্রি-স্টাইলে যত জোরে পারেন জলের উপর দিয়ে সেই লক্ষ্মণ-সীমা পেরোলেন।

না, রংকিনী তো গভীর জলে নেই, সে যে আন্ডারকারেন্টে পড়েছে তাও মনে হল না চাঁদের অস্পষ্ট আলোতে কিন্তু মনে হল, ভীষণই ভয় পেয়ে সে তীরের দিকে সাঁতরে আসছিল। পায়ের তলায় বালি পাওয়া মাত্র সে সাঁতার কাটা থামিয়ে হাঁচোড়-পাঁচোড় করে দৌড়ে আসতে গিয়ে আরও দেরি করে ফেলল তীরের দিকে আসতে। আহুক সাঁতরে তার কাছে গিয়ে পৌঁছোলেন এবং পৌঁছোতেই রংকিনী জ্ঞান হারিয়ে তাঁর প্রসারিত হাতের উপরে মূর্ছা গেল। আহুক তাঁকে দু-হাতে বেষ্টন করে তুলে ধরে হেঁটে তীরের দিকে আসতে লাগলেন। তিনি রংকিনীর চেয়ে অনেকই লম্বা যেখানে সে মূর্ছা গেছিল সেখানে আহুকের কোমর জল। হঠাৎ কী একটা আওয়াজ হল যেন পেছনে। রংকিনীকে বুকে ধরে পেছন ফিরে চাইতেই জলের গভীরে একটি কালো ছায়া যেন নড়ে উঠেই সরে গেল গভীরতর জলে। মনে হল। মনে হল, কে যেন, হাসল। হিঃ। হিঃ। হিঃ।।।

ঠিক তিনবার।

কে?

টুনি কি?

রংকিনীকে পিঠের উপরে ফেলে বাঁ হাতে তার ছাড়া জামাকাপড় এবং তোয়ালেটা তুলে নিয়ে সেই স্যান্ড-স্টোনের প্রস্তরাশ্রয়ের সামনে এসে তোয়ালে পেতে ওকে শুইয়ে দিলেন আহুক।

চাঁদের আলোয় রংকিনীকে একটি মসৃণ, পেলব, সুন্দর সিলভার-গ্রে গাছের মতো, নাকি একটি টুনা মাছেরই মতো দেখাচ্ছিল।

রংকিনী ধবধবে ফরসা নয়। তবে তার শরীরের যে যে অংশ আবৃত থাকে সেইসব অংশ তার মুখ এবং হাত ও গলার চেয়ে অনেকই ফরসা। এক উজ্জ্বল আভাতে মার্জিত তার সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। অনেক অনেকই বছর পরে এই গা-ছমছমে নির্জন পাহাড়বেষ্টিত সুমদ্রের তটভূমিতে শুক্লাঅষ্টমীর জ্যোৎস্নাতে ফিকে-গেরুয়া বালিতে শায়ীন নগ্না রংকিনীকে দেখে তাঁর মধ্যে তীব্র কাম ভাবের উদ্রেক হল। তীব্রতর অস্বস্তির মধ্যে বুঝতে পেলেন যে, তিনি এখনও যুবকই আছেন। যে কোনও যুবতীকে শারীরিকভাবে সুখী করার ক্ষমতা তাঁর অবশ্যই আছে। জেনে, পুলকিত হলেন।

শুধুমাত্র পুরুষেরাই জানেন, এমনটা না হলে কত বড়ো হীনম্মন্যতা জাগত তাঁর মনে নিজের সম্বন্ধে।

তার নিজের তোয়ালেটা এনে রংকিনীর গায়ের উপরে মেলে দিলেন, যাতে জ্ঞান ফিরলে সে লজ্জা না পায়। তারপর রংকিনীর পাশে বসে তার দু-হাতের এবং দু-পায়ের পাতা তাঁর নিজের দু-হাতের পাতা দিয়ে ঘষে ঘষে গরম করে দিতে লাগলেন। নাড়ি দেখলেন একবার। স্বাভাবিকের চেয়ে একটু শ্লথ। এছাড়া উদ্‌বেগের কোনও কারণ নেই।

এদিকে তো বড়ো হাঙর নেই। একটা এসেছিল বছর তিনেক আগে গভীর সমুদ্র থেকে। টাইগার শার্ক। নইলে এখানে যে ছোটো ছোটো হাঙর আছে তারা মানুষকে এড়িয়েই চলে এবং প্রায় প্রতিদিনই জেলেদের জালে তাদের প্রজাতির কিছু ধরাও পড়ে এবং বাজারে বিক্রিও হয়। ভয় যে পেয়েছে রংকিনী তাতে কোনওই সন্দেহ নেই। কিন্তু ভয়টা পেল কী দেখে?

আলো যখন ছিল, তখন দেখেছিলেন যে একটা সার্পেন্টি-ইগল-এর পায়ের দাগ জলের পাশ বরাবর ভেজা বালির উপরে উপরে গেছে ওই দিকে, মানে রংকিনী যেদিকে সাঁতার কাটছিল। কোনও সার্পেন্টি ইগলকে তটে নামতে দেখেননি উনি আজ অবধি। কোনও বড়ো সামুদ্রিক সাপকে কি দেখেছিল সে? সেই সাপই কি তাড়া করেছিল রংকিনীকে? না কি কোনও জিন-পরীই নেমে এল জলের মধ্যে রংকিনীর ক্ষতি করার জন্যে 'দ্যা হর্নেটস নেস্ট' থেকে?

এমন এমন সময়ে আহুক ভীরাপ্পানের অভাব খুবই বোধ করেন। বুদ্ধিতে যা কিছুরই ব্যাখ্যা চলে না সেইসব দুরূহ প্রশ্নর জট ভীরাপ্পান এক নিমেষে খুলে জলবৎ-তরলং করে বুঝিয়ে দেয়। সত্যি কথা বলতে কি, ভীরাপ্পান আছে বলেই এই দ্বীপে তিনি একা আছেন অনায়াসে। প্রকৃতিকে তার ভালো-মন্দ এবং অতিপ্রাকৃত ক্রিয়াকলাপ সমেত ভীরাপ্পান যেমন বোঝে তিনি তেমন আদৌ বোঝেন না। কোনও জান্তব নারীরই মতো, জান্তব, সর্বগ্রাসী, ভয়ানক প্রকৃতিকে ভীরাপ্পানের মতো জান্তব এবং প্রকৃতিলালিত ভয়ংকর পুরুষই শুধু বশ করতে পারে।

রংকিনীর ঠোঁট নড়ল দুবার। এবার জ্ঞান ফিরবে মনে হচ্ছে। জ্ঞান ফিরলেই ওকে এক গ্লাস ওয়াইন দেবেন আস্তে আস্তে খেতে। ব্রান্ডি থাকলে ভালো হত। কিন্তু আহুক সমস্ত কু এবং হয়তো সু-অভ্যেসকেই কলকাতাতেই ছেড়ে এসেছেন। "দ্যা হর্নেটস নেস্ট"-এ এসে নিজের জীবনকে একেবারে অন্য মাত্রা দিয়েছেন। এখানে আয়না থাকলে তাঁর হয়তো নিজেকে চিনতে পর্যন্ত কষ্ট হত—যতটুকু তাঁকে আয়নাতে দেখা যেত। আর যেটুকু তিনি আয়নাতে কখনওই প্রতিফলিত হয় না, হত না, সেটুকুকে দেখতে রংকিনীর মতো কোনও নারীর চোখের আয়নার প্রয়োজন হত।

পাছে জ্ঞান আসামাত্রই আহুকের সামনে ওর নগ্নতা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয় রংকিনী, তাই আহুক উঠে লক্ষ্মণের গণ্ডির ওইদিকে চলে গেলেন। একটু পরই গলা শুনলেন রংকিনীর। কোথায়? আপনি কোথায়?

এই তো এখানে। কেমন আছ? ভালো তো এখন?

কোথায় গেছেন। শিগগির আসুন।

আহুক কাছে যেতেই রংকিনী তোয়ালেটা জড়িয়েই আহুকের বুকে এল। খুব জোরে জড়িয়ে ধরল আহুককে। তারপর ঝরঝর করে কাঁদতে লাগল। আহুকের পিঠের উপর দিয়ে রংকিনীর দু-চোখের গরম জল বয়ে যেতে লাগল।

রংকিনী তাঁর পিঠে তার ছোটো ছোটো নরম মুঠি দিয়ে কিল মারতে মারতে বলল, আপনি খারাপ। খারাপ। ভীষণই খারাপ। খারাপ ...

আহুক অস্ফুটে বললেন, জানি তা।

সমুদ্রে জোয়ার লেগেছে। ঢেউয়েদের তটে আসা দ্রুততর হয়েছে। চাঁদে ভাসছে বিশ্বচরাচর। মাথার উপরে কালো, ভুতুড়ে, "দ্যা হর্নেটস নেস্ট" ছায়া ফেলেছে। আন্দামানী প্যাঁচাটা ডাকল গুড়ুম! গুড়ুম! গুড়ুম!।

আহুকের বুকের মধ্যেই কেঁপে উঠল রংকিনী ভয়ে।

খুবই ভালো লাগল আহুকের। পুরুষের চওড়া রোমশ বুকেই তো নারীর চিরকালীন আশ্রয়।

লক্ষণের গণ্ডির ওপাশে একটা একলা স্যান্ড-পাইপার কেঁদে বেড়াচ্ছিল। এ পাখিগুলোকে রাতে দেখা যায় না। সেও বুঝি সঙ্গী খুঁজছে।

রংকিনীর মুখটিকে দু-হাতের পাতাতে ধরে তার দুঠোঁটে দুঠোঁট রেখে আহুক বহু বছর বাদে কোনও নারীকে পরিপূর্ণভাবে চুমু খেলেন। সেই চুমু পরিপূর্ণতর করে ফিরিয়ে দিল রংকিনী।

কেন জানে না, রংকিনী, এই মানুষটার মধ্যে যে তার হারিয়ে যাওয়া বাবাকে কেন খুঁজে পেল। যে-আদর, যে ভালো-ব্যবহার তাঁকে কখনও দেওয়া হয়নি, তাই যেন দেওয়ার জন্যে উদগ্রীব হল ও।

১২

খাওয়া-দাওয়া এবং অনেক আদর খাওয়া এবং করার পরে একটি বড়ো তোয়ালে পেতে ওঁরা দু জনে শুয়েছিলেন। রংকিনী এমনভাবে আহুককে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়েছিল যে মনে হচ্ছিল যে আর ছাড়বে না তাঁকে কখনও।

আহুক জানেন যে, ও অপাপবিদ্ধা যুবতী। তাই জীবনের গতি-প্রকৃতিকে জানে না। মৃত প্রেমিককেও অন্য মানুষে প্রেমিকার বাহুবন্ধন ছিন্ন করে নিয়ে যায়, মৃতবৎসা মায়ের কোল থেকে শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় শ্মশানে আত্মীয়রা। সংসারে সব বাঁধনই খুলে দেবার জন্যেই। সেই মুক্তিই আসল প্রেম। যে মুক্তি রংকিনীর মা দিয়েছিলেন তার লেখক বাবাকে।

রংকিনী ঘুমিয়ে পড়ার পর আহুক উঠে সমুদ্রতটে পায়চারি করছিলেন। সেই বড়ো প্যাঁচারা ডাকল। অত উপর থেকে ডাকা সত্ত্বেও এই সমুদ্রপারের হু-হু হাওয়া আর ঢেউয়ের শব্দ ছাপিয়ে সেই ডাক কানে এল আহুক-এর। একজোড়া আছে। প্রায় প্রতি সন্ধেতেই দাম্পত্যকলহ হয় একপ্রস্থ খুব জোর। তারপরই খুব ভাব। সব দাম্পত্যই একরকম।

কাল কী হবে জানেন না উনি। রংকিনী হয়তো ওঁর সঙ্গে ঘর পাততে চাইবে। কিন্তু তা তো হয় না। ও অনভিজ্ঞা বলেই তো অনেক পোড়-খাওয়া আহুক বোস ওকে ঠকাতে পারেন না। তবু রংকিনীর যখন চুল পেকে যাবে, দাঁত নড়ে যাবে, তখন যদি সে এখানে এসে থাকতে চায় তবে আহুক, যদি তিনি নিজে তখনও বেঁচে থাকেন, বাধা দেবেন না। আজকে ওঁর বয়সে পৌঁছে উনি যা জানেন, তা রংকিনীর বয়সে রংকিনী জানবেই বা কী করে!

ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যৎই জানে। কিন্তু এখন যা হয় না, তা হয় না। জীবন বড়ো আনরোম্যান্টিক। সকলের জীবনই। গল্প-উপন্যাসের কাহিনি খুব কম ক্ষেত্রেই জীবনে সত্যি হয়।

আর হয় না বলেই মানুষ-মানুষি তা এত ভালোবেসে পড়ে, সারা রাত ধরে। কৃষ্ণমূর্তির কোনও লেখাতেই কি পড়েছিলেন আহুক অনেকদিন আগে? মনে পড়ছে না ঠিক :

''If you love something or someone, set it free. If it comes back to you, it is yours!

If it does not,

it was never meant to be!''

চাঁদের আলোটা ক্রমশ জোর হচ্ছে। হাওয়াটাও জোর হচ্ছে। হাওয়াতে 'দ্যা হর্নেটস নেস্ট'-এর হরজাই গাছগাছালির পাখপাখালির বৃষ্টি ভেজা গায়ের গন্ধ ভেসে আসছে।

এবারে রমিতা রংকিনীকে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে যেতে হবে কটেজে। ফুলশয্যার রাত যেমন চিরদিনের নয়, ডাইনি-জ্যোৎস্নাতে আর সমুদ্রের জলে গা-ছমছম করা সিক্ততাতে অভিষিক্ত তটশয্যাও চিরদিনের নয়।

আজ সারা রাত ধরে কী করে শরীরে আর মনে আতর মাখতে হয় তা ওকে শেখাবেন আহুক। যৌবন যে বড়ো সুন্দর সময় এবং বড়োই ক্ষণস্থায়ী তা বোঝাবেন আহুক রংকিনীকে।

✸

পর্ণমোচী

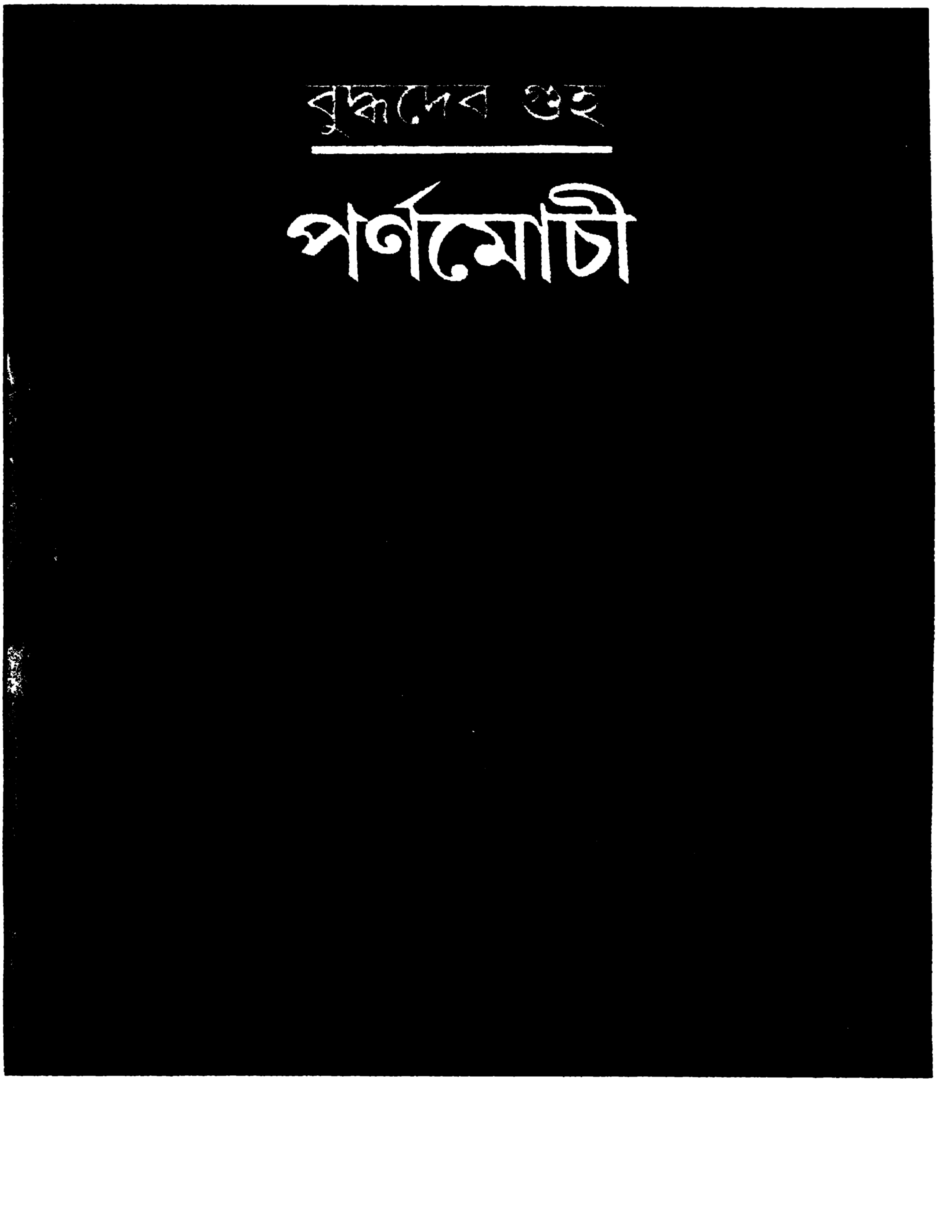

উৎসর্গ

শুভার্থী শুভ্রা বসু,

কল্যাণীয়াসু

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

বুদ্ধ গুহ

দিগন্ত বোস
তেঁতরাপাড়া, য়শপুর,
জেলা কটক, ওড়িশা

দিগন্ত,

আবার ফিরে এলাম এই কেজোমি অথবা পেজোমির দেশ।

এবারে তোমার সঙ্গে অরণ্যবাসে কাটানো ছ'টি দিন এবং সাতটি রাত, বিশ্বাস করো, আমার মনের মধ্যে একটি মরকতমণির টিয়ারার মতো জ্বলজ্বল করছে। সে শুধু আমার কণ্ঠহারই নয়, আমার হারও বটে। এবং তোমার জিত।

যা বললাম, তা কি বুঝলেন আপনি পণ্ডিতমশাই?

সত্যিকথা বলতে কী, আমি এমন গয়না এ-জীবনে আর কখনওই পরিনি।

এ-গয়নার বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, নিরাভরণ এবং নিরাবরণ হয়ে এটি পরে বিছানাতে শুলেও একটুও অস্বস্তি হয় না। সে যে বিলক্ষণ আছে আমার বিভাময় গ্রীবা বেষ্টন করে, দ্যুতিময় দীপ্তিতে আমাকে অনুক্ষণ ধন্য করছে, এই সত্যটি তার অস্তিত্বের পীড়াদায়ক কোনো লক্ষণেরই দ্বারা সে এক মুহূর্তের জন্যেও আমার শরীর অথবা মনকে কন্টকিত করে তো নাই বরং স্নিগ্ধতার প্রলেপ বুলোয় তাতে।

তুমি নিশ্চয়ই এতদিনে তোমার অগণ্য রূপ ও গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে পৌছে আমার মতো এই সামান্য পরবাসীর কথা পুরোপুরিই ভুলে গেছ।

যাও ভুলে। এর জন্যে আমার মনে বিন্দুমাত্রও ক্ষোভ নেই।

আমাদের প্রত্যেকেরই জীবনে কতকিছু স্মৃতি, কত ঘটনা, কত মানুষ প্রতিমুহূর্তেই আসেন, অনেকে কম বা বেশিদিন থেকেও যান; অথচ তাঁদের এবং তাঁদের মধ্যে কতজনকেই কতটুকু ধরে রাখি বা রাখতে চাই আমরা?

ভাগ্যিস রাখি না।

সব কিছুই বা প্রত্যেকেই মনে রাখার বা ধরে রাখার যোগ্যও নয়। তবু যদি কিছু বিনা চেষ্টায় বিনা আয়াসে থেকে যায় মনে, তাহলে বড়োই আহ্লাদ হয়।

তোমার সঙ্গে, তোমার সাহচর্যে কাটানো ওড়িশার দিনক'টির স্মৃতির সঙ্গে, বাঘমুণ্ডা বাংলোর বিধুর, শেষ বিকেলের অস্তগামী সূর্যের দিকে আলতো চালে ভেসে-যাওয়া, গ্লাইডিং-করা সেই এক জোড়া ধূসর-রঙা পাখিরই অনুষঙ্গর তুলনা হয়তো করা চলে।

জানি না, উপমাটা আদৌ তোমার গ্রাহ্য হবে কি না।

আমার বাংলা ভাষাটার চাকচিক্য তো চলে গেছে বহুদিনই, তদুপরি তাতে এমনই মরচে ধরেছে যে, আধুনিকতম লুব্রিকেটিং অয়েল দিয়েও তার ঋতির উন্নতি সাধন হবে না।

অবশ্য বাংলাতে চিঠি লেখার প্রয়োজন তো আর পড়েই না। তাছাড়া, চিঠি লেখার মতো আমার কেউ নেইও তো দেশে। এইসব কারণেই বাংলা লেখার অভ্যেসটাই পুরোপুরি চলে গেছে। সেকারণে লজ্জা করে খুবই। যে-মানুষ মাতৃভাষা ভুলে যায়, সে অমানুষ, তার সব কৃতিত্ব ও প্রাপ্তি সত্ত্বেও। ভাষার ভুলভ্রান্তি নিজগুণে মার্জনা করে নিয়ো।

এর পরে তো একটা সময় আসছে যখন চিঠি আর কেউ লিখবেই না। ফোন, ফ্যাক্স, ই-মেল এ প্রেমিক লিখবে Honey, প্রেমিকা উত্তর দেবে Darling! ফুরিয়ে যাবে প্রেমপত্র।

চিঠির মাধ্যমে আমরা নিজেদের যে-ভাবে খুলতে-মেলতে পারি, তা কি আর অন্য কিছুর মাধ্যমেই পারি! ভাবলেও কষ্ট হয় যে এতদিনের কত মানুষের প্রচেষ্টাতে ভাষার যে উৎকর্ষ সাধিত হল তা কতগুলো Digits-এ পর্যবসিত হবে।

বিজ্ঞানের হাত ধরে আমরা ঠিক কোথায় যে চলেছি তা ভাবার সময় সত্যিই এসেছে।

তাছাড়া, যে সময়টা আমরা এই সব Digital ক্রিয়াকর্ম করে বাঁচাচ্ছি, সেই উদ্বৃত্ত সময় তো আরো টাকা রোজগারের জন্যেই খরচ করছি। করছি না কি? ভেবে দেখো, শুধু টাকাই কি আমাদের সুখী করতে পারে?

তোমরা ওখানে একটা সেমিনারের বন্দোবস্ত করো। আমি সেখানে বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির কুফল প্রসঙ্গে তোমাদের বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে বলব। সময় ও মন কি হবে তোমাদের? জানিয়ো যথেষ্ট আগে।

তুমি তো জানোই যে, এই কেজো বা পেজো দেশে সব কিছুই নিজেকেই করতে হয়। বাঘমুণ্ডার মতো পাণ্ডববর্জিত, প্রায়-পরিত্যক্ত বন-বাংলোতেও ফুটুদাদের দয়া আর চাঁদুবাবু বিমলবাবুর চব্বিশঘণ্টা সজাগ প্রহরাতে আমাদের চারজন সেবক ছিলেন, মনে আছে। এই 'ফিউড্যাল' আরাম-আনন্দ ন্যক্কারজনক অবশ্যই, কিন্তু নির্লজ্জের মতোই বলব, অবশ্যই উপভোগ্য। মুখে পুরো শব্দটি উচ্চারণ করারও প্রয়োজন হত না, "ওরে"-ও বলতে হত না, —"রে" বললেই দু জন মানুষ দৌড়ে আসত; যেন শূন্য থেকেই, আমাদের কি প্রয়োজন তা জানার জন্য।

এটা ভালো না মন্দ, সে প্রসঙ্গ অবান্তর, কিন্তু এটা আরামের অবশ্যই।

যে সব বাঙালি প্রবাসে, মানে সাগর পেরুনো প্রবাসে, বাড়ি, গাড়ি, স্ফীত ব্যাংক ব্যালান্স নিয়ে গর্বে বেঁকে থাকেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই বোধহয় জানেনও না যে আমাদের গরিব দেশে, নিজের দেশে, জন্মভূমিতে অতি সাদামাঠাভাবে বেঁচে থাকার মধ্যেও কত সুখ।

জানো দিগন্ত, মাঝে মাঝে বড়ো ইচ্ছে করে এই "রিলেটিভ" সুখ ব্যাপারটা নিয়ে একটা থিসিস লিখে ফেলি। কিন্তু পৃথিবীর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই কি সুখের ওপরে থিসিস অ্যাকসেপ্ট করে আমাকে ডক্টরেট ডিগ্রি দেবেন? ডক্টর দিগন্ত বোস কী বলেন?

বম্বে থেকে এবারে এসেছিলাম, কে. এল. এম. ডাচ এয়ারলাইনসে। যখন ঘুম ভাঙল, তখন আকাশে সবে আলো ফুটছে। প্লেনটা হল্যান্ডের উপরে। ব্রেকফাস্ট সার্ভ করার বন্দোবস্ত করছে স্টুয়ার্ডেসরা তড়িঘড়ি। তোমার নিশ্চয় মনে আছে, ছেলেবেলায় আমরা আমাদের অক্ষর পরিচয়ের বইয়ে এই হল্যান্ডের গয়লানিদের ছবি দেখতে পেতাম। তখন থেকে হল্যান্ডের গয়লানিদের প্রতি এবং ওদের ডেয়ারি প্রডাক্টস্-এর প্রতি আমার বিশেষ দুর্বলতা। এই প্লেনভর্তি ঝাঁক ঝাঁক ফুটফুটে ডাচ মেয়েদের যখনই দেখি, তখনই বড়ো ঈর্ষা হয়। বিধাতা আমাকে আর কিছুই না দিন, ওদের মতো স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য তো দিতে পারতেন! এই শারীরিক সৌন্দর্য ব্যাপারটা বোধহয় বিধাতার অত্যন্ত একপেশে এবং অত্যন্ত অন্যায় বিচার। এই আশীর্বাদ যাদের ওপর বর্ষিত হয়, তারা অবশ্যই তাদের নিজস্ব কোনো গুণ বা চেষ্টা ব্যতিরেকেই

ভাগ্যবান-ভাগ্যবতী। আমার তো মনে হয়, কোনোরকম গুণরহিত-সৌন্দর্যেরও একটা বিশেষ ভূমিকা, একটা আবেদন আছে সমস্ত পৃথিবীরই কাছে।

রোজই সকালে যদি এমন সব সুন্দর মুখ দেখে ঘুম ভাঙত!

ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে জানলা দিয়ে দেখতে পেলাম প্লেনটি আস্তে আস্তে উচ্চতা কমিয়ে আনছে। কিছুক্ষণ পরই হঠাৎ প্রভাতী হল্যান্ডের একটি টুকরো, তার অগণ্য উইন্ড-মিল, ছোটো-ছোটো খামারবাড়ি, ছোটো-ছোটো ক্যানাল সমেত রোদ-ঝলমল সকালে আমার সমস্ত মস্তিষ্ককে এক সুখানুভূতিতে আচ্ছন্ন করে ফেলল। এবারে চোখে পড়ল অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে রৌদ্রালোকিত "স্কেপোল" এয়ারপোর্ট।

তুমি কি কখনও আমস্টারডামে এসেছ? সে শহরের পাড়া-বিশেষে কাচের বাক্সের মধ্যে সার সার সম্পূর্ণ নগ্না রমণীরা কামুক পুরুষের কদর্য চোখের সামনে পিকিনিজ কুকুর অথবা ব্রাজিলিয়ান ম্যাকাওর মতো অপেক্ষাতে থাকে, কখন কোনো দিশি অথবা ভিনদিশি বাবু তাদের ক'ঘণ্টার জন্য কত মূল্যে কিনবেন।

বছর পাঁচেক আগে একবার স্টেটস থেকে ইয়ারোপ দেখতে এসেছিলাম কসমস-এর ট্যুওর নিয়ে। তখনই সেই বে-পাড়াতে আমাদের ট্যুওরিস্ট বাস ঢুকে পড়ায় ওই দৃশ্য দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ভ্রমণার্থীদের মধ্যে অধিকাংশই পুরুষ। এসব না দেখলে তো তাদের পয়সাই 'উশুল' হবে না। অগত্যা আমাদেরও যেতে হয়েছিল। বাস থেকে নামিনি যদিও।

সত্যি! এই পাশ্চাত্য দেশগুলির অগ্রগতির প্রকৃতি সম্বন্ধে আমার মনে প্রায়ই নানারকম জিজ্ঞাসা জাগে।

যে কথা বলার জন্যে এ চিঠি লিখতে বসেছিলাম, এবারে তাই বলি। আসলে অনেক এলোমেলো কথাই বলা হল। মাঝে মাঝে হয়তো সব মানুষকেই কথাতে পায়, অত্যন্ত স্বল্পবাক মানুষকেও। দেশ থেকে এই পরবাসে ফিরে আমাকেও বোধহয় আজ কথাতে পেয়েছে। মিথ্যে বলব না, আমার মাথার মধ্যে যা কিছুই সুরক্ষিত ছিল অতি সযতনে এবং অত্যন্ত শৃঙ্খলারও সঙ্গে, সেই সমস্ত ভাবনাগুলি বাক্সবন্দি করে, সেলোটেপ লাগিয়ে, তার ওপরে ন্যাপথলিন রেখে সুন্দর করে সারিবদ্ধভাবে গুছিয়ে রেখেছিলাম তার সমস্তই লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল, তোমার সঙ্গে বহুদিন পরে দেখা হয়ে।

দিগন্ত তো দূরেই থাকে। তুমি তো দূরেই ছিলে। ন'বছর বয়সের পরে আর দেখা হয়নি তোমার সঙ্গে। কী জানি। কোন দৈব-দুর্বিপাকে এতদিন পরে হঠাৎ দেখা হল। এই দীর্ঘ ব্যবধানে আমাদের পৃথিবীও যে আলাদা আলাদা হয়ে গেছে। নাকি বলব, গ্রহ? দিগন্তও আলাদা আলাদা। ভাবছি, এখন একা হাতে এই অবিন্যস্ত চিন্তা-ভাবনা ধ্যান-ধারণাকে কি করে যে গুছিয়ে তুলি। কারো ঢাকনা গেছে খুলে, কারো পেট গেছে ফেঁসে, কারো মধ্যে থেকে কঠিন, তরল অথবা বায়বীয় উপাদানগুলি বেরিয়ে পড়ে আমাকে বেদম অবস্থায় এনে ফেলেছে। আমি সত্যিই জানি না এখন আমি কি করব।

তুমি মানুষটা কিন্তু বড়ো খারাপ। ভীষণ, ভীষণ, ভীষণই খারাপ।

এয়ারপোর্টে নেমে ক'মাইল যে যেতে হল অন্য টার্মিনালে পৌছোতে। ঠিক শুধু হেঁটেই নয়, এসক্যালেটারে উঠে-নেমে চললাম। পথের উপরে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে কতবার যে ডানদিকে, কতবার যে বাঁদিকে, কতবার যে উপরে নিচে, দিকচিহ্ন দেখে, যেতে আসতে হল যে, সে বলার নয়। এই কারণে বিদেশের ব্যাপার-স্যাপার আমার আদৌ ভালো লাগে না।

মনে পড়ে শিশুকালে বা বাল্যবয়সে যেখানে-সেখানে প্লেনে চড়ে গেছি আমার বাবার সঙ্গে আমাদের দেশে তখন সেইসব মোনো এঞ্জিন অথবা বাই-এঞ্জিনের প্লেনগুলি যখন ছোট্ট

এয়ারপোর্টে বা এয়ারস্ট্রিপে নামত, যখন সাদাকালো ডোরাকাটা অতিকায় বেলুনের মতো কাপড়ের লম্বাটে বেলুন উড়ত উঁচু মাস্তুলের মাথা থেকে, ল্যান্ডিং করা বা টেক-অফফ্ করা পাইলটকে হাওয়ার হদিস দেওয়ার জন্যে। যখন প্লেনের শব্দে এয়ারস্ট্রিপে নির্বিকারে চরে বেড়ানো গোরু-ছাগল হঠাৎই ঘাবড়ে গিয়ে হাম্বা অথবা ব্যাঁ ব্যাঁ করে ল্যাজ তুলে চলে যেত এদিক ওদিকে তখন মনে হত যে আমাদের চিরপ্রিয় জন্মভূমির চিরাবাসে যেন আমি পুষ্পক রথে চড়েই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় এসে নামলাম।

আশ্চর্য! বলো দিগন্ত, ভাবলেই শিহরিত হই যে, আমাদের শিশুকালে এবং শৈশবে কত না আনন্দ ছিল জীবনে। কত না পুলক, সহজে খুশি হওয়ার কত না ক্ষমতা। অথচ এই অল্প ক'টা বছরের মধ্যেই আমাদের সময়টা কত বদলে গেল বলো তো।

কাল রাতে দোতলার মাস্টার-বেডরুমে একা বিছানাতে শুয়ে বাঘ্‌মুণ্ডার দিনরাতের কথা ভাবছিলাম। আমার বাথরুমের ছাদটা ফাইবার গ্লাসের। বাথরুমের দরজা খোলা রেখেছিলাম। ঘরের সব জানালাও খোলা ছিল। চাঁদের আলোতে ভেসে বাঘ্‌মুণ্ডার অমাবস্যার রাতের তারা-ভরা আকাশের কথা মনে পড়ছিল। তুমি বসেছিলে বারান্দাতে আমার পাশে। তারা চেনাচ্ছিলে। হাতিগির্জা পাহাড়ের দিক থেকে হাতির বৃংহণ শোনা যাচ্ছিল। তুমি বলেছিলে, ওরা পুরুনাকোটের দিকে যাচ্ছে।

আমি ভাবছিলাম রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটির কথা, "রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।" কি যেন নাম ছিল কবিতাটির? "হঠাৎ দেখা?" "রেলগাড়ির কামরায় হঠাৎ দেখা"র প্রথম পংক্তি।

জানো দিগন্ত, যে যাই বলুক, রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই "ক্লিশে" হবেন না। যে বাঙালিরা রবীন্দ্রনাথকে পড়ল না, জানল না, তা তাঁরা কবি, লেখক, গায়ক যাই হোন না কেন, তাঁরা মূর্খ। হয়তো অশিক্ষিতও। তাঁদের প্রতি আমার অনুকম্পা ছাড়া কিছুই নেই।

মনে পড়ছিল, তুমি বলেছিলে আমাকে বাঘ্‌মুণ্ডা বাংলোর বারান্দায় বসে যে, চেয়ে দ্যাখো ওই পাখি দুটি হাওয়ায় গ্লাইডিং করে কেমন ভেসে যাচ্ছে, যেন ডুবন্ত সূর্যকে ধাওয়া করে, সূর্যের লাল গোলকের মধ্যে সেঁধিয়ে যাবে বলে। আমারও খুব ইচ্ছে করে অমন করে কোনোদিন ফেড-আউট করে যেতে।

গোধূলিবেলায় উচ্চারিত তোমার সেই বাক্যটি আমার মনের ঘোরের কফিনে যেন পেরেক গেঁথে দিল।

বড়ো ভালো বলেছিলে বাক্যটি।

স্কেপোলে প্লেন বদলে বস্টনে এসে পৌঁছোলাম। সেখান থেকে বাড়ি এলাম ক্যাব নিয়ে। অবশ্য বাড়িতে ফেরার আগে আমার প্রতিবেশী হীরকদা আর রীতাদিকে বলে রেখেছিলাম। বাড়ির চাবিও ছিল, ওঁদেরই কাছে। বাগানের বারান্দার কার্পেটের নিচে চাবিটা রেখে গেছিলেন ওঁরা। আমি পৌঁছোবার আগের দুদিনে ওঁরা মেইড ডাকিয়ে বাড়ি ঝাড়পোঁছ করে, ফ্রিজে খাবার-দাবার ইত্যাদি কিনে রেখে, সব ঘরের কার্পেট পরিষ্কার করিয়ে, বাগানের এবং লনের ঝরাপাতা কাঠকুটো পরিষ্কার করিয়ে, ড্রাইভওয়ের নুড়ি বিন্যস্ত করে, দুপাশের ছোটো ফুলগাছের বাগান ধুয়ে-মুছে চকচকে করে আমার অনেক খাটনি বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। এত কিছু করার পরও, তবুও সামনের পর পর দুটি উইক-এন্ড আমার ঘরবাড়ি, জামাকাপড়, বাসনপত্র, বাড়ি ইত্যাদি, ইত্যাদি বিন্যস্ত করতেই যাবে।

ভরসা এই যে, তাদের বিন্যস্ত, কিছু পরিশ্রমে অবশ্যই করতে পারব, কিন্তু ভয় বা ভাবনা এই যে, আমাকে কে বিন্যস্ত করবে?

আমি যে শরীরে-মনে পুরোপুরি অবিন্যস্ত হয়েই ফিরে এলাম এবারে।
দিগন্ত, তুমি খারাপ। তুমি ভীষণ, ভীষণ, ভীষণই খারাপ।
ভালো থেকো।

ইতি—

তোমার ছেলেবেলার
হারিয়ে যাওয়া সখী
ইন্দি

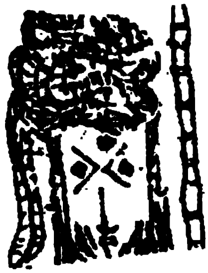

ইন্দি সেন,
মার্লবোরো, ম্যাস; ইউ.এস.এ

যশপুর
জিলা : কটক
ওড়িশা

ইন্দি,
কল্যাণীয়াসু,

কলেজ থেকে ফিরে আমার প্রথম কাজ ডাকবাক্সে হাত ঢোকানো। আজ হাত ঢোকাতেই তোমার চিঠি হাতে এল। সঙ্গে আরো অনেক চিঠি ছিল কিন্তু তোমার চিঠি বলেই সবচেয়ে আগে সে চিঠিটি খুললাম।

বাঘমুণ্ডার দিনগুলির কথা এখন সত্যিই স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। তুমি দেশ ছেড়ে চলেও গেছ প্রায় দিন কুড়ি হল। সত্যি। কী করে সময় যায়। কী করে জীবন শেষ হয়ে যায়। তারাশঙ্করের 'কবি'র সেই গান ছিল না? "ভালোবেসে সুখ মিটিল না হায় এ জীবনে, এ জীবন এত ছোটো কেনে।" গানের বাণীতে হয়তো ভুলভাল হল। তবে এ কথা সত্যিই যে বড়ো ছোটো এই জীবন আমাদের।

তোমার চিঠি এক নিশ্বাসে পড়লাম। এক কথায় বললে বলতে হয়, আপ্লুত হলাম। এতদিন বিদেশে থেকেও তুমি যে এখনও "সভ্য" এবং "উচ্চশিক্ষিত" এবং এন. আর. আই. হয়ে ওঠার প্রমাণ হিসেবে বাংলা ভাষাটা ভুলে গিয়ে "জাতে" ওঠোনি এ জেনে বড়ো আনন্দ হল।

বলতে গেলে আমারও তোমারই মতো অবস্থা। কিন্তু সে কথাটা স্বীকার করাটা কি সপ্রতিভতা বা পুরুষোচিত কাজ হবে? "পৌরুষ"-এর স্বাভাবিক হবার পথে এখনও যে কত বাধা। "সহজ হবি, সহজ হবি" কথাটা বোধহয় রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র বাঙালি পুরুষদের উদ্দেশেই লিখেছিলেন। আমার ভাগ্যেও যে এমন দেবদুর্লভ সুখের অথবা দুখের ঘটনা ঘটবে, এটা সত্যি বলছি, আমার ভাবনারও অতীত ছিল।

আজ অবধি কত মহিলার সঙ্গেই দেখা হল; মেশা হল। জানা হল, কারোকে কারোকে খুব কাছ থেকেও। কাজ করতে হল অগণ্য মহিলার সঙ্গে, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিন্তু একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে তোমার মতো এফিমিনেট ফেমিনিন জেন্ডার-এর প্রাণী এর আগে দেখিনি। আমার শয়নে স্বপনে জাগরণে এখন শুধুই ইন্দির ঠাকরুণ বিরাজ করছেন। অথবা ইন্দিরা।

ছেলেবেলায় তোমার নামটা অবাক করত আমাকে কিন্তু ইন্দি মানে যে লক্ষ্মী তা কিন্তু জানতাম না। শুধু আমি কেন, অনেকেই হয়তো জানেন না। ভারি সুন্দর নামটি তোমার। দারুণ সপ্রতিভ। তোমারই মতো। তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে মনে হল যেন আমার শরীর-মনের একটা নতুন দিগন্ত খুলে গেল।

রোজই সকালে উঠে জানালা খুলি, জানালা দিয়ে গাছপালা, পাখি, দূরের কাটজুরি নদী চোখে পড়ে। দিগন্ত অবশ্যই আছে, ছিল এবং থাকবে আমার জানালার কাছে, যেমন দিগন্ত থাকে, প্রত্যেকেরই জানালার কাছে, অথবা দূরে। কিন্তু যে-দিগন্তকে তুমি খুলে দিলে, অদ্যাবধি-রুদ্ধ এই দিগন্তের মধ্যে সেই দিগন্তও যে ছিল এই সত্যটাই জানা ছিল না আমার।

তুমি তো বাঘ্মুণ্ডা থেকে সোজা জিপে করে কটকে এসে কলকাতায় ফিরে গেলে। আমার কাজ ছিল একটু ঢেনকানল-এ। কটকে ফিরে যাবার সময়ে ঢেনকানল-এর বড়ো রাস্তার উপরের ছোট্ট বাড়িটিকে কি কেউ তোমাকে দেখিয়েছিল? ফুটুদা বা চাঁদুবাবু? যে বাড়িতে অন্নদাশংকর রায়ের জন্ম? তুমি কি ওঁর কোনো ওড়িয়া লেখা পড়েছ? আমি পড়েছি। আশা করি বাংলারই মতো ওড়িয়া ভাষাটার চর্চাও তুমি রেখেছ।

এখানে ফিরেছিলাম রাত্রিবেলা। পরদিনে সকালে ঘুম থেকে উঠে যখন আমি পুবের জানলাগুলি খুলে দিলাম তখনই যেন জীবনে প্রথমবার দিগন্তকে আবিষ্কার করলাম। অথচ আমিই দিগন্ত। দিগন্তের দিকে হেঁটে যাওয়া এক দিগন্তের মধ্যে যে কত দিগন্তই থাকে লীন হয়ে। প্রত্যেকের জীবনেরই অমোঘ ভাগ্যলিপি এই অনবধানে হেঁটে যাওয়া।

এখুনি তোমার চিঠির জবাব দিতে বসেছি এজন্য যে কালই সকালে আমার কলিগ প্রযত কলকাতায় যাচ্চে। তার হাতে এই চিঠির যে স্পেশাল ডাকবাক্স আছে সেখানে নিজের হাতে ফেলে দেবে। তাতে হয়তো চিঠিটা তোমার কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছোবে।

এবারে বাঘ্মুণ্ডা থেকে ফিরে আসার পর থেকে আমি ক্রমাগতই ভাবছি যে, চাকরিটা ছেড়ে দেব, যদিও আমার জীবিকা সম্বন্ধে আমি একটুও বীতশ্রদ্ধ নই। যে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা আমি আমার ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে পেয়েছি, সেই স্বতঃস্ফূর্ত দাবির মোহ ত্যাগ করে যাওয়া বড়ো সোজা কথা নয়। তবে সেই সঙ্গে ভারাক্রান্ত মনে এও বলব, ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে যা পেয়েছি তার সিকি ভাগও পাইনি সহকর্মীদের কাছ থেকে। এ কথা ভাবলে এক ধরনের গ্লানি বোধ করি। যে গ্লানির একাংশও আমাজনিত কারণে উৎসারিত নয়। হয়তো দোষটা আমারই। দোষ যারই হোক, ঘটনাটা অন্যরকম হলে বড়োই আনন্দের হত।

চাকরি ছেড়ে দিয়ে, সিরিয়াসলি ভাবছি, আমর এই সুন্দর দেশের বিভিন্ন বন-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বেড়াব। আমাদের নানা আদিবাসীদের সম্বন্ধে গভীরভাবে পড়াশোনা করব। তাদের সঙ্গে মিশে, তাদের ভালবেসে, তাদের জানব তাদের কাছে থেকে, তাদেরই একজন হয়ে।

তারপর তাদের নিয়ে লেখালিখি করার ইচ্ছে আছে। ফাদার হফ্‌ফম্যান, আই. সি. এস. ওমালি, ভেরিয়ার এলউইন, ফাদার পি পনেট এবং আরও কত বিদেশিদের কাছে আমাদের যা ঋণ, তা শোধ করতে না পারি স্বীকার করার আন্তরিক চেষ্টা করব, এও ইচ্ছা আছে। আশ্চর্য! আমার বিষয় সোশ্যাল-সায়েন্স কোনোদিনও ছিল না, অ্যানথ্রোপলজিও ছিল না। বাংলা সাহিত্যও ছিল না। আমি অর্থনীতির ছাত্র ছিলাম। পড়াইও অর্থনীতিই। অথচ আমার এইসব উপরিলিখিত বিষয়ে উৎসাহ, এতটুকুও কম নয়। এত কিছু সম্বন্ধে জীবনে উৎসাহ ছিল বলেই হয়তো জীবনে তোমার মতো সফল হতে পারলাম না। মাসে পাঁচ লাখ টাকা মাইনের চাকরি করতে পারলাম না বিদেশে গিয়ে। তবে একথা অবশ্যই বলব যে, বিদেশে আমি কখনওই থাকতে চাইনি, এবং অর্থের লোভও আমার ছিল না। আমাকে ভুল বুঝো না। তোমাকে আমি ঈর্ষা করি না। ঈর্ষা আমি কারোকেই করি না।

আসলে ঈর্ষা করতে পারি এমন কারুকে দেখছিই না সমসময়ে। দেখলে, খুশি হতাম। এই STATEMENT OF FACT-এ একটু গর্ব মেশা থাকলেও আমার কিছু করার নেই। দিগন্ত বোসও ঈর্ষা করতে পারে এমন পুরুষমানুষ তো সমসময়ের বাঙালিদের মধ্যে দেখলাম না।

গর্ব যেখানে ন্যায্য সেখানে তার প্রকাশ লজ্জার নয়, তা আত্মবিশ্বাসেরই প্রতীক বলে আমার মনে হয়। তাছাড়া শুনেছি যে, প্রত্যেক ঋদ্ধিমান মানুষেরই গর্ব থাকাটা স্বাভাবিক।

আমি একা মানুষ, আমার সংসার নেই। অর্থের বেশি প্রয়োজন নেই। এবং পূর্বপুরুষের যা কিছু সঞ্চয় আছে তা নিয়ে এবং আমার এ যাবৎ স্বোপার্জিত যতটুকু সামান্য সঞ্চিত ধন আছে তা নিয়েও সাদামাঠাভাবে আমার বাকি জীবন চলে যাবে বলেই মনে করি।

চাকরি তো ছেড়ে দেব কিন্তু তারপরে কোথায় যাব, কি করব তার কোনো স্পষ্ট ধারণা এখনও পর্যন্ত আমার নেই। তবে ইচ্ছে আছে মধ্যপ্রদেশে আচানকমার অভয়ারণ্যের আদিবাসীদের নিয়ে প্রথমে কাজ করার। সেখানে গিয়ে লাগাতার থাকতে না পারি, বারে বারে যাব আসব। গোন্দ আর বাইগা এই দুই আদিবাসীদের সম্বন্ধে আমার অত্যন্ত উৎসাহ আছে। যেমন আছে, মুণ্ডা, ওরাওঁ, সাঁওতাল, খন্দ, পান্ধী, শবর, ভিল, মেচ এবং আরো অনেক উপজাতি সম্বন্ধে। এঁদের দেখে, এঁদের নিয়ে যদি কিছু লিখতে পারি তাহলে হয়তো ভবিষ্যতের ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবে, স্বদেশীয়রা স্বদেশীয়দের কাছে আসবে। যদিও আমার এই সাধু প্রচেষ্টার পথে অনেকই বাধা আসবে, তবে আমার বিশ্বাস আছে যে ধীরে ধীরে ভারতের "অখণ্ডতা" শুধুমাত্র একটি স্লোগান থেকে বাস্তবে রূপায়িত হবে।

ভালোবাসা ছাড়া তা সম্ভব নয়, ভালোবাসা ছাড়া কোনোমতেই সম্ভব নয়। ভারতবর্ষ হয়তো অনেক খণ্ডে ভাগ হবে কিন্তু তাতে অখণ্ডতাই দীপ্তি পাবে। যৌথ পরিবারে থেকে মনকষাকষি আর ট্যারা কথা বলার চেয়ে আলাদা আলাদা থাকলে ভাব-ভালবাসা অনেক সহজে বজায় রাখা যায় আজকের প্রেক্ষিতে। পারিবারিক জীবনে যা সত্যি রাষ্ট্রিক জীবনেও তা সামান সত্যি। ভালোবাসা আর সহমর্মিতাকে বাঁচিয়ে রাখাটাই বড়ো কথা।

আমার ওই সাধে সবচেয়ে বড়ো ধাক্কা তো আসবে কাজটা শেষ হওয়ার পরে। বই যখন বেরোবে। আপমানিত আমাকে হতেই হবে। আগেও যেমন বারংবার হতে হয়েছে. আমাদের দেশে শিক্ষা, সাহিত্য সংস্কৃতি এবং সংগীতও এক বিশেষ চক্র নিয়ন্ত্রণ করে। যদিও তাদের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এবং অনেক সময়ে স্বার্থজড়িত ক্রিয়াকাণ্ডের কোনো স্থায়ী প্রভাব ছাত্র, পাঠক এবং শ্রোতাদের উপরে আদৌ পড়ে না।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, চক্রান্তের শিকার হতে হলে, হবে। কোনো বৈরিতাকেই আমি পরোয়া করি না। অগণ্য শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে চমৎকার বেঁচে এসেছি এবং যে ক'দিন আরও বাঁচি, চমৎকারই যে বাঁচব সে বিষয়ে আমার নিজের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

এই চিঠিটি বড়ো বিজনেস-লাইক হয়ে গেল এবং বাঘ্মুণ্ডায় কাটানো দিনগুলি-রাতগুলির যে স্নিগ্ধ, সুন্দর স্মৃতির আশ্লেষ তোমাকে-আমাকে ঘিরে ছিল, তা হয়তো এই নীরস কচকচানিতে কিছুটা আবিল হল। এবারের মতো আমাকে ক্ষমা কোরো। ভবিষ্যতে তোমাকে সুন্দর সব চিঠি লিখব, দেখো। মনের এবং বনের গভীর থেকে।

এই প্রতিশ্রুতির সঙ্গে এই চিঠি শেষ করলাম।

ভালো থেকো—

—ইতি দিগন্ত

অধ্যায় দুই

চিরন্তন চ্যাটার্জি
আশুতোষ চৌধুরি অ্যাভিন্যু
কলকাতা-৭০০ ০১৯
পশ্চিমবঙ্গ

ওরে শালা!
দিগা পাঁড়ে,

তোর তো দেখছি খুবই পায়াভারি হয়েছে!

ন্যাঙটিয়া দোস্তদেরও খবর রাখিস না আজকাল। শেষবার ফোন করেছিলি সম্ভবত বছর দুই আগে। জানি না, এখনও ওই ঠিকানাতেই আছিস না অন্যত্র চলে গেছিস। ঋক বলল, আছিস। তাই।

চিঠিই লিখলাম। কারণ, যা বাজার পড়েছে তাতে দিন-গুজরান করাই মুশকিল। এস.টি.ডি. করার সামর্থ্য নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের "হাকিমি" করেও সেই বিলাসিতা করতে পারি না। জানি না রে, আর কতদিন এই সততার "বুঁদির কেল্লা" রক্ষা করতে পারব। ভারি ভয় হয়। বড়ো ভয়ের দিন এখন। আগুনের হলকা বইছে সবসময়েই।

যাকগে। আমার কথা থাক। তোকে একটা জরুরি খবর দেবার জন্যেই এই চিঠি। পয়লা এপ্রিল পি.বি-র সত্তর বছর হচ্ছে। সৌম্য, ঋক, কাশ, জলপিপি, ঋতা এবং আমাদের ব্যাচের অন্যান্যরা যারা কলকাতাতেই আছি, ঠিক করেছি, স্যারকে অবাক করে দিয়ে ওঁর সত্তর বছরের জন্মদিন সকলে মিলে আমরা, এখনকার ছেলেরা যাকে বলে "ঝিং-চ্যাক" করে, তেমন করে সেলিব্রেট করব। ওঁকে একটা যোগ্য উপহারও দিতে হবে চাঁদা তুলে।

ব্যাপারটা কিন্তু পুরোপুরি সিক্রেট রাখতে হবে।

সৌম্য বলছিল যে, ক্যালকাটা ক্লাবে দারুণ করে বন্দোবস্ত করবে। কিন্তু স্যার কি সেখানে যাবেন? গন্ধ পেলেই তো পালাবেন।

ঋক এখন বিরাট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। সে বলছে, 'তাজ বেঙ্গলে' রাজীব গুজরালকে বলে বন্দোবস্ত করবে। কিন্তু পি. বি. তো সে চত্বরেই ঢুকবেন না। কী যে করা যায়! তোর বুদ্ধি ও সাহায্য দরকার। অবিলম্বে তুই সৌম্য ও ঋক-এর সঙ্গে যোগাযোগ করিস ফোনে। পিপির সঙ্গেও। আমাকেও করতে পারিস। তবে আমাকে কখন পাবি তার ঠিক নেই। না পেলে, ভ্রমরকে মেসেজ দিস। আমার এখানেই উঠিস কিন্তু কলকাতাতে এলে।

আমাদের ব্যাচের প্রত্যেকেই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে যতটুকু হয়েছি তার পেছনে পি.বি-র অবদান অসামান্য। প্রফেসর তো কতই ছিলেন। যে সব মাস্টারমশাই শুধুমাত্র পড়িয়েই তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করেন না, যাঁরা ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যেকের বুকের ভিতরের ধ্যান-ধারণা জ্ঞান-গম্যির এঞ্জিনকে সুপথে চালিত করেন; তেমন মাস্টারমশায়দের প্রজন্ম প্রায় শেষই হয়ে এল।

আমরা যা হয়েছি, তা পি.বি-র যতটুকু প্রত্যাশা ছিল, সেই তুলনাতে কিছুমাত্রও নয় যদিও, তবে যতটুকু হয়েছি, সেটুকুও পি.বি-র "গাধা ঠেঙিয়ে ঘোড়া করার" নিরলস চেষ্টা ছাড়া সম্ভব হয়তো আদৌ ছিল না। তবে, তোর কথা আলাদা। তুই গোড়া থেকেই ঘোড়া ছিলি, পি.বি-রই মতে "ওয়েলারের বাচ্চা।"

কেমন আছিস? বিয়ে-থা কি করবি না? আমাদের মধ্যে করিৎকর্মা যারা, তাদের কারো তো ঠাকুরদা হবারও সময় হয়ে এল। আর কতদিন রমণীমোহন হয়ে রমণীরমণ করে দিনযাপন করে যাবি রে শালা?

ভ্রমর বলছে, তোকে লিখতে যে, ও তোর ডেঞ্জারাস ব্যাচেলর সঙ্গতে থাকতে চায় দিন সাতেক। তাও আবার বনে, নয় নির্জনে, আমার সঙ্গর নিদারুণ একঘেয়েমি এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমার সামর্থ্যর লজ্জাকর ঘাটতির গ্লানি মুছে আসতে। ওর লোকভয় নেই। আমারও নেই। আর তোর তো নেই-ই!

অতএব বাধা কিসের?

মাঝে মাঝে চিঠি দিস।

—ইতি তোর কুচো চিংড়ি।

পুনশ্চ : ভ্রমর কিন্তু সিরিয়াস, তোর কাছে যাওয়ার ব্যাপারে। আমার ওকে ছেড়ে দিতে, একটুও ভয় নেই। ইচ্ছে করলে সে বাকি জীবনের পুরোটাই তোর কাছেই থাকতে পারে। তবে, তুই ধরে রাখতে পারবি কিনা ভেবে দেখিস। সকলেই তো 'ভগীরথ' নন যে গঙ্গা অবতীর্ণ হলেই তাঁকে ধরে রাখার ক্ষমতা রাখেন। তুই নিজে ভেসে গেলে, পরে আমাকে দোষ দিস না। আর ভ্রমর নিজে যদি ভেসে যায়, ফেঁসে যায়, আমি তো বেঁচেই যাই।

ভ্রমর নিজেও তোকে লিখবে পরে।

অধ্যাপক দিগন্ত বোস
যশপুর, জেলা : কটক, ওড়িশা।

মার্লবোরো
ম্যাসাচুসেটস
ইউ.এস.এ

দূরের দিগন্ত,

তোমার চিঠি গত সোমবারে পেয়েছি।

সারাটা সপ্তাহই তো দৌড়, দৌড়, দৌড়। প্রতি শুক্রবার রাতে নামলেই মনে হয়, আমারও অবকাশ নামক কিছু আছে। কিন্তু সেটাও তো একটা MISNOMER।

অবকাশও তো কাজেই ভরা। সেসব কাজগুলো অবশ্যকর্তব্য। কয়েকটি জানালার ব্লাইন্ডস খারাপ হয়ে গেছে। নতুন ব্লাইন্ডস কিনে এনেছি। আগামীকাল নিজেকেই লাগাতে হবে।

স্বাবলম্বন ব্যাপারটা অবশ্যই ভালো। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় তার একটা সীমা টানা গেলে হয়তো ভালোতর হত।

শনিবার, মানে, কাল রাতে আমার অফিসের কলিগ হবসন আমাকে ডিনারে নিয়ে যাবে। এই নিয়ে তিনবার হল। প্রতিবারেই রাতে বাড়িতে নামায় যখন, তখন দরজা অবধি আসে। চোখমুখের ভাবখানা, এমনই আহ্লাদে হয়; যেন, "একবার সাধিলেই বিছানায় যাইব"।

কিন্তু আমি তার ঠোঁটে নয়, গালে, জম্পেশ করে একটি থুথু-মাখা চুমু দিয়ে 'গুডনাইট' করে, বিদায় দিই। জানি, এমন করাটা আমার পক্ষে নিষ্ঠুরতা হচ্ছে কিন্তু আমি তো ওকে ডেট করতে চাইনি, ওই-ই ঝুলোঝুলি করে "ডেট" করেছে আমাকে, তার একারই তুমুল আগ্রহে।

আমি 'ধোওয়া তুলসীপাতা' নই। বর্তমান সময়ে অমন "শুচিবাই" বা "বারণ" নিয়ে জীবনে যাঁরা বাঁচেন তাঁর যে ভণ্ড এমন কথা আমি বলব না কিন্তু অবশ্যই বলব যে, তাঁরা হয়তো ঠিক করবে না। বাঁচার জন্যে এত কষ্ট করার দরকারটাই বা কি? চারদিকে দেওয়াল তুলে, ছাদ তুলে, রুদ্ধশ্বাস, অসূর্যম্পশ্যা হয়ে কি বেঁচে থাকা যায়? একদিন হয়তো সম্ভব ছিল, আজ আর নয়।

অথচ মন-বিবর্জিত শরীরী সম্পর্কেও যে আমার কোনোদিনই বিশ্বাস ছিল না। পারি না আমি। কিছুতেই পারি না। স্বয়ং কন্দর্প বা মদনদেব অনুরোধ করলেও পারতাম না। অথচ হবসনকে আমার অফিসের তো বটেই, বাইরেরও অগণ্য মেয়ে পছন্দ করে। ও কী চায়, তা আমি বুঝতে পারি। ও যে "ইরেজিস্টিবল", কোনো মেয়ের পক্ষেই যে ওকে 'না' বলা সম্ভব নয়, এই কথাটাই ও ওর মেল-শোভিনিজম-এ পুনঃপ্রমাণিত করতে চায়। নমনীয়, শ্যামলিম, বর্ষা-স্নাত প্রকৃতির মধ্যে বড়ো হয়ে ওঠা একটি ভারতীয়, বাঙালি মেয়েকে শারীরিকভাবে পেয়ে ও নিজের গর্ব বাড়াতে, এবং ওর "জয় করা বিশ্ব"র এলাকা বিস্তৃত করতে চায়। কিন্তু আমি ওর মাথার টুপির উপরে লাগানো অগণ্য কর্বুর পালকের মধ্যে আর একটি নতুন পালক হতে যাব কী জন্যে? তাছাড়া আমার যা-কিছু নরম, কোমল, বহুবর্ণ সব লজ্জারাঙা পালক ছিল, রোম-অনুরোম— সবই তো এবার দেশে গিয়ে এক পাখিকে দিয়ে রিক্ত হয়ে এসেছি। অন্যকে দেবার মতো কিছুই যে আর বাকি নেই আমার!

এতদিন স্টেটস-এ আছি অথচ এদেশীয় একজন পুরুষকেও তেমন করে ভালো লাগল না কেন বলো তো? ভাগ্যিস লাগেনি। ভারতীয়দের মধ্যেও নয়।

ভারতীয় মানে, বিচার করলে, বলতে হয় যে, বেশিদিন প্রবাসে থাকলেই অধিকাংশ প্রবাসী ভারতীয়রেই মন সম্ভবত ছোটো হয়ে যায়। এখানে পুরুষদের বা নারীদের মধ্যে অনেকেই তাঁর সঙ্গীর সঙ্গে ডিনার খেতে যা খরচ করেন হাসিমুখে, তার একশো ভাগের এক ভাগও দেশে পাঠালে নিজের বিধবা অশক্ত মায়ের বহু জোড়া শাড়ি অথবা বছরের ওষুধ হয়ে যেতে পারে। প্রাচ্যে আমরা যতই সচ্ছল হই না কেন, আমাদের জীবনযাত্রা আর আমাদের সুন্দর দেশের সাধারণ হতভাগ্য মানুষদের জীবনযাত্রার মানের মধ্যে যে কোনও সাযুজ্যই নেই, এই সত্যটা এখানে থাকাকালীন আমরা বেমলুম ভুলে যাই। এক ডলারকে এক টাকার সমতুল্য ভাবি, যখন এখানে বসে খরচ করি। অথচ, দেশে যখন টাকা পাঠাই, তখন অবশ্যই এক ডলারকে চল্লিশ টাকা বলে গণ্য করি, দাঁতে দাঁত ঘষে।

তবে, ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। এবং ব্যতিক্রমই নিয়মকে প্রামাণ্য করে। সব এন. আর. আই-ই এক চরিত্রের নয়।

বাঘমুণ্ডার বাংলোর চৌকিদার ও লোকজনেকে, জিপের ড্রাইভারকে, জঙ্গলের মানুষদের তুমি নিঃস্বার্থভাবে যে মুঠো-মুঠো টাকা দিলে, তা দেওয়ার কথা আমি কখনওই ভাবতেও পারি না। আজকে অন্তত ভাবতে পারি না। ভবিষ্যতের কথা জানি না।

তারা, তাদের কর্তব্য যেটুকু করার, সেটুকুই তো করেছে। এবং সেজন্যে যা প্রাপ্য তা তো এমনিতেই পায়। কিন্তু তারা যেহেতু আমার-তোমার চেয়ে অনেক মন্দভাগ্য এবং গরিব, তাই তুমি অমন করে ওদের দিলে। তাই না?

বিদেশে থাকলে, হিসেবটাই বড়ো হয়ে ওঠে, হিসেবের বাইরে কিছুই থাকে না। TIPS-ও একেবারে হিসেব মতো, নিয়ম মেনেই দিই আমরা। বকশিশও এখানে অঙ্ক মেনে চলে। যে দেয়, সে "দেয়" বলে মনে করে আর যে পায়, সে ন্যায্য "প্রাপ্য" বলে। তাই বকশিশ-এর মধ্যে কোনো চমক থাকে না।

হিসেবের উপরেও দু হাত খুলে কত দিলে তাদের তুমি! সেই সব মানুষের মুখের ভাব কি তখন তুমি লক্ষ করেছিলে? এই পাশ্চাত্য দেশের দূর প্রবাসে বেশিদিন থাকলে আমাদের হৃদয় যেন দিনপাখির রাতের ডানারই মতো গুটিয়ে আসে, অনবধানে।

এইসব নানা ছোটোখাটো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণে তোমার প্রতি আমার ভালোলাগাটা হঠাৎই একলাফে অনেক বেড়ে গেছে দিগন্ত। অন্যতর অনেক কারণের ভালোলাগার কথা ছেড়েই দিলাম।

আমি জানি না কবে তুমি আসবে এখানে থাকবে, আমার অতিথি হয়ে। শুধুমাত্র আমারই হয়ে। তুমি তো ইচ্ছে করলেই লেকচারার হয়েও আসতে পারো। সারা পৃথিবী ঘুরেই তো দেশে গিয়ে থিতু হয়েছ। তোমাকে লুফে নেবে এরা, তুমি এলে। LITERALLY. তোমার কি কোনোই অ্যামবিশান নেই এ জীবনে? সারাজীবন কি ওই গর্তেই পড়ে থাকবে?

জানি না, কবে আসবে। আসবে কি না আদৌ।

কিন্তু আমি আমার অবসরের মুহূর্তে, অথবা দীর্ঘপথ একা গাড়ি চালাতে চালাতে, আমার ঘূর্ণি-তোলা বাথটাবে শুয়ে সফেন জলের আবর্তে শরীরের অন্দরের-কন্দরের রিক্ত-সিক্ত প্রতি কুঁড়েঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে তোমার অপেক্ষায় থাকব। থাকব, মনের অগণ্য অলিগতিতে নানা প্যাস্টেলরঙা ফানুস উড়িয়ে দিয়ে।

এসো দিগন্ত, এসো।

আমি তোমার দিশারি হব। দূরের দিগন্ত না হয়ে থেকে, তুমি কাছের দিগন্ত হও আমার। হবে না?

আমি জানি যে, তুমিও ধোওয়া তুলসীপাতা নও। মানে আজকে আমাদের পটভূমি, বয়স, শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা এবং মানসিকতার কোনো নারী অথবা পুরুষই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারে না যে, সে ধোওয়া-তুলসীপাতা। তেমনই আবার, অন্যকে শরীরে মনে একশো ভাগ পাওয়ার আশাও কেউ করেন না। দিতেও যে পারবেন কারোকে নিজের একশো ভাগ, তেমনও মনে করেন না।

অন্যভাবে বললে বলতে হয় যে, কারো পক্ষেই নিজেকে একশো ভাগ দেওয়া বা পাওয়া অসম্ভব। প্রত্যাশাও করি না। কারোই করা উচিত নয়। দিন পালটে গেছে, পৃথিবী পালটে গেছে; মানুষ-মানুষী হিসেবে আমরাও অনেকই পালটে গেছি। এই বদল ভালো কি মন্দ, সেই প্রশ্নে না গিয়েই বলব যে, বুদ্ধিমান এবং বোঝদার বলেই, আমরা আমাদের টুকরো-টাকরা দিয়েই একে-অন্যকে প্রার্থিত পূর্ণতার দিকে হাত ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি শুধু, কিন্তু কেউই অন্যকে নিজের শরীর-মনের সবটুকুই নিঃশেষে দিতে পারি না।

পারি কি?

অনেকেই বড়ো হয়ে গেল চিঠিটা।

চিঠি লেখালেখি ব্যাপারটা কি আর বেশিদিন বেঁচে থাকবে দিগন্ত, এই পৃথিবীতে? আঙুল নাড়ালেই যখন টেলিফোন, টেলেক্স, ফ্যাক্স, ই-মেল তখনও কি কেউ এত যতন-ভরে হৃদয় নিংড়ে

এত সময় নষ্ট করে কারোকে স্বহস্তে লিখবে চিঠি?

কিন্তু এও ভাবি যে, চিঠি যেদিন মানুষ লিখবে না মানুষীকে; ভবিষ্যতের মানুষী মানুষকে, তখন কি এই পৃথিবী বড়ো দরিদ্রও হয়ে যাবে না?

ফোনে বা ফ্যাক্সে বা ই-মেল-এ শিক্ষিত মানুষের অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল মনের সব কম্পন কি কোনোদিনও ধরা পড়বে? দূরদুরান্তের চিঠি বেয়ে যখন ফুলের গন্ধ, নদীর গন্ধ, বৃষ্টি-স্নাত সোঁদা পৃথিবীর মাটির গন্ধ, গ্রীষ্ম-অরণ্যের তীব্র রুখু ঝাঁক, মানুষ-মানুষীর শরীর মনের নানা ফুটন্ত বা স্নিগ্ধ বার্তা বয়ে আর এক মন থেকে অন্য মনে গিয়ে পৌঁছোবে না, তখনও কি মানুষের সঙ্গে আর এই গ্রহের "হাম্বা-হাম্বা" করা বা "ল্যাজ-নাড়ানো" প্রাণীদের মধ্যে কোনো তফাত আদৌ থাকবে?

তুমি কি বলো, দিগন্ত?

ইতি—
ইন্দি

প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়
বেণি ব্যানার্জি অ্যাভিন্যু
ঢাকুরিয়া
কলকাতা ৭০০ ০৩১

দিগন্ত,

পরম কল্যাণীয়েষু,

বহুদিন পরে তোমার চিঠি পেয়ে সব অবগত হলাম।

তুমি মার্চের শেষে কলকাতাতে আসবে লিখেছ এবং এলে এবারে আমার সঙ্গে দেখাও করবে লিখেছ।

অতি উত্তম কথা। আনন্দের কথাও। বহুবছর তোমাকে দেখিনি।

হার্ভার্ড থেকে কি দেশে ফিরেছিলে? না, সেখানে থেকে অন্য কোথাও গেছিলে? সেও তো বহুদিনেরই কথা। চিঠিও লেখোনি বহুবছর। তবে তোমার খবরাখবর মিডিয়ার মাধ্যমে মাঝে মধ্যে পাই।

হঠাৎই মনে পড়ল বুঝি বুড়ো মাস্টারমশাইকে? আমি এখন বাড়িতেই থাকি। পুরোপুরি রিটায়ার্ড। অ্যাজ মাচ রিটায়ার্ড, অ্যাজ ওয়ান ক্যান বি।

তবে, একটি নতুন কাজে হাত দিয়েছি মাসখানেক হল। নিজস্ব কাজ। সাক্ষাতে বলব বিস্তারিত, তুমি যখন আসবে।

আজকাল বইপত্রের যা দাম তাতে তো বই কেনা আমাদের মতো মানুষের পক্ষে অসাধ্যই হয়ে উঠেছে। আমাদের কেন্দ্রে বা রাজ্যে কি কোনো শিক্ষিত মন্ত্রী নেই? জুতো-জামা, টি. ভি. আর বই কি সমতুল হল? বইয়ের দাম যাতে একটু কম থাকে তা কি ওঁরা দেখতে পারেন না?

তবে ব্যাপারটা কি জানো? দেশের অধিকাংশ মানুষের চরিত্রই (তার মধ্যে আমাদের মতো "মেধাবী" "বুদ্ধিজীবীরাও" অবশ্যই পড়ি।) এমন হবে গেছে যে, চোরদের চরিত্রের সঙ্গে তার বিশেষ তফাত যে আছে, তা আর জোর করে বলা যায় না। শুধু বইয়ের জন্যে, পড়াশোনার বই এবং অবশ্যই সাহিত্যের বইয়ের জন্যেও, কাগজের দামে যদি ছাড়ও দেন ওঁরা, তাহলেও দেখা যাবে হয়তো সেই কাগজ নিয়েও কালোবাজারি হবে।

এখন কারোই "ভালো" করার চেষ্টাটা, কারো "মন্দ" করার চেষ্টার চেয়েও অনেকই বেশি কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কাগজের উপরে সমস্তরকম কর যাতে ছাড় হয় সেজন্যে সকলেরই আন্দোলনে নামা উচিত। আমি তো সকলকেই বলছি যে, "পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ড"-কেও এতে INVOLVE করানো দরকার। কারণ, কলকাতা বইমেলার IMPORTANCE তো এখন অনস্বীকার্য। তাঁরা যদি এ বিষয়ে সোচ্চার হন তবে কথাটার ভার বাড়বে। বইয়ের দাম কমানো না গেলে, শিক্ষিতদের কি হবে? আর নিরক্ষরতা দূরীকরণই বা হবে কেমন করে।

তোমার ওখানের কলেজের পরিবেশ কেমন? আমার তো মনে হয়, ভালোই হওয়া উচিত। ওড়িয়া ছেলেমেয়েরা বেশ কয়েকবছর হল সমস্ত ভারতীয় সার্ভিসেই যেভাবে এগিয়ে আসছে; উঠে আসছে, তাতে একটা কথাই প্রাঞ্জল হয় যে, সেখানে যেন এক নবজাগরণের সূচনা হয়েছে। এক সময়ের বেঙ্গল রেনেসাঁরই মতো, "ওড়িশা রেনেসাঁ"।

আমার ওড়িয়া বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান আছে এখনও। এবং আছে বলেই একথা জোর দিয়েই বলতে পারি।

আমাদের দেশের মতো অনগ্রসর ও গরিব দেশে একটা বিশেষ প্রজাতির মধ্যে যখন অবক্ষয় ক্রমশ শিকড় পেতে থাকে, তখন সেই প্রজাতির মধ্যে কিছু লক্ষণ ভারি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে পরে যেমন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কমিউনিটির মধ্যে হয়েছিল। সেই সব লক্ষণই আজ প্রকট হয়েছে পশ্চিমবাংলাতে। তার মধ্যে একটি প্রধানতম লক্ষণ হচ্ছে মেয়েরা উঠে আসছে এবং ছেলেরা রসাতলে যাচ্ছে জীবনের সব ক্ষেত্রেই। আজকালকার বাঙালি ছাত্রীদের সম্বন্ধে বর্তমানের মাস্টারমশাইরা যতটা আশাবাদী, ছাত্রদের সম্বন্ধে ততটা আদৌ নন।

বুড়ো হয়েছি। বেশি কথা বলি। তাছাড়া বুড়োদের কথা তো কেউ শুনতেও চায় না। তাই, সুযোগ পেলেই বাচাল হয়ে উঠি।

আমার শরীরের কথা জিজ্ঞেস করেছ তুমি। আমার শরীর, এ বয়সে যেমন থাকার তেমনই আছে। শরীরের মনে শরীর আছে, মনের মনে মন। মানুষের মনটাই আসল। শরীর কোনোদিনও কোনো Factor ছিল না। শরীর যত পুরোনো, অশক্ত হচ্ছে, মন ততই তরুণ হচ্ছে। কিশলয়ের চিকনতা পাচ্ছে সে। এ বড়ো ধাঁধা। তুমি নিজেও যতদিন না বুড়ো হচ্ছ, ওই ধাঁধার কথা জানবে না।

তবে আমার PROSTRATE GLAND ENLARGED হয়েছে। SONOGRAM করেছি গতকালই। ডক্টর দীপক মুখার্জি LASER দিয়ে ORPRATE করবেন। সুদর্শন ডাক্তারের বয়স কম, বিনয়ী এবং অত্যন্ত ভদ্র। কলকাতার ডাক্তারদের IN GENERAL যা বদনাম হয়েছে, সেই প্রেক্ষিতে দীপককে ব্যতিক্রমী বলা যায়। ওর এক বন্ধুও ভালো। ড. উৎপল রায়। ওর সুন্দরী স্ত্রী 'ছুটি' আমার কন্যাসমা। উৎপল ভালো গ্যাইনিকলজিস্ট। তবে আমার গৃহিনীর তো আর সন্তানাশঙ্কা (অথবা সম্ভাবনা) নেই। আমার কোনো কন্যাও নেই! আর শান্তনুর তো হানিমুনই ফুরোল না। অতএব গাইনিকলজিস্টে ও জীবনের মতো আমার প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেছে।

আগামী মাসের মাঝামাঝি প্রস্টেট গ্ল্যান্ড অপারেশন করব বলে একরকম ঠিক হয়েছে আপাতত। আজকাল তো LASER BEAM দিয়ে অপারেশন হয়। স্বল্প দিনেই আমাকে দাঁড়

করিয়ে দেবে বলেছে দীপক। ওর অবশ্য ওই সময়ে ইংল্যান্ডে যাওয়ার কথা আছে। তাহলে ড. শিবাজী বসুকে দিয়েই করাব। তিনিও নামি এবং বর্তমানে তিনিও বিদেশে।

তুমি তার আগেই দেখা কোরো, কলকাতা এসেই।

ভালো থেকো।

ইতি—
আশীর্বাদক
প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনশ্চ : বিয়ে কি করলে?

বিয়েটা চিরদিনই একটা BIG GAMBLE ! তা, সম্বন্ধে করেই করো, কী ভালোবেসে। তবে বিয়েটা জরুরি। বুড়ো বয়সে পৌঁছে এই সত্য বেশি করে অনুভব করি। যদি বিয়ে করবেই না এমন মনস্থ না-করে থাকো, তবে তাড়াতাড়ি সেটা সেরে ফেলো। EARLY MARRIAGE এর অনেক ADVANTAGE আছে।

আমার টেলিফোন নাম্বার একই আছে শুধু এক্সচেঞ্জটা বদলে গেছে। 421 হয়েছে।

—পশ্চিমবঙ্গ

যশপুর
জেলা : কটক, ওড়িশা

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

স্যার,

বহুবছর পরে আপনার নিজের হাতে লেখা চিঠি পেয়ে খুবই ভালো লাগল। কলকাতা পৌঁছেই আপনাকে ফোন করব।

EARLY MARRIAGE তো আর হবে না। আমি তো চল্লিশ পেরোলাম। তাছাড়া, আপনাদের যুগে যেমন বাধ্য এবং পরম গুণবতী স্বামীগতপ্রাণা স্ত্রী অতি সামান্য চেষ্টাতেই পাওয়া যেত, অধুনা নারীজাতির মধ্যে তেমন প্রাণী অত্যন্তই বিরল। "উইমেনস লিব"-এর ঠ্যালায় পুরুষেরা পৃথিবীময় গড্ডলিকার মেষপুঙ্গবদেরই মতো ব্যাঁ ব্যাঁ আওয়াজে ত্রাহি-ত্রাহি করছে। এখন স্ত্রী জাতির কোনো প্রাণীকেই বিয়ে করার মতো সাংঘাতিক বিপজ্জনক কাজ আর দুটি নেই।

শান্তনু কি এখনও দিল্লিতেই আছে?

ভালো থাকবেন।

ইতি—
আপনার স্নেহধন্য, দিগন্ত

শ্রী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়
বেণি ব্যানার্জি অ্যাভেন্যু, ঢাকুরিয়া
কলকাতা-৭০০ ০৩১

তিন

যশপুর
কটক
ওড়িশা

দিশারি, কল্যাণীয়াসু,

তুমি কি কখনও পারিজাত ফুল দেখেছ?

আমিও দেখিনি।

আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক শ্রী তপনকুমার রায়, যিনি আমারই মতো গাছ, ফুল, বন, পাখি ভালোবাসেন, দুর্গাপুর থেকে আমাকে পারিজাতের পাতা পাঠিয়েছেন একটি। আসলে তাঁর কাছে ফুলটির বর্ণনা শুনে যেহেতু আমি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম যে, উনি সম্ভবত ম্যাগনোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরাকেই পারিজাত ফুল ভেবেছেন ভুল করে। সেইহেতুই যাকে বলে, আমার "চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন" করতেই তিনি পাতাটি পাঠিয়েছেন; কালই পৌঁছেছে এসে।

দেখেই বুঝলাম যে, উনিই ঠিক। আমি ভুল।

পাতাটি আশ্চর্য সুন্দর। মোটা। বেশ লম্বাটে। প্রায় অর্কিডের পাতারই মতো দেখতে। রঙ, হালকা, সবুজ। পারিজাত হয়তো স্বর্গের অর্কিডও হতে পারে।

"পারিজাত-পারিং" নামের একটি গয়নার কথা পড়েছিলাম কোথাও। মণিপুরের মেয়েরা নাকি গলায় পরেন এ হার। বুদ্ধদেব গুহ'র একটি গল্প সংকলনের নাম "পারিজাত পারিং"। আনন্দ পাবলিশার্স-এর বই। নিশ্চয়ই পড়োনি। তাতে লজ্জার কিছুই নেই। এন. আর. আই-দের আর দিশি মানুষদের লজ্জার সংজ্ঞাতে পার্থক্য আছে যেমন পার্থক্য আছে সাহেববাড়ি অথবা সাহেব-ভাবাপন্ন মানুষের বাড়িতে পালিত দুর্মূল্য কুকুর এবং নেড়ি কুত্তার মধ্যে। অনেকেই ব্যাপারে তোমাদের লজ্জাবোধ না করাটাই সপ্রতিভতা আর আমাদের অপ্রতিভতা।

একটা সময় ছিল যখন মানুষে যতই উচ্চশিক্ষিত হন না কেন স্বদেশী সাহিত্য এবং সংগীত সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল না থাকলে, তা তিনি যে দেশীয়ই হন না কেন, তাঁকে শিক্ষিত বলে গণ্যই করা হত না। আজকাল অবশ্য সেই সব ধ্যানধারণার লালনপালনও নেড়িকুত্তা লালনপালনের মতন ন্যক্কারজনক প্রবৃত্তি বলে গণ্য হয়।

দ্যাখো, কোন প্রসঙ্গ যেতে কোন প্রসঙ্গে চলে গেলাম! রবীন্দ্রনাথের গানে তো "পারিজাতের কেশর নিয়ে ছড়ায় শশী ধরায় কি এ", শিশুকাল থেকেই শুনে আসছি। কিন্তু বন-বাদাড়ে এত ঘুরে বেড়াই সখের বশে, সুখের বশে, প্রথম কৈশোরের দিন থেকেই, অথচ পারিজাত ফুল চোখে পড়েনি আজ অবধি। কে জানে! দেখেছি হয়তো, চিনি না বলেই হয়তো শনাক্ত করতে পারিনি।

যাই হোক, উনি একদা এক শিলচরনিবাসী শ্রী বিনয়কুমার মজুমদারকে, (অধুনা কলকাতার সাদার্ন-অ্যাভিন্যুর বাসিন্দা) লিখতে বলেছেন আমাকে। বিনয়বাবুদের শিলচরের বাড়িতে নাকি তপনবাবু পারিজাত ফুল ফুটতে দেখেছিলেন বহুদিন আগে। টবে ফুটেছিল ফুলটি। যদি ওই ফুলের

কোনো বংশধর এখনও বিনয়বাবুর পরিবারে থেকে থাকেন তাহলে চাক্ষুষ করতে পারব এই আশাতেই তাঁদেরও লিখে দিয়েছি এবং উত্তরের আশাতে থেকে থেকে হাল ছেড়ে দিয়েছি।

বুঝলে ইন্দি, আমার মনে একধরনের শ্লাঘা জন্মে গেছিল যে, আমি অনেকই জেনে ফেলেছি। এখন দেখছি, আমার মতো এত কম অত্যন্ত কম মানুষেই জানেন। আসলে "সবজান্তা" যে একবার হয়েছে তার সব জ্ঞানই কবরস্থ। জানার কি শেষ আছে? বলো? আমি তো চিতাতে ওঠার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত শিখতে রাজি, জানতে রাজি: সমস্ত আগ্রহের সঙ্গে।

তপনবাবুর চিঠিতেই জানলাম "পারিজাত" নাকি সন্ধের পর থেকেই পাপড়ি মেলতে থাকে। সুগন্ধি তুমিও যেমন সন্ধের পরেই গা-ধুয়ে উঠে তোমাকে মেলতে থাকো। শেষরাতে নাকি পাপড়িগুলি আবার সেই ফুলকে গুটিয়েও আনে। তাও, তোমারই মতো।

একথা জানার পরে পারিজাতের প্রতি প্রেম আমার আরো বেড়ে গেল।

তোমার কাজিনের মেয়ে হয়েছে বলেছিলে না বাঘমুণ্ডাতে? বলেছিলে, নামকরণের ভার পড়েছে তোমারই ওপরে। তার নাম দিয়ে দাও "পারিজাত"। সে বড়ো হলে, তাকে তোমারই মতো পরতে-পরতে পাপড়ি মেলতে এবং বন্ধ করতেও শিখিয়ে দিয়ো।

তোমার চিঠির উত্তর দিতে বসেছি আজ সাত-তাড়াতাড়ি। পরের শনিবারে রাতে, তুমি যখন হবসনের সঙ্গে ডিনার খাবে, আমাকে কলকাতার ট্রেন ধরে কলকাতায় যেতে হবে। আমাদের কলকাতার কলেজের প্রফেসর প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সত্তর বছরের জন্মদিন উদ্‌যাপনের জন্যে "কুচো চিংড়িরা" একটি কমিটি গড়েছে। জন্মদিনের অনেক দেরি আছে অবশ্য। জন্মদিন দোসরা এপ্রিল। কিন্তু আমি তো দোলের সময়ে মধ্যপ্রদেশের আচানকমারের জঙ্গলে থাকব বেশ কিছুদিন। তাই আগেভাগে সকলে মিলে মিটিং করে, কি করা হবে না হবে ঠিক করব।

মানুষ অফিসের "বস"-এর, প্রধানমন্ত্রীর, মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিন পালন করেন কিন্তু সেইসব উৎসবের পেছনে কোনো না কোনো, কারো-না কারো VESTED INTEREST থাকেই। কিন্তু আমরা আমাদের অনেক ভালোবাসার ও শ্রদ্ধার P.B.-র সত্তরতম জন্মদিনে যেমন সোৎসাহে এক প্রলয়ংকরী কাণ্ড করতে যাচ্ছি তেমন স্বার্থহীন উৎসবের কথা আজকাল বোধহয় কল্পনাও করা যায় না। আর যায় না বলেই, আমি এবং নিশ্চয়ই আমার অন্য সহপাঠীরাও দারুণই উত্তেজিত এবং রোমাঞ্চিত বোধ করছি এবং করছে।

ওঃ সরি। "কুচো চিংড়ির" নামই জানানো হয়নি তোমাকে। ওর ভালো নাম চিরন্তন চ্যাটার্জি। ও কাস্টমস-এর বড়ো অফিসার। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিল। বাবার আদেশে, রেভেন্যু সার্ভিসে জয়েন করেছিল, ফরেন সার্ভিসের জন্যে কোয়ালিফাই করেও। ওর বাবা চাননি যে, একমাত্র সন্তান বিদেশে বিদেশে ঘুরুক। এখন, গাঁজা, আফিং, এল. এস. ডি. সোনা এইসব ধরে বেড়োচ্ছে। পাচার-করা সোনা নিয়ে আসছে গেঁজে খুলে। হিরে আনছে জুতোর সুখতলা থেকে।

ওকে ফোন করলেই বলে, "কবে যে এই হতচ্ছাড়া কাজ থেকে ছাড়া পেয়ে ভদ্রকাজে যাব।" মানে, অফিসে-বসা কাজ আর কী! প্রত্যেক 'শিক্ষিত' বাঙালিরই যা মোক্ষ।

আমাদের ক্লাসে একজন "গলদা চিংড়ি"ও ছিল। নামটা আমরা ইয়ার্কি মেরে দিয়েছিলাম ওর গাব্দা-গোব্দা গড়ন এবং চিংড়ির মতো গোঁফের জন্যে। কিন্তু সত্যি সত্যিই ও এখন চিংড়ি এক্সপোর্ট করে লাল হয়ে গেছে। অবশ্য এক্সপোর্ট করে গলদা নয়, বাগদা চিংড়ি। আর আমাদের কুচো চিংড়ির তো গোঁফই নেই। ভালোমানুষ। সাদাসিধে।

এবারে বলি যে, তোমার চিঠিতে তুমি নানা প্রসঙ্গ এনেছিলে এবং প্রশ্নও। সেসবের উত্তর দিতে হলে অনেকই সময় লাগবে।

আজ বড়ো তাড়াতাড়িতে আছি। হাওড়াতে পৌঁছে কুচো চিংড়ির বাড়ির পথে জি. পি. ও-তে তোমার চিঠি ফেলে দেব, যাতে তাড়াতাড়ি পাও। আমাদের ডাকবিভাগের তো আঠারো মাসে বছর।

ওয়াশিংটনের কাছে ডার্নসটাউনের অশোক মোতায়েদ ওয়াশিংটনে উড়ে যাওয়ার আগে বম্বের লীলা পেন্টা থেকে চিঠি ছেড়েছিলেন এ মাসের চার তারিখে, পেলাম, আঠারো তারিখে।

কী বলব বলো!

আচানকমারের জঙ্গলে পৌঁছে তোমাকে বড়ো চিঠি লিখব। তোমার উত্তর অবশ্য সেখানে আমি পাব না। জমে থাকবে সব যশপুরেই। ভাবতেও ভালো লাগবে যে, জঙ্গল থেকে ফিরে গিয়ে একসঙ্গে একগোছা চিঠি পাব তোমার।

ভাল থেকো দিশারী।

ইতি—
দিগন্ত

পুনশ্চ : "কুচো চিংড়ি", "গলদা চিংড়ি" এবং আরো অগণ্য সহপাঠী উচ্চিংড়েরা আমার নাম দিয়েছিল "দিগা পাঁড়ে"। "দিগা পাঁড়ে" শীর্ষক একটি ছোটোগল্প বনজঙ্গলের পটভূমিতে, আনন্দবাজার রবিবাসরীয়তে লিখেছিলেন আমার প্রিয় সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ (এবং তিনিই পরে দিগা পাঁড়েকে তাঁর "মাধুকরী" উপন্যাসের চরিত্রও করেছিলেন। সেই গল্পের এবং গল্পের নায়কেরও নাম ছিল "দিগা পাঁড়ে") সেই থেকেই আমার ওই নামকরণ। দিগন্তের সঙ্গে সেই দিগা পাঁড়ের কোনোরকম মিলই ছিল না। মিলটা ছিল শুধুমাত্র ধ্বনিগত। ওদের খুশি হয়েছিল তাই ওই নামেই ডাকত। আজও ওরা, মানে কলেজের বন্ধুরা, সকলেই সকলকে কলেজের নামেই ডাকে। আমিও তাই ডাকি।

কলেজের কোনো বন্ধুর সঙ্গেই যে আমার দারুণ কিছু সার্বিক মিল আজকেও আছে এমন নয়। হয়তো আমার সঙ্গেও ওদের নেই। তবে সার্বিক মিলের আশা করাটাই তো মূর্খামি। মনে মনে কলেজের দিনে ফিরে যে যাই ওদের সঙ্গে দেখা হলে, কথা হলে, এইটুকুই আনন্দ, বড়ো আনন্দ।

আমাদের প্রত্যেকেরই দোষ এই যে, আমরা অল্পে সন্তুষ্ট হই না। বসতে পেলে, শুতে চাই। জীবনে প্রত্যেকটি জায়গাতেই যদি শোওয়া যেত তবে জীবন এত, বৈচিত্রময় থাকত না যে, এই সরল সত্যটি আমাদের মধ্যে বড়ো কম মানুষই বুঝি।

ইতি—
দিগন্ত

ইন্দি সেন
মার্লবোরো
ম্যাসচুসেটস
ইউ. এস. এ.

কলকাতা

ইন্দি কল্যাণীয়াসু,

কলকাতায় থাকি না বলেই কখনো-সখনো এখানে এলে ভালোই লাগে। কলকাতার কিন্তু বেশ পরিবর্তন হয়েছে। এখানে যাঁরা থাকেন তাঁদের চোখে এই পরিবর্তন হয়তো সেরকম ধরা পড়ে না। যেমন ধরা পড়ে না আমাদের নিজেদের চোখে নিজেদের চেহারার পরিবর্তন। যে-মুখটি দাড়ি

কামাবার সময়ে আয়নাতে দেখি, সে মুখটির খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে বলে নিজের চোখে প্রায়শই ধরা পড়ে না। কিন্তু পড়ে, যাঁরা সেই মুখ রোজ দেখেন না, তাঁদের চোখে।

কলকাতার রাস্তাঘাট অনেকই চওড়া হয়েছে। অধিকাংশ বড়ো রাস্তাতেই রেলিং লেগেছে রাস্তার পাশে। আর সবচেয়ে যেটা ভালো লাগে, ইদানীং গাছপালা লাগানো হয়েছে এবং হচ্ছে রাস্তার মাঝে এবং রাস্তার পাশে। গাছেরা যে নিজেরা সুন্দর তাই নয়, গাছেরা যার বা যাদের কাছে থাকে, সে মানুষই হোক, কী পাখি, তারাও সুন্দর হয়ে ওঠে।

আমার বন্ধু "কুচো চিংড়ি" বড়ো উদার মনের মানুষ। এমন ঔদার্য সত্যিই কিন্তু সাধারণ বাঙালির মধ্যে দেখা যায় না। ওর স্ত্রী "ভ্রমর"ও ঠিক ওরই মতো। দুজনকে কাছ থেকে দেখে মাঝে মাঝে আমারও সংসারী হবার বাসনা জাগে। কিন্তু ভ্রমরের মতো স্ত্রী পাওয়া ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া সম্ভব নয়।

ভ্রমর খুব ভালো রান্না করে। তোমরা হয়তো অনেকেই জানো না যে, রান্না জানা মেয়েদের কত বড়ো গুণ! এবং শুধুমাত্র ভালো রান্না খাইয়েই কত পুরুষের হৃদয় অবহেলায় জয় করতে পারো তোমরা, সে সম্বন্ধে এই "লিবারেটেড' তোমাদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।

কেন জানি না, আমার মন বলে, সাম্প্রতিক অতীত থেকে যে আন্দোলন প্রচণ্ড প্রবল হয়ে উঠেছে, তোমাদের এই মুক্তিকামী আন্দোলন; তা একদিন নদীরই মতো বাঁক নিয়ে পুরো বৃত্ত রচনা করে আবারও আরম্ভে ফিরে আসবে। জানি না, তোমরা বোঝো না কেন যে, তোমাদের মুক্ত দেখতে আমাদের যত আনন্দ, তা হয়তো তোমাদের নিজেদেরও নয়। যে-পাখিকে খাঁচা থেকে আমরা উড়িয়ে দিই সেই পাখি যখন নীল আকাশে উড়ে বেড়োয় অথবা কাছেই কোনো সোনাঝুরি বা কৃষ্ণচূড়া বা শিমুল গাছে বসে গর্বভরে গ্রীবা বেঁকিয়ে তার চিকন কোমল পালক পরিষ্কার করে, তখন তার নিজের যত না আনন্দ হয়, যে তাকে মুক্তি করল পাখির মুক্তির প্রকৃতি দেখে, তার আনন্দ হয়তো তার নিজের আনন্দের চেয়েও বেশি হয়।

অন্য প্রসঙ্গে এসে গেলাম। ভ্রমরের প্রশংসাও এখন থাক। কারণ, ভ্রমর সম্বন্ধে বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হবে।

যে কথা বলব বলে এই চিঠি, সে কথাই বলি। তুমি এখানে যখন ছিলে তখন চোখের চাউনিতে নীরবে যা অহরহ বলেছ তোমার চিঠিতে তেমনই কিছু কথা সরবে লিখেছ যাতে আমার মনে হয়েছে, তুমি যে আমাকে নিঃশর্তভাবে ভালোবেসেছ, একথা তুমি গোপন রাখতে চাও না। সেটা তোমার মহত্ত্ব। কিন্তু আমি বলি কি, এত সহজে, এত তাড়াতাড়ি নিজের সম্বন্ধে এমন নিশ্চিন্ত হোয়ো না। তেমন নিশ্চিন্তি তোমার তো বটেই, আমার পক্ষেও নিরাপদ নয়।

তাড়া কিসের ইন্দি?

এখনও অনেক বেলা বাকি। জীবনের পথে চলতে চলতে তুমি হয়তো অচিরেই এমন কারও দেখা পাবে, যার জন্য তুমি জন্মজন্মান্তর ধরে অপেক্ষা করে আছো। যে ছিল তোমার পুতুল খেলার দিনের সাথি, মনের সাথি, তোমার অন্তরঙ্গে যে ছিল সুপ্ত হয়ে তোমার গোপন কামনার মতো। তেমন কেউ হয়তো দেখা দেবে, আর তার কাছে, তার প্রেক্ষিতে, এই দিগন্ত বোস পুরোপুরি নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। তখন তুমি হাত কামড়াবে। বলবে, ইস! কি ভুলই না করেছি! তার চেয়ে খোলা থাক ইন্দি, আমাদের সম্পর্ক খোলা থাক। বাঁধন দেবার এত তাড়া কিসের? মানুষ হিসেবে প্রত্যেক নারী ও পুরুষই বড়ো ছিন্ন-মতি। বড়ো ভঙ্গুর আমরা। যতখানি ভঙ্গুর বলে নিজেদের জানি, আসলে তার চেয়েও অনেকই বেশি ভঙ্গুর। আমি কোনোদিনই চাইনি যে, নিজের সুখের কারণে আমি অন্যের দুখের কারণ হই।

এই কথা কটি তোমাকে জানাব বলে বেশ কিছুদিন হল আমার মন আকুলি-ব্যাকুলি করছিল।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে জানালার সামনে এসে দাঁড়িয়ে নক্ষত্রখচিত আকাশ এবং দূরের নদীরেখার দিকে চেয়ে কেবলই মনে হয়েছে, এই সুন্দর পৃথিবীতে কারোকেই বাঁধতে নেই। তোমাকে আমি বারে বারে কল্পিত পাখির মতো, কল্পিত পিঞ্জর থেকে মুক্ত করে, পরম যতন ভরে, আমার দুহাতে তোমার ডানা ধরে উড়িয়ে দিয়েছি।

তুমি কি জানো? দেশে-গ্রামে গৃহস্থরা যে কবুতর পোষেন, সেই সব কবুতর প্রতিদিন ভোরে উড়ে চলে যায়, সারাদিন তারা নিজেরাই ওড়াউড়ি করে, চরে-বরে বেড়ায়, তারপর গোধূলিবেলায় আবার ফিরে আসে গৃহস্থের বাড়ির ছাদে রাত কাটাবে বলে। মানুষ-মানুষীর সম্পর্কটা যদি অনেকটা এই রকমের করে গড়ে তোলা যেত, যদি প্রাগৈতিহাসিক বিয়ে অথবা ইদানীংকালের লিভ-টোগেদারকেও ছুটি দেওয়া যেত, বেশ হত কিন্তু তাহলে।

তাছাড়া, তুমি কি জানো এই বিয়ে ব্যাপারটাই তো গোড়াতে ছিল না। ঋষি উদ্দালকের পুত্র শ্বেতকেতু একদিন দেখলেন যে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক পুরুষ এসে তাঁর মাকে হাত ধরে নিয়ে চলে গেল। শ্বেতকেতু, বালক শ্বেতকেতু, পিতা উদ্দালককে উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, "মা কোথায় গেলেন?'

উদ্দালক জবাবে বললেন, 'নারী আর গাভির ওপরে সমস্ত পুরুষেরই সমান অধিকার।'

আশা করি, এই রকম উদ্ধৃতির জন্য নারী-প্রগতির সৈন্যরা আমার গর্দান নেবেন না। কারণ, এটা আমার কথা নয়, উদ্দালক ঋষিরই কথা। যাই হোক, এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে শ্বেতকেতু দারুণ উত্তেজিত হলেন এবং এই শ্বেতকেতুই প্রথমে বিবাহপ্রথা প্রবর্তন করলেন। কিন্তু ভণ্ডামি ব্যাপারটা যে ভারতীয় পুরুষদের চরিত্রের কত গভীরে প্রোথিত সেটা বুঝতে পারবে ইন্দি, যখন জানবে এই শ্বেতকেতুই বিবাহ প্রথার পত্তন করার পরে একটি কামশাস্ত্র রচনা করেছিলেন এবং সেই শাস্ত্রের একটি অধ্যায়ের নাম হল, "পরদারাধিকরণস্য।"

সেই অধ্যায়টিতে কোন কোন উপায়ে পরস্ত্রীকে ফুসলিয়ে আনা যায় তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিধেয় রইল। কী কী বিশেষ-লক্ষণযুক্ত পরস্ত্রীকে কত সহজে হাত করা যায় কিংবা বিনা আয়াসে তাঁদের সঙ্গে সহবাস করা যায় সেইসব আলোচনাও সেই শাস্ত্রে রইল।

তাহলেই বুঝতে পারছ যে, সরষের মধ্যেই ভূত থেকে গেছিল। ঘরগেরস্থালি, গোরু-বাছুর, ছেলেমেয়ে নিয়ে যে লক্ষ লক্ষ দম্পতি পৃথিবীর সর্বত্রই ল্যাজে-গোবরে হয়ে সংসার-সংসার খেলা করছেন তাঁদের মধ্যে সকলেই যে অত্যন্ত সুখী একথা ভুলেও ভেবো না। আসলে, তাঁদের জীবনটা এক অন্ধ অভ্যাসে পর্যবসিত হয়ে যায়, আর সেই অভ্যাসের আড়ালে, তার গভীরে; সুখ যে মথিত হয়ে, চূর্ণ হয়ে, কখন তলিয়ে যায় তা তাঁদের গোচরে বা মননেও আদৌ আসে না।

চিঠিটা বড়ো হয়ে যাচ্ছে। একটু পরেই আমাদের মিটিং। দ্যাখো দেখি। আমিও কি বুড়ো হচ্ছি? তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তোমাকে নিশ্চিত হতে বারণ করতে বসে কত কীই না লিখে ফেললাম, অপ্রয়োজনীয়, অপ্রাসঙ্গিক।

সব বন্ধুরা এখুনি এসে যাবে, কেউ কেউ এসে গেছেও। আমি কাল সকালেই ধৌলি এক্সপ্রেস ধরে কটকে ফিরে যাব। সেখান থেকে যশপুরে।

ভালো থেকো, আনন্দে থেকো, উত্তর দিয়ো।

ইতি—
দিগন্ত

ইন্দি সেন
মার্লবোরো
ম্যাসাচুসেটস
ইউ. এস. এ.

মার্লবোরো
ম্যাসাচুসেটস
ইউ. এস. এ.

দিগন্ত সুহৃদ্‌বরেষু

তোমার চিঠি পেয়ে আমার খুব রাগ হল। দুঃখও হল।

জ্ঞানী সেজে কিংবা ঔদার্যের মুখোশ পরে তুমি যেকথা বলতে চেয়েছ সেটা পুরোপুরি তোমার নিজের স্বার্থেরই কথা। তুমি আলগা থাকতে চাও। চাও, তো চাও। তোমার ওপরে আমার কোনো দাবিই নেই, ছিল না, থাকবেও না।

বাঘমুণ্ডার সেই অবিশ্বাস্য আরণ্যক অনুষঙ্গ আমাকে তো বটেই, হয়তো অরণ্যচারী তোমাকেও দ্রব করেছিল. যদি করেও থাকে, তাতে আনন্দিতই থেকো, এই অনুরোধ আমার, তোমার কাছে। সেই বনগন্ধ এবং বনশব্দময় আশ্চর্য সুন্দর অনাস্বাদিতপূর্ব (অন্তত আমার কাছে) রাত্রির জন্যে দয়া করে তোমার মনে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা রেখো না। আমার কিছুই চাইবার নেই তোমার কাছ থেকে।

তাড়া তো নেই-ই!

আমরা মেয়েরা হয়তো বড়ো বেশি কল্পনাপ্রবণ। দূরের তৃণাচ্ছাদিত মাটির ঢিবি দেখলেই আমরা তাকে মস্ত পাহাড় বলে মনে মনে কল্পনা করে পুলকিত হই। এবং কিছুকাল পরেই অবধারিত দুঃখও পাই। এই দুঃখ পাওয়ার প্রবণতা অবশ্য আমাদের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত আছে। এ সবই সৃষ্টিকর্তার ষড়যন্ত্র।

মাঝে মাঝে তোমার মতো আমারও মনে হয় যে, আমরা মেয়েরা হয়তো কোনদিনও প্রকৃত মুক্তি পাব না। কারণ, সেটাই হয়তো সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা। তিনি হয়তো এমনই ইচ্ছা করেছিলেন যে, আমরা শক্তসমর্থ, ঋজু, দৃঢ়, অনমনীয় পুরুষকে বেষ্টন করে, তাদের ওপর নির্ভর করে অতি সুখে জীবন অতিবাহিত করব। সত্যিই বলছি। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে, পুরুষের মতো বড়ো চাকরি, বড়ো ব্যবসা এবং পুরুষের মতো পোশাক-আশাক, পুরুষের মতো মানসিকতাই যদি নারীমুক্তির আন্দোলনের একমাত্র গন্তব্য হয়ে থাকে তবে এই গন্তব্যের মধ্যেই আমাদের বন্দিত্ব অবধারিতভাবে নির্দিষ্ট আছে। সৃষ্টিকর্তা তো মানুষ আর মানুষীকে শুধুমাত্র বৈচিত্র বা আধিক্যের জন্যেই আলাদা করে গড়েননি। শরীরে, রূপে এবং মানসিকতাতে, যত লক্ষ লক্ষ রকমের পশু পাখি জীব ফুল গাছ প্রজাপতি আছে, তাদের মধ্যেও তো তিনি পুরুষ এবং নারীর ভূমিকা আলাদা করেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাদের চেহারা করেছেন আলাদা আলাদা, তাদের স্বভাব করেছেন স্বতন্ত্র এবং এই বন্দোবস্ত বেশ তো মানিয়েও গেছে। মান্যও হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। তাহলে সাম্প্রতিক অতীত থেকে পুরুষদের হারাবার জন্য উঠে পড়ে লাগবার, আমাদের মানে মেয়েদের মধ্যে যে জ্বালাধরা প্রবণতা লক্ষ করছি তাতে আমার মনে হয় যে, এর পেছনে আমাদেরই কোনো হীনম্মন্যতা কাজ করেছে।

জানি না, এই কথা বলার জন্য আমাকে নারীবাদীরা ক্ষমা করবেন কিনা। এও জানি না, একথা মনস্তাত্ত্বিকেরা গ্রহণযোগ্য বলেও মানবেন কিনা। তাতে অবশ্য কিছুই যায়-আসে না। যদিও আমি নারী কিন্তু আমি তো একজন ব্যক্তিও। পুরুষ হলেই যেমন সবাই আগ্রাসী পুরুষ নন, নারী হয়েও নারীবাদী নাও হওয়া সম্ভব এবং এই হওয়া-না-হওয়া সম্পূর্ণই ব্যক্তি আমার নিজস্ব স্বাধীনতার এক্তিয়ারেই পড়ে। আমার নিজস্বতা, আমি কোনো কারণেই কাউকেই অর্পণ করতে রাজি নই। না, কারো হাতেই নয়। তিনি তোমার মতো কোনো প্রার্থিত পুরুষই হন কী অতিআধুনিক কোনো উগ্র নারীবাদী নারীই হন।

দিগন্ত, আমি একটি ব্যাপারে তোমার সাহায্য চাই। তোমাকে আজ চিঠি লিখতে বসার সেইটিই আসল কারণ।

আমাদের এখানে একটি ছেলে নতুন এসেছে ওড়িশা থেকে। তার বাড়ি ভুবনেশ্বর। আমাদের মধ্যে অনেকেই যেমন কলকাতাতেই জন্মান, কলকাতাতেই পড়াশোনা করেন এবং কলকাতা ছাড়া আর কিছুই জানেন না, যাঁদের "বিশ্ব" এবং "কলকাতা" সমার্থক তেমনই অনেক নির্ভেজাল ভুবনেশ্বরী আছেন, (স্ত্রী এবং পুরুষও) যাঁদের কাছে "ভুবনেশ্বর" আর "ওড়িশা" সমার্থক। কিন্তু এ ছেলেটি কলকাতাইয়া বা ভুবনেশ্বরীদের মতন কূপমণ্ডূক নয়।

ছেলেটি কিন্তু ভারি ভালো। আমার চেয়ে বয়সে অনেকই ছোটো। কিন্তু অত্যন্তই মেধাবী। মার্লবরোর হীরকদ্যুতি,—রীতাদি বলছিলেন যে এরকম মেধাবী ছাত্র নাকি ভারত থেকে বহুদিন এই অঞ্চলে আসেনি।

আমার মুখ থেকে বাঘমুণ্ডার এবং আশেপাশের অঞ্চলের বন-পাহাড়ের কথা শুনে ওর বিস্ময় এবং ঔৎসুক্য প্রবল হয়েছে ওড়িশার ওই অঞ্চল সম্পর্কে। আমাকে ও অনুরোধ করেছে (ওর নাম টুটু নায়েক) যে, আমি যেন তোমার কাছ থেকে ওই অঞ্চলের পুরো বিবরণ, বিশেষ করে বনাঞ্চল এবং বনবাংলো ইত্যাদি সম্পর্কে যতখানি সম্ভব ডিটেইলসে জেনে নিয়ে তাকে জানাই, যাতে ও এর পরের ছুটিতে দেশে ফিরে পুরো ছুটিটাই ওই সব অঞ্চলেই কাটাতে পারে।

জানি না কেন, আজকাল মানুষ মাত্রের মধ্যেই একধরনের অতৃপ্তি, অসুস্থতা এবং অস্থিরতা দেখতে পাই। তোমার সঙ্গে বাঘমুণ্ডাতে সামান্য কিছু সময় কাটিয়ে এই কথাই আমার বারেবারে মনে হয়েছে, আমাদের এই অস্থিরতা, এই মতিচ্ছন্নতা এ সবেরই মূল কারণ! প্রকৃতি থেকে দূরে সরে আসা, প্রকৃতি বলতে আমি খালি বনজঙ্গলের কথাই বলছি না, যারা গ্রামে মানুষ তারাও প্রকৃতি-পালিত। গাছগাছালি, আকাশ, গৃহপালিত পশু, গ্রামের আশেপাশের ঝোপঝাড়ের পাখি, পোকা, সাপ, ধুলোর পথ, বৃষ্টি-রোদ এবং চাঁদের খুব কাছাকাছি থাকাটা বোধহয় খুবই জরুরি।

গ্রাম ছেড়ে দলে দলে শহরে-আসা এই আমরাই এতদিন দলে ভারী ছিলাম। এখন এমন একটা সময়ে এসে আমরা পৌঁছেছি যখন সারা পৃথিবীতেই মানুষ দলে দলে শহর ছেড়ে গ্রামে যাবে। প্রকৃতির কাছে, বড়ো গাছের নিচে, অরণ্যে। সত্যি বলছি, অরণ্যে যে শান্তি, যে গভীর সুখ তারা ব্যাখ্যা আমি করতে পারব না। তেমন কোনো সুখ শান্তির কথা আমার জানাও নেই।

মিথ্যে বলব না, কখনো কখনো একথা মনে হয় যে তোমার ব্যক্তিত্বে, সান্নিধ্যেই কি এমন পরিবর্তন ঘটল আমার মধ্যে? কিন্তু না : অনেকেই ভেবে দেখেছি, গাড়ি চালাতে চালাতে, স্নান করতে করতে, একা বিছানায় শুয়ে, অনেকেই ভেবে দেখেছি যে, তোমার ব্যক্তিত্বের চেয়েও সম্ভবত ওই অরণ্যের ব্যক্তিত্বই আমাকে অনেক বেশি প্রভাবিত করেছে।

অরণ্যের কাছে, প্রকৃতির কাছে হার-মানতে অরণ্যপ্রেমী দিগন্ত বোসের দুঃখ হবে না নিশ্চয়ই।

চিঠি অনেকই বড়ো হয়ে গেল। তোমার সময় নষ্ট হবে পড়তে। তবে আমি খুব খুশি হব যদি তুমি একটি দীর্ঘ চিঠি আমাকে লেখো, টুটু যা জানতে চেয়েছে তা জানিয়ে। তাহলে টুটুর সঙ্গে

আমিও অনেক কিছু জানতে পারব। এবং হয়তো আমিও এর পরের বারে দেশে গিয়ে টুটুরই মতো অথবা টুটুরই সঙ্গে অরণ্যচারী হব।

জানো দিগন্ত, তুমি অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা না করে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষাতে বসে ফরেস্ট সার্ভিসে কেন যে গেলে না তাই ভাবি মাঝে মাঝে। বারেবারেই তুমি আমাকে বলতে বাঘমুণ্ডাতে অরণ্যবাসের সময়ে যে, বন এবং বন্যপ্রাণী যেভাবে নষ্ট হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে তার ফল, সেই পাপের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত যেভাবে আমাদের করতে হবে সেই সম্পর্কে কোনো ধারণাই সম্ভবত আমাদের এখন পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। এইডস অথবা আণবিক বোমা অথবা কেমিক্যাল ওয়ার-ফেয়ার নিয়ে আমরা সদা চিন্তিত, সদা আতঙ্কিত কিন্তু অরণ্যহীন পৃথিবী যে কী সাংঘাতিক অভিশাপ, তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। সত্যিই ইদানীং প্রায়ই ভাবি যে, তোমার কথা বা তোমার মতো অন্যরা যাঁরা আছেন; তাঁদের কথাও যদি এখনও শুনি আমরা, তাহলে হয়তো যা হারিয়েছি তা ফিরে না পেলেও, সেই বিলম্বিত প্রায়শ্চিত্তর পথে অন্তত একপা একপা করে এগুতে পারি।

এবারে শেষ করছি।

তোমার তাতে প্রয়োজন না থাকলেও, আমার ভালোবাসা জেনো।

Take Care!
ইতি—
তোমার ইন্দি

দিগন্ত বোস
যশপুর
কটক

চার

যশপুর
কটক
ওড়িশা

ইন্দি,

কল্যাণীয়াসু,

এখানে পৌঁছেই দু দিনের জন্যে বম্বে যেতে হয়েছিল একটা সেমিনার অ্যাটেন করতে।

আজকাল তো "সেমিনার" বলে না, বলে ওয়ার্কশপ।

অমর্ত্য সেন এসেছিলেন। সেজন্যেই গেছিলাম।

ভদ্রলোক সম্বন্ধে অনেকেই পড়েছিলাম। ওঁর লেখা বই ও প্রবন্ধ তো পড়েইছি; ওঁকে চাক্ষুষ দেখারও খুব ইচ্ছে ছিল। হয়ে গেল তা। বলতে পারো, "দেবদর্শনই"।

সকলের দেবতা তো এক হয় না। তোমার দেবতা সুসীমমুকুল দত্ত, আমার দেবতা অমর্ত্য সেন। তবে দেবভূমিতে অবস্থানকারী সকলেই সমান পূজ্য। পূজারীদের অধিকার এবং যোগ্যতা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে।

গত বছরে, সম্ভবত পৌষমেলার সময়ে উনি যখন শান্তিনিকেতনে ওঁদের পৈতৃক নিবাসে স্বল্পদিনের জন্যে এসেছিলেন তখন আমার এক বন্ধু আমাকে জোর করেই নিয়ে যাচ্ছিল সেখানে। কিন্তু আমি তখন যাইনি।

অসাধারণ, অতিব্যস্ত এবং বিখ্যাত মানুষদের জীবন এবং অনেক সময়ে জীবনযাত্রাও যে সাধারণ নিয়মেই অসাধারণ হতে বাধ্য এই সাদা কথাটা আমাদের মতো সাধারণেরা প্রায়ই বুঝতে চাই না। কেন যে তা বুঝতে পারি না। তাঁর সুবিধে-অসুবিধে, সময়ের বা অবকাশের মধ্যে ফাঁকফোকর আছে কি নেই, তা না জেনেই তাঁদের উপরে গিয়ে "হামলা" করাটা আদৌ দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মানুষদের কাজ নয়। কলকাতার আমার সেই বন্ধু হারিতচন্দ্র নাকি অমর্ত্যবাবুর প্রথমা স্ত্রী অধ্যাপিকা নবনীতা দেব সেন-এর পৈতৃক নিবাস, বালিগঞ্জের হিন্দুস্থান পার্ক-এর পাশের বাড়ির বাসিন্দা ছিল। সেই সুবাদেই তিনযুগ আগে নাকি তাঁর সঙ্গে আমাদের হারিতের আলাপ হয়েছিল এবং যেহেতু অমর্ত্য সেনের সুদর্শন এবং প্রতিভামণ্ডিত চেহারাই, তাঁর গুণপনা নয়, স্কুলের ছাত্র হারিতকে পরবর্তী জীবনে ইকনমিস্ট হতে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল, শুধুমাত্র সে-কারণেই হারিতের IPSO-FACTO জোর বা দাবি ছিল, বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টেই শান্তিনিকেতনে অমর্ত্যবাবুর স্বল্প-অবকাশে এবং পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে গিয়ে পড়ে "হামলা" করার।

আমাদের পরিচিত হারিতচন্দ্র বলাই বাহুল্য, এমন করার মধ্যে কোনো অন্যায়ও দেখেনি।

কিন্তু আমি ওর ওই "ঝুলে পড়া" মনোবৃত্তিতে, কমিউনিস্টরা যাকে "শামিল" হওয়া বলেন, তেমন শামিল হতে পারিনি। বাঘের সঙ্গে দেখা করতে চিড়িয়াখানায় না গিয়ে গভীর বনে যাওয়াটাই উচিত। প্রত্যেক সাক্ষাতেরই বিশেষ বিশেষ জায়গা থাকা উচিত। মানে, PLATFORM।

পিছন ফিরে চেয়ে এখন ভাবি, যাইনি যে ভালোই করেছিলাম। পরে অন্যদের মুখে শুনেছিলাম যে অমর্ত্য সেন হারিতের সঙ্গে দেখাই করেননি।

যাঁরা প্রকৃতই ব্যস্ত মানুষ, বিখ্যাত অথবা অবিখ্যাতও, তাঁদের পক্ষে "জনগণের নেতাদের" মতো "জনপ্রিয়" হবার সাধনাতে ব্যাপৃত না থেকে তাঁদের নিজের নিজের সাধনাতে ব্যাপৃত থাকাটাই বাঞ্ছনীয় এবং স্বাস্থ্যকর। আমাদের মধ্যে খুব কম মানুষই কাজ করা কাকে বলে বুঝি না বলেই কাজের মানুষদের সময়ের মূল্য এবং স্বল্পতার স্বরূপ না-বুঝে তাঁদের প্রতি অবিচার করি। পৃথিবীর কোনো "কেজো" দেশেই এমন লজ্জাকর স্বাধীনতা নেবার কথা কেউ ভাবতেই পারেন না। ব্যস্ত এবং বিখ্যাত মানুষেরা বাড়িতে আছেন বলেই বহিরাগত যিনিই আসবেন তাঁরই সঙ্গে উইদাউট অ্যাপয়েন্টমেন্টে দেখা করা ন্যায্য কারণেই যে অসম্ভব এই কথাটা অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষই বোঝেন না দেখে বড়োই অবাক লাগে। 'ইগো' সকলেরই থাকতে পারে। বুনো শুয়োরের দাঁত থাকে। ঘোড়ার মেদহীন জননেন্দ্রিয়, অনেক ভালো বাংলা গদ্য লিখিয়েদের মেদহীন বাংলা লেখার ইগোরই মতো। কিন্তু সাধারণের "ইগো" যদি অসাধারণের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে ধাক্কা দেয় তবে তাকে "ইগোর" আত্মহত্যা বলে বিবেচনা করা ছাড়া অন্য কোনো ভাবে ব্যাখ্যা করার উপায়ই দেখি না।

আবার অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলাম।

অমর্ত্য সেনকে বম্বেতে কাছ থেকে দেখলাম, তাঁর বক্তৃতা শুনলাম। তাঁর চেহারা, বক্তৃতা এবং পাণ্ডিত্যতে মুগ্ধ, অভিভূত এবং বিস্মিত হলাম। এই কথা বলতে বসে বেচারি হারিতচন্দ্রর চরিত্র-চর্বণও করে ফেললাম। আসলে আমাদের চারপাশে হারিতরা এত বেশি সংখ্যায় আছে যে, তাদের ভুলে থাকাও সম্ভব নয়।

বম্বে গিয়ে উপরিলাভ হল, তাজমহল হোটেল দেখা। ওয়ার্কশপটা ওখানেই হল। আমাদের দেশে অবশ্য এখন অনেকই ভালো ভালো, মানে তোমাদের মতো বড়োলোকদের থাকার মতো, হোটেল হয়েছে। অথচ সেই তুলনাতে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্তদের থাকার মতো হোটেল হয়ইনি বলতে গেলে। কলকাতাতেও সাম্প্রতিক অতীতে "তাজ বেঙ্গল" হয়েছে। ওবেরয় গ্র্যান্ডও তো ভালোই। কিন্তু বম্বের "তাজমহল" হোটেল, বিশেষ করে OLD WING-টি পৃথিবীর মধ্যে একটি দর্শনীয় বস্তু। আভিজাত্যের কারণে।

শুনলাম, একা থাকতেই নাকি একদিনের মাশুল বারো হাজার টাকা। একটি প্লেইন দোসার দাম সেখানে প্রায় দেড়শ টাকা, অবশ্য ট্যাক্স ফ্যাক্স নিয়ে, এক কাপ চা-এর দাম প্রায় পঁচাত্তর টাকা। পেন্ট-হাউসের প্রেসিডেন্সিয়াল স্যুইটের ভাড়া দিনে মাত্র পঁচাত্তর হাজার। তদুপরি কুড়ি পারসেন্ট লাক্সারি ট্যাক্স। আমি এই সাতানব্বই-এর ট্যারিফ-এর কথা বলছি। তবুও নাকি ওই হোটেলে জায়গা পেতে হলে বহুদিন আগে থাকতে বুকিং না করলে চলে না।

আমি অবশ্য উঠেছিলাম অতি সাধারণ একটা হোটেলে। দাদারে।

এবারে যখন দেশে আসবে টুটু নায়েকের সঙ্গে, তখন বম্বে হয়েই এসো। এবং তাজ-এর ওল্ড উয়িং-এ দিন দুই থেকে এসো। আমাদের টাকাতে বারো হাজার টাকা অনেকেই টাকা কিন্তু তোমাদের কাছে তা তো হাতের ময়লা মাত্র। টাকার বিনিময়মূল্য নিরন্তর কমতে থাকায় তোমাদের কোনোরকম চেষ্টা ব্যতিরেকেই তোমরা এন.আর.আই-রা দিনকে দিন আরও বড়োলোক হয়ে যাচ্ছো ভারতীয়দের প্রেক্ষিতে। থেকে এসো। ভালো লাগবে।

টুটু নায়েক এবং তোমার জঙ্গল ভ্রমণের সুবিধার্থে এবং তোমার আজ্ঞানুসারে ওড়িশার ওই অঞ্চলের বনজঙ্গলের সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য সবিস্তারে জানাব এই সপ্তাহ থেকেই। হঠাৎই বম্বে চলে যেতে হওয়াতে অনেকই কাজ, অনেকই চিঠি জমে গেছে। তাছাড়া, কিছুদিন হল প্রীতি পাণিগ্রাহী বলে আমার এক ছাত্রীকে, পড়াশোনাতে আলাদা করে সাহায্য করতে হয়। ভারি মেধাবী সে। টুটুর চেয়েও মেধাবী কিনা তা অবশ্য বলতে পারব না। মেয়েটা আমাকে এমন করে জড়িয়েছে, স্বর্ণলতা যেমন করে কোনো ঋজু গাছকে জড়ায়, যে, আমি বড়ো বিপদে আছি। জানি না, বিপদটাই হয়তো সম্পদ। সম্পদ আর বিপদের মধ্যে তফাত কতজনেই বা বোঝে বলো?

তুমিও কি বোঝো?

সে নাকি, মানে প্রীতির কথা বলছি; আমারই জন্যে দিল্লির জওহরলাল নেহরু য়্যুনিভার্সিটিতে গেল না। সেখানে নাকি আমার মতো অধ্যাপক সে পেত না। কী বলি বলো তো? যেখানে রামপ্রসাদদার (সেনগুপ্ত) মতো অধ্যাপকেরা আছেন সেখানে আমি কোন ছার। কী করা যাবে। প্রীতি, তাকে আমি পড়াব না বললেই এই কলেজ ছেড়ে চলে যাবে এবং নানা অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটাবে বলে আমাকে প্রায়ই ভয় দেখায়। ওড়িয়া মেয়েরা হয়তো বাঙালি মেয়েদের চেয়েও বেশি লাবণ্যময়ী এবং মেয়েলি। মেয়েদের মধ্যে পুরুষেরা মেয়েলিপনাকে একটা বড়ো গুণ বলে মনে করে। আধুনিক মেয়েরা নিজেরা তা মনে না করলেও কথাটা সত্যি।

আসলে তোমরা "অবলা" মেয়েরা যে জন্ম থেকেই কী সাংঘাতিক রকম সশস্ত্র, কী বিচিত্র যে

সেই সব অস্ত্রশস্ত্রর প্রয়োগরীতি, তা যদি তোমরা সকলেই জানতে তাহলে আমাদের অবস্থাটা যে কীরকম ভয়াবহ হত, তা ভেবেই আতঙ্কিত হই।

ভালো থেকো।

ইতি—
দিগন্ত

শ্রীমতী ইন্দি সেন
মার্লবোরো
ম্যাসাচুসেটস,
ইউ.এস. এ.

মার্লবোরো,
ম্যাস
ইউ.এস.এ

অপম্রিয়মান দিগন্ত,

তোমার প্রীতি-স্নিগ্ধ চিঠির জন্যে ধন্যবাদ, তোমার মতো বনের বাঘকে যে আমার ছোঁড়া টুটু নায়েকের অলকা-পলকা তীর এমন করে সহজে বিদ্ধ করবে সেটা কিন্তু আমার অনুমানেরও বাইরে ছিল। আসলে সব বনের বাঘেরই অন্তত একটি করে মনের বন থাকে বোধহয়। বনের বাঘ হলেও মনের বাঘ সময়ে-সময়ে তাকে অবহেলাতে পরাস্ত যে করতে পারে এটা জেনেও ভালো লাগল।

তোমার প্রীতির (পাণিগ্রাহী) প্রতি কিন্তু আমার একটুও অপ্রীতি নেই। তবে একটি কথাই বলব যে, তুমি অধ্যাপক বলেই নিজের সুনামের কথা মনে রেখে তাকে অতি সযতনে, সাবধানে নেড়োচেড়ো। সে তোমার বড়ো আদরের ধন, কুসমরতন কিনা! তাছাড়া, ছাত্রীর সতীত্ব এবং শিক্ষকের সুনাম দুইই INTANGIBLE ASSET বলেই লোকে জানে। INTANGIBLE ASSET, গুডউইলেরই মতো। মুশকিল হল এই যে, থাকলেও সহজে বলা যায় যে নেই, আর না থাকলেও বলা যায় যে আছে, কারণ এই দুইয়েরই থাকা-না-থাকাটা TANGIBLE উপায়ে সহজে প্রামাণ্য বা অপ্রামাণ্য নয়। এই সম্পত্তিরা সহজ-গোচরও নয়।

তোমার আগের চিঠিটি সম্বন্ধে আমার কয়েকজন পরিচিতা ও বান্ধবীর সঙ্গে আলোচনা করেছি। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেছেন তুমি একজন প্রাগৈতিহাসিক মানসিকতার পশুচর্ম-পরিহিত গুহামানব। মুখে বড়ো বড়ো কথা বললেও তুমি ঘোর নারীবিদ্বেষী। আমারও তাই মনে হয়। আমি অবশ্য তাদের বলেছি যে, ইন্দি-বিদ্বেষী যে নও এটুকু অন্তত বলতে পারি।

বলতে পারি কি?

যাক এসব তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ। আমি এই মর্ত্যভূমিতে তোমার অমর্ত্যদর্শন-বৃত্তান্ত জেনে পুলকিত হয়েছি। আমি ওঁর মেধার ভক্ত, চেহারার নই, তোমার বা তোমার বন্ধু (না শত্রু?) হারিতচন্দ্রেরই মতো। প্রত্যেকেরই পছন্দ-অপছন্দ একই রকম হলে, প্রত্যেকেরই একই পুরুষ অথবা একই নারীকে পছন্দ হলে, এই পৃথিবীর আনাচকানাচে অবিরাম যুদ্ধ লেগেই থাকত। তোমার ও আমার

পছন্দ অন্তত কিছু কিছু ব্যাপারে যে আলাদা একথা জেনে আশ্বস্ত হওয়া গেল। যে দুজন মানুষের মানসিকতাতে একশোভাগ মিল থাকে তাদের কপালে দুঃখ অনিবার্য। কারণ, অচিরেই তারা মানুষ থেকে কবুতর-কবুতরি অথবা নেকপুষুমুনু জোড়া খরগোশে রূপান্তরিত হয়ে যায় অনবধানে।

মানুষের জীবনে এত বড়ো দুর্দৈবর কথা আমি ভাবনাতেও আনতে পারি না।

তোমার প্রীতির একটা ফোটো পাঠিয়ো তো। ভেবো না, তার প্রতি আমার বিন্দুমাত্র অসূয়া আছে। চাইছি, টুটুকে দেখাবো, তাই। পারলে প্রীতির ঠিকানাটাও জানিয়ো। ভয় নেই, ডাকে, লেটার-বম্ব পাঠাব না। প্রীতিকে তুমি টুটুর কথা বোলো। টুটু তো ওড়িয়া। নিজেরা যে-সময়ে, যে-বয়সে প্রেম করার, তা করিনি বলেই হয়তো ওরা আমাদের চোখের সামনে তা করলে বেশ লাগবে।

টুটুর প্রতি আমার মানসিকতাটা, দেখতে পাচ্ছি ক্রমশই আস্তে আস্তে শাশুড়িরই মতো হয়ে যাচ্ছে। জানি না, আমার কপালে কী আছে। যে মা-ই হয়নি, তার মনে জামাই-স্নেহ আসে কি করে।

জঙ্গলের খবর দেওয়া চিঠিটি দয়া করে এবারে লিখতে বোসো। টুটু নায়েক আমাকে খেয়ে ফেলল। সে এই বছরই ক্রিসমাসের সময়ে দেখে যাবে। মানে, ভাবছে। TOYING WITH THE IDEA। তখনই জঙ্গলে যাওয়ার ইচ্ছে ওর। সেই কারণেই এত তাড়া।

ভালো থেকো। প্রীতিধন্যও থেকো।

তোমার প্রীতি-সিক্ততাতে তোমার প্রতি আমার প্রীতি একটুও কমবে না। পিরিতি আর প্রীতি শব্দদুটি সমার্থক নয়। মানো তো সে কথা?

ইতি—
নিরুদ্‌বিগ্না ইন্দি

পুনশ্চ :

মারেফতী গান কাকে বলে?

টুটু নায়েককে নিয়ে সত্যি বড়োই মুশকিলে পড়েছি। তার যে কোন বিষয়ে ইন্টারেস্ট নেই, তা জানি না। এই রকম সর্বগ্রাসী ঔৎসুক্য সম্পন্ন ছেলে আগে আর দেখিনি। আমার চেয়ে অনেকই ছোটো হলেও ওরই কারণে আমার জানাশোনার পরিধি ক্রমশই বড়ো হয়ে যাচ্ছে। মানুষের ঔৎসুক্যই যে যৌবন, ঔৎস্যুকের অভাব আর মৃত্যু যে সমার্থক তা প্রচণ্ড জীবন্ত টুটুকে চোখের সামনে দেখে যেন নতুন করে বুঝতে পারছি।

মারেফতী গান না কি মুসলমানদের একরকমের গান। বাংলা গান। অথচ এখানে আমার যে ক-জন পরিচিত মুসলমান নারী-পুরুষ বন্ধু আছেন তাঁদের মধ্যে কেউই বলতে পারলেন না। তাঁরাও তো আমাদের মতো 'সাহেব মেমসাহেব' হয়ে গেছেন। বলতে পারবেন কি করে।

সইফুদ্দিন, যার সঙ্গে কলকাতাতে তোমার একবার দেখা হয়েছিল বছর পাঁচেক আগে, বলল, যে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজকে লিখতে। এসব ব্যাপারে তাঁর জ্ঞান নাকি প্রবাদপ্রতিম। তাঁর ঠিকানাটা কি দিতে পারো?

এই ছেলেটা আমাকে পাগল করে দেবে। এত ছেলেমানুষ এবং এমনই অবুঝ যে কী বলব। গা-জ্বলে যায় তার অপরিসীম ইনকুইজিটিভনেস-এ। আবার, সত্যি বলতে কি, ওর প্রতি তীব্র এক ভালোলাগাও জন্মাচ্ছে। তবে জামাই-এর প্রতি শাশুড়িদের যেমন ভালোলাগা থাকে, তেমনই আর কী।

শ্রী দিগন্ত বোস
যশপুর, কটক, ওড়িশা

যশপুর
কটক
ওড়িশা

শশ্রুবালা ইন্দিঠাকরুন,

আপনার অবগতির জন্য তড়িঘড়ি জানাই যে, আজকাল কোনো সম্পর্কই আর নিরাপদ নয়। প্রচুর জামাইখেকো শাশুড়ি এবং শাশুড়িখেকো-জামাইদের খবর আমি রাখি। সাবধানে থেকো। কোনোদিন "ম্যানইটিং লেপার্ড অফ রুদ্রপ্রয়াগ" অথবা "ম্যান ইটার অফ থক"-এর মতো তুমিও জামাইখেকো শাশুড়ি অফ মার্লবোরো বলে কুখ্যাত না হয়ে ওঠো।

সিরাজসাহেবের ঠিকানা আমার কাছে নেই, তবে একটা ঠিকানা দিচ্ছি—সেখানে 'কলকাতার অহংকার' এই নামের একটা বই পাওয়া যাবে। তাতে বাঙালি গাইয়ে, বাজিয়ে, কবি লেখক, চিত্রকর, চিত্রপরিচালক ইত্যাদি ইত্যাদি, যাঁদেরই নিয়ে কলকাতা অহংকার করতে পারে বলে মনে করে, তাঁদের সকলের নাম-ঠিকানা আছে। ঠিকানা, ইয়াং রাইটার্স, স্যুইট ৩, ব্লক বি, পূর্বাশা হাউসিং এস্টেট, ১৬০, মানিকতলা মেইন রোড, কলকাতা-৭০০ ০৫৪, ওখানে লিখতে পারো। একটি বইয়ের জন্যে। অনেক কাজে লেগে যাবে প্রবাসে। এ ছাড়াও 'গণশক্তি' সংবাদপত্র থেকে প্রতিবছর একটি বই ওঁরা বের করেন তাতেও অধিকাংশ বাঙালি কবি-সাহিত্যিক-গায়ক-বাদক-নাট্যকার-অভিনেতা-চলচ্চিত্র শিল্পী-পরিচালক ইত্যাদির নাম পাবে। বইটি খুবই কাজের।

সিরাজসাহেবের পাণ্ডিত্যের এবং ওঁর সাহিত্যের প্রতি আমারও শ্রদ্ধা আছে। তুমি কি তাঁর 'অলীক মানুষ' উপন্যাসটি পড়েছ? না পড়ে থাকলে, পড়বে। জোগাড় না করতে পারলে লিখো, কিনে পাঠিয়ে দেব।

উনি ভালো গোয়েন্দা গল্পও লেখেন। তাঁর সৃষ্টি গোয়েন্দার নাম কর্নেল। কিন্তু মনে হয়, শুধুমাত্র সিরিয়াস ঔপন্যাসিক এবং প্রবন্ধকার হলে আমরা ওঁকে আরও বেশি করে নিংড়ে নিতে পারতাম। কী আর করা যাবে, এদেশ তো তোমাদের 'স্টেটস' নয় যে, কেউ ষাঁড়ের শরীরের কোনো বিশেষ প্রত্যঙ্গর মাপের বৃদ্ধি বা হ্রাস নিয়ে অথবা কোকিলের গলার স্বরে মিষ্টতার তারতম্য নিয়ে গবেষণা করবেন মনস্থ করলেও শ'খানেক বিশ্ববিদ্যালয় হুমড়ি খেয়ে পড়ে তাঁকে বৃত্তি দিতে চাইবে। এ দেশে সিরাজসাহেবের মতো মননশীল মানুষেরও সংবাদপত্র সংস্থা থেকে অবসর নেওয়ার পর গোয়েন্দা কাহিনি লিখে, সংসার চালাতে হয়। অবসরের বয়স করণিকের, শ্রমিকের যা, সাহিত্যিকেরও তাই, সংবাদপত্রের মালিকদের মতে। সংবাদপত্ররাও এখানে সরষের তেল বা ভেলিগুড় বা এঁড়ে বাঁছুরের ব্যাপারিদের মনোবৃত্তিসম্পন্ন। অস্বীকার্য এবং অঘোষিত হলেও অর্থোপার্জনই তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ক্ষমতার লোভ তো আছেই। বিপুল অর্থভাণ্ডার গড়ে তোলার পরেই সাধারণ, অল্প বা অর্ধশিক্ষিত মালিক মাত্রই মনে তুমুল লোভ জাগে ক্ষমতার। এ-ব্যাপারে সব সংবাদপত্রই সমান। সংবাদপত্র ব্যবসা হলেও যে অন্য আর দশটা ব্যবসার সঙ্গে সেই ব্যবসার দৃষ্টিভঙ্গির অনেক তফাত থাকা উচিত ছিল, এই কথাটাই প্রায় সব সংবাদপত্ররই

'আধুনিক' এবং 'সাহেব' মালিকেরা মানেন না। ফলে, যা হবার তাই হচ্ছে। FODDER তৈরি হচ্ছে কুইন্টাল কুইন্টাল সকালে গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে, যার সঙ্গে দেশ বা দশের প্রকৃত হিতের আদৌ কোনো সম্বন্ধ নেই। আজকালকার কোনো সংবাদপত্রেরই নৈতিকতা যা দায়িত্ববোধ নেই, পয়সা রোজগারের জন্যে তাঁরা প্রথম পাতাতে তাঁদের পরিজনদের নগ্ন ফোটোও হয়তো ছেপে দিতে পিছপা হবেন না। এমনই হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যবসায়ী মানসিকতা। যেমন গণতন্ত্রের ধরন, যেমন রাজনৈতিক নেতাদের ছিরি, তেমনই ছিরি এই মহান গণতন্ত্রের রক্ষক, প্রহরী, "মরি মরি মিডিয়ার"। একেই বলে "ধন্যি রাজার পুণ্যি দেশ।"

"মারেফতী গান" সম্বন্ধে জানতে হলে তুমি টুটুকে বলো সে ড. শীলা বসাককে লিখুক। তাঁর ঠিকানাটা আমি জানি না, কিন্তু কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযত্নে লিখতে বোলো অথবা বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ সম্পাদক ড. বরুণকুমার চক্রবর্তীকে, উনি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের (জেলা নদিয়া) লোক সংস্কৃতি বিভাগের প্রফেসার এমিরিটাস। চম্পাহাটি কলেজেরও ওই বিভাগেরই রিডার। কিন্তু চম্পাহাটি জায়গাটা পশ্চিমবঙ্গেরই ঠিক কোন জেলাতে পড়বে তা জানি না। তাই বলছি, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযত্নে লিখতে। জেলা নদিয়া।

আমি ভাসা-ভাসা যতটুকু জানি, মারেফতী গান সম্বন্ধে, তা হল "মারেফাত" শব্দের মানে হচ্ছে জ্ঞান। সেই অর্থে আমি হচ্ছি 'অমারেফাত, ফেনা ভাতেরই মতো', অর্থাৎ অজ্ঞান।

মরমিয়াবাদ থেকেই মুসলমান সাধকেরা কোরান শরিফকে ভিত্তি করে এই সব গান রচনা করেছেন। সুফিবাদের নিকটতত্ত্বের বিশ্লেষণ ও বিন্যাস নিয়েই এই গানের উদ্ভব। পাঞ্জু শাহ এবং লালন ফকিরেরও গান আছে মারেফতী। জানি না, তুমি মুরশিদা গানের কথাও শুনেছে কি না।

আপাতত এই থাক। খুবই তাড়াতাড়িতে লিখছি। আমার কলিগ সাগর সামন্ত ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে। মহারাষ্ট্রে। তার স্ত্রী আসন্নপ্রসবা। তার সব ক্লাস তাই আমাকে নিতে হচ্ছে। নিশ্বাস ফেলার সময় নেই। ও বলে গেছে প্রিন্সিপালকে যে হবু মায়েরা তিন মাস ম্যাটার্নিটি লিভ পায় যখন তখন হবু বাবারা অন্তত মাসখানেক ছুটি পাবে না কেন? সত্যিই তো। কেন পাবে না, তাছাড়া বাউলেরা একটা গান গায় শুনেছি। তার নাম 'বিবির গোলাম'। বিবির সর্দি কাশি হলে স্বামী ওষুধ খায়। তাই যদি হয় তবে স্ত্রী আসন্নপ্রসবা হলে যথার্থ স্বামীরও তো প্রসববেদনায় বেদনাতুর হওয়ার কথা।

জঙ্গলের চিঠি এইরকম সাত-ঝামেলা নিয়ে লেখা যায় না। কোনো নারীকে বড়ো আদর করার আগে যেন গভীর একাগ্রতা ও মনোসংযোগের প্রয়োজন হয়, বনের বর্ণনা বা বন্দনার আগেও তেমনই একাগ্রতা ও মনোসংযোগের প্রয়োজন হয়। প্রকৃতিই যে পরমা। সব নারীর সেরা নারী।

পাবে চিঠি, দীর্ঘ চিঠি, আরেকটু অপেক্ষা করো। টুটুকে বলো "টু" টি না করে প্রতীক্ষা করে যেন। তেমন বড়ো কিছু পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতেই হয়। তাছাড়া, আমাকে তোমরা ভেবেছটাই বা কি? আমি কি ইন্দি, টুটু অ্যান্ড কোম্পানির ট্রাভেল এজেন্ট?

একটা কোম্পানির সত্যি সত্যিই খুললে কিন্তু মন্দ হত না। ফোর পাইস আনন্দের সঙ্গে টু-পাইস রোজগারও হত।

ভালো থেকো। আনন্দে থেকো।

ইতি—

বন্ধ দিগন্ত

মার্লবোরো
ম্যাসাচুসেটস
ইউ.এস.এ

আনস্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম,
দিগন্ত, আমার দিগ্‌দিগন্ত,

তোমার মধ্যে বোধহয় সক্রেটিস, প্লাটো, থোরো এবং রাসেল একসঙ্গে বাসা বেঁধেছেন। রাশ্যার কুখ্যাত রাসপুটিনও বাসা বেঁধে থাকতে পারেন। তোমাকে সৃষ্টির সময়ে মিস্টার ব্রহ্মা, স্বর্গের গুদামে অপ, ক্ষিতি, তেজ মরুত এর স্টক কমে আসাতে শুধুমাত্র ব্যোম দিয়েই হয়তো তোমাকে গড়েছিলেন। নইলে, এত জ্ঞান তোমার আসে কোথা থেকে। এত বিচিত্র বায়ু?

আসলে দোষ অথবা গুণ যে কার তা বুঝতে পারছি না। কিছুদিন হল আমার যে কী হয়েছে। কী বৈকল্য যে, তা বোঝাতে পারব না। এই বয়সে পৌঁছে আমার মতো এমন পশ্চিমদেশীয় স্বাবলম্বনে বিশ্বাসী একলা-পাখিও যে এমন মুক্তির অথবা পরাধীনতার তীব্র কামনার বিষয়ে আক্রান্ত হতে পারে, তা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়। সত্যি বলছি দিগন্ত, আমি নিজেকে একটুও বুঝি না। তোমাকে চিঠি লেখা আর তোমার চিঠি পাওয়াই আমার একমাত্র কাজ এবং প্রার্থনা বলে মনে হচ্ছে কিছুদিন হল।

কী সাংঘাতিক কথা বলো তো।

আমি জানি যে, এই চিঠি পড়তে পড়তে তুমি হাসছ। পাইপটা ধরিয়ে, দুটি পা তোমার চেয়ারের সামনের মোড়াতে তুলে দিয়ে ধোঁওয়া ছাড়ছ আর নিজের বশীকরণ বিদ্যার তারিফ তুমি নিজেই করছ।

তবে তুমি যাই করো না কেন। আমি যে মরেছি সে বিষয়ে আমার নিজের আর কোনোই সন্দেহই নেই। কী লজ্জার কথা। বাঙালি ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে অথবা শিক্ষিত, সপ্রতিভ চিত্রতারকাদের সঙ্গে অল্পবয়সি কলেজের মেয়েরা যেমন "প্রেমে পড়ে" আমিও কি তেমনই তোমারও প্রেমে পড়লাম! সে ধরনের প্রেম মানে তো একরকম রোম্যান্টিক অবসেশান, যার স্বপ্নিল পরিণতি শারীরিক সম্পর্ক। যদিও কল্পনাতেই। কিন্তু শারীরিকভাবে তোমার কাছে বাস্তবে আসার পরেও এ ঠিক কী ধরনের মানসিক অনুভূতি তা বুঝতে পারি না।

শরীর বোধহয় হেলাফেলাতে পছন্দসই পুরুষকে সহজেই দেওয়া যায় ক্ষণিকের আনন্দ পাওয়া এবং হয়তো বিলোনোর জন্যেও কিন্তু মন দেওয়া বড়ো কঠিন। কঠিনই শুধু নয়, এই দেওয়ার প্রাক্রিয়াটাও বড়ো জটিল।

আমার আজকাল একেবারেই ভালো লাগে না।

আমার মেজোমামা একটা গান গাইতেন, পুরাতনী; "ননদিনি বোলো নগরে, আজ ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণকলঙ্ক সাগরে।" যতদূর জানি নিধুবাবুর টপ্পা। কিন্তু আমি যে দিগন্ত সাগরে ডুবেছি। ডুবেছি শুধু নয়, হাবুডুবু খাচ্ছি। হঠাৎই দিন সাতেক হল এমন ঘটেছে। কী রোগে যে ধরল আমায়! এই কেজোদের দেশে, রণ-পা এর বদলে যেখানে গাড়ি চড়ে দৌড়ে বেড়ায় মানুষ-মানুষী, যেখানে বেঁচে থাকা মানেই দৌড় আর কাজ, কাজের ফসল মানে বাড়ি, গাড়ি, টাকা, আরও টাকা, সেখানে এই ভেতো-বাঙালির মানসিকতাতে কী করে আক্রান্ত কে জানে।

বাইরে অঝোরে বৃষ্টি পড়েছে, সন্ধে হয়ে আসছে। গাছের সবুজ আরও তীব্র হয়েছে কিন্তু (দ্যাখো, প্রকৃতি-পড়ুয়ার ভাষায় কেমন চেকনাই লেগেছে তোমার কাছে প্রকৃতি পাঠ নিয়ে।)

পাখিরা আজ ঘরে ফিরতে পেরেছে কি না জানি না, বৃষ্টি নেমেছে ওদের ঘরে ফেরার অনেক আগেই। আমাদের এই মার্লবোরো জায়গাটা এমনই সবুজ, প্রত্যেক বাড়িতেই এত বড়ো লন, বড়ো বড়ো গাছপালা যে বৃষ্টি নামলে সত্যিই মন কেমন করে অথচ এই প্রকৃতি আর তোমার হাত ধরে দেখা ওড়িশার বাঘ্বমুণ্ডার প্রকৃতির মধ্যে কত তফাত!

আজ শনিবার। ছুটি। দিনে রাতের এই সময়টাই বোধহয় তোমাকে চিঠি লেখার সঠিক সময়। তুমি বিশ্বাস করবে কি না জানি তবে দিনের যখন-তখনই কিন্তু তোমাকে চিঠি লেখা যায় না। অন্তত আমি পারি না।

বাঘ্বমুণ্ডা থেকে ফিরে এখানে আসার পরে এমন একটি দিন রাতও থাকেনি আমার, যেদিনের স্মৃতিতে তোমার স্মৃতি জড়িয়ে নেই। না। একটি দিন ও রাতও নায়। কিন্তু চিঠি লেখা তো সবদিন হয় না, সব সময়েও হয় না। এখান থেকে তো আরওই হয় না। এখানে আমার সময় যে অনেককেই ইজারা দেওয়া আছে।

একেক সময় এও মনে হয় দিগন্ত যে, তোমাকে চিঠি না লিখলেই বোধহয় ভালো হত, তোমার জন্যে তো বটেই, আমার নিজের জন্যেও। যে আগুন মনের মধ্যে জ্বলেছে তাকে আরও জোর করে কি হবে? আমাদের দুজনের জীবন এমনই যে এই আগুনের সুন্দর সুষম নিবৃত্তি হওয়ার তো কোনো উপায়ই নেই। আর নেই-ই যদি, তাহলে আর এই বেদনার ভারকে আরও ভারী করে তোলা কেন?

তুমি তোমার শত কাজের ফাঁকে, নিরন্তর দৌড়াদৌড়ির মধ্যে, তোমার প্রীতি, স্মৃতি, জ্যোৎস্না, সুজাতা, নন্দিনীদের ভিড়ের মধ্যে আমাকে মনে করে কত জায়গা থেকেই না লেখো চিঠি। সব চিঠির উত্তরও তো দিই না তবুও লেখো তুমি। HOW SWEET OF YOU! HOW KIND OF YOU! তুমি তোমার আশ্চর্য সুন্দর অগণ্য সব বনগন্ধময়, নদীগন্ধময়, জীবনগন্ধী চিঠি লিখে আমার মান বাড়িয়েছ। এই সুদূর উত্তর আমেরিকার পূর্বাঞ্চলের, যেখানে ইংল্যান্ড থেকে মানুষেরা এসে প্রথমে তাদের জাহাজ ভিড়িয়েছিল উপনিবেশ গড়বে বলে; এক নিভৃত কোণে কে এক ইন্দি বাস করে, তাকে (তাকে আগে কতটুকুই বা চিনতে তুমি!) সময় করে, মনে করে, আদর করে কত চিঠি দিয়েছ তুমি। তোমার সেই সব রসস্নিগ্ধ পুরুষ-পুরুষ গন্ধের চিঠি আমার মান যে কতখানি বাড়িয়েছে তা যদি তুমি একটুও জানতে।

আমিও তো প্রকৃতি। পুরুষ ও প্রকৃতি কথাটা জানতাম কিন্তু বনময় তোমাকে না জানলে এই কথার তাৎপর্য বুঝতাম না কখনওই। যখন আমাদের এই চিঠির ভেলা ছিল না তখন তো আমি এমনই বাস করতাম হেনরি ডেভিড থোরোর WALDEN POOL এর কাছের বস্টনের এই মার্লবোরোতে। বাস করতাম একলা। কেমন করে সকাল থেকে রাত, রাত থেকে সকাল কেটে গেছে গত সাতটা বছর তা এখন মনেও পড়ে না। এখন তোমার এক একটা চিঠি এক একটা নতুন যুগকে মুখে করে নিয়ে কোনো সবুজ পাখিরই মতো আসে আমার জীবনে। "ডোর-বেল" বাজায়। প্রত্যাশা, হতাশা, আনন্দ, বিষাদ জীবনে যে এতরকমের অনুভূতি সত্যিই আছে, এই সব শব্দ যে শুধু অভিধানেই শোভা পায় না, একথা তোমার চিঠির মুকুরে নিজেকে বিভিন্ন কোণে, বিভিন্ন আলোতে প্রতিফলিত না দেখতে পেলে কোনোদিন হয়তো জানতেও পারতাম না।

লুকিয়েই তো আমি রেখেছিলাম নিজেকে এতদিন, এত বছর পৃথিবীর কাছ থেকে, নিজের কাছ থেকে। যে-পৃথিবী আমাকে চেনে সেই আমি তো এই-আমি ছিলাম না। কোনোদিনই নয়। আমাকে কেই বা চিনত? আজই বা কে চেনে? মসৃণ, অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন, গভীরতাহীন একটা "জন্ম" একটা "মনোহর" "ভোগবাদী" জীবন কাটিয়ে যাচ্ছিলাম।

বেশ ছিলাম কিন্তু। এই 'সাধারণত্বর' জন্যে নিজেকে কখনও ধিক্কার দিইনি। আসলে তোমাকে তোমার নিজস্ব পরিবেশে, বনজঙ্গলের পটভূমিতে না দেখলে জীবনের সাধারণত্ব কি আর অসাধারণত্বই বা কি তাও তো এমন করে জানা হত না।

মাঝে মাঝে ভাবি, এ জীবনে আর কোনোদিনও তোমার কাছে যাব না, তোমাকেও আমার কাছে আসতে বলব না। কারণ, তুমি আমার জীবনের এক সুন্দর স্বপ্ন। আমি চাই না তাতে বাস্তবের রঙ লাগুক। দূরে থেকে আমি কত সহজ। দুখি, অবশ্যই। কিন্তু নৈকট্যের দুঃখ তো আরও অনেক বেশি হতে পারত। কে বলতে পারে! তাছাড়া, জানালার শার্সির উপর থেকে শ্রাবণদিনের বৃষ্টির সবুজাভা সরে গেলে, কাচ আবার তার স্বচ্ছতা ফিরে পেলে, ওপাশে কি যে দেখা যাবে, তাই-বা কে বলতে পারে। তার চেয়ে দূরে থেকে, আমার সব স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা এই ঘেরাটোপের মধ্যে আমার বড়ো সোহাগের কল্পনাগুলিকে ছোটো ছোটো নানারঙা বদরী পাখিদেরই মতো ইচ্ছেসুখের দানা খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখি, ভবিষ্যতে কোনোদিন তাদের সকলকে খাঁচার দরজা খুলে উড়িয়ে দেব বলে।

জানি না দিগন্ত, কী লিখলাম, কেন লিখলাম; কেমন করে লিখলাম। আমি যে এমন তরতর করে বাংলা লিখতে পারি এতদিনের অনভ্যাসের পরেও, আমার মাতৃভাষা যে এমন সমৃদ্ধ, এমন সুন্দর; প্রবাসে থাকলে যে সাহেব-মেমসাহেব না হয়ে ঘোরতর বাঙালি হয়েও থাকা যায় একথা ফুলের আঘাতের মতো তোমার চিঠির মৃদু ও তীব্র তাড়নাতে অভিজ্ঞ না হলে তো জানতাম না। আমার এত বছরের অনভ্যাসে, রুদ্ধ হয়ে যাওয়া সব অভিব্যক্তির উৎসমুখ তো এমন করে উৎসারিত হতে পারত না। একেকজন পুরুষ অথবা নারী অন্য নারী অথবা পুরুষের জীবনে যে কী আশীর্বাদ হয়ে আসতে পারে তা ভাবতে বসলেও শিহরিত হই।

একঘেয়েমির, দৈনন্দিনতার বিষেয় আমি নীল হয়ে বেঁচেছিলাম এত দিন। তুমি বিষহর, এসেছ আমার এই জীবনে। ইসস। কী এলাহি ব্যাপার বলো তো! মনে হচ্ছে আমার ঈশরমূল হয়ে আমার প্রায় মজে-যাওয়া পানাপুকুরের মধ্যে দীর্ঘ-গ্রীবা, নয়নমোহন, মনোরঞ্জন সাইবেরিয়ান কোনো রাজহাঁসই উড়ে এসে বসেছে, যেন শীত-সকালের সব কুয়াশা তার মস্ত মস্ত দুধলি ডানায় মুছে দিয়ে

ভালো থেকো। চিঠি দিয়ো।

ইতি—

তোমার এলেবেলে ইন্দি

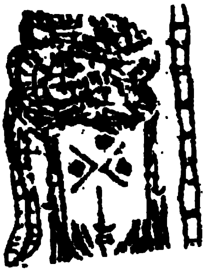

শ্রী দিগন্ত বোস
পো ঃ যশপুর
জিলা-কটক

যশপুর
কটক

কল্যাণীয়াসু,
ইন্দি

তোমার কাছ থেকে অনেকদিন চিঠি পাই না।

কেন? তুমি মার্লবোরো ছেড়ে অন্য কোথাও গেছ?

প্রীতিটাকে নিয়ে তোমার উত্তেজনা উপভোগ করছি। তোমার ছোঁড়া টুটু নায়েকের তীর গালিভারের গায়ে লিলিপুটদের ছোঁড়া তীরে যেমন অনুভূতি হয়েছিল আমারও তেমনই সুড়সুড়ি লেগেছে মাত্র। জানি না, তুমি আমাকে কি মনে করো।

তুমি সম্পূর্ণই মুক্ত। প্রকৃতি-বিহ্বল হয়ে একরাতে কোনো পুরুষের আঙ্কশায়িনী হলেই কোনো নারী সেই পুরুষের কিন্তু চিরদিনের সম্পত্তি বা বন্দিনি হয়ে যায় না। আসলে কম পুরুষই জানেন যে কোনো নারীই কোনো পুরুষের চিরদিনের সম্পত্তি তো ননই, একশোভাগ সম্পত্তিও নন। যাঁরা জনেন না তাঁরা ল্যাজে গুলি-যাওয়া বাঘের মতন অদৃশ্য শিকারিদের দেখতে না পেয়ে তার নিজের ল্যাজকেই তার শত্রু ভেবে হঠাৎই তীব্র ক্রোধের উৎসারের ধন্দে কামড়ে ধরেন। অবশ্যই কোনো নারীর একশোভাগ সম্পত্তি হয় না কোনো পুরুষও। একথাও যে নারীরা না জানেন, তাঁরা কিন্তু কষ্ট পেয়ে মরেন। জীবন অনেকই বড়ো, এখানে অনেকই আঁটে। এই সব ক্ষুদ্র, তুচ্ছ কোনো ঘটনার কোনো অভিঘাতই নেই একজন মানুষের সামগ্রিক জীবনের উপরে।

মাঝে মাঝে মনে হয় 'প্রেম' ব্যাপারটা ক্রমশই যেন কোনো অন্য গ্রহের অনুভূতি হয়ে যাচ্ছে। বালাপোশ তৈরি করতে যেমন অনেক পরতের পর পরত তুলোর আস্তরণ আর আতরের সুগন্ধ লাগে রেশমি কাপড়ের আস্তরণ দিয়ে তাকে ঢাকার আগে, প্রেম জন্মাতেও তেমনই যত্ন লাগে। এবং সময়ও।

তোমার টুটু নায়েক ও তোমারও জ্ঞাতার্থে এবারে সাতকোশীয়া গণ্ড অভয়ারণ্য সম্বন্ধে বলি। একবার গিয়েই যে পুরো অভয়ারণ্য ভালোভাবে ঘুরতে পারবে এমন নয়। তাছাড়া অধিকাংশ অভয়ারণ্যেই কনজার্ভেশানের সঙ্গে ট্যুরিজম এর আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক থাকে। বিশেষ করে অভয়ারণ্য গড়ে তোলার সময়টিতে। অরণ্য যত নীরব থাকে তখন, যত নিরুপদ্রব, যত কম বহিরাগতের পা পড়ে সেখানে বন্যপ্রাণী ও গাছগাছালি তত অনায়াসে বাড়ে, তত নির্বিঘ্ন হয়। সেই কারণেই হয়তো ওই অঞ্চলের গভীরের বিভিন্ন ফরেস্ট ব্লকের বন-বাংলোগুলি মেরামতির অভাবে, অযত্নে খণ্ডহারে পর্যবসিত হওয়া সত্ত্বেও বনবিভাগ ইচ্ছে করেই তা মেরামত করছেন না অথবা নতুন বাংলো বানাচ্ছেন না। বনের মধ্যে পথঘাটের অবস্থাও এখন শোচনীয় হয়ে গেছে। জিপে করেও যাওয়া যায় না। এর পেছনেও হয়তো বনবিভাগের সচেতন উপেক্ষা আছে। তাঁরা চান না যে কেউই আর ওই সব বনকোরকে যান, বনবিভাগের অধস্তন কর্মীরা ছাড়া, যাঁরা পায়ে হেঁটে বা সাইকেলেই বনের মধ্যে যাতায়াত করেন সাধারণত।

ওই অঞ্চলে কটক থেকে বা সম্বলপুর থেকে পৌঁছোনো যায় তবে কটক থেকেই কাছে হয়। কটকে ট্রেন থেকে নেমে মহানদীর ব্রিজ পেরিয়ে চৌ-দুয়ার, হিন্দোল, ঢেনকানল হয়ে অংগুলে এসে পৌঁছোতে হয়। অংগুল ফরেস্ট ডিভিশনের হেড কোয়ার্টাস অংগুলেই। জেলারও সদর দপ্তর।

ছেলেবেলাতে যখন ঋজুদার সঙ্গে গেছি অংগুলে, তখন ছোট্ট শহর ছিল, ঘুমন্ত। সেই সব দিনের কথা ভাবলে মন আনন্দে ভরে ওঠে। তখন ঋজুদা একাই আসতেন। তাঁর বিখ্যাত সাগরেদরা রুদ্র, তিতির এবং ভটকাই তখনও তাঁর ল্যাংবোট হয়নি। তারা অবশ্য ঋজুদার নানা অ্যাডভেঞ্চারেরই সঙ্গী। সেই সব অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি, ভারতের বিভিন্ন বনে এবং আফ্রিকারও, রুদ্র লিখেওছে, যাকে বলে জম্পেশ করে। তুমি না পড়ে থাকলে, ঋজুদার ওই সব অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনিগুলি অবশ্যই পড়বে—তাতে তোমার বন-বিলাসী মন শুধু স্নিগ্ধই নয়, উদ্দীপ্তও হবে।

অংগুল থেকে বড়োকেরাছক হয়ে বেড়াখোল বা সম্বলপুরের জঙ্গলে যাওয়া যায়। লবঙ্গীর জঙ্গলের পথও পড়ে বাঁদিকে। পুরণাকোটের একটু আগে ডানদিকে ঘুরে আমি আর তুমি বাঘ্মমুণ্ডাতে পৌঁছেছিলাম।

বাঘ্মমুণ্ডা বাংলো, হাতিগির্জা পাহাড়, হাতির দল যে তোমাকে এখনও আচ্ছন্ন করে রেখেছে একথা ভাবলেও তোমার গাইড হিসেবে ন্যায্য কারণে শ্লাঘা বোধ করি। আহ্লাদ বোধ করি তোমাকে ওই বাংলোতে আদর করার স্মৃতি মনে হওয়া মাত্রই। সত্যি। সোহাগের সঙ্গে যখন কামের মিশ্রণ ঘটে, ক্যামেরার ছবির মিক্সিং এর মতন তখন এক দুর্দান্ত অথচ কমনীয় বৈভবের জন্ম হয়, যাতে

সিঞ্চিত হয় দুজন মানব-মানবী। শহরে, বিজলি আলো-জ্বলা ঘরে, ডানলোপিলোর উপরে, এসি অথবা পাখার অথবা হিটারের আরামে তো প্রতি দিনে রাতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানব-মানবীই মিলিত হচ্ছে এই পৃথিবীতে। কিন্তু বাঘমুণ্ডার বাংলোর মতো বাংলোতে, কোনো অরণ্যাবৃত পাহাড়ি নদীর বা ঝরনার বা সাদা বা কালো গেরুয়া বালির চরে অথবা যে সব পাহাড়ে লোহা অথবা ম্যাংগানিজ আছে সেই সব পাহাড়ের নদীর নীল অথবা লাল রঙা ঝরনাতে পাখির ডাক আর বনের মর্মরধ্বনি এবং আলোছোয়ার দোলনাতে মিলিত হওয়া মানবজীবনের কর্বুর অভিজ্ঞতা, যার স্মৃতি অবশ্যই দুর্মর। অরণ্যের অমন নগ্ন-নির্জনে যাঁরাই মিলিত হয়েছেন জীবনে কখনও, তাঁরাই জানেন যে সেই মিলনের ঋতি সব রীতি-বহির্ভূত।

ফিরে যাই আবার টুটু নায়েকের ইচ্ছাপূরণে।

এই অঞ্চলে যে অভয়ারণ্য ওঁরা গড়ে তুলেছেন তার নাম "সাতকোশীয়া গণ্ড অভয়ারণ্য" রাখা হয়েছে এই কারণে যে মহানদীর উভয়পারেই এই অরণ্যের অবস্থিতি। নর্মদা যেমন জব্বলপুরের নয়নাভিরাম মারবেল পাথরাবৃত পাহাড়ের গণ্ড বা GORGE এর মধ্য দিয়ে কিছুটা বয়ে গিয়ে সমতলে পড়ে বিস্তৃতি লাভ করেছে তেমনই মহানদীও দুপাশে উঁচু এবং ঘন অরণ্যাবৃত পাহাড়ের মধ্যের গিরিখাত দিয়ে চোদ্দো মাইল বয়ে গিয়ে সমতলে পড়ে, বিস্তৃতি লাভ করে চৌদুয়ার হয়ে কটকের দিকে বয়ে গেছে। এই চোদ্দো মাইল, বা সাত ক্রোশ বা বাইশ কিলোমিটার গিরিখাত আরম্ভ হয়েছে কটরং-এ আর শেষ হয়েছে বালিপুট-এ গিয়ে। তারপরই নদী এসে পড়েছে খোলা জায়গায়। সমতলে পড়েই নর্মদারই মতন তিস্তা বা ব্রহ্মপুত্রেরই মতন, হঠাৎই চওড়া হয়ে গেছে।

সাতকোশীয়া গণ্ড দিয়ে মহানদী বয়ে চলেছে—কোথাও তার জল নীল, কোথাও সবুজ। মনে হয় স্থির হয়ে আছে গভীর জল। দুপাশের ভাবগম্ভীর অরণ্যানির দৃশ্য তাকে এতই মুগ্ধ করেছে যে সে যেন চলতেই ভুলে গেছে। এই গণ্ডে অতিকায় রুই মাছ ছাড়াও বড়ো বড়ো লাল আঁশওয়ালা মহাশোল মাছও পাওয়া যায়। তার স্বাদ অপূর্ব। মহাশোল অবশ্য ব্রহ্মপুত্রেও পাওয়া যায় বলে শুনেছি। আর আছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব কুমির। এবং ঘড়িয়াল। এই গণ্ডের জল কত গভীর তা কেউ মেপেছে কি না জানা নেই তবে গভীরতার একটি নিজস্ব চরিত্র আছে, সে মানুষেরই হোক, কী নদীর, কী সমুদ্রের। সাতকোশীয়া গণ্ডের দিকে তাকালেই তার ব্যক্তিত্বকে সম্ভ্রম না করে উপায় থাকে না।

পুরণাকোট থেকে কিছুটা গেলেই টিকরপাড়া। সেখানে ঘাট আছে। বড়ো বড়ো নৌকোতে গাড়ি ট্রাক বাস সব উঠে নদী পেরিয়ে ওপারে যায়। ওপারে বৌধ, ফুলবানী, দশপাল্লা ইত্যাদি জায়গা। নদীর এ কূলে যেমন টিকরপাড়া, বালিপুট, ওপারে তেমনই কুতবী, মাবড়া হয়ে বড়োমূলের ঘাট হয়ে বড়োসিলিঙা হয়ে পথ গভীর জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে চলে গেছে টাকরাতে।

দশপাল্লা রাজ্যের ছোটো একটা জায়গা। টাকরার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ভারি সুন্দর কৃষ্ণ প্রস্তরাকীর্ণ এক পাহাড়ি নদী। তার নাম বুতরাং নালা। এই টাকরা থেকেই বুরুসাই হয়ে একটি পথ উড়ে গেছে বিড়িগড়ের পাহাড়চুড়োয়, যেখানে ওড়িশার আশ্চর্য আদিবাসী খন্দদের বাস।

তোমার নবীন নায়ক টুটুর হাত ধরে তুমি কোথায় কোথায় যেতে চাও তা জানিয়ো, তবে না তোমাদের ট্যুওর প্রোগ্রাম ঠিক করব। যাওয়ার জঙ্গলের কি অভাব আছে সাতকোশীয়া গণ্ড অভয়ারণ্যে? বাঘমুণ্ডা, পুরুণাকোট, টুল্বকা, লবঙ্গী, রায়গড়া, টিকরপাড়া, বালিপুট কোথায় তুমি যেতে চাও? আটমল্লিক, দশপাল্লা, আটগড়, নুয়াগড়, বৌধ, ফুলবানী কত জায়গাতেই তো যেতে পারো।

ফুলবানী বেশ উঁচু পাহাড়ের উপরে। গরমের সময়ও বেশ ঠান্ডা থাকে এই সব অঞ্চলই। সাতকোশীয়া গণ্ড অভয়ারণ্যর মধ্যে পড়ে এমন নয় কিন্তু মহানদীর এই গণ্ডের এপারে-ওপারে অগণ্য যাওয়ার জায়গা আছে। তবে একথা ঠিক যে, আমার ছেলেবেলায় ঋজুদার হাত ধরে যখন

এসব জায়গাতে এসেছিলাম তখন মনে হত যেন কোনো স্বর্গরাজ্যে এসেছি। মনে হত আর ঘরে ফিরে যাব না। সাতকোশীয়া গণ্ডের দুপারের এই অরণ্য ও নদী যেন মন্ত্রমুগ্ধ করেছে আমাকে। আজও মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে।

এ নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই। পৃথিবীর কোন অরণ্য, কোন সুন্দরী অথবা ব্যক্তিত্বময়ী নারী আর অনাঘ্রাত আছে। মানুষের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে INNOCENCE, SERENITY, CHASTITY এসব শব্দর মেয়াদ যেন শেষ হয়ে গেছে। তামাদি হয়ে গেছে যেন তারা।

কোন কোন জায়গায় যেতে চাও জানাবে, কোন ধরনের পরিবেশ তোমাদের দুজনের পছন্দ তাও। তারপর সেই জায়গা সম্বন্ধে বিস্তারিত জানাব তোমাকে।

এসো, গোঁফওয়ালা মহাশোল মাছ খাওয়াব তোমাকে। এর আগে কালো অথবা বাদামি গোঁফওয়ালা দিশি-বিদেশি পুরুষ অনেকই খেয়ে থাকতে পারো, গোঁফওয়ালা পেল্লায় মহাশোল মাছ কি খেয়েছ কখনও?

ইতি—তোমার শুভার্থী
দিগন্ত

ইন্দি সেন
মার্লবোরো
ম্যাসাচুসেটস
ইউ.এস.এ

পাঁচ

মার্লবোরো
ম্যাসাচুসেটস

দিগন্ত,
চিঠি পেলাম।

শুভার্থী-টুভার্থী বোলো না আমাকে। তুমি কি আমার জ্যাঠামশাই? রাগে গা জ্বলে যায়।

তোমার চিঠির জন্যে অনেক ধন্যবাদ। কী সুন্দর বর্ণনা দিয়েছ তুমি। টুটুকে পড়ে শোনাতেই সে আহ্লাদে আটখানা। তোমার পরের চিঠিতে তুমি লবঙ্গীর বন সম্বন্ধেই লিখো। ভারি সুন্দর নামটা কিন্তু। কেমন লবঙ্গ লবঙ্গ গন্ধ আছে নামটাতে। তাই না?

আমি কাল ওয়াশিংটনে যাচ্ছি অশোকদাদের কাছে। সাতদিন কাটিয়ে আসব। ওয়াশিংটন শহরে ঠিক নয়, ওঁরা থাকেন ডার্নসটাউনের স্কটিশ অটাম লেন-এ। একটু কাজও আছে। তবে কাজটা বাহানা। অশোকদাদের সঙ্গে সাতটা দিন কাটানো যাবে এই লাভ।

অশোকদা, অশোক মোতায়েদ আর গোপাদি, এই মেকির যুগেও অরিজিনাল কাপল। খুব বড়ো ব্যবসা করেন। নিজের কোম্পানির প্রেসিডেন্ট। সাহিত্য-ভক্ত। সংগীত-ভক্ত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। গোপাদিও যাদবপুরেরই ছাত্রী। নাটক করতেন। ওঃ। ভুলেই গেছিলাম, তুমি তো ওঁদের চেনোই!

নাটক, জীবনে প্রায় অনুক্ষণই করেন অনেকেই। আকছার। কিন্তু গোপাদি জীবনে নাটক করেন না। শুধুমাত্র মঞ্চেই করতেন। অত্যন্ত সোজা সরল কিন্তু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহিলা। খুব ভালো রান্না করেন। দুই মেয়ে আর তাঁর কৃতী স্বামী এবং বড়ো বাড়ি দেখাশোনা নিয়েই ব্যস্ত থাকতে ভালোবাসেন। ব্যস্ততা তিন রকমের হয়। সুব্যস্ততা, কুব্যস্ততা আর ব্যতিব্যস্ততা।

অবসর সময়ে দুজনেই বাংলা বই পড়েন, বাংলা গান শোনেন।

ডার্নসটাউন এলাকাটা বড়োলোকদের এলাকা। অনেকে বলেন, আমাদের ম্যাসাচুসেটস-এর মার্লবোরোও বড়োলোকদের এলাকা। জানি না, ডার্নসটাউনের তুলনাতেও কি না। সেখানে একেকটা বাড়ি যেন একেক পাড়াতে। ডার্নসটাউন অঞ্চলের খোলা জায়গাকে কারো নিজস্ব মালিকানা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়নি। সকলেই যৌথভাবে প্রকৃতিকে, উন্মুক্ত সবুজ মাঠকে, গাছপালাকে উপভোগ করেন।

প্রকৃতির ওপরে কারওই ব্যক্তিগত মালিকানা বোধহয় না থাকাই ভালো যদি অবশ্য তার শুধু রক্ষণাবেক্ষণ ও যত্ন হয় মালিকানা ছাড়াই। "কোম্পানিকা মাল দরিয়ামে ডাল" এর মতন পাবলিক প্রপার্টি বলেই তার যথেচ্ছ বিনাশ এদেশে কেউই করতে পারে না। এখানে আইনকে সকলেই মান্য করেন, প্রকৃতিকে, খোলা সবুজ মাঠকে, গাছপালাকে উপভোগ করেন।

তবে আমার মার্লবোরোর মতো অমন জঙ্গুলে ভাব কিন্তু ডার্নসটাউনে নেই। ডার্নসটাউনের বাড়িগুলোর লাগোয়া কোনো বড়ো গাছই নেই—চারদিকেই MEADOW-এর মতো। তবে, নেই বলেই মনে হয় যেন কোনো ইংলিশ-কাউন্টির মধ্যে আছি। যেখানে LUSH-GREEN সবুজ মাঠ ঘেরা সাদা রঙ করা কাঠের বেড়ার মধ্যে লাল-কালো গোরু চরে বেড়ায়। আর বহুরঙা চৌকোচৌকো কাপড়ের নিকারবোকার পরে মুখে পাইপ গুঁজে কড়া তামাকের গন্ধ উড়িয়ে কোনো সুখী, তৃপ্ত, অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সেই বেড়ায় গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রোদ পোয়ান তাঁর খামারে, অথবা প্রভাতি খবরের কাগজ পড়েন।

আমার খুবই দুর্ভাগ্য বলতে হবে যে আমার দেশের গ্রাম আমি দেখিনি। পশ্চিমি দেশের মানুষদের এইটিই কৃতিত্ব যে তাঁরা ব্যস্ততম এবং বহু লক্ষবাসী শহরের কাছাকাছিই খামারের বা জঙ্গলের পরিবেশকে নিজেদের চেষ্টাতে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছেন। বহুদূর থেকে গাড়ি চালিয়ে বা টিউব-এ করে এসে সকালে কাজের জায়গাতে পৌঁছোন এবং সন্ধেতে ফিরে যান বটে তাঁরা কিন্তু উইক-এন্ডের দিন দুটিতে প্রকৃতই পুনরুজ্জীবিত হন। তাছাড়া "কাজের সময় কাজ, খেলার সময় খেলা" এই প্রবাদটির তাৎপর্য বুঝতে হলে পশ্চিমেই আসতে হয়।

কিছু মনে কোরো না, সাম্প্রতিক অতীত থেকে সাহেব রাজীব গান্ধি আমাদের দেশে ফাইভ ডেইজ উইক চালু করে মোটেই ভালো করেননি। পাঁচদিন সকাল ন'টা থেকে ছ'টা প্রচণ্ড পরিশ্রম যাঁরা করেন তাঁদেরই উইক-এন্ডে দুদিন ছুটির দরকার। উইক-এন্ডের ছুটিটা অর্জন করা দরকার। বিনা অর্জনের, বিনা মেহনতির প্রাপ্তি হিসেবে কারোরই তা ভোগ্য নয়।

আমাদের দেশের অধিকাংশ সরকারি অফিসগুলোতেই কি কাজ হয় কিছু? "কাজ" কাকে বলে সে সম্বন্ধে তাঁদের কোনো ধারণাই হয়তো নেই, আর কাজ না করার জন্যে কোনো লজ্জাও নেই। অথবা অপরাধবোধও। আর এই অবক্ষয়ের মাধ্যমে সমস্ত জাতের চরিত্রিটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যাচ্ছে যে, সে কথা এখনও না বুঝলে আমরা আর কবে বুঝব বলো?

গতকালই রুমনির চিঠি পেয়েছি কলকাতা থেকে। সে একটি অ্যাডএজেন্সির বিগ শট। কাজে তাকে এতই ব্যস্ত থাকতে হয় যে আমারই মতন বিয়ে করা তো দূরের কথা, প্রেম করার সময়ও তার হয়নি। ও লিখেছে যে, গতমাসে সপ্তাহের দুদিন ছুটি ধরে, এক নেতার মৃত্যু এবং ডান এবং বাম দল, নয়, তাদের একেকজন নেতাদেরই খেয়াল-খুশি মতন ডাকা সম্পূর্ণ বিবেচনাহীন "বন্ধ" এ নাকি গত মাসের পনেরো দিনই কাজ হয়নি। আমাদের দেশে আবার "বন্ধ" ও

সুপরিকল্পিতভাবে ডাকা হয় বা মন্ত্রিটন্ত্রীরাও এমনই কনসিডারেটের মতন অক্কা পান যে বন্ধ বা শোকপালনের ছুটির পরের ছুটি নিয়ে একসঙ্গে দু তিন দিন ছুটি থাকে। আজকাল "বন্ধ" যে কেউই নাকি ডাকলেই হল। ও লিখেছে যে, আজকাল এ পাড়ার হাবু গুন্ডা বা সে পাড়ার সমর গুন্ডা বন্ধ ডেকে দিলেই বন্ধ "সফল" করা যায়। পশ্চিমবঙ্গে কোন শিল্পপতি কারখানা খোলা রাখবেন বলো? পনেরো দিনের মাইনে তো তাঁদের গুনতে হয়েছে। শিল্পপতিদের তো মাথার গোলমাল হয়নি যে সেখানে নতুন শিল্প খুলবেন। ট্রেড ইউনিয়নিজম-এর মতো মহৎ ব্যাপার খুব কমই যে আছে তা আমি অবশ্যই স্বীকার করি কিন্তু এও বলব যে পশ্চিমবঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নিজম-এর যে বিকৃতি ঘটেছে বহুদিন হল তার নজির সম্ভবত পৃথিবীতে নেই। এই ট্রেড ইউনিয়নিজম কর্ম-সংস্কৃতির কথা, কর্তব্য-দায়িত্বের কথা কখনও শেখায়নি শ্রমিকদের। তাদের হাতপাতা ভিখারিতে পর্যবসিত করেছে। তাদের আত্মসম্মান জ্ঞান পুরোপুরি নষ্ট করে দিয়েছে।

কাজ করার ইচ্ছেই যাদের চলে গেছে, কাজ না করলে যে ব্যক্তি-জীবনে বা জাতীয়-জীবনে অর্জনের মতো কিছুমাত্রই অর্জন করা যায় না এই সরল সত্যটা সম্ভবত আমরা আজও বুঝে উঠতে পারলাম না। শোক পালনের জন্যে সরকার থেকে বাধ্যতামূলকভাবে ছুটি দিয়ে লাগাতার সারা দেশের বা রাজ্যের শাসন অথবা অপশাসন যন্ত্র বিকল করে দেওয়া হয়। আর সেই 'বন্ধ' এর দিনে বা বাধ্যতামূলক শোকপালনের ছুটিতে বা হাবু বা সমর গুন্ডার ডাকা বন্ধকে সফল করে মানুষে সন্ধেতে শ্বশুরবাড়ি, বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে যায়, বিয়ার খায়, ভিডিয়ো ক্যাসেট বা কেবল টিভি দেখে, তাস খেলে। "বন্ধ"-এর আগের দিন মদের দোকানে আর মাংসের দোকানে, মাছের বাজারে ভিড় দেখলে সেই "বন্ধ"-এর পিছনে কাজ ফাঁকি দেওয়া আর দেশের-দশের হিত-বর্জিত শস্তা রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই যে নেই, এ কথাই নাকি প্রাঞ্জলভাবে বোঝা যায়।

তাছাড়া কারো মৃত্যুতে সত্যিই শোক করার মতন নেতা কি আমাদের দেশে এ মুহূর্তে খুব বেশি আছেন? নেতাগিরিও তো একটি LUCRATIVE PROFESSION। তবে অন্য PROFESSION, যেমন অধ্যাপনা বা ডাক্তারির মতো সম্মানের নয় এই PROFESSION আদৌ।

বলতে পারো দিগন্ত, দেশ ও দশের কণামাত্র হিত-বর্জিত এই ধরনের রাজনীতি দেশের লোকে মেনে নেন কেন?

রুমনি লিখেছে যে মানুষে নাকি মেনে নেন ভয়ে। সকলেই নাকি ভয়েই মেনে নেন অন্যায়কে।

কিন্তু ভয়কে ভয় করার যে শেষ নেই। পাজি অত্যাচারী মানুষদের কাজই তো হচ্ছে ভয়কে জাগিয়ে রাখা ভয়কে যদি আমার দেশবাসী ঘুম পাড়াতে না পারেন তবে আর কি হবে। দেশের ভবিষ্যতে কি আছে তা নিয়ে কি তাঁরা এখনও ভাবিত নন? অবাক লাগে ভাবলে, এত দূরে বসেও। আমি তো এন. আর. আই। তোমাদের কারো কাছে শ্রদ্ধার, কারো কাছে তাচ্ছিল্যের আবার কারো কাছে অনুকম্পার পাত্রী। তাও দেশের কথা ভেবে আমারই যদি তো উষ্মা হয়, দেশে যাঁরা বাস করেন তাঁদের হয় না কেন? বলতে পারো কি? তাঁদের চোখ-কান-কণ্ঠ সবই কি বুজে গেছে?

আগে মাঝে মাঝেই ভাবতাম যে আর কিছুদিন বাদে কলকাতাতেই গিয়ে 'সেটল' করব। কিন্তু কলকাতার আর পশ্চিমবঙ্গের নানাজনের চিঠিতে, ফোনে এবং ফ্যাক্সে পাঠানো খবরে রীতিমতো আতঙ্কিত বোধ করি। জানি না এ কোন মূর্খের স্বর্গে আমরা বাস করছি। যে বাংলা সারা ভারতকে পথ দেখিয়েছে তার এ কী অবস্থা। সব দলই এখানে সমান দায়িত্ববান। কে কত ভান আর ভঙ্গি করে ভোট বাগাতে আর ভাঙাতে পারে প্রত্যেক দলেরই ওই একই চিন্তা। বড়োই দুঃখের ব্যাপার স্যাপার।

তুমি তো কাছাকাছিই আছো দিগন্ত। চলে যেতে পারো না কি নিজ রাজ্যে? সকলেই যদি সমালোচনাই শুধু করেন, দেশের হাল যদি হাতে তুলে না নেন তবে শুধু শুধু উষ্মা প্রকাশ করে কি লাভ হবে?

পরে তোমাকে লিখব আবার ডার্নসটাউন থেকে, মানে, ওয়াশিংটনের কাছ থেকে। আমি মার্লবোরোতে ফেরার আগেই তোমার লবঙ্গীর বনের গন্ধ-ভরা চিঠিও এসে পৌঁছোবে আশা করি।

প্রীতিকে তোমার বাঁ হাতের মধ্যমাতে পরা হিরের আংটিটিরই মতো জলে-তেলে উজ্জ্বল করে তুলো প্রতিদিন একথা। কি জানো যে, হিরে ব্যবহারে ঔজ্জ্বল্য পায়? নারীও তেমনই। তুমি অনেক জানতে পারো কিন্তু সব জানো না। দশ বছরের ডিফারেন্স থাকলে স্বামী স্ত্রী মধ্যে আদর্শ দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ঝগড়াঝাঁটি হয় না, স্বামীর মধ্যে একাধারে, গুরু গোরু এবং জ্যাঠামশাইও অবস্থান করে।

চালিয়ে যাও দিগন্ত। নিয়ত প্রীতিসুধারসে সিঞ্চিত হও এই আশীর্বাদ করি।

ইতি—

আশীর্বাদিকা

তোমার জ্যাঠাইমা

ইন্দি

শ্রদ্ধাভাজনীয়াসু
জ্যাঠাইমা

যশপুর
কটক
ওড়িশা

আপনার পত্র পাইয়া সমুদয় সংবাদ অবগত হইলাম।

প্রবাসী হইয়াও স্বদেশ ও স্বজন সম্বন্ধে আপনার এইরূপ "পেকৃত" ভালোবাসা এবং চিন্তাভাবনা লক্ষ্য করিয়া যারপরনাই আহ্লাদিতও হইলাম।

পৃথিবীর সর্বত্রই আমার ইন্দি জ্যাঠাইমার মতন দেশপ্রেমী নন-রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ান-এর মহিমান্বিত এন. আর. আই-এ ভরিয়া যাউক। পরম মঙ্গলময় ঈশ্বরের কাছে আমার এই বিনীত প্রার্থনা।

কিন্তু মাননীয়া জ্যাঠাইমা, আপনি একা কী করিবেন? আমিই-বা কি করিব? এদেশ, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ এখন এক অচলায়তন হইয়া উঠিয়াছে। যে দেশবাসী নিজেরাই মরিবে বলিয়া বদ্ধপরিকর, তাহাদের বাঁচাইবে কে? এবং কেমন করিয়া?

ভারতবর্ষের ইতিহাস বলে যে, আমরা দাড়িতে ছারপোকা পালনকারী অগণ্য দুর্গন্ধ, বিজাতীয়, বিধর্মী, জঘন্য সব বহিরাগতদের দ্বারা নিপীড়িত, পদদলিত, লুণ্ঠিত, অপমানিত, প্রহৃত এবং ধর্ষিত হইতে বড়োই ভালোবাসি।

উত্তর ভারতের জনসংখ্যার একটি অংশের ধমনীতে কত আফগান, মোগল, পারসিক, তুর্কি এবং ইরানির রক্ত যে প্রবাহিত হইতেছে তাহা কে বলিতে পারে!

যেভাবে এবং যে কায়দাতে "আঁতেল"-শ্রেষ্ঠরা, ধর্মে-অবিশ্বাসীরা, দেশের নিয়ন্ত্রা হইয়া বসিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের ভোট-ভিখারি মনোবৃত্তর নিট ফল হইবে যে, ভারতবর্ষও একদিন পাকিস্তানের অন্তর্গত হইয়া যাইবে। ভিতু, মেরুদণ্ডহীন, অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং সাময়িক লাভের

লোভের কবলে সম্পূর্ণ পরাভূত, বর্তমান ভারতবর্ষের গরিষ্ঠ প্রজাতি সমস্ত ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎকে কবরস্থ যে করিবেই তাহাতে আমার কোনোই সন্দেহ নাই। এই ঘটনা ঘটিতে আর বড়ো জোর পঞ্চাশ বৎসর লাগিবে।

দুই শতাধিককাল আমরা ইংরেজের পরাধীন ছিলাম। আমাদের স্বাধীনতার বয়স তো পঞ্চাশ হইয়া গিয়াছে। যথেষ্টই হইয়াছে। আবারও পরাধীন হইবার জন্যে আমাদের সমস্ত সত্তা বড়োই উদ্গ্রীব হইয়াছে। এক্ষণে আমাদিগের নূতন মালিক পাকিস্তান হয় না চিন, না আমেরিকা না রাশিয়া বা জাপান, তাহাই দেখিবার।

যে দেশে মনুষ্যের চেহারার কোটি কোটি জীবেরই বাস, মনুষ্যের নহে, সেই দেশের ভবিষ্যৎ অন্যরূপ হইবার কোনো সম্ভাবনাই আর দেখি না।

জ্যাঠাইমা, আপনার পদযুগে এই মিনতি করি যে, এই সকল ভয়ঙ্কর নিদ্রাহরণকারী প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আমার হাইপারটেনশান আরও বৃদ্ধি করাইয়া হার্ট-অ্যাটাকের হেতু হইবেন না। আমার কেবলই মির সাহেবের একটি বিখ্যাত শায়রী মনে পড়িয়া যায় : "হিয়া সুরত-এ আদম বহত হ্যায়। আদম নেহি হ্যায়।"

মানুষের মতো মানুষের বড়োই অভাব বলিয়াই যাহা ঘটিবার এদেশে, তাহাই ঘটিবে। কাহারও সাধ্য নাই এই আত্মঘাতী জাতিকে আত্মহত্যার পথ হইতে অন্য পথে চালিত করে।

বর্তমানে তো তেমন অঘটন ঘটিবার বা ঘটাইবার কোনোরকম লক্ষণ আদৌ দেখিতেছি না। নেতারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ গদি এবং নিজ নিজ পকেট ভরাইতে এতই ব্যস্ত যে দেশ জাহান্নমে যাইলেও কাহারও বিন্দুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

পুনরায় নিবেদন করি যে, এইসব প্রসঙ্গ আমার সহিত আলোচনা আদৌ করিবেন না।

ইতি—

দিগন্ত

স্যার,

যশপুর
কটক

হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে, আপনার PROSTATE GLAND অপারেশন করাবার কথা ছিল। করালেন কি?

প্রাচীন পন্থাতে করাবেন না আধুনিক পদ্ধতিতে? ড. দীপক মুখার্জি তো শুনেছি মাইক্রো-সার্জন।

করালে, কবে করাবেন? না কি ইতিমধ্যেই করিয়েছেন?

জানাবেন। পত্রপাঠ।

বিনত—

দিগন্ত

বেণি ব্যানার্জি অ্যাভিন্যু
ঢাকুরিয়া
কল্যাণবরেষু, দিগন্ত কলকাতা ৭০০ ০৩১

তোমার পত্র পাইয়া প্রীত হইলাম। তুমি এবং আমার অন্য ছাত্রদের মধ্যে তোমাদের এককালীন শিক্ষকের প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা ও তাঁহার শুভাশুভর প্রতি প্রখর মনোযোগ লক্ষ্য করি তাহা এই যুগের অনেক পুত্র-কন্যার মধ্যেও লক্ষণীয় নয়। আমি সত্যই পরম ভাগ্যবান। তোমার গুরুপত্নীও সর্বদাই সেই কথাই বলেন।

ড. দীপক মুখার্জি অপারেশন করিয়াছে। আমার পুত্রের বিশেষ কাজ পড়িয়া যাওয়াতে সে আসিতে পারে নাই দিল্লি হইতে।

দক্ষিণ কলিকাতার বিপিন পাল রোডস্থ নার্সিং হোম "মাইক্রো-ল্যাব"-এ সাতদিন থাকিবার পর বাড়িতে আসিয়াছি আজ তেরোদিন হইল। আরও দিন দশেক গৃহবন্দি থাকিতে হইবে। অসমতল ভূমিতে পদচারণা বারণ। গাড়ি চড়া বারণ। গাড়ি তো নাই, তাই চড়িবার প্রশ্নও নাই। রিকশা বা মোপেড তো চড়া বারণই।

কলিকাতার কম ফুটপাথই আজ সমতল আছে। বহুতল হইয়া গিয়াছে। এমন গর্বময় দাবি পৃথিবীর আর কোনো "আধুনিক" এবং "তিলোত্তমা" শহর করিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। তাই পথে বাহির হইবার জো নাই। কার্যত গৃহবন্দিই আছি।

গত চার-পাঁচদিন হইল রক্তস্রাব বন্ধ হইয়াছে। পুরুষ হইয়াও রক্তস্রাবী হইবার বিশেষ গুণ জীবনের শেষে আসিয়া কিয়ৎকালের জন্যেও অর্জন করিয়া যারপরনাই আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। সবই দীপকের দয়া। তবে যন্ত্রণাও ছিল।

কোনো সার্জারিই সুখের নয়। কিন্তু দীপক এবং তার স্ত্রী ঝামরুর সৌজন্য ও দক্ষতাতে আমি মুগ্ধ। শুধু তাহারই নহে, আমার হৃদয়ঘটিত কিঞ্চিত গোলযোগ ছিল বলিয়া সে ড. দিনমণি ব্যানার্জি, এবং দীপকের সহকারী ড. পার্থ সাহারও সাহায্য লইয়াছিল। তদুপরি ড. সত্যজিৎ সিনহা, ড. রণজিৎ রায়, ডঃ কিশোর নন্দী, ড. রণেশ ভৌমিক এবং Last but not the least ড. ঝামরু মুখার্জি, দীপকের সহধর্মিণীও অতন্দ্র প্রহরাতে ছিলেন। এহেন এলাহি বন্দোবস্ত অথচ আমাকে একটি পয়সাও খরচ করিতে দেয় নাই।

বড়ো সাহিত্যিক বা গায়ক বা চিত্রীর প্রতি অনেক ডাক্তার বা সার্জেনেরই শ্রদ্ধা এবং দুর্বলতা থাকে বলিয়া জানি এবং তাঁহাদের চিকিৎসা নিখরচাতে অনেকেই করিয়া থাকেন কিন্তু অবসরপ্রাপ্ত সম্বলহীন অধ্যাপকের (তাহাও, আমি দীপকের অধ্যাপক ছিলাম না।) কপালেও যে এমন সৌভাগ্য লিখিত আছে তাহা কে জানিত।

তোমাদের জানিবার কথা নহে, যে, ড. দীপক মুখার্জির বাবা শ্রীসুনীলবরণ মুখার্জি, চিত্তরঞ্জন, (মিহিজাম) স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনিও আমারই মতো অবসরপ্রাপ্ত। মালবিকা দত্ত, এম. আর. সি. পিও তাঁহারই ছাত্রী ছিলেন। বাঁকুড়াতে ছিল তাঁহাদের পৈতৃক নিবাস। ছিল নহে, এখনও আছে। প্রতিবছর দুর্গাপূজার সময়ে এখনও দেশের বাড়িতে সপরিবারে গিয়া মায়ের পূজা সম্পন্ন করেন।

ইহা বড়ো নির্মম সত্য যে, ইদানীংকালে খুব কম বাবার ভাগ্যেই এমন কৃতী, শ্রদ্ধাবনত এবং ভদ্র সন্তান জোটে। শুধু দীপকই নহে, তাহার অন্য তিন ভাইও একইরকম। বাবা একদা মাস্টারমশাই ছিলেন বলিয়াই হয়তো এই মাস্টারমশাইকেও তাহারা পিতৃজ্ঞানে দেখে। ইহা তাহাদেরই মহানুভবতা। সুনীলবাবুর মহৎ শিক্ষার ফল।

এই বাবদে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীদিলীপকুমার সিংহর কথা মনে পড়ে। তাঁহার পিতাও বালিগঞ্জের জগবন্ধু ইনস্টিট্যুশনের শিক্ষক ছিলেন। দীপকের মানসিকতার সহিত দিলীপের মানসিকতার খুবই মিল আছে। যে সব পিতাগণের এইরূপ পুত্র থাকে তাঁহাদের মনুষ্যজন্ম সার্থক।

PROSTATE GLAND OPERATION-এর খরচ নাকি MEDICLAIM দেয় না। খরচ হয়ই নাই, সুতরাং তাহাদের নিকট তাহা দাবি করিবার প্রশ্নও ওঠে না। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত অগণ্য বিমা কোম্পানিদের এজেন্টগণ এবং বিমা কোম্পানিগণ পলিসি করিবার আগে এবং সেই সময়ে যেরূপ পবননন্দন সুলভ লম্ফঝম্ফ করিয়া থাকেন তাঁহাদের দেয় টাকা দিবার সময়ে সেই রূপ ভিন্ন হইয়া যায়। প্রায় সিক্ত-মার্জারের রূপের ন্যায় তাহা নিষ্প্রভ হইয়া উঠে। বিমার দালাল এবং বিমা কোম্পানিগুলি হয়তো তখনই মনুষ্যজনোচিত এবং ভদ্রসভ্য ব্যবহার করিবেন যখন সংস্থাগুলি বেসরকারি হস্তে অর্পিত হইবে। যতক্ষণ ইহারা দুর্ভেদ্য এবং নির্লজ্জ সরকারি বর্ম পরিধান করিয়া আছেন ততদিন, প্রার্থনা করি, নেহাত নিরুপায় না হইলে কাহারওই যেন বিমা কোম্পানি বা তাহাদের দালালদিগের খপ্পরে পড়িতে না হয়।

আমার নিজের অত্যন্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে বলিয়াই এই সাবধানবাণী। ইঁহারা দুমুখো সাপ। পলিসি দেওয়ার সময়ে ইঁহাদের এক রূপ, আর টাকা দেওয়ার সময়ে অন্য রূপ।

এদিকে লোকমুখে শুনিতে পাই যে গাড়ি মেরামতি, চিকিৎসা, অগ্নিকাণ্ড এমনকী জীবনবিমার ক্ষেত্রেও কোটি কোটি সরকারি টাকা গাড়ি মেরামতির কারখানা, কিছু অসৎ প্রতিষ্ঠান এবং অসৎ কর্মচারী এবং দালালদের দ্বারা লুঠমার হয়। তাঁহাদের যত অত্যাচার ও অন্যায্য ব্যবহার কি শুধুমাত্র মুরুব্বিহীন জনসাধারণেরই প্রতি?

তোমাদের রক্তের জোর আছে। চাহিলে, তোমরাই এই সব অন্যায়ের প্রতিকার করিতে পারো। এইসব অন্যায়ের প্রতিকার করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তবু ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে" এই শিক্ষায় যদি তোমরা শিক্ষিত না হইয়া থাকো তাহা হইলে জানিব আমি তোমাদের কিছুমাত্রও শিখাইতে পারি নাই।

তুমি নিজেও আমারই ন্যায় অধ্যাপনা করিতেছ তাই তোমাকে এত কথা বলা। অধ্যাপক হইবার অর্থ এইমাত্র নহে যে, তুমি ছাত্রদের অর্থনীতি বা রাজনীতি বা পদার্থবিদ্যাতে পারদর্শী করিয়া তুলিবে। তাহাদের চরিত্রগঠন করাটাও তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। যে ছাত্র অন্যায়ের এবং তাহার জ্ঞানত সংঘটিত সবরকম অত্যাচারের প্রতিকার না করে বা করিতে উদ্যোগী না হয়, সেই ছাত্রের শিক্ষা সম্পূর্ণই ব্যর্থ। এই অন্যায় বা অত্যাচার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অথবা নৈতিকও হইতে পারে। ছাত্রদের মধ্যে ন্যায়-অন্যায়ের ব্যবধানবোধ জন্মাইয়া দেওয়াও অধ্যাপকদের অবশ্যকর্তব্য। একটি জাতির "প্রগতি", মসৃণ রাজপথ, উড়াল-পুল, পাঁচতারা হোটেল বা পাতাল রেলের সংখ্যার উপরে নির্ভরশীল কখনওই নহে। জাতি, যে-কোনো জাতিই গঠিত হয় সেই জাতির মনুষ্যচরিত্র দ্বারাই। "চরিত্র" ব্যতীত কোনো জাতিরই অগ্রগতি সম্ভব নহে।

আগামী দশদিন আমি গৃহবন্দিই থাকিব। কলিকাতায় আসিলে অবশ্যই আসিয়ো। মাথায় ব্যথা, কোমরে ব্যথা এবং ঘুষঘুষে জ্বর ছাড়া অন্য কোনোরকম উপসর্গই নাই। মেরুদণ্ডে ছুঁচ ফুটাইয়া আংশিক অসাড় করাইয়া অপারেশন করা হইয়াছিল বলিয়াই নাকি এইসব উদ্‌বেগ। তবে সেই কারণে সম্পূর্ণ অজ্ঞান হইবার আনুষঙ্গিক অসুবিধা হইতে বাঁচিয়া গিয়াছি। এইসব উপসর্গ নাকি আরও কিছুদিন থাকিবে।

সস্ত্রীক দীপক, এবং অতজন মানী-গুণী ডাক্তার-শল্যচিকিৎসকের নিকট যে অপরিসীম কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ হইলাম তাহা ভাবিলেই লজ্জিত যেমন হই, তেমন গর্বিতও হই।

এই দেশ সম্বন্ধে এখনও নিরাশ হইবার মতো অবস্থা হয় নাই। আশা অবশ্যই আছে।

ইতি—

আশীর্বাদক

প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

দিগন্ত বোস
পো : যশপুর
জেলা : কটক

ছয়

দিগন্ত বোস
পো : যশপুর
জেলা : কটক

মার্লবোরো
ম্যাস.,
ইউ. এস. এ

আমার পাগলা,

কি হল তোমার?

ভালো আছ তো?

কই? চিঠি তো এল না তোমার লবঙ্গীবনের বার্তা নিয়ে? এদিকে টুটু তো আমায় উদ্‌ব্যস্ত করে তুলেছে। দয়া করে রক্ষা করো।

ভালো থেকো। অনেকদিন চিঠি না পেলে চিন্তা হয়। একা একা থাকো তো।

তোমার ইন্দি

ইন্দি সেন
মার্লবোরো
ম্যাস.,

যশপুর
কটক

আমার পাগলি,

রবীন্দ্রনাথের লেখাতে পড়েছিলাম যে মেয়েরা যাকে ভালোবাসে তাকেই পাগল বলে। এতদিনে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তোমার ভালোবাসা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই আর রইল না।

"লবঙ্গগন্ধী" লবঙ্গীবনের বার্তাবাহী চিঠির জন্যে আরও একটু সবুর করতে হবে। ইতিমধ্যে তোমাকে অন্য বনের খবর দেব। আজই আমি রওয়ানা হয়ে যাচ্ছি বিলাসপুরের দিকে। মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর।

বিলাসপুরে বিলাসীদেরই যাবার কথা কিন্তু বিলাসী না হওয়া সত্ত্বেও যাচ্ছি। সেখান থেকে অচানকমারের জঙ্গলে যাব।

কোনো জায়গার এরকম নাম কখনও শুনিনি আগে। গোন্দ, বাইগা, বাইসন-হর্ন মারিয়াদের দেশের বহুধামের নামই এমন। "মোক্ষম" মার, "জব্বর" মার, "ধর আর মার" এসবই শোনা ছিল কিন্তু অচানকমার, অবুঝমার এসব শব্দ শুধু নতুনই নয় এরা মনে নানা কৌতূহলেরও উদ্রেক করে। সাবধানি বা ধীর-স্থির মানুষের অচানকমার-এ অথবা বুঝদার মানুষের বস্তারের অবুঝমার-এ যাওয়াটা আদৌ উচিত নয়। যেমন উচিত নয় আমার বিলাসপুরে যাওয়া।

অচানকুমার থেকে তোমাকে চিঠি লিখব

ভালো থেকো।

দিগন্ত

পুনশ্চ : একা তো তুমিও থাকো। একাকিত্বে তো আমি একা নই।

আসলে আমরা প্রত্যেকেই একা। বাড়ি ভরা মানুষ থাকলেও একা। একা আসা, একা একা এই জীবনের নদী বাওয়া এবং যাওয়ার সময়েও একাই যাওয়া। মানুষের মতো Loner আর কোনো জীবই নয়। মানুষের সমাজ বা সংসার এসবই অনিত্য। এবং সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়ও। এই সাধারণ কথাটা খুব কম মানুষেই বোঝেন। আমি যে বুঝি একথা জেনে নিজেকে পরম বুদ্ধিমান বলে মনে হয় মাঝে মাঝে।

কিন্তু যে মানুষ একা থাকতে না পারেন তার মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণতা পায়নি, এমন মনে হয় আমার।

—দি

বিলাসপুর
এস. ই. সি. এল
গেস্ট হাউস

ই, ইঃ ঈঃ,

আজ ভোরে বিলাসপুরে এসে নামলাম বম্বে মেল থেকে, যে বম্বে মেল নাগপুর হয়ে যায় বম্বেতে। আশাকরি, জানো যে অন্য এক বম্বে মেলও আছে যা হাওড়া থেকে বম্বে যায় এবং আসেও ইলাহাবাদ হয়ে।

আজ বিলাসপুরেই থাকব কোল ইন্ডিয়ার গেস্ট হাউসে। আগামীকাল ভোরে গাড়িতে রওনা হব জঙ্গলের দিকে। অমরকন্টকের পথে।

একটা অসুবিধে ঘটেছে। অচানকমার বাংলোতে একজন ভি. ভি. আই. পি. "অচানক" বুকিং করেছেন তাঁর শালি এবং ভায়রাভাইকে নিয়ে হোলি কাটাবেন বলে। তাঁর হোলি, আমার গোলি।

কাল রাতে ট্রেনের কামরাতে একজন খ্যাপাটে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। ভারি মজার মানুষ। এই PROTOTYPE দের জগতে একজন ORIGINAL মানুষ। এমন মানুষ আজকাল চোখেই পড়ে না।

তাঁর সঙ্গে ছেলেমেয়েদের বিদেশে পড়তে যাওয়া নিয়ে আলোচনা করছিলেন তাঁরই এক সঙ্গী। সঙ্গী, তাঁর ছেলেকে তোমাদের "স্টেটস"-এ পড়তে পাঠিয়েছেন। তবে ছেলে কোনো স্কলারশিপ নিয়ে যায়নি, গেছে বাবার টাকায়। মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা "গলে" যাচ্ছে একথা জানিয়ে ভদ্রলোক সঙ্গী খুব গর্ব এবং শ্লাঘার সঙ্গে বললেন, ছেলে "মানুষ" করতে হলে পয়সা খরচ করতে হয় বইকী। দেশে ফিরে...

সেই খ্যাপাটে ভদ্রলোক সে কথা শুনে বললেন, থামুন মহায়। দেশে সে আর ফিরেচে।

কে-কে-কেন?

স্টেটস-এ ছেলে পাঠানো গর্বিত ভদ্রলোক গরম দুধে-ফেলা মুড়ির মতন চিপসে গিয়ে বললেন।

ফিরবে কেন? ন্যাংটো মেয়েছেলে, লিজিং-এ কেনা টিভি, গাড়ি, বাড়ি, অগাধ এবং অবাধ স্বাধীনতা—CONSUMER GOODS—এর চমক—তা ছেড়ে কে আর ফেরে! গিয়েচে তো গিয়েচে। লস্ট কেস। ভুলে যান ছেলের কতা।

ব-ব-ব-বলেন কি হেরম্ববাবু!

হ্যাঁ। যা বলচি তাই শুনুন। আর যদি ফিরেও আসে তো কি পড়ে আসে দেখবেন।

মানে? পড়তে তো গেছে লেদার টেকনোলজি।

পড়তে যাই হোক।

মানে?

ছেলেকে অ্যামেরিকাতে-পাঠানো গর্বিত বাবা, আমার মতো অপরিচিতের সামনে হেরম্ববাবু দ্বারা অমন SUMMARALY DISMISSED হওয়াতে ভীষণই মনঃকষ্ট পেলেন।

হেরম্ববাবু বললেন, মানে-টানে জানি না। আমার ন্যাংটোপোঁদের বন্ধু বটকেষ্টও তার ছেলেকে পড়তে পাইটেচেল স্টেটস-এ। সেদিনে গেসলাম হ্যাওয়ার ব্যাঁটরাতে বটকেষ্টর বাড়ি।

কেন?

খোকাবাবুর পেত্যাবত্তন ঘটেচে, তাই।

তা কি দেকলেন? গিয়ে।

আমি কিছুই দেকিনি। বটকেষ্টকে শুদোলাম, কি পড়ে এল র‍্যা? তোর ছ্যালে?

সে বললে, কি পইড়ে এল তা তো জানি নে হেরম্ব। তবে পরে এইয়েচে একটা প্যান্টুলুন।

তা আমি বল্লু, আমেরিকা ফেরত ছেলে কি ধুতি পইরে আসবে? না কি ন্যাংটোপোঁদে?

বটকেষ্ট বললে, না, তা লয়। দেগলুম সে প্যান্টুলুনের ডান পাটা লাল আর বাঁ পাটা নীল।

বলেই, খ্যাপা হেরম্ববাবু খ্যাঁক খ্যাঁক করে শেয়ালের মতন হাসতে লাগলেন তো লাগলেনই, হাসি আর থামে না!

আজকের মতন এই থাক। কাল জঙ্গলে পৌছে তোমাকে আবার লিখব।

—দিগন্ত

লামণি বন বাংলো
ছত্তিশগড়
মধ্যপ্রদেশ

আমার ইন্দি ঠাকরুণ,

একটু আগেই সন্ধে হয়ে গেছে। এতক্ষণ যে আশ্চর্য সুন্দর কমলাভা ছিল ঘন নীল কলুষমুক্ত পশ্চিমাকাশে, তা মুছে গেছে। সূর্য পাটে গেছে পশ্চিমের কাছিমপেঠা রোঁয়া-ওঠা প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মতন কালো পাহাড়ের আড়ালে আর সঙ্গে সঙ্গে পাটরানি হয়ে চাঁদ উঠেছে পুবাকাশে, বিশ্বচরাচর উদ্ভাসিত করে।

চাঁদ সূর্য নিয়ে এমন কাব্য করাটা এই কম্পিউটারসর্বস্ব আধুনিক জগতে হয়তো উন্মাদেরই লক্ষণ। কিন্তু আমি এরকমই। কম্পিউটার আমার দু চোখের বিষ। বিষ, কারণ কম্পিউটার মানুষের মস্তিষ্কের জায়গা দখল করতে এসেছে। মানুষের মস্তিষ্ক যদি যথেষ্ট ব্যস্ত না থাকে, তাহলে মানুষ একদিন জড়বুদ্ধি হয়ে যাবে হয়তো। কম্পিউটারই তাকে চালাবে, মানুষ চালাবে না আর কম্পিউটারকে।

বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর CONQUEST OF HAPPINESS বইতে লিখেছিলেন যে, INDUSTRIAL REVOLUTION-এর পরে যন্ত্র, মানুষের তাবৎ MUNDANE ক্রিয়াকলাপের ভার নেবে আর মানুষ মুক্ত থাকবে তার যথার্থ মানবিক ক্রিয়াকলাপে মন দিতে।

কিন্তু তা কি ঘটেছে? ইংল্যান্ডের ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলুশন তো আজ হয়নি। তারপরে কত শত রেভুল্যশন ঘটে গেছে সারা পৃথিবীতে। কিন্তু মানুষ কি আজকে প্রকৃতই যন্ত্রের ক্রীতদাস নয়? আজ কোনো মানুষকেই কি আর প্রকৃত কৃতবিদ্য বলা চলে। এখন কৃতবিদ্য হয়েছে যন্ত্র আর মানুষ হয়েছে তার ক্রিয়াকলাপের মুগ্ধ দর্শক। এই "উন্নতি", এই কম্পিউটার-রেভল্যুশনের শেষ গন্তব্য তো জাগতিক উন্নতি। আরও সচ্ছল হওয়া, আরও ভালো থাকা, আরও আরাম, বিলাসব্যসন, আরও বড়ো বাড়ি, বড়ো গাড়ি, প্রতিবেশীর পরম ঈর্ষাভাজন হওয়া।

এই যদি উন্নতির "সংজ্ঞা" এবং শেষ "গন্তব্য" হয় তবে আমি অনুন্নতই থাকতে চাই।

অর্থনীতি শাস্ত্রেরই মতন মানুষের জীবনে এবং ইতিহাসেও কোনো কোনো অধ্যায় থাকে। যাদের PERIODS OF UNSTABLE EQUILIBRIAM বলা যেতে পারে। মানুষের জীবন এমনই যে, যেখানে STATIC অথবা STABLE EUILIBRIAM-এর কোনো অবকাশ নেই। তার অস্তিত্ব এবং অগ্রগতির রকম সবসময়েই "টলটলায়মান" হওয়াটাই বাঞ্ছিত। আমার মত অন্তত তাই। তুমি, আমাকে OUT DATED বলো আর যাই বলো। বিজ্ঞানের, চিকিৎসার এবং প্রতিরক্ষার সীমিত ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার দোষের বলে মনে হয় না। কিন্তু জীবনের সর্বক্ষেত্রেই কম্পিউটারের প্রাধান্যর আদৌ কোনো মানে আছে বলে আমি অন্তত মনে করি না।

যাকগে। বাসন্তী শুক্লপক্ষের চাঁদের কথা বলতে বসে কত কথাই না বলে ফেললাম। আমার মন সত্যিই ঘাসফড়িং-এরই মতো। সদাই লম্ফমান, কম্পমান। স্থির হয়ে বসতে জানে না সে কোনোখানেই। এটা লজ্জার।

এই বাংলোটি অত্যন্তই সুন্দর কিন্তু এখানে সৌরশক্তি চালিত আলো আছে। সন্ধে থেকে রাত এগারোটা অবধি জ্বলে। চাঁদের আলো যে উপভোগ করব তার জো-টি নেই। বিচ্ছিরি। শুধু বাংলোতেই নয়, আলো জ্বলে বাংলোর কাছেরই পঞ্চায়েতেও। সেখানে টি.ভিও চলে। সন্ধে থেকে গাঁক গাঁক গাঁক করে, এই বনের ধাড়ি বুনো শুয়োরের মতো শব্দ করে।

গণতন্ত্রের ক্ষমতাবানদের ক্ষমতার শিখরাসীন হওয়ার প্রথম সোপানই এই সব পঞ্চায়েত। GOVERNNENT OF QUANTITY-র ভিত্তিপ্রস্তর এই পঞ্চায়েতেই স্থাপিত। কৃত্রিম, মতলববাজ, অসৎ কিছু মানুষ, পঞ্চায়েত থেকে রাজ্যের মন্ত্রিসভা, এবং কেন্দ্রের মন্ত্রিসভাও দখল করে আছেন। সকলেই নন। তবে অধিকাংশই। এখন দলই সব প্রায় সকলের বেলাই এই কথা বলা চলে। ব্যক্তি হারিয়ে গেছে। তার কণ্ঠ সজোরে চেপে ধরেছে এই সব দল আর দলীয় নেতারা। প্রত্যেকটা দলই সমান। PARTY SYSTEM-এ এটাই স্বাভাবিক। ECONOMICS-এর GRESHAM'S LAW-এর DICTUM "BAD MONEY DRIVES AWAY GOOD MONEY" রাজনৈতিক জগতেও আজকে পুরোপুরি প্রযোজ্য। ভালো এবং সরল মানুষ হলে, তাকে সচরাচর সব দলই ছুড়ে ফেলে দেয়, সে দল রাজনৈতিক হোক বা সাংস্কৃতিক হোক বা সাংগীতিক অথবা সাহিত্যিক।

আমেরিকান ঔপন্যাসিক ERNEST HEMINGWAY বলতেন : "I WANT MINIMUM GOVERMENT."

আমারও তাই বক্তব্য।

যাকগে ওসব অসুন্দর প্রসঙ্গ। আমি আবার ফিরে যাই এ জঙ্গলের প্রসঙ্গেই। ভাবলে দুঃখ হয় যে শহুরেদের আর বিজ্ঞানের যে প্রকার "জয়যাত্রা" অহরহ লক্ষ করছি তাতে ভবিষ্যতে এই সব অরণ্য পর্বত এবং অরণ্যবাসীরা তাদের স্বকীয়তা আদৌ ধরে রাখতে পারবে কি না! শহুরে মানুষ আর বুনো মানুষের মানসিকতাতে আর কোনোই তফাত হয়তো থাকবে না। সে বড়ো দুর্দিন হবে।

বিকেলে গাড়ি থেকে নেমেই জঙ্গলে হাঁটতে গেছিলাম। বিন্ধ্য পর্বতমালার এ অঞ্চলে গভীর জঙ্গল আছে। বাংলোর পেছনে একটি কজওয়ে পেড়িয়ে গভীরতর জঙ্গলে পৌঁছোনো যায়। প্রায় মাইল তিনেক হেঁটে এলাম। জঙ্গলে হাঁটতে গেলেই ঋজুদার কথা খুব মনে পড়ে। সঙ্গে থাকলে, কত কী জানতে পারতাম। কত গাছের নাম, ফুলের নাম, পাখির নাম। আমি আর কতটুকু জানি।

"লামণি" বাংলোর তিনধারেই চমৎকার চওড়া বারান্দা। যে কোনো বন-বাংলোর বারান্দাই তার মর্যাদা। সামনের দিকে পঞ্চাশগজ মতন দূরে একটি ঘর আছে। সবুজ কাঠের টাইলস ঢাকা দেওয়া তার ছাদ। সবদিক খোলা। সেখানে বসে, দূরে বাঁক নিয়ে চলে যাওয়া পাহাড়ি নদী মাট্রিনালাকে দেখা যায়। পথটাও একটা বাঁক নিয়ে চলে গেছে কেঁওচির দিকে। পথের দুপাশে ঘন শালজঙ্গল। দিনশেষের আলোতে রাঙামাটি, সবুজ শালবন, আর কালো পিচ রাস্তাকে ভারি সুন্দর দেখায়।

এখনও বসে আছি সেই বসার ঘরটিতেই। বাংলোর দিকে পিছন ফিরে, যাতে কোনোরকম আলোই চোখে না পড়ে। চাঁদের আলো এখনও পরিষ্কার হয়নি। যাব যাব করেও, প্রেমিকার সুগন্ধি শরীরের গন্ধে আমোদিত কবোষ্ণ বিছানা ছেড়ে প্রেমিকের যেমন পুবে আলো ফুটলেও যেতে মন সরে না, তেমনই শীত এখনও পুরোপুরি যায়নি এখান থেকে।

ওড়িশা বা বিহারে যখন বসন্ত আসে, মধ্যপ্রদেশে বা গুজরাট বা মহারাষ্ট্রে আসে তার বেশ কিছুদিন পরে। আমাদের বাংলাতে আসে এদের মধ্যে সকলের আগে। সূর্যাস্তও যেমন ওসব জায়গাতে দেরি করে হয়, সূর্যোদয়েরই মতো, তেমন ঋতুরাও একে একে এসে পৌঁছোতে দেরি করে। শীত এখনও যায়নি বলেই আবছা আবছা লাগছে। রাতে এখনও ভালো হিম পড়ে। এবং সেজন্যই বোধহয় এই রাতের সৌন্দর্য এক আলাদা মাত্রা পেয়েছে। জীবনেরই মতো, প্রকৃতিতেও

স্পষ্টতার মধ্যে সহজগ্যতা আছে কিন্তু অস্পষ্টতার মধ্যে রহস্য। দূরের অস্পষ্ট মাট্টিনালার উপরে একজোড়া টিটি পাখি উড়তে উড়তে ডাকছে।

দূরাগত ক্ষীণ টিটির-টি-টিটির-টি ডাক পৃথিবীর এই রাতের সব রহস্য নিয়ে আসছে আমার কানে। এই পাখিগুলো দিনে এবং বিশেষ করে রাতেও কোনো নড়াচড়া দেখলেই অমন করে ডাকে। এদের ইংরেজি নাম WATTLED LAPWING এদেশে দুরকমের দেখা যায়। YELLOW WATTLED আর RED WATTLED.

এই পাখিরা ভারতের সব জঙ্গলকেই এক গভীর রহস্যময়তা দান করে রাতের বেলা। যে ভাবে পশুপাখির বিনাশ ঘটছে তাতে ভয় হয় এরাও হয়তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তেমন দুঃখরাতে বনের রাত বুঝি রহস্যরহিত হয়ে যাবে।

লামণি বাংলোর সামনের পথ বেয়ে লরি ও বাস যাচ্ছে অনেক। শুনলাম। রাত ন'টা নাগাদ এই চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। বনের বুকের কোরকে বসে থেকেও এই নিরন্তর ট্রাক এবং বাসের শব্দ শুনতে পাওয়াটাই একমাত্র মন্দ ব্যাপার।

অমরকন্টক শুধু হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্রই নয়, শোণ এবং নর্মদা নদের উৎসস্থলও ওই মেকলে মালভূমিতে। এছাড়া ইন্ডিয়ান অ্যালুমিনিয়াম এবং ভারত অ্যালুমিনিয়ামের কারখানার জন্যে বক্সাইটও যায় এখান থেকেই। তাই ট্রাক, বাস তো যাবেই। বক্সাইট অবশ্য আসে পাহাড় থেকে রোপওয়েতে করে।

আজই সবে এসেছি। কাল সকালে উঠে পায়ে হেঁটে চারধারে ঘুরে ঘুরে SCOUTING করতে হবে। পায়ে হেঁটে না ঘুরলে কোনো জায়গাই ভালো করে দেখা হয় না। যাকে বলে, TO HAVE A FEEL OF THE PLACE, তা হয় না।

আজ ঘুম পেয়ে গেছে। তাছাড়া, চাঁদের আবছা আলোতে লিখছি। হাতের লেখা দেখেই নিশ্চয়ই তা বুঝতে পারছ। জানি, তোমার এ চিঠি পড়তে অসুবিধা হবে। আমারও অসুবিধে হচ্ছে লিখতে। তবুও লিখছি। সব আনন্দই নিজের সুবিধেমতো যে আয়ত্ত করতেই হবে তারই বা মানে কি?

আজ শেষ করছি। কাল ভালো করে লিখব।

দিগন্ত

ইন্দি সেন
মার্লবোরো
ম্যাস., ইউ. এস. এ

লামণি
ছত্তিশগড়
মধ্যপ্রদেশ

ইন্দি ঠাকরুণ

ভেবেছিলাম, তোমাকে অরণ্য-স্তবের মতো একটি সুন্দর, গা-ছমছম, বনগন্ধময়, সবুজাভ চিঠি লিখব। কিন্তু হল না এই জন্যে যে, আমার যে-বন্ধুর গাড়ি নিয়ে এসেছি বিলাসপুর থেকে, তার গাড়ি আগামীকালই ফেরত পাঠাতে হবে বিলাসপুরে। তিনদিন পরে আবারও ফিরে আসবে যদিও, মানে দোলের পরের দিন। তার পরদিন তো চলেই যাব। তাই তড়িঘড়ি করতে হল, সময় পাব না বলে। আর ভীষণ তাড়াতে তড়িঘড়ি করে চুমু খেতে গেলে যেমন সে চুমু চুমু থাকে না, কামড়

হয়ে যায়, অন্য নির্ভর অবকাশে তড়িঘড়ি চিঠি লিখতে গেলে সেই চিঠিও টেলিগ্রাফ হয়ে যায় চিঠিও তো গানেরই মতো একধরনের শৃঙ্গারই। শৃঙ্গারে তাড়াহুড়ো TABOO। একথা বিশ্বাস করো নিশ্চয়ই।

প্রায় সারাদিনই এখানে ছিলাম না। সকালে ব্রেকফাস্ট করেই অমরকণ্টকের দিকে রওনা হয়ে গেছিলাম। এই বাংলোর কর্মচারীরা মোটেই কাজকর্মে মনোযোগী নয়। তারা কেউ বাংলোতে থাকেও না। খাওয়াদাওয়ার বেশ অসুবিধা। দেখাশোনাও করে না কেউই, যদিও ফরেস্টার একজন আছেন এখানেই। পুলিশ সার্জেন্টদেরই মতো ট্রাক থামিয়ে চেক-নাকাতে পয়সা কামানোতে তাঁর যত উৎসাহ ততখানি নিজের কর্তব্যকর্মে আদৌ নেই। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ কর্মবিমুখ ভোগোন্মুখ আমলাদেরই মতো তিনি অধুনা ভারতের আরও একজন সরকারি আমলা।

সারাদিন অমরকণ্টকে থেকে বিকেল বিকেল রওনা হয়ে বেশ রাতে এখানে এসে পৌঁছেছি। আজই না গেলে অমরকণ্টক দেখাই হত না। কারণ, পরে গাড়ি পেতাম না।

ভারি ভালো লাগল। অমরকণ্টক যেতে হলে লামণি থেকে কেঁওচি অবধি গিয়ে বাঁদিকে বেঁকে যেতে হয়। অধিকাংশ পুণ্যার্থীই আসেন ট্রেনে। পেন্ড্রা রোড স্টেশনে নেমে সেখান থেকে বাস বা ট্যাক্সিতে করে যান। অগণ্য ধর্মশালা আছে। জলবায়ুও চমৎকার। রীতিমতো উঁচু অমরকণ্টক। আমার মতোই যাঁরা তীর্থযাত্রী নন, তাদের কাছে অমরকণ্টক SUMMER RETREAT বলেও চলে যেতে পারে সহজেই।

তবে দ্রষ্টব্যও আছে অনেক, যাঁরা দেখতে চান তাঁদের জন্যে। শোণ নদীর উৎসমুখে শোণমুড়া, নর্মদার উৎস নর্মদউদ্‌গম, কপিলধারা প্রপাত, পঞ্চমুখী গায়ত্রী মন্দির। মার্কণ্ডেয়াশ্রম।

শংকরাচার্যের উপাস্য দেবতা পঞ্চমুখী শিব আছেন মার্কণ্ডেয়াশ্রমে। মাই কী বাগিয়া। আর জনপদে ঢোকার পথে, পাঁচ কি.মি মতো আগে আছে কবির চবুতরা। সন্ত কবিরের সিদ্ধিস্থান।

এখানে কয়েকবছর আগেও পদব্রজেই আসতে হত। পিচ-বাঁধানো পথই সর্বনাশ করেছে সুন্দর পবিত্র জায়গাটার। "Communication" হয়তো ব্যবসায়ীদের মুনাফা বাড়াতে সাহায্য করে, হয়তো স্থানীয় মানুষদের আয় বাড়াতে সাহায্য করে কিন্তু তার সঙ্গে অনেক এবং অনেকরকম বিবাদও যে ডেকে আনে সে বিষয়ে আমার অন্তত কোনো সন্দেহ নেই।

আমাদের নিজেদের কথা ভাবলেও লজ্জা হয়। এমন আত্মবিস্মৃত জাত বোধহয় আর নেই। আমরা ইংরেজদের তো বটেই, পারসিক, মোগল, আফগান, তুর্কি ইত্যাদিদের, তা তাঁরা এখানে এসে রাজ্য পত্তনই করুন আর লুটেরা বা ধর্ষণকারীই হন, কুষ্টি-ঠিকুজি মুখস্ত করে রাখি কিন্তু আমাদের নিজেদের পৌরাণিক কাহিনিগুলি তো বটেই, ইতিহাসও জানি না। জানি তো নাই, উলটে জানতে লজ্জাবোধও করি। আর এই লজ্জা বাঙালিদেরই সবচেয়ে বেশি। ফরাসি দেশের রেনেসাঁ অথবা লেনিনস্ট্যালিনের গুষ্টির ইতিহাস অথবা মাও জেদং-এর শরীর-গতিক সম্বন্ধে যতখানি খবর আমরা রাখি তার এককণাও রাখি না শংকরাচার্য বা ছত্রপতি শিবাজির। শংকরাচার্য কে ছিলেন আমরা জানি না। রামকৃষ্ণদেব বা স্বামী বিবেকানন্দের কথাও তেমন জানি না। অথচ দক্ষিণ ভারতে রামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দকে ঈশ্বর জ্ঞানে পুজো করা হয়। আমরা রামায়ণ মহাভারতই পড়ি না। যে দুই মহাকাব্যের শিক্ষায় আজও নব্বই ভাগ ভারতীয় শিক্ষিত। সেই শিক্ষাতেই তাদের মূল্যবোধ, ন্যায়-অন্যায় বোধ আজও আমাদের চেয়ে অনেকই অন্যরকম। আমরা ইংরেজি জানি, কেবল টি ভি দেখি, সি. এন. এন., বি. বি. সি.। বিজ্ঞাপনের আঠাতে দুচোখ সাঁটা আমাদের। অন্য কিছু দেখতেই ভুলে গেছি। রাম আর হনুমানকে নিয়ে তামাশা করি। সিউডো ইন্টেলেকচুয়াল বিধর্মী চিত্রীর আঁকা বিবসনা সীতা বা সরস্বতীর ছবি দেখে আহ্লাদ করি। আমাদের মহান সাহিত্যিকেরা বাংলাদেশে বই বিক্রি অব্যাহত রাখতে গোমাংস ভক্ষণের উপকারিতার গুণগান করেন, আর সেই আমরাই হজরত মোহম্মদের কেশ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলেও

সেই দুর্বিনয়ের কারণে যত্রতত্র দাঙ্গা বেধে যায়। ভারতীয় হিন্দুরা এক আশ্চর্য প্রজাতি। নীলগিরি পর্বতশ্রেণীর গভীরে অতি দুষ্প্রাপ্য স্লো লরিস বাঁদরের প্রজাতির মতন। যাদের চলতে ফিরতে আঠারোমাস।

অমরকণ্টকের মন্দির-টন্দির আমার দ্রষ্টব্য ছিল না। কোনও জায়গার মন্দিরই নয়। কিন্তু লক্ষ লক্ষ সাধারণ ভারতীয় কিসের টানে এইসব জায়গাতে আসেন তা জানতে ভারি ইচ্ছে করে। গ্রামীণ ভারতবর্ষের মানুষদের সঙ্গে মিশে, তাঁদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সেই MAINSTREAM-এর মধ্যে লীন হতে মাঝে মাঝে খুবই ইচ্ছে করে। যদিও জানি যে, অনেকই দেরি করে ফেলেছি। অনেকখানি চলে এসেছি ভুল পথে। এখন আর সময় নেই।

বুঝলে ইন্দি, অমরকণ্টকের গভীর জঙ্গলাবৃত বিন্ধ্যপর্বতমালার দৃশ্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমার মনে হয় যে, আমাদের যে কোনো তীর্থস্থানে মন্দিরের মধ্যে যা আছে, তার চেয়ে অনেকই বেশি আছে সেই তীর্থস্থানের পথে। হিন্দুদের সব তীর্থ সম্বন্ধেই বোধহয় একথা বলা চলে। সেই পথের প্রাকৃতিক দৃশ্য, তার সৌন্দর্য এবং তার অমোঘতা, তার ভয়াবহতাই মানুষকে বিনত করে, SUBLIME করে, HUMILITY-তে ভরে দেয় তার মন। এমনি করেই তার মনের আধারটি ঈশ্বরের ভাবনা ভাবার যোগ্য হয়ে ওঠে। ওঠে বলেই আমার বিশ্বাস।

আমেরিকান ন্যাশনাল গ্রিনকার্ড হোল্ডার তুমি ভাবছ আমি ঈশ্বরটিশ্বরের কথা কেন তুলছি? মান্ধাতার আমলে আবার ফিরে যাওয়া কেন? ভাবছ, আমি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি?

উত্তরে আমি বলব, তোমাকে খুবই অবাক করে দিয়ে বলব যে, করি। মূর্তিতে বিশ্বাস করি না কিন্তু ঈশ্বরে অবশ্যই করি।

ঈশ্বরবোধহীন মানুষ, ধর্মরহিত মানুষ, ন্যায়-অন্যায় বোধহীনও হতে বাধ্য। সে মনুষ্যেতর জীব। জানোয়ারের ঈশ্বরবোধ বা ন্যায়-অন্যায় বোধ থাকে না। কিন্তু মানুষের থাকে। থাকা উচিত অন্তত। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের মূল উদ্দেশ্যই হয়তো : মানুষকে মনুষ্যত্বর যোগ্য করে তোলা, তাকে মনুষ্যেতর হতে না-দেওয়া।

অমরকণ্টকের পথের এবং বিন্ধ্যরেঞ্জের মেকলে পাহাড়ের (প্রায় এগারশো মিটার উঁচু) পাদদেশে যে গভীর বনভূমি তা আমাকে অমরকণ্টকের চেয়েও বেশি আকৃষ্ট করেছে। ইচ্ছে আছে একবার উমারিয়া থেকে শুরু করে ভ্যালেন্টাইনের মাড়িয়ে যাওয়া পথ বেয়ে ভউদুকা, পাটকুরিয়ার মালভূমি, অমৃতধারা, চিলিকা এবং কোডিয়াগড়ের আশ্চর্য সুন্দর অরণ্যরাজিতে "তীর্থ" করতে আসত। বনভূমিই আমার তীর্থ। অমরকণ্টকের চারধারের বনভূমি এখনও যেমন অক্ষত ও নিবিড় তেমনটি ভারতের খুব বেশি জায়গাতে আজ নেই সম্ভবত।

লামণির কাছেই, অচানকমারের চারধার ঘিরে (লামণিও তার মধ্যে পড়ে) একটি নতুন অভয়ারণ্য গড়ে উঠেছে। তার নাম "অচানকমার অভয়ারণ্য" ওড়িশার "সাতকোশিয়া গণ্ড" অভয়ারণ্যেরই মতন। তবে এসবই চোর পালানোর পরে বুদ্ধি বাড়ার সমতুল। আজ থেকে ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেই এই সব অভয়ারণ্য হলে অনেকই ভালো হত।

আজও কালকেরই মতন ঘুম পেয়েছে। কাল দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর তোমাকে আবার লিখব চিঠি, লামণির বনের গন্ধ-মাখা।

PROMISE!
ভাল থেকো।
—তোমার দিগন্ত

ইন্দি সেন, মার্লবোরো
ম্যাস. ইউ., এস. এ.।

সাত

লামণি
ছত্তিশগড়
মধ্যপ্রদেশ

কল্যাণীয়াসু লক্ষ্মী,

ইন্দি তো লক্ষ্মীই। ইন্দি, ইন্দিরাও।

"এসো সোনার বরণ রানি গো, এসো শঙ্খ কমল করে।
এসো মা লক্ষ্মী, বোসো মা লক্ষ্মী, থাকো মা লক্ষ্মী ঘরে।"

তুমি আমার লক্ষ্মী সোনা। কতদিন তোমার চিঠি পাই না।

কে জানে! আমার ডেরায় ফিরে গিয়ে হয়তো দেখব আমার জন্যে অনেকই চিঠি জমে আছে একসঙ্গে, তোমার গোটা গোটা হস্তাক্ষরে লেখা, ভালোবাসায় জরজর। আমি যে আমার লেখা চিঠিতে আতরমাখা হাত বুলিয়ে দিই তার গন্ধ কি তুমি পাও? সেই তো বনের গন্ধেরই মতন আমার মনের গন্ধ। আমার ভালোবাসার গন্ধ।

পাও যদি, তো বলোনি কেন কখনও?

এতদিনেও যখন তুমি বললে না তখন নিজেই জিজ্ঞেস করছি নির্লজ্জের মতন। কি আতর লাগাই তা কি জান? 'শাবেদুলহান'। শব্দটা আরবি। উর্দুতে বললে বলতে হত সুবাহ দুলহান। অর্থাৎ ভোরের বউ। রাত জাগার পরে ভোরের বউ এর গায়ের গন্ধর মতন গন্ধ এই আতরে। এ রে! ভাবলেই গা শিরশির করে রে!

মুসলমান জাতটাকে আমি বহুকারণে পছন্দ করি। তারা ভোগ করতেও জানে ত্যাগ করতেও জানে। যুদ্ধ করতে গেলেও সঙ্গে হারেম, কবিতার খাতা আর ছবি আঁকার রঙ তুলি নিয়ে যেতে ভোলে না। তারা জীবনকে যে চোখে দেখে মরণকেও সেই চোখেই দেখে। বাবুর্চি ছাড়া তারা জাহান্নামেও যেতে রাজি নয়। এমন বিরাদরিও অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আছে বলে আমি তো জানি না। যাই বলো আর তাই বলো, গ্রেট জাত। দুঃখের কথা এই যে আমরা না জানলাম অন্যদের এবং না জানলাম নিজেদেরও। অপার অশিক্ষিত আমরা।

সারা গ্রীষ্ম আমি আতর ব্যবহার করি। বর্ষাতে রজনীগন্ধা, শীতে অম্বর, আর ক্ষণস্থায়ী বসন্তে ফিরদৌস বা হিণ্বা। এবং সাম্প্রতিক অতীত থেকে 'শাবেদুলহান' যার কোনোদিনও বউ হবে না তার আতরের গন্ধ নিয়েই বউ-পাগল হওয়া ভালো। এমন একটা চমৎকার দিশি শিল্প সাহেবদের সবকিছুই অনুকরণপ্রিয় আমরা নষ্ট করে ফেললাম। উত্তর ও মধ্য ভারতের এবং দক্ষিণ ভারতেরও এবং অবশ্যই বিহার-ওড়িশারও কিছু রহিস মুসলমানেরা ছাড়া আতর আজকাল কেউই ব্যবহার করেন না। টিম টিম করে এই শিল্পটি বেঁচে আছে মুখ্যত মধ্যপ্রাচ্যের শেখদের জন্যে। কোটি কোটি টাকার আতর তাঁরা আমদানি করেন। কিন্তু যাঁরা আতর বানান, উত্তরপ্রদেশের নানা জায়গাতে এবং দক্ষিণেও হয়তো অনেক জায়গাতে বানান, তাঁদের পরের প্রজন্মেরা সব "সাহেব" হয়ে গেছেন। আমাকে আতর দিয়ে যায় বছরে দুবার। ঈদের সময়ে আর হোলির সময়ে। জৌনপুর আর বদায়ুন

থেকে আসে দুই আতরওয়ালা। ঈত্বর-ই-গিল আতর অনেকে মাখেন গরমের সময়ে। গিল অর্থাৎ মৃত্তিকা। আমি মাখতাম ছেলেবেলায় ঋজুদার সঙ্গে যখন বাঘ শিকারে যেতাম। মাচাতে বসতাম ওই আতর মেখে। "রহিসি" করে।

যা কিছুই দিশি তার সব কিছুরই প্রতি এমন বিদ্বেষ আমাদের মতন আর কোনও জাতেরই নেই। অথচ আমাদেরই বাবা-দাদারা বিদেশি জিনিস বর্জনের জন্য আন্দোলন করেছিলেন। চরকাতে হাতে-বোনা খদ্দর পরতেন। বিদিশি হটানোর জন্যে জেলে গিয়েছিলেন, মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ভাবলেও অবাক লাগে! এত বড়ো বড়ো কল্যাবরেশান হচ্ছে এখন, মধ্যপ্রাচ্যের কোনো শেখকে ধরে আতর-শিল্পটাকে একটা BOOST UP দিতে পারা গেলে মন্দ হত না। টাকাও তেমন কিছু দরকার ছিল না।

যাকগে, মরুকগে। আমি এখন তোমাকে বনগন্ধময় চিঠি লিখতে বসেছি, কোনো শিল্প-বাণিজ্যর কথাই এর মধ্যে আনব না আর। এখন দেনাপাওনা শুধু ভালোবাসার, লেনদেন শুধু চুমুর বা সঙ্গমের। এখন পাখির ডাক, ভ্রমরের ডানার গুঞ্জন, নির্জনে, দূরে, নদী বয়ে-যাওয়ার অস্ফুট শব্দ, হাওয়ার ফিশফিশ, পাতার চামর দোলানোর ঝুরুঝুরু মর্মরধ্বনি। মৌ-টুসকি পাখিদের কিস-কিস। Kiss-Kiss! আমায় দাও। এক্কো, দুতো, তিনতে, তারতে।

শুধু এই সবই। আর কিছুই নয়।

জানি না, কেন, আজকাল নির্জনে এলেই তোমার কথা মনে হয়। যখন দূরে গাঢ় সবুজ বনরাজিনীলার উপরে হালকা নীল নির্মেঘ আকাশে ঘুরে ঘুরে WHITE CRESTED EAGLE ওড়ে বৃত্তাকারে, পাতায় পাতায় বয়ে যায় মিশ্রগন্ধ বয়ে নিয়েআসা হাওয়া, গোরু মোষের গলার কাঠের ঘণ্টার ডুং-ডুং ধ্বনি ভেসে আসে নেপথ্য সঙ্গীতেরই মতন, তখন ইচ্ছে করে, খুবই ইচ্ছে করে, তোমার সঙ্গ পেতে।

গত রাতে খুব শীত করেছিল। এই বসন্তেও। জ্বর জ্বর লাগছিল। কতরকমের জ্বর হয় মানুষ-মানুষীর তা কি তুমি জানো? কাম-জ্বরও একরকমের জ্বর। তা ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার চেয়েও ভয়ংকর। তোমাকে কি কখনও ধরেছিল এই জ্বরে? এ জ্বর ঘুষঘুষে নয়। প্রবল প্রতাপে আসে এবং ফিরে যায়। ফিরে যায় না, অন্য শরীরে সেই দুলালি-তাপ সংক্রামিত করে অনুপম নিজেই নিজেকে বিধ্বস্ত করে মরে যায়। যা কষ্ট ছিল, তাই গভীর আনন্দ হয়ে ওঠে।

আজ সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। ব্রেকফাস্টটা আদৌ জমল না। এই বাংলোর সব খিদমতগারেরাই থাকে পথের উলটোদিকে গোন্দদের গ্রামে। মস্ত গ্রাম। তাদের সংসার, খেত-খামার নিয়েই তারা সদাব্যস্ত থাকে। বাংলোর বা বাংলোতে-আসা অতিথিদের দেখভাল করার ইচ্ছে বা সময় এদের কারোই নেই। অথচ মাস গেলে হাত পেতে বনবিভাগ থেকে মাইনে নিতে তাদের আত্মসম্মানে লাগে না। ধীরে ধীরে পশ্চিমবঙ্গের কর্মসংস্কৃতি বোধ হয় দেশের সব জায়গাতেই পৌঁছে যাচ্ছে। স্বাধীনতা পাবার পর আমাদের দেশে যা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা কর্তব্যজ্ঞান, সততা আর আত্মসম্মানজ্ঞান। অথচ এই তিন গুণ ছাড়া কোনো জাতই জাত হিসেবে গণ্য হওয়ার নয়।

এই বাংলোতে যদি কেউ কখনও আসতে চান তো নিজেদের খিদমতগার সঙ্গে করেই নিয়ে আসা উচিত। মধ্যপ্রদেশের ছত্তিশগড়ের এই লামণি বাংলোর মতন এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন ও উদাসীন বন-কর্মী আর কোথাও দেখিনি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষদেরও বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। আমাকে এই বাংলোতে বসিয়ে দিয়ে গেলেন একজন রেঞ্জার । বিলাসপুরের একজন কনসার্ভেটরের নির্দেশে। সেই রেঞ্জারের হেড কোয়ার্টার্স পেন্ড্রা রোডে। ফরেস্টারের সঙ্গে আলাপও করিয়ে দিয়ে গেলেন। অথচ তারপরও এই অবস্থা অভাবনীয়!

কোল-ইন্ডিয়ার (এস. ই. সি. এল) কলিয়ারিগুলির সম্প্রসারণে ECOLOGICAL

BALANCE যাতে নষ্ট না হয় সেজন্যে একজন কনসার্ভেটর লেভেলের অফিসারকে বনবিভাগ নিয়োগ করেছেন শুনলাম। যে কনসার্ভেটর নির্দেশ দিয়েছিলেন রেঞ্জারকে, তিনিই সেই। তাঁর নাম মিস্টার গেনা অথবা জেনা। লোকমুখে শুনলাম, তিনি নাকি নিজের ECOLOGY নিয়েই ব্যতিব্যস্ত থাকেন এবং কোল-ইন্ডিয়ার এয়ারকন্ডিশানড অফিসেই তাঁর দিন কেটে যায়। বনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিশেষ নেই।

আমাদের দেশের সমস্ত রাজ্যের বনবিভাগেই এইরকম পায়াভারি, অপদার্থ এবং অসৎ আমলারা যত কম থাকেন ততই মঙ্গল।

অবশ্য জানি না, যাঁরা ওই ভদ্রলোক সম্বন্ধে এসব বললেন তাঁদের নিজেদের কোনো VESTED INTEREST ছিল কিনা। তবে ওই কনসার্ভেটরকে যে অধস্তন কর্মচারীরা কেউই আদৌ মান্য করেন না তা আমার প্রতি তাঁদের উদাসীনতাই প্রমাণ করে।

যাই হোক, বন্‌ ভালোবাসি বলেই, বন-বন্যপ্রাণী এবং বন-বাংলোর হেনস্তা আমাকে শুধু দুঃখিতই নয়, ক্রুদ্ধও করে তোলে।

লামণি বাংলোর হাতাতে, সামনেই একটি গামহার গাছ আছে। হাওয়াতে তার গায়ের গন্ধ ওড়ে সর্বক্ষণ, চান করে-ওঠা তোমার গায়ের গন্ধেরই মতো। দুটি প্রাচীন BOTTLE BRUSH- এর গাছও আছে এত বড়ো BOTTLE BRUSH-এর গাছ আর কোথাওই দেখিনি। এক ঝাঁক MUSSUNDA।

হাতার প্রান্তদেশে বনবিভাগের সাম্প্রতিক অতীত থেকে লাগু হওয়া SOCIAL FORESTRY-র জিগির-এ এক গাদা লেবু ও পেয়ারাগাছ পুঁতে মাট্রিনালা এবং সামনের পথের দৃশ্যের সর্বনাশ করেছেন গেনা বা জেনাসাহেবের মতো বনবিভাগের কোনো হস্তীমূর্খ, সৌন্দর্যজ্ঞানহীন আমলা। SOCIAL FORESTRY, গ্রামে করা হোক আপত্তি নেই। কিন্তু বন-বাংলোর হাতাতে সেই আক্রমণের দাঁত কেন? এই সব লেবু ও পেয়ারা তো বসে বসে মাইনে-পাওয়া বনবিভাগের এই সব খিদমতগারেরাই খায়। তবে আর বন-বাংলোর এমন সৌন্দর্যহানি করা কেন?

বন-বাংলোর হাতাতে সাহেবদের আমলে নানান দুষ্প্রাপ্য সব গাছ লাগানো হত কিন্তু আমাদের দিশি সাহেবদের মধ্যে সেসব গুণ বেশি দেখা যায় না। ইংরেজদের প্রকৃতি প্রেমও অসাধারণ ছিল। সাধারণ জ্ঞান, সারা পৃথিবী তাঁদের করায়ত্ত ছিল বলেও হয়তো একজন গড়পড়তা ভারতীয় আমলার চেয়ে হয়তো বেশিই ছিল। তবে বনকর্মীদের মধ্যে ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। নইলে সব রাজ্যের বনবিভাগই অচল হয়ে পড়ত।

বাংলো থেকে বেরিয়ে কেঁওচির দিকে না গিয়ে বিলাসপুরের দিকে একটু গেলেই একটি চেক-নাকা পড়ে। সেটি পেরিয়ে গেলে একটি কাঁচা-পথ চলে গেছে বাঁদিকে অপেক্ষাকৃত কমবয়সি শালের প্ল্যান্টেশানের মধ্যে দিয়ে। আড়াই-তিন কি.মি মতো গিয়ে একটি শালগাছ দেখলাম, যদিও সে এখন মৃত। অতবড়ো শালগাছও আগে দেখিনি। তার নাম মেড্রিসেরাই। গোন্দ-বাইগাদের ভাষায় শালগাছকে বলে সেরাই। বিহারে বলে শাকুয়া। ওরাওঁ, চেরো, খাঁরওয়ার সকলেই শাকুয়াই বলে। আর সেগুনকে বলে সাগুয়ান।

এই মেড্রিসেরাইটি নাকি মধ্যপ্রদেশের তৃতীয় উচ্চতম গাছ। এই গাছের একটি ইতিহাস আছে। পরে বলব তোমাকে।

ভালো থেকো।

—দিগন্ত

লামণি বন-বাংলো
ছত্তিশগড়
মধ্যপ্রদেশ

ইন্দি,

এখানে চারদিন হয়ে গেল। গতরাতে দোলপূর্ণিমা ছিল। আগামীকাল ভোরে রওনা হব বিলাসপুরের দিকে। তারপর বিকেলে পৌঁছে রাতের বম্বে-হাওড়া মেল ধরব। তারপর শেষরাতে গাড়ি বদলে কটক।

কালকের রাতটির কথা অনেকদিন মনে থাকবে। সে এক মিশ্র অনুভূতি।

এ অঞ্চলের জঙ্গলে নানারকম গাছ আছে। শাল, সেগুন, ছোটো বাঁশ, খুব সুন্দর, দেখতে, শিমুল, শিশু, কেন্দ, পিয়ার, অশোক, গামহার, পলাশ। অমাদের ওড়িশার না-নউরিয়া বা গিলিরিরই মতন নানান ফুলের লতা, নানারকম ঘাস, বিজা, আম, বট, অশ্বত্থ। নানারকমের ঝোপঝাড়, লতা। বন্যজন্তুর মধ্যে বাঘ, চিতা, ভাল্লুক, চিত্রল হরিণ, কোটরা হরিণ, শম্বর, বাইসন, শিয়াল, খরগোশ ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবশ্য গত রাতে মাট্টিনালা, পেরিয়ে বিন্ধ্যরেঞ্জের বুকের কোরকের জঙ্গলে একঝাঁক চিতল হরিণই দেখলাম শুধু। বন চমৎকার, কিন্তু জানোয়ার তেমন নেই। দেখে মনে হয় EXTREMELY SHOT-UP AREA। তবে জানোয়ার অবশ্যই আছে বনের গভীরে গভীরে। তারা তো আর প্যারিসের বা লানডানএর 'সোহোর' কলগার্ল নয় সে সেজেগুজে পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে দেখা দেওয়ার জন্য!

সব জায়গাতেই চোরা শিকারে জানোয়ার শেষ হয়ে যাবার পরেই আমাদের SANCTUARY করার কথা মাথাতে আসে। তবে অধিকাংশ SANCTUARY-র মধ্যেও শিকার এবং কাঠ কাটা ঠিকই চলে। এবং চলে যে, তার পেছনে কাণ্ডজ্ঞানহীন অশিক্ষিত এবং শিক্ষিত শিকারি, এক ধরনের অসাধু ব্যবসায়ী এবং বনবিভাগের বিভিন্ন তলার আমলাদের যোগসাজশও থাকে। বন না বাঁচলে যে আমরাও বাঁচব না এই এই সরল প্রাঞ্জল সত্যটি মাংসলোভী এবং অর্থগৃধ্নু দ্বিপদ জানোয়ারেরা কবে সম্যক বুঝবেন তা জানি না। এ এক নিবিড় নৈরাজ্যে বাস আমাদের। মাঝে মাঝেই মনে হয় আমার যে, এ দেশের মা-বাবা নেই, অভিভাবক নেই। একে সকলেই লুটছে, চুষছে, ধর্ষণ করছে। অথচ আমাদের এই দেশের মতন সুন্দর দেশ পৃথিবীতে কমই আছে।

আগের চিঠিতে যে মেস্ত্রিসেরাই-এর কথা বলেছি সেই গাছটিকে স্থানীয় গোন্দ ও কাইগারা দেবতাজ্ঞানে পুজো করে হোলির সময়, হরিয়ালির সময়ে।

হোলি তো সকলেই জানে। হরিয়ালি কাকে বলে জানো কি? শান্তিনিকেতনে যেমন বৃক্ষরোপণ উৎসব হয় মধ্যপ্রদেশের বনেজঙ্গলেও বর্ষার সময়ে খেতে খেতে যখন প্রথম লাঙল দেওয়া হয়, বীজ ছড়ানো হয়, প্রকৃতির গর্ভাধান হয়, তখনই উদ্‌যাপিত হয় এই হরিয়ালি উৎসব।

সিঁদুর মাখায় ত্রিশূলে, যে সব ত্রিশূল পোঁতা আছে সেই অতিকায় তরুমূলে। মুরগি বলি দেয়,

ফুল ছড়ায়। এই মেভ্রিসেরাইই নাকি এই অঞ্চলের সব অধিবাসীদের রক্ষয়িত্রী। যদিও এখন বাজ পড়ে সে মৃত, তার ছাল টুকরো টুকরো হয়ে কাণ্ড থেকে খসে পড়ছে চারধারে। তবে সেই ছালও মোটা তক্তার মতনই মোটা। মৃত হলেও এ-অঞ্চলের গ্রামবাসীরা এই সুপ্রাচীন শালগাছটিকে এখনও জীবিত দেবতাজ্ঞানেই পুজো করে।

স্থানীয় মানুষদের মুখে শুনলাম যে, বহুদিন আগে নাকি এই গাছকে একাধিকবার কাটার চেষ্টা হয়েছিল। ঠিকাদারদের করাতিরা অসুস্থ হয়ে পড়ে বার বার। তারপর অন্য ঠিকাদার আসে। তার করাতিরা করাত চালাতেই মানুষের রক্তর মতন রক্ত বেরোতে আরম্ভ করেছিল গাছের গা থেকে। তখন মেভ্রিসেরাই তাদের স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন যে তাকে কাটতে গেলে তাদের অমঙ্গল হবে, আর না কাটলে মেভ্রিসেরাই-ই এই পুরো অঞ্চলের রক্ষয়িত্রী হবেন। তাতেও লোভী ঠিকাদার নিবৃত্ত না হয়ে অত বড়ো গাছের কাঠের লোভে তার করাতিদের আবারও পাঠায়। এবারে করাতিদের কারও মৃত্যু হয় এক অজানা দুরারোগ্য রোগে। তারপর কোনো করাতিই আর ওই গাছের গায়ে করাত ছোঁয়াতে রাজি হয় না। তারপর থেকে সকলেই মেভ্রিসেরাইকে দেবতাজ্ঞানে পুজো করে।

লামণি বাংলোর পেছনেই একটি ছোট্ট গ্রাম আছে। সেটি বাইগাদের। গোঁন্দদের বিরাট বস্তি পথের উলটোদিকে। সেই বাইগা বস্তির মুখিয়াকে ডেকে কিছু টাকা দিয়ে সকালেই বলেছিলাম যে, মহুয়া কিনে তোমরা খেয়ে নাচ-গান কোরো। পূর্ণিমার চাঁদ মাথার উপরে এলে আমি যাব তোমাদের গ্রামে। গেছিলামও। কী ভালো যে লাগল!

কার্মা নাচ নাচছিল ওরা ছেলেরা মেয়েরা সবাই ঘুরেঘুরে। কী সুন্দর নমনীয় ওদের শরীর। মেয়েরা হাতে একটি বাদ্যযন্ত্র নিয়ে (নাম জানি না) ধামসা আর মাদলের তালে তালে শরীর নুইয়ে তাদের মাথাগুলি প্রায় পায়ের কাছে নামিয়ে যেমন করে আনছিল, তেমন করে নোয়াতে নৈনিতালের হ্রদের পাশের WEEPING WILLOW-রাও পারে না।

তোমরা তোমরা, ওরা ওরা। ওরা শব্দে, বর্ণে, গন্ধে একশোভাগ ভারতীয়। আদিম ভারতবর্ষের গন্ধ ওদের গায়ে। ওদের ঘামে। ভারি ইচ্ছে করছিল এই মিথ্যে শিক্ষার, মিথ্যে মানের নির্মোকের পর নির্মোক, মুখোশের পরতের পর পরত ছিঁড়ে এই বনবালাদের একজনের হাত ধরে আলোছায়ার বুটিকাটা গালচেতে গিয়ে শুয়ে পড়ি। তারপর ঘর করি তার সঙ্গে। মাট্টিনালার জল, শালফুলের গন্ধ, উদার আকাশ, পাহাড় আর বন, কলুষহীন হাওয়া, মহুয়ার গন্ধ, মহুয়ার মদ। সেই জংলি মেয়ের গর্ভে আমার ঔরসে যে সন্তান আসবে তার গায়ে থাকবে এই মাটির গন্ধ, ফুলের গন্ধ। সে ইংরেজি না পড়েই রামায়ণ মহাভারতের শিক্ষাতেই প্রকৃত শিক্ষিত হবে। আমাদের প্রয়োজন থাকবে সীমিত। আসবাব থাকবে না। মাটির বাড়ি, মাটির হাঁড়িকুড়ি, খেজুর পাতার চাটাই, চাঁদ সূর্যের আলো, মিষ্টি গন্ধ, ধুলো।

আর কি চাই?

কিন্তু স্বপ্ন স্বপ্নই।

এই লামণির পঞ্চায়েতের এ শহর সে শহরে প্রায়ই আনাগোনা-করা শেয়ানা বুড়োগুলো শহর থেকে স্বার্থপরতা, বেইমানির জীবাণু বয়ে আনে। কচি কচি মেয়ে-মরদের সঙ্গে বসে সৌরশক্তি চালিত টি.ভি দেখে। জি.টি.ভি, দূরদর্শন। বিজ্ঞাপন দেখে। মডেলদের রং-ঢং। লোভের বীজাণু ওড়ে প্রতিমুহূর্তে প্রতিটি টি. ভি. সেট থেকে। যে জীবাণু এইডস-এর চেয়েও মারাত্মক রোগের বাহক। টি.ভি. দেখতে দেখতে এত যুগধরে স্বল্পতে সুখী সব বনবাসীরই মনে "সব কিছুরই" প্রয়োজন জাগে। ভালো জামা-কাপড়ের, চুলের তেলের, শ্যাম্পুর, টোস্টারের, গিজারের, ফার্নিচারের, ফার্নিশিং-এর, বাড়ির, এয়ার কন্ডিশানের, গাড়ির এবং সেলুলার ফোনেরও। কত কম

রোজগারে একজন মানুষের জীবন পরম সুখে অতিবাহিত করা যেত একথা মন থেকে নির্মূল করে দিয়ে কী কী নইলে বাঁচাই অসম্ভব, এই কথাই মন জুড়ে বসে। এতদিন চাঁদ রোদ আর বনের শান্তি নিয়েই পরম সুখী ওদের কাছেও টাকা আর সুখ সমার্থক বলে মনে হতে থাকে। ক্রমাগত অপ্রয়োজনের প্রয়োজনের ভার বাড়াতে বাড়াতে চুরি করে গাছ কাটা হয়, বাঘ মেরে চামড়া বিক্রি করতে হয়, রাহাজানি করতে হয়, ডাকাতি করতে হয়, মিথ্যাচারী জোচ্চার হতে হয়।

জানো ইন্দি, আমরা তো তোমাদের মতো বড়োলোক নই। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই এখনও গরিব। আমাদের মতো গরিব দেশে সাধারণের জন্যে যদি টি. ভি-র সমস্ত অনুষ্ঠানকে ভারতীয়ত্বে এবং সাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার সমতার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে যুদ্ধের ভিত্তিতে সেন্সর করে সম্প্রচার না করা যায় তবে অচিরেই পুরো দেশটাই চোর ডাকাত, ঘুষখোর আর ঘুষের দালাল, ধর্ষণকারী, খুনি, আর লুটেরাতে ভরে যাবে। মূল্যবোধ বলে কিছুমাত্রও থাকবে না আর অবশিষ্ট। শতকরা আধ-শতাংশ মানুষের কাছেও যেসব অনুষ্ঠান ও বিজ্ঞাপন জরুরি নয়, সেই সব অনুষ্ঠান ও বিজ্ঞাপন সর্বসাধারণকে দেখিয়ে সমস্ত দেশের সর্বনাশই সম্পূর্ণ করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

কিন্তু প্রতিবাদ করবে কে? ভাবে কে? 'লামণিতে' টি.ভি. এসে গেছে। এখানে আমার স্বপ্ন আর সফল হবে না। এখানে গোঁন্দ-বাইগারাও কলকাতা-দিল্লি-মুম্বইয়ের শহরবাসীর মতো সদালোভী, সর্বগ্রাসী খিদে নিয়ে নিজেদের ইহকাল পরকালের সর্বনাশ শিগ্‌গির নিশ্চিত করবে। করবেই যে তা পঞ্চায়েতের বুড়োগুলোর লোভী মুখের দিকে চাইলেই বোঝা যায়। লোভ, যেন করৌঞ্জ তেলের মতন মুখ চুঁইয়ে পড়ছে ওদের।

হায় মেভ্রিসেরাই-এর দিন! হায় হরিয়ালির দিন! হায় হোলির রাত!

"চোলিকে পিছে ক্যা হ্যায়?"

হাম সবোঁকো মওত হ্যায়। মওত।

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। মূল্যবোধের মৃত্যু, আত্মসম্মানজ্ঞানের মৃত্যু, কর্তব্যজ্ঞানের মৃত্যু, ন্যায়-অন্যায় বোধের মৃত্যু এই সমস্ত মৃত্যুই আসবে দূরদর্শনের মাধ্যমে। ছড়িয়ে যাবে গ্রামে-জঙ্গলে, সমুদ্রতীরে, পাহাড়ে। কোনো মানুষই সুখ কাকে যে বলে, তা আর জানবে না। আনন্দকে জানবে না আরামকে জানবে। দু হাতের আঙুলে আরামকে অসতর্কতায় চুবিয়ে বড়া ভাজবে কিন্তু আনন্দ কোথায় বা কিসে, তা জানবে না। আদৌ জানবে না আর।

সরি ইন্দি। আমার উত্তেজনা ক্ষমা কোরো।

দেশকে ভালোবাসা বড়ো পাপ। দেশের মানুষকে ভালোবাসা আরও পাপ। ধুরন্ধর, স্বার্থতাড়িত, গদি-সর্বস্ব রাজনীতিকরা এই অভিভাবকহীন, মাতা-পিতাহীন, হতভাগ্য দেশকে যে কোন আঁধির মধ্যে, কোন নরকে টেনে নামাবেন, তা শুধুমাত্র তাঁরাই জানেন। সর্বশক্তিমান তাদের হাতে, নিশ্চেষ্ট আমরা, আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের ভাইবোনেদের ভবিষ্যৎ, আমাদের দাম্পত্যের ভবিষ্যৎ, আমাদের অনাগত সন্তানদের ভবিষ্যৎ সঁপে দিয়ে কী পরম নিশ্চিন্ত নির্লিপ্তিতে দিন কাটাচ্ছি। ভাবলেও অবাক লাগে।

আমরাও কি মানুষ? মানুষ হলে কি এই মুষ্টিমেয়দের জুলুম আমরা মেনে নিতাম? আমাদেরও কি মেরুদণ্ড বলে কিছু আছে?

জানি না।

ইতিহাস তার বিচার করবে।

কে জানে! হয়তো তুমি বেঁচে গেছ দেশ ছেড়ে গিয়ে। এই নির্লজ্জ নিশ্চেষ্টতার সাথি হতে হয়নি তোমাকে। হবেও না। কিন্তু দেশের মানুষ যদি বিদেশেও থাকে তবুও কি তাদের দায়িত্ব থাকে না একটুও দেশকে নিয়ে ভাববার?

জানি না। তোমার মতো এন. আর. আই-রাই বলতে পারবে তোমাদের বিবেকের কথা।

—দিগন্ত

পুনশ্চ—

দ্যাখো, তোমাকে আচানকমারের কথাই বলতে ভুলে গেলাম।

অচানকমার বাংলোটি কিন্তু লামণির মতো নয়। সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ হয় তার। রাস্তা থেকে অনেকখানি ভেতরে ঢুকোনো সেটি। বাংলোর হাতাটি এবং বাংলোটি ছোটো হলেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চারধারেই জঙ্গল। কাছাকাছি জনবসতি নেই। তবে বাংলোর পেছনেই চৌকিদারের ঘর। সেও সেখানে সপরিবারে থাকে কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় যে, অতিথিদের যত্নআত্তির কমতি হয় না এখানে।

ঘরের মধ্যে এখনও টানা-পাখা লাগানো আছে। বিহার বা ওড়িশার কোনো কোনো বন-বাংলোতেই কিছুদিন আগে পর্যন্তও যেমন ছিল। তোমার অ্যামেরিকান বন্ধু-বান্ধবদের বা ভারতীয় সাহেবদের এনে দেখাতে পারো ঊনবিংশ শতাব্দীর RELIC।

অচানকমারে থাকলে সত্যি সত্যিই মনে হবে কোনো বন-বাংলোতে আছে। বাংলোটি অনেকখানি ভিতরে বলে বড়ো রাস্তার বাস ট্রাকের শব্দকে ভ্রমরের গুঞ্জনের মতো শোনায়। বিরক্ত করে না কানকে। লামণির মতো হাজারো বিঘ্ন নেই সেখানে। একটি নদী, পাহাড়ি নালা, মাট্রিনালারই মতো ঘিরে রয়েছে অচানকমারকে, তার নামটিও খুব রোম্যান্টিক। নাম, মনিয়ারি কৈরাহা।

অচানকমার একসময়কার বিখ্যাত SHOOTING BLOCK ছিল। ইংরেজ আমলে নিয়মিত শিকার করতেন শিকারিরা। কিন্তু নিয়ম মেনে। SHOOTING SEASON সারা বছরই ছিল না। OPEN SEASON, CLOSED SEASON ছিল। তখন এই রাজ্যের নাম ছিল CENTRAL PROVINCES।

আমাদের ছেলেবেলাতে দেখেছি ইলিশমাছ বর্ষার শেষে থেকে খাওয়া বন্ধ করা হত তারপর আবার খাওয়া আরম্ভ হত সরস্বতী পুজোর দিনে। সকালবেলাতে জোড়া-ইলিশ আসত বাড়িতে, লাউ-ডগা দিয়ে হলুদ-কাঁচালংকা কালজিরের ঝোল হত পাতলা করে। কেউ আইন করেননি। মানুষ নিজেরাই নিজেদের কিছু কিছু সংযমের বাঁধনে বাঁধতেন তখন। জীবনের সব ক্ষেত্রেই লোভ এমন সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠেনি আজকের মতো।

ইংরেজ আমলে আইন ভাঙলে যে শাস্তি পেতে হবে এই ভয়টা ছিল শিক্ষিত অশিক্ষিত গরিব বড়োলোক সকলেরই মধ্যে কমবেশি। Administration-এর গোড়ার কথাই ছিল এই ভয়। লালপাগড়ি মাথায় লাঠি-হাতে ভুঁড়িওয়ালা একা পুলিশই AUTHORITY-এর প্রতিভূ ছিল। আজকের I.A.S ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বা জেলার পুলিশ সুপারেরও সেই AUTHORITY নেই যা সেদিনের সেই ভুঁড়িওয়ালা ভোজপুরি একক লালপাগড়ির ছিল। সকলেই জানত যে, ওই লোকটাই আইন। তাকে অমান্য করা মানেই ব্রিটিশ শাসককে অমান্য করা।

আইন-শৃঙ্খলাকে, সে অন্তর্জগতেরই হোক কী বহির্জগতের, আমরা নিজেরাই কবরে সমর্পিত করেছি আমাদের অবাক-করা সহজ নির্বুদ্ধিতায়। অন্যাকে দোষ দিয়ে কি লাভ?

ভাল থেকো

—ইতি

শুভার্থী

দিগন্ত

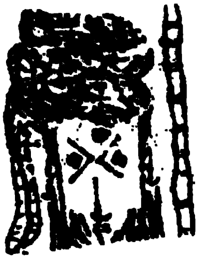

আট

যশপুর
কটক

শ্রদ্ধাভাজনেষু স্যার, ১৩/৩

বহুদিন আপনাকে চিঠি লেখা হয়নি।

বাইরে গেছিলাম। মধ্যপ্রদেশে। গত শনিবার ফিরেছি। আপনার শরীর এখন কেমন আছে? POST-OPERATIVE কোনোরকম অসুবিধে নেই তো?

জানিয়ে আশ্বস্ত করবেন।

ফিরে এসেই কলেজে একটা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং অপ্রিয় ঘটনার সাক্ষী হলাম। তার প্রতিবাদ করাতে আমাকে প্রায় একঘরে করে দেওয়া হয়েছে। অথচ অন্যায়ের প্রতিকার যদি না করতাম তাহলে আমার নিজের কাছেই নিজে মুখ দেখাতে পারতাম না। সেদিন থেকেই আত্মসমীক্ষা চালাচ্ছি। বড়ো অন্তর্দ্বন্দ্বে আছি। কী করব স্থির করে উঠতে পারছি না। এইরকম সংকটে বহুদিন পড়িনি।

ঘটনাটা কি তার আপনাকে জানাবার প্রয়োজন নেই। শুনলে আপনার মনের শান্তি ব্যাহত হবে। আজকে সারা দেশের অধিকাংশ অধ্যাপকদের নৈতিক মান এমনই এক জায়গাতে পৌঁছেছে যা আপনাদের সময়ে ভাবনারও অতীত ছিল।

আমি যদি আমার প্রতিবাদী-সত্তাকে মুখ-চাপা দিয়ে সহজ, নিরাপদ এবং বিঘ্নহীন ভবিষ্যতের উষ্ণতায় ফিরে যেতে চাই তো এই মুহূর্তেই পারি। যে মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রমী অধ্যাপকেরা আমার মনের কাছে থাকেন তাঁরা আমার হিতার্থেই আমাকে এই 'ভেড়াচাল'এ শামিল হতে বলছেন। কিন্তু আপনার কাছে যা শিখেছিলাম সেই শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা আমাকে অন্যায়টা মেনে নিতে বাধা দিচ্ছে।

কালকে আমার এক শুভার্থী CO-PROFFESSOR বীণা মহান্তি অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করছিল। বলছিল, সপ্তদশ শতাব্দীর FRENCH SOCIAL OBSERVER, ROCHFUKO (রোশফুকো) বলেছিলেন যে একা মহৎ হতে চাওয়ার মতন অসীম নির্বুদ্ধিতা আর নেই। বীণা, রোশফুকোর আরও একটি কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন "NEITHER THE SUN NOR DEATH CAN BE LOOKED AT STEADILY", এই প্রসঙ্গে বীণা সোফোক্লেসের বিখ্যাত নাটক 'আন্তিগোনে' নাটকের রাজা ক্রেয়নের দায়বদ্ধতার জটিলতার দিকে এই মানসিকভাবে দ্বিধাগ্রস্ত-আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিল যে, সংসারে "বিশুদ্ধ শত্রু" বা "বিশুদ্ধ মিত্র" বলতে কিছুই নেই। অন্যায়কারীর প্রতি অসূয়াতে আমি যদি একলা হয়ে যাই তবেও আমার তার প্রতি শত্রুতা বিশুদ্ধ হবে না।

আমি জানি না আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারলাম কি না।

কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আমার কি করণীয়, তা আপনি যদি একটু বলেন তাহলে অশেষ কৃতজ্ঞ থাকব।

আশাকরি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন।

বিনত
দিগন্ত

শ্রী প্রসূন ব্যানার্জি
বেণি ব্যানার্জি অ্যাভিন্যু
কলকাতা-৭০০০৩১

স্কটিশ অটাম লেন
ডার্নসটাউন

দিগন্ত,

জানি, তুমি নেই তোমার গুহাতে। তাই এক অন্য গুহাতে ঘুরে এলাম। লুরে'জ ক্যাভার্ন তার নাম।

অশোকদার চ্যালা-চামুণ্ডার অভাব নেই এখানে। তার মধ্যে অন্যতম বিশু ও পল্টন। বিশ্বজিৎ সেন এবং পল্টন সাহা। তারা দুজনে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ড্রাইভ করে গেছিল সেখানে। পল্টন বিবাহিত। তার সুন্দরী, সাহিত্যভক্ত এবং উজ্জ্বল স্ত্রীর নাম মিতালি। এখনও প্রলম্বিত হানিমুন চালাচ্ছে ওরা। আর বিশু বিয়ে করবে বলে মনস্থ করেছে কিন্তু কাকে করবে তা নিয়ে ভাবাভাবি চলছে।

ভেবে দেখছি এই আধুনিক কালে বিয়ের মতো ANCHORAGE-এ শামিল হতে হলে তারুণ্য উচ্ছ্বাস থাকতে থাকতেই হওয়া ভালো। তা না হলে, তোমার মতো অসমসাহসীর মনেও ভয় জাগে। এখন নিশ্চয়ই স্বীকার করতে লজ্জা পাও না যে পায়ে হেঁটে বাঘ মারার চেয়েও বেশি বয়সে বিয়ে করাটা অনেক বেশি সাহসের কাজ।

তুমি কি শেনানডোয়াহ ন্যাশনাল পার্ক-এর নাম শুনেছ? অবশ্য এসবই ইস্টকোস্ট-এ। WALDEN POOL-ও তাই। ডেভিড হেনরি থোরোর WALDEN POOL পড়ে ছেলেবেলাতে বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক'-এর সরস্বতী কুণ্ডেরই মতো এক চিত্রকল্প তৈরি হয়েছিল আমার মনে। WALDEN POOL দেখিনি এখনও। তবে দেখার ইচ্ছে আছে। BOSTON থেকে কাছেই।

শেনানডোয়াহ উপত্যকা আর ভার্জিনিয়া হাইল্যান্ডস এ অনেকেই বেড়াতে আসেন। ওয়াশিংটন থেকে একানব্বই কি.মি আর রিচমন্ড থেকে প্রায় ছশো কি.মি।

মাটির নিচে চৌষট্টি একক এলাকা জুড়ে অগণ্য সব গুহার মতো সৃষ্টি হয়েছে চার কোটি বছর ধরে। পৃথিবীর আস্তরণে যখন প্রথম চার কোটি বছর ধরে। পৃথিবীর আস্তরণে যখন প্রথম নড়াচড়া

ঘটেছে তখন ফাঁক-ফোকরও সৃষ্টি হয়েছে তাতে আর সেই ফাঁক-ফোকর দিয়ে জল ঢুকে তাদের আরও বিস্তৃত করেছে। চারকোটি বছর ধরে ভূগর্ভে কত প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠ আর তাতে গত গড়নের সব স্ট্যালাকটাইট আর স্ট্যালাগমাইটের FORMATIONS হয়েছে, যে কী বলব! আলো পড়লে, রামধনু রঙ ঝলসে ওঠে সে সব থেকে। স্ট্যালাকটাইটের নানা বিমূর্ত FORMATION গুহাগাত্রের ওপর থেকে ঝুলছে আর স্ট্যালাগমাইটের নানা বিমূর্ত FORMATION জমি থেকে উঠেছে। তোমার মুখে, বাঘ্রমুণ্ডাতে শোনা সুন্দরবনের MANGROVE FORESTS-এর ক্যাওড়া গাছেদের শুলোদের মতোই AERIAL ROOTS যেন।

একঘণ্টার ট্যুওএ নিয়ে যায় ভিতরে এরা। এক ঘণ্টা হেঁটে হেঁটে যেতে হয় এ গুহা থেকে সে গুহাতে—সবই INTER-CONNECTED. মাঝামাঝি জায়গাতে ELECTONICALLY OPERATED একটা স্ট্যালাকটাইট অর্গ্যান আছে। তার উপরে রাবার মোড়া লোহার দণ্ড। স্ট্যালাকটাইটের ওপরে ছন্দ লয় তাল বজায় রেখে সেই দণ্ডগুলো আঘাত করে আর স্ট্যালাকটাইট অর্গান বেজে ওঠে। চৌষট্টি একর এলাকায় ধ্বনিতে-প্রতিধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে অগণন গুহা।

এই অর্গানে যে COMPOSITIONটি বাজে তার নাম "শেনানডোহা" উপরের ন্যাশনাল পার্কের নামে। সেই গুহার অভ্যন্তরের আধিভৌতিক বাজনা শোনার অভিজ্ঞতা এক বিশেষ অভিজ্ঞতা অবশ্যই।

এই "লুরে'জ ক্যাভার্নস"-এর চারপাশ ঘিরে নানারকম এন্টারটেইনমেন্ট সেন্টার গড়ে উঠেছে। লুরে সম্ভবত জায়গার নাম নয়। যে কৃষকের জমির নিচে এই গুহগুলি অবস্থিত রয়েছে তারই নাম সম্ভবত লুরে।

আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে হঠাৎই এটি আবিষ্কৃত হয়। শুনেছি এই লুরে পরিবার নাকি ট্যুওরিস্টদের পয়সাতে এখন ট্রিলিয়নিয়র। বছরের প্রত্যেক দিনই খোলা থাকে এই লুরে ক্যাভার্নস।

অ্যামেরিকানদের অনেকই গুণ কিন্তু ওরা বড়ো বহির্মুখী। ছুটির দিনে সাধারণত সিটিংরুমে বসে সারাদিন গান শুনি, ভালো বই পড়ি, বেছে নিয়ে একটি বা দুটি ভালো ছবি দেখি টিভির কোনো চ্যানেলে। কখনওই আমি সিরিয়ালস দেখি না। BOLD AND THE BEAUTIFUL এখন সারা পৃথিবীতে এক ব্যামো হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাকে ভাগ্যিস তেমন কোনো ব্যামোতে পায়নি। যে-কোনো নেশাকেই ধরলে ছাড়া ভারি মুশকিল। পৌনঃপুনিকতাতে সেই নেশা দীপ্তি পায়, তখন তাকে ছাড়া ভারি মুশকিল। তাই ধরার আগে বিবেচনা করা উচিত। টি.ভি. সিরিয়ালস, সিগারেট, পান-জরদা বা মদ্যপানের চেয়ে কোনো অংশেই কম বিপজ্জনক নেশা নয়।

তুমি কী বলো?

আমার তো ইচ্ছে করে সব অ্যামেরিকানদেরই ধরে ধরে অন্তর্মুখী করে দিই। বলি—

"পুরানো ঘরে দুয়ার দিয়া ছেঁড়া আসন মেলি বসিবি নিরালায়, বাহির পথে বিবাগী হিয়া কিসের খোঁজে গেলি আয়, আয় রে ফিরে আয়।"

কিন্তু ভবি কি ভোলে। ওদের ফিজিক্যাল ফিটনেস, হেলথ-কনসাসনেস, অসুখ-ফোবিয়া আর এই সব শস্তা শিশুসুলভ আমোদপ্রিয়তা এমনই ভর করেছে যে, জাতটা যে কোনোদিনও প্রাপ্তমনস্ক হয়ে উঠবে আমার তো তেমন মনেই হয় না। এই দুর্দৈবের হাত থেকে এরা মুক্ত না হতে পারলে এদের সব প্রাপ্তিই অচিরে অপ্রাপ্তিতেই পর্যবসিত হবে। এটা নিশ্চিত জানি বলেই এ দেশে চিরদিন থাকব না আমি। থাকলে, আমার দেশের দেশবাসীর মানসিকতাতে যা-কিছুই গড়ে তুলেছি শিশুকাল থেকে তার সবই বিসর্জন দিতে হবে। আর তাই যদি হয়, তবে সেই বাঁচা, সেই পরম সুখের বড়োলোকির জীবন হবে মৃত্যুরও অধম।

তুমি কবে মধ্যপ্রদেশ থেকে ফিরবে আর কবে আমার জ্ঞাতব্য যা সব জানিয়ে চিঠি লিখবে?

টুটু যে আমাকে ছিঁড়ে ফেলল।

ভালো থেকো।

ইতি দিগন্তলীনা
তোমার ইন্দিঠাকরুন

বেণি ব্যানার্জি অ্যাভিনু্য
কলকাতা-৭০০ ০৩১

স্নেহের দিগন্ত,

তোমার চিঠি পেয়েছি পরশু।

পাওয়ার পর থেকে মনে মনে বেশ আলোড়িত আছি। তোমার মতো ছাত্র আমার দু-একজনও আছে বলে নিজের সম্বন্ধে একধরনের শ্লাঘাও জন্মেছে। যাই হোক, জীবন আমার বিফলে যায়নি।

তোমার সিদ্ধান্তই ঠিক। জীবনে গড্ডলিকার একজন হয়ো না। কখনওই নয়। তারা ভেড়ারই মতো জন্মায় এবং .ভড়ারই মতো মরে। এই পৃথিবীর মনুষ্যপ্রজাতিতে বিন্দুমাত্র অবদান নেই তাদের। তাদের কেউই মনে রাখবে না। আর মানুষ হিসেবে এই পৃথিবীতে এসে যদি অন্যের মনে থাকার মতো কিছুমাত্রই না করে যেতে পারলে, তাহলে মানুষ হয়ে জন্মালে কেন?

রোশফুকোর লেখা এবং সোফোক্লেসের নাটক আন্তিগোনে আমি পড়েছি। ওই নাটকটি কলকাতার একটি নাট্যগোষ্ঠী মঞ্চস্থও করে। রুদ্রপ্রসাদ ও স্বাতীলেখা সেনগুপ্তেরা। সে নাটক আমার এক তরুণ ছাত্র আমাকে দেখাতেও নিয়ে গেছিল একবার। নাটক এখন এক অন্য শিল্পের পর্যায়ে নিজেকে উন্নীত করেছে এবং যেহেতু সেই শিল্প সম্বন্ধে আমি অজ্ঞ, নাটকটি সম্বন্ধে আমার মতামত দেওয়াটা বাতুলতা। কিন্তু আমার একটি কথা মনে হয়েছে নাটকটি দেখে। তা হচ্ছে, তার মধ্যে সোফোক্লেসের আন্তিগোনে অনুপস্থিত। দোষটা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নয়, নাট্যকারের। তিনি সোফোক্লেসের বক্তব্যই হয় ধরতে পারেননি, নয় জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য ইচ্ছে করে সোফোক্লেস থেকে সরে এসেছেন।

যাই হোক, যে কথা বলার জন্যে বসেছি তা এবারে বলি।

তোমার সহ-অধ্যাপিকা বীণার সঙ্গে আমি একমত নই। তোমার বিশ্বাসের পথে, CONVICTION-এর পথে যদি বাধাই না আসল তো কোন আগুনে তুমি ইস্পাত করে গড়ে তুলবে নিজেকে?

সতেরশো শতাব্দীর ফরাসি সমাজতাত্ত্বিক রোশফুকো যা বলেছিলেন, সোফোক্লেস তাঁর আন্তিগোনেতে যা বলেছিলেন, সে সবের নজির এখানে টেনে আনা, আমার মতে বাতুলতা। তখনকার সমাজব্যবস্থা বা রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে আজকলের পৃথিবীর এবং বিশেষ করে আমাদের দেশের কোনোই মিল নেই। এখন এখানে যাবতীয় মহৎ কর্ম সব একা একাই করতে হবে কারণ দল মানেই অসততা, মতলববাজি, মিডিয়ার বশংবদ হওয়া। আজকের দলবদ্ধ বুদ্ধিজীবীদের কাছে

আমার বিন্দুমাত্র প্রত্যাশার নেই। তারা তাদের প্রাইজ, মান ও যশের সাধনাতেই বুঁদ হয়ে থাকেন। তোমাকে দলছুট হয়ে, ব্যতিক্রমী হয়ে নিজের কাজ করতে হবে।

MY SON, YOU MUST HAVE THE COURAGE OF YOUR CONVICTION.

যে-বুদ্ধিজীবী ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি নেই, তা দ্বারা যিনি চালিত হন না, দলের বুদ্ধিই যূথবদ্ধ জানোয়ারের বুদ্ধিরই মতো যাঁকে চালিত করে, তাঁর নিজস্বতা বলতে কিছুমাত্রই অবশিষ্ট থাকে না। তাই দেশের কাছে, সমাজের কাছে তাঁদের অস্তিত্ব একেবারেই মূল্যহীন।

প্রয়োজনে একলাই চলতে হবে। যা ন্যায় বলে জানবে, যা সত্য বলে জানবে তা থেকে একচুলও নড়বে না। এই আমার মত।

উপদেশ আমি কারোকেই কোনোদিনও দিইনি। মত প্রকাশ করেছি মাত্র। তোমাদের ইচ্ছে হয়েছে বলে তোমাদের কেউ কেউ তা নিয়েছ। অনেকে নেয়ওনি। সকলকেই যে আমার মতকে গ্রাহ্য করতেই হবে একথাও আমি কখনই বলিনি।

এর পর তোমার যা করণীয় তা তুমিই স্থির করবে।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

ইতি ভবদীয়
তোমাদের P.B

শ্রীদিগন্ত বোস
তেঁতরাপাড়া
কটক

কর্নফিল্ড
কলকাতা-৭০০ ০১৯
কৃষ্ণাতৃতীয়া, ফাল্গুন

দিগন্ত,

আপনার বন্ধু চিরন্তন আপনাকে বেশ কিছুদিন আগে একটা চিঠি দিয়েছিল, আমি আপনার ওখানে কদিন গিয়ে থাকব এ কথা জানিয়ে দিয়েছিল কিনা জানি না, তবে সে বলেছিল যে, দিয়েছিল।

এতদিন হয়ে গেল অথচ আপনার কাছ থেকে সে অথবা আমি এই বিষয়ে কোনো উত্তর পাইনি। কলকাতাতে যখন আপনাদের শ্রদ্ধেয় পি.বি-র সত্তর বছরেরর জন্মদিনে আপনারা জমায়েত হয়েছিলেন তখনও একটি ফোনও করেননি আমাকে। অবাক হয়েছি আপনার আশ্চর্য শীতল ব্যবহারে।

যাই হোক, ভেবেছিলাম যে দোলের আগে আপনার কাছে যাব এবং দোল কাটিয়ে ফিরব। দোলও চলে গেল। এখন কি দুর্গোৎসবের জন্যে অপেক্ষা করব?

আপনাদের "কুচো চিংড়ির" বন্ধু তো অনেকই আছেন। কিন্তু আপনার মতো বন্ধু বেশি নেই। বেশি কেন, নেই-ই। আপনি ছাড়া আর সকলেই গৃহী, বৌ, ছেলেমেয়ে, গাড়ি, চাকরি, উন্নতি ইত্যাদি নিয়ে এমনই ল্যাজে-গোবরে হয়ে থাকে সবসময়ে যে, তাদের মধ্যে রোমান্টিকতা একটুও বেঁচে নেই আর। তারা আর পুরুষ মানুষ নেই। নিছক দু পেয়ে একধরনের প্রাণী হয়ে গেছে, কেরিয়ার-সর্বস্ব, অনুকরণপ্রিয়, প্রোটোটাইপ, ঘোরতর সংসারী। তাদের স্ত্রীদের ভূমিকাও এই ব্যাপারে কিছু পিছিয়ে-পড়া নয়। তাঁরাও ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন এবং চাহিদা-সংকুল সতত জাগতিক উন্নতি-প্রার্থী জীবনে শামিল হয়েছেন এবং তাঁদের স্বামীদেরও শামিল করেছেন।

এই পরিবেশে এই প্রতিবেশএ বড়ো দমবন্ধ দমবন্ধ লাগে। আপনার বন্ধু তো তার পাড়ার ক্লাব, তার স্কুলের ওল্ড বয়েজ অ্যাসোসিয়েশনের নানা অনুষ্ঠান, তাদের ঘন ঘন রি-ইউনিয়ন নিয়ে এমনই ব্যস্ত যে, তার আমাকে দেবার মতো সময়ই নেই। যখন তার সে সময় হবে তখন হয়তো আমার নেওয়ার মতো মন আর থাকবে না।

যাই হোক, আপনার কাছে বেড়াতে যাওয়ার মন আর আমার নেই। আপনার উপরে খুব অভিমান যে হয়েছে এই কথা জানাবার জন্যেই এ চিঠি।

অভিমান করতে পারি এমন সম্পর্কও আমার জীবনে খুব বেশি নেই। এই পৃথিবীতে, হয়তো কম মানুষের জীবনেই থাকে। 'অভিমান' শব্দটাই সম্ভবত এই CRUDE, MATTER OF FACT এবং UTTERLY MATERIALISTIC পৃথিবীতে অর্থহীন হয়ে গেছে। তামাদি হয়ে গেছে চিরদিনের মতো।

আপনার সঙ্গে আমরা যে শিমুলতলাতে গেছিলাম একবার পুজোর সময়ে সেই স্মৃতি এখনও জ্বালায় আমাকে। এবং স্নিগ্ধও করে। মনে আছে, লাট্টুপাহাড়ের কাছ থেকে শুক্লা ত্রয়োদশীর রাতে ফিরে আসছিলাম আমরা তিনজনে। চারদিকে, উপরে নিচে ছমছম করছিল জ্যোৎস্না। আপনার ডান হাত ছিল আমার হাতে আর বাঁ হাত ছিল আপনার বন্ধুর হাতে। মাঝে মাঝেই আমার সেই রাতের কথা মনে হয়।

শিশুকাল থেকে পুরুষ দেখেছি অনেক। তাদের কারো মধ্যে দেখেছি অপত্য, যেমন আমার বাবা ও কাকার মধ্যে, পাড়ার ভন্তু কাকার মধ্যে। শৈশব ও কৈশোরের প্রথম দিকে সখ্য কাকে বলে তার স্বাদ জেনেছিলাম। কিন্তু আর একটু বড়ো না হতেই সব পুরুষের চেহারাই এক হয়ে গেল। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে সম্ভবত অতি অল্পসংখ্যক পুরুষই নারীদের সঙ্গে সখ্যে বিশ্বাস করেন। নারীকে তাঁরা সকলেই শুধু একই চোখে দেখেন, একচক্ষু হরিণেরই মতো। ফলে একজন নারী ও পুরুষের মধ্যে যে হাজারো রকম সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারত সে সম্বন্ধে তাঁদের কোনোরকম ধারণাই গড়ে ওঠার সময় পায় না। শিক্ষিত পুরুষ মানুষেরাও জানোয়ারের মতো ব্যবহার করেন। তাই দেখে, শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য যে কি তা নিয়ে ধন্দে পড়তে হয়।

এত কথা বললাম এই জন্যে যে, আপনাকে সখা হিসেবে পেয়েছিলাম খুব কাছ থেকে, মাত্র চারটি দিনের জন্যে। অত অল্পদিনের জন্যে পেয়েছিলাম বলেই হয়তো বেশি করে মনে আছে শিমুলতলার দিনগুলিকে। এই থোড়বড়িখাড়া, খাড়াবড়িথোড়-এর জীবনে আবার কি সেই স্নিগ্ধতা স্বল্পদিনের জন্যে ফিরিয়ে আনা যায় না?

জানি না, নিজেকে পুরোপুরি মেলতে পারলাম কি না। যতটুকু আমি অপ্রস্ফুটিত রইলাম সেইটুকুকে ফুটিয়ে নেবার ভার আপনার উপরেই রইল। ফোটা ফুলে তো সকলের ডালিই সহজে ভরে। কুঁড়িকে যিনি ফোটাতে পারেন পরিপূর্ণ ভাবে, তিনিই তো প্রকৃত পুরুষ।

এই চিঠির উত্তর দিলে আপনি যে এখনও শতকরা একশো ভাগ অভদ্র হয়ে যাননি, তা জেনে আশ্বস্ত হব।

আপনার সখীর ভালোবাসা জানবেন।

ইতি—ভ্রমর

শ্রীদিগন্ত বোস
তেঁতরাপাড়া, যশপুর, কটক

নয়

যশপুর
কটক
ওড়িশা

ভ্রমর,
আমার দূরের সাথি,

তোমাকে তুমি বলি,

সখা হয়েও সখীকে আপনি সম্বোধন করার মধ্যে এক ধরনের কৃত্রিমতা আছে। হয়তো হীনম্মন্যতাও। নেই কি? তাই, তুমি।

তুমি বড়ো সুন্দর চিঠি লেখো ভ্রমর। তোমার স্বামী চিরন্তন যেমন সুন্দর বাজারের হিসেব লেখে।

তা বলে ভুলেও ভেবো না যে বাজারের হিসেবটা সাহিত্যের মধ্যে গণ্য নয়। চিরন্তন, মানে আমাদের কুচোচিংড়ি একবার কলেজের পিকনিকের বাজারে ফর্দ করতে বসে সবশেষে লিখেছিল, "শরীর মেরামতি খাতে" তিনশো টাকা।

কিছু কি বুঝলে সখী?

পল সায়ান্সের প্রফেসর কৈফিয়ত চাওয়াতে তাঁকে সে বলেছিল, আমাদের কজনের ওপরে যাবৎ দায়িত্ব পড়েছে স্যার। বাজার করা, টেম্পো ভাড়া করা সেই ডাঁই-করা বাজারে বরানগরের গুপ্ বাঁড়ুজ্যের বাগানবাড়িতে নিয়ে যাওয়া, পাচক ঠাকুর আর তস্য জোগানদারদের সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা, এইসব কমপ্লিকেটেড এবং ডিফিকাল্ট ক্রিয়াকাণ্ড করতে কী কম ঝকমারি স্যার? তাই আমাদের বিয়ার এবং সিগারেট এবং পাচক ও তার জোগানদারদের অহিফেন ও বিড়ির খরচ বাবদ এই ফি ধার্য করেছি। এটা বাজেট প্রোপোজাল। আপনি কাট-ছাঁট করে পাস করতে চাইলে সে অধিকার আপনার অবশ্যই আছে, স্যার, কিন্তু অন্যেরা শুধু বিশল্যকরণী পাবে আর আমরা চারজন হেঁইও হেঁইও গন্ধমাদন বইব এইটে তো এই সমাজতন্ত্রে ঈপ্সিত নয়। এখন আপনি যা ভালো মনে করবেন তাই করবেন স্যার। তাই করবেন।

বুঝতেই পারো, স্যার বলেছিলেন, বিয়র লুকিয়ে নিয়ো। নইলে আমার চাকরিটিই যাবে। পারমিশান দিলাম এই জন্যেই যে, বিয়র মদের মধ্যে গণ্য নয়, যেমন তোমরা চারজন মেধাবীদের মধ্যে গণ্য নও। "সিক্রেসি ক্লজ" ভায়োলেট করলে তোমাদের শাস্তি পেতে হবে।

জানো ভ্রমর, চিরন্তনের কিছু দোষ আছে, যা আমার নেই। ওর আবার অনেক গুণও আছে যা আমার নেই। আমরা কেউই স্বয়ংসম্পূর্ণ নই। সৃষ্টিকর্তা অত্যন্ত বুদ্ধিমান। সৃষ্ট জীবের স্বয়ংসম্পূর্ণতা, সৃষ্টির জয়যাত্রার পরিপন্থী। পুরুষের যা নেই তা নারীর আছে। আবার নারীর যা অভাব তা পুরুষকে দিয়ে তাকে নারীর কাছে বরণীয় করেছেন সৃষ্টিকর্তা। হাতির পেখম নেই, ময়ূরের শুঁড় নেই বলেই পৃথিবী এত ইন্টারেস্টিং। ভ্রমরের দিগন্ত নেই, চিরন্তনের ভ্রমর আছে বলেও পৃথিবী এত ইন্টারেস্টিং। তবে যখন গড়তে বসেছিলেন, সামনে ক্ষিতি, মরুৎ, ব্যোম, অপ, তেজ সবকিছুর ভাণ্ড নিয়ে, তখন আমাদের সাধারণের তুলনাতে তাকে অত নিপুণ করে গড়তেন না। গড়লেন তো বটেই, তারপর নিজে হাতে তার চুল গজিয়ে, সেই চুল নিজে হাতে পাটপাট করে আঁচড়ে পর্যন্ত দিলেন। তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবে যে, চিরন্তনের কখনোই চিরুনির প্রয়োজন হয়নি। চান করে উঠলেও ঘন কালো চুল যেমন পাটপাটই থাকে, তোমাকে বড়ো আদর করার পরে রাতভর ঘুমিয়ে ওঠার পরও থাকে কি ঠিক তেমনই।

তুমিই বলো, এ কী বিধাতার পক্ষপাতিত্ব নয়?

শিমুলতলার কথা মনে পড়িয়ে দিয়ে তুমি আমার মনকে বড়ো বিধুর করে দিলে। বাংলা ভাষার ওই "বিধুর" শব্দটির মতো রোমান্টিক শব্দ সম্ভবত আর বেশি নেই। দুঃখের মধ্যেও যে সুখ এমন বিরাট হয়ে বিরাজ করতে পারে তার মস্ত প্রমাণ ওই শব্দটি।

ভ্রমর! তুমি কি মনে করেছিলে শিমুলতলার স্মৃতি তোমাকেই শুধু বিবশ বিধুর করে? আমাকেও কি করে না?

আমি যদি গান গাইতে পারতাম, তবে গাইতাম "গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে মধুপ হোথা যাসনে, ফুলের মধু লুটিয়ে গিয়ে কাঁটার ঘা খাসনে"। অথচ মধুপ আর ভ্রমর সমার্থক। নামে ভ্রমর হলেও তুমি আসলে ভ্রমর নও। আমিই ভ্রমর।

চাঁদ পৃথিবীর সব মহাদেশের সব প্রত্যন্ত প্রদেশেই ওঠে, ঝুরুঝুরু চৈতি বাতাস বয়, গন্ধ ছোটে কিন্তু আমাদের মনে তা কোনো বিশেষ প্রভাবই ফেলে না। অথচ যখন ভ্রমর থাকে অন্য ভ্রমরের কাছে সেই চাঁদের রাতে, যখন হাওয়াতে নানা ফুলের, পাতার, গাছের গায়ের মিশ্র গন্ধ কারো আদরের গোল্ডেন রিট্রিভার কুকুরেরই মতো পায়ে পায়ে হেঁটেও আগুপিছু করে, যখন ছোটাছুটি করে ভ্রমরের বৈকালিক চানের পরের গায়ের গন্ধর সঙ্গে, তখন সেই ক্ষণটি স্মৃতির ফ্রেমে চিরদিনের জন্যে বাঁধা পড়ে যায় অনড় অম্লান হয়ে।

জানো ভ্রমর, আমি যখন ছোটো ছিলাম, একবার পুরীতে গিয়ে নির্জন সৈকতের একটি ফোটো তুলেছিলাম। ডেভেলপ করার পরে নিজেই নিজের তোলা ছবি দেখে মোহিত হয়ে গেছিলাম। বাবাকে দেখাতেই, বাবা বললেন, বাঃ। তারপরেই বললেন দারুণ হয়েছে কিন্তু পারফেক্ট হয়নি। অসম্পূর্ণতাও একধরনের ত্রুটি।

বুঝতে না পেরে বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন অসম্পূর্ণ?

বাবা বলেছিলেন, প্রকৃতি নিজেতে নিজে সম্পূর্ণ নিশ্চয়ই। কারণ, প্রকৃতি আমাদের প্রত্যেকেরই মা। অন্য মা। কিন্তু কোনো প্রাণ ছাড়া প্রকৃতি সদাই অসম্পূর্ণ। তোর এই ছবিতে যদি বালুবেলাতে একটি নুলিয়া থাকত, বা কোনো ঝিনুক-কুড়োনো শিশু, নিদেনপক্ষে বালুবেলার অগণ্য গর্ত থেকে উঠে খুদে খুদে পায়ে দ্রুত ছুটে যাওয়া কাঁকড়ারাও, তবেও এই অসম্পূর্ণতার অসঙ্গতি হয়তো কেটে যেত।

আমি চুপ করে ছিলাম। বাবার কথার তাৎপর্য বোঝবার চেষ্টা করছিলাম।

পরবর্তী জীবনে বড়ো হবার পর জেনেছিলাম বাবার ওই মন্তব্যের গভীরতা। যেমন, প্রকৃতিও সম্পূর্ণতা পায় না তারই সৃষ্ট কোনো প্রাণ ছাড়া, সফলতম পুরুষ অথবা নারীও সম্পূর্ণতা পায় না বিপরীত লিঙ্গের এক বা একাধিক মানুষের ভালোবাসা, উষ্ণতা, অথবা সাহচর্য ছাড়া। একজন

মানুষী বা মানুষ সবকিছুই করতে পারে কিন্তু রুম-হিটার বা ইলেকট্রিক-কম্বল দিয়ে সে তার প্রার্থিত উষ্ণতা কোনোদিনই পেতে পারে না। আমার তোমার সকলেরই বাঁচা, শুধু "একটু উষ্ণতারই জন্যে"।

কুঁড়ি, তুমি কুঁড়িই থেকো। যখন তুমি আসবে তখন তোমাকে আমি নিঃশব্দে কিন্তু মহাসমারোহে ফুটিয়ে তুলব। কুঁড়িকে যদি পূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুলই না করে তুলতে পারলাম তাহলে আমি কেমন করেই বা নিজেকে পুরুষ বলব।

এক ফুলে অনেকই ভ্রমর উড়ে এসে বসে। তাতে, না ফুল অপবিত্র হয়, না ভ্রমর। তবে ফুলে কি করে বসতে হয়, কি করে মধু খেয়ে যথাসময়ে নিজের সম্মান নিয়ে এবং অন্যকে সম্মান জানিয়ে উড়ে যেতে হয় ফুল ছেড়ে, সেই "আর্ট" ফুল এবং ভ্রমর দুজনেরই করায়ত্ত হওয়া চাই।

সংসারে যত গোল সবই বাধে মালিকানা নিয়ে, স্বত্ব নিয়ে। জমি বা ফুল বা নারী বা ভ্রমরও যে, কোনো মানুষের সৃষ্টি নয়, বিধাতারই দান, এই সহজ সত্যটি বুঝতে শিখিনি বলেই আমরা মূর্খ মানুষেরা জীবনে আনন্দ না করে নিজেদের মিথ্যা অহং ও নিজেদের অহংকার নিয়ে মারামারি করে এই ছোট্ট জীবনটা অজানিতে এবং পরম সাধারণ্যে শেষ করে মিলিয়ে যাই।

সখী ভ্রমর, তোমার সুন্দর ফুলগন্ধী চিঠির উত্তরে অনেক বড়ো বড়ো ভারী ভারী কথা বলে ফেললাম। মার্জনা কোরো।

আমি তোমার অপেক্ষাতে বসেই আছি সেই শিমুলতলার দিন থেকে। মনে আছে তোমার? তোমাকে আর কুচোচিংড়িকে যেদিন ট্রেনে তুলে দিলাম সেই রাতের কথা? তুমি ট্রেনের কামরার খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালে আমার দিকে। তোমার হাতে হাত রেখে ট্রেন ছাড়ার পরেও কিছুটা হেঁটে এলাম প্ল্যাটফর্মে। একবার সত্যিই মনে হয়েছিল হ্যাঁচকা টানে নামিয়ে নিই তোমাকে। নামিয়ে নেবার পরে গোলাপ বাগানের আর উ্যক্যালিপ্টাসের গন্ধের মধ্যে তোমাকে খুঁড়ে খুঁড়ে দেখি। ভেবেছিলাম, যেন তুমি জলদস্যুদের পুঁতে রাখা গুপ্তধন-ভরা কোনো পাতকুয়ো।

কিন্তু হয়নি। ট্রেনটা চলে গেছিল। গতি ক্রমশ দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়েছিল। জানালাতে কত মুখ, সার সার, নারী, পুরুষ, শিশুর। তারপর আর চেনা গেল না। তোমার বর তার বউকে নিয়ে চলে গেল কলকাতাতে, বউয়ের প্রেমিককে প্ল্যাটফর্মে দাঁড় করিয়ে রেখে। যেমন করে, যুগের পর যুগ নব-বিবাহিত এমনকী প্রাচীন-বিবাহিত বরেররাও তাদের নিয়ে চলে গেছে নিছক সামাজিক অধিকারের বশেই।

বর মাত্রই বর্বর। আমার অন্তত তাই মনে হয়।

ইতি—

তোমার
ছুটির বাঁশি

পুনশ্চ :

মাঝে মাঝে মনে হয়, ঋষি উদ্দালকদের দিনগুলোই ভালো ছিল। শ্বেতকেতু এদেশীয় মানবসমাজে বিবাহপ্রথা প্রথম চালু করে, এক পুরুষ এক নারীর জন্যে এক নির্বিকার অভ্যেসের চিরমান্য গারদ সৃষ্টি না করলেও হয়তো পারতেন। তাঁকে কোন পোকাতে তাঁর দেহশরীরের কোন জায়গাতে কামড়েছিল তা জানি না। পৃথিবীতে করবার মতো কত ভালো ভালো তাক-লাগানো কাজ ছিল। সাহারা মরুভূমি একা একাই পেরুতে পারতেন তিনি উটবিহীন। মাউন্ট এভারেস্ট চড়তে পারতেন অক্সিজেন সিলিন্ডার ছাড়াই। প্রশান্ত মহাসাগরের এপার থেকে ওপারে সাগরকে দুপায়ে লাথি মেরে মেরে ব্রেস্ট-স্ট্রোকে সাঁতরে গিয়ে সেই মহাসাগরের পুরোনো প্রশান্তি চিরদিনের জন্যে ঘোচোতে পারতেন। কিন্তু সেই সবের কিছুই না করে সমগ্র মানবজাতির এমন সর্বনাশ করতে তাকে কে যে মাথার দিব্যি দিয়েছিল তা ঈশ্বরই জানেন।

—দি

ভ্রমর
কর্নফিল্ড রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৯

আমার ছুটির বাঁশি,

তোমার চিঠি পেয়ে তোমার ওপরে যত অভিমান জমেছিল সব যেন জল হয়ে গেল। তোমাকে ধন্যবাদ।

আমাদের এই 'আপনি' ও 'তুমি' সম্বোধনের মধ্যে প্রকৃত কি তফাত বলতে পারো? তুমি যে "আপনির" অলকা-পলকা ভেরেণ্ডার বেড়া ভেঙে আমার মনের হলুদ সরষেখেতে অবলীলাতে ঢুকে পড়তে পেরেছ এতে তোমার ওপরে শ্রদ্ধা আমার আরও অনেক বেড়ে গেল।

ইংরেজিতেও 'আপনি' 'তুমি'র বেড়া নেই। ওদের শুধুই YOU। বাবাও YOU, ছেলেও YOU, শাশুড়িও YOU আর অপরিচিতও YOU। আমার মনে হল আমাদের সমাজে জাতপাত উচ্চনীচ-এর যে প্রভেদ ছিল, মানুষের গড়া হাজারো ব্যবধান, তার জন্যেই একজন মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের এমন মনগড়া ফারাড় গড়ে তোলা হয়েছে। "তুমি", "আপনিই" শুধু নয়, আমাদের "তুই" ও আছে। স্ত্রী স্বামীকে আপনি সম্বোধন করবে, কাজের লোক মনিবকে, কিন্তু স্বামী স্ত্রীকে "তুমি" বলবে এবং কাজের লোককে "তুই"। এই রীতি কিন্তু সংস্কৃত ভাষাভাষী এবং যে সব ভাষা সংস্কৃত নির্ভর বা বহুলাংশে তৎসম সেইসব ভাষাভাষীদের মধ্যেই প্রচলিত। উত্তর ভারতের অধিকাংশ রাজ্যেই যেমন পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদিতে স্বামী স্ত্রী দুজনেই দুজনকে আপনি সম্বোধন করছেন এমন শুনেছি।

এই "আপনি", "তুমি" "তুই" এর গা-জোয়ারি ব্যবধান যত তাড়াতাড়ি ঘুচে যায় ততই মঙ্গল। যাব না বলেছিলাম, এখন সেকথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। তবে কখন যাব তা তোমার উপরে নির্ভর করছে। আমাকে অন্তত এক পক্ষকালের নোটিশ দিয়ো।

যদিও ছেলেমেয়ের ঝামেলা আমার নেই তবু একজন অবুঝ স্বামীর ঝামেলাই যথেষ্ট। ছেলেমেয়েকে দেখতে হলে আপনার, থুড়ি তোমার, কুচোচিংড়ির অবস্থা যে কী ল্যাজে-গোবরে হত তা অনুমান করেই আতঙ্কিত হই।

সন্তান না এলে স্বামী-স্ত্রী মধ্যে সম্পর্কটা যেন দ্বিরাগমনের সম্পর্কেই আটকে থাকে। এমন সম্পর্কে ভালোবাসা হয়তো বেশি থাকে (থাকে কি?) কিন্তু সেই ভালোবাসা কাঁচা কামরাঙার মতোই ঝাঁঝালো, পাকা আমের মতো পূর্ণ সুগন্ধ ও স্বাদ হয়তো তাতে নেই। জানি না, নিজের জীবনে কাঁচা কামরাঙার দিনগুলি নিয়েই সুখী থাকতে হল, তাই বন্ধু-বান্ধব পাড়াপড়শিদের পূর্ণ ও সুগন্ধি আমের জীবন আমার জীবনের প্রেক্ষিতে তুলনা করে দেখতে আর পারলাম না।

তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার বলেন, বেশ আছো ভাই। Eternal Honey Moon! ঝাড়া হাত-পা। ছেলেমেয়ে হলে "নিজস্ব জীবন" বলতে আর কিছুই থাকে না। তাদের চিন্তা করতে করতেই নিজেদের জীবনের বেলা পড়ে আসত।

জানি না, কথাটা হয়তো ঠিক। হয়তো ঠিক নয়ও। চোখের সামনে এমন অনেক "কৃতী" ছেলেমেয়ের বাবা-মাকেও যখন না-খেয়ে এবং বিনা-চিকিৎসায় মরে যেতে দেখি তখন মনে হয় তাঁদের এই উষ্মা ও পরিতাপ বোধহয় পুরোপুরি অসত্য নয়।

যাক ওসব কথা। শোনো আমার ছুটির বাঁশি, আমাকে হয় পাগল-করা পূর্ণিমাতে ডেকো, নয় ঘোর অমাবস্যাতে।

কারও বুকের মধ্যে থেকেও তাকে দেখতে না পাওয়াটাও কি কম বড়ো সুখ? তুমিই বলো।

অন্ধ শ্রাবণেও ডাকতে পারো। অথবা তীব্র মধ্যমের পুলক-লাগা বসন্তে যখন চোখ গেল পাখিরা আমার চোখ খেয়ে আমাকে নির্লজ্জ করবে। যখনই ডেকো, ভেবেচিন্তে ডেকো। নামে ভ্রমর হলেও আসলে আমি গঙ্গা, হাতের কাছে কোনো মহাদেবকে মজুত রেখো। একা ভগীরথ আমাকে সামলাতে পারবে না।

নাঃ। এমন করে কাগজে-কলমে আপনি থেকে তুমিতে আসা বড়োই আনরোমান্টিক। এমন "তুমি", "কাগুজে তুমি"। পদ্মফুলের লালচে জমি নিজের আঙুলে যেমন করে কুরে কুরে খেয়ে পদ্মবীজে পৌঁছোতে হয় আমি "আপনির" জমি ছাড়িয়ে একদিন বা শুক্লাপঞ্চদশীর বা কৃষ্ণাপঞ্চদশীর এক রাতে "আপনি" থেকে "তুমিতে" পৌঁছোব। আমার নিথর যৌবনের এতগুলো বছরের সব পঙ্কে জন্মানো সুরভিত পদ্মের "আপনি"কে আমি নিজে হাতে ছিঁড়ে "তুমি"র বীজ বপন করব। এখন আপনির বেড়া থাকই না হয়। সেই বেড়ার ওপার থেকে আপনি, আমি তুমির ফিকে বেগনি রঙা ফুল ফুটোনো জ্যাকরান্ডা গাছের দিকে মুগ্ধ নয়নে চেয়ে থাকুন।

"সুখ নেইকো মনে, নাকছাবিটি হারিয়ে গেছে হলুদ বনে বনে।"

খুঁজে দিন না মশাই। আমার নাকছাবিটি আমাকে। ডাকাতি করে।

আপনার বন্ধুরা তো আপনাকে দিগা পাঁড়ে বলে ডাকেন। শুনি যে, দিগা পাঁড়ে নাকি কোনো ডাকাতেরও নাম? আমার ডাকাতদের খুব পছন্দ,সেই ভোম্বল সরদার আর শিকরেবাজদের মতো ডাকাত, যারা আগে থেকে জমিদার বাড়িতে চিঠি দিয়ে জানিয়ে ডাকাতি করতে আসত।

অধিকাংশ পুরুষেরাই এখন ছিঁচকে চোর হয়ে গেছে, ট্রাভেলিং অ্যালাউন্স-এর বিল ইনফ্লেট করা, ঘুষ-ঘাষের কারবারি পুরুষ সব। ডাকাতদের আর দেখাই যায় না জীবনে কোনো ক্ষেত্রেই। আপনি আমর ছুঁটির বাঁশি না হয়ে "ডাকাতিয়া বাঁশি" হন। "ডাকাতিয়া বাঁশি", যে, "দিন দুপুরে চুরি করে রাত্তিরেতে কথা নাই"। সেই "ডাকাতিয়া বাঁশি"।

খারাপ থাকবেন। খুব খারাপ। যাতে, আমি গেলে ভালো থাকতে পারেন।

ইতি—

পদ্মবনের মত্ত ভ্রমর

স্কটিশ অটাম লেন
ডার্নসটাউন

দিগন্ত
তেঁতরাপাড়া, যশপুর
কটক, ওড়িশা

দিগন্ত,

গতকাল মণীষদা দেশ থেকে এসে পৌঁছেছেন। দেশ ছাড়ার আগের কয়েকদিনের আনন্দবাজার পত্রিকা নিয়ে এসেছিলেন উনি। উনি অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে আমাকে, অশোকদাকে এবং গোপাদিকে ২৭/৫/৯৫ কাগজটি দেখালেন। তখন ওয়াশিংটন থেকে শংকরদা মানে শংকর গুপ্তও সদ্য এসে পৌঁছেছেন। শংকরদার কথা বাঘমুণ্ডাতে বলেছিলাম। শংকরদা আর সুমিতাদি আমাকে

খুবই স্নেহ করেন। তিনি ইউনাইটেড স্টেটস-এর ফরেন সার্ভিসে আছেন। বহুদিন ওয়াশিংটনে থাকার পরে কায়রোতে ছিলেন বেশ কিছুদিন। তারপর ওয়াশিংটনে ফিরে আবার বাইরে গেছেন। এখন হেডকোয়ার্টার্স কিনিয়ার নাইরোবি। আফ্রিকান ডেস্ক-এ আছেন।

উনি কিন্তু এঞ্জিনিয়র। ফরেন সার্ভিসে ঠিক কী কাজ করেন তা বলতে পারব না। সম্ভবত সুপারভাইজারি কাজ কোনো।

যাই হোক, কাগজটি (আনন্দবাজার) নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেকক্ষণ উত্তেজিত আলোচনা চলল। আনন্দবাজারের একার কোনো ও দোষ নেই। ওদের প্রতিবেদক রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরও অন্য দু'একজনের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে।

কিছু সাহিত্যিকেরা যে সব মন্তব্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তা পড়ে আমরা সকলেই মর্মাহত।

সবচেয়ে মজার কথা হল যে বাপ্টিকে (ম্যান্ডেভিলা গার্ডেনস-এর) কলকাতাতে ফোন করেছিলাম পরশু। তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করাতে সে বলল, কাগজে বহু চিঠি বেরিয়েছে এর প্রতিবাদ জানিয়ে। তার উত্তরে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নাকি সম্পাদকীয় দপ্তরে লেখা তাঁর চিঠিতে এসব কথা আদৌ বলেছেন বলে অস্বীকার করেছেন। তারপরে, মানে এই অস্বীকার—পর্বের পরে রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় একটি চিঠিতে (সম্পাদকীয় দপ্তরে) জানিয়েছেন, "ভবিষ্যতে তিনি আর কোনো সাহিত্যিকেরই সাক্ষাৎকার নেবেন না"।

প্রকারান্তরে গভীর উষ্মার সঙ্গে বলেছেন, আজকালকার সাহিত্যিকরা অনেকেই ভণ্ড এবং মিথ্যাবাদী।

তুমি আনন্দবাজার রাখো না। শুধুই "THE STATESMAN" রাখো, তাই আমি তোমাকে সেই সাক্ষাৎকারের সারাৎসার জানাচ্ছি। ওই সময়ের কাগজগুলি জোগাড় করে নিয়ে তোমরা মতামত অবশ্যই জানাবে। সত্যি কথা বলতে কী, আমরা সবাই এখনও রীতিমতো মুহ্যমান হয়ে আছি এখানে। মনীষদা কাগজটা না আনলে এই অশান্তির হাত থেকে বেঁচে যেতাম সকলেই।

বাঙালি, সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে অত্যধিক নাচানাচি করাতে পশ্চিম ও উত্তর ভারতের মানুষে তো বটেই, এখানকারও বহু মানুষ বলতেন যে, বাঙালির কোনো SENSE OF PROPORTION নেই। তাতে আমরা আহত হতাম ঠিকই কিন্তু সেই বক্তব্যকে পুরোপুরি উড়িয়েও দিতে পারতাম না। কিন্তু কোথায় সত্যজিৎ রায় আর কোথায় রবীন্দ্রনাথ।

অশোকদা বাংলা সাহিত্যের অনেকই খবরাখবর রাখেন এবং প্রত্যেক প্রণিধানযোগ্য আধুনিক কবি ও লেখক কী লিখছেন না লিখছেন তারও খবরটবর রাখেন। উনি যখন ভাগ্যান্বেষণে কপর্দকশূন্য অবস্থাতে প্রথমবার এ দেশে আসেন তখন তাঁর সঙ্গে তাঁর এক প্রিয় বাঙালি লেখকের পাঁচখানি বই ছিল।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা আমি বেশি পড়িনি। তবে অশোকদা বললেন যে, উনি অনেকগুলি মোটা মোটা ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন যেগুলি খ্যাতি পেয়েছে। ছোটো উপন্যাসও নাকি সম্ভবত শ পাঁচেক লিখেছেন। জাস্ট ইমাজিন। পাঁচশো। জানি না অশোকদার অনুমান সত্যি কি না! কিন্তু তার মধ্যে একটি-দুটি ছাড়া অন্যগুলির নাম অশোকদার মনে নেই। তবে অশোকদা বললেন যে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নাকি বড়ো কবি এবং ওঁর 'নীরা' সিরিজের কবিতাগুলি নাকি খুবই জনপ্রিয়।

যাই হোক, তিনি কেমন কবি বা কেমন ঔপন্যাসিক সে সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র বলার নেই, ঔৎসুক্যও নেই। কারণ একমাত্র তাঁর 'আত্মপ্রকাশ' উপন্যাসটি ছাড়া অন্য কোনো উপন্যাসই আমি পড়িনি। তবে মিথ্যে বলব না, 'আত্মপ্রকাশ' উপন্যাসটি আমার অত্যন্তই ভালো লেগেছিল। তারপর

আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কেন, বাংলা সাহিত্যের কোনো লেখকের লেখাই পড়ে উঠতে পারিনি। ব্যতিক্রম, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশংকর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সতীনাথ ভাদুড়ী ইত্যাদি। তবে তারাশংকর থেকে সতীনাথ ভাদুড়ি পর্যন্ত ওঁদের প্রত্যেকেরই মাত্র দু'তিনটি উপন্যাসই অসাধারণ মনে হয়েছে, সব উপন্যাস আদৌ নয়।

তুমি জেনে খুশি হবে যে, আমার ডার্নসটাউনে বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎবাবুর সেট আছে। এখানে আসার পরেই SEA MAIL-এ আনিয়েছিলাম।

তোমাকে এত কথা বললাম কেন জানো? অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে আছি তাই। এবারে উত্তেজনার কারণ সংক্ষেপে বলি। রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শুনেছি, ইংরেজির মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং বর্তমানে আনন্দবাজারের একটি শারদীয় 'পত্রিকা'র সম্পাদকও।

তাঁরই প্রশ্নের উত্তরে সুনীল বলেছেন :

"কারও নাম করতে পারব না। কাউকে শনাক্ত করতে পারব না। সেটা আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে এটুকু বলতে পারি যে, রবীন্দ্রসংগীত মডার্ন জেনারেশানের কাছে বোরিং। একই সুর। কোনও রকমফের নেই। বড্ড স্লো। আধুনিক জীবনের গতির সঙ্গে যায় না। এ যুগের ছেলেমেয়েরা যখন বুড়ো হবে, এখন যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে বিশুদ্ধ রাখতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের প্রভাব কমে আসবে, তখন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এই হুজুগ আর থাকবে না। তাঁর জনপ্রিয়তাও অনেক কমে যেতে পারে যদি না রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমাদের এই জবরদস্তির এই মনোভাবের পরিবর্তন হয়।"

আচ্ছা দিগন্ত, আমার কাছে তো ভীমসেন যোশীর অনেক এল.পি ক্যাসেট এবং সি. ডি.-ও আছে কারণ আমি ওঁর খুবই ভক্ত কিন্তু উনিও যে রবীন্দ্রসংগীত গান তা তো আমি জানতাম না। সুনীলবাবুর কাছেই প্রথম জানলাম। উনি বলছেন "রবীন্দ্রসংগীত ভীমসেন যোশীর মতো কে গাইতে পারেন? আনন্দ পুরস্কারের অনুষ্ঠানে কী অসাধারণ রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছিলেন ভীমসেন। রবীন্দ্রনাথের গান, অর্থাৎ কথা রবীন্দ্রনাথ, সুর ভীমসেন। অসামান্য অভিজ্ঞতা। কিন্তু বিশ্বভারতী কি ভীমসেনের এই এক্সপেরিমেন্টকে রেকর্ড করার অনুমতি দেবে?"

ঝাঁঝিয়ে উঠলেন আবুল বাশার। "বিশ্বকবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব কোনও দায়িত্ব কোনও দায়িত্বশীল পাঠকের নয়। এ দায়িত্ব পালন করছেন, বেশ ভালো ভাবেই করছেন তথাকথিত রবীন্দ্র-মাফিয়ারা। না, মাফিয়া কথাটাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। এই তথাকথিত রবীন্দ্র ভক্তরাই তৈরি করেছেন সুরক্ষিত রবীন্দ্রবলয়। লক্ষ্মণের গণ্ডির মতো। একবার এই বলয়ের মধ্যে ঢুকতে পারলে আর কোনও ভাবনা নেই। মোস্ট ডেডিকেটেড বলয় নাম করার প্রয়োজন নেই, কারা কী ভাবে রবীন্দ্রবলয় রক্ষা করছেন, সেই সব দাদা-দিদিদের আমরা সবাই চিনি। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ও কার্ল মার্কস-এর মধ্যে কোনও তফাত নেই। কম্পিউনিস্টরা যেমন মার্কসকে এক্সপ্লয়েট করেছেন তেমন রবীন্দ্রনাথকে রাবীন্দ্রিকরা। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই এই এক্সপ্লয়টেশান।"

এর পরে, "স্পষ্ট কথার মানুষ" সুনীল আবারও বললেন, আমি খুশি হব যেদিন রবীন্দ্রসাহিত্য এবং রবীন্দ্রসংগীতের উপর বিশ্বভারতীর কর্তৃত্ব আর থাকবে না। যেদিন হোটেলের নৃত্যশিল্পীরা ছোটো ছোটো স্কার্ট পরে রবীন্দ্রনাথের গান নিজেদের সুরে গেয়ে নাচবে। কেউ তাকে অপসংস্কৃতির ধিক্কার দেবে না। রবীন্দ্রনাথকে নতুন প্রজন্মের কাছে বাঁচিয়ে রাখতে হলে রবীন্দ্রসংস্কৃতির আমূল সংস্কার চাই। .....কুমার শানুর মতো পপুলার শিল্পী যদি রবীন্দ্রনাথের গান করেন তাহলেই রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ থাকবে। অনেক বাড়বেও। অন্তত তাতে কোনো মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। অথচ আমরা সেটা মেনে নিতে পারছি না কেন?"

আরও ছিল কিন্তু আমার তাড়া আছে।

তোমার বাড়িতে ফ্যাক্স থাকলে পুরো সাক্ষাৎকারটাই FAX করে দিতাম। এই অংশগুলো

গোপাদির XEROX মেশিনে জেরক্স করলাম বলে পুরোটা হাতে লিখতে হল না যে, এই বাঁচোয়া।

ও দিগন্ত, আমি আমাদের কলকাতার যে সাহিত্য সংস্কৃতি এবং সংগীতের দিগন্তকে পেছনে ফেলে এসেছি আজ বেশ কয়েকবছর হল সেই দিগন্ত কি হারিয়েই গেল?

বাংলা সাহিত্য এবং সংগীতের জগৎ কি এমনই সব অন্তঃসারশূন্য পাণ্ডিতম্মন্যদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে? নইলে, এমন এমন কথা এঁরা বলেন কী করে! ছিঃ। ছিঃ। বড়ো লজ্জা করে।

এই সব গা-জ্বলে যাওয়া ব্যাপার স্যাপার, আজেবাজে মানুষদের বে-এক্তিয়ারে যা নয় তা বলা, কলকাতার শিক্ষিত সমাজ মেনে নেন কী করে! কলকাতা কি মরে গেছে? পত্রপাঠ তুমি আমাকে এ ব্যাপারে তদন্ত করে যোগ্যজনের মতামতসহ উত্তর পাঠাবে।

আর কিছু লিখতে পারছি না, আমি অত্যন্তই উত্তেজিত।

নিরুত্তর থেকে আমার রাগ আরও বাড়িয়ো না।

ইতি—
ইন্দি

শ্রদ্ধাভাজনীয়েষু স্যার,

যশপুর
কটক

বড়োই বিপদে পড়ে আপনাকে এই চিঠি লিখছি। চিঠির সঙ্গে স্টেটস-থেকে লেখা আমার এক পরিচিতার একটি চিঠি স্টেপল করে দিলাম। সেই চিঠিটা যদি কষ্ট করে পড়েন তবেই বিপদের স্বরূপ এবং গভীরতা আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন।

রবীন্দ্রসাহিত্যের অনেকখানিই পড়া থাকলেও রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে আমি বেশিকিছু জানি না। ছেলেবেলায়, পাড়াতে অল্পবয়সি মেয়ের অভাব ছিল এবং আমার নাক চিবুক কাটা কাটা এবং গায়ের রঙ ফরসা ছিল বলে দিদিরা জোর করে মেয়ে সাজিয়ে আমাকে দিয়ে "হ্যাদে গো নন্দরানি আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও" গাইয়েছিলেন। আমার রবীন্দ্রসংগীতের জ্ঞান ওই গানটিতে এসেই থেমে গেছে।

রবীন্দ্রসংগীত শুনতে আমি খুবই ভালোবাসি এবং রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে প্রথিতযশা সবচেয়ে বেশি প্রচারিত বাংলা কাগজে বাঙালি সাহিত্যিকদের মতো এমন মন্তব্য আমার মতো কাঠখোট্টা গোঁড়া ইকনমিস্টকেও ভীষণই ব্যথিত করেছে তা অস্বীকার করতে পারব না। কিন্তু ইন্দিরার চিঠিখানি এ বিষয়ে আমার জ্ঞানবুদ্ধি নিয়ে HANDLE করা অসম্ভব। তাই TIMED HAND-GRENADE এর মতো আমি বোমা গরম থাকতে থাকতেই আপনার দিকে ছুঁড়ে দিলাম। হয় আপনি তাকে ডিফিউজ করুন, স্যার নয়তো, ওই সব মন্তব্যকারীদের দিকেই ছুঁড়ে দিন।

ইন্দিরার পুরো ঠিকানা ওর চিঠির উপরের STICKER-এই আছে। স্যার, আপনি যদি আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করে ওকে সরাসরি একটি উত্তর লিখে শান্ত করেন এবং যাঁরা ওই সব মন্তব্য করেছেন তাঁদেরও কিছু লেখেন তবে অত্যন্ত কৃতার্থ ও বাধিত হব।

আমাকে যদি ইন্দিরাকে লেখা চিঠির একটা জেরক্স কপি পাঠান তাহলেও খুব খুশি হব।

আপনাকে আমরা, আপনার ছাত্ররা, চিরদিনই CRUSADER বলেই জেনে এসেছি। সে

কারণেই, অনেক ভেবেটেবে ইন্দিরার চিঠিটা আপনাকেই পাঠালাম। সব অন্যায়ের বিরুদ্ধেই CRUSADE যিনি করবার যোগ্য, তাঁর কাছেই।

অবশ্য আমি জানি না তাঁরা যা বলেছেন তা ঠিক না ভুল, সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত না অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত।

আশা করি ভালো আছেন।

ভালো থাকবেন। আপনি আমাদের নির্ভীক ডন কীয়টে (DON QUIXOT)। আপনাকে ভালো থাকতেই হবে, আমাদের মতো অগণ্য মানুষদেরই জন্যে।

আমিও আপনারই এক ছেলে। আমার দ্বারা আপনারা জন্যে যদি কিছুমাত্র করণীয় থাকে তাহলে নির্দ্বিধায় জানাবেন, যে-কোনো সময়ে।

ইতি—
স্নেহধন্য আপনার প্রিয় ছাত্র
দিগন্ত

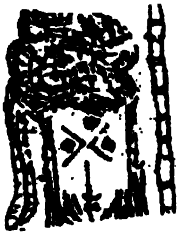

ইন্দি,
কল্যাণীয়াসু,

তেঁতরাপাড়া
যশপুর
কটক

এবারে লবঙ্গী সম্বন্ধে তোমার অ্যাডমায়রারের যা জ্ঞাতব্য তা জানাতে পারব বলে উল্লসিত বোধ করছি। এতদিন যে দেরি হল সে জন্যে আমি অত্যন্তই লজ্জিত। ঋজুদার কাছ থেকে একটি বই পেয়েছি গতকালই। ডাকে পাঠিয়েছেন নিজে সই করে। বইটির নাম "বনজ্যোৎস্নার সবুজ অন্ধকারে" (দ্বিতীয় খণ্ড) প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯।

বইটি ওড়িশার নানা বনজঙ্গলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা। আমি লবঙ্গীর জঙ্গলের সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশি তথ্য দিতে পারতাম না অবশ্যই। এই বইয়ে 'লবঙ্গী' শীর্ষক একটি অধ্যায়ই আছে। সেটি থেকে কিছুটা তোমাকে জেরক্স করে পাঠালাম। পড়ে আমাকে জানিয়ো তোমার চামুণ্ডর (মা কালীর চামুণ্ডা থাকার কথা কিন্তু তুমি দেবী লক্ষ্মী হয়েও চামুণ্ড পোষণ করছ যে, এটা লজ্জার নয় কি?) আরও কিছু তথ্যর প্রয়োজন আছে কি না।

এছাড়া "লবঙ্গীর জঙ্গলে" নামের আরও একটি বইয়ের খোঁজ পেয়েছি,যার প্রকাশক দে'জ পাবলিশিং ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩। এই বইটিও আমার কাছে নেই। আমি প্রকাশককে লিখব একটি আমাকে পাঠাতে V.P.P তে আর তোমাকেও পাঠাতে বলব SEA MAIL-এ। টাকা আমি দিয়ে দেব। ইতিমধ্যে যদি STATES থেকে কেউ আসেন তো তাকেও বলতে পারো, প্রেসিডেন্সি কলেজের উলটোদিকে-র গলিতে দে'জ এর দোকান থেকে কিনে নিয়ে যেতে।

তোমরা কেউই হয়তো খবর রাখো না যে, জানাশোনা থাকলে, কলেজ স্ট্রিট পাড়াতে প্রকাশকদের থেকে সরাসরি বই নিলে সারাবছরই কুড়ি পারসেন্ট কমিশন পাওয়া যায় যখন বইমেলাতে পাওয়া যায় মাত্র দশ পারসেন্ট।

যে-কোনো RETAILER-কেই প্রকাশকেরা কুড়ি পারসেন্ট ছাড় দেন। নামী লেখকদের রয়্যালটির হারের সমানই। এবং কখনও কখনও বেশিও। ওই কথা কি জানতে?

তোমার কাছে কি 'আরণ্যক' আছে বিভূতিভূষণের? তোমার প্রিয় লেখক বুদ্ধদেব গুহ দশবার মরে জন্মালেও একজন বিভূতিভূষণের সমকক্ষ হতে পারবেন না। 'আরণ্যক' তোমরা কাছে না থাকলে আমাকে জানাবে। আমি পাঠিয়ে দেব। যখনই কোনো কারণে মন অশান্ত হয় আমি 'আরণ্যক' খুলে বসি।

প্রস্তাবনাতেই বিভূতিবাবু লিখছেন :

"মহালিখারূপের পাহাড়ে পাদদেশে বিশাল বনপ্রান্তরে বসন্ত নামিয়াছে, লবটুলিয়া বইহারের সর্বত্র হলুদ রঙের গোলগোলি ফুলের মেলা, দ্বিপ্রহরে তাম্রাভ রৌদ্রদগ্ধ দিগন্ত বালির ঝড়ে ঝাপসা, রাত্রে দূরে মহালিখারূপের পাহাড়ে আগুনের মালা, শালবনে আগুন দিয়াছে। কত অতিদরিদ্র বালক-বালিকা, নরনারী, কত দুর্দান্ত প্রকৃতির মহাজন, গায়ক, কাঠুরে, ভিখারীর বিচিত্র জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল। অন্ধকার প্রান্তরে খড়ের বাংলোয় বসিয়া বন্য শিকারির মুখে অদ্ভুত গল্প শুনিতাম। মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের মধ্যে গভীর রাত্রিতে বন্য মহিষ শিকার করিতে গিয়া ডালপালা ঢাকা গর্তের ধারে বিরাটকায় বন্য মহিষের দেবতাকে তারা দেখিয়াছিল।

ইহাদের কথাই বলিব। জগতের যে পথে সভ্যমানুষের চলাচল কম, কত অদ্ভুত জীবনধারার স্রোত আপন মনে উপল বিকীর্ণ অজানা নদীখাত দিয়া ঝিরঝির করিয়া বহিয়া চলে সে পথে, তাহাদের সহিত পরিচয়ের স্মৃতি আজিও ভুলিতে পারি নাই।"

এরপরে একটা কথা বলব, তোমার বুদ্ধদেব গুহর স্বপক্ষে। "শালগাছের বনে আগুন দিয়াছে" তিনি লিখতেন না। শাল এর মতো মূল্যবান গাছের বনে কোনো মানুষই আগুন দেয় না। আগুন "লাগে" চৈত্র-বৈশাখ মাসে। এই আগুনকে দাবানল বলে। যখন আগুন লাগে, তখন শাল-সেগুন নির্বিশেষে সব বনেই আগুন লাগে।

বিভূতিবাবু মস্ত বড়ো লেখক ছিলেন, মানব-দরদি ছিলেন, অনেক কমিউনিস্ট বা স্যোসালিস্টদের চেয়েও বড়ো গরিব-দরদি ছিলেন যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বনজঙ্গল পাহাড়কে তিনি দেখছিলেন রোমান্টিকের চোখে, তোমার প্রিয় লেখকের মতো বন জঙ্গলকে উলটে-পালটে, INSIDE OUT করে দেখেননি যে, একথা স্বীকার করতেই হবে আমার মতো নিন্দুকেরও।

এবার 'লবঙ্গী' পড়ে দ্যাখো, "বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে" থেকে।

ঋগ্‌বেদে 'অরণ্যানি' শীর্ষক একটি স্তোত্র আছে।

যতবারই লবঙ্গীতে গেছি, পাহাড়ের উপরে লবঙ্গীর খড়ে-ছাওয়া বন-বাংলোতে বসে সামনে তাকাতেই আমার সেই স্তোত্রটির কথা মনে পড়ে গেছে।

পাহাড় বেয়ে উঠে পম্পাশর হয়ে, তালশিরা হয়ে যে পথ লবঙ্গীতে এসে পৌঁছেছে সেই অনিন্দ্যসুন্দর পথ এবং যে পথটি লবঙ্গী হয়ে ডানদিকে গেণ্ডুলি গাছে-ভরা গভীর উপত্যকাকে ডাইনে রেখে বাঁয়ে সুউচ্চ পাহাড়ের গায়ে গায়ে মিশেছে রায়গড়া এবং টুম্বকাতেও, সেই পথ নাকি এখন আর নেই।

ব্রিটিশ আমলে বানানো সেই পথ, সেই টুম্বকা বাংলো, সবই অযত্নে, দায়িত্বজ্ঞানহীনতায় ধ্বংস হয়ে গেছে।

এ-কথা ভাবলেই মনে গভীর দুঃখ হয়।

তালশিরা থেকে লবঙ্গীতে আসার পথে ব্রিটিশ আমলে বানানো একটি ব্রিজও ছিল সমতলে। তার ধ্বংসাবশেষ আমরাও দেখেছি ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে। সাহেবরা ঘোড়াতে চড়ে নদী পেরিয়ে লবঙ্গীতে আসতেন। ডি. এফ. ও, ডি. এম, ডিভিশনাল কমিশনার, এস.পি। একবার ওড়িশার গভর্নরও লবঙ্গীতে শিকারে এসেছিলেন। তাঁর জন্যই নাকি নদীতে ব্রিজ বানানো হয়েছিল যাতে তাঁর মোটরগাড়ির লবঙ্গী বাংলোতে পৌঁছোতে কোনো অসুবিধা না হয়।

পম্পাশর থেকে যে পথে আমরা লবঙ্গী যেতাম জিপ চালিয়ে এবং লবঙ্গী থেকে টুম্বকা বা রায়গড়াতেও, সেই রাস্তাও নাকি এখন পায়ে চলার অযোগ্য হয়ে গেছে। কোনো বনপথেরই আর রক্ষণাবেক্ষণ হয় না। চমৎকার সব বন-বাংলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গেছে। তারই সঙ্গে চাপা পড়ে গেছে আমাদের প্রথম ও মধ্য যৌবনের কতশত দিনগুলি-রাতগুলির স্মৃতি। বনবাংলোর খণ্ডহারের মধ্যে আমাদের সেই সব মধুর স্মৃতি খণ্ডহার হয়ে ওই খণ্ডহারের নীচে প্রোথিত হয়ে গেছে। লতাগুল্ম গজিয়ে গেছে তার উপরে। সরীসৃপের বাস হয়েছে, লজ্জাবতীর ঝোপ গজিয়েছে ঘন কণ্টাবাঁশের বনের পায়ের কাছে।

তবে ভাবলে, ভালো লাগে যে, কাঁচপোকা ওড়ে এখন নিশ্চয় সেখানে শীতের মধ্যদিনে, তাদের ডানায় ডানায় রোদ ছিটিয়ে। লজ্জাবতীর ঝাড় আরও ঘন হয়েছে হয়তো এত বছরের ব্যবধানে।

পম্পাশর থেকে রায়গড়া বাইশ কি.মি। ঘাট রাস্তা। ঘুরে ঘুরে পথ উঁচু পাহাড়ে চড়েছে। আবার নেমে গেছে। পম্পাশর থেকে চার কি.মি গেলে তালশিরা। যেখানে ফুটুদাদের মুহুরি দুর্গার বাড়ি ছিল। এই তালশিরা থেকে আরও চার কি.মি গেলে জুকুব বা জোকাব গ্রাম। ছোট্ট গ্রাম।

তালশিরাতে চল্লিশ ঘর মতো মানুষের বাস। আগে হয়তো আরও কম ছিল। তালশিরার লোকে চাষবাস করেই খায়। ধান, কন্দমূল, বিড়িডাল ইত্যাদির চাষ করে। গরমের সময়ে আম কাঁঠালও হয় অনেক। কাঁঠালকে ওড়িশাতে বলে পন্বস।

লবঙ্গী ও জুকুবে ধানজমি নেইই বলতে গেলে। জঙ্গলের ঠিকাদারেরা যদি কোনো কাজ দেয় তবে গ্রামের মানুষেরা সেই কাজ করে। ক্যুপ কাটে। জঙ্গলে পথ বানায়, পথ মেরামত করে, গরমের আগে বনবিভাগের "বরাদ" মতো ফায়ার-লাইন তৈরি করে, মানে, আগুন যাতে না ছড়িয়ে যেতে পারে সেজন্যে পথের দুপাশে নালার মতো কেটে তার দুপাশের সব আগাছা এবং ঘাস পুড়িয়ে দেয় গরম পড়ার আগে আগেই।

লবঙ্গীর সেই খড়ে-ছাওয়া ছোট্ট বাংলোটি এমনই জঙ্গলের মধ্যে ছিল, যেন মনে হত জঙ্গল গলা টিপে ধরে শ্বাসরোধ করে দেবে।-অনেকটা ময়ূরভঞ্জের সিমলিপালের ধুধুরুচম্পার বাংলোরই মতো। লবঙ্গীর বাংলোর সামনেই নিচ দিয়ে একটি নালা বয়ে গেছে। সেই নালা বনবিভাগের পথটিকে মাড়িয়ে, পেরিয়ে গেছে। নালার ডানপাশে সামান্য ধানজমি। ওই নালার বাঁপাশে বনবিভাগের BEAT HOUSE, সেখানে একজন ফরেস্টগার্ড থাকত, তার পরিবার নিয়ে। এই গভীর জঙ্গলে হাতি ও নানারকম জানোয়ারের মুখ থেকে বাঁচিয়ে ধানচাষ করা বলতে গেলে প্রায় অসাধ্যই ছিল। সেই অসাধ্যসাধনের চেষ্টাতেই ব্যাপৃত থাকত সেই বেচারি ফরেস্ট গার্ড। ওই BEAT HOUSE-এর কাছেই একটি কুয়োও ছিল। ফরেস্ট গার্ড সেই কুয়ো থেকে জল তুলে ক্যানেস্তারা করে বাঁকে বয়ে নিয়ে আসত বাংলোতে।

আমরা যখন যেতাম লবঙ্গীতে, সেই সময়কার ফরেস্ট গার্ডের নাম ছিল "মহি"।

মানুষটি বড়ো ভালো ছিল।

লবঙ্গীর বাংলোর সামনেই যে পাহাড়গুলি দেখা যায় তার নাম কানজিয়া খোল। নালাটির নামও ওই পাহাড়েই নামেই। কানজিয়া খোল নালা।

শুনেছি, পুরোনো বাংলোটি ভেঙে ফেলে এখন নতুন একটি বাংলো বানিয়েছেন বনবিভাগ, কিন্তু তাতে আসবাব বা বাসনপত্র বলতে কিছুই নেই। তাছাড়া, পুরোনো বাংলোটির সঙ্গে আফ্রিকার কোনো কোনো আদিবাসীদের বাড়ির সাদৃশ্য ছিল। ঠিক অমন ধাঁচের খড়ের চালের বাংলো ভারতের কম বনেই দেখেছি।

লবঙ্গী থেকে টুম্বকা আঠারো কি.মি পথ। গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে গেছে সেই পথটুকু। কয়েকটি, প্রায় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি বাঁক আছে সেই পথে। তখনকার দিনে দিনমানে যেতেও গা ছমছম

করত। এখন সে রাস্তা নাকি এমনভাবেই নষ্ট হয়ে গেছে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে যে পায়ে হেঁটেও আর যাওয়া যায় না। ভাবলেও কষ্ট হয়। ওই সব অঞ্চলে যে কত সুন্দর ট্যুরিস্ট বাংলো গড়ে তোলা যায় তা কী বলব। যাঁরা বটানিস্ট, আর্কিয়োলজিস্ট, তাঁরাও এসব জায়গাতে এলে আনন্দে আত্মহারা হবেন। কিন্তু কাঠ-বাঁশের কারবারি আর শিকারিরা ছাড়া এইসব সুন্দর জায়গার কথা তো কেউ জানেনেই না। তাঁদের মধ্যে আবার অধিকাংশই অশিক্ষিত, বেরসিক।

লবঙ্গীর বাংলো থেকে কিছুটা এগিয়ে গেলেই ডান দিকের উপত্যকাতে অপূর্ব সুন্দর ধবধবে গেণ্ডুলি গাছের বন, যা দিয়ে পলিয়েস্টার ফাইবার তৈরি হয়। সেই বনে একটি রোগ-এলিফ্যান্ট শিকারের কাহিনি "ঋজুদা" সিরিজের "ঋজুদার সঙ্গে লবঙ্গী বনে" বইতে আছে। "ঋজুদা-সমগ্রে"ও। আনন্দ পাবলিশার্স-এর বই।

গ্রীষ্মের বা বসন্তের মেঘহীন শুক্লপক্ষের রাতে এই গেণ্ডুলি বনের যা সৌন্দর্য তা ভাষায় বর্ণনার নয়। গ্রীষ্মদিনে সেই পত্রশূন্য, মসৃণ, সাদা গাছগুলিকে দেখে মনে হতে পারে লানডান-এর মঞ্চে 'OH CALCUTTA' নাটকের অগণ্য শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গিনিদের নগ্ন শরীরের নীরব শোভাযাত্রাই দেখছেন। মাঝে মাঝেই বুকের মধ্যে চমক তুলে কামজ্বরাক্রান্ত ব্রেইন-ফিভার পাখি ডেকে ফিরত তখন ওই জোছনা রাতের বনে। ব্রেইন-ফিভার। 'পিউ-কাঁহা পিউ-কাঁহা' বলে।

লবঙ্গী থেকে টুম্বকা ওই পথ দিয়ে যেতে শিশুবাঙ্কা, চুয়ারি ও ডিহআম্ব, এই তিনটি ছোট্ট ছোট্ট গ্রাম পড়ে।

পাহাড়ের মধ্যে "ডিহঅম্বি" গ্রামে একবার আমরা ক্যাম্প করে ছিলাম। ক্যাম্প মানে, ত্রিপল খাটিয়ে। জানুয়ারির শেষে। প্রচণ্ড ঠান্ডা ছিল। আর টিপটিপে বৃষ্টি। ডিহআম্বতে একটি একলা বড়ো দাঁতাল হাতি আমাদের খুবই উত্ত্যক্ত করত। ভয়ে ভয়ে থাকতাম। সারা রাত ক্যাম্প পাহারা দিতে হত আমাদের, রাতের প্রহর ভাগ করে করে। তখনও হাতিটা ROUGE ঘোষিত হয়নি। হাতি-শিকারের পারমিট তো ছিল না আমাদের। তাই তার পায়ের নিচে থেঁৎলে গেলেও রাইফেল হাতে নিয়ে তাকে গুলি করার অধিকার ছিল না।

লবঙ্গী থেকে যে রাস্তাটি রায়গড়া গেছে, সেই পথেই রসোগুা ঘাট পেরোবার পরেই ডানদিকে একটি পথ চলে গেছে কুয়াদলী, ভুরকুণ্ডি হয়ে টুম্বকা। এটিও ফরেস্ট রোড। রসোগুা থেকে টুম্বকা প্রায় পনেরো কি.মি মতো পড়ে। আর রসোগুা থেকে রায়গড়া ছয় কি.মি মতো।

পম্পাশর থেকে রায়গড়ার রাস্তাতে কয়েকটি খুব ভালো সেগুন প্ল্যানটেশান ছিল। এই পথে একটি GAME TANK আছে। তার নাম কান্তারশিঙা গেম ট্যাংক। রসোগুাতেও একটি আছে। তার নাম রসোগুা গেম ট্যাংক।

লবঙ্গীর জঙ্গলের বর্ণনা দিতে গিয়ে ঋগ্‌বেদের অরণ্যানি স্তোত্রটি বলা হল না।

"ও বনদেবী! (ওড়িশাতে বনদেবীকে বলে ঠাকুরানি!) বনদেবী! দূর থেকে দেখা দিয়েই তুমি অদৃশ্য হয়ে যাও। তুমি আমাদের গ্রামে আসো না কেন একবারও? তুমি কি মানুষকে ভয় পাও?

যখন ফড়িং-এরা বনে চরতে যাওয়া গাভিদের দূরাগত অস্পষ্ট হাম্বা-আ-আ রবের উত্তর দেয় তাদের পাখনার হালকা মসৃণ আওয়াজে, তখন মনে হয় যে, শিং-নাড়ানো গাভিদের গলার ঘণ্টার টুং টাং ঢুক-ঢুক আওয়াজে তুমি যেন বড়ো খুশি হও।

কখনও তোমাকে এক মুহূর্তের জন্যে দেখা যায়।

ঠিক কি দেখা যায় তোমাকেই?

মনে হয়, বনের মধ্যে ধীরে সঞ্চারমান কোনো গাভিকেই দেখা গেল বুঝি অথবা গাছগাছালির আড়ালে কোনো বনবালাকেই।

সন্ধে যখন নেমে আসে, তখন মনে হয়, বহু দূরের জঙ্গলের গভীরের কোনো বনপথ দিয়ে গোরুর গাড়ির সারির চলে যাওয়ার অপস্রিয়মান চলমান শব্দই যেন তোমার গলার স্বর।

যখন কোনো গ্রামবাসী তার গাভিকে ডাকে, যখন কোনো সদ্যকর্তিত গাছ হুড়মুড় করে হাত-পা ছড়িয়ে লতা-গুল্ম আর অগণ্য গাছের ডালপালার সব ভেঙে, ছিঁড়ে নিচে পড়ে, তার ডাক আর সেই আর্তনাদকে যেন তোমারই গলার স্বর বলে মনে হয়।

যদি কোনো মানুষ অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পরেও বনের মধ্যে থাকে, তবে তোমার গলার স্বর শুনে তার মনে হতে পারে যে বনপথে পথ হারিয়ে দূর থেকে যেন কেউ কাঁদছে।

বনদেবী। তুমি কারোরই ক্ষতি করো না, কারোরই প্রাণ নাও না, যদি না সেই মানুষ তোমার শত্রু, তোমার খুবই কাছে চলে যায়।

তুমি বনফল খেয়ে তোমর খিদে নিবারণ করো, তোমার যেখানে মন চায় তুমি সেখানেই রাত কাটাও, তোমারই বনে। তোমাকে আমি বন্দনা করি। তোমার গায়ে সবসময়েই সুগন্ধ, বিচিত্র বনসুবাসে সুবাসিত তোমার শরীর। তুমি তৃপ্ত, যদিও কখনও তুমি কৃষি-কাজ করো না তবু বনদেবী, "বনমাতৃকা", তোমাকে প্রণাম!"

এই বনদেবীর বর্ণনা ঋগ্‌বেদে যেন ছিল তেমনই নানা জঙ্গলের বনের নানা দেব-দেবীর কথা আদিবাসী এবং বনচারীরা জানেন, মানেন। আমাদের দেশের ওরাওঁ, মুণ্ডা, সাঁওতাল, কন্দ বাখন্দ, ভিল, বীরহোড়, মারিয়া, খাসি, নাগা, কুকি, মেচ, বোরো, মিজো, চাকমা এবং অন্যান্য আদিবাসীরাও বনদেবী ও বনদেবকে জানেন। সুন্দরবনে বনবিবি, বাবা দক্ষিণরায়, গাজি খাঁ পির—ইত্যাদিকে রীতিমতো পুজো করা হয়। আফ্রিকার মাসাই এবং অন্যান্য উপজাতিরাও বনদেবীকে মানেন। যেমন গুগুনোগুম্বার। ওড়িশার কন্দদেরও নানারকম দেবতা আছে। যেমন মউলি, ব্রিভি, পেনু, টাকেরি পেনু। যেমন আছে অন্য সব আদিবাসীদেরই।

আসামের বিখ্যাত শিকারি এবং পৃথিবীর অন্যতম প্রধান হাতি বিশেষজ্ঞ লালজি, শ্রীপ্রকৃতিচন্দ্র বড়ুয়া (প্রমথেশ বড়ুয়ার সহোদর, প্রতিমা বড়ুয়ার বাবা) 'মহামায়া'কে দেখেছিলেন নাকি চাক্ষুষ। সেই রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার কথা তিনি আমাকে নিজমুখে বলেওছিলেন।

লবঙ্গীর জঙ্গলে, কানজিরাখোল নালার পাশে, জঙ্গলের গাঢ়, গা-ছমছম গভীরে, একবার ছিলাম। সেখানে ফুটুদাদের কাঠ-কাটা ক্যাম্পে কুদর্শন, ভীষণ গরিব, অহিফেন-সেবী দুখি করাতি ছিল একজন। তার নাম নারান। তার কথা "লবঙ্গীর জঙ্গলে" উপন্যাসে বিস্তারিত আছে।

গভীর রাতে, প্রতি রাতে ক্যাম্পের সব শব্দ থেমে গেলে এবং বনের শব্দ উঠতে শুরু হলে, সে দীনবন্ধুর কৃপা প্রার্থনা করে একটি করুণ গান গাইত। গানটির কথা পরে আবারও বলব।

ওরা সেদিনও যেমন দীনবন্ধুর কৃপাতেই বেঁচে ছিল, আজও তেমনই আছে।

লবঙ্গীর মাঠিয়াকুদু নালার ক্যাম্পে থাকবার সময়েই নারান, কম্ফু মহান্তি, আরো কত মানুষকে দেখি। কম্ফু, জঙ্গলের "কোয়াক"। তার কাছে কর্কট রোগের ওষুধ আছে বলে দাবি করত। এই ক্যাম্পে থাকার অভিজ্ঞতা নিয়েই মুখ্যত 'লবঙ্গীর জঙ্গলে' উপন্যাস এবং কিশোরদের জন্যে লেখা "ঋজুদার সঙ্গে লবঙ্গীবনে"।

দোলপূর্ণিমার সময়ে মই গাছে লাল লাল ফুল এসেছিল। দু দিকে মাথা উঁচু দুই পাহাড়ের মধ্যের বিস্তীর্ণ উপত্যকাময় পর্ণমোচী গেণ্ডুলি গাছের বন ছিল। এই গাছগুলো অনেকটা পালামুর চিলবিল গাছের মতো দেখতে, তবে আরো সুন্দর। গ্রীষ্মে পত্রশূন্য গেণ্ডুলি গাছগুলির সৌন্দর্যের কথা নিজ চোখে না দেখলে বুঝিয়ে বলা যায় না। সেই শোভা, দিশেহারা করে দেয় মানুষকে চাঁদনি রাতে। মনে হয়, শয়ে শয়ে শ্বেতাঙ্গিনি নগ্নিকামূর্তি এক শব্দহীন গন্ধ-ওড়ানো গান্ধর্বী নাচে উদ্বাহু হয়ে মেতেছে। তারই মধ্যে কুম্ভাটুয়া পাখি ডেকে চলেছে গুব-গুব-গুব-গুব। আর কপারস্মিথ ডেকে চলেছে। এবং সেই ছোট্ট পাখিটাও, যে ডাকে, রাতভর টাক-টাক-টাক-টাক করে। রাতের বেলা বলে তাকে কখনও দেখা হয়ে ওঠেনি। তাই তার চেহারা চিনি না। শুধু ডাকই চিনি। কেউ চিনিয়ে দিলে খুশি হব।

মুহুরিবাবু উকিলবাবু আমি তো বিজ্ঞানীর চোখ দিয়ে প্রকৃতিকে তেমন করে দেখিনি। দেখেছি, শুধু প্রেমিকের চোখ দিয়ে। তবে বিজ্ঞানীর চোখ দিয়ে প্রকৃতিকে দেখা, জানা প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষেরই কর্তব্য।

অত্যন্তই আনন্দের কথা এই যে, এক নতুন প্রজন্মর সৃষ্টি হয়েছে, যারা বয়সে তরুণ কিন্তু তারা ভালোবাসাকে মিশিয়েছে চুলচেরা জ্ঞানের সঙ্গে। তারা যখন শিশু ও কিশোর ছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ যে আমার লেখা বই পড়েই প্রকৃতিকে ভালোবাসতে শিখেছিল এই কথা তারা যখন আমাকে জানায় তখন নিজেকে অত্যন্তই পুরস্কৃত বলে মনে হয়। একটি প্রজন্মকে প্রকৃতি প্রেমে উদ্‌বুদ্ধ, দীক্ষিত করার চেয়ে বড়ো স্বীকৃতি আমার মতো অশিক্ষিত "অন্য লাইনের" অপুরস্কৃত মানুষের আর কী হতে পারে। অন্য পুরস্কারের আর দরকারই বা কি?"

"বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে" বইটি হাতে পেলে আরও জানতে পারবে। আপাতত এটুকু পড়েই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাও।

আশা করি, এর পরেও তোমার নায়ক, টুটু নায়েক সাহেবের আর কিছু জিজ্ঞাস্য থাকবে না লবঙ্গীর বন প্রসঙ্গে।

—ইতি তোমারই আজ্ঞাবহ
দিগন্ত

ইন্দি সেন
স্কটিশ অটাম লেন
ডার্নসটাউন

স্কটিশ অটাম লেন
ডার্নসটাউন

দিগন্ত,

তোমার লবঙ্গী সম্পর্কিত দীর্ঘ চিঠির জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে তোমাকে ছোটো করব না। তোমার বই পাঠাতে হবে না। "বনজ্যোৎস্নায় সবুজ অন্ধকারের" দুটি খণ্ডই (দ্বিতীয় খণ্ড যখন আছে তখন প্রথম খণ্ডও নিশ্চয়ই আছে!) এবং 'লবঙ্গীর জঙ্গলেও' নিয়ে আসবে আমার জন্যে পল্টন সাহা। ও যাচ্ছে কলকাতাতে ক'দিন পরেই।

আমার সেই রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কিত চিঠির উত্তর তোমার মাস্টারমশাই কবে দেবেন? আমার উত্তেজনা, সেই উত্তর না পেলে যে প্রশমিত হবে না।

—ইতি, তোমার লক্ষ্মীছাড়ি লক্ষ্মী

পুনশ্চ : ইদানীং কি ভ্রমরের গুনগুনানি একটু বেশি শুনছ? গুনগুনানির গুজব কানে আসছে ভ্রমরের পাখনাতে রোদ যেমন করে ছিটকোয়, তেমন করে।

"গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে মধুপ হোথা যাসনে, ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে কাঁটার ঘা খাসনে।"

—ই/ইঃ/ঈঃ

দিগন্ত বোস
তেঁতরাপাড়া
যশপুর, কটক

দিগন্ত বোস
তেঁতরাপাড়া
যশপুর, কটক

বেণি ব্যানার্জি অ্যাভিন্যু
কলকাতা-৭০০ ০৩১

কল্যাণীয়েষু বাবা দিগন্ত,

তোমার চিঠির উত্তর অনেকই বিলম্ব হল বলে কিছু মনে কোরো না। পুত্র শান্তনু এখানে এসেছিল সিংগাপুর ও ব্যাংককে বেড়াতে যাওয়ার পথে। হংকং-এও যাবে। ওরা প্যাকেজ হলিডে নিয়ে যাচ্ছে যদিও কিন্তু পরে থেকে যাবে বেশ কিছুদিন। ওর ও বউমার অনেকই বন্ধুবান্ধব আছে ওইসব দেশে। বলছিল কুয়ালালামপুরেও যাবে—মালয়েশিয়াতে। সস্ত্রীকই এসেছিল।

তুমি কি ওইসব দেশে গেছ? না গিয়ে থাকলে একবার ঘুরে এসো। ট্রাভেলিং ইজ এডুকেশান। দেশ দেখার জন্যে পয়সা খরচ করাটা আমি কখনোই অপচয় বলে মনে করিনি। তবে আমার পয়সা ছিলও না, আজও নেই, তাই দেশ দেখা বলতে যা বোঝায় তা আমার দেখা হয়নি। সেমিনার বা অধ্যাপনা করতে দেশের মধ্যেই যেসব জায়গাতে গেছি শুধু তাই-ই আমার কাছে দেশ দেখা।

শান্তনুরা উঠেছিল শ্বশুরবাড়িতেই। ওর শ্বশুরমশাই রাস্তা ও বাঁধ বানানোর ঠিকাদার। প্রচুর পয়সা। সল্টলেক-এ নতুন বাড়ি করেছেন, প্রাসাদোপম। আমার ভাড়াবাড়িতে কমোড নেই। ওদের অসুবিধে হয়। সেজন্যে শ্বশুরবাড়িতেই উঠেছিল। তাই শান্তনু ও বউমার সঙ্গ আমরা খুব কমই পেয়েছি, যদিও ওরা পনেরো দিন কলকাতাতে ছিল।

ওরা আমার জন্যে বুকে 'আই লাভ উ্য' লেখা চারটি রঙিন টি-শার্ট এবং তোমার গুরুপত্নীর জন্যে আধডজন প্যান্টি ও ব্রা এনেছিল। তিনি তো প্যান্টি জীবনে পরেননি। ব্রা'র প্রয়োজনও এখন ফুরিয়ে গেছে। ব্রা এবং প্যান্টিগুলি বাড়ির ঠিকে কাজের মেয়েটিকে দিয়ে দিয়েছেন। সে মহাখুশি। 'ফোরেন জিনিস' বলে।

ভাবতে কষ্ট হয় যে, আমাদের বাবা-কাকারাই বিদেশি জিনিস বর্জন করার জন্যে পরাধীন ভারতে আন্দোলন করেছিলেন মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে। জেলও খেটেছিলেন। জানি না, হয় গান্ধি প্রকৃত মহাত্মা ছিলেন না, নয়, ভারতীয়েরা, উইনস্টন চার্চিলের তাদের সম্বন্ধে যা মত ছিল আসলে তাই। "MEN OF STRAW".

ওদের প্রায় রোজই রাতে নেমন্তন্ন থাকত। আমাদের সময়ে যাকে আমরা "নেমন্তন্ন" বলে জানতাম তাকেই তো আজকাল তোমরা 'পার্টি' বলো, তাই না? তবে আমাদের সময়ে কারো বাড়ি নেমন্তন্ন থাকলে ছেলে মেয়ে সবাইরই "নেমন্তন্ন' থাকত। আজকাল সেই প্রাচ্য-পন্থী রেওয়াজ উঠে গেছে। আর পাশ্চাত্য প্রথাতে মিস্টার অ্যান্ড মিসেসই শুধু পার্টিতে যান। ছেলেমেয়েরা একা থাকে বাড়িতে। অন্য পরিবারের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ আদৌ পায় না। টি.ভি-তে পর্নো ও ক্রাইম-ছবি দেখে। এর ফলে কি ভালো হবে? জানি না।

তোমাদের প্রজন্মের নারী ও পুরুষের, মানে, বাবা-মায়ের উপস্থিতিতে শিশুকাল থেকে ছেলেমেয়েদের সুস্থ মেলামেশা তাদের চরিত্রগঠনে সাহায্য করতে পারত বলেই আমার বিশ্বাস। সেই সুযোগ আজকালকার শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা পায় না সন্তানেরা যখন বড়ো হবে, সব জানবে বুঝবে তখনই বোঝা যাবে এই প্রাচ্য-পন্থী নিয়ম ভালো ছিল কি না!

মাঝে মাঝে ভাবি, আমরা তো শান্তনুদের মতো নিজস্বার্থপরায়ণ জীবন কাটাইনি। সন্তানদের জড়িয়ে-মড়িয়েই ছিলাম। তোমাদের 'মানুষ' হবার শিক্ষাই দিয়েছিলাম, 'বড়োলোক' হবার নয়। তবু সবই কেমন উলটোপালটা হয়ে গেল। দোষ হয়তো আমাদেরই।

তোমার চিঠিতে আনন্দবাজার প্রকাশিত রবিবাবুর গান সম্পর্কে যা লিখেছ সে সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়ে তোমাকে শিগ্‌গিরই আমার বক্তব্য জানাব আলাদা চিঠিতে। তবে কী জানাব জানি না। জ্ঞানের সীমা চিরদিনই ছিল কিন্তু অজ্ঞতা এবং এক্তিয়ারহীন ঔদ্ধত্যর সীমা কোনোদিনও ছিল না।

আপাতত এইটুকুই বলি। ইতি—

আশীর্বাদক প্রসূনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কটক
যশপুর, ওড়িশা

কুচো চিংড়ি

ভ্রমর আসবে কি আসবে না? একেবারে আলটিমেটাম দিচ্ছি।

ছেলেবেলাতে আমাদের পাশের বাড়ির সুন্দরীপিসি, যিনি রূপে অতীব অসুন্দরী ছিলেন এবং বাবার অর্থ ছিল না বলে বিয়েও হয়নি, একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন "গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে মধুপ হোথা যাসনে, ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে কাঁটার ঘা ঘাসনে"। তোর ভ্রমরের বিলম্ব আমাকে সেই গানের কথাই বারেবারে মনে করিয়ে দিচ্ছে।

মনে আছে কি তোর? আমাদের স্কুলের অঙ্কের মাস্টারমশাই মহাদেব স্যার একদিন গজা তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে দেরি করেছিল বলে নিজের রোমশ ডান কানটি চুলকোতে চুলকোতে বলেছিলেন "কীরে গর্ভস্রাব। গা গরম কইত্তে কইত্তে যে দেখি বিবি পাইলে গেল। হুঁ!"

আমারও সেই দশা। ভ্রমর বড়োই ওভার-কনফিডেন্ট। যদি সত্যিই আসে তবে ফেভিকল দিয়ে ওকে আটকে রেখে দেব। ডানা-ফরফরিয়ে আর তার কাছে ফিরে যেতে দেব না। যত বড়ো মক্ষীরানি ভ্রমরই সে হোক না কেন! সিরিয়াসলি বলছি।

তোকে যে আনন্দবাজারের জেরক্স পাঠিয়েছিলাম তার কী হল? ভ্রমর তো গীতবিতানের ছাত্রী ছিল। পরবর্তীকালেও সুচিত্রা মিত্র এবং পরে কমলা বসুর কাছেও নাকি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছিল। সে কী বলে? আমাকে জানালেও হবে। নয়তো সরাসরি ইন্দিকে জানালেও হবে। ইন্দি এতটাই উত্তেজিত এ ব্যাপারে যে বলার নয়। সে বলছে, কপিরাইট আইনের মেয়াদ থাকতে থাকতেই রবীন্দ্রনাথের এমন হেনস্তা শুরু হল তো মেয়াদ ফুরোল কী হবে?

তাড়াতাড়ি করতে বলো ভ্রমরকে আর সত্যিই সে আসবে কি না তা জানাতে বলিস। FIRM DATE। নইলে তার জন্যে আমি হৃদয়ের জায়গা অতদিন খালি রাখতে পারব না। আমার কি রাজকন্যার অভাব? তারা সব লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রোদ জল উপেক্ষা করে। আর কতদিন তাদের এমন হেনস্তা করব?

সিগারেট খাওয়া কি ছাড়লি? না ছাড়তে পারলে পাইপ ধর। অন্যকে অফারও করতে হবে না। ধোঁয়াও গেলা যাবে না। ভ্রমরের সঙ্গে ঝগড়া হলে মনোযোগ দিয়ে পাইপ পরিষ্কার করবি। দেখবি অশান্তির ঝড় উড়ে গেছে। মেয়েদের রাগ একই পাত্রে বেশিক্ষণ থাকে না গড়িয়ে যায় অন্য পাত্রে। এই মস্ত সুবিধা।

ভালো থাকিস। সময়ে খাবার খাস। আর এই অবেলাতে ঘুমোস না। অবেলাতে খেলে তাও হজম করতে পারতিস হয়তো। কিন্তু অবহেলার ঘুম হজম করতে পারার কোনোই সম্ভাবনা নেই। তুই তো আবার ছেলেবেলা থেকেই পেটরোগা।

—ইতি

তোর দিগা পাঁড়ে

পুনশ্চ : জললিপি এক বুড়ো বিড়িখেকো আর্টিস্টের সঙ্গে ভেগে গেছে তার স্বামী পানকৌড়িকে ছেড়ে। জলপিপির মতো মেয়ে কী যে দেখল সেই হাঁড়িচাচার মধ্যে, তা সে-ই জানে। দূর শালা। এ জন্মে লাইন চুজ করাই ভুল হয়ে গেছে। আর্টিস্টই হওয়া উচিত ছিল।

দিগন্ত

বেণি ব্যানার্জি অ্যাভিন্যু

কলকাতা-৭০০ ০৩১

কল্যাণীয়াসু,

তোমার অনুরোধানুসারে রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ে তোমার জ্ঞাতব্য জানাতে অনেকই বিলম্ব হইল। সে অপরাধ মার্জনা করো।

সত্তরোর্ধ্বরাই জানেন তাঁদের বৈকল্যের কথা। কোনো বিশেষ পীড়া ছাড়াই পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। সব বাহ্য জিনিসকেই বর্জ্য বলে মনে হতে থাকে তখন। যেমন বাঁধানো দাঁত, হাতঘড়ি, জামা-কাপড় ইত্যাদি ইত্যাদি। এই বয়েস তাই থ্রি-পিস সুট-ওয়ালাদের আর ড্রেসিং গাউন ওয়ালাদেরও লুঙি-ফতুয়াতে ফিরে যেতে দেখি। এইসব শারীরিক কারণেই যৌবনের যে অনায়াস ফূর্তি, তাতে টান পড়ে। যৌবন যে বিধাতার কত বড়ো দান তা এখন প্রতি মুহূর্তে বোঝা যায়। এবং যৌবনকে পরিপূর্ণরূপে সম্ভোগ যে করিনি কেন, তা ভেবে নিজের উপর রাগ হয়।

যাই হোক, নিজের অপরাগতার ও মন্দ স্বাস্থ্যের কথা সবিস্তারে কারোকে বলাটা শোভন নয়। তোমর বান্ধবী ইন্দিকে আমি আজই সকালে নিজে জি.পি ও-তে গিয়ে একটা চিঠি পোস্ট করেছি। চিঠিটি অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে গেল। কোনো উপায় ছিল না। যে বিষয়ের অবতারণা সে এবং তুমি করেছিলে তোমাদের চিঠিতে, সেই বিষয়টিও যে লঘু নয়। অতএব গুরু হতে বাধ্য।

সামর্থ্য থাকলে ক্যুরিয়ারেই পাঠাতাম। কিন্তু সামর্থ্য নেই বলেই এমনি ডাকে পাঠাতে হল। ভারী হওয়াতে, উপরি টিকিটও লাগাতে হল। আশা করি, তাড়াতাড়িই পাবে।

তোমার সঙ্গে যদি তার কথা হয় ফোনে তাহলে তুমি জানিয়ে দিয়ো এই কথা।

যদিও তুমি নিজের সশরীরে উপস্থিত ছিলে না কিন্তু তোমার অদৃশ্য হাত যে ছিল সেই ক্রিয়াকাণ্ডের পেছনে তা আমার না জানার কথা নয়। আমার দীর্ঘজীবনে আমার জন্মদিন কখনোই এইভাবে পালিত হয়নি। আমি অভিভূত। তোমরা আমাকে যে 'মঁ ব্লাঁ' কলমটি দিয়েছ তার দাম নাকি দশ হাজার টাকা? আমি আর কতদিন বাঁচব? আমার জন্যে এত টাকা তোমরা নষ্ট করলে জেনে বড়ো অনুতাপ হয়েছে। তবে এ কথাও বলব যে, আনন্দ সেই অনুতাপকে ছাপিয়ে গেছে।

তোমার গুরুপত্নীকে তোমরা যে অনেকগুলি শাড়ি দিয়েছ তার মধ্যে পোশাকি শাড়িটি এতই ভালো যে, তিনি বলছিলেন যে "আমার বিয়ের সময়ে তোমার ছাত্ররা কোথায় ছিল? এমন শাড়ি বিয়ের সময়ে পরলে তবে না হত!"

যাই হোক। তোমরাই আমার ছেলে এবং মেয়ে, তোমরাই আমার সব। রবীন্দ্রনাথ বলতেন রক্তসূত্রের আত্মীয়তাটা আত্মীয়তাই নয়। যে আত্মীয়তা আমরা ব্যবহারিক সূত্রে প্রাপ্ত হই সেই আত্মীয়তাই আসল আত্মীয়তা। তোমরা আমার সন্তানের চেয়েও আপন। উপহারভারে ভরিয়ে

দিয়েছ বলেই আমি একথা বলছি না। আমার প্রতি তোমাদের যে GENUINE CONCERN আছে তা আমি উপলব্ধি করেছি।

অনুযোগ করে অশিক্ষিতেরা, তবু না বলে পারছি না যে, আমার আরেক ছাত্র, আমার মার্কিনমুলুক প্রবাসী পুত্র শান্তনুকে আমি আর পুত্রবৎ বলে মনে করতে পারি না। তোমরাই আমার সব। আমার পুত্র যে অমানুষ হয়েছে তার দায় আমার উপরেই বর্তাবে। বলতে হবে, তাকে ঠিকমতো শিক্ষা আমিই দিতে পারিনি। অথচ তোমরা তো একই সঙ্গে একই ক্লাসে আমার কাছে পড়েছ। ভাবলে অবাক হই।

সংসারে অনেক কিছুই ঘটে দিগন্ত, যা যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দের লেখাতে পড়েছিলাম যে, তুমি অত্যন্ত ভালো ও সাবধানী ড্রাইভার হতে পারো, কিন্তু অন্য চালকের গাড়ি চালনার প্রকৃতির উপরে তোমার তো কোনো হাত নেই। তাই তোমার সব মুন্সিয়ানা ও সাবধানতা সত্ত্বেও দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। দুর্ঘটনার উপরে তোমার কোনো নিয়ন্ত্রণই নেই, তোমার নিয়ন্ত্রণ নেই, তোমার নিয়ন্ত্রণ শুধু তোমার নিজের আচার-ব্যবহারেরই উপরে। এই কথা মনে করেই, নিজেকে সান্ত্বনা দিই। ললাটলিখন বোধহয় কেউই খণ্ডাতে পারে না।

যৌবনে নিরীশ্বরবাদী ছিলাম। যতই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি ততই বুঝতে পারছি, কোনো অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্ব।

আমার এই প্রগলভতা নিজগুণে মার্জনা কোরো। মাঝে মাঝে মনে হয় যে, পাশ্চাত্য দেশের সংস্কৃতি সংস্কৃতিই নয়। তাদের নতজানু হয়ে বসে আমাদের কাছে অনেক কিছুই শেখার ছিল। অবশ্য বর্তমানে আমরা তাদেরই অন্ধ অনুকরণ করে আমাদের সর্বনাশ সুনিশ্চিত করছি।

ভালো থেকো। মাঝে মাঝে চিঠি লিখো। কলকাতাতে এলে দেখা কোরো।

ইতি—
তোমাদের শুভার্থী
প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

দিগন্ত বোস
যশপুর, কটক
ওড়িশা

যশপুর, কটক
ওড়িশা

স্যার,

আপনার চিঠি পেয়ে আশ্বস্ত হলাম। ইন্দি রবীন্দ্রনাথকে তার জন্মদাতা পিতৃদেব-এর চেয়েও বেশি শ্রদ্ধা করে। সে কারণেই সে সত্যিই আহত হয়েছে। আপনার চিঠির অপেক্ষাতেও আছে সে বহুদিন। ভালো থাকবেন। প্রণাম নেবেন।

ইতি
দিগন্ত

প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়
বেণি ব্যানার্জি অ্যাভিন্যু
কলকাতা-৭০০ ০৩১

বেণি ব্যানার্জি অ্যাভিন্যু

কল্যাণীয়াসু ইন্দি,

কলকাতা-৭০০ ০৩১

দিগন্তকে লেখা তোমার চিঠিখানি দিগন্ত আমাকে অনেকদিন আগে পাঠিয়েছিল কিন্তু নানা কারণে এর আগে উত্তর দিতে পারিনি বলে লজ্জিত। চিঠির উত্তর না দেওয়া এবং তা সময়ে না দেওয়া চরম অভদ্রতা। আমি যদি কোনো বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব হতাম, যিনি দিনে অগণ্য চিঠি পান পৃথিবীর সব কোণ থেকেই, তবেও না হয় ব্যস্ততার ন্যায্য অজুহাত দিয়ে নিজের বিবেককে বোঝাতে পারতাম। তা যখন আমি নই, তখন আমার কোনো অজুহাতও নেই।

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেও তো তাঁকে কম নিন্দামন্দ সহ্য করতে হয়নি। তবে তাঁর পরিশীলিত মন ও প্রকৃত শিক্ষা তাঁকে সাধারণের স্তরে নিজেকে নামিয়ে এনে তার প্রতিবাদ করতে দেয়নি। তবে ঘনিষ্ঠদের কাছে প্রচ্ছন্নভাবে অনেক সময়েই অনুযোগ করেছেন। তাও তাঁদের সহানুভূতি কুড়োনোর জন্যে নয়। নিজের আত্মবিশ্বাসকে দৃঢ়তর ও নিজের গন্তব্যকে স্পষ্টতর করতেই তিনি তা করতেন।

তুমি কি জানো মা? যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা একবার বাংলার এম.এ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে রবীন্দ্রনাথের "ছিন্নপত্র" থেকে একটি প্যারাগ্রাফ তুলে দিয়ে তার উপরে প্রশ্ন মুদ্রিত করেছিলেন "নিম্নলিখিত প্যারাগ্রাফটি শুদ্ধ বাংলায় লিখ।"

কিন্তু তার কিছুদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরে সেই অধ্যাপকেরাই সাষ্টাঙ্গে তাঁকে প্রণাম করেছিলেন।

ডিনামাইটের আবিষ্কারক অ্যালফ্রেড নোবেল পৃথিবীর ধ্বংসকারী বিস্ফোরকের পথিকৃৎ। তাঁর পাপ স্খালনের জন্যে তাঁরই স্থাপিত অছি-পরিষদ ওই পুরস্কার দিয়ে থাকেন।

কত কল্লোল-যুগ, পরিচয়-যুগ, কৃত্তিবাস-যুগ-এর যুগান্ত আমরা নিজ চোখেই প্রত্যক্ষ করলাম। রবীন্দ্রনাথকে এঁদের মধ্যে ওইসব যুগ-এর খুব কমজনই বড়ো সাহিত্যিক বা কবি হিসেবে স্বীকার করেছেন বা করেন। গান, যেহেতু নিরানব্বই ভাগ বাঙালি কবি-সাহিত্যিক জানেন তো না-ই, বোঝেনও না, শোনেনও না, তাই রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে সম্পূর্ণই অনধিকারীরা কী বললেন না বললেন তা নিয়ে অযথা উত্তেজিত হবার কোনো মানেই হয় না।

আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, আজ বলে নয়, রবীন্দ্রনাথকে বাঙালি কবি সাহিত্যিকদের অধিকাংশই সহ্য করতে পারতেন না। তিনি অন্যদের চেয়ে সবদিক দিয়ে এতই বড়ো ছিলেন এবং আজও আছেন যে, ঈর্ষাতে অন্যেরা সবুজ হয়ে যেতেন। এতদিন পরেও যান।

এই প্রসঙ্গে নীরদচন্দ্র চৌধুরীর একটি লেখা, পাক্ষিক 'দেশ'-এ প্রকাশিত হয়েছিল সাম্প্রতিক অতীতে। তাতে তিনি লিখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ লেখক হিসেবে বাবুস্থানীয় ছিলেন। সাধারণ বাঙালি লেখকরা ছিলেন শ্রমজীবী। সুতরাং 'অবাবু' লেখকেরা 'বাবু' লেখক রবীন্দ্রনাথকে প্রচণ্ড বিদ্বেষের চোখেই দেখতেন। কবিরা আবার তাঁদের মধ্যেও অকর্মণ্য বলে গণ্য হতেন। যদি না, সে কবি হাকিম নবীনচন্দ্র বা উকিল হেমচন্দ্র হতেন।

রবীন্দ্রনাথ হাকিম ছিলেন না, উকিলও নন, জমিদার। তবু মরতে তিনি কবি হতে গেলেন কেন? তরুণ জমিদারবাবু হয়েও জমিদারপুত্রের মতো আলস-বিলাসে কাল কাটালেন না কেন?

এমনকী তিনি অন্য কবি-যশপ্রার্থী জমিদারদের মতো 'জাত লেখক'দের মাইনে করে রেখে তাদের দিয়ে লিখিয়ে নিজের নামে প্রকাশও করলেন না। তা করলেও 'জাত লেখকদের' কিছু অর্থাগম হত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কাব্যকে তাঁর 'বাপের সম্পত্তি' বলে দাবি করলেন। কোনো কোনো গণ্যমান্য সাহিত্যিক আবার তাঁকে কবি বলে গ্রহণও করলেন। সেটা জাত লেখকদের কাছে আরো অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হল।

তারপরে নীরদবাবু, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, যিনি রবীন্দ্রনাথের কট্টর সমালোচক ছিলেন, তাঁর কথা বলেছিলেন। নীরদবাবুর এক বন্ধু সুরেশবাবুকে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। সন্ধের সময়ে, একটু তরল অবস্থাতে থাকার দরুন, " In Vino Veritas" এই বিখ্যাত প্রবাদ অনুযায়ী সুরেশবাবুর কাছ থেকে সত্যি উত্তর পেয়েছিলেন। সুরেশবাবু স্থির দৃষ্টিতে নীরদবাবুর বন্ধুর দিকে চেয়ে বলেছিলেন, "সত্যি কথাটা বলব? আমরা ভাবতাম সবাই বাংলা লিখছি, ইংরেজির ধার ধারিনে, সুতরাং সবাই এক। একদিন বুঝতে পারলুম যে, তা নয়, তিনি অনেক উপরে। এটা সহ্য হল না।" বলেই, সুরেশচন্দ্রের বুকে হাত দিলেন কোথায় যন্ত্রণা তা বোঝবার জন্যে।

নীরদবাবুর মতে এটাই যে, সুরেশচন্দ্রর রবীন্দ্রনিন্দার মূল কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না।

তোমার উল্লিখিত লেখক ভীমসেন যোশীর সুরে রবীন্দ্রনাথের গান বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডকে পাস করতে অনুরোধ করেছেন। যোশীজির সেই গান, আমার এক গান-জানা ছাত্র, গ্র্যান্ড হোটেলের আনন্দ পুরস্কারের সেই অনুষ্ঠানে শুনেছিল। তার কাছে যা শুনেছি, তাতে তো জানি, সে এক বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা।

সাম্প্রতিক অতীতে এক রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক এক মহাপরাক্রান্তের পরমাত্মীয়ের পৃষ্ঠপোষণাতেই নাকি মস্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক হয়ে উঠেছেন তিনি নাকি রবীন্দ্রনাথের চেয়েও রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে বেশি জানেন। সরকারের প্রচ্ছন্ন মদত আছে এঁকে রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক হিসেবে তুলে ধরার পেছনে। থাকবেই। মহাপরাক্রান্তর আত্মীয় পেছনে থাকলে আমলারা সেলাম তো বাজাবেনই। পার্টির ক্যাডারেরাও বাজাবে। যে রবীন্দ্রনাথ রাগরাগিণী গুলে খেয়ে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে জেনেশুনে অশাস্ত্রীয় করে রাগমালা গেঁথে আমাদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন সেই রবীন্দ্রসঙ্গীতকেই এই হঠকারী পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি মূর্খামির পরাকাষ্ঠা করে, শব-ব্যবচ্ছেদ করে রাগরাগিণী তুলে ধরছেন। হাটুরে শ্রোতাদের সামনে ঘন ঘন ইংরেজি শব্দর ফুলঝুরি ফুটিয়ে নিজের পাণ্ডিত্য প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন। আমার এক ছাত্র, দিগন্ত চেনে না, বলছিল যে, একদিন তাঁর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তাঁকে প্রশ্ন করবে, "আই ডোন্ট নো"—মানে কি?

যাঁরা ইংরেজি জানেন না, তাঁদের কাছে মস্তবড়ো ইংরেজিনবিশ হতে অসুবিধে কী? অথচ এর কোনো প্রতিবাদ হচ্ছে না।

উনি প্রকাশ্যে নাকি বলছেন যে এসব 'গিমিক' আমি করেই যাব যতক্ষণ না মানুষে আমাকে "ইট মেরে" উঠিয়ে দিচ্ছি। ওঁর বোধহয় জানা নেই যে, রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি এবং শিক্ষাতে যাঁরা প্রকৃতই শিক্ষিত, ইট মারার সংস্কৃতি তাঁদের নয়। যে হাটুরে ও 'ক্যাডারেরা' তাঁর অনুষ্ঠান শুনতে যান তিনি তাঁদেরই যোগ্য গুণী। যেখানে আছেন তিনি সেখানে থাকলেই ভালো করবেন, বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার চেষ্টা না করাই তাঁর পক্ষে শুভ হবে।

তবে এও ঠিক, ওইসব উপদ্রবই বানের জলের মতো। কিছুদিন ঘোলা জলের স্রোত বইয়ে খড়কুটো পুরীষ ভাসিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে পূতিগন্ধময় কাদা রেখে দিয়ে। এইসব ছোটো মাপের এবং নিজস্বার্থপরায়ণ মানুষদের নিয়ে আলোচনা না করাই শ্রেয়। অনেকেই আসবেন, অনেকে মুছেও যাবেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই বয়ে যাবেন নদীরই মতো আমাদের হৃদয়ে।

এটুকু সবসময়ে মনে রাখবে মা যে, জ্ঞানের সীমা চিরদিনই ছিল কিন্তু অজ্ঞতার সীমা কখনোই ছিল না।

তুমি ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আর রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে যেসব চিঠিপত্রের আদান প্রদান হয়েছিল তার সংকলন 'সুর ও সংগতি' বইটি জোগাড় করে পড়ে ফ্যালো। এ-ছাড়াও ধূর্জটিপ্রসাদের স্ত্রীকে উৎসর্গ করা 'বক্তব্য' বইটিও পড়ে ফেলো। বিশেষ করে 'রবীন্দ্রসংগীতের গায়ন পদ্ধতি' শীর্ষক অনুচ্ছেদটি। সাহিত্যিক হিসেবে ধূর্জটিপ্রসাদ যে মস্ত বড়ো ছিলেন ও কথা আমি বলব না। কিন্তু তিনি মস্ত বড়ো প্রাবন্ধিক ও পণ্ডিত ছিলেন। বহুরূপী প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। তাঁর মতো গুণী বাংলা ভাষাভাষী বেশি পাননি এ-যাবত।

ধূর্জটিপ্রসাদকে যদি পড়োই মা, তবে ভালো করেই পড়ো। তাঁর ট্রিলজি উপন্যাস 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত' এবং 'মোহনা' জোগাড় করে পড়ে ফেলো। দিগন্তকে লিখো, সে-ই জোগাড় করে দেবে। ওই ট্রিলজি থেকে একটি অংশ তুলে দিচ্ছি।

দশাশ্বমেধ ঘাটে এক অপরাহ্ণে সুজন ও রমলা এসে পৌঁছোল। সানাই বেজে উঠল।

সানাই বেজে উঠল। প্রথমে মোটা সুর। একটানা। তৈলধারাবৎ।

চামড়ার যন্ত্রের আওয়াজ এল। তারপর গৎ শুরু হল।

রমলা দেবী প্রশ্ন করলেন, কী সুর এটা?

সুজন—রাজপুরীতে বাজায় বাঁশির।

রমলা—না, কী রাগ?

সুজন—নাম জানি না রমাদি। কী হবে জেনে নামটুকু?

রমলা—শোনো।

ধূর্জটিপ্রসাদ, যিনি পণ্ডিত রতনঝংকার-এর বন্ধু ছিলেন, যিনি ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের যেমন বড়ো বোদ্ধা ছিলেন তেমনই রবিবাবুর গান-এরও একজন মস্ত সমঝদার, তিনি বলছেন সুরের বা রাগের নাম জেনে কী হবে? শোনো, সানাই শোনো।

আমাদের হিন্দুস্থানি মার্গসঙ্গীতের গম্ভীর, সম্ভ্রান্ত এবং কখনো কখনো নিয়মানুবর্তিতার কাঠিন্যের কারণে ভীতিজনক কাঠামোর মধ্যে না ঢুকিয়েও রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানকে যে আমাদের ঘরে ঘরে এমন করে পৌঁছে দিয়ে নানা রাগরাগিণী সঙ্গে আমাদের অজানিতেই পরিচিত করিয়েছিলেন তার কারণ তিনি জানতেন যে, গানের প্রাণই হচ্ছে আসল, তার হৃদয়ই হচ্ছে সবশেষে কথা, তার বাইরের রাজবেশ নয়। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় উচ্চাঙ্গসঙ্গীত জানতেন বলেই তা নিজের খেয়ালখুশি মতো ভেঙে তাঁর নিজের গানের সৃষ্টি করেছিলেন। ধূর্জটিপ্রসাদ ভারতীয় উচ্চাঙ্গসঙ্গীত জানতেন বলেই রবীন্দ্রনাথের সহজ হবার দুরূহ কারিকুরিকে তেমনভাবে লক্ষ্য করে তাঁর তারিফ করা যোগ্যতা রাখতেন। রবীন্দ্রনাথ ছন্দের জগতের শেষে পৌঁছে তারপরে গদ্য কবিতাতে এসেছিলেন। অগণ্য আধুনিক কবিদের মতো ডাবল-প্রোমোশন পেয়ে গদ্যকবিতা রচয়িতা হননি। আসল কথাটা হচ্ছে, মূলে যাওয়া। গভীরতা। পুঁটিমাছ মাত্রই অল্প জলে ছরছর করে। এদের ঘৃণা না করে, এদের উপরে ক্রুদ্ধ না হয়ে, এদের অনুকম্পা করো। তার বেশি এঁদের যোগ্যতা নেই। পরম লজ্জাহীনেরও কিছু লজ্জা থাকে। এঁদের বোধহয় সেটুকুও নেই। নিজ নিজ স্বার্থ, নিজ নিজ স্তাবকমণ্ডলী তাঁদের সাধারণ বুদ্ধিও নষ্ট করে দিয়েছে।

এবারে চিঠি শেষ করি মা। দুচোখেই ছানি পড়েছে। মাদ্রাজ, থুড়ি, চেন্নাই যেতে হবে নেত্রালয়ের ড. সবুজ বিশ্বাসের কাছে ছানি কাটাতে (ড. জে. বি. বিশ্বাস)। আমাদের এই প্রজন্মের কলকাতার বাঙালিরা নিজ রাজ্যে শিক্ষায়, চিকিৎসায়, সাহিত্যে, সঙ্গীতে এবং আত্মসম্মানজ্ঞানের পরীক্ষাতে অন্য বহু প্রদেশের কাছেই যে ক্রমাগত হেরে যাচ্ছি সেটা আমাদের পক্ষে গৌরবের নয়। একটা সময়ে সারা ভারতের মানুষ কলকাতাতেও পড়তে আসত, চিকিৎসা করাতে আসত, সাঙ্গীতিক শিরোপা পেতে আসত। এখন আমরা বড়োই দীন হয়ে গেছি। সর্বক্ষেত্রের এই "জনগণায়ন" আমাদের গভীর অন্তর্মুখীনতাকে নষ্ট করে দিয়েছে। নিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা, সততা

এবং বড়ো হওয়ার জেদ নষ্ট করে দিয়েছে। সব ক্ষেত্রের প্রকৃত গুণীরাই এখন নিজের অভিমান নিয়ে ঘরে বসে রয়েছেন। অর্থনীতির গ্রেশাম সাহেবের সেই পুরোনো MAXIM 'BAD MONEY DRIVES AWAY GOOD MONEY' র এমন জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমাদের নিজবাসের মতো প্রকট সম্ভবত আর কখনোই হয়নি। বাঙালি তার নিজের দোষে নিজের নিশ্চেষ্টতাতে, নিজের সবরকম অন্যায় সহ্য করার সহ্যশক্তিতে আমার মতো একজন সামান্যজনকেও স্তম্ভিত করে দিয়েছে। যাঁরা অসামান্য, তাঁরাও কেন এই বামনদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করার জন্যে অঙ্গুলিহেলন পর্যন্ত করছেন না, তা ভেবে অবাক হই।

কারণটি কী? ভয় কী?

আমাদের দিন তো শেষই। তোমরা যেমন করে গড়বে দেশ, দেশ সেই চেহারাই পাবে। তুমি যে অন্যায় হয়েছে বলে মনে করে তার প্রতিবাদ করতে চেয়েছ, এ জন্যে তুমি আমার অভিনন্দন জেনো। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত প্রতিবাদী থাকবে। ভয় ব্যাপারটার জন্ম অজ্ঞতা থেকেই। কিছুতেই ভয় পাবে না। রবীন্দ্রনাথের সেই কথা মনের মধ্যে গেঁথে রাখবে—

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।"

তোমার মঙ্গল হোক মা লক্ষ্মী, জীবনে মানুষের মতো মানুষ হও। সুখী হওয়ার সস্তা আশীর্বাদ আমি করব না। প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে গিয়ে যদি দুখি হতে হয়, তবে তাই হও। তবে সে দুঃখ বহিরঙ্গেরই দুঃখ। বাইরেরই ছিন্নবস্ত্র শুধু। মনুষ্যত্বর জ্যোতি তোমার অন্তরকে সর্বদা দৃপ্ত, দীপিত করে রাখুক—এই আশীর্বাদ করি।

ইতি—
আশীর্বাদক
প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

ইন্দি সেন
মার্লবোরো

স্কটিশ অটাম লেন
ডার্নসটাউন

দিগন্ত আমার,

গত রাতে তোমাকে স্বপ্নে দেখলাম। আজকাল পৃথিবী থেকে স্বপ্ন উধাও হয়ে গেছে। কারণ, নব্বইভাগ মানুষে হয় ঘুমের ওষুধ নয় ট্রাংকুলাইজার খেয়ে শোয় ঘুমোবার আগে। আর সেইসব ওষুধ খেলে মানুষে আর স্বপ্নই দেখে না। তাদের স্বপ্নগুণ অথবা স্বপ্নদোষ সবই উধাও হয়ে যায়। স্বপ্নহীন মানুষও কি মানুষ? তুমিই বলো?

তোমাকে স্বপ্নে দেখলাম, আবার দেখলামও না। কেন, তা ব্যাখ্যা করে বলি। তোমাকে দেখলাম কিন্তু তোমার চেহারাই দেখলাম, তোমার মুখে যে সর্বক্ষণ এক স্মিতহাসি লেগে থাকে তা দেখতে পেলাম না। আমার এক বান্ধবী সঙ্গীতা, বয়সে যদিও ছোটো অনেক, একটি কবিতা প্রায়ই বলে। সঙ্গীতা খুব ভালো গান গায়। দেখতেও অপরূপ সুন্দরী। বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল বিয়ের আগে। সম্প্রতি বিয়ের পরে এখানে এসেছে। এখানে, মানে ইয়েল ইউনিভার্সিটিতে ওর স্বামী ইংরেজির অধ্যাপক। সঙ্গীতা দক্ষিণীর ছাত্রী ছিল। ওর গান শুনলে মন ভরে যায়। যদিও দক্ষিণীর সব ছাত্র-ছাত্রীর গানই

যে আমার ভালো লাগে এমন নয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও আবুল বাশারের রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে মন্তব্য পড়ে সে-ও আমারই মতো রীতিমতো উত্তেজিত।

যাই হোক, যা বলছিলাম, ওর বলা কবিতাটির কথা :

"যতবার আঁকলাম, মুছলাম তার চেয়ে বেশি।
চোখ, চিবুক, চুল, সবই মিলল।
মিলল না, শুধু সেই ভাবনাটুকু।
কবে যেন চুরি হয়ে গেছে।"

তোমাকে স্বপ্নে দেখতে গিয়েও ঠিক ওরকমটাই হল। "ভাবনাটুকু কবে যেন চুরি হয়ে গেছে।"

কিন্তু কেন হল বলতে পারো?

ভালোবাসা কাকে বলে আমি জানি না। পৃথিবীর কোনো অভিধানেই এই শব্দের কোনো ব্যাখ্যা নেই। তবু মনে হয়, ভালোবাসা এমন এক আঙ্গিক যা নইলে ব্রহ্মা জগন্নাথ হতেন। যে মানুষ জীবনে কখনো কারোকে স্বার্থহীন গূঢ় কোনো উদ্দেশ্যহীন, মতলবহীন ভালোবাসা বাসেনি সে অমৃতের স্পর্শ থেকেই বঞ্চিত হল। আকাশে মেঘ করলে, পাখি ডাকলে, প্রচণ্ড জ্যামের মধ্যে পড়ে অনির্দিষ্টকাল স্টিয়ারিং-এ বসে থাকলে চতুর্দিকের অধৈর্য অবুঝ, বালখিল্যদের তীব্র হর্ন-এর শব্দের এবং ছটফটানির মধ্যে বসে হঠাৎই যার মুখ ভেসে ওঠে মনের অদৃশ্য পার্সোনাল কম্পিউটারের স্ক্রিনে, সে-ই তো ভালোবাসার জন। নয় কি? সে-ই তুমি। অনেক কৃতবিদ্যা মানুষকেও এরকম জ্যামে পড়ে কলে-পড়া ইঁদুরের মতোই ছটফট করতে দেখি। এঁরা বোধহয় শোনেননি যে, " There is no point in trying to do something when there is nothing to be done".

যখন তোমার মুখ এমন এমন সময়ে ভেসে ওঠে তখনই বুঝি যে আমি মরেছি। এই দ্রুতগতি, কম্পিউটার-সর্বস্ব, ভোগবাদী, ভান-ভঙ্গিতে ভরা পৃথিবীতে তুমি আমার পবিত্রতম তীর্থ, কোলাহলহীন, অনাবিল, বৈশাখের ভোরের হাওয়া তুমি আমার, আকাশের প্রথম মেঘ, তুমি আমার বসন্তের আমের মুকুল আর কাঁটালের মুচির গন্ধ। তুমি দিগন্ত আমার সব, আমার সর্বস্ব। তুমি নইলে আমি শব হব।

আমিও একটা কবিতা লিখে ফেললাম, "ভালোবাসা কাকে বলে জানিনা/কোনোদিন জানতেও চাইনি/ ওই মুখ ওই চোখ দুটিকে/ কাছে পেলে আর কিছু চাইনি।"

কেমন হয়েছে। শেষে কি কবিতার পোকা আমাকেও কামড়াল?

সেইসব পরম একাকিত্ব ও বিমর্ষতার ক্ষণে আবার বিদ্যুৎচমকের মতো মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথকেও। "আমি নারী, আমি মহীয়সী, আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্নাবীণার নিদ্রাহীন শশী, আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা, মিথ্যা হত কাননে ফুল ফোটা।"

তোমার নইলে যেমন আমার চলবে না, আমায় নইলেও তোমার চলবে না। ফুঃ। কোথায় তোমার প্রীতি আর ভ্রমর আর কোথায় আমি। কাদের সঙ্গে কার তুলনা।

চার-পাঁচদিনের জন্যে চলে এসো না! তোমার আগামী ছুটিতে একটা উইকএন্ড দেখে। বলতে লজ্জা করছে যদিও, লজ্জার মাথা খেয়েই তবুও বলছি যে, তোমাকে কিছুদিন হল ভীষণই পেতে ইচ্ছে করছে শরীরে। বলো তো রিটার্ন টিকিট কেটে পাঠিয়ে দি।

তোমার কলেজ তো অনন্তকাল ছুটিই থাকে। আসতে তোমার বাধা কি?

এসো দিগন্ত। আমার শরীর-মনের সব রন্ধ্র তুমি ভরাট করে দিয়ে যাও। আমি পুরোপুরি দিগন্তলীন হতে চাই। এসো প্লিজ। লক্ষ্মীটি।

ইতি—
তোমার এন্তেকাল ইন্দি

যশপুর
কটক

আমার জিয়নকাঠি ইন্দি,

তোমার চিঠি পেয়ে নবীকৃত হলাম। এই সংবারে মানুষের পক্ষে নবীকৃত হওয়াটাই সবচেয়ে কঠিন।

ঘরের ফার্নিচারের অবস্থান বদলে দিলে, দেওয়ালের রং ফেরালে, জানালাতে দরজাতে নতুন পর্দা ঝোলালে সোফা সেট-এর মোড়ক এবং খাবার ঘরের টেবলের গদি বদলালে বাসস্থানকে সহজেই নবীকৃত করা যায়। সাপ তার খোলস ফেলে নতুন খোলস গজিয়ে নিয়ে নিজেকে নবীকৃত করে। হরিণ তার পুরোনো শিংকে ফেলে দিয়ে নতুন শিং পরে নবীকৃত হয়। বাঘ গত শীতে যে সঙ্গিনীর সঙ্গে সহবাস করেছিল এই শীতে তার অন্য বনের অন্য সঙ্গিনীর সঙ্গে সহবাস করে নিতুই-নব, নবীকৃত হয়। পর্ণমোচী গাছ গ্রীষ্মে বা শীতে তার পাতা খসিয়ে দিয়ে বর্ষাতে বা বসন্তে আবারও নব কিশলয়ে নিজেদের নতুন চিকন পাতাতে ভরে তুলে নিজেকে নবীকৃত করে। নবীকৃত করতে পারে না তেমন করে নিজেদের, শুধু হতভাগ্য মানুষেরাই। তাই নবীকরণ, আমার কাছে সবচেয়ে দুরূহ আর্ট।

পূর্ব আফ্রিকাতে যখন গেছিলাম তখন সেখানের রক্তবস্ত্র পরিহিত মাসাই উপজাতিদের খুব কাছ থেকে জানবার সুযোগ হয়েছিল। মাসাইদের প্রতি ছেলেবেলা থেকেই আমার দুর্বলতা ছিল অপরিসীম। এখনো তাদের মেয়েরা তেমন কোনো ছেলেকে বিয়েই করে না যে, পায়ে হেঁটে সিম্বা অর্থাৎ সিংহ না মেরেছে। একেই বলে 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'। ওই মাসাইরা নিজেদের নবীকৃত করতে মাঝে মাঝেই খুশিমতো নিজেদের নাম বদলে দেয়। যে রাম ছিল সে মধু হয়ে যায়। যে যদু ছিল সে শ্যাম হয়ে যায়। এইজন্যে পূর্ব আফ্রিকাতে যখন জার্মান এবং ব্রিটিশদের আধিপত্য ছিল তখন জার্মান ও ব্রিটিশদের পুলিশ বিভাগের হিমশিম খেতে হত খুনি ধরতে গিয়ে। কারণ, এই গ্রামের রাম কারোকে খুন করে দিয়ে অন্য গ্রামে গিয়ে শ্যাম হয়ে কদমতলায় গোপিনীদের নিয়ে কেলি অথবা কেলো করলেও পুলিশের কোনো এক্তিয়ারই ছিল না তার কেশাগ্র স্পর্শ করার।

আমরা পর্ণমোচীও নই। যে পাতা আমাদের ঝরে যায় তা আর নতুন করে গজায় না। শরীরের আমরা নবীকৃত হতে পারি না। তবে মনে অবশ্যই পারি। আর মন আছে বলেই তো আমরা মানুষ। আমরা যেহেতু মাসাই নই তাই নবীকৃত হওয়া বড়ো কঠিন। আর নবীকৃত না হতে পারা মানেই একঘেয়েমির জাঁতাকলে পিষে মরা। তাই নিজেকে নবীকৃত করবে বলে যে ডাক দিয়েছ সেজন্য ধন্যবাদ। কারণ তাতে আমিও নবীকৃত হব।

দেখছি, কী করা যায়। তবে তোমাকে প্লেনের টিকিট পাঠাতে হবে না আমার জন্যে। প্রেমিকাকে আদর করতে যেতে যে পুরুষ প্রেমিকার কেটে দেওয়া টিকিটে যায় তার পৌরুষ সম্বন্ধেই আমি সন্দিহান হব। অবশ্য তুমি বলতে পারো এ নিছকই বোকা-বোকা দম্ভ! হতে পারে হয়তো। কিন্তু শুধু বোকারাই যে জানে বোকামির আনন্দ! চালাকেরা সেই আনন্দ জানবে কী করে!

তুমি তোমার সুন্দর, উষ্ণ, কামগন্ধ-জরজর আতরগন্ধী চিঠি শেষ করেছ রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করে, আমিও তাই করি।

রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আর আবুল বাশারের মন্তব্য সম্বন্ধে আমার অধ্যাপক

এখনো নীরব। তিনিও কি কারও ভয়ে ভীত? বঙ্গভূম থেকে সব মেরুদণ্ডই কি রপ্তানি হয়ে গেছে বাংলাদেশে? নাকি অন্য কোথাও?

কবে যে স্যার আমার চিঠির উত্তর দেবেন বুঝে উঠতে পারছি না। তোমাকে কি লিখেছেন সরাসরি? চিঠি পেলে আমাকে জানিয়ো।

"সংসারে মোরে রাখিয়াছ যেই ঘরে,
সেই ঘরে রব সকল দুঃখ ভুলিয়া
করুণা করিয়া নিশিদিন নিজ করে,
রেখে দিয়ো তার একটি দুয়ার খুলিয়া।"

ভালো থেকো, আনন্দে থেকো
ইতি, তোমার নবীনের দূত
দিগন্ত

স্কটিশ অটাম লেন
ডার্নসটাউন

দিগন্ত,

তোমার চিঠি পেয়ে আমিও নবীকৃত হলাম। তুমি সশরীরে এলে যে কী হব, তা ভাবতে পর্যন্ত পারছি না।

তোমার চিঠিতেই মনে পড়ল, তোমার স্যার তো সত্যিই হতাশ করলেন। কবে তিনি জবাব দেবেন? তাড়া দিয়ো।

—ইন্দি

বেণি ব্যানার্জি অ্যাভিন্যু
ঢাকুরিয়া
কলকাতা-৭০০ ০৩১

দিগন্ত
কল্যাণীয়েষু,

তোমার কথামতো তোমার বান্ধবী ইন্দিরাকে চিঠি যে দিয়েছি সে কথা তো তোমাকে জানিয়েইছি। না কি জানাইনি? আজকাল কোনো কথাই মনে থাকে না। এমনকী গতরাতে কী খাবার খেয়েছি তাও মনে থাকে না অথচ ছেলেবেলার সমস্ত সুখস্মৃতি, মা-বাবা, ঠাকুমা,

কাকা-কাকিমার অপার স্নেহ, ভাই-বোনের অবিরাম খুনশুটি ও প্রগাঢ় ভালোবাসার কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। এমনকী মনে হয়, যেন সেদিনের কথা।

এই ভালো। যে স্মৃতি মনকে আনন্দে ভরে তোলে সেই স্মৃতিই তো ভালো। অন্য কথা মনে নাই বা থাকল।

এই কম্পিউটার সর্বস্ব যুগে আমরা বয়স্করা বড়ো বেমানান হয়ে গেছি। আমাদের এবারে চলে যাওয়াই ভালো। আমার পুত্র আমাকে একটি কম্পিউটার কিনে দেবে বলেছিল। বলেছিল, তাতে কম্যুনিকেশনের সুবিধা হবে। এক লহমার মধ্যে কথাবার্তা চালাচালি করা যাবে। আমিই মানা করেছি। বলার মতো কোনো কথা না থাকলে তা মিথ্যে চালাচালি করার প্রয়োজনই বা কি। তোমাদের বন্ধুকে আমার জানা হয়ে গেছে। সে একটি স্বার্থপর স্ত্রৈণ। সে যে আমারই ছেলে এ কথা ভাবতেও আমার ঘেন্না হয়। তুমি আমার অনেক বেশি ছেলে অথবা তোমার অন্য বন্ধুরা, আমার নিজের ছেলের চেয়ে।

আমি জানি, কম্পিউটার বসালেও আমার কোনো আত্মীয় বা বন্ধু বা তোমার মতো কোনো ছেলে ই-মেল এ যদি আমার পুত্রকে আমার মৃত্যুসংবাদ জানায় মুহূর্তের মধ্যে হয়তো জবাবও আসত। কিন্তু জবাবে হয়তো কম্পিউটার স্ক্রিনে ফুটে উঠত "আই হ্যাভ বুকড আ হলিডে ইন দ্যা বাহামাজ। মাই চিল্ড্রেন আর ডাইং ফর আ হলিডে অ্যান্ড সো আর উই। ক্যান্ট অ্যাটেন্ড। সেন্ডিং টু্য হান্ড্রেড ডলারস ফর ফিউন্যারাল অ্যান্ড শ্রাধ এক্সপেন্সেস। সরি।"

ভেবো না, এ আমার কষ্টকল্পনা। ঠিক এই রকমই একটি ই-মেল মেসেজ এসেছে আমার বাল্যবন্ধু সুদীপ্তের মৃত্যু-সংবাদের উত্তরে তার কৃতী বড়ো ছেলের কাছ থেকে, স্টেটস থেকে। সুদীপ্তর ছোটো ছেলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাধারণ করণিক। সে জাগতিকার্থে তার দাদার মতন বড়ো হয়নি কিন্তু সেই সুদীপ্তের ছেলের ভূমিকা পালন করেছে ও করল। একমাত্র সেই-ই!

তুমি ভেবো না যে আমি বিজ্ঞান-বিরোধী বা অগ্রগতি-বিরোধী। আমার বক্তব্য শুধু এই যে, আমাদের অগ্রগতি যেন মূল্যবোধের বিনিময়ে না আসে। তা হলেই হল। মানুষ যদি মূল্যবোধ রহিতই হয়ে গেল তাহলে এই সব অগ্রগতির মূল্য আমার কাছে একটুও থাকে না।

তুমি এবং তোমরা কী বলো?

আনন্দবাজারের ওই সাক্ষাৎকার নিয়ে তোমরা মাথা ঘামিয়ো না। সব মানুষের কাছে সবকিছু প্রত্যাশার নয়। প্রত্যেক মানুষেরই মানসিকতার, রুচির, সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তর থাকে। সেই স্তর রাতারাতি স্থিরীকৃত হয় না, বেনোজলের বন্যার পরের পলিমাটির মতো এই স্তর শিশুকাল থেকে একজন মানুষের পারিবারিক ঐতিহ্য, শিক্ষা, রুচি, মানসিকতা, মূল্যবোধ ইত্যাদির উপরে গড়ে ওঠে। তার পরিবেশ এবং প্রতিবেশও তা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সে মানুষ কার সঙ্গে বা কাদের সঙ্গে বা কাদের সঙ্গে মিশেছে শৈশব, কৈশোর ও যৌবনে, তাদের মানসিক স্তরের উপরেও তার নিজের মানসিক উচ্চতা নির্ভর করে। কথায়ই বলে, 'A man is known by the company he keep's।

রবীন্দ্রনাথের আদর্শ, রুচি, সাহিত্য, মানসিকতা এবং গানের দ্বারা যারা শিশুকাল থেকে প্রভাবিত তারা গভীর হতে বাধ্য। এই সব ভুঁইফোঁড় মানুষ, হেলিকপ্টার থেকে দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারীর মোড়ে অবতরণ করা তথাকথিত আঁতেলদের কাছ থেকে কিছুমাত্র প্রত্যাশা না করলেই তোমরা শান্তি পাবে। একথা ইন্দিরাকে জানিয়ো। শুনলাম ওই মানসিকতার অনেকে নাকি শান্তিনিকেতনে প্রাসাদ বানিয়েছেন। যাঁদের রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে এমন মনোভাব তাঁরা কোন লজ্জাতে শান্তিনিকেতনে গিয়ে বাড়ি করেন তা আমার বুদ্ধির বাইরে।

আবুল বাশারের কথা নিয়েও মাথা ঘামানোর দরকার নেই। আমার এক ছাত্র বলল যে, যে-বছর তিনি আনন্দ পুরস্কার পান সে বছর গ্র্যান্ড হোটেলের অনুষ্ঠানে তোমার উল্লিখিত ওই

লেখক নাকি বলেছিলেন যে "আমি মুরশিদাবাদ জেলার গ্রামে ছাগল চরাতাম।" এই উক্তি তাঁর সারল্য অবশ্যই প্রমাণ করে। তিনি যে অন্য অনেকের মতো আপাদমস্তক কপট এবং ভণ্ড নন তাও প্রমাণ করে। কিন্তু ছাগলচড়ুয়া থেকে রবীন্দ্রভক্ততে রূপান্তরিত হতে, যদি কোনোদিন তা হওয়া সম্ভবও হয়, যথেষ্টই সময় লাগবার কথা। তাই ইন্দিরাকে বোলো অযথা উত্তেজিত না হতে। এঁরা যা বলেন তা বলুন। ছাগলে কী না খায়,পাগলে কী না বলে।

পর্ণমোচী গাছ থেকে প্রতিবছরই পাতা ঝরে যায় কিন্তু গাছ পাতা ঝরায় নিজেকে পরের বছর নবকিশলয়ে নবীকৃত করবে বলেই। গাছেদের সঙ্গে মানুষের এই তফাত। মানুষের পাতা যখন ঝরে, তখন তা ঝরেই যায়, মানুষ কখনই নবীকৃত করতে পারে না নিজেকে।

মাঝে মাঝেই আজকাল নিজেকে পর্ণমোচী বলে মনে হয়। শুধু আমিই নই, হয়তো সব মানুষই পর্ণমোচী। কিশলয়ের স্বপ্ন দেখি আমরা একদিন। তারপরে কচিকলাপাতা-রঙা তারা আসে এক এক করে। যৌবনের উজ্জ্বল সবুজ পর্ণে ভরে যাই আমরা জীবনের শ্রাবণ-ভাদ্রে। তারপর কারো বসন্তশেষে কারো বা শীতে সেই সাজিয়ে-তোলা তিলতিল করে গড়ে-তোলা পাতারা ঝরেও যায়, এক এক করে। সংসার ছেড়ে যেতে থাকে আমাদের, ধীরে ধীরে, ভালো করে বুঝে ওঠার আগে। ছেলে মেয়ে বিদেশে যায়, তারপর শ্বশুরবাড়ি। আজকাল অধিকাংশ ছেলেরাও শ্বশুরবাড়ি যায়। আমরা ক্রমশই একলা হয়ে যেতে থাকি। রোগ, জরা, শকুনের মতো তাদের বড়ো বড়ো ডানা নিয়ে সপ-সপ করে উড়ে এসে আমাদের জীবনের ডালে বসে থাকে সারসার কখন আমাদের জীবন শেষ হবে সেই প্রতীক্ষাতে। তারপর একদিন সেই অমোঘ মুহূর্ত আসে। সব জীবনই শেষ হয়।

এসব তুমিও জানো, আমিও জানি। আমরা সকলেই জানি!

"আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু বিরহদহন লাগে
তবুও শান্তি তবু আনন্দ তবু অনন্ত জাগে।"

কিন্তু তোমার উল্লিখিত সেই দুই সাহিত্যিক কি এই পংক্তি দুটির অর্থ কোনোদিনও হৃদয়ঙ্গম করবেন?

যাঁরা বাংলা ভাষাভাষী হয়েও রবীন্দ্রনাথের করুণাধারা থেকে বঞ্চিত হলেন তাঁদের মতো হতভাগ্য আর কে আছে? প্রকৃত কৃতবিদ্য না হয়েও যাঁরা উদ্ধত, যাঁরা সর্বজ্ঞ, সেই সব শুধুমাত্র জাগতিক ও সাংসারিক দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের ঈশ্বর যেন ক্ষমা করেন। এছাড়া আর কিছু বলার নেই আমার। তোমার বন্ধু ইন্দিরাকে বোলো মিথ্যে যশ-এর ভিখারি এই সব মানুষদের যেন TOTALLY IGNORE করে। করতে পারলেই নিজের মনের শান্তি আবার ফিরে পাবে।

ভাল থেকো
ইতি আশীর্বাদক
প্র.ব.

শ্রীদিগন্ত বোস
যশপুর, কটক